মাসিক পত্রিকা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অষ্টাদশ খণ্ড।

কলিকাতা।

আপার সারকুলার রোড, কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে "ভারতী যন্ত্রে"
শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচি-পত্র।

[illegible]।	লেখক লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
অপেক্ষা	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	২৯৮
অশিক্ষিতা	ঐ	৯৯
অশ্ব পৃষ্ঠে	শ্রীমতী সরলা দেবী	১৪
আকবরসাহের হিন্দু-প্রীতি	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৯৬, ৩২১, ৫২১, ৬৫৩,
আবু মানমন্দির	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A.(cantab.)	৪৫৫
আর একবার	শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়	৬৫
আলোচনা	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪১৯
ঈশ্বরী পাটনী	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৬৯৩
উদ্ভিজ্জাণু ব্যাক্‌টিরিয়া	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়	৪২২, ৪৪৪
কবি কৃত্তিবাস	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী	৪০৯, ৭৩৮
কলিকালে কালোরূপ	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৭৩৯
কাজ নেই	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	২৩৯
কার্গো	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A. (cantab.)	৪৩১
কালী-ভক্ত রামপ্রসাদ সেন	শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল	৫৭৩, ৬৬২, ৭২৬
কয়লার গ্যাস	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় B.S.(Lond.)	৭৪৯
কি দোষ তোমার	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১৩৮
কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি হীরক প্রস্তুত করণ	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়	৭৬
কেমনে বুঝিবে		৪৩৪
কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক B. A. (Cantab.) B. S. c. (Lond.)	১৫৬
কোন জাতির আমোদ-প্রমোদ	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	২০১
গল্প ও অঙ্ক	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৮৭
গানের বহি বা মনস্তত্ত্ব	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৫৮০
গোলাপি কাণ্ডারী	শ্রীযুক্ত প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়	[illegible]২৭
ঘুঘু	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৫৫২

বিষয়।	লেখক লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
চক্র	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৯৯,৩৪৫,৩৯২,৪৭২
ঝুমঝুমি	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৫৭২
তারা-বাই	শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায়	২৬৮
তোমাকে	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	[illegible]
দুইটি বোন	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সরকার	৬৫৯
দুটি তারা	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৪৭১
দেওঘর	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	৪৪১
নক্ষত্রদিগের জাতি-বিচার	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A. (cantab.)	৪৬
নিজাম রাজ্য	শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র	৮১
নিবৃত্তি	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৮৭
নূতন যৌবন	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৫৬
নূতন বিজ্ঞান	শ্রীযুক্ত প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়	৫৫৩ ৬১৩ ও ৬৬৮
নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৭০১
পাণ্ডুকেশ্বর	শ্রীযুক্ত জলধর সেন	১৪৬
পার্সি সম্প্রদায়	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়	৪১৩, ৫৮৬
প্রবাসে	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৬৪
প্রলয়	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A.(cantab.)	১৩১
প্রহসন	শ্রীমতী স্বর্ণলতা মল্লিক	৪৮৮, ৫০১
ফুল ও অলি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	২১৭
বউ কথা কও	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	৪৭০
বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	১৬৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৭৫
বজেট ১৮৯৪।৯৫	শ্রী * * * * * *	২৮০
বজেট নামক প্রবন্ধের উপসংহার	শ্রী * * * * * *	৩২০
বদরিকাশ্রমে	শ্রীযুক্ত জলধর সেন	২৮৮
বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন	ঐ	৪৩৪
বদরিনাথ	ঐ	৩৭৩
বন্দী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১
বর্ণচ্ছত্র	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৫৬৭
বসন্ত-সঙ্গীত	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৬১২

বিষয়।	লেখক লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি ...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	৬৭৯
বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণ	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ..	৩৮১
বাবু-ভীতি বা বাবু-ফোবিয়া	...	৪০৬
[illegible]	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	৩৯
বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ...	৫৯২
বিদ্বজ্জন-মিলন	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	১০৭
বিশ্ব	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ..	৪৮৪
বিষম সমস্যা	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	[illegible]
বিষ্ণু-প্রয়াণ	শ্রীযুক্ত জলধর সেন ..	৯১
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	২৭০
বীণাপাণি	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	৫৬৫
বুবোপগ্রহণ	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A. (Cantab.)	৫৩৬
বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৯, ২৫০
বোম্বাই সহরে পার্সি	শ্রীযুক্ত কুমার বসন্তকুমার রায় ...	২৩৩
ব্যাসগুহা	শ্রীযুক্ত জলধর সেন ...	৬৩০
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩২, ৯০১
ব্রীটিশ্-রাজনীতি	শ্রী * * * * * *	৫৪৫, ৬৪৮
ভুল	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	৩৪৪
মনের মানুষ	ঐ ঐ ...	৬৭৮
মরণ-সোহাগ	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ..	৫৬২
মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়	২১৮, ২৫৭, ৩৩৯
মহানদী-বক্ষে	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	৫৩০, ৬৯৪
মালা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৪৩৪
মানী	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	৭৪৮
মুদ্রাবিপ্লব ও ভারত গবর্ণমেণ্টে ...	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ..	৩৬৬
মুদ্রারাক্ষস	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১২০
মুসলমানের অবরোধ	শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র ...	৫১৩
মুসলমানের খো-বলি	ঐ ঐ ...	২৬
যোগী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	১৮০
রবির প্রেম	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৪০
রাজা রসালু	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র M.A.B.L.	৬৩৭

বিষয়।	লেখক লেখিকাগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
রাজা রামমোহন রায়ের ডাকাইতি ...	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৪২
রামমোহন রায়	ঐ ঐ ...	১৮৬
রাম ও রামায়ণ	শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ...	৭১৪
লান্‌কশানের উজীর	শ্রীমতী সরলা দেবী, ৫৬, ১০০, ২৪৫,	৪২০
শকুন্তলা	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	৪৩০
শিখধর্ম্ম-গ্রন্থ ও ধর্ম্মনীতি	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৭০৭
ষ্টীমারে	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে M.A.c.s.	১৩৯
সমুদ্র মন্থন	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৩৬২
সম্পাদকের চিত্র-চয়ন	...	৬২৩
সাধের তরণী আমার	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	২৩০
সৌর প্রতিকরণ	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত B.A. (cantab.)	৩৫৮
স্বর-মিলন	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১৮৯
স্বরলিপি	ঐ ঐ ৪১, ৪৫৩,	৭৩৩
স্বরলিপি	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র ...	৩০৫
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১২৭
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৭৫৩
হত্যা-রহস্য	শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ২০৬,	৩০৬
হরপার্ব্বতীর তপস্যা	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	১৯১
হাসির গান	শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	৭৫৪
হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণ	শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ...	৬২৫
হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ...	৪৫৯
হেন্‌রী মার্গে	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...	৬০৫

ভারতী।

বন্দী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সত্যব্রতকে কেহ নির্ব্বোধ বলিত না। তাঁহাকে সকলে সচ্চরিত্র বলিয়াই জানিত। বিদ্যাভ্যাসেও বেশ মন ছিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কি করিবেন সেই কথা লইয়া গৃহে কিছু আন্দোলন হইতেছিল। পিতা ধনী; পুত্র রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয় এমন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, অথচ নিষ্কর্ম্মা হইয়া গৃহে বসিয়া থাকে এমনও ইচ্ছা ছিল না। সত্যব্রতের নিজের কোন মতামত ছিল না, পিতার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। পিতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দুই চারিজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সত্যব্রতের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় করাই শ্রেয়। সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন।

ব্যবসা কর্ম্ম সত্যব্রতের পিতা ভাল বুঝিতেন। মনে করিলেন পুত্রও সেইরূপ বুঝিবে। একটা ছোট খাট হৌস খুলিয়া পুত্রের হস্তে সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন। সত্যব্রত পিতাকে কহিলেন, "আমি কর্ম্ম কাজ কখন করি নাই, আপনি না দেখিলে কেমন করিয়া আপিস চলিবে?" পুত্রের নামে আপিস হইল কিন্তু পিতাই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সত্যব্রত সমস্ত দিন আপিসে বসিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাকে দিয়া কর্ম্ম বড় এগাইত না। আপিসে যাহার যাহা দুঃখ সত্যব্রতকে নিবেদন করিত, তিনি সকলের উপকার করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। অবকাশ পাইলেই চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ পড়িতেন, ঔষধাদিও বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হয়ত কোন দিন কোন কেরাণী আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আমার বড় কষ্ট, বহু পরিবার, ত্রিশ টাকায় মাস কুলায় না। যদি মাহিয়ানা কিছু বাড়াইয়া দেন।"

সত্যব্রত কহিলেন, "এখানে কতদিন হইতে আছ?"

কেরাণী কহিল, "ছয় মাস হইল।"

সত্যব্রত কহিলেন, "দেখ, সে দিন চন্দ্রনাথও আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিল। আমার ইচ্ছা বেতন বাড়াইয়া দিই, কিন্তু কর্ত্তা মত করিলেন না। বলেন আপিস এই অল্প দিন খোলা হইয়াছে, কেমন চলিবে এখনও বলা যায় না। আর বেতন একজনের বাড়াইতে হইলে সকলেরই বাড়াইতে হয়। তোমার কথা বলিলেও হয়ত সেই কথা বলিবেন। তাই তাঁহাকে সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এখন এই দশটা টাকা লইয়া যাও, কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে, তাহা হইলে কর্ত্তা রাগ করিবেন।"

আপিসের সঙ্গে সত্যব্রতের সম্বন্ধ অনেকটা এইরূপ। স্ত্রী যুবতী, স্বামীকে দেবতার স্থায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু স্বামীর হৃদয় তিনি সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারেন নাই। অন্ততঃ তাঁহার মনে এইরূপ হইত। সত্যব্রত রূঢ় কথা বলিতে জানিতেন না, স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রীতিচক্ষে দেখিতেন, কিন্তু নবীন দম্পতী-প্রণয়ের তন্ময়তা তাঁহাকে কখন ব্যাকুল করে নাই। তিনি গৃহে আসিতেন যাইতেন, স্ত্রীর সহিত স্নেহালাপ করিতেন, কিন্তু যদি কেহ কাহারও বিপদের অথবা অসুখের সংবাদ আনিত তাহা হইলে তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিতেন না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যদি শুনিতেন প্রতিবেশীদিগের গৃহে কেহ পীড়িত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতেন। দীন দুঃখীকে দান করিবার সময় নিজের কাছে কিছু না থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতেন। স্বামী কতকটা স্বার্থপর না হইলে স্ত্রীর সুখ সম্পূর্ণ হয় না। সন্তানাদি কিছু হয় নাই বলিয়া সত্যব্রতের স্ত্রী কিছু দুঃখিত থাকিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যবসা উত্তমরূপ চলিতে লাগিল। সত্যব্রতের পিতার তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট লাভ হইতে আরম্ভ হইল। অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে হুণ্ডীর কারবারও হইত। সত্যব্রত ও তাঁহার পিতাকে বিশ্বাস করিয়া অনেকে অনেক টাকা রাখিত। সকল কর্ম্মেই পূর্ব্বের স্থায় সত্যব্রত নির্লি[illegible] থাকিতেন। তাঁহার নিকট লোকে হয় লাভের না হয় উপকারের আশায় আসিত কর্ম্মের নিমিত্ত হয় তাঁহার পিতার নিকট না হয় আপিসের লোকের নিকট যাইত।

কিছুদিন এইরূপে গেল। কিছুদিন পরে সত্যব্রতের পিতার কাল হইল। তখন বি[illegible] কর্ম্মের সমস্ত ভার সত্যব্রতের উপর পড়িল। লোকের বিশ্বাস পূর্ব্বের মত রহিল, কি[illegible] সত্যব্রত একে কোমলস্বভাব তাহাতে ব্যবসা কর্ম্ম তেমন বুঝিতেন না এজন্য পূর্ব্বের [illegible] আর লাভ হইত না। আপিসে কে কি করিত সত্যব্রত তাহার বড় সন্ধান রাখিতেন না।

হ। (প্রথম পত্র পাঠ)

প্রিয় নরেন্দ্র,

তোমার সহিত আমার যদিও পূর্ব্বে পরিচয় ছিল, কিন্তু বহুদি অদর্শন; ভুলিবারই কথা। নতুবা সহপাঠী বীরেশ্বরকে ভুলিবে কেন? সে যাহা হ শুনিলাম তোমার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। আমার একমাত্র পুত্র শ্রী নবকিশোরের সহিত বিবাহ দিবার মানস করিয়াছি। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব দৃঢ়বদ্ধ হইবে। শীঘ্র উত্তর দিবে কারণ দশদিনের মাত্র ছুটী। বলা বাহুল্য নবকিং এণ্ট্রেন্স পাশ হইয়াছে।

তোমার অভিন্নহৃদয়

বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

ন। ওঃ হোঃ বীরেশ্বর লিখেছে তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহের জন্য। এ চেয়ে আহ্লাদের বিষয় কি হতে পারে? কিন্তু—

হ। এই চিঠিখানার সঙ্গে আর একখানা আছে।

ন। কে লিখেছে দেখ ত।

হ। আপনার আফিসের বুককিপার পূর্ব্ব পত্রের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হ অনুরোধ করেছে।

ন। ভাল। তারপর এগুলো পড়। এখানা আমাদের আফিসের এন্টিক্লার্কের হাতে লেখা দেখছি।

হ। সেও যে প্রভাকে বিয়ে করতে চায়। বেশ ছেলে সচ্চরিত্র সুপুরুষ প্রভার যোগ বর।

ন। আর মাথা মুণ্ড! সবগুলো এখন পড়ে যাও। আমার মাথার ঠিক নেই।

হ। (চতুর্থ পত্র) এখানা আপনার শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে।

ন। সেখানে আবার কি হল।

হ। (পত্রপাঠে সহাস্যে) দাদা আজ দেখছি প্রভার বরের ছড়াছড়ি। এখানা বড় মামা লিখেছেন।

ন। কি লিখেছেন?

হ। ভূপতিচরণ রায় বলে একটি সুপাত্রের সহিত প্রভার সম্বন্ধ করেছেন। বিশে কিছুই দিতে হবে না শুধু মেয়েটি চায়।

ন। এও ত বেশ সম্বন্ধ। আমার অবস্থায় এর চেয়ে আর কি ভাল বন্দোবস্ত হতে পারে।

ঘটকীর প্রবেশ।

(স্বগত) এ আবার কোথা হতে?

ঘ। বাবু আপনি আমাকে যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তাদের খুব মত আছে। বিশেষ আপনার প্রভাকে কোথা থেকে দেখেছে। এখন তারা আজই পাকা পত্র করতে চায়।

হ। কোনটী দাদা ?

ন। আমাদের আফিসের কেসিয়ার দীননাথ গাঙ্গুলি।

হ। (হাসিয়া) এখন ঘটকীকে কি বলবেন বলে দিন।

ন। বাছা, আমার আজ বড় শরীর অসুখ করেছে, কাল সকালে তোমাকে খবর দেব।

ঘ। দেখবেন বাবু যেন হেলায় হারাবেন না। এমন সম্বন্ধ এমন পাত্র আর পাবেন আহা ছেলেত নয় যেন হীরের টুকরো। সোণা একদিকে আর পাত্র একদিকে। বড় শী দিতে হবে না। কুলের ঘর। সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে সব। একি কম সুবিধা। বাহ হলে আপনার মেয়ে যে কি সুখী হবে তার কি বলব। যেমন শ্বশুর শাশুড়ী তেমনি ড়ী ঘর। কলকাতার কাছে। দুঘণ্টার রাস্তা। আপনারা যেমনটী চান তেমনি মিলেছে।

ন। সব বুঝলেম। আজ পাকাপত্র করতে গেলে আমাকে সেখানে ত থাকতে হবে। আমি যে মাথা তুলে বসতে পারচি নে।

ঘ। তবে আমি চল্লেম। খুব সকালে আসব। ঘটকীর প্রস্থান।

ন। সেই ভাল। ভাই হরেন সত্য সত্য মাথা ঘুরচে। কাকে রাখি কাকে তাড়াই স্থির করতে পারচি নে।

হ। আজ গঙ্গাধর চৌধুরীর বাড়ী থেকে লোক আসবার কথা আছে না ?

ন। আমি এখনি বারণ করে পাঠাব। সেও একটা বিষম সমস্যা। বড় বৌ ঠাকরুণ বেঁকে বসেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ঝি মাগী ক্ষেপেছে। দিনরাত্রি বিড় বিড় করছে কাঁদছে বলে বুড়ো বরের সঙ্গে বে দিতে দেব না।

হ। ভাগ্যি সেজবৌদিদিকে সঙ্গে আনি নি তা হলে মহা বিভ্রাট উপস্থিত হত দেখছি।

ন। সে আর বলতে। আমি ক্ষেপে যাব দেখছি তুমি যদি এর একটা উপায় না কর।

হ। (চিন্তাপূর্ব্বক) আমার বুদ্ধিতে একটা যোগাচ্চে। আপনি যদি সম্মত হন। তা হলে সকলদিক বজায় থাকে। অথচ আমাদের প্রতি কারো কোপদৃষ্টি পড়ে না।

ন। আমি কি বুঝছি না। বন্ধুবিচ্ছেদ আত্মীয়বিচ্ছেদ, হয়ত চাকরি নিয়ে টানাটানি, বৌ ঠাকরুণের প্রাণে দারুণ আঘাত দেওয়া, যা এজীবনে কথনো করিনি। এমন কি গ্রামে গাঁয়ে বাস করা ভার হবে। তুমি কি উপায় স্থির করেছ বল। আমি জানি আমার স্থূল বুদ্ধি অপেক্ষা তোমার উদ্ভাবিত বুদ্ধি অনেক কাজ করবে।

হ। এদের একজনের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়া হবে না। আমার বন্ধু বরেন্দ্রই সবার চেয়ে যোগ্য পাত্র। এক কাজ করা যাক। এদের সকলকেই একটা অছিলা করে নিমন্ত্রণ করা যাক। বরেন্দ্রকেও আসতে বলি। আর প্রভাকে বলে দিই বরেন্দ্রের গলাতে যেন মালা দেয়।

ন। স্বয়ম্বর না কি?

হ। হলেই বা, তাতে দোষ কি? আপনি না পারেন তার পর যা করতে হবে আমার ভার।

ন। আমার মনে কিছু ভাল লাগচে না। তোমার উপর ভার দিলেম আমার প্রভা মান তোমাকে দুইই রক্ষা করতে হবে।

হ। এই মতলব ভিন্ন আমি আর কোন উপায় দেখছিনে। কেন না সকলেই ও আপনার আফিসের লোক। সকলের ঝোঁক একদিকে। আমি শুনেছি এবং আ বেশি জানি আপনি যত না জানেন। যাকে অমত করবেন সেই আপনার শত্রু হবে।

ন। তবে তুমি সব উদ্যোগ কর। কাল সন্ধ্যাবেলা হবে। বড় বৌঠাকরুণ বৈ সারা তাঁকে একটু বুঝিয়ে আসি। প্রভার কপালে যা আছে হবে আমি আর ভাবা পারি নে। উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

নরেন্দ্র বাবুর বাটীর সন্নিকটস্থ রাজপথ। বুককিপার ভূপতি রায়ের প্রবেশ।

ভূ। মনের আনন্দেই চলেছি। যথার্থই কি আজ আমার রত্ন লাভ হবে? যখ নরেন্দ্র বাবু নিজে লিখেছেন তখন অবশ্যই। (নবকিশোরের অন্য পথে প্রবেশ।)

ন। এখন আর আমি ঝাড়ুদার নই, চাকর নই, রাজা বল্লেই হয় সম্রাট বল্লেই চলে কারণ যে রাজ্যের অধীশ্বর হতে যাচ্চি তাতে মহারাজ অপেক্ষা আমার সম্পদ অধিক (সম্মুখে দৃষ্টিপাতে) বাড়ীটী দেখছি দিব্য সাজান হয়েছে। তবে কি নরেন্দ্র বাবুর ইচ্ছ আজই বিবাহ হয়। (ঈষৎ হাস্যে) তাতে কি আমার অনিচ্ছা? বাবা কিছু মনক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তিনি আমোদ করতে পেলেন না। কিন্তু বধুর মুখ দেখলে তাঁর সকল দুঃখ দূর হবে। ভিন্ন পথে এপ্টিক্লার্কের প্রবেশ।

ধী। সত্য সত্য কি আজ আমার বিবাহ। নরেন্দ্রবাবুর পত্রের ভাবে সেই রকম বোধ হয়। তবে আমার অদৃষ্ট! এই জন্যই কি আমার এতদিন বিবাহে ইচ্ছা ছিল না নবেলে পড়েছি প্রথম দৃষ্টিতে অনুরাগ; আমাতে কি বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে! আর এক-দিনও বিলম্ব ভাল লাগে না। সকলি অনুকূল কেবল এক ভাবনা আমি বিষয় সম্পত্তিহীন তা হলেমই বা। "স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" অমন রূপগুণবতী ভার্য্যা যার তার আবার বিষয় ভাবনা কেন? প্রাণের অদম্য উৎসাহে উপার্জ্জনে ব্রতী হব। দুই বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্র বাবুর জামাতার ক্ষমতা দেখে লোকে অবাক হবে। (প্রস্থান)

কেসিয়ারের প্রবেশ।

কে। ঘটকীর ৭ টার সময় আসবার কথা ছিল আমি ছটার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। বাড়ীর লোককে বলে এসেছি সে ঠিক এখানে এসে পৌঁছবে। আর না যদি আসে তাতেই বা ক্ষতি কি? নিজেই হাল ধরব। নরেন্দ্রবাবুর পত্রে লেখা ছিল "প্রভা ই পতিবরণ করবে।" এর ভাব কি? স্বয়ম্বরের ন্যায় একটা কিছু নরেন্দ্র বাবুর সাধ হচ্ছে বোধ হয়। সে আরো আনন্দের কথা। বাঙ্গালীর ঘরে বর কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে দেখা শুনা হয় না। সেই জন্য পরে পরস্পর মনোমিলন ঠিক হয় না। কেবল নিরুপায়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু আমার বেলা বিপরীত হবে। প্রাণে আনন্দের ঢেউ খেলছে। আর কিছু নয় আজ একবার ভাল করে কাছে দেখতে পাব। কথা কি কইবে না? কইতেও পারে। শীঘ্র শীঘ্র যাই। আঃ পথগুলা কি আমারি জন্যে এত লম্বা হয়েছে!

প্রস্থান।

নরেন্দ্রবাবুর দ্বারদেশে জমীদারের প্রবেশ।

জ। (স্বগত) আজ নরেন্দ্রবাবু বাড়ীটাকে সাজিয়েছেন বেশ। মনে করেছেন বড়লোক জামাই হবে তাঁর মান্যের জন্য এ সব করতে হয়। কিন্তু তিনি জানেন না গঙ্গাধর রায় এখন আর বড়লোক নয় তাঁর পায়ের ধূলো। অমন রূপবতী সুশীলা কন্যার পিতা অপেক্ষা সম্পত্তিশালী আর কে? নরেন্দ্রবাবু তুমি আমার সমস্ত বিষয় নিয়ে যদি কেবল প্রভাকে দাও তা হলেই এ দাস কৃতকৃতার্থ হবে। আজ চাটুর্য্যেকে সঙ্গে আনা হয়নি। কারণ নরেন্দ্রবাবু "বিশেষ নিমন্ত্রণ" লিখে পাঠিয়েছেন। প্রভাময়ীকে বোধ হয় আমার কাছে আনবে। দুদিন বাদে যে স্বামী হবে তার সঙ্গে কথা কইতেই বা কি দোষ আছে? যদি কাছে আসে গোটাকত সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে দিতে হবে। কেন না এখনকার মেয়েরা মূর্খ বরকে মনে মনে ঘৃণা করতে পারে। দেখি মনে আছে কি না নলদময়ন্তীর সেই শ্লোকটা (মনে মনে চিন্তা)।

হ। আসুন আসুন। হরেন্দ্রবাবুর অগ্রসর হওন।

জ। নরেন্দ্রবাবু কোথা?

হ। তিনি অন্যান্য কার্য্যে বড় ব্যতিব্যস্ত আছেন। চলুন দালানে বসবেন। আপনি এসেছেন তাঁকে খবর দিই গে এখনি আসবেন।

জ। অন্যান্য কাকেও কি নিমন্ত্রণ করা হয়েছে?

হ। আজ্ঞে দাদার আফিসের কয়েকটী বন্ধুকে মাত্র।

জ। চলুন।

দালানের মধ্যে চেয়ারে উপবেশন। নবকিশোরের প্রবেশ।

হ। এই যে একজন এসেছেন। এই চেয়ারে বসুন।

বুকবাইণ্ডার ও এক্টিক্লার্কের প্রবেশ ও উপবেশন।

কয়েক মাস পরে লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে আপিসে পূর্ব্বের মত লাভ হয় লোকসান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুই চারি জন বন্ধু সত্যব্রতকে সতর্ক করিয়া দিলেন, তু তিনি পূর্ব্বের মতই অতর্কিত রহিলেন। অবশেষে একদিন খাজাঞ্চি নিরুদ্দেশ হইল, র কারবার বন্ধ হইল। যাহাদের টাকা পাওনা ছিল তাহারা আসিয়া আপিস ঘিরিল। এক দিনে সত্যব্রত নিঃস্ব হইলেন। নিজের জন্য একবারও চিন্তা করিলেন না, কে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইল মনে করিয়া কাতর হইলেন। যাহাদের টাকা গিয়াছিল হাদের অনেকে নালিশ করিল। তাহারা কহিল সত্যব্রতকে বিশ্বাস করিয়াই তাঁহার ট টাকা জমা রাখিয়াছিল। কিছুদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট খাজাঞ্চি ধরা পড়িল। সে তাপত্র সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল। আদালতে অম্লানবদনে কহিল, "আমি কিছু নিনা। টাকাকড়ি বাবু নিজে রাখিতেন, খাতাপত্রও তাঁহার কাছে থাকিত। আমাকে াইতে বলিয়াছিলেন সেইজন্য পলায়ন করিয়াছিলাম। আমি কিছু জানি না।" তাহার া শুনিয়া সত্যব্রত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন া বলিলেন না।

মকদ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা সকলে বলিল যে সত্যব্রত অতি সাধুচরিত্র, অন্য লোকে হাকে ঠকাইয়া থাকিবে। কিন্তু বিচারক কেমন করিয়া সে কথা শুনিবেন? তিনি সামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট টাকা খিয়াছিল?"

সত্যব্রত কহিলেন, "হাঁ আমাকেই বিশ্বাস করিয়া টাকা রাখিয়াছিল।"

"তুমি সে টাকা সাধ্যমত সাবধানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলে!"

"এখন মনে হইতেছে রাখি নাই।"

"তোমার খাজাঞ্চি যে কথা বলিতেছে তাহা কি সত্য?"

"উহাকেই জিজ্ঞাসা করা হউক। আমি কোন উত্তর দিব না।"

বিচারের পর অপরাধী প্রমাণিত হইয়া সত্যব্রতের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ ইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লেখাপড়া জানিতেন বলিয়া সত্যব্রত কারাগারে আপিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কারাধ্যক্ষ দেখিলেন সত্যব্রত কর্ম্মে পটু, পরিশ্রমে অকাতর, এবং তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত শান্ত। কিছু দিনে সত্যব্রত কারাধ্যক্ষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

বন্দীদিগের সহিত সত্যব্রত এরূপ ব্যবহার করিতেন যে তাহারা তাঁহাকে পরম আত্মী-য়ের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। কোন দুঃখ কষ্ট হইলে তাঁহাকে জানাইত। কোন বন্দী কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাধ্যক্ষের সম্মুখে নীত হইলে সত্যব্রত কারাধ্যক্ষকে বলিতেন, "আপনাকে একটা কথা নিবেদন করিবার আছে।"

কারাধ্যক্ষ স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি কথা?"

"এ ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে। ইহার কি হইবে?"

"অপরাধ করিলে যাহা হইয়া থাকে। দণ্ড হইবে।"

সত্যব্রত কহিলেন, "অপরাধ করিলেই দণ্ড হয় আমরা সকলেই জানি, কেননা আমরা অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতেছি। কিন্তু অপরাধ করিলে মার্জ্জনাও আছে এ কথা এই কারাগারে কেহ জানে না। আপনি কেন একবার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দেখুন না?"

কারাধ্যক্ষ কিছুক্ষণ মৌন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অপরাধীকে কহিলেন, "এবার তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইল। ভবিষ্যতে সাবধান থাকিবে।"

অপরাধী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, সত্যব্রতের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কারাবাসীদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কারাধ্যক্ষ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন—সর্ব্বদাই দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয়, সর্ব্বদাই কলহ, সর্ব্বদাই উৎপাত। ক্রমশঃ সে শঙ্কা নিবারিত হইতে লাগিল। বন্দীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম করে, পরস্পরে কলহ করে না, কর্ম্মচারীদিগের আদেশ সর্ব্বদা পালন করে। সত্যব্রত সর্ব্বদা বন্দীদিগের সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদিগকে কি বলিতেন, কি বুঝাইতেন কেহ জানিতে পাইত না। তাহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত। কারাধ্যক্ষ এক একবার মনে করিতেন যে বন্দীদিগের উপর একজন বন্দীর এতটা আধিপত্য হওয়া ভাল নয়, কিন্তু সত্যব্রতের স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া তাঁহার মনে কোনরূপ শঙ্কা হইত না।

কয়েক মাস পরে একজন বন্দীর অত্যন্ত পীড়া হইল। পীড়া সাংঘাতিক, কিন্তু কারাগারে বন্দী মরিলে কিম্বা বাঁচিলে কে চিন্তিত হয়? সত্যব্রত কারাধ্যক্ষকে মিনতি করিয়া কহিলেন, "আমাকে অনুমতি করুন, আমি রোগীর শুশ্রূষা করিব।"

কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "তুমি রোগের সুশ্রূষার কি জান? বিশেষ, রাত্রে তুমি এমন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পার না।"

সত্যব্রত কহিলেন, "পূর্ব্বে আমি কখন কখন রোগের সুশ্রূষা করিতাম। রাত্রে না হয় দিনে রোগীর নিকট আমায় থাকিতে দিন।"

সত্যব্রতের আগ্রহ দেখিয়া কারাধ্যক্ষ সম্মত হইলেন। সত্যব্রত সমস্ত দিন রোগীকে এরূপ সুশ্রূষা করিলেন যে চিকিৎসক সন্ধ্যার সময় আসিয়া কহিলেন, এমন সুশ্রূষা বন্দীদের মধ্যে কেহ করিতে জানে না। সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ যুক্তকরে চিকিৎসককে কহিলেন, "আমার একটি নিবেদন আছে।"

"কি?"

"আপনি কারাধ্যক্ষকে বলিয়া দিন যেন রাত্রেও আমি রোগীর সুশ্রূষা করিতে পাই।"

"সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে পারিবে?"

"পারিব।"

চিকিৎসক কারাধ্যক্ষকে বলিয়া দিলেন। রাত্রেও সত্যব্রত রোগীর নিকট রহিলেন। চিকিৎসক যে যে ঔষধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সত্যব্রত দিবাকালে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাত্রেও সেইরূপ করিলেন। পরদিবস প্রভাতে চিকিৎসক আসিলে সত্যব্রত অত্যন্ত বিনীত স্বরে কহিলেন, "অন্যান্য ঔষধির সঙ্গে আর একটা সামগ্রী দিলে হয় না," বলিয়া একটা ঔষধির নাম করিলেন।

যে পর্য্যন্ত সত্যব্রত কেবল রোগের সুশ্রূষা করিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত চিকিৎসক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ঔষধের নাম শুনিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তুমি ডাক্তার না কি?"

সত্যব্রত অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা, না। ডাক্তারেরা ঔষধি ব্যবস্থা করিতেন আমি তাই দেখিতাম। আপনার উপর কথা কহিবার আমার সাধ্যও নাই, সে স্পর্দ্ধাও নাই।"

কারাধ্যক্ষ পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। ডাক্তারকে কহিলেন, "ইহাতে বিরক্তির কোন কারণ নাই। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ এই ঔষধে কোন উপকার হইবে কি না।"

ডাক্তার সত্যব্রতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি মনে হয় এই রোগী রক্ষা পাইবে?"

সত্যব্রত কহিলেন, "এ কথার উত্তর কে দিবে? চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সাধ্যমত চেষ্টা এবং রোগীকে রক্ষা করিতে না পারিলে রোগের যন্ত্রণার লাঘব করা।"

চিকিৎসক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সত্যব্রতের কথা মত সেই ঔষধি ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধি পান করিয়া রোগী কিছু স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তাহার মৃত্যু হইল; কিন্তু সকলে বলিতে লাগিল যে সেই ঔষধি সেবনে তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা অধিক হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারাধ্যক্ষ একদিন সত্যব্রতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছ তাহা অত্যন্ত গুরুতর। সত্যই কি তুমি লোকের টাকা লইয়া ফাঁকি দিয়াছিলে?"

সত্যব্রত কহিলেন, "অপরাধ না করিলে দণ্ড হইবে কেন?"

কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "সে কথা বলা যায় না। এমনঅনেক নির্দ্দোষীর দণ্ড হইয়া থাকে।"

সত্যব্রত কহিলেন, "নিজেকে নির্দ্দোষী কেমন করিয়া বলিব? পরের ধন আমি অপহরণ করি নাই, আমার কর্ম্মচারীরা করিয়াছিল। কিন্তু লোকের বিশ্বাস আমার উপরেই ছিল। আমি যখন টাকা সাবধানে রাখিতে পারিতাম না তখন টাকাস্রাখাই আমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল।"

কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "পরের অপরাধে তোমার এই দণ্ড হইয়াছে। তুমি যে কোন গর্হিত কর্ম্ম করিতে পার আমার বিশ্বাস হয় না।"

কিছু দিন পরে কারাধ্যক্ষের একটি পুত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল। কারাধ্যক্ষ সাহেব, ভয়ে পুত্রের নিকট গমন করিতেন না। রুগ্ন বালক একটী স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষিত হইল, সে গৃহে পিতা, মাতা, অথবা ভ্রাতা ভগিনী কেহ যাইত না। সত্যব্রত পীড়ার কথা শুনিয়া সাহেবকে কহিলেন, "আপনার পুত্রের সেবা করিব, আপনি অনুমতি দিন।"

কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "পীড়া বড় কঠিন। যে নিকটে থাকে তাহারও রোগ হইবার আশঙ্কা। পরে সে কথা প্রকাশ হইলে আমার বিপদ।"

সত্যব্রত কহিলেন, "সাহেব, আমা দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইবে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার মনে কোন প্রকার আশঙ্কা জন্মিতেছে না, অতএব আমাকে রোগীর নিকটে থাকিতে দিন।"

এদিকে ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "রোগের লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না। উত্তমরূপে শুশ্রূষা হইলে রক্ষা পাইতে পারে। আর কোন উপায় দেখিতেছি না।"

কারাধ্যক্ষ সাত পাঁচ ভাবিয়া সত্যব্রতের কথায় সম্মত হইলেন।

সত্যব্রত সেই যে রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন আর উঠিতেন না। দিন নাই, রাত্রি নাই, নিদ্রা নাই, ক্লান্তি নাই, সত্যব্রত এক মনে রুগ্ন বালকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস চিকিৎসক আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইতেন, কোন কথা কহিতেন না। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বালককে দেখিয়া কহিলেন, "আর কোন ভয় নাই। এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।"

বাহিরে আসিয়া কারাধ্যক্ষকে কহিলেন, "আপনার পুত্রের জন্য আর ভাবিত হইবেন

আর কোন ভয় নাই। কিন্তু সে যে রক্ষা পাইয়াছে কেবল শুশ্রুষার বলে। যে বন্দী
ার নিকট বসিয়া রহিয়াছে সেই আপনাদের ধন্যবাদের পাত্র। রোগের শুশ্রুষা
াকেও ওরূপ করিতে দেখি নাই।"

পুত্র আরোগ্য হইলে কারাধ্যক্ষ সত্যব্রতকে সঙ্গে করিয়া আপনার স্ত্রীর নিকট লইয়া
েন। কহিলেন, "এই ব্যক্তি আমাদিগের পুত্রের প্রাণদাতা। এ বন্দী, কিন্তু আমরা
কে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি।"

বালকের মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সত্যব্রতকে কহিলেন, "তুমি আমার সন্তানরে
রক্ষা করিয়াছ। আমি কি বলিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব?"

সত্যব্রত কহিলেন, "আপনার সন্তান আরোগ্য লাভ করিয়াছে ইহাতেই আমার
ন্দ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তজ্ঞতা প্রকাশের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া কারাধ্যক্ষ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে লিখিলেন
ত কারাগারে অতি উত্তমরূপে ব্যবহার করিতেছে। তাহার দণ্ডের এক বৎসর রহিত
উচিত। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিবেচনা করিয়া ছয় মাস দণ্ড রহিত করিলেন।

ারাধ্যক্ষ সত্যব্রতকে ডাকাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন
ংবাদ শ্রবণে সত্যব্রত অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। কিন্তু সত্যব্রত বিশেষ আনন্দ
 না করিয়া কহিলেন, "সাহেব, পাঁচ বৎসর আমার দণ্ড, ছয় মাস কম হইল কেন?"

াহেব কহিলেন, "আমি সুপারিষ করিয়াছিলাম।"

ত্যব্রত কহিলেন, "পাঁচ বৎসর ও সাড়ে চার বৎসরে বিশেষ প্রভেদ কি?"

াহেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তুমি বিনা অপরাধে এই দণ্ড ভোগ করিতেছ। মুক্ত
তোমার ইচ্ছা হয় না?"

ত্যব্রত কহিলেন, "প্রথমে মনের ভাব যেরূপ ছিল তাহাতে কষ্ট বোধ হইত। এখন
কষ্টবোধ হয় না।"

ারাধ্যক্ষ কহিলেন, "তোমার গৃহে কেহ নাই? স্ত্রী নাই, সন্তানাদি নাই? তাহাদিগকে
ত ইচ্ছা হয় না?"

ত্যব্রত কহিলেন, "সন্তানাদি নাই। গৃহে স্ত্রী আছেন। তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়
কিন্তু সে ইচ্ছা কেবল আত্মসুখ। পৃথিবীতে সুখ অল্প, দুঃখ পাপ বিস্তর। পরের
চনই যথার্থ সুখ। অন্য সুখ জগতে নাই।"

এই মহতী বাণী সাহেব ভাল বুঝিতে পারিলেন না, কারণ নীতি যাহাই বলুক আত্ম-[illegible] ইংরাজের জীবনের প্রচলিত আদর্শ। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "ধন্য তোমার জীবন, ধন্য তোমার স্বার্থশূন্যতা!"

মুক্তির দিবস উপস্থিত হইল। প্রভাতকালে সত্যব্রত কারামুক্ত হইলেন। কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে বন্দীগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিল। কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, কেহ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল, কেহ নীরবে কেহ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

দ্বারের নিকট কারাধ্যক্ষ দাঁড়াইয়া ছিলেন। সত্যব্রতের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমার মনে এখন যাহা হইতেছে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই যে বন্দীরা তোমার জন্য কাঁদিতেছে ইহাদের অপেক্ষা আমার কষ্ট অধিক হইতেছে। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ ইহজন্মে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

সত্যব্রত গদগদ স্বরে কহিলেন, "সাহেব, ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি এখানে আসি নাই, ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাইতেছি না। আমি এখানে নিশ্চিন্ত ছিলাম, এখান হইতে যাইবার কোন ইচ্ছা ছিল না।"

বাহিরে আসিয়া নগরীর কোলাহল, রাজপথের জনতা, বৃক্ষশাখে পক্ষীর কলরব। ক্ষুদ্র প্রাচীরবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, প্রহরীরক্ষিত কারাগারে এত কাল বাস করিয়া সত্যব্রত নগরে যেন দিক্‌নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অকূল সমুদ্রে যেমন দিকৃভ্রম জন্মিয়া থাকে সত্যব্রত সেইরূপ কিছু নির্ণয় করিতে পারিলেন না। নগরের কোলাহলে তাঁহার শ্রবণ ব্যথিত হইতে লাগিল, লোকের ব্যস্তসমস্তভাব ও ইতস্ততঃ গমনাগমন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

গৃহে আত্মীয়বর্গ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সত্যব্রত মৃদু মৃদু হাসিয়া, অল্প কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "এইবার বন্দী হইলাম।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

উদ্ভিজ্জ বিস্তার।

া কখন কখন দেখিতে পাই, কিছুদিন পূর্ব্বে যে উদ্ভিজ্জ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না,
াল মধ্যে তাহার এত অধিক বিস্তার হইয়া পড়ে, যে প্রদেশস্থ আদিম উদ্ভিজ্জের
ইহা সকল স্থানেই বিনা যত্নে স্বতঃই উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও যথাসময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে
। উদ্ভিজ্জ বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করিলে কখন কখন দেখা যায়, যে উদ্ভিদ
েন আমাদের দেশে বহু বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাহার বীজ কোন এক সময়ে বিদেশ
নীত হইয়াছিল; কিন্তু অনেক উদ্ভিদের ইতিহাসে, এই সামান্য কারণটী পর্য্যন্তও
নুসন্ধানে, বাহির করিতে পারা যায় না। সুতরাং অনুকূল স্রোত্রবাত ও মনুষ্যকর্ত্তৃক
ীত হওয়া, উদ্ভিজ্জ বিস্তারের দুইটী সামান্য কারণ মাত্র; ইহাদের সহিত অন্যান্য কারণ
একযোগে উপস্থিত না থাকিলে বিস্তার অসম্ভব হইয়া পড়িত।

ভিদ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, মনুষ্যের নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগণই
বিস্তারের প্রধান সহায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদ্বারা
ল কার্য্য সম্পন্ন হয় না, পশ্বাদি জন্তুদ্বারা অলক্ষিতভাবে ধীরে ধীরে তাহাই সুসম্পাদিত
ছ।

বাদি পশু উদ্ভিজ্জ বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করে,—কথাটী প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া
য়, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। জামেকাদ্বীপে
নামক একজাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তার, গোজাতি দ্বারা সাধিত হইয়াছে
স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে জামেকাতে উৎকৃষ্ট গরুর অভাব ছিল, এই কারণে দক্ষিণ
রকার ভেনিজুয়েলা প্রদেশ হইতে গবাদি আনীত হইত। জাহাজে অবস্থানকালীন
াদ্যের প্রায়ই অভাব হওয়ায় তৃণাদির সহিত পশুগণ অনেক সময়েই সামান বৃক্ষের
াহার করিত। এই ফলের বীজসকল স্বভাবতঃ অতি কঠিন, সুতরাং পশুর চর্ব্বণে
রর পাকক্রিয়ায় ইহাদের কোন অংশই নষ্ট হইত না। পশুগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত
ইহাদের উদরস্থ বীজ সকল গোময়ের সহিত গোচারণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া এবং ক্রমে
ও বর্দ্ধিত হইয়া, মহাবৃক্ষে পরিণত হইত। মহাসমুদ্রের অন্তরায় উত্তীর্ণ করিয়া
উপায়ে উদ্ভিদের বিস্তারের আরও অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বীজ
াল পশু উদরস্থ থাকায় ইহার সজীবতার কোনও ক্ষতি হয় না, বরং ইহাদ্বারা বীজ
ীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, এবং আরও ভূপতিত হইবামাত্র গোময় আবৃত হওয়ায়, অঙ্কুরো-

[illegible] বীজ সকল প্রতিকূল রৌদ্রবাতের অন্তরালে রক্ষিত হয় এবং অঙ্কুরিত হইলে গোময়যুক্ত সারবান মৃত্তিকাদ্বারা বৃক্ষ শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং পশু সকল কেবলমাত্র বিদেশ হইতে বৃক্ষের বীজ আনিয়া ও বপন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, কি প্রকারে সেই বীজ নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অঙ্কুরিত হইয়া, বৃক্ষে পরিণত হইবে এবং কি প্রকারেই বা ভবিষ্যতে, তাহাদের আতপক্লিষ্ট বংশধরগণ সুশীতল ছায়া ও সুস্বাদু আহার্য্যফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনেও ইহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত দেখিয়া থাকিবেন আমাদের দেশীয় বাবলা (Arcadia Arabica) বৃক্ষের বিস্তারও গবাদি পশু হইতে হইয়া থাকে। বাবলাফল পশুদিগের [illegible]খাদ্য। সুপক্ক ফল উদরস্থ হইলে ইহার বীজের কঠিন আবরণ পাকক্রিয়া দ্বারা কোমল হইয়া যায়; পরে গোময়ের সহিত নির্গত হইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বাবলাবীজ অপর উপায়ে প্রোথিত করিলে প্রায়ই অঙ্কুরিত হয় না, এই কারণে [illegible]কাষ্ঠব্যবসায়ী বাবলাক্ষেত্রে গবাদি পশুর "খোঁয়াড়" স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। "[illegible]" জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার অবিকল বাবলার ন্যায় হইয়া থাকে। সাধারণ উপায়ে [illegible]বীজ বপন ও তাহাতে জলসেচন করিলে ইহা প্রায়ই অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু নরবিষ্ঠাস্থ বীজ বিনায়ত্নে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত সারদ্বারা কখন কখন উদ্ভিজ্জবিস্তার হইতে দেখা গিয়াছে। বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ [illegible] সাহেব, তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, যে [illegible]লোর ভ্রমণকালীন জেমস্ টাউনের নিকটবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রে কোন প্রকার সারই ব্যবহৃত হয় না দেখিয়া, অনুর্ব্বর ভূমির উন্নতি সাধনে কৃষকদিগের ঔদাসীন্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উক্ত স্থানে নরবিষ্ঠাজাত সার ব্যবহার করিলেই ক্ষেত্রে [illegible]জাতীয় সকণ্টক ফলবৃক্ষ জন্মিতে আরম্ভ করে, এবং ইহা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন [illegible] যে তাহার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে, বলা বাহুল্য সেণ্টহেলেনা বাসীগণ উক্ত [illegible] পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং তাহাদের পরিত্যক্ত মলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব বীজ [illegible] পুনঃ জন্মিতে থাকে। গোময় সারদ্বারাও উদ্ভিদ বিস্তারের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। [illegible] তৃণের "মিয়া" গোময়ের সহিত নির্গত হইলেও সজীব থাকে, এবং কর্ষিত ভূমিতে [illegible] হইলে অচিরাৎ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে। [illegible] নামক এক জাতীয় শস্যক্ষেত্র[illegible] তৃণের বিস্তার গোময় সার হইতে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

[illegible] জাতীয় সকণ্টক কর্ণবিশিষ্ট লতার বিস্তার অতি আশ্চর্য্যরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে। [illegible] ফল সকল, ইহাদের আবরণস্থ কোমল কণ্টকদ্বারা পশ্বাদির লোমে বদ্ধ হইয়া, বহু দূরে নীত হয়, এবং কালক্রমে তথায় পতিত হইয়া, সাধারণ উপায়ে অঙ্কুরিত [illegible] বংশ বিস্তার করে। পক্ষীজাতিও উদ্ভিজ্জ বিস্তারের সহায়তা করে। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল প্রায়ই পক্ষী বিষ্ঠাস্থ বীজ হইতে জন্মাইয়া থাকে, ইহাদের [illegible]

জন্ত, অপরিজ্ঞাত বিদেশজ উদ্ভিদ্ অতি শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আয়েকারীপে কমলা লেবুর বিস্তার পক্ষীকর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপরোক্ত কয়েকটী কারণ ব্যতীত বায়ু ও জলপ্রবাহদ্বারা অনেক সময় উদ্ভিজ্জ বিস্তার হইতে দেখা যায়। নবসংগঠিত দ্বীপ সমূহে প্রায়ই শেষোক্ত উপায়ে উদ্ভিজ্জ সংস্থাপন হইয়া থাকে; নিকটবর্ত্তী উপকূল ও দ্বীপস্থ উদ্ভিদের বীজ সকল স্রোতদ্বারা নীত হইয়া দ্বীপ সমূহে সঞ্চিত হয় এবং পরে অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া প্রাণীহীন দ্বীপসকল জীববাসোপযোগী করিয়া তোলে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিজ্জ বিস্তারের আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি প্রত্যক্ষ ও সর্ব্ববাদীসম্মত নয়।

তৈলের একটী নবাবিষ্কৃত শক্তি।

মহা ঝটিকায়, যখন প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে, বহুমূল্য বাণিজ্যপোত সকল সমূহবিপদসঙ্কুল হয়, সেই সময়ে তরঙ্গায়িত জলে কিয়ৎপরিমাণ তৈল নিক্ষেপ করিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা বহুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়া ও সাগরের ভীষণতা নিমিষে প্রশমন করিয়া, আসন্ন বিপদ হইতে ধনজনপূর্ণ পোত সকলকে রক্ষা করে। তৈলের এই তরঙ্গপ্রশমন শক্তি পূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল না, আরিষ্টটল্ ও প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, তাঁহাদের গ্রন্থের অনেক স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আলেরিয়ান ডুবুরিগণ শুক্তি সংগ্রহকালে, তৈলের সাহায্যে সমুদ্রজল শান্ত করিত বলিয়া জানা যায়, এবং উত্তর য়ুরোপের এস্কিমো জাতি তৈলের এই শক্তির ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে অবগত আছে, তাহারা অদ্যাপিও সমুদ্রভ্রমণকালীন তৈলদ্বারা জলপথ সুগম ও নির্ব্বিঘ্ন করিয়া থাকে। প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যদিও এতগুলি প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই মহতী শক্তিটাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই, সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনার ন্যায় বহুকাল হইতে ইহা প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল মাত্র। অল্পদিন হইল বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনপ্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বাধীন গবেষণা দ্বারা তৈলের এই শক্তির নবাবিষ্কার করিয়া ও ইহাদ্বারা তরঙ্গের প্রমত্ততা নিবারণ সম্ভবপর দেখাইয়া একটী অশেষ কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

গত পঞ্চদশবর্ষ মধ্যে, অনেকগুলি জাহাজ, কেবল মাত্র তৈলের সাহায্যে জলনিমজ্জন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই কারণে জাহাজের নিরাপদের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে, তৈলও যে একটী ইহা স্থিরীকৃত হইয়া ব্রিটিশ নাবিকসমিতি কর্তৃক জাহাজে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল রাখা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এবং কি উপায়ে তরঙ্গপ্রশমন শক্তির আরও অধিক সদ্ব্যবহার হয়, তাহার চিন্তায় অনেকে নিযুক্ত আছেন।

বায়ু ও জলরাশির পরস্পর সংঘর্ষণে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বায়ু যত প্রবল হইতে থাকে ততই বেগবান বায়ুরাশি, অল্প বাধা প্রাপ্ত হইয়াও জলরাশি আন্দোলিত করিয়া ভীষণ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। কিন্তু জল তৈলাক্ত হইলে, তৈলের সাধারণ পিচ্ছিলতা গুণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষণ অনেক কমিয়া যায় এবং প্রবাহমান বায়ুরাশি, জল আন্দোলিত না করিয়া অপ্রতিহত গতিতে, জলরাশির উপর দিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়, সুতরাং দেখিতে গেলে তরঙ্গপ্রশমন শক্তি একটী পৃথক গুণ নয়, ইহা তৈলের প্রধান গুণ পিচ্ছিলতার প্রকারান্তর মাত্র।

তৈলের সাহায্যে, য়ুরোপের প্রধান প্রধান বন্দর সকল ভয়াবহ তরঙ্গের প্রকোপ হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য, নানা প্রকার উদ্যোগ চলিতেছে কিন্তু আজও কোন স্থানেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। পিটারহেডের বন্দরে, সমুদ্রতলে নল বসাইয়া পরে আবশ্যক সময়ে, বায়ুচাপদ্বারা পম্পের প্রণালীতে সমুদ্রজলে তৈল প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; অপর আর এক স্থানে তৈল পরিপূর্ণ সছিদ্র গোলক ঝটিকার সময় কামান দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন উপায়ই সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

জাহাজ নিরাপদে রাখিবার জন্য অতি অল্প তৈলের ব্যয় হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, মহাঝটিকাতেও একখানি বৃহদায়তন জাহাজের জন্য ঘণ্টায় অর্দ্ধ গ্যালনের (প্রায় দেড়সেরের) অধিক তৈল আবশ্যক হয়না। তৈল নিক্ষেপ কার্য্যও অতি সহজ উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঝটিকার সময় কতকগুলি তৈল পরিপূর্ণ সছিদ্র থলি, দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া জাহাজের বিভিন্ন অংশ হইতে জলে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে; ভাসমান থলি সকল হইতে স্রোত ও জলের চাপে ধীরে ধীরে তৈল নির্গত হইয়া, সমুদ্রের চঞ্চলতা নিবারণ করে; এই সকল থলিতে অধিক তৈল রাখিবার আবশ্যক হয়, প্রত্যেক-টাতে দুই গ্যালন করিয়া তৈল রাখিলেই চলে।

তৈল প্রক্ষেপের এই সহজ উপায় থাকায় নাবিকগণের বিশেষ উপকার হইয়াছে, এই কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্রাদি প্রস্তুত রাখিবার কোনই আবশ্যকতা হয় না; নদীর নাবিকগণ পর্য্যন্ত এই সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া জলপথে নিরাপদে যদৃচ্ছা যাতায়াত করিয়া থাকে। তৈলের এই নবাবিষ্কৃত শক্তিটীর পূর্ব্বরূপ সদ্ব্যবহার ব্যতীত ইহা আরও অধিক লোকহিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এখন কি উপায়ে সেই সকল কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে তাহার গবেষণায় অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত রহিয়াছেন।

সাকারিণ বা অঙ্গারক শর্করা।

প্রায় দশবৎসর অতীত হইল মার্কীন রাসায়ণিক ফালবার্গ (Fahlberg) সাকারিণ নামক এক অতি মিষ্ট পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। কেবল মাত্র পাথুরিয়া-কয়লা জাত আল্কাতরা হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবিমিশ্র সাকারিন, একটী শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ, ইহার মিষ্টতা অতি উৎকৃষ্ট শর্করার মিষ্টতা অপেক্ষা প্রায় তিনশত গুণ অধিক। সাকারিণের কথা প্রথম সাধারণের প্রচারিত হইলে, এই অদ্ভুত মিষ্ট পদার্থের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন ফালবার্গ সাহেব বহুল পরিমাণ সাকারিণ প্রস্তুত করিয়া সাধারণের পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন সকলেই, এই পদার্থের গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প ব্যয়ে সাকারিণ প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায়, কিছুদিন ইহা সাধারণ শর্করা অপেক্ষা অনেক সুলভমূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল এবং নানা প্রকার মিষ্টান্নে ও মদ্যে চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এই প্রকারে সাকারিণের বহুল ব্যবহারে চিনিব্যবসায়ীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, এবং চিনি বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হওয়ায়, অনেক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বও হ্রাস হইয়াছিল। চিনিব্যবসায়ীগণ একত্রিত হইয়া, কয়েকটী গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে, সাকারিণ প্রচলন রহিত করিয়া, ধ্বংশপ্রায় চিনির ব্যবসায় পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাকারিণ রহিত করিবার জন্য কাহাকেও বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। এই সময়ে কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, ইহাকে অস্বাস্থ্যকর পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং ইহা বিশ্লেষ করিয়া ইহাতে কোনও পুষ্টিকর পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে না পাইয়া, সাকারিণ মনুষ্য খাদ্যরূপে কোনক্রমেই ব্যবহৃত হইতে পারে না বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক ও ভিষক্‌গণের এই কথায়, সাকারিণ ব্যবহার ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই সকলেই ইহা পরিত্যাগ করি শর্করা পুনর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সাকারিণ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায়, য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই, আইন দ্বারা ইহার ব্যবহার রহিত করিবার আদেশ প্রচার হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে কর্তৃপক্ষীয়দের অজ্ঞাতসারে সাকারিণ বা তৎসংযুক্ত কোন পদার্থ প্রস্তুত বা আমদানি করা কঠোর দণ্ডার্হ বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

শর্করা ও সাকারিণের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, শর্করায় যে সকল পদার্থ যে পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, সাকারিণে তাহাদের কিছুরই ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সাকারিণ জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, এমনকি অত্যুষ্ণ জলেও দ্রব হয় না। [illegible] হইলে, পাকক্রিয়া দ্বারা ইহা কিছুতেই জীর্ণ হয় না, মলাদির সহিত অবিকৃত [illegible]

কিছু শক্ত—কিছু, কিঞ্চিৎ। এদিকে পাহাড়ী ঘোড়াতেও হয়ত তাঁকে মানাবে না, সম্ভবতঃ তাঁর সবুট পদদ্বয় জননী ধরণীকে স্পর্শ করে থাকবে। যদি বা বড় ঘোড়া পাওয়া যায় তাহলেও বিপদ, কেননা অশ্বারোহণে তিনি ষোল আনা অনভ্যস্ত এবং বার আনা অসমর্থ। অবশেষে হেঁটে পাড়ি দেওয়াই তাঁর মত হল। তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে এসংকল্প থেকে বিচ্যুত করবার বিশেষ চেষ্টা করলে। শেষকালে এই সাব্যস্ত হল যে তাঁর জন্যেও একটা ঘোড়া অর্ডার দেওয়া যাক, কপাল ঠুকে তিনিও চড়ে বসবেন তারপর যা থাকে বিধাতার মনে। তার পরদিন ঘোড়া এল, আর সবাই চড়লে, তিনি কিছুতেই আমাদের সুমুখে চড়তে রাজী নন। আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা কর্ত্তে লাগলুম, তাঁর ঘোড়ায় চড়ার বিফল চেষ্টা চলতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে খবর পাওয়া গেল তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন, তখন আমরা স্ব স্ব অশ্ব ছুটিয়ে দিলুম।

আমি বোধ হয় সবচেয়ে এগিয়ে ছিলুম, একবার পিছনে চেয়ে দেখি আমাদের দলের আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে। ঠিক পথে যাচ্ছি কি না একটু সন্দেহ হওয়াতে রাশ টেনে নিয়ে অন্যদের প্রতীক্ষা কর্ত্তে লাগলুম। খানিক পরে দেখি অদূরে একজন অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। আমি ঠাওরালুম মৎকনিষ্ঠ; তার পিছনে দ্বিতীয় ঘোড়া না দেখে নিঃসন্দেহে স্থির করলুম, শ্রীসদানন্দ তবে সওয়ার হয়ে আর বেশীদূর অগ্রসর হননি, বাড়ীর উঠোনেই বোধ হয় দুচার কদম চলেই ঘোড়সওয়ারের ল্যাটা মেরে নিয়েছেন, আর বেশীর জন্যে লালায়িত হননি। মনে মনে বিলক্ষণ আমোদ অনুভব করাগেল; এবং বাড়ী গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে আরো আমোদের আশা রাখলুম। দেখতে দেখতে উক্ত অশ্বারোহী আমার নিকটবর্ত্তী হলেন। গুঁতো, কিল, লাথি এবং উৎসাহবর্দ্ধক নানারূপ শব্দ ঘোড়ার উপর অজস্রধারে প্রয়োগ কর্ত্তে কর্ত্তে, আমার প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে তিনি আমায় ছাড়িয়ে চলে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই কিললাথিবর্ষী নির্ভীক অশ্বারোহী পুরুষ আর কেউ নয়— শ্রীযুক্ত সদানন্দ দেবশর্ম্মা! তারপর তাঁকে ধরে ওঠা আমার প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, প্রাণপণ সবেগে, সাবেগে তিনি ঠাণ্ডা পাহাড়ী টাট্টু ছুটিয়ে চলেছেন। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। ঘোড়ায় চড়া এমন সহজ! তিনি রোজ একটা করে ঘোড়া ভাড়া করে সমস্ত দার্জ্জিলিং পর্য্যটন করে বেড়াবেন। কিন্তু তার পরদিন সকালবেলায় গায়ের ব্যথায় যখন বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না, তখন তাঁর উৎসাহ আটার আনা নিবে গেল। আর অনেক কাল ধরে ঘোড়ায় চড়ার নাম করেননি। কিন্তু ক্রমশঃ যখন ক্রমে গায়ের ব্যথা মরে এল, তার স্মৃতিও মরে এল, এবং পুনর্ব্বার অশ্বারোহণের দুঃসাহস মনে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। লাথি গুঁতো ও তালুতে জিহ্বার সংস্পর্শজাত বিবিধ শব্দের জোরে তিনি কেন অশ্বারোহণের ভরসা রেখেছিলেন, কিন্তু তার উপকারিতা পারাটা [illegible] হয়েছিল। পাহাড়ী ঘোড়ায় একবার উঠে পড়ে, জিনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে টাট্টুটির [illegible] বিশ্রাম

[illegible] গেলে আর ভয় নেই, কিন্তু সেই ওঠার, সেই প্রথম আত্মসমর্পণের পর্ব্বটাই গোলযোগে। বুঝি বা এতদিনের বড় যত্নের আশা কুটোমুখে বিসর্জ্জন দিতে হয়, মজিৎ দেখার সাধ নিতান্তই বিলোপ কর্ত্তে হয়। তাঁর পূর্ব্বের নৈরাশ্য, পূর্ব্বের ভয়, পূর্ব্বের দ্বিধা, সব ফিরে এল। এক একবার রেকাবে পা অগ্রসর করেন, আবার নামিয়ে নেন; একবার ঘোড়ার ডাইনে যান, একবার বাঁয়ে আসেন, কোনদিক থেকে কিছু সুবিধা করে উঠ্‌তে পারেন না,—বিভীষিকা দুধারেই সমান ওজনের। প্রায় আধঘণ্টাটাক এই রকমে কেটেগেল, ক্রমে রৌদ্র উঠ্‌বার উপক্রম হল, আমরা অস্থির হয়ে উঠ্‌লুম, অবশেষে অনেক কষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক অনুনয়বিনয়ে, অনেক উত্তেজনাতাড়নায় তিনি বুকে খুব খানিকটা সাহস বেঁধে কস্‌করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বস্‌লেন। ইতিমধ্যে আমাদের দলের সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দর্শকবৃন্দের মুগ্ধদৃষ্টি পশ্চাতে রেখে আমরা তিনটী অশ্বারোহীপ্রবর যাত্রা কর্‌লুম।

তখনও রাস্তায় বেশী লোকের আবির্ভাব হয়নি। কেবল দুটী একটী ইংরেজ আকণ্ঠ বিপুল আলষ্টারবৃত হয়ে উষাভ্রমণে বেরিয়েছে। মল্‌রোড জনশূন্য। সেই প্রশস্ত পার্ব্বত্য-প্রাঙ্গন অশ্বক্ষণের জন্ত ছুটী পেয়েছে, তরঙ্গায়িত অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা সম্মুখে রেখে, ক্ষণকালের জন্যে নিজের নিস্তব্ধ হৃদয়ের গভীরতায় সে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে, স্নিগ্ধশীতল প্রাতঃসমীরণ তাকে সস্নেহে বীজন কর্‌ছে। আমরা ভুটিয়াবস্তির রাস্তা ধরে চলতে লাগ্‌লুম। সেদিন প্রভাতে যাত্রারম্ভে আমাদের মনে কত আনন্দ, শিশুর মত পথে যা দেখ্‌ছি তাই ভাল লাগ্‌ছে। যখন অল্প অল্প অন্ধকারে বড় বড় গাছের তলাদিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, তখন সেই অন্ধকার, সেই [illegible] ছায়াই আনন্দে মায়ায় মনকে সিক্ত কর্‌ছে—যেন এখানেই আমাদের খেলাঘর, যেন সত্যিই আমরা শিশু। যখন অল্পে অল্পে অন্ধকার দূর হয়ে আলোর উন্মেষ হচ্ছে সে আলোও কত বিস্ময় আন্‌ছে, তার মৃদু উত্তাপে শরীরে কেমন স্নিগ্ধতা সঞ্চারণ কর্‌ছে। সেদিন মনে হতে লাগ্‌ল আমরা রোজ কেন ভোরে উঠিনে, ভোরের এত উপভোগ্য সামগ্রী হেলায় হারাই কেন।

খানিকটা পথ অগ্রসর হয়ে একজন ভুটিয়া গোয়ালার সঙ্গে দেখা হল। সে যেন সেই পাহাড়ের প্রত্যুষের একটা অঙ্গ। যেদিন সিঞ্চল গিয়েছিলুম সেদিনও দেখেছিলুম, ভুটিয়া গোয়ালারা সূর্য্যোদয়ের আগেই সর্ব্বোচ্চ শিখরে যেখানে অনেকটা প্রশস্ত সমতল ভূমি আছে সেখানে গরুদের চরাতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের শুভ্রমুখ আর প্রত্যুষের তীক্ষ্ণ শীতনিবারণোপযোগী গায়ের [illegible] যেন তাদের শুভ্র, তীক্ষ্ণশীতল উষারই একটা অংশ বলে বোধ হয়। গোয়ালা তার বাঁশের নল থেকে আমাদের দুধ ঢেলে দিলে, আমরা [illegible] গেলাস [illegible] সেই [illegible] নিয়ে [illegible]। [illegible] হাতে দুধ [illegible]! কেমন [illegible]! [illegible] দিয়ে [illegible] আমাদের [illegible]।

তারপরে আমরা মাইলষ্টোন দেখে দেখে চল্‌তে লাগ্‌লুম। পাহাড়ের গায়ে কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব ফুল দেখ্‌লেই তুলি, কোথাও বা হাত বাড়িয়ে লতা টেনে আনি, কোথাও শৈবাল জড় করি, কোথাও ফার্ণ, কোথাও ষ্ট্রবেরি এই রকম করে করে আমরা অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। একটা খোলা জায়গায় এসে পড়্‌লে সূর্য্যটা যখন হঠাৎ ঠিক কপালের উপর কিরণ বর্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌ল, আর তার তাপটা কিছু বেশী প্রখর বোধ হতে লাগ্‌ল, তখন যেন একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা গেল। কিন্তু সেদিন—কিম্বা একটু সঠিক করে বল্‌তে গেলে, সেবেলা—আমাদের দুনিয়ার কিছুরই উপর অসন্তোষ নেই, তাই সূর্য্যের অত্যাচার বেশ ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করা গেল। ক্রমে বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌ল, ক্ষুধার উদ্রেক হতে লাগ্‌ল, কিন্তু আমরা ঠিক কর্‌লুম রঙ্গিৎ না পৌঁছিয়ে মহাপ্রাণীকে তুষ্ট করা হবে না, পথে খেলে আর্দ্ধেক মজাই মাটী।

দার্জ্জিলিঙ সাত হাজার ফিট উঁচু, আর রঙ্গিৎ মোটে হাজার ফিট—এই ছ হাজার ফিট আমাদের নামতে হবে—আর এই উৎরাইটা ১১ মাইলের পথ। এখানে ঘোড়া ছোটাবারও যো নেই তা হ'লে ঠোকর খেয়ে ঘোড়া ও আরোহী দুজনেই পড়ে যাবে,—তাই আস্তে আস্তে যেতে হ'চ্ছিল। ফেরবার সময় চড়াই হবে তখন ঘোড়া ছুটিয়ে সময় সংক্ষেপ করা যাবে স্থির ছিল। এদিকে রোদ্দুরে এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়ারাও পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে, বিশেষতঃ আমার বয়োজ্যেষ্ঠের অশ্বটী। যদিও তিনি তাঁর ঘোড়াকে বাঁচাবার জন্যে এক ফন্দি বের করেছিলেন। একটা ঘোড়া ক্রমাগত ১১ মাইল ধরে তাঁকে বহন কর্‌লে ফির্‌তি বেলায় নিতান্ত অসমর্থ হয়ে পড়্‌বে বলে তিনি ঠিক করেছিলেন মাঝে মাঝে ভায়ার সঙ্গে ঘোড়া বদ্‌লাবেন। তা হলে দুটোর মধ্যে পরিশ্রম ভাগাভাগি হলে কারোই তেমন বেশী কষ্ট হবে না কিন্তু এতে যে হিতে বিপরীত হবে তা কে জান্‌ত। যা হোক সে কথা পরে বল্‌ব।—তাই রাস্তার মাঝে থেকে থেকে তিনি তাঁর ঘোড়া থেকে অবতীর্ণ হয়ে ভায়ার ঘোড়ায় চড়েন এবং ভায়া তাঁর থির ঘোড়াটির আরোহণ করেন। গরমে ঘোড়াদের পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে, এখন থেকে পথে ঝরণা পেলেই তারা আপনা হতে আরোহীকে সেই দিকে নিয়ে গিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে ঝরণায় মুখ দিয়ে জল খায়।

নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে ক্রমে অনেক চা ক্ষেত দেখা দিলে, বহুসংখ্যক কুলি ক্ষেতে কাজ করছে—অধিকাংশই মেয়ে—আর একটা মস্ত শোলাহ্যাট পরা ঘোড়ায় চড়া সাহেব ছড়ি হাতে তাদের তদারক কর্‌ছে। সাহেবের বাঙ্গলা কাছেই, আমরা তার পা দিয়ে গেলুম। আমরা যত নীচে নাব্‌ছি ততই গরম বাড়্‌ছে, গাছ পালাও ক্রমে বদ্‌লাচ্ছে। দার্জ্জিলিঙের শীতে যে সব ফল ফুল জন্মাতে পারে না, এখানে তার চাষ হয়। এখানেই আমরা প্রথম গাছ লক্ষ্য কর্‌লুম, কেমন স্নিগ্ধ সবুজ রঙ, অনেককালের পর একে দৃষ্টিগোচর করে চোখ জুড়িয়ে যেতে লাগল। আরও নীচের উপত্যকা থেকে অনেকরকম শাকসবজি, ধান চাল প্রভৃতি

দার্জ্জিলিঙের হাটে বিক্রির জন্যে আস্‌ছে। তদুপযোগী ঘোড়ার উপর বস্তা চাপিয়ে বিক্রেতারা ক্রমাগত আনাগোনা করছে। আমরা চলেছি—পথশেষ হবার কোন লক্ষণ নেই, আমাদের যেন সে প্রত্যাশাও নেই। সত্যিই যে একসময় পথ ফুরোবে, আমরা একটা গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছব, পথ চল্‌তে চল্‌তে এটা যেন সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। হঠাৎ এক জায়গায় একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কানে এল—যেন দশ বারটা ট্রেন একত্রে সোঁ সোঁ-করে ছুটেছে। আমরা ভারি বিস্মিত হয়ে গেলুম, এখানে ট্রেন কি করে এল? আমরা কি একেবারে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছি? সইসদের কাছে শুনলুম তা নয়—ও রঙ্গিতের শব্দ। রঙ্গিতের শব্দ! পাহাড়ে নদী যে কেমন তা আগে জানতুম না, তাই নদীর ও রকম গর্জ্জন শুনে ভারি অদ্ভুত ঠেকল। প্রথমটা সইসটার কথায় পুরো বিশ্বাস হল না, কিন্তু যখন একটা গাছের ফাঁকে একবার রঙ্গিতের ক্ষীণ শুভ্ররেখা দেখতে পেলুম, আর শব্দের দিকও সেই দিকেই নির্দ্ধারণ করলুম তখন আর সন্দেহ রইল না। তখন আমাদের ভারি উৎসাহ হল। বাঁকে বাঁকে কখন সেই রেখাটি দেখ্‌তে পাব তার জন্যে ভয়ানক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলুম। ইতিমধ্যে সেই তন্বী রেখাটির কল্লোলধ্বনি, তার গম্ভীর নির্ঘোষ আমাদের মন অধিকার কর্ত্তে লাগ্‌ল। যেমন যুদ্ধঘোটক দূর থেকে রণবৃংহিতি শুনে সেই দিকে কাণ পেতে চঞ্চল হয়ে উঠে, তার সমস্ত স্নায়ু তাকে সেই দিকে প্রধাবনে উন্মুখ করে আমাদেরও মন সেই রকম হতে লাগল। মনে হল যেন রঙ্গিৎ আমাদের ডাক্‌ছে, আমরা তাকে দেখ্‌বার জন্যে যেমন অস্থির হয়েছিলুম, সেও আমাদের পাবার জন্যে তেমনি ব্যগ্র হয়েছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের দেখ্‌তে পেলেই তরঙ্গবাহু তুলে বল্‌ছে "আয়! আয়! আয়! ওরে কাছে আয়, চলে আয়, ছুটে আয়।" আমরা বড় বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার আহ্বান শুন্‌তে লাগ্‌লুম। তার গুরুনাদে প্রাণ আকৃষ্ট হল অথচ একটা অজানিত ভয়ে যেন স্তম্ভিতও হল! কিন্তু সে উন্মাদ আহ্বানের আকর্ষণী শক্তি আর সব রকম ভাবকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল, আমরাও উন্মাদ আগ্রহে, উন্মাদ আনন্দে অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। কতদূর থেকে তার আহ্বান শুনতে পেয়ে ছিলুম, কিন্তু তার কাছে—একেবারে নদী কিনারায় পৌঁছতে কত বিলম্ব হল। সে ক্ষীণ রেখা ক্রমে প্রশস্ত হতে লাগ্‌ল, কিন্তু তখনও যেন মাটির উপর হাত দুই তিন চওড়া খানিকটা পারা ভাস্‌ছে, ক্রমে আরও প্রশস্ত ও স্পষ্টতর হল, ক্রমে খুব ভাল করে দেখা গেল, ক্রমে সবটা দেখা গেল তবু তার ধারে গিয়ে পৌঁছতে পারিনে, পথ যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে।

যাহোক্ সে বস্ত্রের শেষ না থাক্ পথের শেষ ক্রমে দেখা গেল, আমাদের অভিলাষ লাভ হল, রঙ্গিতের তীরে এসে দাঁড়ালুম,—সে যে ছবি চোখের সুমুখে খুলে গেল। কেবল রাশি রাশি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে তরঙ্গিনী ফেনিয়ে ফুঁসিয়ে গর্জ্জিয়ে চলেছে। প্রস্তর রাশি মূক প্রহরীর মত তার পথ রোধ করে রয়েছে। অভিমানিনীর কত আঘাত, কত লাঞ্ছনা, কত তিরস্কার,—সব তারা মাথা পেতে সয়ে যাচ্ছে;

কিন্তু তবু কর্তব্যে অটল,—এতটুকু স্থানভ্রষ্ট হচ্ছে না, তরঙ্গিনী মহা রাগভরে তাদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে ছিটকিয়ে বেরিয়ে পড়ছে।

এও নদী, গঙ্গাও নদী, কিন্তু দুয়ে কত প্রভেদ—গঙ্গা যেন প্রৌঢ়া শান্তি, এ যেন শুধু তরুণ বাঁধ, কেবলি ঝাঁঝ। এই জলপ্রবাহের তীরে দাঁড়িয়ে কে বল্‌তে সাহস করবে, এ শুধু জড় অচেতন পদার্থমাত্র, এর প্রাণ নেই, চেতনা নেই, আত্মা নেই। যে চেতনা যে আবেগ, যে অভিমান এই ছুটোবাষ্প মিশ্রণের প্রতি কণা বিদীর্ণ করে প্রকাশিত হচ্ছে পঞ্চভূতের সমষ্টিতে তার তুলনা কোথায়? এই যে ফেণকুণ্ডলা, ভীষণ নির্ঘোষময়ী কুপিতা সুন্দরী তটিনী এর তুল্য প্রাণময়ী কোন মানবীকে দেখা গেছে? যে মৌন পাষাণখণ্ড তার বিশাল বক্ষের উপর কল্লোলিনীর সমস্ত অত্যাচর অবিকৃত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করছে তার ভিতরেও চৈতন্যের প্রচ্ছন্নসঞ্চার কে না উপলব্ধি করবে? আমরা পুলকিতহৃদয়ে, অনন্যমনে এইদৃশ্য দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

কতকাল থেকে রঙ্গিৎ এমনি ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে—আজ আমরা তাকে দেখ্‌লুম; মনে হল যেন সৃষ্টির আরম্ভ থেকে সে আমাদের প্রতীক্ষা করেছিল, দুপাশের পাষাণ প্রাচীর আর মাঝখানের পাষাণবাহিনী নদী সকল মিলে আজ আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ করে তাদের মাঝে ডেকে নিলে। যদি এই নদীতে আমরা একটীবার শরীর নিমজ্জন কর্ত্তে পার্ত্তুম তা হলে আমাদের সুখ সম্পূর্ণ হত, কিন্তু তখন তার কোন উপায় আছে জান্‌তুম না, পরে যখন সেটা জান্‌তে পারলুম আমাদের আর আপশোষ রাখবার জায়গা রইল না।

ছেলেরা নূতন কিছু জিনিষ পেলে তাকে স্পর্শ করে করে ভাল করে জান্‌তে চায়, কোন জিনিষ ধরা ছোঁয়া না গেলে বড়দেরও মনে অতৃপ্তি থেকে যায়, আমরাও রঙ্গিতের জলের উপর হাত রেখে, তাকে খানিক নাড়াচাড়া করে তার সঙ্গে ভাব কর্ত্তে লাগ্‌লুম। অনেকক্ষণ ধরে এই রকম খেলা করে আমরা নদীর ধারে মস্ত একখানা পাথরের উপর বসে আহারে মন দিলুম—নদীর জল পাথরের তলা ধুয়ে যাচ্ছে। রঙ্গিতের দিকে মুখ করে একখানা পাথরের উপরে বসে আর একখানা পাথরে ঠেসান দিয়ে, কেউ বা একেবারে লম্বা হয়ে এক হাতে মাথার ভর রেখে খেতে লাগলেন। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমরা অনেকক্ষণ স্ব স্ব স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে রইলুম, তারপরে স্থির করা গেল বেতের সাঁকো পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। সদানন্দ প্রভু তাঁর নশ্বর দেহকে সেই নশ্বরতর সাঁকোর হাতে সমর্পণ কর্ত্তে কিছুতেই রাজী হলেন না, তাঁকে কত প্রলোভন দেখান গেল কিছুতেই টল্‌লেন না। আমরা দুজনেই গেলুম।

বাস্তবিকই সে পুলের উপর দিয়ে যেতে প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। শুনলুম আমরা [illegible] পর দিন থেকে তার উপর দিয়ে লোক যাতায়াত নিষেধ হয়ে গেছে। [illegible] পুলের [illegible] ভাঙ্গা;—খুব ভাল অবস্থাতেও সে পুল গুটিকতক কঞ্চির সমষ্টি বৈ আর কিছু নয়। এখন আবার যেখানে যেখানে কঞ্চি ভেঙ্গে গেছে সেখানে আস্ত [illegible]

বাঁশ ফেলে রেখেছে ; সেই বাঁশের উপর সাবধানে সাবধানে পা ফেলে যেতে হবে,—হাতে ভর রাখবার আশ্রয়ও প্রায় কিছুই নেই—যদি একবার পা ফস্কে যায় তাহলে নদীতের পাষাণ শয্যার উপর দেহলতা লুণ্ঠিত হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন একবার যেতে অগ্রসর হয়েছি তখন আর বিপদ দেখে ফেরা যায় না। আমরা ভয়ে ভয়ে সাবধানে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চল্‌তে লাগ্‌লুম, আমাদের প্রতি পদক্ষেপে পুলটা দোলনার মত দুল্‌ছে, আমাদের বুকের মধ্যেও একটা দোলনি রয়ে যাচ্ছে। বেশী বড় পুল নয় তাই শীঘ্রই ওপারে পৌঁছলুম, শক্ত মাটিতে পা দিয়ে যেন ধাত ফিরে পেলুম। এখন যে পারে এসেছি এপার সিকিম, ওপার ছিল ভুটান। সিকিমের ডাঙ্গা মাড়িয়ে, "সিকিমে এসেছি" এই আমাদের আনন্দ! খানিকটা এদিক ওদিক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটা দোকানের কাছে একজন পুলিসের সাক্ষাৎ লাভ হল। সে আমাদের অনেক অনুনয় করে বল্লে নদীতে একখানা নৌক আছে, আমরা নৌক করে ওপারে ফিরব কি? আমরা তৎক্ষণাৎ রাজী হলুম,—বেশত আর একটু নতুনত্ব হবে, তা ছাড়া সে বেতের সাঁকোটি দেখতে বেশ ছবির মত বটে, কিন্তু তার দোলানি তখনও আমাদের অন্তরে জেগে ছিল, তাই অন্য কোন উপায়ে ওপারে ফির্‌তে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। নৌক করে ফিরে এলুম, একরত্তি নদীটি, পার হতে কিছুই সময়ক্ষেপ হয় না, তবে তার পাথর বাঁচিয়ে নৌক চালানতেই যা সময় গেল। আমরা আমাদের অগ্রজকে যেখানে রেখে গিয়েছিলুম দেখ্‌লুম ঠিক সেই খানে সেই রকম ভাবেই তিনি বসে রয়েছেন, এদিকে তিনি আশা করছিলেন আমরা পুল দিয়ে ফিরে আস্‌ব, সেই দিকেই চেয়ে ছিলেন—নৌকর অস্তিত্বের কথা জানতেনও না। হঠাৎ আমাদের দুটীকে তাঁর অনতিদূরে টপ করে নৌক থেকে লাফিয়ে পড়্‌তে দেখে ভারি বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারপরে আমাদের দার্জ্জিলিঙ ফেরবার সময় হয়ে এল।

এখুনি যেতে হবে! এই রঙ্গিৎ, এই শ্যামল তীর, এই স্রোত, এ সঙ্গীত—সবই এখুনি ছেড়ে যেতে হবে। আর কখন বোধ হয় দেখা হবে না। শুধু একটী দিনের একটু খানির মিলনের জন্যে কি শত শত বৎসরের এই আয়োজন? তবু যেতে হবে! আমরা চলে গেলেও রঙ্গিৎ প্রবাহিত হবে, এ সবই তেমনি থাক্‌বে—শুধু রঙ্গিতের সেই কটী বিদেশী মুগ্ধ অতিথি আর থাক্‌বে না।

সইসরা ঘোড়ার পিঠে ফের সাজ চাপালে, মোটমাট সব কাঁধে বেঁধে নিলে, আমরা দার্জ্জিলিঙের জন্যে রওনা হলুম। পথের ছুটো একটা বাঁকের পরই রঙ্গিৎ বিজনবর্ত্তিনী হল, সেই আরম্ভের মত শুধু মাঝে মাঝে জায়গায় জায়গায় তার ক্ষীণ রেখা দেখা যেতে লাগল—তাতে আরও, বন খারাপ হতে লাগল, আর তার কল্লোল যেন আমাদের ডাকছে না, শুধু তার নিজের প্রাণের সঙ্গীত, নিজের ভাবে ভোর হয়ে সে বয়ে চলে যাচ্ছে, আর কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই।

আমরা প্রথমটা মন্দ গতিতে পরে ক্রমশঃ গতি বাড়িয়ে আলো ও ছায়ার ভিতর দিয়ে চলতে লাগ্লুম। তখনও রোদ পড়েনি, কিন্তু রোদের প্রখরতাও তেমন নেই। ঘোড়া ছোটাতে সঙ্গীরা পিছনে পড়ে গেল, আমরা তাদের জন্তে অপেক্ষা না করে মাইল ষ্টোন অনুসরণ করে চলতে লাগলুম। কিন্তু এ বেলা যেন এক একটা মাইলকে ওবেলার চেয়ে ঢের বেশী লম্বা মনে হতে লাগ্‌ল—প্রায় আধঘণ্টায় একটি করে মাইল অতিক্রম কর্ত্তে লাগলুম—তাহলে এগার মাইল কতক্ষণে পৌঁছব, তাছাড়া মল্‌রোড থেকে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্তও প্রায় আর দেড় মাইল হবে! সূর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে অস্তে গেল, চা-ক্ষেতের প্লান্টের কুলিদের ছুটি দিয়ে বাড়ীমুখো ফির্‌লে, পাল পাল বস্তার ঘোড়া আমাদের পথ রোধ কর্ত্তে লাগ্‌ল,—তাদের মালিকরা সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এক জায়গায় একজন যুবক টী প্ল্যাণ্টার আমাদের পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, তার দুটী ছোট ছোট কুকুর তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে। একটা বাঁক ফিরতে কুকুরদুটী অনেকগুল বস্তার ঘোড়ার মাঝে পড়ে গেল, যে দিকে যাবে সেই দিকেই ঘোড়ার পায়ে মাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা, প্ল্যাণ্টার তার নিজের ঘোড়া থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা কুকুরকে কোলে তুলে নিলে, অন্যটাকে তুলতে পার্‌লেনা। ঘোড়ার হিন্দুস্থানী মালিককে হিন্দিতে নরম কথায় কুকুরটাকে তার কোলের উপর উঠিয়ে দিতে বল্লে। মেড়ুয়াবাদীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। আমার এমন রাগ ধর্‌ল, ছোট কুকুরটী অতগুল ঘোড়ার পায়ের মধ্যে পড়ে ভয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে; কোনদিকে নড়্‌বে কি কর্‌বে ভেবে পাচ্ছেনা, তার বিপদও সমূহ, আর কাটখোট্টা মানুষটা নিশ্চিন্তভাবে তাই দেখ্‌ছে, একটু হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে প্ল্যাণ্টারের কোলে তুলে দেবে তা না। আমি তার ব্যবহার দেখে কিছু রূঢ়ভাষায় তাকে সাহেবের কুকুর বাঁচাতে বল্লুম, তখন সে শুনলে। প্ল্যাণ্টার ত আমার প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ, আমি ঘোড়াওয়ালাকে আমার বক্তব্য বলে এবং সেটা পালন হচ্ছে দেখেই ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজের ঘোড়া বের করে নিয়ে, খোলা জায়গায় খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। খানিক পরে দেখি প্ল্যাণ্টার তার ঘোড়া ছুটিয়ে আমাকে ধর্‌বার চেষ্টা করছে, আমার কাছে এসে নিতান্ত মিষ্ট ভাষায় তার কৃতজ্ঞতা জানালে—আমিই তার কুকুরকে বাঁচিয়েছি—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এত সামান্য কাজের জন্তে এত ধন্যবাদ পেয়ে আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে তার নগণ্যতার সাপক্ষে দু এক কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লুম। তার পরে তার সঙ্গে "Good bye" করে আমি অগ্রবর্ত্তী হলুম, সে তার বাঙ্গলাভিমুখে ঘোড়া ফেরালে।

এদিকে যে একটা বিষম গোলযোগ বেধেছে সে কথা এতক্ষণ বল্‌তে অবসর পাইনি। শ্রীযুক্ত সদানন্দের ঘোড়া আর চল্‌তে পারে না, প্রথমে তার পেটী ছিঁড়ে গেল, সেই হ্যাঙ্গামের মাঝখানে তিনি সেটা কতকটা দোরস্ত করে নিলেন, কিন্তু তার দেহভার বহন কর্‌তে সে এখন আর নিতান্তই অক্ষম। তিনি আবার ভায়ার ঘোড়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে বদলাবদলের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সে এবারে কিছুতেই রাজী হয় না—সে বলে

"আস্‌বার সময় মাঝে মাঝে তোমাকে বওয়াতেই আমার ঘোড়া হয়রাণ হয়ে গেছে, এখন আবার তা কর্‌লে এও আর এক পা নড়্‌তে পার্‌বে না।" কাজে কাজেই তাঁকে নিজের ঘোড়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর কর্ত্তে হল। প্রথম মাইল দুই তিন আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলুম, কিন্তু আর ছোটাতে পার্‌ছিনে, বেচারারা বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমি সব চেয়ে লঘুভার, তাই আমার ঘোড়ার অবস্থা তবু ভাল, কিন্তু তাহলেও রাস্তাটা আগাগোড়া চড়াই, তাই সে বেচারিও দু চার পা করে উঠেই ধুঁকে পড়্‌ছে, আমি তখন তাকে খানিকক্ষণ দাঁড় করিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, তার প্রতি অনুকম্পাসূচক দুটো মিষ্টি কথা বলে ফের অগ্রসর হচ্ছি। দু একবার এই রকম কর্‌বার পর আমার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল, আমার এই নিরীহ আচরণে প্রভু সদানন্দের ক্রোধবহ্নি হঠাৎ ভয়ানক প্রজ্জলিত হয়ে উঠ্‌ল। তাঁর ঘোড়ার অবস্থা নিতান্ত করুণরসাত্মক, তারই উপর আবার তার প্রভুর কিলটা চাপড়টা ও চল্‌ছে, কিন্তু তাতেও কিছু ফলোদয় হচ্ছে না— সদানন্দের মনের তখন নিতান্ত ঝালাপালা অবস্থা, সেই সময় ঘোড়ার সঙ্গে আমার মিষ্টালাপটা তাঁর কি রকম অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। কল্পনা কর একটা মুক্ত পার্ব্বত্য প্রান্তর, তার থাকে থাকে রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে, তারই একটার উপর তিনটী বিদেশী বিপন্ন অশ্বারোহী যুবক, একজন মহাক্রুদ্ধ, একজন মহাহাস্যপরায়ণ আর একজন নির্ব্বিবাদী, নিশ্চেষ্ট। প্রভু যত আমার উপর রাগ করেন আমার হাসির লহরী তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আমি তাঁকে তত বোঝাতে চেষ্টা পাই আমি কি অপরাধটা কর্‌লুম? আমার ঘোড়াকে কেন আমি মায়া কর্‌ছি, তাকে কেন জিরোতে দিচ্ছি—সেইটেই আমার অপরাধ। কিন্তু আমার ঘোড়ার প্রতি অনুকম্পার সঙ্গে তাঁর ঘোড়ার চলৎশক্তিরহিতের যে কোথায় যোগ আমি সেটা কিছুতেই ধর্ত্তে পার্‌লুম না। আমি দ্বিতীয় নম্বর অপরাধ এই করেছিলুম যে একটা খোট্টা ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে পথে আলাপ পরিচয় কর্‌ছিলুম; সে কোথা থেকে আস্‌ছে, কদ্দূর যাবে, পাহাড়ে কবছর আছে, কিসের চাষ করে, কেমন পায়, এবম্বিধ অনেক প্রশ্ন কর্‌ছিলুম, এবং অবিশ্যি আমাদের সম্বন্ধে তারও কতক কতক কৌতূহল নিবৃত্ত কর্ত্তে হয়েছিল। সদগ্রজের বিশ্বাস সে লোকটা ঘোর মাতাল, আমরা কিন্তু তাতে মাতালের কোন লক্ষণ দেখ্‌তে পাইনি। আবার এক সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল আমরা পথ হারিয়েছি, আস্‌বার সময় যে পথ দিয়ে এসেছিলুম এ সে পথ নয়। এ যে সেই পথই সে বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে রাস্তায় একজন ভুটিয়াকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে পথ জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। সে জায়গাটাতে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে, ভুটিয়া আমাদের দার্জ্জিলিংয়ের আসল রাস্তাটা দেখিয়ে দিলে। আমিও জানতুম যে সেই আসল রাস্তা,—আমার পথের দৃশ্য বেশ মনে ছিল—কিন্তু সদানন্দ ঠাকুরের কিছুতেই ভুটিয়ার কথায় বিশ্বাস হয় না, তিনি আমাকে বল্‌তে লাগলেন "তোমার কেমন বুদ্ধি, ওদের রাস্তা জিজ্ঞেস কর্ত্তে গেছ, ওরা সব চোর, ও নিশ্চয় একটা ভুল রাস্তা বলে দিয়েছে, ওদের আড্ডায় নিয়ে গিয়ে, আমাদের মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা।" তিনি কিছুতেই সে রাস্তায়

জানেন না। অথচ আমাদের দুজনের স্থির বিশ্বাস ঐটেই ঠিক রাস্তা, বরঞ্চ অন্য রাস্তায় গেলেই পথ হারাব, তাই ভুটিয়ানির্দ্দিষ্ট পথে যাওয়াই আমাদের দৃঢ়সংকল্প। শেষকালে তিনি কি করেন, আমাদের জেদ দেখে অগত্যা তাঁকে আমাদের সঙ্গ নিতে হল, কিন্তু বরাবর বলতে বলতে চল্লেন "কক্ষণো এ রাস্তা দিয়ে আমরা সকালে আসিনি, ও নিশ্চয় চোর, আমাদের ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে।"

ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে, অত্যন্ত পরিষ্কার জ্যোৎস্না, কিন্তু কখন যে দিনের আলো চলে গেল, চাঁদের আলো তার স্থান নিলে আমরা কিছু জান্‌তে পারিনি, আমাদের বাইরের প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তা অনুভব করিনি। জ্যোৎস্নার সেই পার্ব্বত্য প্রকৃতির যে কেমন শোভা হয়েছিল তা দেখ্‌বার আমাদের তিলমাত্র অবকাশ ছিল না, সদানন্দের মেজাজ বিগ্‌ড়ে যাওয়াতে আমরা এমনি বিব্রত হয়ে ছিলুম। যাহোক্ মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে আমরা ক্রমে ভুটীয়াবস্তির কাছাকাছি অগ্রসর হলুম। সেই সময়টা ভুটিয়াদের ঘরে ঘরে দশহারা উৎসব, তারা তখন ভয়ানক মাতাল হয়ে থাকে শোনা ছিল, তাই ভুটিয়া বস্তির নিকবর্ত্তী হবার সময় সদানন্দের সশঙ্কিতাবস্থার কথা আর কহতব্য নয়। প্রত্যেক ভুটীয়টা অতিক্রম করছেন আর মনে করছেন একটা ফাঁড়া কাট্‌ল। হঠাৎ একটা বাড়ী থেকে একটা লম্বা, ঝোলা, কাল কাপড়পরা ভুটিয়া বেরিয়ে এল, মাটিতে তার ছায়া ভয়ানক দীর্ঘ দেখাতে লাগ্‌ল, সদানন্দ প্রতি মুহূর্ত্তে মনে কর্ত্তে লাগ্‌লেন বুঝি আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করার জন্যে সে আমাদের গলায় কুক্‌রি বসিয়ে দেয়। তাঁর ভয় আমাদের মনেও কিছু সংক্রামক হল। কিন্তু সে ভুটিয়া নিঃশব্দে আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমরাও নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিতান্ত স্বচ্ছন্দতার ভান করে ঘোড়া চালাতে লাগ্‌লুম। এবার দার্জ্জিলিঙের আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু দার্জ্জিলিঙ এখনও দূরে। এদিকে মাইল কতক আগে থেকে সদানন্দের ঘোড়ার পেটি ফের ছিঁড়ে গেছে, তার পিঠে সাজ আর শক্ত করে বসান যায় না। ঘোড়া তাঁকে বহন না করে তাঁকে ঘোড়াকে বহন করে আন্‌তে হচ্ছে। হরি হরি, যে প্রভাতে রঙ্গিৎ যাত্রা করেছিলুম সে কি আজকেকারই প্রভাত! সে যেন কত দিনকার স্বপ্ন-কথার মত মনে হচ্ছে,—সে আনন্দ, আমাদের তিনটী সহযাত্রীর সে সদ্ভাব এখন কতদূরে। তাঁর ঘোড়া নিয়ে যত বেগ পেতে হচ্ছে, সদানন্দ আমাদের উপর ততই চট্‌ছেন, যেন আমাদের দোষেই তাঁকে এই বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে। তাঁর স্থায়ী অপ্রসন্নতায় শেষাশেষি আমারও হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হল, বাড়ী পৌঁছিয়ে এই অপ্রসন্ন খিট্‌খিটে সঙ্গীটির সঙ্গ ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যে মন উচাটন হল। কার্টরোড পাওয়া গেল, হাঁফছেড়ে বাঁচ্‌লুম! তারপরে বাড়ী পৌঁছন আর বেশী ক্ষণের কথা নয়। আমরা ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়েছিলুম, রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে ফিরে এলুম। ছটি শ্রান্ত পথক্লিষ্ট প্রাণী,—তিনটী মানুষ ও তিনটী অশ্ব, বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালুম। আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা আমাদের ফির্‌তে এত বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমাদের প্রতীক্ষা

করে সকলেই দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রে সব ভাবনা দূর হল। আমরাও ঘোড়ার থেকে নেমে বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোতেই যেন আমাদের সব পথশ্রম কেটে গেল, আর আমাদের পরস্পরের প্রতি মনের গ্লানিও এক নিঃশ্বাসে ছুটে গেল। তখন গল্প করার মহাধূম!

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি আমাদের দুটী সঙ্গী নিরুদ্দেশ—এঁরাই আমাদের রঙ্গিৎ যাওয়ার বিষয়ে বিশেষ নিরুৎসাহ করেছিলেন। সন্ধান নিয়ে জানলুম আমরা সকালে যাত্রা করা অবধি এঁদেরও যাবার ইচ্ছা এমন বলবতী হয়ে উঠেছিল যে সেই দিনের মধ্যেই বাহনের বন্দোবস্ত ঠিক করে, তারপর দিন ভোরে চুপি চুপি যাত্রা করেছেন। আমাদের লুকিয়ে যাবার অর্থ আমাদের চমৎকৃত করা। এঁরা বাস্তবিক আমাদের হারিয়েছিলেন— রঙ্গিতে স্নান করেছিলেন। তাঁরা যখন ফিরে এসে সে গল্প করলেন তখন তাঁদের জানতে দিলুম না যে আমরা সেটাকে বিশেষ একটা কিছু কীর্ত্তি মনে করছি, কিন্তু মনে মনে দুঃখ অনুতাপে মরে রইলুম। কিন্তু সে শুধু আমরা দুটী—আমি ও কনিষ্ঠ। শ্রীশ্রীসদানন্দ মহাপ্রভুর তখন এ সব সেণ্টিমেণ্টের অবসর ছিল না, তাঁকে তখন আর এক খবরে বিশেষ কাবু করেছে,—তাঁর অশ্বরাজ কিছু দানা উদরস্থ করছে না, তার আশু পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াওয়ালা চার টাকার বদলে নাকি শখানেক টাকা দাবী করবে! প্রভুর চক্ষুস্থির! আমরা পরম আমোদিত!!

মুসলমানের গো-বলি।

আজ কাল গোহত্যা লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতেছে। সে দিন বম্বেতে গোহত্যা লইয়া কি ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গেল। গোহত্যার বিষয়ে অনেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের পুস্তকাদি হইতে কেহই নিজ মত সমর্থন করিয়া বিশেষ কিছু লেখেন নাই। ডাক্তার লাইটনার "এসিয়াটিক কোয়ারটর্লি রিভিউ" নামক বিলাতি পত্রিকায় মুসলমানের গো-বলি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশাচারের (custom) কথাই অধিক ছিল। ইসলাম ধর্ম্মের আর্ব্বী গ্রন্থাদি হইতে অতি অল্প সাহায্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে মুসলমানের গো-বলি সম্বন্ধে ইসলাম ধর্ম্মের পুস্তকাদি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে মুসলমানের কুরবানিতে (বলিদান) গো-হত্যা করিবার কোনও আবশ্যক নাই, সুতরাং গো-হত্যা না করিলে ইসলাম ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপমান করা হয়.না।

ধর্ম্মপুস্তকাদি হইতে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে কোন্ কোন্ পুস্তক মুসলমানেরা পবিত্র জ্ঞান করেন এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ গুলি সর্ব্ব প্রধান।

সকলেই জানেন যে মুসলমানের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে—শিয়া ও সুন্নি। বম্বে এবং আজমগড়ে গো-হত্যা লইয়া হিন্দুদের সহিত সুন্নিদের বিবাদ হয়, শিয়া সম্প্রদায় মারামারিতে ছিল না। সেইজন্য আমরা এস্থলে কেবল সুন্নিদিগের ধর্ম্মপুস্তক হইতে দেখাইব যে গো-হত্যা তাঁহাদের পূজার একটা অঙ্গ নহে।

কোরানকে সকল মুসলমানই অকাট্য ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মানেন; এবং দেশাচারের কোরান খণ্ডন করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

কোরানের পর "হদিস্" অর্থাৎ মহম্মদের আজ্ঞা, অথবা মহম্মদ যাহা স্বয়ং করিয়াছেন, কিম্বা যাহা তিনি বারণ করেন নাই, ইত্যাদি।

হদিসের মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে:—

১ সহি বুখারি,

২ সহি মুসলিম,

৩ সুনান্—ই—আবু দাউদ,

৪ সুনান্—ই—নসাই,

৫ ইব্‌নি মাজেহ,

৬ তিরমিজি,

৭ মিশ্‌কাত্‌,

৮ অমিউল্‌ জওয়ামেহ্‌।

হদিসের পরে মুসলমানেরা কোরানের টীকাগুলিকে মানেন। এই টীকার নাম "তফাসির্"। নিম্ন লিখিত তিন খানি তফাসির সর্ব্বপ্রধান :—

১. বৈজাবি।

২ মদারিক।

৩ মালিমুত্ তন্‌জিল্‌।

উপরোল্লিখিত পুস্তকগুলিকে সকল সুন্নি মৌলবিরা মান্য করেন।

যদি ধর্ম্মপুস্তকের কোন বিশেষ শব্দের অর্থ লইয়া গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ অভিধানগুলির মতেই তাহার অর্থ স্থির করা হয় :—

১ কামুস্‌।

২ সুরাহ্‌।

৩ মুণ্ড খবুল্‌ লুষাৎ।

৪ মজ্‌মউ বিহারিল্‌ অন্‌ওয়ার্‌।

এইত গেল কোরান, তাহার টীকা এবং অভিধানের নাম। (বলা বাহুল্য যে আর্ব্বী শব্দ বাঙ্গলাতে ভাল করিয়া লেখা যায় না, আর্ব্বী শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিবার কোন Huntarian System নাই।)

প্রথমে দেখা যাক কোরাণে গো-বলি সম্বন্ধে কি আছে।

সর্ব্বপ্রথমে কোরাণখানি কি তাহা জানা আবশ্যক। কোরাণখানি এক সময়ে এক ব্যক্তি লেখেন নাই। মুসলমানেরা বলেন যে মহম্মদ ধ্যানে বসিলে ঈশ্বরের আদেশ, স্বর্গীয় দূত জিব্‌রইল্‌ (Gabriel) তাঁহার কর্ণে আসিয়া বলিয়া যাইতেন, এবং মহম্মদ তাহাই তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। এই প্রকারে মক্কা ও মেদিনাতে ক্রমাগত তেইশ বৎসর ধরিয়া, ঈশ্বরের আদেশ, স্বর্গীয় দূত জিব্‌রইল্‌ মহম্মদকে আনিয়া দেন; এবং এই আদেশগুলি পুস্তকাকারে লিখিত হইলে উহার নাম হইল কোরান অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। মুসলমানেরা কোরাণের অনেক গুণ বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে একটি এই যে অমন সুন্দর ভাষা স্বয়ং ঈশ্বরের ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না।

কোরাণখানি ১১৪ সর্গে বিভক্ত এবং উহার মধ্যে একটি সর্গ আছে যাহার নাম "সুরাতুল্‌ বকর" অর্থাৎ গো-সর্গ। গো-হত্যার কথা ইসলাম ধর্ম্মে নাই বলিয়া অনেকে মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলেন যে তবে কোরাণের মধ্যে "গো-সর্গ" কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। যিনি কোরাণের কিছুমাত্র পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে [illegible]

...সহিত ভিতরকার বিষয়ের বিশেষ কোন সম্পর্কই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জিবরইল্ স্বর্গ হইতে অল্প অল্প কোরাণের অংশ আনিয়া মহম্মদকে দিতেন। প্রথমে যে কথাগুলি মহম্মদের নিকট আসিত, সেই মতেই কোরাণের সর্গের নামকরণ হইত। ইহুদিদিগের ধর্মপুস্তক সিডারিমেরও নাম রাখা এই প্রকারে হইয়াছে, বোধ হয় ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

"এই "সুরাতুল বকর (গো-সর্গ) কোরাণের সকল সর্গাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাতে ২৮৬টি শ্লোক (আয়াত্) আছে, কিন্তু গো-হত্যার কথা কেবলমাত্র একবার আছে। দেখা যাক" গো-হত্যার বিষয় কি আছে।

সুরাতুল বকরের অষ্টম (রুকু) প্যারাগ্রাফ :—

ওয়া ইজ্ কালামুসা........................য়ুরিকুম আয়াতিহি। (বাঙ্গালা অক্ষরে আর্ব্বী ভাষা লেখা দুরূহ বলিয়া সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল না,) অর্থাৎ মুসা ইহুদিদিগকে বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ, তোমরা একটা গরু কাট" ইত্যাদি।

এখানে একটি গল্পের উল্লেখ আছে। দুই সহোদরে মিলিয়া তাহাদের খুড়তুত ভাইকে মারিয়া ফেলিয়া মুসাকে বলে যে হত্যাকারী কে তাহা জানি না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। মুসা বলিলেন "তোমরা একটা গরু কাটিয়া তাহার একখণ্ড মাংসদ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে মার, তাহা হইলে সে উঠিয়া বলিয়া দিবে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।" দুই সহোদরে ভাবিল যে মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং গোমাংস দ্বারা মৃতব্যক্তির শরীরে মারিলে হত্যা প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই স্থির করিয়া মুসার আজ্ঞামতে তাহারা একটি গরু বলিদান করিল, এবং একখণ্ড গোমাংস লইয়া মৃত ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করিল। মৃতব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল এবং হত্যাকারীদিগের নাম বলিয়া দিল। ইহা মুসার একটি অলৌকিক ব্যাপার (miracle); কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য এইরূপ আজ্ঞা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা হইতে গো-বলিদান সম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মের মতামত কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঐ আদেশ মুসা ইহুদিদিগকে দিতেছেন মুসলমানকে নহে, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মের আদেশ কোনক্রমেই বলা যাইতে পারে না। এখানে কেবলমাত্র গো-হত্যার কথা আছে, গো-বলিদানের নাম গন্ধও নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোরাণের "সুরাতুল বকর" অর্থাৎ গো-সর্গে গরু বলিদানের কথা আদৌ নাই। এই সর্গে বলিদানের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা নরবলি গো-বলি নহে। মুসা ইহুদিদিগকে বলিতেছেন "তোমরা বৎস পূজা করিয়াছ বলিয়া তোমাদের নিজ প্রাণ বলিদান দিয়া ঈশ্বরের নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" গো-সর্গে বলিদান অথবা গো-হত্যার কথা আর নাই।

...বলিদানের কথা "সুরাতুল হজ" অর্থাৎ তীর্থ সর্গে আছে :—

ওয়াল্ বুদ্না যাল্নাহা..লাকুম্ মিন্ শআয়েরিল্লাহে লাকুম্ ফিহা খয়রুন্ ... লাহুম্ তক্‌ওয়া মিন্‌কুম।
অর্থাৎ উষ্ট্র বলিদান তোমাদের ঈশ্বর ভক্তির চিহ্ন স্থির করিয়াছি, ইত্যাদি।

এখানে এই "বুদ্না" শব্দের অর্থ লইয়া কেহ কেহ মহা গোলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে "বুদ্না" অর্থে উট ও গরু দুই বুঝায়। আমরা বলি যে "বুদ্না" শব্দের অর্থ উট ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁহারা পার্শী অথবা আর্ব্বী কিছু জানেন তাঁহারা সকলেই দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মৌলবি আবদুল্ কাজির সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। ইনি "বুদ্না" অর্থে উট লিখিয়াছেন। খ্যাতনামা সেল সাহেব কোরাণের তরজমাতে বুদ্না camel বলিয়া তরজমা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অভিধান "কামুস" "মজমউ বিহারিল্ অন্ওয়ার" ও "মুন্তখবুল্ লুঘাৎ" সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন যে বুদ্না মানে যে সে উট নহে বরং বলিদানের উট। সাধারণ উটকে আর্ব্বী ভাষায় ইবিল্ বৈর্ ইত্যাদি কহে। বুদ্না শব্দের প্রকৃত (literal) অর্থ বড় জন্তু, এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে গরুও বুঝায়। কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বুদ্না মানে গরু নহে। প্রসিদ্ধ টীকাকার বৈজাবির মতে "বুদ্না" মানে কেবলমাত্র উট, গরু নহে, যথা :—

"নহর্না মা রসুল ইল্লাহে অলবুদনতা অন্সবাতিন্ ওয়ল বকরতা অন্সবাতিন্"। অর্থাৎ মহম্মদের সঙ্গে, সাতজনের জন্য একটি উট (বুদ্না) এবং সাতজনের জন্য একটি গরু (বকর) বলি দেওয়া হইয়াছিল। যদি "বুদ্না" অর্থে গরুও বুঝাইত তাহা হইলে পুনরায় "বকর" (গরু) শব্দ লেখা হইল কেন? ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বুদ্না অর্থে কেবল উট বুঝায়, এবং "বকর" মানে আর্ব্বীতে গরু। উর্দ্দুতে বকরা মানে ছাগল বুঝায়। এই দুই শব্দের বানান এক নহে। এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না কোরাণে উট বলিদানের কথা বলা হইয়াছে, গরু বলিদানের নহে।

কোরাণের আর এক স্থানে বলিদানের উল্লেখ আছে। "সুরাতুল কৌথর" নামক সর্গে আছে :—

"ইন্না আতৈনা কল্ কৌথর ফসল্লেরব্বিকা ওনহর্।" অর্থাৎ আমরা (ঈশ্বর) তোমাকে (মহম্মদ) "কৌথর" দিলাম, সেই জন্য পূজা কর এবং বলি দাও।" কৌথর অথবা কৌসর শব্দের অর্থ প্রচুরতা, এখানে বিদ্যা বুদ্ধির প্রচুরতা। কৌথর অর্থে স্বর্গের ... ও মধুপূর্ণ নদীও বুঝায়। কৌথর শব্দ লইয়া কোন গোলমাল নাই। বিবাদ কেবল "নহর" শব্দের অর্থ লইয়া। কেহ কেহ বলেন যে "নহর" অর্থে উট, গরু উভয় বলিদানই বুঝায়। আমরা বলি যে "নহর" শব্দ কেবল উট বলিদানের সময় ব্যবহৃত হয়, এবং "জবেহ" (বাঙ্গলা জবাই) উট, গরু, ছাগল, ভ্যাড়া, সকলের জন্য প্রয়োগ হয়। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মজমউ বিহারিল্ অন্ওয়ার," "কামুস," "বৈজাবী," ও "তফাসির জলালিন," এ "নহর" মানে উট বলিদান। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কোরাণে গোবলির ... গন্ধও নাই।

বাহ্যের সহিত ভিতরকার বিষয়ের বিশেষ কোন সম্পর্কই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জিবরইল্ স্বর্গ হইতে অল্প অল্প কোরাণের অংশ আনিয়া মহম্মদকে দিতেন। প্রথমেই যে কথাগুলি মহম্মদের নিকট আসিত, সেই মতেই কোরাণের সর্গের নামকরণ হইত। ইহুদিদিগের ধর্ম্মপুস্তক সিডারিমেরও নাম রাখা এই প্রকারে হইয়াছে, বোধ হয় ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

"এই "সুরাতুল বকর (গো-সর্গ) কোরাণের সকল সর্গাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাতে ২৮৬টি শ্লোক (আয়াত্) আছে, কিন্তু গো-হত্যার কথা কেবলমাত্র একবার আছে। দেখা যাক গো-হত্যার বিষয় কি আছে।

সুরাতুল বকরের অষ্টম (রুকু) প্যারাগ্রাফ :—

ওয়া ইজ্ কালামুসা......................য়ুরিকুম আয়াতিহি। (বাঙ্গালা অক্ষরে আর্ব্বী ভাষা লেখা দুরূহ বলিয়া সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল না,) অর্থাৎ মুসা ইহুদিদিগকে বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ, তোমরা একটা গরু কাট" ইত্যাদি।

এখানে একটি গল্পের উল্লেখ আছে। দুই সহোদরে মিলিয়া তাহাদের খুড়তুত ভাইকে মারিয়া ফেলিয়া মুসাকে বলে যে হত্যাকারী কে তাহা জানি না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত। মুসা বলিলেন "তোমরা একটা গরু কাটিয়া তাহার একখণ্ড মাংসদ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে মার, তাহা হইলে সে উঠিয়া বলিয়া দিবে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।" দুই সহোদরে ভাবিল যে মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং গোমাংস দ্বারা মৃতব্যক্তির শরীরে মারিলে হত্যা প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই স্থির করিয়া মুসার আজ্ঞামতে তাহারা একটি গরু বলিদান করিল, এবং একখণ্ড গোমাংস লইয়া মৃত ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করিল। মৃতব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল এবং হত্যাকারীদিগের নাম বলিয়া দিল। ইহা মুসার একটি অলৌকিক ব্যাপার (miracle); কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য এইরূপ আজ্ঞা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা হইতে গো-বলিদান সম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মের মতামত কিছুই স্থির পাওয়া যায় না। ঐ আদেশ মুসা ইহুদিদিগকে দিতেছেন মুসলমানকে নহে, সুতরাং ইসলাম ধর্ম্মের আদেশ কোনক্রমেই বলা যাইতে পারে না। এখানে কেবলমাত্র গো-হত্যার কথা আছে, গো-বলিদানের নাম গন্ধও নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোরাণের "সুরাতুল বকর্" অর্থাৎ গো-সর্গে গরু বলিদানের কথা আদৌ নাই। এই সর্গে বলিদানের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা নরবলি গো-বলি নহে। মুসা ইহুদিদিগকে বলিতেছেন "তোমরা বৎস পূজা করিয়াছ বলিয়া তোমাদের নিজ প্রাণ বলিদান দিয়া ঈশ্বরের নিকট সেই পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" গো-সর্গে বলিদান অথবা গো-হত্যার কথা আর নাই।

অতঃপর বলিদানের কথা "সুরাতুল হজ" অর্থাৎ তীর্থ সর্গে আছে :—

ওয়াল্ বুদ্‌না জাল্‌নাহা.......................................লাহুহু তক্‌ওয়া মিন্‌কুম। অর্থাৎ উষ্ট্র বলিদান তোমাদের ঈশ্বর ভক্তির চিহ্ন স্থির করিয়াছি, ইত্যাদি।

এখানে এই "বুদ্‌না" শব্দের অর্থ লইয়া কেহ কেহ মহা গোলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে "বুদ্‌না" অর্থে উট ও গরু দুই বুঝায়। আমরা বলি যে "বুদ্‌না" শব্দের অর্থ উট ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁহারা পার্সী অথবা আর্ব্বী কিছু জানেন তাঁহারা সকলেই দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মৌলবি আবদুল্ কাদির সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। ইনি "বুদ্‌না" অর্থে উট লিখিয়াছেন। খ্যাতনামা সেল সাহেব কোরাণের তরজমাতে বুদ্‌না camel বলিয়া তরজমা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অভিধান "কামুস" "মজমউ বিহারিল্ অন্‌ওয়ার" ও "মুগুখবুল্ লুঘাৎ" সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন যে বুদ্‌না মানে যে সে উট নহে বরং বলিদানের উট। সাধারণ উটকে আর্ব্বী ভাষায় ইবিল্ বৈর্ ইত্যাদি কহে। বুদ্‌না শব্দের প্রকৃত (literal) অর্থ বড় জন্তু, এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে গরুও বুঝায়। কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বুদ্‌না মানে গরু নহে। প্রসিদ্ধ টীকাকার বৈজাবির মতে "বুদ্‌না" মানে কেবলমাত্র উট, গরু নহে, যথা :—

"নহর্‌না মা রসুল ইল্লাহে অলবুদ্‌নতা অন্‌সবাতিন্ ওয়ল বকরতা অন্‌সবাতিন্"। অর্থাৎ মহম্মদের সঙ্গে, সাতজনের জন্য একটি উট (বুদ্‌না) এবং সাতজনের জন্য একটি গরু (বকর) বলি দেওয়া হইয়াছিল। যদি "বুদ্‌না" অর্থে গরুও বুঝাইত তাহা হইলে পুনরায় "বকর" (গরু) শব্দ লেখা হইল কেন? ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বুদ্‌না অর্থে কেবল উট বুঝায়, এবং "বকর" মানে আর্ব্বীতে গরু। উর্দ্দুতে বকরা মানে ছাগল বুঝায়। এই দুই শব্দের বানান এক নহে। এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না কোরাণে উষ্ট্র বলিদানের কথা বলা হইয়াছে, গরু বলিদানের নহে।

কোরাণের আর এক স্থানে বলিদানের উল্লেখ আছে। "সুরাতুল কৌথর" নামক সর্গে আছে :—

"ইন্না আতৈনা কল্ কৌথর ফসল্লেরব্বিকা ওনুহর্।" অর্থাৎ আমরা (ঈশ্বর) তোমাকে (মহম্মদ) "কৌথর" দিলাম, সেই জন্য পূজা কর এবং বলি দাও।" কৌথর অথবা কৌসর শব্দের অর্থ প্রচুরতা, এখানে বিদ্যা বুদ্ধির প্রচুরতা। কৌথর অর্থে স্বর্গের দুগ্ধ ও মধুপূর্ণ নদীও বুঝায়। কৌথর শব্দ লইয়া কোন গোলমাল নাই। বিবাদ কেবল "নহর" শব্দের অর্থ লইয়া। কেহ কেহ বলেন যে "নহর" অর্থে উট, গরু উভয় বলিদানই বুঝায়। আমরা বলি যে "নহর" শব্দ কেবল উষ্ট্র বলিদানের সময় ব্যবহৃত হয়, এবং "জিবেহ" (বাঙ্গলা জবাই) উট, গরু, ছাগল, ভ্যাড়া, সকলের জন্য প্রয়োগ হয়। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মজমউ বিহারিল্ অন্‌ওয়ার," "কামুস," "বৈজাবী," ও "তফাসির হুসেনি," মতে "নহর" মানে উষ্ট্র বলিদান। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কোরাণে গোবলির নাম গন্ধও নাই।

এই ত গেল কোরাণের কথা, এখন হদিসে কি আছে দেখা যাক। অনেক বাজে বচনকে মূর্খলোকে হদিস্ বলে। কিন্তু তাহা হদিস্ (মহম্মদের আদেশ) নহে। স্বয়ং মহম্মদ হদিস্ চিনিবার এই উপায় বলিয়া গিয়াছেনঃ—

অন্ ইব্‌নি উমরা কালা রসুলিল্লাহি..............................কলম্ অকলহু। অর্থাৎ "অনেকেই অনেক কথা বলিবে যে আমি (মহম্মদ) বলিয়া গিয়াছি। তাহা সত্য কি না জানিবার এই উপায়, যে যদি কোরাণের সহিত ঐক্য হয় ত আমি বলিয়াছি, নতুবা আমি কখনও বলি নাই।" সুতরাং যা তা একটা বচন খাড়া করিতে পারিলেই তাহা মহম্মদের আদেশ (হদিস) হইতে পারে না। হদিস কাহাকে বলে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইংরেজি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলে আর্ব্বার অপেক্ষা সহজ হয়। "Haji Khalifa defines the science of tradition (হদিস) to be the means of discriminating knowledge of the sayings of the Prophet, together with his actions and circumstances and divides it into two parts,—(I,) the science of the reporting of tradition—which treats of the conditions under which a tradition is considered as reacting back to the Prophet, and (II,) the science of the understanding of tradition—which treats of the meaning of a particular tradition as ascertained by its language by reference to the fixed principles of Muslim law or by the analogy of known circumstances relating to the Prophet" *(vide Journal of the American Oriental Society Vol VII, page 61.)*

অবশ্য দুই এক স্থানে হদিসে গোবলির কথা আছে। "সুনানই আবু দাউদে" আছে "হুদেবিয়াতে মহম্মদের সঙ্গে একটি উট সাতজনের জন্য, এবং একটি গরু সাতজনের জন্য বলিদান দিয়াছিলাম।"

এখানে বলা হইল যে উট বলি গরু বলির সমান, অর্থাৎ দুই সাত জনের জন্য।

কিন্তু প্রসিদ্ধ "তিরমিজ" ও "নসই"তে আছে যে সাত জনের জন্য গরু ও দশ জনের জন্য উট বলি হইয়াছিল। এখানে দুই বচনে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমান মৌলবিদের একটি প্রসিদ্ধ বচন আছেঃ—

"ইজা তারজা তসাকতা" অর্থাৎ যদি দুই বচনে অনৈক্য হয়, কোন বচনই মানা উচিৎ নহে। এই নিয়ম মতে গরু বলির বিষয়ে যে কয়টা বচন হদিসে আছে, সমস্তই আপনা আপনি কাটিয়া যায়।

গরু বলির বিপক্ষে আর এক কথা আছে। ইমাম আহম্মদ বলেন যে মহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে জন্তু বলিদান দেওয়া যায় তাহার এক একটী লোমে এক একটী পুণ্য হয়। এ নিয়ম মতে যে ভেড়া বলিদান দেওয়া সকল অপেক্ষা উত্তম সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্ব্বী শব্দ বকর মানে গরু। বকরিদ শব্দ আর্ব্বী বকর হইতে উৎপন্ন হয় নাই। উহা বোধ হয় উর্দ্দু বকরা (ছাগল) হইতে হইয়াছে। আরব দেশে "বকরিদ" শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় না, সেখানে উহাকে "ইদ্—উজ্—জুহা" অথবা "ইদ্—উন্—নহর্" কহে। এ নামগুলিও কোরাণের কোন স্থানে নাই। হদিসে এই নামগুলি পাওয়া যায়। আরব দেশে গরু নাই বলিলেই হয়, সেই জন্যই বোধ হয় গরুর কথা কোরাণে নাই, এবং হদিসেও অতি অল্প।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে ভদ্র মুসলমানেরা কখন গোমাংস খান না। এমন কি সকল ভদ্র মুসলমান সমাজেই এই আর্ব্বী বচনটি প্রসিদ্ধ আছেঃ—

"লবন্থুল্ বকরে দওয়াউন্, ওলেহেমুহা দাউন" অর্থাৎ "গো দুগ্ধ ঔষধ কিন্তু গোমাংস ব্যাধি।"

এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে গো বলি না হইলে যে মুসলমানের কুর্‌বানি মাটি হয়, ইহা নিতান্ত অমূলক।

শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র।

---

* এ বিষয়ে গত বৎসর লেখক "রইস ও রায়ত" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং উর্দ্দুতে [illegible] এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন, উহা প্রেসে আছে শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। মহম্মদের সময় গোবধ প্রথা ছিল না এবং স্বয়ং মহম্মদ গোবধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না, এই বিষয়ে ইনি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। ভাঃ সং।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিলুপ্ত। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদেরা যেমন ভূপঞ্জরের স্তরের পর্য্যায় পর্য্যালোচনা করিয়া কতক পরিমাণে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন, সেই রূপ এ দেশের মানসিক ও বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় ও ক্রম আংশিক রূপে নির্দ্দিষ্ট করা একেবারে অসম্ভব নহে।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত একটী ঘটনাদ্বারা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের নূতন একটী স্তরের আরম্ভ স্পষ্ট সূচিত হয়। চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজচক্রবর্ত্তী স্বীয় শূদ্র মন্ত্রীর কর্তৃক নিহত হইলে পর সদ্ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পার হইয়া দেশান্তরবাসী হয়েন। দুষ্ট রাজা প্রভূত অর্থ দানে ইতর ব্রাহ্মণদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে কৃত্রিম শাস্ত্র রচনা ও ব্যবহারবিপ্লবের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেন। প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে রাজহত্যা গুরুতর পাতক। শাস্ত্রে অনুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে কখনও কোন ব্রাহ্মণ রাজঘাতীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না। এবং এই রাজরক্তপাতই দেশের অধঃপাতের নিমিত্তক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মহাপাপী রাজাকে প্রজাপীড়ন কার্য্যে সহায়তা এবং প্রাচীন ব্যবহারের বক্ষে পদাঘাত করিয়া নূতন কুব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা করিল। এই দারুণ বিষসঞ্চারে দেশের সর্ব্বাঙ্গ ক্রমশঃ বিকল হইয়া পড়িল। কুব্রাহ্মণের সাহায্যে শূদ্রেরও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইল এবং প্রজাগণ সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভকে রাজপূজা দিতে বাধ্য হইল। এরূপ ঘটনায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই ঘটিল। দেশের আধ্যাত্মিক জীবন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। স্বাভাবিক ন্যায়ান্যায়বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিল। বিনাশের প্রথম সূচনা বুদ্ধির সত্ত্বগুণের রজস্তমগুণের দ্বারা অভিভব। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই নিয়মে সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি নৈতিক গুণের যে উৎকর্ষ তাহা ক্রিয়া কলাপে আরোপিত হইল—যজ্ঞীয় হবিঃ কুক্কুরের ভাগে পড়িল। দাম্ভিক লোকের পক্ষে এই রূপ ব্যবহার বিশেষ উপাদেয়। ইহাতে আত্মদমনের আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির উদ্দামভাবে স্বচ্ছন্দে বিচরণের পথ ইহাতে পরিষ্কার হয়। এবং বহুল ব্যয় ও আয়াসসাধ্য ক্রিয়া কলাপে নিবিষ্ট হইয়া সৎবুদ্ধিকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করা যায়। এই কারণে যে রূপ কার্য্য ঘটে তাহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইহুদিদিগের ফারিসীসম্প্রদায়ের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তস্থল, য়ুরোপের মধ্যযুগে খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এই রূপ কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়। যে পরিমাণে যথার্থ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির ক্ষীণতা ঘটে সেই পরিমাণে বাহ্যক্রিয়ার আড়ম্বর বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এদেশেও ঐ নিয়মের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। [illegible] ধনশালী হইয়া ব্রাহ্মণগণ আমরণ ক্রিয়া কলাপের আড়ম্বরে কাটাইতে লাগিল। [illegible]

একেবারে নিভাইবার জন্য তৎকালে এক নূতন দর্শন শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইল।* বেদের ভাবার্থকে বলিদান দিয়া শব্দার্থের প্রতিষ্ঠা করা এই দর্শনের উদ্দেশ্য। এবং ইহার দ্বারা একবার বুদ্ধি অভিভূত হইবে ক্রিয়াকলাপের গণ্ডীর বাহির হইবার জন্য বুদ্ধির আর প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল দার্শনিকদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উল্লেখ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদ বাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্ম কর্ম্মফল প্রদাং।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়োপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
....

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত লোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্ম মনুপ্রপন্নাঃ গতাগতং কামকামাং লভন্তে॥

এ দেশের তৎকালিক দুর্গতির কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিবার জন্য এই দার্শনিকদিগের দুই একটী মত আলোচনা করিবার প্রয়োজন। ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবিভেদ বশতঃ এই দার্শনিকের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। এক সম্প্রদায়ের মতে ক্রিয়াই ঈশ্বর তদতিরিক্ত আর ঈশ্বর নাই —ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য ও অদ্বয়ত্ব ইহারা একেবারে স্বীকার করেন না। অপর সম্প্রদায় ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন বটে কিন্তু বলেন যে তাঁহার সম্বন্ধে মনুষ্যের সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা উচিৎ কেন না কৃতকর্ম্মের† উপযুক্ত ফল দেওয়া ভিন্ন ঈশ্বরের আর কোন ঈশ্বরত্ব নাই। অতএব স্বর্গকামনায় যাগ যজ্ঞ, ইষ্টপূর্ত্ত, সাধনই পরম পুরুষার্থ। জন্ম জন্ম কর্ম্ম করিয়া স্বর্গ ও মানুষ লোকে ইন্দ্রিয়ভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। উভয় সম্প্রদায়েরই মতে রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখ ও প্রযত্ন আত্মার নিত্যগুণ এবং আত্মা চেতন অচেতন উভয় ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এই সকল মতের ব্যবহারিক ফল নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন নহে। আত্মার সুখেচ্ছা যদি নিত্যগুণ হয় তবে যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় সুখভোগ হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখায় পুরুষার্থ সাধন। এবং যখন আত্মা জড়াংশ জড়িত তখন চিরকালই জড় উপভোগ ভিন্ন আত্মার তৃপ্তি অসম্ভব। এক কথায় এই মতে স্বার্থপরতা সর্ব্বোচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত।

এই মতাবলম্বনের সামাজিক ফল ও সমান অনিষ্টকর। ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থ সাধনের

---

* প্রভাকর প্রভৃতি পূর্ব্ব মীমাংসা সম্প্রদায় ইহার পূর্ব্বেও থাকিতে পারে কিন্তু এই সময়ে ইহার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। কোন দর্শন কখন রচিত হয় বলা যায় না তবে কোন ঘটনাবলীর সাহায্যে কোন দর্শন কখন বিশেষ প্রবলতা লাভ করে তাহা কতক পরিমাণে স্থির করা যাইতে পারে। যেমন রামমোহন রায়ের পর বাঙ্গালায় উপনিষদের চর্চ্চা জন্মিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে এ প্রদেশের লোকে উপনিষৎ থাকিয়াও ছিল না।

† ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে কর্ম্ম শব্দে বেদোদিত ক্রিয়া। চলিত ইহার যে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার দেখা যায় তাহা বৌদ্ধদিগের কৃত।

যজ্ঞ যে সকল বহুব্যয়সাধ্য ক্রিয়াকলাপের বিধান করিয়াছিল তাহার দ্বারা স্বর্গলোকে অপ্সরা সম্ভোগের লালসায় প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। ফলতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, এই সকল শক্তির সঞ্চারণে লোক দুঃখভারে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল।

কতদিন পর্য্যন্ত যে এই দুরবস্থা চলিয়াছিল বলা যায় না তবে ইহা একরূপ স্থির যে শাক্য সিদ্ধার্থের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ উপশম হয় নাই। বুদ্ধদেবের উপদেশ হইতেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বিশদ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথার্থতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সহিত না মিলাইয়া লইলে বৌদ্ধ মত সম্পূর্ণরূপে বোধায়ত্ত হয় না। অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ মতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গঠনের সহিত উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনাভাব। কেবল চারিটি বৌদ্ধ দর্শনই ভারতবর্ষীয় চিন্তার স্রোতে বহমান। বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মতের বিচ্ছেদভূমি। বৌদ্ধদিগের বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারের যথার্থ ভাব বুঝিতে হইলে কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনার আলোচনা আবশ্যক। "সুত্তনিপাতের" অন্তর্গত "ব্রাহ্মণ সুত্তে" বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সত্য জ্ঞানের প্রচার ছিল।* কিন্তু ব্রাহ্মণ আচার্য্যদিগের মধ্যে কেহই এখনও বেদত্যাগ করেন নাই। অতএব বুদ্ধদেবের বেদ প্রত্যাখ্যান এরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে যাহাতে উপরোক্ত সত্যের কোন প্রকারে অপলাপ না হয়। আরও দ্রষ্টব্য যে বুদ্ধদেব উল্লিখিত "সুত্তে" ব্রাহ্মণদিগের অধঃপাতের কারণ বেদ এ কথা কোন স্থানে বলেন নাই কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে রাজন্যবর্গের কুদৃষ্টান্তেই ব্রাহ্মণের অবনতি। এক অর্থে বেদত্যাগ ব্রাহ্মণদিগেরও সম্মত।

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।

....

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতো সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

....

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥—ভগবদ্গীতা।

....

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ শাস্ত্রমশেষতঃ ॥—পঞ্চদশী।

....

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥—বিবেক চূড়ামণিঃ।

বুদ্ধদেবেরও বেদ প্রত্যাখ্যান অনেকটা এই প্রকার। বিশেষ এই যে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ

* Max Müller's Sacred Books of the East. vol. x.

বেদাদি শাস্ত্রকে জ্ঞান সাধনের উপায় বলিয়া অভ্যাস করিতে বলেন। বুদ্ধদেব ঐ সকল শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য বাক্যরাশির শ্রবণ মননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ বিশেষের কারণ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ অন্য বর্ণের জ্ঞানী পুরুষদিগের নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদে রাজা অশ্বপতির আখ্যানে অতি স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। অজাতশত্রু, জনক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বর্ণ না হইয়াও যে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপক্ক হইয়াছিলেন ইহারও উল্লেখ আছে। এমন কি রাজা অশ্বপতি যে বিদ্যা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন তাহা যে তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাও কথিত আছে। ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, বিশেষ একটী উপাসনা প্রণালী মন্বাদি রাজারা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেও সূচিত হয় যে ঐ প্রণালীর উপাসনা রাজর্ষিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধদ্বেষী কুমারিল ভট্টের চক্ষে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছিলেন এইটীই অমার্জ্জনীয় দোষ। ইহাতে দৃঢ়ভাবে অনুমান করা যায় যে বুদ্ধের বহুকাল পূর্ব্বাবধিই ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে শাস্ত্র অধ্যাপনা বিশেষরূপে গর্হনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর বুদ্ধদেবের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, উচ্চ বর্ণের মধ্যে তাঁহার পন্থার অপ্রচারের একটা প্রধান কারণ ব্রাহ্মণত্ব অভিমান। তাঁহার অনন্তকাল পূর্ব্বাবধি ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের যেরূপ দুষ্ট অর্থ প্রচার করিয়াছিল তাহাতে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহের পক্ষে সদ্ব্যাখ্যা উপাদেয় করিয়া প্রচার করা একরূপ অসম্ভব হইত, ইহা নিশ্চিৎ। বেদের ভিত্তিতে বহুকাল যাবৎ যে সকল অসত্য ও অমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তাহার নিরাকরণ কখনই সম্ভবপর হইত না।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুষ্ট রাজা ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে তাহাদের ও সাধারণ প্রজাবর্গের ভিতর গভীর নির্ম্মতার নদী বহমান হইয়াছিল। বেদবাদরত নান্যদস্তীতিবাদী পণ্ডিতমন্যদিগের চক্ষে বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদির দ্বারা কামোপভোগাগ্নির জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে ভূরি দক্ষিণায় বশীভূত করা নিঃস্ব প্রজাদিগের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইহাদের চক্ষে প্রজাগণ পশুতুল্য নগণ্য, উভয়লোক হইতে বঞ্চিত। প্রজাদিগের মধ্যে কেহ কিছু অর্থ সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেই তাহাদের জন্য নূতন জাতি সৃষ্টি হইত, তাহাতে অপরাপর প্রজার আরও অবনতি ঘটিত। রাজপুতগণ নীচবংশোৎপন্ন হইয়াও চুরি ডাকাইতি করিয়া অর্থবলে ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। এখনও বাঙ্গালাপ্রদেশে কৈবর্ত্ত অর্থবলে কায়স্থ হইতেছে শুনা যায়। সাধারণ্যে শাস্ত্রের প্রচার না থাকায় ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছামত শাস্ত্র গড়িতে পারেন এবং ইচ্ছামত ব্যবহার চালাইতে সক্ষম হন। জাতির সংখ্যা বাড়িলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্মও বাড়িয়া যায় ও তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের উপার্জ্জনের রাস্তা খুলে।

এই সকল উৎপীড়িত নীচজাতির উদ্দেশেই বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রধানতঃ প্রবর্ত্তিত। এবং এই জন্য ঘৃণিত প্রাকৃত ভাষা বৌদ্ধদিগকে ব্যবহার করিতে হয়। চারি শ্রেণীর বৌদ্ধদিগের অপর দুইটি সাধারণ মত এখানে আলোচ্য। জগতে ঈশ্বর নাই ও মনুষ্যে আত্মা নাই—যোগাচার, সৌগত, মাধ্যমিক, বৌদ্ধ চারি সম্প্রদায়েরই ইহা মত। এই মতের ভাবার্থ পাইবার জন্য একটুকু বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক। সুবিধার জন্য আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। প্রথমে দেখিতে হইবে এই দুইটি মত ধারণার নিকৃষ্ট ফল কি। তাহার পর আলোচ্য যে কি কারণে উপস্থিত ভাবে এই দুইটি মত প্রকটিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎ, বস্তু বা ব্রহ্মের সত্তা বিশ্বাস করেন তাঁহারা জানেন যে আমরা উহার সম্বন্ধে যাহাই ভাবি না কেন উনি তাহাতে অস্পৃষ্ট। ভ্রম অর্থ আর কিছুই নয় কেবল সদ্বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধ আমাদের মনের সংকল্প বিকল্পকে সৎ বা সত্য বলিয়া ধারণ। আর যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে সৎ আছেন এ জ্ঞান ধারণের বৃত্তি আমাদের বুদ্ধিতে আছে তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে সৎ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার উদয় হইলে সংকল্প বিকল্প আর থাকিবে না। সংকল্প বিকল্পশূন্য যে অবস্থা তাহাতে যদি জাগতিক অন্তর ও বহির্বস্তুর জ্ঞান না থাকে এবং সে অবস্থা যদি সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতির অবস্থা হইতে ভিন্ন হয় তবে অবশ্যই সে অবস্থায় যথার্থতঃ সৎপ্রকাশিত হইবে। বেদান্তশাস্ত্রে এই অবস্থারই নাম তুরীয় অবস্থা। মনখালি হইলে অবশ্যই সৎ বিদিত হন যেহেতু সৎস্বপ্রকাশ। একথা ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ শ্রুতি সম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন। এখন দেখিতে হইবে যে আমি নাই, ঈশ্বর নাই এই জ্ঞান পরিপক্ব হইলে পূর্ব্বোক্ত তুরীয় অবস্থা উদিত হয় কি না। অনাত্মবাদী বৌদ্ধ এ ধারণা ত্যাগ করেন যে ইন্দ্রিয় মন ও শরীরের কোন ব্যাপারে আমি আছি। এবং নিজের শরীর ও জগৎ আছে ও আমি নাই এইরূপ ধারণাবলে মন ক্রমশঃ নির্ব্বাসনা হইয়া "আমি নাই" এই ভাব বা জ্ঞান থাকিয়া যায়। অতএব প্রথম অবস্থার জ্ঞান যে "আমি আছি" ও সাধনজনিত জ্ঞান যে "আমি নাই" এই দুই পরস্পর আপেক্ষিক জ্ঞানের অস্তিত্বে দাঁড়ায় এই যে মন ও বুদ্ধির সকল প্রকার ব্যাপার সাম্যাবস্থায় আসিয়া কেবল সৎ ভাসমান থাকে। তাহাই পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে:—

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চ স্যাৎ যন্নকিঞ্চত্তদেবতৎ॥

সর্ব্ব বিষয়ের ব্যাবৃত্তিতে কিছুই থাকে না—যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহাই সৎ। এই যে "কিছুই না" জ্ঞান তাহারই সর্ব্বাতীত সাক্ষীকে বেদান্তে আত্মা বা চৈতন্য বলা হয়। এই চৈতন্য ব্যক্তির হিসাবে জীবাত্মা ও জগতের হিসাবে পরমাত্মা। অতএব বৌদ্ধ যতি যখন ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব অনুভব করেন তখনই উভয়েরও সাধারণ আধার যে সৎ তাহারও উপলব্ধি হয়। এই সৎ নির্ব্বিশেষ তাহার সম্বন্ধে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। এমন কোন চিহ্ন নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে বা চিনাইতে পারা যায়। কেবল মন্দ বুদ্ধি সাধকের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ শ্রুতিতে তাঁহার সবিশেষ নিরূপণের দ্বারা ক্রমমুক্তির সোপান গঠিত হইয়াছে। একথা বৈদান্তিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে:—

নির্ব্বিশেষং পরাত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত্তুং মনীশ্বরাঃ।
যে মন্দা স্তানমুকম্পন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥

বৌদ্ধদিগের সর্ব্বব্যাবৃত্তি * শ্রুতিরে অতদ্‌ব্যাবৃত্তিরূপো ব্রহ্ম নিরূপণ মাত্র।

এই সকল কথা বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায় যে, জীব নশ্বর কি অনশ্বর সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বৌদ্ধতন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য নহে। সৎ যে মনোবাক্যের অতীত এই জ্ঞান দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। এই জ্ঞানই পরম পুরুষার্থসাধক কেননা সত্য জানিতে পারিলে আর দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। সুখ দুঃখের সহিত যথার্থতঃ তোমার সম্পর্ক নাই এই জ্ঞানের পর দুঃখের ভয় ও সুখের আশা উভয়ই অন্তর্হিত হইয়া যায় ও চিরশান্তি বিরাজমান থাকে।

যে অবস্থায় বৌদ্ধ আগমের অভ্যুদয় তাহার উপর লক্ষ্য রাখিলে ইহার বাহ্য আকার যে কেন এত নিষেধাত্মক, কেন সাক্ষাৎ বিধিমুখে সৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। যে আত্মার কামনাগ্নি অনন্তভোগেও শমিত হয় না, যে ঈশ্বর দরিদ্র দুঃখী অক্ষমের প্রতি পাষাণবৎ উদাসীন, তাহার নিষেধই যুক্তিযুক্ত। এতদুভয়ের নিবারণ বিনা তৎকালের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায়ান্তর ছিল না।

নূতন আধ্যাত্মিক স্রোতে জাতিবন্ধন ভাসিয়া গেল এবং কালসহকারে যদিও ভারতবর্ষে জাতিভেদ পুনর্জীবিত হইয়াছে তথাপি হিন্দুস্থানে আর কখনও পূর্ব্ববৎ বললাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কাল্পনিক ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থানে পুনরায় নৈতিক উৎকর্ষ সিংহাসনাভিষিক্ত হইল ও সর্ব্বভূতে দয়া মনুষ্য চরিত্রের উপর অধিকার লাভ করিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহুকালের পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ মানসিক স্বাধীনতা লাভ করিবার একটি ফল এখনও বর্ত্তমান। বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত অজন্তার মন্দিরের সৌন্দর্য্য ব্রাহ্মণদিগের সমধর্ম্ম কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিয়া জগতে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে—ইহার প্রধান কারণ বৌদ্ধদিগের মানসিক স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মণদিগের নিয়মের দাসত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম যে অবস্থায় ঘটে তাহাতে তাহার এক বিষয়ে অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। বৌদ্ধধর্ম্ম দীন দুঃখীর ধর্ম্ম। যাহার মমতা করিবার কেহ নাই বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাকেই কোলে তুলিয়া লয়। ভগ্ন হৃদয় বৌদ্ধধর্ম্ম জোড়া দেয়, উৎপীড়িতের চক্ষের জল মুছায়। বাসনার বস্তু নাই—ইহা বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে শান্ত করে। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিয়া রাজ্য করা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী নহে কিন্তু ফলাভিসন্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া রাজকার্য্যের সাহায্যে যে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে একথা বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম যে পবিত্রতা লাভের একটী প্রধান উপায় ইহা বৌদ্ধের ভিতর নাই। রাজনৈতিক মহত্ব যে ভারতবর্ষে

---

* "আত্মা নাই" বা "আত্মা কিছুই নহে" এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিদিত ও অবিদিত পদার্থের আত্মত্ব নিষেধ।

† [illegible]

প্রচলিত, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহমাত্র অল্প। বৌদ্ধধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যে বিকাশ দেশান্তরে ঘটিয়াছে তাহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। পার্থিব রাজত্বের সহিত ধর্ম্মরাজ্যের সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্ম্মের এদেশে অবনতি। জটিল ক্রিয়াকলাপের সহিত সম্মিলন ধর্ম্মের আত্মদ্রোহ। এবং ব্যাপককাল রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক রাখিয়া কখনও কোন ধর্ম্ম ক্রিয়াড়ম্বর শূন্য থাকিতে পারে না। রাজকার্য্য বড়ই জটিল। সরল আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অধিক কাল তাহার সহিত স্বচ্ছন্দে একত্র বাস অসম্ভব। এই অমঙ্গল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অচিরে পরাভূত হইল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীভাব ছিল তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের যথার্থ সাত্ত্বিক ক্রিয়া সকলে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। কাজেকাজেই অনার্য্য ক্রিয়াকলাপ তাহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও নাগ পূজা ও বিবিধ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। পরিশেষে "মালতী মাধবে" দেখা যায় যে বৌদ্ধ জাদুকাদ্ধের নামান্তর মাত্র।

এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মে দুই শ্রেণীর ফল প্রসব করিয়াছিল। এদিকে সাধারণ লোকে ইহার সাহায্যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে ইহা ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ধর্ম্ম সংস্কার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। ভারতবাসীর উপর এখন খৃষ্টধর্ম্ম অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে প্রথমতঃ সাংখ্য দর্শনের পুনরুদ্ধার হয়। বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া যে সকল দর্শন স্বীকার করে সংখ্যদর্শন তাহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা সান্নিকটস্থ ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা বোধ হয় নিজ জাতীয় যাবতীয় গ্রন্থ হইতে পুরাতন। ইহার ভাষ্যকার গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু। ইনি মণ্ডুক উপনিষদের করিকাকার। এই কারিকা দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হয় যে ইহার রচনাকালে বেদান্ত দর্শন বর্ত্তমান আকার ধারণ করে নাই। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ। বৈদান্তিক সম্প্রদায়ে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইঁহারই অন্য নাম পতঞ্জলি এবং এই শেষোক্ত নামে ইনি যোগসূত্রের রচয়িতা।

সাংখ্য দর্শনকে বৌদ্ধ মতের সর্ব্বাপেক্ষাসন্নিকটস্থ বলিবার হেতু দুইটি। প্রথমতঃ যদিও ইহাতে বেদকে প্রমাণের মধ্যে ধরেন তথাপি সে প্রমাণের কার্য্যতঃ প্রয়োগ সাংখ্যাচার্য্যদিগের মধ্যে দেখা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় সাংখ্য দর্শনেও কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণের ব্যবহার দেখা যায়। বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয়ই নিরীশ্বরবাদী। উভয় মতেই অচেতন কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য দর্শন নিরাত্মবাদী নহে কিন্তু সাংখ্যের কৈবল্য বৌদ্ধদিগের কি বহুদূরবর্ত্তী?

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্তি নমে নাহং ইত্য পরিশেষং।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলং উৎপদ্যতে জ্ঞানং॥ সাংখ্যকারিকা॥ ৬৪॥

অনন্তর পাতঞ্জল দর্শনের আবির্ভাব। সাংখ্যদর্শনের বিস্তৃতি সম্পাদন করিয়া ভগবান পতঞ্জলি ষড়্বিংশ তত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বর অঙ্গীকার করিলেন। বিবেকাৎ কেবলীভূত ষড়্বিংশানুপশ্যতি।

বৌদ্ধমতের সহিত যোগের প্রভেদ সাংখ্য অপেক্ষা অধিক এবং ইহা ঔপনিষদিক মতের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী। তবে ইহাতে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধমতের সহিত এইস্থলেই কথঞ্চিৎ সাম্য রহিয়াছে।* বৌদ্ধদিগের ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভাবকালে মীমাংসা দর্শনের অভ্যুদয় দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ এবং পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার পুনরুদ্ধার সময়ান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাপতি।

পশিলে তোমার অন্তঃপুরে,
রৌদ্রে দগ্ধ দিবাচয়, হয়ে যায় শ্যামময়,
বসিয়া হোথায় শ্যাম সরোবর তীরে।
শীকর সম্পৃক্ত বায় শীতলিয়া যায় কায়
—হৃদয় কমলগন্ধ নাসারন্ধ্রে ঘিরে;
আঘ্রাণিয়া জাগে হিয়া হৃদয়-কুটীরে।
দেখাইয়া শত পথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
পবিত্র তীর্থের সাথী হেন আর কে রে,
চল নিরখিতে শ্যামে যমুনার তীরে।
এল এল মধুমাস, কাজ নাই বেশ বাস,
আঁকা সে মধুরহাস প্রতি শিরে শিরে!
চল নিরখিব শ্যামে যমুনার তীরে!
এখনো আহির নারী লইয়া গাগরি ঝারি,
শ্যাম প্রতিবিম্ব তথা হেরে শ্যাম নীরে!
তেমতি বিগগীত কুঞ্জে কুঞ্জে উথলিত,
কম্পিত মাধবীলতা মৃদু বায়ে ধীরে
শিহরিত কম কায়, তেমতি কদম্ব তায়,
ফুলে ফুলে অলি ধায় মধু গুঞ্জরণে!
চকিত হরিণীনেত্র বাঁশরীর স্বনে।
ত্যজি কুল লাজ বাধা, অভিসারে চলে রাধা,
মুখর নূপুর রুণু ধ্বনিত চরণে।
ত্যজিতে কি পারে শ্যাম সুখবৃন্দাবনে।
চল নিরখিতে শ্যামে যমুনা পুলিনে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

---

* দর্শন সমূহের সমন্বয় অন্যত্র বিচার্য্য।

রবির প্রেম।

প্রতিদিন উষাকালে,
তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি,
কারে দিতে উপহার
হৃদয়ের প্রেম ছবি,—
কালাকাল তুচ্ছ করি
যুগ যুগান্তর ধরি
গাহিছ প্রণয় গীতি,
তরুণ অরুণ কবি?
হেথায় কে বুঝে তব
হৃদে কি গম্ভীর স্নেহ?
প্রাণের অসীম রূপ
ধরিতে কি জানে কেহ?
ফুটাইতে পূর্ণ হাসি
আনন্দের জ্যোতি ঢালো,
সহিতে কে পারে হেথা
অত প্রেম, অত আলো!
হাসিতে সুখের হাসি
"তাপ" তাপ উঠে তান!
প্রেমের বাসনা যত
বিলাপেতে অবসান!

হেথায় আকঙ্ক্ষা শুধু,
তৃপ্তি কেহ নাহি চায়!
চাহে প্রেম ততক্ষণ
যতক্ষণ নাহি পায়!
রূপ হেথা শুধু কথা,
চাহেনা স্বরূপ রূপ!
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু
তারা খুঁজে মরে কূপ!
হেথায় চাহে না ভাব
শুধু তারা চাহে কথা!
চাহে না হেথায় সুখ
শুধু তারা চাহে ব্যথা!
সত্যের আদর নাহি
শুধু তারা চাহে মায়া!
কে হেথা আলোক চাহে
শুধু তারা চাহে ছায়া!
এই কি বিশ্বের ধারা
সসীমে অসীম লয়!
তবে কেন অশ্রুজল?
এ অশ্রু মোছার নয়!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি ।

সঙ্কেতের ব্যাখ্যা ।

স র, গ, ম, প, ধ ন = শুদ্ধ স্বর ।
রো, গো, ধো, নো = কোমল স্বর ।
মী = কড়ি মধ্যম ।

মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না । উপরের সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ্‌ এবং নিম্ন সপ্তকের স্বরের নীচে হসন্ত থাকে যথা, স, র্স, স্ ।

সহজে একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাকে একমাত্রা কাল কহে । একটি স্বর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, তাহার মাথার উপর সেই চিহ্নিত অঙ্ক দেওয়া যাইবে । যথা :—স১ এই স্বরটী একমাত্রা কাল স্থায়ী অর্থাৎ শুদ্ধ সা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত স্বরটি স্থায়ী ।

স২—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর এক আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে । যথা, সা—আ ।

স৩—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর দুই আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে । যথা, সা—আ—আ—ইত্যাদি ।

আবার কোন মাত্রা চিহ্নিত স্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরে কিম্বা স্বরগুলিতে যদি মাত্রাচিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাত্রা চিহ্নিত স্বরের কাল-মধ্যেই ঐ সব স্বরগুলি উচ্চারিত হইবে । যথা :—

সর১ ।—এখানে একমাত্রাকালের মধ্যে দুটি স্বরই বাজাইতে হইবে ।

সরগ১ ।—একমাত্রা কালের মধ্যে তিন স্বরই বাজাইতে হইবে ।

আবার সর-গ১ ও সরগ১ এ বিশেষত্ব আছে । সর-গ১, এ স্থলে কসির বাম পার্শ্বস্থিত স্বরের মাত্রা কাল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত স্বরের মাত্রা কালের সমান, অর্থাৎ 'সর' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী এবং 'গ' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী । কিন্তু সরগএর প্রত্যেক স্বরের মাত্রাকাল সমান, স একতৃতীয়াংশমাত্রিক, র একতৃতীয়াংশমাত্রিক, ও গ একতৃতীয়াংশ মাত্রিক, তিনে মিলিয়া পূর্ণ একমাত্র কাল ।

সর১— এ স্থলে বাম পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র 'স'কে ভূষিকা বলা যায়, তাহা মীড়ের কাজ করে, সর১ ও সর১ ইহাদের প্রভেদ এই যে প্রথম গ প্রত্যেক অক্ষরের মূল্য আছে 'স'র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা ও 'র'র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা । কিন্তু সর১এ 'স'কে

কোন মূল্য নাই, এখানে শুধু ‘র’ই পূর্ণ একমাত্রা। ‘ম’কে শুধু কোনমতে তাড়াতাড়ি স্পর্শমাত্র করিয়া প্রধান সুর র১ বাজাইতে হয়।

দেড়মাত্রা নিম্নলিখিত উপায়ে বুঝাইতে হয়; প১প্ম১। এখানে প্রথম ‘প’র মূল্য একমাত্রা দ্বিতীয় ‘প’র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়কে বন্ধনীতে আটক করাতে উহারা বিভিন্ন ‘প’ না হইয়া একটী দেড়মাত্রা কাল স্থায়ী ‘প’ হইল। বন্ধনী না থাকিলে উহারা দুই স্বতন্ত্র ‘প’ হইত, একটীর মূল্য একমাত্রা অপরটীর মূল্য অর্দ্ধমাত্রা। এখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে দুইবার করিয়া না বাজাইয়া শুধু প্রথম প বাজাইয়া দেড়মাত্রা পর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া রাখিতে হয়।

[ ] এই ব্র্যাকেট পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, যে অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তাহা দুইবার বাজাইতে হইবে।

{ } দ্বিতীয়বার আবৃত্তির কালে কতকগুলি সুর বাদ দিতে হইলে তাহারা এই বন্ধনীতে আটক থাকে, ইহার অন্তর্ভুক্ত সুরগুলিকে দ্বিতীয়বারের বেলা না বাজাইয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে।

কলির শেষে আ—প্র থাকিলে প্রথম কলির আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন বুঝায়।

শেষ—আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান যেখানে শেষ করিতে হইবে।

আ|—আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন কোন স্থলে প্রথম দুই একটা সুর বাদ দিয়া আরম্ভ করিতে হয় সেই স্থলে যে সুরের মাথায় ‘আ|’ থাকিবে সেই সুরে ধরিতে হইবে।

কখন কখন স্বরশ্রেণীর কোন কোন সুরের মাথায় উপর আর এক শ্রেণী স্বর থাকে। তখন বুঝিতে হইবে যে পুনরাবৃত্তির কালে গানের পদে নীচের সুরের বদলে সেই উপরের সুর সংযোজন করিতে হইবে। নিম্নে যে গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক তাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বিভক্ত যেমন কাওয়ালি চতুর্মাত্রিক, একতালা ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি। চতুর্মাত্রিক তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে প্রত্যেক চারিমাত্রা অন্তর এক একটী দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে। সেইরূপ অন্য কোন তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর তালের পূর্ণ আবৃত্তি বুঝাইবার জন্য এক একটী দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে।

যে স্থলে [illegible] চিহ্নিত কশির নীচে গানের পদের স্থানে কশি টানা থাকিবে সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে [illegible]হার অব্যবহিত পূর্ব্বের সুরের রেশ চলিতেছে কিন্তু যে স্থলে নীচে কোন কশি নাই সে স্থলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাল পর্য্যন্ত বাজনা বা গলা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে।

মগ১ । ম১ নো১ ধ১ । ধ[illegible]১ ন১ র্স১ । নর্সর্র১ র্সন১ ন১ । র্স০ । — ১ র্স১ ।
তনু স্ মু ক মু ক বা মু ব — হে বাঁ [illegible] তার

ন১ র্স১ ন১ । র্সর্র১ র্স১ র্সধ১ । ধনো১ ধনোর্স১ নো১ । ধ০ । —১ ধ১ ।
কা নে কা নে কি যে ক — হে যা য় ভাই

"ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়" "কানে কানে কি যে কহে যায়" এই দুই স্থলে প্রথম "যায়" তিন মাত্রা কাল টানিয়া রাখিয়া তাহার পরে একমাত্রা কাল ছাড়িয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় "যায়" সে একমাত্রা কালও টানা থাকে।

চিত্রে যেমন আলো ও ছায়ার সমাবেশে চিত্রটা আরো ফুটিয়া উঠে সুরের সেইরূপ মৃদু ও প্রবল আওয়াজের তারতম্য রক্ষা করিয়া গাহিলে গানের ভাবটী সম্যক্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়া গানকে আরও সুমিষ্টতর করে।

সুরের আওয়াজের চিহ্ন এইরূপ :—

প্রবল আওয়াজ	...	...	(ব)
মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃ)
অতি প্রবল আওয়াজ	...	...	(বব)
অতি মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃমৃ)
মধ্য বলের চিহ্ন	...	...	(ম)
আওয়াজ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(বৃ)
হ্রাসের ঐ	...	...	(হ্র)
ক্রমশঃ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(ক্র-বৃ)
ক্রমশঃ হ্রাসের ঐ	...	...	(ক্র-হ্র)

এই অক্ষরগুলি সুবিধা বুঝিয়া পদের নীচে কিম্বা সুরের মাথায় বসিবে।

কোন বিশেষ চিহ্নের পর যত দূর এইরূপ বিন্দুশ্রেণী..................থাকিবে তত দূর পর্য্যন্ত সেই চিহ্নের কার্য্য চলিবে।

নক্ষত্রদিগের জাতিবিচার।

চার্লস্ ডারউইন জীবরাজ্যে ক্রমাভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়া জগতে এক নূতন জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিধানবলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে মানুষের দেহ ক্রমে কীটাণুকীট হইতে ক্রমাভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া একে একে সকল প্রকার জীবদেহ ধারণ ও পরিহারপূর্ব্বক বর্ত্তমান মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। এই বিধানে সৃষ্টিনিয়ন্তার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল প্রকাশ পায়, এবং সৃষ্টিরাজ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা ও বন্ধন দেখিয়া মানুষের চিত্ত স্তম্ভিত হয়! মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া নিজকে সমস্ত বিশ্বরাজ্যের অঙ্গীভূত বলিয়া অনুভব করে! চার্লসের প্রণোদিত বাদ বিজ্ঞান জগতে 'জীববিজ্ঞান' (Biology) নামে এক নবশাখার অভ্যুদয় করিয়াছে। তিনি কেবল ক্রমাভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; আমাদিগকে এক্ষণে ঐ বাদের প্রত্যক্ষসত্য উপলব্ধি করিবার জন্য কেবল দেহে কিম্বা বহির্জগতে নেত্রপাত করিতে হইতেছে না; আমরা তাঁহারই বংশধরদিগকে [illegible] জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি!

ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তনবাদ জীব জগতে সম্যক পরিস্ফুট হইতে না হইতেই,—ঐ প্রচারিত সত্য সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবার বহুবিলম্ব থাকিতেই,—চার্লসের জ্যেষ্ঠপুত্র জর্জ ডারউইন্ * উক্ত বিবর্ত্তনবাদের ধ্বজা লইয়া জীবরাজ্য পরিহারপূর্ব্বক নক্ষত্ররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তনবলে জীবজগতে এক জাতীয় জীবদেহ হইতে অপর উন্নত জাতীয় জীবদেহ সকল ক্রমবিকশিত হইয়া অভ্যুদিত হইতেছে, সেইরূপ বিবর্ত্তনবলে নক্ষত্র জগতেও দেখা যাইতেছে যে এক জাতীয় নক্ষত্র হইতে অপর নানা জাতীয় নক্ষত্রসকল ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। পিতা ডারউইনের প্রণোদিত বাদ যেমন 'জীববিজ্ঞান' প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছে পুত্র ডারউইনের প্রণোদিত বাদও সেই প্রকারে 'নক্ষত্রবিজ্ঞান' (Cosmology) নামে এক বিজ্ঞান শাখা অভ্যুদিত করিয়া জগতের জ্ঞানরাজ্যের পরিসর বিস্তৃত করিয়াছে। পিতা যে বাদকে কীটরূপে [illegible] করিয়া ধরাতলে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন পুত্র তাহার পক্ষ বিস্তৃতি ঘটাইয়া তাহাকে গগনে উড্ডীয়মান করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া যেমন একদিকে কীট হইতে [illegible] ক্রমাভিব্যক্তি জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে তেমন অপর দিকে পিতা হইতে পুত্রের [illegible] প্রকাশ পাইতেছে।†

---

* [illegible] H. Darwin, Plumian Professor of Astronomy & Experimental Philosophy, [illegible] University.

† [illegible] বাদ নূতন না হইতে পারে। মহাভারতে, [illegible]

নক্ষত্রদিগের ক্রমাভিব্যক্তি বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডে যতজাতীয় নক্ষত্র আছে তাহাদের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, অতএব 'নক্ষত্ররাজ্যে বিবর্ত্তন' বিচারের সূচনাস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদিগের জাতীয়ত্ব পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

গগনে যত জাতীয় জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে কতকগুলি সদাগতিশীল এবং অপরগুলি অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সদাগতিশীল জ্যোতিষ্ককে 'গ্রহ' এবং স্থির জ্যোতিষ্কদিগকে 'নক্ষত্র' বলা যায়। নক্ষত্রদিগকে সাধারণতঃ মুক্তনেত্রে গতিবিহীন দৃষ্ট হইলেও দূরবীক্ষণবলে তাহাদের অতি সূক্ষ্মগতি পর্য্যবেক্ষিত হয়, এই গতিকে নক্ষত্রের 'স্বকীয় গতি' (Proper motion) বলা হইয়া থাকে। এক্ষণে বহুগবেষণার পর ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ঐ স্বকীয় গতি প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রদিগের গতি নহে; বস্তুতঃ সৌরজগৎ ইহার অধিকারভুক্ত যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ সহ গগনমার্গে বিচরণ করিতেছে, কোন সুদূরাবস্থিত নক্ষত্র ইহাকে স্বীয় বলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গতি উৎপাদিত করিতেছে, এবং সেই গতিবশতঃ সৌরজগতান্তর্ভুক্ত ধরাতলবাসী জনসাধারণের নিকট ইহা অনুমিত হয় যেন সৌরজগৎ স্থির রহিয়াছে কিন্তু নক্ষত্রমালা স্বীয় স্বীয় অবস্থিতি হইতে বিচলিত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে।

এতদ্ভিন্ন ইহাও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে কতকগুলি নক্ষত্র এইরূপ আছে যে মুক্তনেত্রে তাহাদিগকে একটী নক্ষত্র বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলে তাহারা স্থলবিশেষে দুই কিম্বা ততোধিক নক্ষত্রের সমষ্টি বলিয়া পর্য্যবেক্ষিত হয়; তাহারা পরস্পর এত সন্নিধানে অবস্থিত যে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ না করিলে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব কিছুমাত্র অনুভূত হয় না, অতএব তাহাদিগের সমষ্টিকে একটী মাত্র সোজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে নেত্রগোচর করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে 'যুক্ততারকা' বলা যায়।*

জর্ম্মেণ জ্যোতিষী 'মায়ার' এই জাতীয় নক্ষত্রদিগের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীদিগের এবং তাঁহার নিজের পর্য্যবেক্ষিত যাবতীয় নক্ষত্রগুলি তালিকাবদ্ধ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯টী 'যুক্ত তারকার' স্থিতি ও স্বরূপ প্রকাশ করেন। †

১৭৮১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত যে সকল 'যুক্ত তারকা' পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল তাহাদিগকেই উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'মায়ার' একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—"যে

* যে নক্ষত্র সমষ্টিতে দুইটী মাত্র সন্নিহিত তারকা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকে 'যমক তারকা' (Double Stars) এবং অধিক তারকার সমষ্টিকে 'বহুযমিক তারকা' (Multiple Stars) বলা হইয়া থাকে (ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৯, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত 'যমক ও বহুযমিক তারকা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু আমরা সংক্ষেপার্থ আমি তাহাদিগকে একযোগে 'যুক্ত তারকা' নামে অভিহিত করিয়াছি।

† Vide 'Astronomische Jahrbuch, 1781'. মায়ারের তালিকাভুক্ত তারকাগুলি সমস্তই [illegible]

[illegible] তারকা মুক্তনেত্রে এক সংখ্যক কিন্তু দূরবীক্ষণ সাহায্যে দুইটী স্বতন্ত্র তারকা বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদিগকে 'যমক তারকা' বলা যায়। ইহাদিগের দূরত্বের পরিমাণ কয়েক বিকলা মাত্র; অতএব কোন উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্টি-গোচর করা সম্ভবপর নহে। ইহাদিগের [illegible] কালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণদ্বারাই নক্ষত্র-দিগের 'স্বকীয় গতি' আবিষ্কার করা যাইতে পারে।" এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যুক্ত তারকাদিগের পর্য্যবেক্ষণারম্ভ করিয়াছিলেন।

যমকতারকা সম্বন্ধে তাৎকালিক জ্যোতির্বিদিগের এই ধারণা ছিল যে কোন দুইটী পরস্পর বহুদূরাবস্থিত নক্ষত্রদ্বয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে এক সমসূত্রে দৃষ্ট হইলে তাহারা 'যমকতারকা' রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ দুইটী নক্ষত্রের আপাতঃদৃষ্ট সন্নিধান কেবল মাত্র ঐ নক্ষত্রদ্বয়ের দৃষ্টিরেখার প্রায় একত্ব ভিন্ন অপর কিছুই নহে। তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতপক্ষে অতিশয় অল্প দূরত্ব রহিয়াছে তাহা তাৎকালিক জ্যোতির্বিদবর্গের বিশ্বাসসাপেক্ষ ছিল না।

১৭৮১ খৃঃ অঃ ৬ই ডিসেম্বর সার্ উইলিয়ম্ হর্শেল্ রয়েল সোসাইটিতে 'স্থির নক্ষত্রদিগের লম্বন' (On the Parallax of Fixed Stars*) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ইহা বিজ্ঞাপিত করেন যে নক্ষত্রদিগের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহাদের 'লম্বন'† পরিমাপার্থ সচেষ্ট হইয়া কিছুদিন যাবৎ তিনি এক নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, এবং ইহাতে আশু ফললাভের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। সেই প্রণালী এইরূপঃ—

মনে কর ক খ রেখা ধরাকক্ষের ব্যাস, এবং ক ও খ বিন্দুদ্বয় হইতে চ ও ছ নক্ষত্রদ্বয় পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে। এস্থলে চ ও ছ এমত ভাবে অবস্থিত যে ক হইতে ঐ উভয়কে দৃষ্ট করিলে অতিশয় সন্নিকট-বর্ত্তী অনুভব করা যায়। এরূপ স্থলে ইহাদিগকে 'যমক তারকা' বলা হইয়া থাকে। এ স্থলে চ ক ছ কোণের পরিমাণ অত্যল্প মাত্র। কিন্তু খ বিন্দু হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে চ খ ছ কোণের পরিমাণ অদ্ভুত অতিশয় হয়। আরও দৃষ্ট হইবে যে চ ক খ ও চ খ ছ কোণদ্বয়ের অন্তর ক চ খ ও ক ছ খ কোণদ্বয়ের অন্তর সমান; অধিকন্তু ক চ খ কোণ চ নক্ষত্রের 'লম্বনের' এবং ক ছ খ কোণ ছ নক্ষত্রের
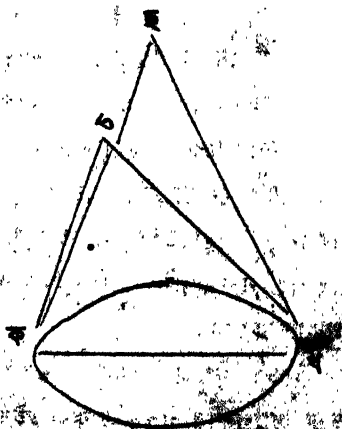
* See 'Philosophical Transactions of the Royal Society' 1781, p. 82.

† ধরাকক্ষের ব্যাসের প্রান্তদ্বয় হইতে কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রের দিকে রেখা টানিলে ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাহাকে ঐ নক্ষত্রের 'লম্বন' বলা যায়। ঐ কোণের পরিমাণ [illegible] জানা থাকিলে তাহা হইতে ঐ নক্ষত্রের দূরত্ব সাধন করা যাইতে পারে।

লম্বনের সমান। অতএব ঐ নক্ষত্রদ্বয়ের লম্বনের অন্তর উক্ত চকছ ও চখছ কোণদ্বয়ের অন্তরের সমান। যদি চ ও ছ নক্ষত্রদ্বয় অতিশয় সন্নিহিত থাকে তবে চ ক ছ ও চ খ ছ কোণদ্বয়ের অন্তর গণনাসাপেক্ষ হয় না, অতএব তদ্দ্বারা 'লম্বন' পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু হর্শেল ঐ সময়ে নক্ষত্রদিগকে অতিশয় সন্নিহিত বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই, অতএব তিনি মনে করিলেন যে যমকতারকার দূরত্ব কোণের অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেই তাহা হইতে তাহাদের লম্বন সাধন করা যাইতে পারিবে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই উদ্দেশ্যে গগন পর্য্যবেক্ষণ ও 'যুক্ততারকা'গণের সংখ্যা ও স্থিতি নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে দৃষ্ট হইবে যে এই পর্য্যবেক্ষণফল হইতেই যুক্ত তারকাদিগের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি হর্শেল স্বীয় পর্য্যবেক্ষিত 'যুক্ততারকা'দিগের এক তালিকা প্রকাশ করিলেন; তাহাতে ২৬৯টী নক্ষত্রের স্বরূপ ও স্থিতিগতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সকল যুক্ততারকার স্থিতিবৈষম্য পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে ধরা-কক্ষাবর্ত্তনদ্বারা তাহাদের কোন অন্তর লক্ষিত না হইলেও নক্ষত্রদিগের একটী স্বকীয় গতির আভাস পাওয়া যাইতেছে যদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে নক্ষত্রগণের এক একটী স্বকীয় গতি রহিয়াছে*। তাহা হইতে তিনি ইহা অনুমান করিলেন যে, সকল নক্ষত্রই যদি গতিশীল হইয়া থাকে তবে সূর্য্য কেন গতিবিহীন থাকিবে? অতএব সৌরজগতেও কোন একটী নির্দিষ্ট দিগ্বাহী গতি রহিয়াছে†। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে যুক্ততারকার পর্য্যবেক্ষণে নিরত হইয়াছিলেন তাহার কোন লক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারিলেন না। ইহা হইতে তাঁহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে নক্ষত্রগণ পরস্পর হইতে দূরাবস্থিত হইলেও ধরার কক্ষব্যাসের সহিত তুলনায় ধরা হইতে তাহাদের দূরত্ব অপরিসীম; অতএব পর্য্যবেক্ষণদ্বারা তাহাদের লম্বনান্তর নিরাকরণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরও হর্শেল 'যমকতারকা' পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার মনের একটী বিশেষ ভাব এই ছিল যে তিনি কোন একটী নবভাব ধারণার আয়ত্ত করিলেও যে পর্য্যন্ত তাহা সাধারণের প্রত্যক্ষীগোচর বা সহজে সুবোধ করাইতে সক্ষম না হইতেন সে পর্য্যন্ত তাহা কাহারও নিকটে কদাপি প্রকাশ করিতেন না। তদ্ধেতু তিনি

---

* তাঁহার পূর্ব্বে 'মায়ার' যদিও এই সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হর্শেল তাহার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি কদাপি অঙ্কের তালিকা ব্যবহার করেন নাই; কারণ তিনি প্রবন্ধ একস্থলে বলিয়াছেন,—"As I intended to view the heavens myself, Nature, that great volume, appeared to me to contain the best Catalogue.

† হর্শেলের মৃত্যুর পর ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে নক্ষত্রদিগের স্বকীয় গতি প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের কোন নির্দিষ্ট দিগ্বাহী গতিরই ফলমাত্র।

তাঁর উদ্দিষ্ট ফললাভে বিফল মনোরথ হইলেও কি উদ্দেশ্যে "যমকতারকা" পর্য্যবেক্ষণে নিরত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া ক্রমাগত ঐ পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত রহিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর তিনি অপর একটী তালিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে ৪৩৪টী 'যমকতারকার' স্থিতি ও গতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই তিনি "ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ প্রণালী" (On the Construction of the Universe) বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতেই প্রথমতঃ 'যুক্ততারকা' দিগের প্রকৃত স্বরূপের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন "গত ২৫ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণে যমকতারকাদিগের যে আপেক্ষিক স্থিতিবৈষম্য লক্ষিত হইয়াছে তদ্বিবরণ সহ তাহার কারণ নির্দ্ধারণ" বিষয়ে* অপর একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহাতে যুক্ততারকাদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফল হইতে গণিত সূত্র বলে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দর্শাইয়া দিয়াছেন। এই দুইটী প্রবন্ধ সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এ স্থলে অপর একটী প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

১৭৮৩ খৃঃ অঃ ২৭শে নবেম্বর 'জন মিচেল' নামক এক ব্যক্তি Royal Societyতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।† তাহাতে তিনি ইহা প্রকাশ করেন যে "হর্শেল যে সকল তারকাকে 'যমক' বা 'যুক্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাঁহাদের স্বরূপ ও স্থিতি পর্য্যালোচনা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন যে ঐ সকল তারকা যুগলের মধ্যে (সকল গুলি না হইলেও) অধিকাংশই এক একটী নক্ষত্রজগৎরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং ঐ তারকাযুগল পরস্পরের স্থিতি-সন্নিধানে থাকিয়া পরস্পরের আকর্ষণ-বল অনুভব করিতেছে! অতএব ইহা অতি সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত আকর্ষণবলে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে এবং এমত সময় বহুদূরাবস্থিত নহে যখন ইহাদের আবর্ত্তন কালও আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারিবে।"

অতঃপর মিচেল্ গণিতবলে ইহা দর্শাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে যদি মনে করা যায় যে এইরূপ একটী নক্ষত্রজগৎ আমাদের জ্ঞানগোচর করা যায় যাহাতে একটী নক্ষত্রকে বেষ্টন করিয়া অপর এক কিম্বা ততোধিক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতেছে তবে তাহার আবর্ত্তন কাল জ্ঞাত হওয়া সহজ হইবে; এবং মধ্যবর্ত্তী বা কেন্দ্রস্থানীয় নক্ষত্রের আপাতঃদৃষ্ট ব্যাস পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে তাহা হইতে অনায়াসেই (সূর্য্যের সহিত তুলনা দ্বারা ও তাহাকে 'ঘনতায়' (density) সূর্য্যের সমকক্ষ মনে করিয়া) নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব এবং পৃথিবী বা সূর্য্য হইতে ঐ নক্ষত্রদ্বয়ের দূরত্ব সাধন করা যাইতে পারে। অনন্তর তিনি ঐ স্বকীয় প্রবন্ধে আলোক ও তাহার গতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপেক্ষিক ব্যাস

* See Proceedings of the Royal Society, 1800—14, Vol. 1 pp. 138—49.

† See Abridged Transactions of the Royal Society, Vol. XV., pp. 403-79.

হইতে নক্ষত্রের 'গাঢ়তা' নিরাকরণের প্রণালীও দর্শাইয়াছেন। এস্থলে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমূল প্রবন্ধটী কেবলমাত্র অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া প্রণীত হইয়াছে; প্রথমতঃ, নক্ষত্রের আপেক্ষিক ব্যাস পর্য্যবেক্ষণ করা এযাবৎ মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই, তৎপর 'গাঢ়তা' নিরাকরণার্থ তিনি যে প্রণালী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আলোকের 'আণবিক জনয়নের' (Corpuscular propagation) উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে, অতএব আলোকবিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের সহিত ঐ প্রণালীর সমন্বয় করা যাইতে পারিতেছে না; এই হেতু নক্ষত্রের 'গাঢ়তা' নিরূপণ অদ্যাপিও মানবের সাধ্যের অনায়ত্ত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল অনুমান ও কল্পনা উপেক্ষা করিলেও, যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মিচেল্ তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা একান্ত উপেক্ষার বস্তু বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। এই প্রবন্ধেই আমরা দেখিতে পাই যে যুক্তভারকার প্রকৃত স্বরূপ প্রথম অভিব্যক্ত হইয়াছে; যদিও ইহা বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ হর্শেল্ ইহার বহু পূর্ব্বেই তাহাদের স্বরূপ জ্ঞানগোচর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু মিচেলের অনুমান (যাহা পরে হর্শেল সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন) প্রথম ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল!

এস্থলে ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কি মিচেল্‌কে 'যুক্তভারকার স্বরূপের' আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে? তদুত্তরে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে বিজ্ঞান অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহার মূল সত্যেতে প্রোথিত, 'প্রমাণ বচন' অনুসার বিধানপূর্ব্বক তাহার বর্দ্ধনের সহায়তা করে। মিচেল্ অনেক বিষয়েই অনুমানমাত্র করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সত্যাসত্য বিচারে উদাসীন হইয়া ঐ সকল অনুমানদ্বারা ফলসাধন পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হর্শেল্ সম্পূর্ণই তাহার বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—তিনি যাহা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই তাহা কেবলমাত্র অনুমানগ্রাহ্য করিয়া তদুপরি ফললাভে আশান্বিত হন নাই, বরঞ্চ যাহাতে অনুমিত বিষয় প্রমাণদ্বারা সত্যেতে পরিণত করিতে পারেন তজ্জন্যে সর্ব্বদাই প্রাণপণে যত্নবান ছিলেন। এই হেতু 'যুক্ত তারকার স্বরূপাবিষ্কার' হর্শেল্ ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি আরোপিত করা যাইতে পারে না! তিনি স্বীয় কার্য্যকে কেবল অনুমানে পর্য্যবসিত না করিয়া তাহাকে প্রমাণ বচনে ও গণনাতে সত্যাত্মক করিয়া গিয়াছেন!!

এক্ষণে মিচেলের প্রবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া হর্শেলের প্রথমোক্ত প্রবন্ধের সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ১৮০২ খৃঃ অব্দ ১লা জুলাই হর্শেল যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন তাহাতে তিনি গগনবিহারী নক্ষত্রমালাকে বারশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—

(১) অসম্বদ্ধ তারকা:—ইহারা এরূপভাবে অবস্থিত যে অপর কোন নক্ষত্রই তাহাদের উপর কোনরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ভৌতিক প্রক্রিয়া সংঘটন করিতে পারে না। সুতরাং এই

শ্রেণীর তারকা; ইহার সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ২১০ বৎসর কাল অতীত হয়, এবং আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে; অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত নক্ষত্র হইতে সূর্য্যের দূরত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা স্বপ্রমাণ হইয়াছে যে এই নক্ষত্র হইতে সূর্য্যের অধিকতর সান্নিধ্যে অপর কোন নক্ষত্রই বিদ্যমান নাই। হর্শেল প্রবন্ধের টীকাতে প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে এরূপ তারকা জগতে বিদ্যমান থাকা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ; কিন্তু তাহারা অপর সকল নক্ষত্র হইতে এতদূরে অবস্থিত যে তাহাদের উপর অপর কোন নক্ষত্রের কার্য্য বহু শতাব্দীতেও গণনা সাপেক্ষ করা যায় না। আমরা এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছি যে সূর্য্য গগনমার্গে কোন নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বনে পরিভ্রমণ করিতেছে; এরূপও অনুমান করা গিয়াছে যে এই পরিভ্রমণ কোন দূরস্থিত 'মহাসূর্য্যের' আকর্ষণজনিত।

(২) যমক তারকা:—ইহাদের সম্বন্ধে হর্শেল এইরূপ বলিয়াছেন, "ইহা একরূপ স্থির নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক দৃষ্টিরেখানিবদ্ধ নক্ষত্রমালা নহে; পূর্ব্বে যদিও এরূপ অনুমান করা গিয়াছিল এবং গগনে এরূপ নক্ষত্র বিরল নহে, কিন্তু এই শ্রেণীতে যাহাদিগকে ভুক্ত করা যাইতেছে তাহারা পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ-বলে আবদ্ধ হইয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভারকেন্দ্রকে বেষ্টনপূর্ব্বক উভয়ে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। পরে দৃষ্ট হইবে যে এই উক্তি গণনা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতে পারে, কারণ পদার্থবিজ্ঞান-বলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপর কোন নক্ষত্রের কার্য্য এইরূপ দুইটী নক্ষত্রের ক্ষেত্রবহির্ভূত থাকিলে, উভয়েই তাহাদের ভারকেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তন করিবে, এবং তাহাদের উভয়ের গতি সর্ব্বদা সমান্তরালভাবে থাকিয়া পরস্পরের বিপরীতদিগে নির্দ্দেশিত হইবে। আমি স্বয়ং যে সকল পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া অচিরে জগৎকে দর্শাইতে পারিব যে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে অনেক যুক্ততারকা স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের গতি প্রণালী উক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে যে অচিরে কোন কোন স্থলে তাহাদের আবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিব।" (এই স্থলেই আমরা প্রথমে হর্শেলের মুখে যুক্ততারকার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতেছি এবং তিনি যে প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র অনুমানলব্ধ ফল প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, বস্তুতঃ এতকাল তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইবার জন্যই পর্য্যবেক্ষণদ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন তাহার পরিচয় পাইতেছি।)

(৩) বহুমিলিত তারকা:—যমকতারকাস্থলে কেবলমাত্র দুইটী নক্ষত্রকে পরস্পর মাধ্যাকর্ষণবলে আবদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে যদি দুইটী তারকাই আকর্ষণ ক্ষেত্রান্তর্ভূত হইতে পারে তবে স্থলবিশেষে ততোধিক নক্ষত্রের ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। হর্শেল বলিতেছেন,—"এরূপ ব্যক্তি [illegible]

যুক্ততারকা আবার দূরবীক্ষণ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত না হয়; যাহাদের মধ্যে তিনটী কিম্বা চারিটী অথবা ততোধিক নক্ষত্র এক ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধরূপে দৃষ্ট হইতেছে। কালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে মাধ্যাকর্ষণ-বলে পরস্পর সম্বদ্ধ এক একটী জগৎ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে। অতঃপর হর্শেল এক সুদীর্ঘ গণনা দ্বারা তাহাদের সমষ্টির মধ্যকেন্দ্র নিরাকরণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঐ সকল নক্ষত্রের আবর্ত্তনের ক্রম পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাহা পর্য্যবেক্ষণ ফলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

(৪) তারকাপুঞ্জ :—গগনের নানাস্থানে দেখা যায় যে বহুসংখ্যক তারকা গগনের কোন একটী অপ্রশস্ত অংশে রাশীকৃত হইয়া পুঞ্জাকারে বিরাজ করিতেছে; ইহারা আকৃতিতে রেণুকাকার ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হয়, বস্তুতঃ তাহারা বহুদূরবর্ত্তী, এবং তাহাদের দৃষ্টি রেখা সমূহ পরস্পর অতিশয় সন্নিহিত বলিয়া একস্থানে এইরূপ রাশীকৃত দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ছায়াপথ' এইরূপ রাশীকৃত তারকার সমষ্টি দ্বারা গঠিত বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে; এবং ইহা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে যে ছায়াপথের একস্থলে কেবলমাত্র ৫ অংশমিত অপ্রশস্ত স্থানের ভিতর ৩৩১০০০টী তারকা বিরাজ করিতেছে। কেবলমাত্র দৃষ্টিরেখার সন্নিবেশ হেতু যে সকল তারকাপুঞ্জ বহুবন্ধিক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহারা এই শ্রেণী ভুক্ত।

(৫) তারকাস্তূপ :—ইহারা পরস্পর সন্নিধানে অবস্থিত বহুসংখ্যক সদৃশাকৃতিবিশিষ্ট তারকার সমষ্টিমাত্র। বহুবন্ধিক তারকার সহিত ইহাদের এই বিশেষ প্রভেদ যে বহুবন্ধিক-স্থলে যেরূপ পরস্পরের আকর্ষণজনিত গতি লক্ষিত হয়, এবম্বিধ স্তূপে তাহা হয় না। এ কারণ ইহাদিগকে ভিন্ন শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা কি বলে এইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা হর্শেল নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

(৬) তারকা রেণু :—এক এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে অনেকগুলি রেণুকাকার কিরণ তারকা স্তূপাকারে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের মধ্যকেন্দ্রের দিকে সমাকৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে ঐ তারকাসমষ্টির একটী নির্দ্দিষ্ট আকৃতি (প্রায়শঃ গোলাকার) লক্ষিত হয়, এবং ইহা প্রতীয়মান হয় যে এই আকৃতি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ও তাহার কেন্দ্রভাগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে। হর্শেল ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে এই সঙ্কোচন ও ঘনীভূত হওন বশতঃ ঐরূপ এক একটী তারকারেণুর সমষ্টি কালে এক একটী নক্ষত্রে পরিণত হইবে; এক্ষণে কেবল ইহাদের নক্ষত্রাকারে গঠিত হইবার পূর্ব্বাবস্থা মাত্র।

(৭) নীহারিকা :——(৪) (৫) ও (৬) সংখ্যক নক্ষত্রশ্রেণীতে যে সকল তারকার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র তারকাগুলি পরস্পর অসংলগ্নভাবে জ্যোতিঃকণারূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখন পর্য্যবেক্ষণকালে সচরাচর ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় যে অনন্ত কতকগুলি 'কণা' রহিয়াছে যাহাদের অঙ্গীভূত 'তারকা' গুলিকে অসম্বদ্ধ বলিয়া অনুভব করা যায় না কিন্তু বাষ্পাকারে অবস্থিত 'নক্ষত্রাণু' বলিয়া অনুমান হয়। এই সকল জগৎকে নীহারপুঞ্জ বা নীহারিকা বলা যায়। ইহাদিগকে নক্ষত্রজগতের

আদিম অবস্থা বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে ; এই সকল নীহারপুঞ্জ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া নক্ষত্ররেণুতে এবং তাহা হইতে ক্রমে সুগোলাকারবিশিষ্ট নক্ষত্রে পরিণত হয়।

(৮) কদম্বতারকা :———সাধারণতঃ গগনে আমরা যে সকল নক্ষত্র নেত্রগোচর করিয়া থাকি তাহারা সকলই এক একটী আলোক মণ্ডিত জ্যোতিক বিন্দুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু দূরবীক্ষণ সাহায্যে বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে কোন কোনটী এরূপ যে তাহা কেবল মাত্র একটী নির্দ্দিষ্ট জ্যোতিষ্ক বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয় নাই, তাহার চতুর্দ্দিকে একটী আলোকজাল তাহাকে কুয়াসাকারে সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহার মধ্যবিন্দুটী অপেক্ষাকৃত অধিক তেজোময় লক্ষিত হইয়া থাকে। হর্শেল অনুমান করিয়াছেন যে ইহা কোন অতি দূরস্থিত 'তারকারেণু'; দূরাবস্থানহেতু রেণুসকলের দৃষ্টিরেখা পরস্পর অতি সন্নিহিত হওয়াতে রেণুস্তূপের মধ্য-বিন্দুকে আলোকের সমষ্টি বা জ্যোতিকবিন্দুরূপে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বাবয়ব অস্পষ্টরূপে আলোকিত এবং পার্শ্বদেশ হইতে ঐ আলোক ক্রমশঃ মধ্যভাগের দিগে ঘনীভূত হইয়া বিকাশিত হইয়াছে ; দেখিলে ঠিক কদম্বফুল বলিয়া মনে হয়।

(৯) নীহারচ্ছায়া :———এই জাতীয় জ্যোতিকের যথার্থ অস্তিত্ব বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন ; হর্শেল স্বয়ং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তিনি বলিতেছেন "গগনপর্য্যবেক্ষণ কালে সময় সময় দেখা যায় যেন কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন 'তারকাপুঞ্জ, (৪ নং দেখ) পরস্পর পাশাপাশি সংলগ্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাদের সমষ্টিকে কখনও বা নীহারমালা-পরিবৃত 'ছায়াপথের' আভাস বলিয়া মনে করা যায়, অতএব তাহাদিগকে 'নীহারচ্ছায়া' বলা যাইতে পারে। দূরত্বনিবন্ধন তারকাপুঞ্জের অন্তীভূত নক্ষত্রগণ নীহারাকারে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে ঐ সকল 'নীহারচ্ছায়ার' মধ্যে কোন কোনটী বহুদূরবর্ত্তী না হইতে পারে ; সে স্থলে ইহাদিগের 'নীহার-প্রকৃতি' বাস্তবিক প্রকৃত বলিয়া অনুভূত হয় এবং তাহাদিগকে যথার্থই 'নীহারচ্ছায়া' বলা যায়। 'কালপুরুষের' অন্তর্ভূত যে এরূপ একটী 'নীহারচ্ছায়া' পর্য্য-বেক্ষিত হইয়া থাকে তাহাকে এই জাতীয় অর্থাৎ প্রকৃত 'নীহারচ্ছায়া, বলিয়া প্রমাণ করা যায়। এই সকল জ্যোতিকের স্বরূপ এই যে ইহারা পরস্পর বিভিন্ন 'গাঢ়ত্ব'বিশিষ্ট 'নীহারপুঞ্জের' সমষ্টিদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে ; দেখিলে এরূপ মনে হয় যেন কতকগুলি বিভিন্ন আকারের নীহারমালা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া গগনে বিরাজ করিতেছে।

(১০) নীহারতারা :———ইহারা দেখিতে ঠিক অষ্টম জাতীয় জ্যোতিকের ন্যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই একটী জাতিগত পার্থক্য রহিয়াছে যে অষ্টম জাতীয় 'কদম্ব তারকা' সকল প্রকৃতপক্ষে এক একটী বিচ্ছিন্ন নক্ষত্র নহে ; তাহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র তারকারেণুর সমষ্টিমাত্র। 'নীহারতারা' পর্য্যবেক্ষণ কালে তাহার মধ্যভাগ একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কাকারে লক্ষিত হয় এবং ঐ জ্যোতিকের চতুষ্পার্শ্বে বায়ুস্তরের ন্যায় আলোকস্তর

ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বহির্দ্দিকে প্রসারিত হয়। হর্শেল সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে খণ্ডাকার নীহারিকা সকল মাধ্যাকর্ষণবলে ক্রমশঃ ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতেছে; অতএব তাহাদের মধ্যস্থল ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া কঠিন পদার্থখণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং তৎচতুস্পার্শ্বে নীহারস্তর তাহাকে বাষ্পাকারে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

(১১). গ্রহনীহারিকা:——স্থানে স্থানে খণ্ডাকার নীহারিকা সূর্য্য কিম্বা কোন স্থিরনক্ষত্রকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়, ইহাদিগকে 'গ্রহনীহারিকা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

(১২) সকেন্দ্রগ্রহনীহারিকা:——যখন গ্রহ নীহারিকা সকল ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রস্থলে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে তখন তাহারা গ্রহাকার ধারণ করিবার পূর্ব্বাবস্থাতে উপনীত হয়; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাহারা অপরাপর গ্রহদিগের ন্যায় কঠিন অবয়ববিশিষ্ট হয় না, তাহাদের চতুর্দ্দিক নীহারবাষ্পে আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের সহিত 'নীহারতারার' জাতিগত পার্থক্য না থাকিলেও অবস্থাগত পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ 'নীহারতারা' অপর কোন নক্ষত্র হইতে এতদূরে অবস্থিতি করে যে তাহার উপর অপর কোন নক্ষত্রের আকর্ষণ কার্য্যকারী হয় না; কিন্তু 'গ্রহনীহারিকা' সকল কোন নক্ষত্রের আকর্ষণ ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত হওয়াতে তাহারা ঐ আকর্ষণবলে চালিত হইয়া উক্ত নক্ষত্রকে বেষ্টনপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে হর্শেল কত বিশিষ্টরূপ অনুধাবন ও পর্য্যালোচনপূর্ব্বক নক্ষত্রদিগের জাতি বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সংজ্ঞাদৃষ্টে সহজেই অনুভূত হইবে যে (৪) (৫) ও (৬) সংখ্যক তারকাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা কত আয়াসসাধ্য! কিন্তু (৮) ও (১০) জাতীয় তারকাদিগের মধ্যে দর্শনজনিত কোন পার্থক্য লক্ষিত না হওয়া সত্বেও তাহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া অনুমান ও শ্রেণীবিভাগ করিতে সচেষ্ট হওয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক!!

এই সকল শ্রেণীবিভাগের পর হর্শেল উক্ত প্রবন্ধে শেষোক্ত ছয় শ্রেণীর জ্যোতিষ্কদিগের এক তালিকা প্রদান করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ৫০০ তারকার নাম ধাম ও রূপাদি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই তালিকাদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে হর্শেল কত সবধানতার সহিত গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ অপক্ষপাতিতা ও সতর্কতার সহিত তারকাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন,—কোন কোন তারকা আকৃতিতে সদৃশ হইলেও প্রকৃতি বিচারপূর্ব্বক কিরূপে তাহাদিগের প্রকৃত জাতি নির্ণয় করিয়াছিলেন!

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

লানুকরানের উজীর।*

এই আজব নাটকের সবিশেষ বৃত্তান্ত চারি অঙ্কে সন্নিবিষ্টও সমাপ্ত হইয়াছে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মীর্জা হবীব। লানুকরানের খাঁর উজীর।

হায়দার। উজীরের ফরাশ।

করীম। উজীরের সহিস।

আকা বাশীর। উজীরের নাজির।

উজীরের ফরাশদিগের আর কয়েক জন।

জীবাখানুম্। উজীরের জ্যেষ্ঠাপত্নী।

শোলিখানুম। উজীরের কনিষ্ঠা ও প্রেয়সী পত্নী এবং নিসাখানুমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

নিসা খানুম্। উজীরের শ্যালিকা ও তৈমুর আকার প্রণয়িণী।

পরী খানুম্। উজীরের শ্বশ্রু, যিনি কনিষ্ঠা কন্যা নিসাখানুমের সহিত উজীরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

খোজা আকামসুদ। উজীরের খোজা।

খাঁ। লানুকরানের শাসনকর্ত্তা।

[illegible] আকা। খাঁর সর্দার চাকর।

[illegible] বেগ। খাঁর নাজীর।

[illegible] বেগ। নায়েব ও দেউড়ীর অধ্যক্ষ।

[illegible] বেগ। খাঁর সর্দার ফরাশ।

দেউড়ীতে আরজদার আসামী ও ফরিয়াদীর চারিজনা।

খাঁর দেউড়ীর ফরাশদের কয়েকজনা।

[illegible] আমীর ও ওমরাহদিগের কতিপয়। গোলাম পঞ্চাশজন।

তৈমুর আকা। খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিসাখানুমের প্রণয়ী।

[illegible]। তৈমুর আকার ধাত্রীপুত্র।

[illegible]। সওদাগর।

[illegible]। লানুকরানের বাসেন্দা।

---

* মূল পারস্য হইতে অনুবাদিত।

প্রথম অঙ্ক।

[পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে, কাস্পিয়ান্‌ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সহর লান্‌করানে, মির্জা হবীব জীরের গৃহে এই দৃশ্য সংঘটিত হয়। উজীর অন্তঃপুরের সম্মুখবর্ত্তী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট, এবং াজিসালি তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান]

উজীর। হাজি সালি, শুন্‌লেম তুমি রাশ্‌ৎ যাচ্ছ? সত্যি নাকি?

হাজিসালি। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাচ্ছি।

উজীর। হাজি সালি আমি তোমার উপর একটা কাজের ভার দিতে চাই, আমীর হয়ে তামায় সেটা কর্ত্তে হবে। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলেম।

হাজি। আজ্ঞে করুন, দিল্‌জান দিয়ে সরকারের ফরমায়েস পালন কর্ত্তেই হুজুরে াজির আছি।

উজীর। দেখ হাজি, রাশ্‌তে একটা নীলরঙের জরির আঙ্গিয়া তৈরি করাতে হবে, মন আঙ্গিয়া যেন আজ পর্য্যন্ত লান্‌করানে কেউ না দেখে থাকে। আঙ্গিয়া তৈরি হলে াকরাকে দিয়ে চব্বিশটা সোনার বোতাম গড়াবে—বোতামগুল যেন মুরগীর ডিমের চেয়ে ছু ছোট, পায়রার ডিমের চেয়ে কিছু বড় বড় হয়, তারপর সেই বোতামগুল আঙ্গিয়ার ার চারিধারে লাগাতে দেবে। ফের্‌বার সময় তুমি নিজে সঙ্গে করে এনো; এই নাও ই পঞ্চাশ মোহর (কাগজ মণ্ডিত মুদ্রা সম্মুখে রক্ষণ) যা লাগে সব দিও, যদি এতে কম পড়ে য়ে এলে হিসেব মেটান যাবে। তুমি শীগ্‌গির ফির্‌ছত? না কি?

হাজি। মাসখানেকের মধ্যেই ফির্‌ব; আমার বিশেষ কোন কাজ নেই। নগদ টাকা য় যাচ্ছি, রেসম কিনেই চলে আস্‌ব। কিন্তু হুজুর, আঙ্গিয়ার মাপটা জান্‌তে পার্‌লে খুব ল হত, কেননা সেখানে সেলাই হবে হয়ত বেশী সরু বা বেশী মোটা, কি বেশী খাট বা শী লম্বা হয়ে পড়বে, তাহলে হুজুরের ফরমায়েসটী নিখুঁত রকম সেরে আস্‌তে পার্‌ব না।

উজীর। একটু লম্বা কি মোটা থাক্‌লে ক্ষতি নেই। গায়ে ঠিক না হলে এখানে রস্ত করে নেওয়া যেতে পারে।

হাজি। আজ্ঞে যদি আমি কাপড় কিনে, বোতাম গড়িয়ে এখানে নিয়ে আসি তাহলে চলে না? যিনি পর্‌বেন তাঁর গায়ের মাপে কেটে তাহলে এখানেই আঙ্গিয়া সেলাই ই পারে।

উজীর। আরে খোদার বান্দা! তোমাদের সকলেরই কেমন একটা বেশী কথা কয়ে ঝর বিতে কলান অভ্যেস। তোমার আসল মতলবটা এই যে এর রহস্যটা তোমায় খুলে ! আরে, আহাম্মকি এখানে গায়ের মাপ নিয়ে জামা সেলাই কর্ত্তে দিলে কিরকম াকাণি ফিসির ফিসিরের পাল্লায় পড়্‌ব? কি দুর্গ্রহ ভোগ কর্ত্তে হবে?

হাজি। আজ্ঞে না মশায়, আমি তার কি জানব বলুন ?

উজির। তাহলে দেখ্‌ছি তোমায় আগে থাক্‌তে সব খুলে বল্‌তে হল, না হলে এখুনি হয়ত বাজারে গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা হলেই রাষ্ট্র করে দেবে উজীর তোমায় এই রকম এই রকম কাজের ভার দিয়েছে, আর আমার শান্তি অসম্ভব করে তুল্‌বে, দুদণ্ড নিশ্চিন্তি হয়ে বস্‌তে পার না। বন্ধু হে, ব্যাপারখানা এই—আর দুমাস পরে নওরুজের পরব আস্‌ছে আমি সেদিন শোলি খান্নমকে একটা কিছু আজব জিনিষ উপহারদিতে চাই। এখন আমি যদি আঙ্গিয়াটা এখানে তৈরি কর্ত্তে দিই তাহলে জীবাখান্নমও ঐরকমের একটা চাবে, তাকে আবার দিতে গেলে আমার খরচ অনেক বেড়ে যাবে অথচ তার সৌন্দর্য্যও তাতে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পাবে না, আর না দিলে তার গজর গজরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব না, আমার প্রতিদিনকার অন্ন শিরঃপীড়ার কারণ হবে, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌বে।

হাজি। কিন্তু মশায় শোলিখান্নম্‌কে যখন আঙ্গিয়টা দেক্কেন তখন কি জীবাখান্নম ঐ রকমের একটা চাবেন না ?

উজীর। আল্লা হো আক্‌বর ! কি বিপদেই পড়া গেছে ! আরে মানবক ! তোর সে খবরে কাজ কি ? তোকে যা বলা গেছে তাই করগে না ! শোলিখান্নম্‌কে আঙ্গিয়া দেবার সময় আমি বলব আমার বোন রাশ্‌তের হিদায়ৎ খাঁর স্ত্রী এই জামা শোলিখান্নমের জন্যে সওগাত পাঠিয়েছে, তাহলে আর জীবা খান্নম তার প্রতি আমার তাচ্ছিল্য ধরে খোঁটা দিতে পার্‌বে না। কিন্তু তুমি আমার কথার একটী অক্ষরও কাউকে বল্‌বে না ত হে ?"

হাজি। আজ্ঞে না মশায়, আপনার ঘরের কথা বাইরে রটিয়ে আমার কি লাভ বলুন ? আর সে কি আমার দাড়ীর যোগ্য ?

উজীর। আল্লা তোমায় সেলামতে রাখুন। আচ্ছা এখন যেতে পার। (হাজি সালির সেলামান্তর নিক্রমণ। তাহার পশ্চাৎ জীবা খান্নমের হঠাৎ সজোরে দুই হাতে গৃহের অপর দ্বার ঠেলিয়া ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ, আকস্মিক শব্দে চমকিত হইয়া উজীরের ভীতভাবে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত)

জীবাখান্নম্‌। বটে ! আদুরে স্ত্রীর জন্যে গলায় সোনার বোতামওয়ালা আঙ্গিয়া ফরমাস দেওয়া হচ্ছে ! আল্লা তোমার মর্দানির কুশল করুন ! আমায় তুমি বল্‌বে "আমার বোন হিদায়ৎ খাঁর স্ত্রী শোলিখান্নম্‌কে এই জামা সওগাত পাঠিয়েছে ?" আল্লা হে ! তোমার বোনের নাম করে বল্‌বে ! যার কিপ্‌টেমি ইস্‌পাহানী সওদাগরের তুল্য,—কাচের ভিতর পনীর রেখে বাইরে রুটী ঘসে ! আজ সে হঠাৎ পঞ্চাশ বাট মোহরের আঙ্গিয়া তোমার স্ত্রীকে সওগাত পাঠাতে যাবে ! অর্থাৎ আমি এমনই আহাম্মক যে ঐ কথায় বিশ্বাস করব।

উজীর। মাগী তুই যে আমার ভয় পাওয়ালি ! কিসের সওগাৎ ? কোথাকার আঙ্গিয়া ? তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি ?

জীবা। আর চালাকী কর্ত্তে হবে না, অমন করে কথা উল্টে নিতে হবে না। তুমি হাজি সালিকে যা যা বলেছ আমি তার আদ্যোপান্ত হরফকে হরফ সব শুনেছি। যখন হাজিকে ডাকতে পাঠালে তখনই আমি বুঝেছিলুম, তখনই আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল, চুপি চুপি ঐ কবাটটার আড়ালে এসে দাঁড়ালুম, কান পেতে সব শুনলুম, যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। আল্লা করুন গলায় সোনার বোতামওয়ালা সেই আঙ্গিয়া যেন তোমার স্ত্রীর পয়মন্তর হয়। আহা তৈমুর আকার চোখ কি রোশনাই হয়ে উঠবে! তার প্রেয়সীর জন্যে নতুন জামা ফরমাস হয়েছে! সেই জামা পরে তৈমুরের সামনে সে কত হাবভাব করবে।

উজীর। বুড়ি! বাজে বক্‌ছিস্ কেন? আর কদ্দিন পর্য্যন্ত তোর বেয়াদব জীবের সংযম করবিনে? তোর কিছু লজ্জা নেই? আমার মুখের সামনেই আমার পরিবারের কুৎসা করছিস? আমার ঘরের বদনাম কর্ত্তে চাস্?—আদবজ্ঞান সংসারে বড় ভাল জিনিষ, কি লজ্জা!

জীবা। হ্যাঁ, আমি যদি তোমার ঘরের বদনাম কর্ত্তে চাইতুম তাহলে একটা সুন্দর হোন যুবপুরুষকে হাত করে তার সঙ্গে প্রণয় কর্ত্তেম! তোমার বড় আদরের আদরিণীই তোমার ঘরের বদনাম করছেন। রাত নেই দিন নেই তাঁর হাত তৈমুর আকার গলা জড়িয়েই রয়েছে। আমার বাঁদী কতবার না তাদের স্বচক্ষে দেখেছে।

উজীর। (বিবর্ণ হইয়া) তোর কিম্বা তোর বাঁদী কারো কথাই আমি বিশ্বাস করিনে।

জীবা। আমি একলা একথা বল্‌ছিনে। লানকরানের সবাই এ খবর জানে। তারা বলে তুমি চোখ বুঁজে বসে আছ, চকোরের মত বরফের নীচে মাথা পেতে রয়েছ। তোমার নিজের ভাল মন্দ নিজে বোঝ না, আর মনে কর পরেও বোঝে না।

উজীর। তুমি কি বল্‌ছ কি? শোলি তৈমুর আকার কি জানে? তাকে দেখ্‌লে কোথায়?

জীবা। তুমি নিজেই দেখিয়েছ, নিজেই চিনিয়ে দিয়েছ।

উজীর। (উচ্চৈঃস্বরে) আমি দেখিয়েছি? আমি চিনিয়ে দিয়েছি?

জীবা। আজ্ঞে হ্যাঁ তুমিই দেখিয়েছ, তুমি না ত কি আমি দেখাতে গিয়েছিলুম না কি? রমজানের মাসে ইদের দিন তোমার প্রেয়সীকে বল্লে না "খাঁ আজ কেল্লার বাইরে সাহাজাদদের কুস্তি করাচ্চেন, তুমি ও নিশাখানুম বাঁদী আর খোজাকে সঙ্গে নিয়ে এস, কেল্লার পাঁচিলের তলার রাস্তায় উপর ফরাস বিছিয়ে বসে তামাসা দেখো?" ওরা সবাই দেখতে গেল। সেখানে পঁচিশ বছরের টাট্‌কা যুবো, সুপুরুষ, জোয়ান, তৈমুর আকা আর সব সাহাজাদদের হারিয়ে দিলে, আর শোলি খানুম এক প্রাণে নয় হাজার প্রাণে মুগ্ধ হল। তারপর কে জানে কি ফন্দি করে তাকে হাত করে এনেছে। এখন যদি একদিন তাকে না দেখে ত ঠাণ্ডা হয় না। আমি তখনই তোমায় বলিনি যে এই বয়সে অমন ছুঁড়ী তোমার সাজে না? আমার কথা যেমন শুনলে না, এখন তেমনি তার ফল ভোগ কর।

উজীর। আচ্ছা বেশ! তুমি যাও এখান থেকে—ব্যস্! ঢের হয়েছে, আমার কাজ আছে— একলা থাকতে দাও—বেরোও!

জীবা। (নিষ্ক্রমণকালে মৃদুস্বরে বিড় বিড় করণ) আমি কেন বেরোতে যাব? তোমার সোহাগিনী তার উপপতিকে নিয়ে বেরোক,— তা তুমি যেমন লোক তোমার পক্ষে ঠিকই হয়েছে।

উজীর। (একাকী) আমার মনে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে শোলি খানুমসাহেবা এই কাজ করেছে। কিন্তু এ খুব সম্ভব বটে যে তৈমুর আকার বলবীর্য্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে, আর বোকা মেয়ে কিছু না ভেবে চিন্তে এর ওর কাছে তার প্রশংসা করেছে, তার পরে বুড়ী হিংসেতে তার কথার উল্ট ব্যাখ্যা করে তাকে ফাঁদে ফেল্‌তে চায়। যাহোক শোলির মন থেকে এ ভাবটা দূর করা ভাল, কোন না কোন রকম করে তাকে জানান দরকার যে তৈমুর আকা এমনই কিছু বলবান নয়। সে কুস্তিতে যাদের পেড়ে ফেলেছিল তারা নিতান্ত বাচ্ছা, হয় ত এই উপায়ে তৈমুরের গুণ তার মন থেকে দূর হতে পারে, তাহলে আর তার নাম মুখে আন্‌বে না। এখন উঠে খাঁর ওখানে যাই, তারপরে ফিরে এসে তার ঘরে গিয়ে দেখ্‌ব কি কর্ত্তে পারি। (উত্থান)

জীবা। (প্রবেশান্তর) আজ হাজ্‌রি আর খানায় কি খেতে সাধ হয় বলে দাও, তাই রাঁধুবে।

উজীর। তুমি আমাকে এত কাঁটা আর বিষ খাইয়েছ যে আর এক মাস কিছু না খেলেও আমার পেট ভরা থাকবে।

(গমনোদ্যম। গৃহমধ্যে একটা চাল্‌নি পড়িয়া রহিয়াছে, দ্বারের দিকে চাহিয়া সচিন্তিত-ভাবে যাইতে যাইতে চাল্‌নির কানাচের এক প্রান্তে পা লাগিয়া অপর প্রান্ত লাফাইয়া তাঁহার জানুতে আঘাত। জানু ধরিয়া মুখ বিকৃত করিয়া, উপবেশন পূর্ব্বক স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া) আঃ মারা গেলেম! এখানে এ চাল্‌নি কি করছে? পোড়া বাপের মেয়ে!

জীবাখানুম। (সবিস্ময়ে) আমি কি জানি? এখানে চাল্‌নি কি করছে আমি কেমন করে বলব? ঘরে এলেই আমার সঙ্গে ঝগড়া আর গালাগালি! আর একজন আজিয়া পক্ষ আমি শুধু গাল খেয়ে মরব!

উজীর। ফরাস!

(হায়দার ফরাসের দালান হইতে গৃহে প্রবেশান্তর বক্ষে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক শিরোনমন। জীবাখানুমের মুখ ঢাকিয়া গৃহের এক কোনে গমন)।

উজীর। (সক্রোধে) হায়দার! ঘরের মাঝে এই চাল্‌নি কি করছে?

হায়দার। হুজুর, ভোর বেলায় আমি যখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেম করিম সইস চাল্‌নি হাতে করে এখানে আসে, দু একটা কথা কয়েই চলে যায়। বোধ হয় সেই এখানে চাল্‌নিটা ফেলে চলে গেছে।

উজীর। সেই বদমায়েস সইসকে ডাক্ দিকিন, একবার দেখাই মজা! (ফরাসের দালানের

উদ্দেশে নিক্ষেপণ)-আল্লা হো আকবর! সইসের আমার ঘরে কি কাজ? চাল্‌নি আমার ঘরে কি করে? আজ চারদিক থেকেই আমার ঝালাপালা করে তুলেছে। যতবার এই ঘরটায় ঢুকি একটা না একটা কিছু ফ্যাসাদে না পড়ে আর বেরোতে পারিনে।

জীবাখাতুন। ভাত হবেই, গোলিখাতুম এখানে নেই কি না! তা যদি তাই হয়, তবে আর এখানে আস কেন? গোলিখাতুমের ঘরেই হামেষা যেতে পার না?

(ফরাস ও সহিসের প্রবেশ)

উজীর। (অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া) ছোঁড়া! করিম! আমার ঘরে তোর কিসের দরকার? তোর জায়গা আস্তাবল! তুই কোন্ সাহসে আমার ঘরে পা দিয়েছিলি? পোড়া বাপের ছেলে!

সহিস। হুজুর আমি এক মিনিটের জন্যে হায়দারকে জিজ্ঞেস কর্ত্তে এসেছিলেম আপনি আজ ঘোড়ার চড়বেন কি না! জিজ্ঞেস করেই তখুনি বেরিয়ে গিয়েছিলেম।

উজীর। তবে এ চাল্‌নি এখানে ফেলে গিয়েছিলি কেন?

সহিস। ঘোড়াদের দানা ঝেড়ে দেবার জন্যে চাল্‌নি আমার হাতে ছিল। আমি ভুলে এখানে ফেলে গিয়েছিলেম।

উজীর। তবে পরে নিতে এলিনে কেন?

সহিস। আমার একবারও মনে হয়নি যে এখানে ফেলে গেছি, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উজীর। (প্রথমে সহিসকে পরে হায়দারকে) হারামজাদা তোর মন তখন কোথায় ছিল?

আকা বাশীর নাজীরকে এক্ষুনি এখানে ডেকে আন্, লাঠি আর খুঁটি সঙ্গে করে আনিস্, আর বাইরে থেকে তিনজন ফরাসকে এখানে আসতে বল্।

সহিস। (কাঁপিতে আরম্ভ করিয়া ও সরোদনে) ধর্ম্মাবতার! খাঁর দোহাই! এবার আমার মাপ কর্ত্তে আজ্ঞা হোক্।

উজীর। (ক্রোধবশতঃ চাপাস্বরে) চোপ রও কুত্তকি এক্কা।

সহিস। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি হুজুরের কুরবানি হই, কসুর করেছি, মাটি খেয়েছি! হুজুরের বাপজানের কবরের দোহাই আমার মাপ করুন। আমার কসুর হয়েছে, আমার বাপের কসুর হয়েছে, আমার মায়ের কসুর হয়েছে আর কখন আমি এখানে পা দেব না।

উজীর। চোপরাও গাধে কি বাচ্ছা!

(এতদণ্ডে আকা বাশীর নাজীর, যষ্টি হস্তে হায়দার ফরাস ও আর তিনজন ফরাসের প্রবেশ ও অভিবাদন)

উজীর। (ফরাসদিগের প্রতি) নাজীরকে মাটিতে ফেল্, খুঁটিতে ওর পা বাঁধ্।

(ফরাসদের নাজীরকে ভূমে পাতন, এবং খুঁটি ঠিক করিয়া পাদবন্ধন। দুইজন ফরাসের খুঁটি ধারণ ও দুইজনের যষ্টি গ্রহণ)

উজীর। মার্।

(ফরাসদের প্রহার)

নাজীর। হুজুর! আমার জান! আপনার মাথা খবরদারি করি। আমার কি কসুর হয়েছে যে এরা আমায় মার্‌চে?

উজীর। (সক্রোধে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই চাল্‌নি ঘরের ভিতর কি কর্‌ছে?

নাজীর। কোন্ চাল্‌নি ধর্ম্মাবতার?

উজীর। দু ঘা লাঠি খেলে তখন বুঝ্‌বে কোন্ চাল্‌নি।

(ফরাসদের প্রহার)

নাজীর। হুজুর মাফ করুন! হুজুর ইন্‌সাফ করুন! আপনার মাথা খবরদারি করি! নিদেন আমায় জান্‌তে দিন আমার কসুর কি! আপনার কুর্‌বানি হই! আমার কসুর কি আগে বলুন, তারপরে আমার গর্দ্দান নিতে চান নেবেন, যা খুসী কর্‌বেন!

উজীর (ফরাসদের প্রতি) থাম্! আকা বাশীর তোমার কসুর এই, দেউরীর চাকরদের কর্ত্তব্য তুমি তাদের বুঝিয়ে দাওনি, আর দেউরির কাজের তদারকের ভার তোমারই উপর দেওয়া আছে। তোমার প্রত্যেককে তাদের নির্দ্দিষ্টস্থান ও কাজ বলে দেওয়া উচিত, তাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আস্তাবলের সইস আস্তাবল ছাড়া আর কোন জায়গায় পা দেবে না। আমার ঘরের মধ্যে চাল্‌নি ফেলে যাবে না। আজ করিম সইস চাল্‌নি হাতে করে আমার ঘরে ঢুকে চাল্‌নি ফেলে চলে গেছে। আমি দৈবাৎ তার কানায় পা দিয়েছি, তার অন্য ধার লাফিয়ে উঠে আমার হাঁটুতে লেগেছে, এখন পর্য্যন্ত বেদনায় পা নাড়াতে পাচ্ছিনে। আমি একটা বড় রাজ্যের শাসনভার চালাই, আর তুই নির্ব্বোধ গাধা! একটা বাড়ী আর বাড়ীর চাকরদের চালাতে পারিস নে?

নাজীর। হুজুর খোদা আপনার বুদ্ধি বিচক্ষণতা অনেক বড় করেছেন, আমি কেমন করে আপনার মত হতে পার্‌ব?

উজীর। (ফরাসদের প্রতি) মার্!

নাজীর। আপনার মাথার দিব্য ধর্ম্মাবতার এবার আমায় মাফ করুন, আর কখন এমন কাজ হবে না।

উজীর। আচ্ছা যখন কসম খেয়েছে ওকে ছেড়ে দে, ঢের হয়েছে। আকা বাশীর এবার

তোমায় মাফ কর্‌লেম, কিন্তু যদি এর পরে আর কখন আমার ঘরে চাল্‌নি দেখ্‌তে পাওয়া যায় ত নিজেকে মরা জেনো।

নাজীর। (উঠিয়া) আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

উজীর। যাও! বেরোও!

সহিস। (স্বগত) আল্লা ধন্য!

(চাল্‌নি কুড়াইয়ালইয়া সকলের অগ্রে তাহার নিস্ক্রমণ, এবং অন্যদের তাহার পশ্চাদানুসরণ)

যবনিকা পতন।

শ্রীসরলা দেবী।

আর একবার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ল]ক্ষ্ণৌ নগরীর গোমতীতীরে কুঞ্জলাল শেঠের সুন্দর ভবন শোভা পাইত। জনকোলাহলময় [প্র]শস্ত রাজপথের দিকে বাড়ীর সদর; অন্দরমহলের অব্যবহিত পার্শ্বে গোমতীনদী অবিরাম [ব]হিয়া যাইত। ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গমালা নিশিদিন শেঠ ভবনের চরণ চুম্বন করিত। দ্বিতল [প্র]কোষ্ঠের পর্য্যঙ্কে বসিয়া শেঠ-ললনাগণ গোমতীর মুক্তবায়ু উপভোগ করিতেন। নদীতীরবর্ত্তী [স]নবিন্যস্ত বনশোভা, তরণীশোভিত পালের অমলধবল শ্রী, উড্ডীয়মান দলবদ্ধ অসংখ্য বিহঙ্গের [স]মবেত কাকলী, শিখাধারী মেড়ুয়াগণের সবলহস্তনিক্ষিপ্ত দাঁড়ের শব্দের সহিত তাহাদের [দু]র্ব্বোধ্য বিরহ-গীতি গোমতীতীরবাসীগণের যুগপৎ চক্ষু কর্ণের প্রসাদন করিত। নদীজল [হ]ইতে গৃহের সহিত প্রস্তরঘাট সংযুক্ত ছিল; সেই খানে একদিন কুঞ্জলাল শেঠ বসিয়া নদী [দে]খিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, গোমতীর তরঙ্গতাড়ন এখন [না]ই; বরষায় আতটপূর্ণা গোমতী উদ্দাম যুবতীহৃদয়ের ন্যায় সচঞ্চলে বহিয়া চলিয়াছে। [অ]সংখ্য বাত্যাহত বৃক্ষাবলী, ভগ্নশাখা, পক্ষীকুলায়, ভগ্নমাস্তুল, পর্ণকুটীর ঝটিকাবসানে স্রোত-[জ]লে ভাসিয়া আসিতেছিল। শান্ত গোমতী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভীষণ ঝটিকার সহিত তরঙ্গরঙ্গে [মা]তিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহার শরীরে তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। [এ]মন সময় একটি বৃহৎ বৃক্ষের ভগ্নাংশের সহিত রজ্জুবদ্ধ কি একটা পদার্থ স্রোতাবেগে [এ]ইদিকে আসিতে লাগিল। কুঞ্জলাল শেঠ কি সন্দেহ করিয়া তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। [সো]পান নিম্নে অবতরণ করিয়া বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেন, একটি সুকুমার [বা]লকের দেহ ভাসমান বৃক্ষের সহিত রজ্জুবদ্ধ হইয়া আসিতেছে! কুঞ্জলাল সমগ্র সোপান অবত[রি]ত হইয়া হাত বাড়াইলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্রোতে ঝাঁপ [দি]য়া সাঁতার দিয়া ত্বরিত যাইয়া বালককে একহস্তে ধারণ করিলেন। ঘাটে ফিরিয়া [আ]সিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, দুরন্ত ঝটিকা কাহার সর্ব্বনাশ করিয়া [এক]টি তিন বৎসর বয়স্ক সুন্দর বালককে তাহার মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। [সে]ই খানে শেঠ গৃহের সকলে এতক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল; বালকের মৃতকল্প শরীর [দে]খিয়া কুঞ্জলাল এবং তাঁহার পত্নী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বালককে [র]জ্জুবদ্ধাবস্থায় ভাসিতে দেখিয়া সকলে স্থির করিলেন, এই দুরন্ত ঝড়ের কোন [নৌ]কাডুবির সময় ইহার নৌকাযাত্রী পিতামাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণাধিক [বাল]ককে বাঁচাইতে ঐ অন্তিম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ সকলেই বালকের

জীবনে হতাশ হইল, জীবনের কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না; কিন্তু অনেকক্ষণ অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার পরে ক্রমশঃ শরীরে উত্তাপ পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে বালক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শেঠপত্নী আশান্বিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, 'আহা, কার এমন কোল ভরা ছেলে!' সহানুভূতির সদ্যোজ্ঞ অশ্রুবিন্দু তাঁহার সুন্দর গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। বালক প্রাণ পাইল, কিন্তু তাহার হৃদয়-ভাঙ্গা ক্রন্দন থামিল না। কয়েক দিন মা ও বাবা বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালক নিরুপায় হইয়া অবশেষে ক্রন্দনে নিবৃত্ত হইল। স্নেহময়ী শেঠপত্নী জননীতুল্য যত্নসহকারে তাহাকে পালন করিলেন; তাঁহার স্নেহ মমতার গুণে ক্রমে বালক তাঁহাকে ভালবাসিল। ক্রমে বালক তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তখন এক দিন কুঞ্জলাল আদর করিয়া বালককে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক আধ ভাষায় কহিল,—মন্মঠ। ইহার বেশী সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার নামের আর খানিকটাও সে বলিতে পারিল না। কুঞ্জলাল মন্মথকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চক্ষু জল-ভারাবনত হইয়া আসিল, বালক উত্তর করিল—'বাবু'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরতিশয় ঘটনাবর্ত্তে পড়িয়া বালক যখন কুঞ্জলালের আশ্রয় পাইল, কুঞ্জলালের পত্নীর ক্রোড়ে তখন এক বৎসরের একটী শিশুকন্যা। শেঠদম্পতী বহুদিন পরিণীত হইয়াও সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। নিঃসন্তানজনিত ক্লেশে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিতেন। ধনৈশ্বর্য্য সকলি বৃথা ভাবিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ সংসারের প্রতি বিরাগী হইতেছিলেন। সন্তান সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছেন, এমন সময়ে শেঠপত্নীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। কুঞ্জলাল ও তাঁহার পত্নীর আনন্দের অবধি রহিল না। যথাকালে কুঞ্জলালের পত্নী এক লাবণ্যময়ী কন্যা প্রসব করিলেন। শিশুসন্তানহীন শেঠগৃহ কন্যারত্নের আগমনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হতাশ শীর্ণ দম্পতির অধরে আবার হাসিরেখা দেখা দিল, সংসার-বিরাগী কুঞ্জলালের পুনরায় সংসারে মন বসিল। ক্রমে শিশুর দুগ্ধদন্ত ফুটিল, শিশুর আধভাষা স্ফুরিত হইল, পিতা মাতা আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন—কুসুম। সেইবার দেশে দুরন্ত ঝড় বহিয়া গেল, নদীবক্ষে কত দুর্ভাগ্যের ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ ঘটিল। একটি ভদ্র লোক সপরিবারে গোমতী-সলিলে জীবন সমর্পণ করিলেন। সংসারে তাঁহাদের আর খবর হইল না,—তিন বৎসর বয়স্ক শিশু ঘটনাচক্রে লক্ষ্ণৌর শেঠগৃহে আশ্রয় পাইল।

মন্মথ বালক। 'বাবু' ব্যতীত সে তাহার পিতার নাম বলিতে পারিল না। কোন্ দেশে

বাড়ী, কি জাতি, কাহার সন্তান জানিতে কুঞ্জলাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পিতামাতার কোনই সন্ধান পাইলেন না। কুঞ্জলাল নিতান্ত সহৃদয়ের ন্যায় বহু অর্থব্যয় করিয়াও দেশদেশান্তরে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে তিনি সে আশা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে বালককে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যদিও কুঞ্জলাল নানা দেশে পুত্রহারা পিতামাতার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের শূন্য ক্রোড় পূর্ণ করিবার আশায় দিবারাত্রি চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি যদি তখন হঠাৎ জলমগ্ন বালকের পিতামাতা শেঠগৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে সন্তানহারা পিতামাতার সন্তান পুনঃপ্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত হইয়াও কুঞ্জলাল ও শেঠ-পত্নী বিনা অশ্রুপাতে তাঁহাদের যত্ন-পালিত বালককে তাহার পিতামাতার সহিত বিদায় দিতে পারিতেন না। এক দিকে ভুবন মোহিনী বালিকা কুসুম, কুসুম-কলিকার ন্যায় অনুক্ষণ পিতামাতার নয়নাভিরাম হইয়া ছিল, আর এক দিকে পিতৃমাতৃহীন বালক শেঠগৃহে সমান আদর-যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাল খাবার আসিলে তাহার অর্দ্ধেক কুসুমের, অর্দ্ধেক মন্মথর; ভাল কাপড় আসিলে তাহার একখানি কুসুমের, একখানি মন্মথর। কেবল মাত্র জিনিষ দ্বারা নহে, হৃদয়ের স্নেহও মন্মথ অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইয়াছিল। বাল্যকালে দুইটিতে বাল-সুলভ চপল ক্রীড়ায় মগ্ন থাকিত, তখন একবৃন্তে দুটি ফুলের শোভা দেখিয়া লোকে আনন্দ লাভ করিত; কুঞ্জলাল ও শেঠ-পত্নী সে শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতেন; নিশি দিন দেখিয়াও তাঁহাদের দেখিবার সাধ মিটিত না। কুসুম ও মন্মথ ক্রমে বড় হইতে লাগিল; তাহাদের বয়সের সঙ্গে তাহাদের শোভা ও পরস্পরের স্নেহ ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। দুটিতে সোদর প্রীতির আদর্শ স্বরূপ। এক জন আহার না করিলে আর এক জন আহার করে না, একের অভাবে আর একজন বেড়াইতে যায় না। দু জনের মধ্যে যদি কখন কাহারো কোন পীড়া হইত তবে আর এক জনের মুখ ম্লান হইয়া উঠিত—নিশি দিন অবিরাম শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া দিন কাটিত—ব্যারাম আরোগ্য না হইলে খেলায় মন লাগিত না। ক্রমে দুই জনই বড় হইল। শৈশব বাল্যে পরিণত হইল, বাল্য কৈশোরে পরিণত হইল, ক্রমে বালক বালিকা উভয়েই যৌবনের সীমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কুসুম ধীরস্বভাব বালিকা, অন্যের নিকটে সে অধিক কথা কহিত না, কিন্তু মন্মথর নিকটে তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। যেখানে কুসুম ধীরস্থির হইয়া থাকিত সেখানে মন্মথ আসিলে তাহার কথা ফুটিত, হাসি দেখা দিত। উদ্যান-নিভৃতে, সরোবর সোপানপংক্তিতে, পুষ্পিতা লতিকাপার্শ্বে, গোমতীর প্রস্তরমণ্ডিত তীরে, মন্মথর পার্শ্বে বসিয়া কুসুম এক—দুই—তিন করিয়া সন্ধ্যাতারা গুণিত; একখানা—দুইখানা করিয়া পান্সি গুণিয়া মন্মথকে দেখাইত। রঙ্গিন সাড়ীর আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া নদীতীরে আসিয়া মন্মথর পাশে বসিয়া মালা গাঁথিত কখন বা একটী—দুইটী করিয়া ফুল এক সঙ্গে জলে ভাসাইয়া দিত। নিভৃত-উদ্যানে লোকের

গতিবিধি ছিল না। সরোবরের সোপানোপরি বসিয়া মন্মথ ও কুসুম তাহাদের মনের কথা কহিত।

মন্মথ যদিও শেঠভবনে বাল্যাবধি পালিত হইয়াছে, যদিও সে শেঠগৃহের সকলকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, তথাপি সে তাহার জনকজননীর কথা একেবারে ভুলিতে পারে নাই। কুসুমের জননী সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন যেন তাঁহাদের স্মৃতি মন্মথর কষ্টের কারণ না হয়, কিন্তু অলক্ষ্যে পিতৃমাতৃহীন বালক তাহার ভূত কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সময়ে সময়ে জীবন বিড়ম্বিত বোধ করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তা ক্রমে প্রগাঢ়তায় পরিণত হইল। যদিও কুসুম বিহনে সে আপনার অস্তিত্ব কল্পনা করিতেই পারিত না, তথাপি কুসুমের প্রিয়সান্নিধ্যে থাকিয়াও সময়ে সময়ে তাহার মুখমণ্ডল সহসা ম্লান হইয়া উঠিত; অব্যক্ত মনোকষ্ট মুখে চোখে সুস্পষ্ট রেখাঙ্কিত করিত। কুসুম নিকটে থাকিলে সে সকলই বুঝিত। তখনি জলভারাবনত-নয়না কুসুম কাতর-কণ্ঠে মন্মথর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিত 'মনু, তুমি আমাদের ভালবাস না?' কুসুমের সেই স্নিগ্ধ-স্নেহ তাহার চিন্তাপীড়িত হৃদয়কে জিয়াইয়া রাখিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুসুমের বয়স হইয়াছিল। শেঠ পরিবারের অন্তরঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে যদি কেহ কোন দিন শেঠ-পত্নীর নিকট কুসুমের বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, কুসুমের মা একটু মৃদু হাসিয়া সে কথার উত্তরে বলিতেন, 'হবে'। কুঞ্জলালের খুড়ীমা সম্পর্কে এক বর্ষীয়সী রমণী গৃহিণীকে বলিলেন,—"তা, মা, ছেলে খুঁজতে বাইরে যেতে হবে কেন, ঘরেই ত রয়েছে। রূপ, গুণ, মানুষে যা চায় তার কিছুরইত অভাব নেই। আহা, দু'টিতে যেন মানিকজোড়!"

সেইখানেই কুসুম ও মন্মথ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরাণী এই কথা বলিবামাত্র লজ্জা পাইয়া তাহারা দুইজনেই ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

মা বলিলেন,—"ঠাকরুণ, সে সুখ অদৃষ্টে ঘটবে কি না বলতে পারি নে। তাই এত দিন মনে মনে আশা করেছিলাম, কিন্তু কর্ত্তা কোন মতেই রাজি হন্ না।"

ঠাকুরাণী কহিলেন,—"কেন মা কুঞ্জলাল রাজি হন না?'

গৃহিণী অতি ক্লেশকণ্ঠে কহিলেন,—"মন্মথ পরের ছেলে, ভেসে এসেছিল, আমরা তাকে কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে রেখেছি। অজ্ঞাতকুলশীল ব'লে সমাজ জাতঃপাত করবে, এই ভয়! না হলে ঠাকরুণ, সে কথা কি আর বলতে হতো! মন্মথ তার মা বাপকে জানে না

আমিই তাকে লালনপালন করেছি। কুসুম মন্মথ সুখে থাকাতে কি আমার অসাধ, কিন্তু কি করি বল সমাজ ছেড়ে তো অমন কাজ করতে পারিনে। তা কেমন করে হবে বল।"

ঠাকুরাণী তদুত্তরে বলিলেন,—"তা, মন্মথ তা'র মা বাপ আবার ফিরে পেলেও তোমার সম্বন্ধ কখনই এড়াতে পারবে না। মায়ের একবিন্দু দুধের ধার শোধ করা যায় না আর কিনা তুমি মন্মথকে আজ চোদ্দ বছর বুকে ক'রে মানুষ করলে; এ সম্বন্ধ কি আর কিছুতে যায়! তবে মা, যে আশা ক'রেছিলে সেতো আর হবার নয়। জাত খুইয়ে তো আর কুঞ্জলাল সে সুখ কিনতে পারবে না।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কুসুমের মায়ের নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ। দুঃখাবেগ গোপন করিতে তিনি অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন, কিন্তু বর্ষীয়সী সকল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—'মা, মন্মথ তোমারই আছে। ছেলে নাই, মন্মথকে দিয়ে সেই সাধ মেটাও। পাষাণে বুক বেঁধে মেয়েকে অজ্ঞাতচরিত্র একজনের হাতে সমর্পণ করতেই হবে। কন্যার পিতামাতার এ দেশে এ দুঃখত নিশ্চিতই।'

সে দিন সেখানে উভয়ে আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। দরজার বাহিরে একজন দ্রুত স্পন্দিত-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যে এই কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ না হইতেই সেই মূর্ত্তি দ্রুতপদবিক্ষেপে ফিরিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই লুক্কায়িত শ্রোতা আর কেহই নয়,—কুসুম! উজ্জ্বল দিনের পরিণাম ঘোরান্ধকার অমাবস্যা রজনী! আকাশ নির্ম্মল, নক্ষত্রখচিত, নিমেষমধ্যে একখানি কালো মেঘ তাহাকে ছাইয়া ফেলিল!

আগে আগে সকলেই বলিয়াছে কুসুম ও মন্মথে বিবাহ হইবে। কুসুমের মাও প্রকাশ্যে সেই কথা বলিয়া মন্মথ ও কুসুমের শোভা অতৃপ্ত নয়নে দেখিয়া সুখী হইতেন। এ আশা একদিনের নয়, বৎসরাধিককাল হইতে মন্মথ ও কুসুম শুনিতেছিল; অজ্ঞাতসারে তাহারা পরস্পর হৃদয় বিনিময় করিয়াছিল। আজ হঠাৎ এই নিদারুণ কথা! বজ্রাহতের ন্যায় হৃদয় তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরাশ্রয়া বালিকা অশ্রুনিষেকে বুক ভাসাইয়া ফেলিল। অবশেষে একথা মন্মথরও কানে উঠিল। উভয়ের মনের অবস্থাই শোচনীয়। একদিন পূর্ব্বে যাহাদের চক্ষের সম্মুখে সংসার অপূর্ব্ব নন্দনকাননস্বরূপ প্রতীত হইতেছিল, আজ তাহাই বিষবোধ হইতেছে। আশা, ভরসা, সুখ, শান্তি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। জীবনের সম্মুখে এখন কেবলি অনন্ত দুর্ভেদ্য অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার!

লোকহীন নির্জ্জনে জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত উদ্যানে দাঁড়াইয়া দুটী সন্তপ্ত বালক বালিকা পরস্পর বিদায় ভিক্ষা চাহিতে ছিল। তাহাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাসে ও কণ্ঠস্বরে আকুল ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতি ও শোকোচ্ছ্বাসময়ী। বৃক্ষ শাখায় কোকিলের নৈশকুহুতান, ঊর্দ্ধ আকাশে তৃষিত চাতকের করুণ সঙ্গীত, সমীরণান্দোলিত সলিলের মৃদু তরঙ্গক্ষেপ ও শ্যামল তরুশ্রেণীর ধীর মর্ম্মর শব্দ, শিশির

সিক্ত নব কিশলয়ের বিনম্র শোকশ্রী, ও প্রস্ফুটিত শুভ্র বেলার সুবাসের সহিত মিশিয়া সেই নৈশপ্রকৃতিকে বিষণ্ণতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে সজ্জিত করিয়াছিল।

বালিকা কাঁদিতেছিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় শোকাশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় গণ্ড বহিয়া, ক্রমে বক্ষঃবহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। যেন ম্লান গোলাপের পাঁপড়ির উপর স্বচ্ছ সলিল-বিন্দু ভাসিতেছিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যুবক কহিল,—'সত্যই, আর বুঝি দেখিতে পাইব না! হৃদয় বারম্বার বলিতেছে তোমায় আমায় আর কখনো সাক্ষাৎ হইবে না।'

অশ্রুময়ী বালিকা ঐ কথা শুনিয়া একবার হতাশপীড়িত নয়নে যুবকের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার পর সহসা যন্ত্রণা কাতর স্বরে কহিল,—'ভাই, আবার দেখা হইবে, অবশ্যই হইবে। এই বাগানে, এই বকুল তলায় আমরা আর একবার সম্মিলিত হইব।'

কুসুমের সহিত মন্মথর বিবাহ হইল না। পাটনার লালাবংশীয় এক ব্যক্তির সহিত কুসুমের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। সম্বন্ধ স্থির হইল, বিবাহোদ্যোগ হইতে লাগিল, বর আসিল, মন্মথর কথা ফলিল, কুসুমের সহিত অপরিচিত আর একজনের বিবাহ হইল। মন্মথ দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিল। তাহার কুসুম আর একজনের হইল।

কুসুম যে দিন তাহার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবে, তাহার আগের দিন উদ্যানের বকুলতলায় দাঁড়াইয়া অনিবার অশ্রুপাতের সহিত হতাশোন্মত্ত মন্মথকে বলিয়া গেল,—'ভাই, এইখানে এই বকুলতলে, আমার পিতৃগৃহের পুণ্যভূমে তুমি আমায় আর একবার দেখিতে পাইবে।'

মন্মথ রহিল, কুসুম চলিয়া গেল। তরণী হেলিয়া দুলিয়া নববধূ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নিজ নিকেতনে যাত্রা করিল। যে ঘাটে গোমতী তটে দুইজনে বসিয়া ভাসমান ফুলদল নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিত, আজ ঠিক সেইখানে দুইজন নয় একজন বসিয়া আর একজনের বিদায় দৃশ্য দেখিতেছে। নৌকা ভাসিল, একটু দূর—আরো দূর—আরো দূরে ক্রমশঃ নৌকা চক্ষের বাহির হইয়া চলিয়া গেল। স্পষ্ট—ঈষৎস্পষ্ট—অবশেষে নৌকা আকাশের সঙ্গে কোথায় মিশিয়া গেল!

সে অনেক দিনের কথা। তখন পাটনা হইতে প্রায়শঃ জলপথেই ভদ্র পরিবারের যাতায়াত করিতেন, একবার কোন খানে গেলে ফিরিয়া আসা সহজ ছিল না। কুসুম স্বামীসঙ্গে শ্বশুরালয়ে গেল; আর কতদিনে ফিরিয়া আসিবে কে জানে? তখন দূরদেশে কন্যা বিবাহ দেওয়ার সময় জনকজননী কন্যার আশা ত্যাগ করিয়া পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেন। পাষাণে বুক বাঁধিয়া শেঠদম্পতী একমাত্র দুহিতাকে বিদায় দিলেন। সুহৃজ্জনের মন স্বাভাবিক অমঙ্গলাশঙ্কাময়, পিতামাতা কন্যার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সময় তাঁহাদের দেহমন অবসন্ন হইল;—আর কি কুসুম ফিরিয়া আসিবে?

কুসুম স্বামীগৃহে গেল। সেখানে স্বভাবগুণে সকলের প্রশংসালাভ করিল। দূরে থাকিয়া পিতামাতা তাহা শুনিয়া সুখী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐ ঘটনার তিনবৎসর পরে একদিন একখানি বজরা গঙ্গা বহিয়া আসিতেছিল। বজরার আরোহীদিগের মধ্যে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে একটী অলোকসামান্যা সুন্দরী বসিয়াছিল। পরিচ্ছদ দেখিলেই বোধ হয় বিধবা। কুসুম বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে আসিতেছিল। নৌকা অনেক পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে পুণ্যতীর্থ কাশীতটে আসিয়া লাগিল। নৌকারোহিনীর তীর্থ করা উদ্দেশ্য ছিল না, হঠাৎ পথিমধ্যে তিনি ভীষণ জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। নৌকা ক্রমাগত গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতেছিল কিন্তু আকস্মিক বিপদ দেখিয়া সকলের পরামর্শে কাশীতে অপেক্ষা করিয়া রোগের সুচিকিৎসা করাই সঙ্গত বোধ হইল। রোগী স্থানান্তরিত হইলেন না, বজরার সুপরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠেই তিনি শয্যাগত থাকিলেন। চিকিৎসক আনীত হইলে নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইলেন। অতি সাবধানতার সহিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, তিন চারিজন বিচক্ষণ চিকিৎসক একত্রে মিলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা হইতে লাগিল, কিন্তু ভীষণ বৈকারিকজ্বর ক্রমেই মারাত্মক উপসর্গ আনিয়া রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর করিতে লাগিল। তীব্র জ্বররোগের সহিত মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ। ক্ষণেকের জন্য মূর্চ্ছা ও শরীরাক্ষেপ নিবৃত্তি হইলে রোগী তখনি অসংলগ্ন প্রলাপ বাক্য কহে, চিকিৎসক ও সঙ্গীয় আত্মীয়গণ কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন রোগীর দিব্য জ্ঞানসঞ্চার হইল। অবিরাম অত্যুষ্ণ শরীর তখন অস্বাভাবিক শীতল। চীৎকার করিয়া রোগী কহিল,—'দরজা খুলে' দাও, জানেলা খুলে দাও, আমি একটু দেখ্‌ব—

তৎক্ষণাৎ নদীর দিকের জানেলা খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রসারিত গঙ্গা শুভ্ররজত-রেখার মত একটানে বহিয়া চলিয়াছে, কত নৌকা অনুকূল প্রতিকূল স্রোতে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়াছে। অদূরে, নগরাভ্যন্তরে ও ভাগীরথীর পুণ্যতীর্থ প্রস্তরতটে প্রাতঃস্নানাহ্নিক-পরায়ণ ত্রিপুণ্ড্রকশোভিতললাট ব্রাহ্মণগণের প্রশস্ত বক্ষোপরি শুভ্র যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে ও তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত 'শিব শম্ভোধ্বনি' প্রাসাদ সমাকীর্ণ বিরাট দিঙ্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। কল্লোলিনী সহস্র রক্তকুসুম ও শ্যামলপত্র বুকে করিয়া অনন্তের উদ্দেশে চলিয়াছে, নগরাভ্যন্তর হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধুপ-দীপ ও পুজা পরায়ণ ব্রাহ্মণ কণ্ঠোচ্চারিত বৈদিক উদাত্ত-গীতির মনোমুগ্ধকারী শব্দ ও গন্ধে নদীবক্ষ আমোদিত হইতেছে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন ত্রিতল প্রাসাদশীর্ষ হইতে সুমধুর শানাই ভৈরব রাগিণীর ঝঙ্কার দিতেছে।

যাতনাগ্রস্ত রোগীর মনে এ সকল একটুও স্পর্শ করে নাই। জানেলার দিকে মুখ করিয়া অতি যন্ত্রন্যগ্রস্তের ন্যায় হৃদয়ে হাত দিয়া রোগী বলিল,—'আমি—আমি—কথা রাখিব সে আবার আমায় দেখিবে।"

তখনি চিকিৎসক ও শুশ্রুষাকারিণী রমণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে মা? কি বলিতেছেন?'

মানুষ দেখিয়া রোগী দুই চোখ্ কপালে তুলিল; ধীরে নরম বালিশের উপরে মাথা রাখিল। চিকিৎসক নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, নিস্পন্দ হইয়া বুকে হাত দিয়া থাকিলেন। এই সময়ে রোগীর চোখ্ আরো বড় হইল, আরো যেন অস্বাভাবিক হইল। একবার আক্ষেপ, আর একবার আক্ষেপ, তখনি আবার শরীর স্থির হইল। চিকিৎসক তখনও হাত ধরিয়া আছেন। দশ মিনিট পরে তিনি হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাত খানি শ্বেত বস্ত্রাবরণের উপরে পড়িয়া রহিল। হাত ছাড়িয়া দিয়াই চিকিৎসক দৃঢ়চেষ্টিতকণ্ঠে কহিলেন,—'হইয়া গিয়াছে।'

সকলেই বুঝিল। বিধবা বালিকার জন্য নৌকায় শোকের অস্ফুট ক্রন্দন শোনা গেল। কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য। বারাণসীর অদূরে জনকোলাহল হইতে পৃথক থাকিয়া জাহ্নবীবক্ষে একখানি নৌকার মধ্যে একটী বিধবা বালিকা সংসারের চক্ষে চিরবিদায় লইল। তখনও তাহার ফুল্লারবিন্দ শ্রী। সে যেন মরে নাই। নিমীলিত নয়নে বালিকা কাশ্মীরিশালে আবৃত হইয়া যেন নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(মন্মথর কথা।)

আশ্বিন মাসে শুনিলাম কুসুম একবার তাহার পিত্রালয়ে আসিবে। কতদিন কুসুমকে দেখি নাই। কুসুম আসিবে, ভাবিলাম কুসুম তাহার কথা ঠিক্ রাখিবে। অনেক দিনের পর আমি যথার্থ সুখ অনুভব করিলাম।

এখন কেবলি সুখস্বপ্ন দেখিতেছি। আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় নদীর ঘাটে বসিয়া থাকি, কখন্ কুসুম আসে।

এক দিন কাশী হইতে দ্রুত-পত্র-বাহক সংবাদ লইয়া আসিল, 'কুসুমের জ্বর হইয়াছে, জ্বর সারা পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিতে হইল, এজন্য লক্ষ্ণৌ পৌছিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। চিন্তার কারণ নাই।'

সুদীর্ঘ তিন বৎসর সহ্য করিয়া ছিলাম কিন্তু কুসুমের অসুস্থতার সংবাদ আসা অবধি প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কি করিব? উপায় কি? অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে করিয়া কুসুমের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

শরৎকাল। সে রাত্রে পরিষ্কার নীলাকাশে একাদশীর চাঁদ কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! হিমসিক্ত বৃক্ষাবলীর শ্যামল পত্র জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া রমনীয় দেখাইতেছিল। কুসুমের রোগ সংবাদ পাওয়া অবধি মন বড় অস্থির, তাই নির্জ্জনতার আশায় পুষ্পবাটিকায় বেড়াইতে গেলাম। প্রকৃতির শোভা রমণীয়; উদ্যান শোভা তাহারি সঙ্গে মিশিয়া আরো সুন্দর দেখাইতেছিল। গিনিঘাষের ক্ষেতখানি চন্দ্রালোকে ঠিক যেন একখানি বিস্তীর্ণ সুবর্ণাস্তরণের মতন প্রতীয়মান হইতেছিল। সবুজ ঘাষের পাশে পাশে ছোট ছোট নীল, লোহিত, শুভ্র ফুলগুলি ফুটিয়াছিল, বোধ হইতেছিল যেন একখানি মূল্যবান কারপেট পাতিয়া রাখিয়াছে। তখনকার চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যশোভা মধুময়, কিন্তু কি জানি আমার মন অন্ধকারময়। ঠিক সেই সময়ে ভাবিতেছিলাম তিন বৎসর আগে যাহার পার্শ্বে বসিয়া স্বর্গসুখের কল্পনা করিতাম, এই সেই স্থান। যেখানে তাহার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইত, সে কোথায়? সংসারের অবিচার অত্যাচারে ভগ্নহৃদয় হইয়া আজ সেই স্বর্গীয় স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি দূর কাশীতটে রুগ্নশয্যায় শয়ান।

সেই দিন, সেই রম্যকানন মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া আমি যখন এই সব কথা ভাবিতেছিলাম তখন তোমরা কি বিশ্বাস করিবে? তখন ঠিক সেইখানে—আমি সত্য কহিতেছি—আমার কুসুমকে আমি দেখিলাম। স্বপ্ন নয়—ভ্রান্তি নয়—মানসবিকার নয়। সে কথা কহিল; আমায় জিজ্ঞাসা করিল। আমার দুঃখ সে থাকিল না কেন?

সম্মুখে পুখুর ঘাট, পিছনে বাগান, মাঝখানে দাঁড়াইয়া ধ্যান-নিরত হইয়া আমি ভাবিতেছি,—কুসুম কি তার প্রতিজ্ঞা রাখিবে না? আবার কি কোন বিপদ ঘটিবে? তাহাকে কি আর আমি দেখিতে পাইব না? জ্বর ত বেশী গুরুতর হয় নাই?'

আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুচ্চালনা করিয়া, সমগ্র বনস্থলী মুখরিত করিয়া আমার চিরপরিচিত কণ্ঠ যেন বীণায় ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—'মন্মথ, আমি এসেচি।'

আমার দক্ষিণে, যে দিক্ হইতে কুসুম ডাকিল, আমি চকিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলাম। ঘাটের পাশেই ঝাঁপড়া লতার গাছ, তার পাশে বকুল গাছ। দেখিলাম পাতা ও ফুল নড়িতেছে; ভাবিলাম বাতাস অথবা পাখী; আর এক মুহূর্ত্ত—দেখিলাম কুসুম! তৃষিতা কুসুম আমার মুখের দিকে একধ্যানে তাকাইয়া আছে! উন্মাদের মত ছুটিয়া তাহাকে বুকে করিতে গেলাম, তাহাকে ধরিতে পারিলাম না! আমি কুসুমের দিকে যতই যাই তাহাকে ধরিতে পারি না; সে আমা হইতে প্রায় দুইহাত দূরে থাকে। দৃষ্টি তাহার তিলেকের জন্যও অন্য কোথাও নাই, কেবল তাহা আমার মুখের প্রতি বিন্যস্ত। আমি তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। অগত্যা স্থির হইয়া

কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি হীরক প্রস্তুত করণ।

বর্ত্তমানের অন্য অশেষবিধ বৈজ্ঞানিক বিজয়কীর্ত্তির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি হীরক প্রস্তুত করণ, আর একটি। জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ বহু বৎসর যাবৎ অক্লান্ত শ্রমস্বীকার ও অশেষ যত্নসাধন করিয়া সম্প্রতি হীরক উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞান জগৎ একরূপ জানিয়াছিল যে, সহিষ্ণুতা সহকারে পরীক্ষা করিতে করিতে একদিন হীরক উদ্ভাবন প্রণালী আবিষ্কার হইয়া পড়িবে,—এক্ষণে সে দিন উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকেরা জানেন হীরক বহু মূল্যবান হইলেও উহা অঙ্গারকের এক প্রকার রূপান্তর মাত্র। কিন্তু সেই রূপান্তর কিরূপে সাধিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর সামান্য কয়লা—দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড—খণিমধ্যে হীরকরূপে পরিণত হইয়াছে, তদ্বিষয় জানা ছিল না। উল্লিখিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক (M. Moisson) আট দশ বৎসর ক্রমাগত নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা অবশেষে প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছেন। এতাবৎ অন্যান্য যে যে খণিজ পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সেই খণিজ পদার্থ খণিমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় কিরূপে অবস্থান করে, তাহা তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিবার পর কৃত্রিম প্রণালী সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল খণিজ পদার্থের খণিমধ্যস্থ স্বাভাবিক অবস্থা ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলির যথাযথ অনুসরণ করিয়াই লাবরেটরীতে খণিজ পদার্থ প্রস্তুতকরণে বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে, হীরক প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধেও সেই পন্থা অবলম্বন করাতে বিজ্ঞানের চেষ্টা ও যত্ন সফল হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে অনেকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অকৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, তাঁহারা হীরকের স্বাভাবিক খণিজ অবস্থা সম্যক্ অধ্যয়ন করেন নাই এবং আপনাদিগের পরীক্ষাপ্রণালীও সেই স্বাভাবিক অবস্থার অনুযায়ী করেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে হীরকখণি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই খণির অবস্থা দর্শন করিয়া খণিজপদার্থবিদগণ সর্ব্ব প্রথমে হীরক উৎপন্নের কারণের আভাস পান। সেখানে যে প্রস্তর স্তূপের মধ্যে হীরক পাওয়া গিয়াছে, তাহা নীলবর্ণের প্রস্তর। ইংরাজীতে ইহাকে Kimbrelite বলে। এই নীল প্রস্তরের চতুষ্পার্শ্বস্থ শিলাস্তূপের মধ্যে একটী স্তূপ এক প্রকার কৃষ্ণকায় পদার্থনির্ম্মিত। এই কৃষ্ণকায় পদার্থকে ইংরাজীতে "Shale" বলে। "শেল" লৌহ অঙ্গারক ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট এক প্রকার খণিজ পদার্থ। প্রোক্ত নীল প্রস্তরের মধ্যেও স্থানে স্থানে উত্তাপ ও অন্যান্য কারণে পরিবর্ত্তিত এবং রূপান্তরিত "শেল" খণ্ড পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আর ঐ নীল প্রস্তরের মধ্যেই স্বভাবজ হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে সহজে এই অনুমানই মনে আসিয়া পড়ে যে উক্ত নীলপ্রস্তরনিহিত "শেলের"

অঙ্গারক অংশই তাপ চাপাদি ভৌতিক কারণ প্রভাবে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরক খণি হইতে হীরক উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটা পূর্ব্বাভাস কৃত্রিম প্রণালীতে হীরক উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইবার সম্বন্ধে বহুল সহায়তা করিয়াছে। এতদিন ইহা অজানিত ছিল বলিয়া প্রকৃত প্রণালী মতে পরীক্ষা করা হয় নাই সুতরাং কৃতকার্য্য হওয়াও যায় নাই।

বোধ হয় পাঠকেরা অবগত আছেন বিশুদ্ধ অঙ্গারক সাধারণতঃ তিন প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়—১ঃ সাধারণ কয়লা অর্থাৎ কাষ্ঠ পোড়াইলে যে কয়লা জন্মে (Charcoal) ২ঃ পেন্সিলের কয়লা (Graphite); ৩ঃ হীরক। আমরা এখানে মৃদঙ্গারকের কথা উল্লেখ করিলাম না। কেন না ইহার সহিত অন্যান্য অনেক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মৃদঙ্গারক অমিশ্র বা বিশুদ্ধ অঙ্গারকের উদাহরণ স্থল হইতে পারে না। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন অঙ্গারকের মধ্যে হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অম্লজান বাষ্পের মধ্যে পোড়াইলে হীরক হইতে কার্ব্বণিকঅ্যাসিড্ বাষ্প উত্থিত হয়। কিন্তু যদি অম্লজানের অভাব হয়, হীরক অগ্নি মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বিহীন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ বহুমূল্য হীরক তখন আর হীরক থাকে না; অতি সামান্য কয়লা হইয়া পড়ে। যদিও অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাহা হইলেও উত্তাপের সহিত চাপ প্রয়োগ করিলে সামান্য কয়লাই আবার হীরক হইতে পারে। উত্তাপের সহিত চাপ প্রযুক্ত হইলে, উত্তাপের ক্রিয়াফলের যে এক বিশেষত্ব ঘটে, তাহা অনেক দিন হইতেই জানা আছে। চা-খড়িকে এইরূপে উত্তাপ সহ চাপযুক্ত করিয়া মার্ব্বেল প্রস্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোয়াসঁ তাঁহার কৃত্রিম খাঁটি হীরক প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এই নিয়মটির সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাক কিরূপে হীরক লাবরেটরীতে পরীক্ষা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হীরক এক প্রকার অঙ্গার বিশেষ। এমন কি সামান্য কয়লা হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু আমরা জানি কেবল দানা বাঁধিয়াই (Crystallized) সেই ভঙ্গপ্রবন অঙ্গারক অণুগুলি সম্পূর্ণ রূপে রূপান্তরিত হইয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল হীরক রূপে পরিণত হয়। তবে এখন দেখা যাক কোন পদার্থের দানা কিরূপে বাঁধে। পাঠকবোধ হয় জানেন খণিজ যাবতীয় দানাদার পদার্থকে দুই প্রধান উপায়ে সাধারণতঃ দানা বাঁধান যাইতে পারে—১ঃ, তরলীকৃত দ্রব পদার্থকে ক্রমশঃ শীতল করিয়া, ২ঃ কঠিন পদার্থকে উত্তাপ সহযোগে বাষ্প করিয়া এবং সেই বাষ্পকে ক্রমশঃ শীতল করিয়া অর্থাৎ যাহার দানা গঠন করিতে হইবেক, তাহাকে কোন রূপ দ্রাবক দিয়া (যেমন জল, সুরাসার, ইথর, বা অ্যাসিড ইত্যাদি) গলাইয়া ফেলিয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে দিলে, উহার দানা বাঁধিতে পারে; অথবা যদি উহা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়, উত্তাপ সংযোগে উহাকে বাষ্প করিতে হইবে এবং এই বাষ্পকে ক্রমশঃ শীতল করিলে উহা দানা বাঁধিবে। এখন কয়লার দানা গঠন উপরোক্ত দুই উপায়ের কোনটিরও আয়ত্তীভূত নয়। এমন কোন অ্যাসিড বা অ্যালকেলি

এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যাহাদ্বারা কয়লা দ্রব করা যাইতে পারে। জল, সুরাসার বা ইথরেও কয়লা দ্রব হয় না। উত্তাপ সংযোগে উহাকে বাষ্প করিবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং কয়লা দ্রব করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। দ্রব ধাতুময় পদার্থের সহিত কয়লা যে কতক পরিমাণে গলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে ইহা পূর্ব্ব হইতে কতকটা জানা ছিল। যেমন, Blast furnace এ যখন লৌহ গলান হয়, তখন খানিকটা অঙ্গারকও সেই সঙ্গে গলাইয়া দ্রব লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং লৌহ শীতল হইলে তৎসঙ্গে দ্রব কয়লাও শীতল হইয়া কঠিন হয়, ও কখন কখন দানা বাঁধিয়া গ্রাফাইটের মতও হয়। মোয়াসঁ এই সন্ধান লইয়া তপ্ত দ্রবমান লৌহকে কয়লার দ্রাবক রূপে ব্যবহার করিলেন। লৌহকেই কয়লার দ্রাবক রূপে ব্যবহার করিবার দুটি প্রধান কারণ আমরা মনে করিতে পারি। একটি আফ্রিকার হীরকখণির মধ্যে ও সান্নিধ্যে যে কৃষ্ণকায় পদার্থের (Shale) কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি এবং যাহা হইতে বা যন্মধ্যে খণিজ হীরক পাওয়া গিয়াছে সেই "শেল" লৌহ ও অঙ্গারক পদার্থে মিশ্রিত থাকে। অপরটি খণিজ স্বাভাবিক হীরক পোড়াইলে যে, ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে Oxide of iron পাওয়া গিয়া থাকে।

মোয়াসঁ প্রথমে প্রথমে যে পরীক্ষা করিতেন তাহাতে চিনি পোড়াইলে যে অঙ্গারক উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্গারক ব্যবহার করিতেন। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে লৌহ গলিয়া যখন শ্বেতবর্ণ হইত তখন তাহার সহিত যত পরিমাণে অঙ্গারক মিশিতে পারে তত পরিমাণ অঙ্গারক মিশাইতেন। বলা বাহুল্য লৌহের সহিত অঙ্গারকও গলিয়া মিশিয়া যাইত। পরে যে মুচীতে করিয়া লৌহ ও অঙ্গারক গলান হইতেছিল সেই মুচীটি দ্রবীভূত লৌহ ও অঙ্গারক সমেত শীতল জলমধ্যে নিমজ্জিত করা হইত। মিশ্র দ্রব লৌহাঙ্গারক শীতল জল সংস্পর্শে ক্রমশঃ শীতল হইবার সময় সর্ব্ব প্রথমে উহার বহিঃপ্রদেশটি ঠাণ্ডা হইয়া আভ্যন্তরীণ দ্রব পদার্থের চতুষ্পার্শ্বে একটি কঠিন আবরণ স্বরূপ পরিগঠিত হয়। অর্থাৎ গলিত পদার্থের সমস্ত অংশটা একবারে শীতল হইয়া কঠিন হয় না। ভিতরের অংশ দ্রব থাকিতে থাকিতে বাহিরের অংশ শীতল সলিল সংস্পর্শে শক্ত হইয়া পড়ে। এই বহিরাবরণ লোহিত বর্ণের থাকিতে থাকিতেই মুচীটিকে জল হইতে উঠাইয়া অতি অল্পে অল্পে শীতল হইতে দেওয়া হয়। এক্ষণে এই রূপে একটি শক্ত বহিরাবরণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অভ্যন্তরস্থ দ্রব লৌহ যখন ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিন হইতে থাকে, তখনই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। লৌহের একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, উহা শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময় আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। (জল যেমন জমাট হইয়া বরফ হইলে আয়তনে বাড়ে সেই রূপ) এখন সেই মুচীর মধ্যস্থ দ্রব-লৌহ শীতল জলে নিমজ্জিত হইবার কালে উহার উপরি অংশটা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভিতরে তখনও দ্রব লৌহ। এই দ্রব-লৌহ যখন শীতল হইয়া শক্ত হয়, তখন উহার আয়তন বর্দ্ধিত হইবার কথা। কিন্তু স্থান সীমাবদ্ধ; কেন না, বহিঃস্থ দ্রবময়ী পদার্থ ইতি-

পূর্ব্বে শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরস্থ দ্রব পদার্থের চতুস্পার্শ্বে এক কঠিন আবরণরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্রব পদার্থ শীতল ও শক্ত হইবার সময় লৌহের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে প্রসারিত হইতে গিয়া কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে খুব চাপ পায় এবং পেষিত হইয়া পড়ে। সুতরাং অতি ধীরে ধীরে এবং ভয়ানক চাপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্রব-লৌহ শীতল হইয়া কঠিন হয়। কিন্তু মুচীর মধ্যস্থ দ্রব পদার্থ শুদ্ধ লৌহ নহে। উহার সহিত অঙ্গারক দ্রবাবস্থায় মিশ্রিত ছিল। এই মিশ্রিত অঙ্গারকের কিয়দংশও বিষম পেষণভারে পিষ্ট হইয়া দানা বাঁধিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে যদি ফুটন্ত হাই-ড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে নিক্ষেপ করিয়া লৌহ অংশটা গলাইয়া ফেলা হয়, তন্মধ্য হইতে অঙ্গার-স্ফটিক (Crystallized carbon) স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

এই প্রক্রিয়ানুসারে যে দানাদার অঙ্গারক পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উহার কিয়দংশ গ্রাফাইটরূপে জমাট বাঁধিয়াছে। অবশিষ্টাংশ তাহাপেক্ষাও আরো ঘনতর দানাবিশিষ্ট এবং এত শক্ত যে পান্নার উপরও দাগ পাড়াইতে পারে। শেষোক্ত প্রকার দানার মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী সে গুলি উজ্জ্বল ও ঈষৎ স্বচ্ছ হয় এবং তাহাদের গাত্রে সমান্তরাল রেখাচিহ্ন (Striai) ও ত্রিকোন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত (Triangular depression) থাকে। (হীরকের এগুলি বিশেষ লক্ষণ।) এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ অঙ্গারক দানাকে অম্লজান বাষ্পের মধ্যে ১০৫০ শতাংশী উত্তাপ প্রয়োগে পোড়াইলে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসও উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই নমুনাগুলি এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের লইয়া কোনরূপ রাসায়নিক পরখ চলেনা। তথাপি, ইহা স্থির যে ঐ উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, দানাদার অঙ্গারক রেণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক, সম্পূর্ণরূপে খনিজ হীরকসদৃশ।

মোয়াসঁ সম্প্রতি একটু পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া এত বড় ও এত উৎকৃষ্ট ধরণের প্রকৃত হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সেগুলি লইয়া অনায়াসেই রাসায়ণিক পরখ দ্বারা সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে। হীরকের একটি প্রধান পরখ এই যে, উহা অম্লজানে পোড়াইলে কার্ব্বণিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন হইবে। মোয়াসঁর পূর্ব্ব পরীক্ষালব্ধ হীরকরেণু অতীব ক্ষুদ্র হইত বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই পরখ করা সম্ভবিত না। কার্ব্বণিক অ্যাসিড গ্যাস জন্মিলেও তাহা এত সামান্য পরিমানে হইত যে, অনুমান করিয়া লইতে হইত। কিন্তু এই নূতন প্রক্রিয়ালব্ধ হীরক এত বড় ও এত উত্তম হয় যে, কার্ব্বণিক অ্যাসিড গ্যাসের পরখ স্বচ্ছন্দে করিয়া সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে। নূতন পরিবর্ত্তিত প্রণালী এই :—

বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ও চাপ সংযোগে লৌহসহ যত পরিমাণ অঙ্গারক মিশিতে পারে তত মিশাইয়া উভয়কে উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত করিয়া শ্বেত বর্ণ করিতে হইবেক। তৎপরে যে মুচীতে করিয়া উক্ত উভয় দ্রব্য দ্রবীভূত হইল, সেই মুচীটি শুদ্ধ দ্রব লৌহাঙ্গারক, খানিকটা দ্রব সীসকের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হইবেক। এই রূপ করিলে, দ্রব লৌহ

পূর্ব্ব-পরীক্ষায় বর্ণিত জলমধ্যে নিক্ষেপণ অপেক্ষা, শীঘ্র শীতল হয়। কারণ, লৌহ যং এত উত্তপ্ত হয় যে একবারে লাল বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত বর্ণ ধারণ করে, সেই অবস্থ উহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে জলে সংস্পৃষ্ট হয় না। জল বাষ্প হই উহার চতুষ্পার্শ্ব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং বাষ্প ভাল তাপ পরিচালক নয়। দ্রবীভূ সীসার মধ্যে কিন্তু সেরূপ হয় না। আর সীসার তাপপরিচালক শক্তি জল অপেক্ষ অনেক বেশী। কাযেকাযেই উত্তপ্ত সীসার 'রাঙ্গের' মধ্যে দ্রব-লৌহ শীঘ্র শীতল হয় লৌহ অপেক্ষা সীসার আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া, তৈল যেমন জলের উপর ভাসে দ্রবলৌহ ছোট ছোট ফোঁটার আকারে তপ্ত সীসার রাঙ্গের উপর ভাসিয়া থাকে। সুতরা মুচীস্থিত দ্রবলৌহ সীসার রাঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা ছোট ছোট ফোঁটার মং সীসার উপর ভাসিয়া উঠে। ভাসমান ফোঁটাবৎ দ্রবলৌহ পিণ্ডগুলির উপরিভাগ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ, অগ্রে শীতল হইয়া পরে কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু উহাদের অভ্যন্তর দেশ তখনও তরল থাকে। এখানেও অভ্যন্তরদেশ শীতল হইবার সময় প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বহিরাবরণ ইতিপূর্ব্বেই শক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভিতরের অংশ বর্দ্ধিতায়তন হইতে গিয়া শক্ত বহিরাবরণ মধ্যে পেষিত হয়। এই পেষণের সময়, যে অঙ্গারক অংশ এতক্ষণ দ্রব-লৌহের সহিত মিশিয়া ছিল, তাহারও কিয়দংশ শক্ত ও জমাট হইয়া দানা বাঁধিয়া, তরল দ্রব লৌহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন সীসাও ঠাণ্ডা হইয়া শক্ত হয়, ছোট ছোট ফোঁটার মত বর্ত্তুলগুলি তন্মধ্যে সংলগ্ন রহিয়া যায়। এক্ষণে যদি উক্ত ছোট ছোট লৌহ বর্ত্তুলগুলিকে সীসার 'রাঙ্গ' হইতে স্বতন্ত্র করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা সংলগ্ন সীসক গলাইয়া ফেলা যায়, আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা বর্ত্তুলের লৌহ অংশও গলাইয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দানাদার অঙ্গারক বাহির হইয়া পড়িবেক। ইহাই হীরক খণ্ড। খনিজ স্বাভাবিক হীরক হইতে কোন অংশে একবিন্দুও অনুৎকৃষ্ট বা হীন নহে।

অবশ্য, এইরূপে হীরক প্রস্তুত করিতে অনেক পরিশ্রম, অনেক সময়, অনেক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও দ্রাবকব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তির কিছুই লাঘব হয় না। যত শ্রম-সাধ্য, ও সময়সাপেক্ষ হউক না, এক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ হীরক উৎপাদন এক সংসিদ্ধ ব্যাপার।

মোয়াসঁর শেষোক্ত পরীক্ষালব্ধ হীরকখণ্ড সকল তাঁহার প্রথম পরীক্ষা সম্ভূত হীরক রেণু অপেক্ষা অনেক বড়! ইহাদিগের ব্যাস প্রায় অর্দ্ধ মিলিমিটার। (এক মিলিমিটার এক মিটারের সহস্র ভাগের এক ভাগ, এবং এক মিটার প্রায় ৩৯.৪ ইঞ্চির সমান।) ইহারাও যদিও ক্ষুদ্রায়তনের বটে, তবুও আশা করা যায় এ সম্বন্ধে আরো যত পরীক্ষা হইবে ও উন্নতি সাধিত হইবে, ততই অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের হীরক খণ্ড প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা হইবেক। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অভিনব কীর্ত্তির মধ্যে আমাদের যাহা বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাহা এই যে, কৃত্রিম পান্নার মত, এ কৃত্রিম হীরক বাস্তবিক কৃত্রিম অর্থাৎ 'নকল' বা 'ভেল্ল' বা 'ঝুটা' নহে। ইহা সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে খণিজ অকৃত্রিম হীরকসদৃশ। স্বভাবতঃ হীরকের ন্যায় ইহা স্বচ্ছ ও উজ্জল দীপ্তিসম্পন্ন; দানার আকার, গঠন, উপরিস্থ সমান্তরাল রেখাচিহ্ন ও ত্রিকোণাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত—ঠিক খনিজ হীরকের ন্যায়। খনিজ হীরকের ন্যায় এ হীরকেরও প্রতিফলনক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। আলোক রাশি খনিজ হীরকের উপর সম্পাতিত হইলে যে যে বিশেষ বিশেষ গুণ প্রকাশ করে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ করে। খনিজ হীরকের ন্যায় ইহাও অতি কঠিন এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক খনিজ হীরকের ন্যায়। অত্যধিক চাপের মধ্যে দানা বাঁধে বলিয়া খনিজ হীরকের মধ্যেও যেমন কখন কখন এক এক বিন্দু বাষ্প কণা রহিয়া যায় এবং যাহার জন্য খনিজ হীরক সময়ে সময়ে আপনাপনিই বিদারিত হইয়া পড়ে, আমাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হীরকের মধ্যেও সেইরূপ কখন কখন বাষ্প কণা বদ্ধ থাকে এবং আপনাপনি তাহা ছট্‌কাইয়াও পড়ে। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বাংশেই খনিজ হীরকের সদৃশ। কেবল এই পার্থক্য যে বর্ত্তমানে অতি ছোট ছোট আকারের ও অতি অল্প পরিমাণেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপতি চরণ রায়।

নিজাম রাজ্য।

নিজাম রাজ্য যে সর্ব্ব প্রধান দেশীয় রাজ্য তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ইহা আয়তনে প্রায় ফ্রান্সের মত, এবং লোক সংখ্যা এক কোটির অধিক। ইহার বাৎসরিক আয় প্রায় চারি কোটি টাকা। নিজাম রাজ্য অর্থে এখন যাহা বুঝায়, তাহারই কথা বলিতেছি, অর্থাৎ বেরার ছাড়া।

প্রায় দুই শত বৎসর হইল আসফ্ যাহ্ নিজাম্-উল্-মুলক্ নামে দিল্লির সুবাদার এই রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। আজ পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে "সল্‌তনত্-ই-আসফিয়া, অর্থাৎ আসফের রাজ্য কহে।

প্রায়ই লোকের ধারণা যে হায়দ্রাবাদে সমস্তই মুসলমান, কিন্তু ইহা নিতান্ত অমূলক। নিজাম রাজ্যের লোক দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র মুসলমান, অর্থাৎ প্রায় সমস্তই হিন্দু। তবে এখানে হিন্দু বলিলে যাহা বুঝায় আমাদের দেশে ঠিক তাহা বুঝায় না। এখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল হিন্দুই কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে। পেঁয়াজ খাওয়ায় কোন পাপ নাই।

হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার নাম গন্ধও নাই। এ দেশে এক সম্প্রদায় মান্দ্রাজি ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা নিজের মামাত ভগ্নী এবং ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। বঙ্গ দেশের পণ্ডিত মহাশয়রা শুনিয়া বোধ হয় আড়ষ্ট হইবেন, এবং বলিবেন যে ওখানকার ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি তাঁহারা জুতা পায় দেন না, দুই হস্ত পরিমিত টিকি রাখেন, কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন না, তাম্রকুট সেবন করেন না, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট। এ প্রকার মামা ভাগ্নীতে এবং মামাত পিস্তুত ভাই ভগ্নীতে বিবাহ যে কালেভদ্রে ঘটে তাহা নহে। প্রায়ই এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি মামা থাকিতে ভাগিনেয়ীর অন্য কাহারও সহিত বিবাহের কথা হওয়ায়, মামা নালিষ পর্য্যন্ত করিয়াও ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও শুনা গিয়াছে। মামা ব্যতীত যে ভাগিনেয়ীর অন্য কোন উপায় নাই, তাহা বলিতেছি না। যদি মামা না থাকেন, কিম্বা মামার বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়া থাকে, অথবা মামার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই ভাগিনেয়ীর অন্যত্র বিবাহ হয়।

এখানকার হিন্দু সমাজ অনেক দিনের পুরাতন। কথিত আছে যে রামচন্দ্র এইখান হইতেই অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। নিজাম রাজ্যের মধ্যে আনাগুন্দি নামে এক জমিদারি আছে। আনাগুন্দির রাজা সুগ্রীবের বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। বালির বংশের কেহ এখনও রাজত্ব করিতেছেন কি না তাহা জানি না। বলা বাহুল্য যে সুগ্রীবের বংশধর বলিলে বঙ্গদেশে যাহা বুঝায় আনাগুন্দিতে তাহা বুঝায় না। আমাদের দেশের সীতাদেবী কোমল প্রকৃতি। এখানে সীতা মারাহাঠা রকমে কাছা দিয়া কাপর পরা এবং "চুলি" আঁটা; হটাৎ দেখিলে কুস্তিগির জোয়ান বলিয়া বোধ হয়। "চুলি" অর্থে বক্ষ ঢাকিবার এক প্রকার ছোট জামা বিশেষ, ইহাতে বোতাম নাই, ফিতা দিয়া বক্ষের কাছে বাঁধা থাকে। এ দেশে ভদ্র, অভদ্র, যুবতী, বৃদ্ধ, সকলেই এই চুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল কোন কোন পরিবারে বৃদ্ধা বিধবারা চুলি পরেন না।

এখানে অনেক প্রকার মুসলমান আছে। আরব, রোহিলা কাবুলি, বেলুচি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে দক্ষিণের "চিন্তা পণ্ডু মির পকায়ু" অর্থাৎ তেঁতুল এবং লঙ্কা, খাইয়া তাহারাও খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে আমাদের দেশের "চাচা" বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের কথা বার্ত্তাতেও অনেক তামিল শব্দ পাওয়া যায়।

অন্য স্থানের ন্যায়, এখানেও শিয়া, সুন্নি দুই সম্প্রদায়ই আছে। নিজামের বংশ সুন্নি, সালার জঙ্গের বংশ শিয়া। সালার জঙ্গ যখন জীবিত ছিলেন, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বড় সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, শুনিতে পাই। নিজাম সুন্নি, সুন্নিরা তাঁহার কাছে যাইত, মন্ত্রী সালার জঙ্গ শিয়া বলিয়া শিয়াদের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন, এবং মহারাজ নরেন্দ্র প্রসাদ পেশকার হিন্দুদের প্রার্থনা শুনিতেন। ফল এই দাঁড়াইত যে, কোন সম্প্রদায়ের উপর অবিচার হইত না। ইহা কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান নিজামের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। ইনি ইংরাজি পোষাক পরেন; কেবল পাগড়িটি হায়দ্রাবাদি। ইহা এক নূতন প্রকার পাগড়ি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের চাদর জড়ান ব্যাপার নহে। ইহা সকল রকম রংয়ের হয়। ভদ্র লোকে প্রায়ই সাদা অথবা ফেল্‌টের পাগড়ী ব্যবহার করেন। একটি পাগড়ির মূল্য দুই টাকা হইতে চল্লিস টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে জরির নাম গন্ধও নাই।

এখনকার নিজামের নাম মির্ মহবুব্ অলি খান্। কিন্তু খেতাব মিলাইয়া নামটি খুব বড় হইয়া যায়, যথা

আসফ্ যাহ্ মজফ্ফর্,-উল-মমালিক্ নিজাম্-উল্-মুল্‌ক্, নিজাম্-উদ্-দৌলা মির্ মহবুব্ অলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ জি, সি, এস্, আই।

এই সঙ্গে আর গুটি কতক বড় নামের নমুনা দিতেছি। এখন যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম;—নবাব সিকন্দর্ জঙ্গ্, ইকবাল্-উদ্-দৌলা, ইকৃতদার্-উল্-মুলুক্, ওকার্-উল্-উমরা বাহাদর। ইহাঁকে সচরাচর ওকার-উল-উমরা বলা হয়। ইংরাজেরা বলেন "Life is too short to pronounce such a big name এবং সংক্ষেপ করিয়া ওকার-উল-উমরা কে তাঁহারা "ভিকার" বলেন। ইংরাজিতে Vicar অর্থে পাদ্রি, এই জন্যই বোধ হয় ক্রমে ক্রমে Vicar এর পূর্ব্বে The সংযোগ হইয়াছে। ইংরাজেরা প্রায়ই "The case is before the Vicar" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় গোলযোগে পড়িয়া পাদ্রি হইয়া গেলেন!

ইহাঁর পূর্ব্বে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম:—

নবাব মহমদ মজহরুদ্দিন্ খাঁ, রফত্ জঙ্গ, বশির্-উদ্-দৌলা, উম্‌দত্-উল্-মুল্‌ক্, অজম্-উল্-উমরা, আমির্-ই-অকবর, স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বাহাদর, কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে কেবল স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বলা হয়।

এখানকার যিনি প্রধান নবাব, (Premier noble) তাঁহার নাম:—

নবাব শম্‌স্-উদ্-দৌলা, শম্‌স্-উল্-মুল্‌ক্ শম্‌স্-উল্-উমরা, অমির-ই-কবির্, স্যার খুরসেদ যাহ বাহাদর কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে স্যার খুরসেদ যাহ বলা হইয়া থাকে। আর লম্বা নামের নমুনা দিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। নামের ধরণ সকলেই বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন।

নিজামের সচরাচর দুইজন এডিকং থাকেন। বলা বাহুল্য যে ইহাঁদেরও খেতাব দিয়া নবাব করা হইয়াছে। নবাব দুই প্রকার, এক নবাব বংশে জন্মিয়া নবাব, আর খেতাব পাইয়া নবাব। বিলাতে অর্ল, মার্কুইসের মত এখানকার নবাবেরও শ্রেণী আছে।

১। জঙ্গ, (যুদ্ধ) যথা ইমাদ্ জঙ্গ;

২। দৌলা, (রাজ্য) যথা ইমাদ্ উদ্ দৌলা;

৩। মুল্‌ক্, (দেশ) যথা ইমাদ্-উল্-মুল্‌ক্;

হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার নাম গন্ধও নাই। এ দেশে এক সম্প্রদায় মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা নিজের মামাত ভগ্নী এবং ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। ব দেশের পণ্ডিত মহাশয়রা শুনিয়া বোধ হয় আড়ষ্ট হইবেন, এবং বলিবেন যে ওখানকা ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি তাঁহারা জুতা পা দেন না, দুই হস্ত পরিমিত টিকি রাখেন, কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন না, তাম্রকুট সেব করেন না, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট। এ প্রকার মামা ভাগ্নীতে এবং মামাত পিস্তুত ভা ভগ্নীতে বিবাহ যে কালেভদ্রে ঘটে তাহা নহে। প্রায়ই এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এমন কি মামা থাকিতে ভাগিনেয়ীর অন্য কাহারও সহিত বিবাহের কথা হওয়ায়, মাম নালিষ পর্য্যন্ত করিয়াও ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও শুনা গিয়াছে। মাম ব্যতীত যে ভাগিনেয়ীর অন্য কোন উপায় নাই, তাহা বলিতেছি না। যদি মামা না থাকেন কিম্বা মামার বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়া থাকে, অথবা মামার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই ভাগিনেয়ীর অন্যত্র বিবাহ হয়।

এখানকার হিন্দু সমাজ অনেক দিনের পুরাতন। কথিত আছে যে রামচন্দ্র এইখান হইতেই অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। নিজাম রাজ্যের মধ্যে আনাগুন্দি নামে এক জমিদারি আছে। আনাগুন্দির রাজা সুগ্রীবের বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন! বালির বংশের কেহ এখনও রাজত্ব করিতেছেন কি না তাহা জানি না। বলা বাহুল্য যে সুগ্রীবের বংশধর বলিলে বঙ্গদেশে যাহা বুঝায় আনাগুন্দিতে তাহা বুঝায় না। আমাদের দেশের সীতাদেবী কোমল প্রকৃতি। এখানে সীতা মারাহাঠা রকমে কাছা দিয়া কাপর পরা এবং "চুলি" আঁটা; হটাৎ দেখিলে কুস্তিগির জোয়ান বলিয়া বোধ হয়। "চুলি" অর্থে বক্ষ ঢাকিবার এক প্রকার ছোট জামা বিশেষ, ইহাতে বোতাম নাই, ফিতা দিয়া বক্ষের কাছে বাঁধা থাকে। এ দেশে ভদ্র, অভদ্র, যুবতী, বৃদ্ধ, সকলেই এই চুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল কোন কোন পরিবারে বৃদ্ধা বিধবারা চুলি পরেন না।

এখানে অনেক প্রকার মুসলমান আছে। আরব, রোহিলা কাবুলি, বেলুচি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে দক্ষিণের "চিন্তা পণ্ডু মির পকায়ু" অর্থাৎ তেঁতুল এবং লঙ্কা, খাইয়া তাহারাও খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে আমাদের দেশের "চাচা" বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের কথা বার্ত্তাতেও অনেক তামিল শব্দ পাওয়া যায়।

অন্য স্থানের ন্যায়, এখানেও শিয়া, সুন্নি দুই সম্প্রদায়ই আছে। নিজামের বংশ সুন্নি, সালার জঙ্গের বংশ শিয়া। সালার জঙ্গ যখন জীবিত ছিলেন, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বড় সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, শুনিতে পাই। নিজাম সুন্নি, সুন্নিরা তাঁহার কাছে যাইত, মন্ত্রী সালার জঙ্গ শিয়া বলিয়া শিয়াদের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন, এবং মহারাজ নরেন্দ্র প্রসাদ পেশকার হিন্দুদের প্রার্থনা শুনিতেন। ফল এই দাঁড়াইত যে, কোন সম্প্রদায়ের উপর অবিচার হইত না। ইহা কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান নিজামের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। ইনি ইংরাজি পোষাক পরেন; কেবল পাগড়িটি হায়দ্রাবাদি। ইহা এক নূতন প্রকার পাগড়ি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের চাদর জড়ান ব্যপার নহে। ইহা সকল রকম রংয়ের হয়। ভদ্র লোকে প্রায়ই সাদা অথবা ফেল্‌টের পাগড়ী ব্যবহার করেন। একটি পাগড়ির মূল্য দুই টাকা হইতে চল্লিস টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে জরির নাম গন্ধও নাই।

এখনকার নিজামের নাম মির্ মহবুব্ অলি খান্। কিন্তু খেতাব মিলাইয়া নামটি খুব বড় হইয়া যায়, যথা

আসফ্ যাহ্ মজফ্‌ফর্,-উল-মমালিক্ নিজাম্-উল্-মুল্‌ক্, নিজাম্-উদ্-দৌলা মির্ মহবুব্ অলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ জি, সি, এস্, আই।

এই সঙ্গে আর গুটি কতক বড় নামের নমুনা দিতেছি। এখন যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম;—নবাব সিকন্দর্ জঙ্গ্, ইকবাল্-উদ্-দৌলা, ইক্‌তদার্-উল্-মুলুক্, ওকার্-উল্-উমরা বাহাদর। ইহাঁকে সচরাচর ওকার-উল-উমরা বলা হয়। ইংরাজেরা বলেন "Life is too short to pronounce such a big name এবং সংক্ষেপ করিয়া ওকার-উল-উমরা কে তাঁহারা "ভিকার" বলেন। ইংরাজিতে Vicar অর্থে পাদ্রি, এই জন্যই বোধ হয় ক্রমে ক্রমে Vicar এর পূর্ব্বে The সংযোগ হইয়াছে। ইংরাজেরা প্রায়ই "The case is before the Vicar" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় গোলযোগে পড়িয়া পাদ্রি হইয়া গেলেন!

ইহাঁর পূর্ব্বে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম:—

নবাব মহমদ মজহরুদ্দিন্ খাঁ, রফত্ জঙ্গ, বশির্-উদ্-দৌলা, উম্‌দত্-উল্-মুল্‌ক্, অজম্-উল্-উমরা, আমির্-ই-অকবর, স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বাহাদর, কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে কেবল স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বলা হয়।

এখানকার যিনি প্রধান নবাব, (Premier noble) তাঁহার নাম:—

নবাব শম্‌স্-উদ্-দৌলা, শম্‌স্-উল্-মুল্‌ক্ শম্‌স্-উল্-উমরা, অমির-ই-কবির্, স্যার খুরসেদ যাহ বাহাদর কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে স্যার খুরসেদ যাহ বলা হইয়া থাকে। আর লম্বা নামের নমুনা দিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। নামের ধরণ সকলেই বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন।

নিজামের সচরাচর দুইজন এডিকং থাকেন। বলা বাহুল্য যে ইহাঁদেরও খেতাব দিয়া নবাব করা হইয়াছে। নবাব দুই প্রকার, এক নবাব বংশে জন্মিয়া নবাব, আর খেতাব লইয়া নবাব। বিলাতে অর্ল, মার্কুইসের মত এখানকার নবাবেরও শ্রেণী আছে।

১। জঙ্গ, (যুদ্ধ) যথা ইমাদ্ জঙ্গ্;

২। দৌলা, (রাজ্য) যথা ইমাদ্ উদ্ দৌলা;

৩। মুল্‌ক্, (দেশ) যথা ইমাদ্-উল্-মুল্‌ক্;

হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার নাম গন্ধও নাই। এ দেশে এক সম্প্রদায় মান্দ্রাজি ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা নিজের মামাত ভগ্নী এবং ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। বঙ্গ দেশের পণ্ডিত মহাশয়রা শুনিয়া বোধ হয় আড়ষ্ট হইবেন, এবং বলিবেন যে ওখানকার ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি তাঁহারা জুতা পায় দেন না, দুই হস্ত পরিমিত টিকি রাখেন, কখনও আমিষ ভক্ষণ করেন না, তাম্রকূট সেবন করেন না, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট। এ প্রকার মামা ভাগ্নীতে এবং মামাত পিস্তুত ভাই ভগ্নীতে বিবাহ যে কালেভদ্রে ঘটে তাহা নহে। প্রায়ই এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি মামা থাকিতে ভাগিনেয়ীর অন্য কাহারও সহিত বিবাহের কথা হওয়ায়, মামা নালিষ পর্য্যন্ত করিয়াও ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও শুনা গিয়াছে। মামা ব্যতীত যে ভাগিনেয়ীর অন্য কোন উপায় নাই, তাহা বলিতেছি না। যদি মামা না থাকেন, কিম্বা মামার বিবাহ পূর্ব্বে হইয়া গিয়া থাকে, অথবা মামার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই ভাগিনেয়ীর অন্যত্র বিবাহ হয়।

এখানকার হিন্দু সমাজ অনেক দিনের পুরাতন। কথিত আছে যে রামচন্দ্র এইখান হইতেই অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। নিজাম রাজ্যের মধ্যে আনাগুন্দি নামে এক জমিদারি আছে। আনাগুন্দির রাজা সুগ্রীবের বংশধর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন! বালির বংশের কেহ এখনও রাজত্ব করিতেছেন কি না তাহা জানি না। বলা বাহুল্য যে সুগ্রীবের বংশধর বলিলে বঙ্গদেশে যাহা বুঝায় আনাগুন্দিতে তাহা বুঝায় না। আমাদের দেশের সীতাদেবী কোমল প্রকৃতি। এখানে সীতা মারাহাঠা রকমে কাছা দিয়া কাপর পরা এবং "চুলি" আঁটা; হটাৎ দেখিলে কুস্তিগির জোয়ান বলিয়া বোধ হয়। "চুলি" অর্থে বক্ষ ঢাকিবার এক প্রকার ছোট জামা বিশেষ, ইহাতে বোতাম নাই, ফিতা দিয়া বক্ষের কাছে বাঁধা থাকে। এ দেশে ভদ্র, অভদ্র, যুবতী, বৃদ্ধ, সকলেই এই চুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল কোন কোন পরিবারে বৃদ্ধা বিধবারা চুলি পরেন না।

এখানে অনেক প্রকার মুসলমান আছে। আরব, রোহিলা কাবুলি, বেলুচি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে দক্ষিণের "চিন্তা পণ্ডু মির পকায়ু" অর্থাৎ তেঁতুল এবং লঙ্কা, খাইয়া তাহারাও খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে আমাদের দেশের "চাচা" বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের কথা বার্ত্তাতেও অনেক তামিল শব্দ পাওয়া যায়।

অন্য স্থানের ন্যায়, এখানেও শিয়া, সুন্নি দুই সম্প্রদায়ই আছে। নিজামের বংশ সুন্নি, সালার জঙ্গের বংশ শিয়া। সালার জঙ্গ যখন জীবিত ছিলেন, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বড় সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, শুনিতে পাই। নিজাম সুন্নি, সুন্নিরা তাঁহার কাছে যাইত, মন্ত্রী সালার জঙ্গ শিয়া বলিয়া শিয়াদের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন, এবং মহারাজ নরেন্দ্র প্রসাদ পেশকার হিন্দুদের প্রার্থনা শুনিতেন। ফল এই দাঁড়াইত যে, কোন সম্প্রদায়ের উপর অবিচার হইত না। ইহা কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান নিজামের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। ইনি ইংরাজি পোষাক পরেন; কেবল পাগড়িটি হায়দ্রাবাদি। ইহা এক নূতন প্রকার পাগড়ি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের চাদর জড়ান ব্যপার নহে। ইহা সকল রকম রংয়ের হয়। ভদ্র লোকে প্রায়ই সাদা অথবা ফেল্‌টের পাগড়ী ব্যবহার করেন। একটি পাগড়ির মূল্য দুই টাকা হইতে চল্লিস টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে জরির নাম গন্ধও নাই।

এখনকার নিজামের নাম মির্ মহবুব্ অলি খান্। কিন্তু খেতাব মিলাইয়া নামটি খুব বড় হইয়া যায়, যথা

আসফ্ যাহ্ মজফ্ফর্,-উল-মমালিক্ নিজাম্-উল্-মুল্ক্, নিজাম্-উদ্-দৌলা মির্ মহবুব্ অলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ জি, সি, এস্, আই।

এই সঙ্গে আর গুটি কতক বড় নামের নমুনা দিতেছি। এখন যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম;—নবাব সিকন্দর্ জঙ্গ্, ইকবাল্-উদ্-দৌলা, ইকৃতদার্-উল্-মুলুক্, ওকার্-উল্-উমরা বাহাদর। ইহাঁকে সচরাচর ওকার-উল-উমরা বলা হয়। ইংরাজেরা বলেন "Life is too short to pronounce such a big name এবং সংক্ষেপ করিয়া ওকার-উল-উমরা কে তাঁহারা "ভিকার" বলেন। ইংরাজিতে Vicar অর্থে পাদ্রি, এই জন্যই বোধ হয় ক্রমে ক্রমে Vicar এর পূর্ব্বে The সংযোগ হইয়াছে। ইংরাজেরা প্রায়ই "The case is before the Vicar" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় গোলযোগে পড়িয়া পাদ্রি হইয়া গেলেন!

ইহাঁর পূর্ব্বে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম:—

নবাব মহমদ মজহরুদ্দিন্ খাঁ, রফত্ জঙ্গ, বশির্-উদ্-দৌলা, উম্‌দত্-উল্-মুল্ক্, অজম্-উল্-উমরা, আমির্-ই-অকবর, স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বাহাদর, কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে কেবল স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বলা হয়।

এখানকার যিনি প্রধান নবাব, (Premier noble) তাঁহার নাম:—

নবাব শম্‌স্-উদ্-দৌলা, শম্‌স্-উল্-মুল্ক্ শম্‌স্-উল্-উমরা, অমির-ই-কবির্, স্যার খুরসেদ যাহ বাহাদর কে, সি, আই, ই।

সচরাচর ইহাঁকে স্যার খুরসেদ যাহ বলা হইয়া থাকে। আর লম্বা নামের নমুনা দিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। নামের ধরণ সকলেই বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন।

নিজামের সচরাচর দুইজন এডিকং থাকেন। বলা বাহুল্য যে ইহাঁদেরও খেতাব দিয়া নবাব করা হইয়াছে। নবাব দুই প্রকার, এক নবাব বংশে জন্মিয়া নবাব, আর খেতাব লইয়া নবাব। বিলাতে অর্ল, মার্কুইসের মত এখানকার নবাবেরও শ্রেণী আছে।

১। জঙ্গ, (যুদ্ধ) যথা ইমাদ্ জঙ্গ;

২। দৌলা, (রাজ্য) যথা ইমাদ্ উদ্ দৌলা;

৩। মুল্ক্, (দেশ) যথা ইমাদ্-উল্-মুল্ক্;

৪। উমরা, (সম্ভ্রান্ত, noble) যথা ওকার্-উল্-উমরা ;

৫। যাহ, (পদ, Dignity) যথা খুরসেদ যাহ্।

"যাহ" সর্ব্বোচ্চ খেতাব। বলা বাহুল্য যে সকল খেতাবের ঠিক অর্থ হয় না, যেমন ইমাদ্-নওয়াজ্-জঙ্গ্। কিন্তু প্রায়ই অধিকাংশ খেতাবের মানে আছে, যথা "সালার জঙ্গ" অর্থাৎ যুদ্ধে প্রধান, ইমাদ্-উদ্-দৌলা অর্থাৎ রাজরক্ষক, ইমাদ্-উল্-মুল্ক্ অর্থাৎ দেশ রক্ষক; (ইমাদ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্তম্ভ) ওকার-উল-উমরা অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদিগের গৌরব; আশ্মান্ যাহ্ অর্থাৎ আকাশের মত উচ্চ পদ, খুরসেদ যাহ্ অর্থাৎ সূর্য্যের মত উচ্চ পদ।

পাঁচজনে বসিয়া প্রায়ই তর্ক করিয়া থাকেন খুরসেদ যাহ্ খেতাব বড়, কি আস্মান যাহ্ বড়? আকাশ হইতে সূর্য্য উচ্চ অথবা সূর্য্য হইতে আকাশ। এ বিষয়ের মীমাংসা না হইলে যে বিশেষ কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তাহা ত বোধ হয় না; তবে এই রকম তর্ক আরম্ভ করিয়া বেয়ারিং পোষ্টে গুড়ুক খাইবার খুব সুবিধা বলিয়াই বোধ হয় "বিজ্ঞ" লোকেরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেন। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়ের মীমাংসা এখনও হয় নাই, সুতরাং শ্রাদ্ধও এখনও শেষ হয় নাই।

মন্ত্রীর পরে এখানে Cabinet Council আছে। ইহাতে মন্ত্রীমহাশয় এবং সেক্রেটারিরা মিলিয়া ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি এখানে Legislative Council ও হইয়াছে। Cabinet Council অথবা Legislative Councilএ কি প্রকার কায কর্ম্ম হয়, তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল কি আছে না আছে, তাহাই বলা হইতেছে।

এখানে High Court আছে, তাহাকে "মজ্লিস-ই-আলিয়া" কহে; জজকে "রুকন্" বলে। জজেরা টেবিল, চেয়ার ব্যবহার করেন। এজলাসে, টেবিলের উপর পান ও নীচে পিকদানি কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। হাইকোর্টের এবং অন্যান্য সকল কাজ কর্ম্মই উর্দ্দুতে হইয়া থাকে। এখানকার উর্দ্দু উত্তর পশ্চিম প্রদেশের উর্দ্দুর মত খুব ভাল নহে। অনেক তামিল শব্দ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। উর্দ্দু ব্যাকরণের প্রতি কাহারও প্রায় ভ্রুক্ষেপ নাই।

নিজামের স্বতন্ত্র পোষ্টআফিস আছে, টিকিটও স্বতন্ত্র। পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেল এক জন বৃদ্ধ মৌলবি। এখানকার রাজকর্ম্মচারীগণ বেশ বেতন পান। সেক্রেটারির বেতন দুই হইতে চারি সহস্র মুদ্রা, হাইকোর্টের জজেরা ১৫শ হইতে দুই সহস্র, আমাদের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মহাশয় বারশ টাকা পান, অন্যান্য কর্ম্মচারীর বেতনও নিতান্ত অল্প নহে।

এখানকার কর্ম্মচারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত:—

১। হিন্দুস্থানী;

২। দক্ষিণী।

হিন্দুস্থানী অর্থে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোক বুঝায়, এবং দক্ষিণী বলিলে হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক বুঝায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বিশেষ আন্তরিক সদ্ভাব নাই। উচ্চ কর্ম্মচারীগণ প্রায় সমস্তই মুসলমান, দুই একজন মাত্র ইংরাজ ও হিন্দু আছেন।

নিজামের সৈন্য দুই প্রকারঃ—

১। বেকায়দা অর্থাৎ Irregular.

২। বাকায়দা অর্থাৎ Regular,

বেকায়দা (Irregular) সৈন্যের কোন এক রকম (uniform) পোষাক নাই। তাহারা অপর লোকের ন্যায় নিজের কায কর্ম্ম করে, কেবল মাসে মাসে সরকার হইতে কিছু কিছু বেতন পায়; যুদ্ধের সময়ে ডাক পড়িলে উপস্থিত হইতে হইবে এই কথা। এখন ত যুদ্ধের নাম গন্ধও নাই, সুতরাং ইহাদিগকে মহরমের সময়ে, বৎসরে একবার প্যারেডে আসা ভিন্ন, যে অন্য কোন কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা বোধ হয় না। ইহাদের প্যারেডে দেখিলে, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সৈন্যের অবস্থা কি ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাদের এক রকম পোষাক নাই। কাহারও গায়ে একটি মাত্র ছেঁড়া জামা, কেহ বা পাজামাপরা গাথালি, কাহারও বা মাথায় এক পাগড়ি এবং পায়ে বুট জুতা, কিন্তু গাত্রে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মাত্র। এই ত গেল পোষাক। অস্ত্রও সকলে একরূপ ব্যবহার করে না। কাহারও হাতে একটা বল্লম, কেহ বা একটি চোং ভাঙ্গা বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াছে, কাহারও ভাগ্যে কুড়ালি বা থন্তা ভিন্ন অন্য কিছুই যোটে নাই। চিরকাল ইংরেজি প্যারেড দেখিয়া, মোগলাই বেকায়দা ফৌজের প্যারেড দেখিলে মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হয়।

বাকাদয়া (Regular) ফৌজ ঠিক ইংরাজী সৈন্যের মত, ইহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ একজন ইংরাজ কর্ণেল।

বাকায়দা সৈন্যের মধ্যে African Body Guards দেখিতে অতি সুন্দর। কাফ্রিরা সুপুরুষ কেহ যেন না বুঝেন। এই কাফ্রি সৈন্যের পোষাক দেখিতে অতি উত্তম, এবং যখন ইহারা শ্বেত অশ্বে চড়িয়া বাহির হয়, তখন সাদা ঘোড়ার উপর রঙ্গীন পোষাক পরা কাল মূর্ত্তি বাস্তবিকই অতি সুন্দর দেখিতে হয়।

নিজামের একজন রাজকবি—Poet Laureate—আছেন। তাঁহাকে সচরাচর "বুলবুল-ই-দক্ষিণ বলা হয়। তাঁহার লম্বা নামটি এখন মনে পড়িতেছে না।

এখানে প্রায় কেহই লাখের কম কথাই কহে না। দুই বৎসর পূর্ব্বে মণিকার জেকবের সহিত নিজামের যে হীরার মকদ্দমা হয়, সেই হীরা খানির মূল্য ছিল ৪৫লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষে আর কেহ এত মূল্যবান হীরা ক্রয় করিতে সক্ষম বলিয়াও বোধ হয় না। গত বৎসর একটি লাখ টাকা ঘুষের গোলমাল হইয়া গিয়াছে। তখন মন্ত্রী ছিলেন স্যার আস্‌মান্ যাহ্ বাহাদুর। তিনি নিজামের প্রিয় পাত্র নবাব সরওয়ার জঙ্গ বাহাদুরকে টাকা পাঠাইয়া দেন্। কেহ বলেন উৎকোচ, আর কেহ বলেন বক্‌সিস্ দেওয়া হইয়াছিল। যাহাই হউক, আমাদের বক্তব্য যে হায়দ্রাবাদে কথায় কথায় লাখ টাকা। সারওয়ার্ জঙ্গ বাহাদুর টাকা পাইয়া নিজামের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সমস্ত কথা বলেন। অনুসন্ধানে

প্রকাশ পায় যে, নবাব মেহদি আলির (Financial Secretary) পরামর্শে স্যার্ আস্মান্ যাহ্ এই কার্য্য করেন। কিছু দিন পরে নিজাম, নবাব মেহদি আলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত (Deport) করিয়া দেন এবং স্যার্ অস্মান্ যাহের স্থানে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধান বিচারপতি এবং Judicial Secretary মহাশয়রাও এই বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন, নিজাম তাঁহাদের ধমকাইয়া অব্যাহতি দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যে "Deportation" দুষ্ট লোক দূর করিবার একটি সহজ উপায়। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল একটি বারবিলাসিনী লইয়া দুই জন নবাবের মধ্যে বিশেষ গোলমাল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন প্রাতে শুনা গেল যে মোগলাই পুলিষ সেই বেশ্যাকে নিজাম রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এক কথায় সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল; ব্যবস্থা মন্দ নহে।

এখানে নেটিভ খৃষ্টান সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহারা অধিকাংশ খানসামা বাবুর্চ্চির কাজ করে। ইংরাজি পড়ে নাই, কিন্তু ইংরাজিতে কথা কহিয়া এক প্রকার কাজ চালাইয়া লয়। ইহাদের এ দেশে "Boy" কহে। "Boy"এর বয়স দশ বৎসরও হইতে পারে এবং ৬০ বৎসরও হইতে পরে। ইহাদের সকলের নামও ইংরাজি যথা George, Francis, ইত্যাদি। নেটিভ খৃষ্টানদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল কর্ম্মও করে। হঠাৎ দেখিলে ইহাদের হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। যখন প্রথম এখানে আসি, একদিন বড়ই আমোদ হইয়াছিল। "Boy" আসিয়া কার্ড দিল। নাম লেখা আছে "Mr. R. Samuels." ভাবিলাম বুঝি কোন ইংরাজ আসিয়াছেন; তাড়াতাড়ি ঢিলা পায়জামা ফেলিয়া কোট পেণ্টুলন পরিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম কেবল মাত্র একজন টিকিওয়ালা, তিলক কাটা, পাগড়ি বাঁধা ভদ্র লোক বসিয়া আছেন। ইনি "Mr. R. Samuels!" কিছু কথা বার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি খৃষ্টান তবে টিকি ও তিলক কেন?" মিষ্টার স্যামুয়েল সদর্পে উত্তর করিলেন "I have only changed *religion* and not my forefathers' *customs*" সেই অবধি আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি না, তবে কার্ডের উপর ইংরাজি নাম দেখিলেই জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখি মূর্ত্তি খানা কেমন; তাহা বুঝিয়া ঢিলা পায়জামায় বাহির হওয়া উচিত কি না স্থির করি।

এখানকার দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে অধিকাংশই Roman Catholic। শুনিতে পাই যে ইহাদের খৃষ্টান করিতে পাদ্রি মাহাশয়রা কিছুই বেগ পান নাই। এক একটিকে জর্ডানের জল দিয়া শুদ্ধ করিতে হয় নাই। একেবারে এক একটি গ্রাম ব্যাপ্‌টাইজ করা হইয়াছে। ব্যাপটাইজ্ করিবার প্রথা এইরূপ। এক গ্রামের চারিদিকে চারিজন পাদ্রি গিয়া "ইহারা সকলেই খৃষ্টান হইয়াছে" বলিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া দিলেন! ইহা নিতান্ত আষাঢ়ে গল্প বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অনেকের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

এ দেশে সতীত্বের বিশেষ মূল্য নাই। ছোট লোকের মধ্যে অনেকেই পিতা কে, তাহা জানে না। ইহারা "মুর্লির" সন্তান। এখানে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। দরিদ্র লোকের পাত্র না যুটিলে, একটা বৃক্ষের সহিত কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যা, ইহার পর সাধারণের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি করিয়া কাল কাটায়। পূর্ব্বে পুরুষের কাছে ইহারা টাকা লইতে পারিত না, কেবল অন্ন ও বস্ত্র পাইত; কিন্তু এখন ও "ধর্ম্মবন্ধন" টুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!

হায়দ্রাবাদ নবাবি দেশ হইলেও গুড়ুকতামাকের বিশেষ আদর নাই। সিগেরেট ব্যবহার করাই আজকাল ফ্যাশন হইয়াছে; তবে দুই একটি পুরাতন পরিবারে এখনও আলবোলা গুড়গুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

পোষাক এখনকার লোকের অনেকটা ইংরাজি রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবকেরা প্রায়ই গলা পর্য্যন্ত টাই কলার দোরস্ত ইংরাজি পোষাক পরেন; কেবল হ্যাটের পরিবর্ত্তে মাথায় একটি পাগড়ি। চাপকান ও চোগা এখানে নাই বলিলেই হয়, উহার বদলে "শের-ওয়ানি" অর্থাৎ ইংরাজি ফ্রক্‌কোটের মত এক প্রকার লম্বা কোট, সকলে ব্যবহার করে।

ভদ্রলোকের বাটীতে প্রায়ই ইংরাজি Drawing room, তবে নবাবদের বাটীতে ঢালা বিছানাও আছে।

বাল্যকালে ঠানদিদির কাছে যে সকল নবাবির গল্প শুনা যাইত, তাঁহার দুই একটা এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন নবাব চায়ের সহিত মুক্তা ভস্ম মিশ্রিত করিয়া খান। মুক্তা ভস্ম করিবার বিশেষ নিয়ম আছে। চায়ে দিবার পূর্ব্বে মুক্তাটি আস্ত থাকে, কিন্তু দিবা মাত্র গলিয়া মিশাইয়া যায়। কোন কোন নবাব পরিবারে বিবাহ রাত্রিতে বরকে পান খাইতে দেওয়া হয়, তাহাতে চুনের পরিবর্ত্তে মুক্তাভস্ম থাকে। বাদাম পেস্তা দেওয়া চা বোধ হয় কেহ জানেন না। এখানে ইহাও নিতান্ত অপ্রচলিত নহে।

ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে গেলে, ছোট এলাচি চিকি সুপারি এবং আতর দিয়া অভ্যর্থনা হইয়া থাকে।

নবাব মাত্রেরই অনেকগুলি বেগম, কতক বিবাহিতা কতক রক্ষিতা। কেবল একজন নবাবকে জানি যাঁহার একটি মাত্র সহধর্ম্মিণী।

সে কালের লোকের কুসংস্কারের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একটি গল্প পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। যখন প্রিন্‌স্ অব্ ওয়েল্‌স্ এখানে আসেন, দুই একজন বৃদ্ধ নবাবের তাঁহাকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না, কারণ তাঁহারা ত্রিতল গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সমস্ত জীবন সেইখানেই কাটাইয়াছেন; উপর হইতে নামিতে মানের হানি বোধ করিলেন, সুতরাং রাজপুত্র দর্শন হইল না!

যখন এখানে প্রথমে মিউনিশিপালিটি হয়, মিউনিশিপ্যাল এন্‌জিনিয়ার একজন ইংরাজ, সহরের স্তূপাকার ময়লা পরিষ্কার করিতে যান। দুই একজন প্রবীন বৃদ্ধ আসিয়া

এন্‌জিনিয়ারকে বাধা দিয়াছিলেন "ইয়েহ্ নবাব অফ্‌জল-উদ্-দৌলা বাহাদুর কা জমানা কা কচড়া হয়, অগর উঠাওগে সহরকা বরকত যাতা রহেগা," অর্থাৎ ইহা বর্ত্তমান নিজামের পিতার সময়ের ময়লা, ইহা ফেলিয়া দিলে সহরের অকল্যাণ হইবে। শেষকালে নাকি পাহারা খাড়া করিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে হইয়াছে!

এখানে গোলকণ্ডা নামক হীরার খনির কথা সকলেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। গোলকণ্ডায় যে কখনও হীরা পাওয়া গিয়াছে, ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ কেহই দিতে পারেন না, বোধ হয় কথাটা নিতান্ত অমূলক। একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত গোলকণ্ডার মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে হীরা ত দূরের কথা, কয়লা পর্য্যন্ত নাই।

যাঁহারা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিবার বিশেষ কিছুই এখানে নাই। তবে বর্ত্তমান মন্ত্রী নবাব ওকার-উল-উমরা বাহাদুর একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মান করিয়াছেন। ইহার নাম "ফলক-নুমা" অর্থাৎ স্বর্গদৃশ্য। ইহাতে চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাজ মহল ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অট্টালিকা ভারতে নাই।

কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের মত বেড়াইবার স্থান এখানে নাই। একটী সাধারণের বেড়াইবার বাগান আছে, কিন্তু উহার প্রাচীর এত উচ্চ যে উহার মধ্যে বায়ুসেবন হয় না। এই বাগান হইতে নিজামের বেগমরা রেল গাড়িতে উঠেন, সেই জন্য ইহা উচ্চ প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে কোন কোন বাগানের প্রাচীর এত উচ্চ করা হয় যাহাতে রাজপথ দিয়া হস্তির উপর চড়িয়া গেলেও "জনানা" দেখিতে না পাওয়া যায়। হোসেন সাগর নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে, ইহার ধারেই সকলে বায়ু সেবনে গিয়া থাকেন। হ্রদটির পরিধি প্রায় দশ মাইল। ইহা প্রসিদ্ধ "ভুপাল তাল" অপেক্ষাও অনেক বড়।

হায়দ্রাবাদ তিন ভাগে বিভক্ত। ১—সহর, যেখানে নিজাম ও নবাব প্রভৃতি থাকেন। তাহার পর চাদরঘাট, এখানে ইংরাজ এবং অধিকাংশ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের বাটী। চাদরঘাটটি কলিকাতার চৌরঙ্গির মত পরিস্কার স্থান। সহর এবং চাদরঘাটের মধ্যে মুসা নামে একটি ক্ষুদ্র নদী ব্যবধান। মুসা নদী বর্ষাকাল ব্যতীত বারমাসই প্রায় শুষ্ক অবস্থায় থাকে। ৩—সিকান্দ্রাবাদ। ইহা এখানকার Cantonement। সিকান্দ্রাবাদ এবং চাদর ঘাটের মধ্যে হোসেন সাগর হ্রদ।

এখানে জলের কল হইয়াছে, কিন্তু এখনও গ্যাসের আলো হয় নাই। ড্রেন নাই বলিলেই হয়।

এখানে সংবাদ পত্রের বিশেষ দুর্দ্দশা। রাজপুরুষগণের মনোগত না হইলে কাগজ উঠাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে তিনখানি ইংরাজি সংবাদ পত্র ছিল, ক্রমে ক্রমে সব গুলিই উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল একখানি উর্দ্দু কাগজে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বিপক্ষে কিছু লেখা হইয়াছিল। দুই এক দিনের মধ্যেই যোগল্লাই পুলিষ গিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাগজ কলম মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি টানিয়া লইয়া গেল। এডিটর

মহাশয় কিছুদিন গাঢাকা দিলেন। এখন তিনি এক খানি দোকান খুলিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতেছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালোরের একখানি ইংরাজী পত্রিকার প্রতি রাগ করিয়া নিজাম গবর্মেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, নিজামের কোন কর্ম্মচারী যেন সে কাগজ খানি না লয়েন। কলিকাতা হইতে স্বাধীনতা গেল বলিয়া তুমুল আন্দোলন হইল। এখানে ঘাড় পাতিয়া লোকে আদেশ পালন করিল; চুঁ শব্দটি নাই!

নবাবের প্রাসাদকে এখানে "দেউড়ি" কহে। নবাবদের দেউড়ি প্রায়ই বৃহৎ কাণ্ড। তাহার মধ্যে ছয় সাত খানা বড় বড় বাড়ি, দুই চারিটা "বাউলি" অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ কূপ, কুড়ি পঁচিশটা ঘোড়া রাখিবার আস্তাবল এবং দুশ একশ সৈন্য থাকিবার স্থান। ঘরগুলি কিন্তু বড়ই ছোট, জানালা নাই বলিলেই হয়। দেউড়ির চারিদিকে বৃহৎ প্রাচীর, দেউড়ি গুলি এক একটি কেল্লা বলিলেই হয়। এক একটি দেউড়ি ৫০।৬০ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বৃহৎ ফটক দিয়া দেউড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বাররক্ষকগণ প্রায়ই আরব, কখন কখন রোহিলাঁও দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে ইহারা নিজামের বেকায়দা সৈন্যের মত। ফটকের দুই পার্শ্বের ঘর ইহাদের বাসস্থান। ইহাদের বন্দুক কিরিচ প্রভৃতি ঐ খানেই টাঙ্গান থাকে। যখনই যাও দেখিতে পাইবে কেহ বা মুখ ধুইতেছে, কেহ মাংস কাটিতেছে, আবার কেহ বা আর্ব্বী ভাষায় কি বলিতেছে। আগন্তুককে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল কি গালাগালি দিল কিছুই বুঝা যায় না। কার্ড পাঠান প্রথা প্রায়ই দেউড়িতে খাটেনা যদিও কোন কোন স্থানে "টিকিট কঁহা" জিজ্ঞাসা করে। প্রায়ই দেউড়িতে মান অপমান বেশ ভূষা এবং গাড়ি ঘোড়ার উপর নির্ভর করে। তবে দক্ষিণা দিতে পারিলে সব লেঠা চুকিয়া যায়। "দক্ষিণা" যেমন তেমন করিয়া দিলেই হয় না; তাহাতে একটু "ডিপ্লমেসি" চাই। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল একটি বন্ধু আমাকে লইয়া একজন বড় নবাবের দেউড়িতে গেলেন। বলা বাহুল্য যে দেউড়িতে যাইবার পূর্ব্বে হ্যাট কোট ফেলিয়া মোগলাই পোষাক পরিলাম! এখানে মোগলাই পোষাক অর্থে পেণ্টলুন, সেরওয়ানি (বড় কোট) জরির কোমর বন্দ এবং পায়ে পাম্প শু ও মাথায় হায়দ্রাবাদি পাগড়ি। হঠাৎ দেখিলে কাহার সাধ্য বলে যে আমি বাঙ্গালী।

দেউড়িতে পৌছিয়াই বন্ধু আমার গাড়ি হইতে নামিলেন। আমিও নামিলাম। বন্ধু একজন সামান্য প্রহরীকে ডাকিলেন "জমাদার সাহেব"। একজন সামান্য সিপাহিকে "জমাদার সাহেব" বলাতে সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া দৌড়িয়া আসিল। বন্ধু বলিলেন, "কেঁউ মিয়াঁ, তোমরা নাম কেয়া?" উত্তর হইল "খএরুদ্দিন্"। বন্ধু অমনি তাহাকে "খইরুদ্দিন সাহেব" বলিতে আরম্ভ করিলেন। সিপাহি ওরফে "খইরুদ্দিন সাহেবকে" এক পার্শ্বে ডাকিয়া তাহাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বন্ধু "টিপ" করিলেন। দক্ষিণা পাইয়া সিপাহি বলিল "হুকুম"। বন্ধু বলিলেন নবাব সাহেবকে সংবাদ দিতে। নবাব সাহেব তখন "জানানায়"। আমি ভাবিলাম সব বুঝি মাটি, কারণ পুরুষের সেখানে যাইবার

অধিকার নাই। কিন্তু খইরুদ্দিন নেমকহারাম নহে। সে "মামা, মামা" বলিয়া চীৎকার করিল। আমাদের দেশে এপ্রকার চীৎকার কখন কখন শুণ্ডিকালয়ে শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে "মামা" অর্থে দাসী; আমরা যেমন ঝি বলিয়া ডাকি এখানে "মামা" সেই রূপ। একজন "মামা" আসিয়া উপস্থিত হইল। খইরুদ্দিন তাহাকে কি বলিল এবং টাকা দেখাইল। "মামা" দৌড়াইয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সর্‌কার্ ইয়াদ্ কিয়ে" অর্থাৎ নবাব সাহেব ডাকিতেছেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। চোপদার পথ দেখাইয়া চলিল। একটি ছোট ঘরে আমাদের বসিতে বলিল। ঘরটি বোধ হয় পাঁচ হস্ত লম্বে এবং চারি হস্ত মাত্র প্রস্থে। টেবিল চেয়ার কিছু নাই; ঢালা বিছানা পাতা, একটি মাত্র তাকিয়া আছে। তাকিয়াটিতে জরির পাড় বসান। আমরা জুতা খুলিয়া জানু পাতিয়া যোড় হস্তে বসিলাম। এমন সময়ে চারি দিকে "রোশন নিগাহ্" বলিয়া চোপদারেরা চীৎকার করিল। বন্ধু বলিলেন "সরকার তশরিফ লাতে হাঁয়"; আমরা সকলে উঠিয়া দাড়াইলাম। নবাব সাহেব সামান্য সাদা পোষাক পরিয়া ছিলেন। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে একজন নবাব বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় ছিলনা। সকলেই খুব ঝুঁকিয়া সেলাম করা গেল। বন্ধু আমার পরিচয় দিলেন, নবাব সাহেব সেকেলে লোক, পার্শী কথা খুব অভ্যস্ত, আমার সহিত পার্শীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে উর্দ্দূও চলিতে লাগিল। আমরা তাঁহার কাছে একটু প্রয়োজনে গিয়াছিলাম। একখানি কাগজে তাঁহার দস্তখত আবশ্যক ছিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কাগজখানি চাহিলেন, আমাদের সঙ্গেই ছিল, তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইল। একজন মোসাহেবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মোসাহেব অমনি "সাগর পেশা" বলিয়া চীৎকার করিল।

একেবারে পাঁচ সাতজন চাকর দৌড়াইয়া আসিল। হুকুম হইল কলমদান লে আও। সোণা দিয়া বাঁধান কলমদান আসিল। তাহার কালি শুখাইয়া গিয়াছিল, জল দিয়া তখনই ঠিক করিয়া লওয়া হইল। নবাব সাহেব আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়াছিলেন, কাগজখানি তাকিয়ার উপর রাখিয়া সহি করিয়া দিলেন। আমরা উঠিয়া সেলাম করিলাম। ইহাই এখানকার thanks, কিছু পরে বিদায় লইয়া বন্ধুর সহিত বাহিরে আসিলাম। খইরুদ্দিন বলিল "মামুল্" অর্থাৎ তাহার পাওনা। বন্ধু কুড়িটি টাকা তাহাকে দিলেন এবং আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "মিয়াঁ খইরু, জব্ ইয়েহ সাহেব আঁওয়ে ফোরণ্ সরকার সে ইত্‌লা কর্‌না।" সিপাহি উত্তর করিল "খইরা গোলাম আপ্‌কা"। বন্ধুর ডিপ্লমেসির বলে "খইরুদ্দিন সাহেব" ক্রমে "খইরা গোলাম" হইয়া পড়িল!

এক বৎসরে গুটি পাঁচ ছয় দরবার হয়। দরবার প্রায়ই রাত্রিতে হয়। সকলেই জানু পাতিয়া ভূমিতে বসেন। নিজামকে "নজর" দেওয়া হয়। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেইরূপ নজর দেন। নজরের মোহর অথবা টাকা সরকারে জমা হয়।

এখানকার টাকা ইংরাজি টাকার সাড়ে তের আনা মাত্র; মোহরও সেই পরিমাণে

কম। আধুলি, সিকি ও দুয়ানি আছে, কিন্তু অতি অল্প ব্যবহার হয়। এখানে গুটলে পয়সা ব্যবহৃত হয়।" এক টাকায় সচরাচর একশত পয়সা পাওয়া যায়, সুতরাং চারি পয়সায় আনা না হইয়া, ছয় পয়সায় আনা হয়!

শ্রীসিদ্ধমোহন মিত্র।*
(হায়দ্রাবাদ)।

বিষ্ণুপ্রয়াগ।

২৭ মে বুধবার—অপরাহ্ন ৭—আজ যোশীমঠ হতে বের হবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। শুধু একদিনের জন্যে নয়, আমার ইচ্ছা তিন চারি দিন এখানে থাকি, শঙ্করাচার্য্যের এই অতীত গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, এই স্মরণীয় স্থান ছেড়ে আমার সহজে যেতে ইচ্ছে করছিল না। থাকবার ইচ্ছা কল্লুম বটে কিন্তু থাকা হলো না, স্বামীজী জেদ্ করতে লাগলেন আজই রওনা হ'তে হবে, তার উপর অসহিষ্ণু বৈদান্তিকের তাড়না অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। দু দণ্ড যে কোথাও একটু বিশ্রাম করবো সে যো নেই, বোধ হয় জন্মান্তরে আমি গরু এবং বৈদান্তিক রাখাল ছিলেন, তাই বুঝি আজও নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছাড়তে পারেন নি। কি করা যায়, বেরিয়ে পড়া গেল।

আগেই বলেছি পাহাড়ের উপর যোশীমঠ, নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। যোশীমঠ হতে বিষ্ণুপ্রয়াগ একটা খুব খাড়া 'উৎরাই'। যদি পাহাড়ের গায়ে গাছ পালা না থাকতো তাহলে শঙ্করের মন্দির হতে গা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু-প্রয়াগে এসে একেবারে অলকনন্দা দাখিল হওয়া যেতো। যোশীমঠ হতে এই উৎরাইটুকু নামতে আমার একটু বেশী কষ্ট হয়েছিল, কারণ পাহাড়ের গা এমন সোজা যে নামতে গেলে আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে নবাবী চালে নামা যায় না, নামতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়, বোধ হয় কে যেন উপর হতে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে দিতে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। আমরা বেলা প্রায় ৫টার সময় রওনা হয়েছিলুম কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে বিষ্ণুগঙ্গার উপর টানা সাঁকোর কাছে এসে পড়লুম। এই বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গা অলকনন্দার সঙ্গে মিশেছে।

আজ একবছরের উপর হতে শুধু প্রয়াগের কথাই বলছি; একটা প্রয়াগের যায়গায় পাঁচটা প্রয়াগের কথা বলছি, তবু আমার প্রয়াগ ফুরোয় না। আজ আবার আর এক

---

* ইনিই হায়দ্রাবাদ Pamphlet caseএর এস, এম, মিত্র; বলা বাহুল্য যে ইনি হায়দ্রাবাদের [illegible] বিষয় বিশেষ অবগত আছেন। ভাং সং।

প্রয়াগে উপস্থিত। সবশুদ্ধ প্রয়াগ পাঁচটাই বটে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগকে পূর্ব্ববর্ণিত প্রয়াগ গুলির মধ্যে একটা Supplement বলে ধ'রে নেওয়া দরকার, Supplement এই জন্তে বলছি যে, 'কেদার খণ্ডে' পাঁচটার বেশী প্রয়াগের উল্লেখ নেই,—কিন্তু তথাপি বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ না বল্লে তার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়, শুধু অবিচার নয়, এতে তার যথেষ্ট অপমান করাও হয়; বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ শ্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদার খণ্ড' লেখক একজন চিন্তাশীল এবং ভক্ত হ'তে পারেন কিন্তু তিনি কবি নন, এবং কবিত্বের মাধুর্য্য ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান।

যাহোক কাব্যজগতে বিষ্ণু-প্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত, তা কোন লেখকের লেখনী-মুখে ব্যক্ত হোক আর নাই হোক। আজ কাল প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সত্তার পৌরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব করচে, সুতরাং এ যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগসমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলে বেশী আপত্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর যদি দুই নদীর সঙ্গম স্থলকেই প্রয়াগ বলা যায় তাহলে এই স্থানটিকেই সকলের আগে প্রয়াগ বলা উচিত। কেন, সে কথা পরে বলছি।

আমরা যখন যোশীমঠ হতে খানিকটে নেবে এসেছি, সেই সময় খানিকদূরে জলের একটা গম্ভীর কল্লোল শুনা গেল, এই অবিরাম কল্লোলের সঙ্গে কার যে তুলনা দেওয়া যেতে পারে তা অনেক চিন্তা করেও স্থির কর্ত্তে পারিনি। কোথা হতে এই শব্দ আস্‌চে তা কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাল্লুম না, বিশেষ আমাদের তিনজনেরই অভিজ্ঞতা সমান, সুতরাং কোন রকমেই মীমাংসা হলো না। তবে অনুমান কল্লুম এ শব্দ অলকনন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যখন ধীরে ধীরে বিষ্ণুগঙ্গার সাঁকোর উপর এসে পড়লুম তখন খুব প্রবল শব্দ শুনতে পাওয়া গেল; একটু এদিকে ওদিকে সন্ধান কর্ত্তেই দেখ্‌লুম, বিষ্ণুগঙ্গা খুব প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে, এ শব্দ তারই স্রোতের শব্দ। আমরা ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালুম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উচু নীচু, তাই এ রকম জলের শব্দ হচ্ছে।

আমরা সাঁকো পার হয়ে বাজারে উপস্থিত হলুম, বাজার ত ভারি, সেই "যথাপূর্ব্ব তথাপর" খানিকটে অপ্রশস্ত সমতল জায়গায় খানচার দোকান; তাতে আটা, ডাল, ঘি, নুন, গুড়, বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হবামাত্র একজন দোকানদার—ফরমাইস পেলে সে তখনি গরম গরম পুরী, ভুজ্জি (তরকারী) তৈয়েরী করে দিতে পারে এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দিলে এবং কথার সাক্ষীস্বরূপ আর তিন চার জন লোককে দাঁড় করালে, তারাও মুক্তস্বরে এই হালুইকর ঠাকুরের যশোগান কর্ত্তে প্রবৃত্ত হ'ল। এদের রকম সকম দেখে আমার বড়ই আমোদ বোধ হয়েছিল, আমার আরো আমোদের কারণ তারা আমাদের যতটা নির্ব্বোধ ভেবে দু পয়সা উপায়ের চেষ্টা

কচ্ছিল, সুখের বিষয় আমরা ততটা নির্ব্বোধ নই, কিন্তু সে জন্যে তাদের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোন বাধা হয়নি! দেখলুম কলিকাতার বড়বাজারের দোকান-দাররাই যে ধূর্ত্ত এবং ব্যবসাকার্য্যে দক্ষ তা নয়, হিমালয়বক্ষে এই সকল দোকানদাররাও জানে কিরকম করলে দু পয়সা উপায় হতে পারে।

যাহোক মিষ্ট কথা এবং ভবিষ্যতে পুরীর খরিদ্দার হবার ষোল আনা রকম আশা দিয়ে এই দোকানদারপুঙ্গবটিকে বশকরা গেল, কোথায় রাত্রি কাটান যায় তা ঠিক করবার জন্যে তার উপরই ভার দিলুম, বুঝলুম আজ তাকে যে লোভ দেখান গিয়াছে তাতেই সে আমাদের জন্যে সকল কষ্ট স্বীকার করবে; আর বাস্তবিকও দেখলুম এই 'সাধু'দের কাছে দু পয়সা লাভ করতে পারবে বুঝে সে আমাদের একটা আড্ডার জন্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তার চেষ্টার ক্রুটী না হলেও, অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, কাজেই কোথাও আড্ডা মিললো না। বামুন ঠাকুর অনেক অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য্য হয়ে যখন আমাদের সম্মুখে কাতর ভাবে দাঁড়াল, তখন আমাদের নিজের কথা ভেবে যতটা দুঃখ না হোক ঠাকুরের ভাব দেখে তার চেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছিল। আমি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলুম তার আর কষ্ট করবার দরকার নেই আমরাই একটা বাসা খুঁজে নিচ্ছি, কিন্তু এতে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়, লুচি তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছিনে।

আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল, স্থান আর মেলেনা। সকাল বেলায় যেসব যাত্রী যোশীমঠে না গিয়ে রাস্তা হতে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চলে এসেছে, তারাই এখানে সকল আড্ডা দখল করে ফেলেছে, একটি প্রাণীও এস্থান ছেড়ে যায় নি, সুতরাং পরে আসার জন্যে আমাদের স্থানাভাব হয়ে উঠেছিল। এখনো অনেক বেলা আছে অথচ যাত্রীর দল আর অগ্রসর না হয়ে এখানে কেন সময় ক্ষেপ করচে জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ হল। শুনলুম আগামী কাল যে পথে চলতে হবে তার মত ভয়ানক, বিপদপূর্ণ রাস্তা বদরিনারায়ণের পথে আর নেই; অপরাহ্নে এপথে চলা দুরূহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করে সকালে এই পথে চলা সুবিধা ও যুক্তিসঙ্গত মনেকরে যাত্রিরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা কচ্ছে। অল্প কয়েক খানি ঘর তারা এমন পরিপূর্ণ মাত্রায় দখল করেছে যে তার মধ্যে একটু পা বাড়াবার যায়গা নাই। লোক যে বড় বেশী তা নয়, তারা যদি একটু গোছাল ভাবে বিছানাগুলি বিছিয়ে নিত তাহলে প্রত্যেক ঘরে আরো ৫।৭ জনের স্থান হতে পারতো, কিন্তু সন্ন্যাসী বাবাজিরা তীর্থ করতেই এসেছেন এবং নারায়ণ দর্শন করে অনেকখানি পুণ্য সঞ্চয়ই তাঁদের অভিপ্রায়, তাঁরা অনুগ্রহ করে পাদুখানি একটু গুটিয়ে বসলে সেই পদতলে আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে এই বরফের রাজ্যে কৃতার্থ হয়ে যাই, তাঁদেরও পুণ্য সঞ্চয় হয় সে কথা বোধ করি তাঁদের ভাবার অবসর হয়নি। এতটুকু অসুবিধা যারা সহ্য করতে প্রস্তুত নয় তারা যে কেন সন্ন্যাসী হয়েছে তা আমি বুঝতে পারিনে। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসীদের এই স্বার্থপরতা দেখে

বেশী রাগ হয়েছিল কি রাত্রিবাসের অনুপায় দেখে বেশী রাগ হয়েছিল এখন তা ঠিক করে বল্‌তে পারিনে, তবে মনে হয় গাছ তলায় বরফে পড়ে থাকায় চেয়ে ঘরে একটু আরামে থাকা যায় আর এই সন্ন্যাসীগুলো সেই আরামের বিষম বিঘ্ন, অতএব নিজের সুখের কথাটা পিছনে দাঁড় করিয়ে তাদের স্বার্থপরতার উপরই রাগটা বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক কত সময় আমরা পরের স্বার্থপরতা দেখে রাগ করি; কিন্তু আমাদের সে রাগও স্বার্থপরতা পূর্ণ। আমার মনে হতে লাগলো যদি আমাদের দেশ কি আমাদের ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেটের রেলগাড়ি হতো তাহলে এখনি পুলিষম্যান ডেকে ওদের গাঁটরি ও বোঁচকাবুচকী সরিয়ে দিয়ে এত জায়গা করে নিতে পাত্তুম যে তাতে বসে হাত পা মেলে বিলক্ষণ আরাম করা যেত। কিন্তু এখানে সে রকমের প্রীতিকর সম্ভাবনা কিছু মাত্র নেই, কাজেই উপস্থিত মত রাগটা চাপা দিয়ে বাসার অনুসন্ধানে অন্যত্র প্রস্থান করা গেল।

খানিক ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়া বসে পড়লেন। আমার শ্রান্তি ক্লান্তি নেই আমি ভাবলুম আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি তার পরে যা হয় করা যাবে। সঙ্গম স্থলে চল্লুম। বাজারের পিছনে খানিকটা নীচেই সঙ্গম স্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেবেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নূতন ছোট মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি এমন স্থানে নির্ম্মিত যে এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না করে যদি একজন কবিকে প্রতিষ্ঠা করা যেত তাহলে ঠিক কাজ করা হতো। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দা গভীর নীচে গিয়ে আনন্দোচ্ছাসের বিপুলকল্লোলে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, পাশে ঈষৎ বক্র সমুন্নত বিশাল পর্ব্বত আকাশ ভেদ করে উঠেছে, এবং তারই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির, প্রকৃতির স্বহস্ত নির্ম্মিত চিত্রবৎ। তখন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও মধুর করে তুলেছিল। আরো অগ্রসর হয়ে দেখলুম মন্দিরটির পাদদেশ হতে আরম্ভ করে পাহাড়ের গা খুঁদে ছোট ছোট সিঁড়ি তৈয়েরী করা হয়েছে তা একবারে সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছে; উদ্দাম তরঙ্গ সেই সিঁড়িতে, পর্ব্বতের কঠিনগায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন সুন্দর দৃশ্য আমার চক্ষে এই নূতন। মন্দিরের কাছে এসে ইচ্ছা হলো আজ এখানেই থাকি, তার বাইরে খানিক বারন্দা বের করা ছিল, তাতে তিন চারজন লোক বেশ থাকতে পারে; কিন্তু কাকেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বামুন সেখানে উপস্থিত। কথায় কথায় জানতে পাল্লুম মন্দির এখন সেই দোকানদারেরই জিম্মায় আছে; আমি তখন এই মন্দিরে থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ কল্লুম কিন্তু সে প্রথমে কিছুতে রাজি হলো না কারণ মন্দিরটি এই নূতন তৈয়েরি হয়েছে, তাতে এখনো দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়নি। একবৎসর হলো ইন্দোরের রাণী এসে এই মন্দির তৈয়েরী করিয়ে দিয়েছেন, এই বৎসর

নর্ম্মদাতীর হতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এনে মন্দির ও দেবতা উভয়ই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমিত জোর জবরদস্তি করে মন্দিরের সম্মুখে বসে পড়লুম, সে'ও কিন্তু নাছোড়বান্দা। যাহোক দুই চারিটি বচন দেওয়ার পর সে আর কোন আপত্তি কল্লে না; মন্দির দ্বারে একটি ছোট ছেলে বসে ছিল, তাকে বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়াকে ডাকিয়ে আনলুম। স্বামীজী মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য্য দেখে আনন্দেই অধীর, বৈদান্তিক পারৎ পক্ষে কারো প্রশংসা করেন না, কিম্বা অল্প কারণে তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ওষ্ঠের উপকূলে প্রকাশ পায় না, কিন্তু এই সুন্দর স্থান আবিষ্কার করার জন্যে তিনি আজ আমাকে কলম্বসের পাশে আসন দিতে সঙ্কুচিত হলেন না। বাস্তবিক কোথায় আজ স্থানাভাবে এই শীতে, বরফের মধ্যে, অনাবৃত আকাশ তলে বাস করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর কোথায় এই সুন্দর স্থানে, দেববাঞ্ছিত মন্দিরের মধ্যে সুখ শয্যা!

মন্দিরের ভিতরটি আটকোনবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। দ্বারের দিকে গাড়ী বারান্দার মত একটা বারান্দা বের করা, তারো তিন দিকে বড় বড় কপাট লাগানো সুতরাং ইচ্ছা কল্লেই চারদিক বন্ধ করে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়। আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না করে আগে যে সিঁড়ির কথা বলেছি সেই সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গম স্থলে নেবে গেলুম। সেখানে—আর শুধু সেখানে কেন এই মন্দির মধ্যেও কথা বোলতে হোলে খুব চেঁচিয়ে বল্‌তে হয় কারণ জলের এত শব্দ যে ছোট কথা কিছুতেই শুন্‌তে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রয়াগ সমতল স্থান নয়, দুদিক হতে যে দুটি নদী আস্‌চে তারা উভয়েই পাহাড়ের ঢালু বয়ে নাবচে সুতরাং অন্য স্থান চেয়ে এখানে নদীর স্রোত এবং শব্দ দুই-ই বেশী। তার উপর যেখানে সঙ্গম স্থল তার আট দশ হাত উজানে অলকনন্দা একটা পাহাড়ের উপর হতে লাফিয়ে নীচে পড়চে সুতরাং এই মন্দিরের কাছে শব্দ আরো বেশী। সমুদ্র গর্জ্জন অনেকেই শুনেছেন, অপার জলধির সেই বিপুল গর্জ্জন, বায়ুহিল্লোলে উন্মত্ত তরঙ্গ রাশির অসীম মুক্ত প্রদেশে নির্ব্বাধ নৃত্য এবং তার প্রবল বিক্রম, এসকলের মধ্যে কোমলতা বা সংকীর্ণতা নেই, তাই বুঝি আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তার ভিতর পড়ে শ্রান্ত অবসন্ন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু এই সঙ্গম স্থলের জলের অবস্থা সেরকম নয়। এই অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আনে না শান্তি আনে, এই উগ্র শব্দের মধ্যে এমন একটু কোমলতা, এমন একটু মিষ্টতা আছে যা মর্ম্মস্পর্শী, অনেকক্ষণ এই শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে বোধ হয় ঘুম আসে; কিন্তু তাই বলে এর বিক্রম কম নয়, সঙ্গম স্থলের এই ঘূর্ণিত ফেনিল জলে নামে কার সাধ্য? নাবতে সাহসই হয় না। দিবারাত্রি জল আলোড়িত হচ্ছে, জলের কাছে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ইন্দোরের রাণী মন্দির হতে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়ে তার সব নীচের সিঁড়ির দুপাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে দিয়েছেন; এই শিকল জলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধরে জলস্পর্শ করে,

স্নান করবার শক্তি কারো নেই। যাদের মাথা ভাল নয়, একটা কিছু গোলমাল দেখলেই সহজে যাদের মাথা ঘুরে উঠে তাদের এ জলের কাছে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে, যাদের সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে কিন্তু সে তুলনা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবেন কিনা সন্দেহ, তার চেয়ে যদি বলা যায় এ একটা ছোটখাট নায়েগ্রার মত, তাহলে বোধ করি অনেকে বুঝতে পারেন, কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে দুচার জন ছাড়া আর কেউ নায়েগ্রা না দেখলেও অনেকেই তার বর্ণনা প'ড়ে প'ড়ে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, সুতরাং এই সঙ্গমস্থল নায়েগ্রার একটা ছোট প্রতিকৃতি বল্লেই বোধ হয় বর্ণনা ষোল আনা রকম হয়, এতে যিনি সন্তুষ্ট নন তাঁকে সঙ্গে করে আমি দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে বরং এখানে আস্‌তে রাজী আছি কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

সমস্ত দেখে শুনে আমরা উপরের সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলুম। যাবার সময় দেখে গিয়েছিলুম মন্দিরের ভিতরের দ্বার বন্ধ, এখন দেখি দ্বার খোলা, একটি ৮।৯ বছরের ছেলে সেই উন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে ব'সে আছে। ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভবিষ্যতে যেখানে শিবমূর্ত্তি হবে সেইখানে একখানা কাঠের ছোট চৌকীর উপর তেল সিঁদুর মাখানো পাথরে খোদা কয়েকখানা মূর্ত্তি; তেল সিঁদুরের প্রসাদে তারা পুরুষ কি স্ত্রী, মানুষ কি আর কিছু, কিছুই বুঝবার উপায় নেই। মন্দিরের মালিক এখনও আসেন নি তাই এই বালক নিখরচায় তার পুতুলগুলিকে মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে অনায়াসে দুচার পয়সা রোজগার করছে; পরে যখন মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী এসে উপস্থিত হবেন তখন এই দেবতারা অন্যান্য জাতিভায়ার মত বৃক্ষতল আশ্রয় করবেন। জিজ্ঞাসা করে জানলুম বালকটি আমাদের সেই লুচিওয়ালা বামন ঠাকুরের ছেলে, এদের বাড়ী যোশীমঠে। ছেলেটির সঙ্গে গল্প যুড়ে দেওয়া গেল। এদিকে বৈদান্তিক ভায়া দোকানদারকে পুরী প্রভৃতির ফরমাইস দিলেন, যে পরিমাণে জিনিষ তিনি ফরমাইস দিলেন তাতে আমার ও স্বামীজীর চার পাঁচ দিন চল্‌তে পারতো, এবং যদি বৈদান্তিকের উদরের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাক্‌তো তাহলে হয়ত মনে করতুম ভায়া এই তীর্থস্থানে বুঝি আট দশজন সাধু সন্ন্যাসীকে খাইয়ে স্বর্গপথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তিনি তেমন লোক নন, পুণ্যার্জ্জনের জন্যে তিনি সর্ব্বত্যাগ করেছেন, কিন্তু উদরের জন্যে তিনি এই পুণ্যেরও কিয়দংশ অব্যাকুলভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার হয়েছে দেখে ছেলেটি উপরে উঠে বাজারে গিয়ে ঘি সলতে প্রদীপ নিয়ে এল; তাতেই বুঝতে পাল্লুম মন্দিরের বর্ত্তমান অধিবাসীগণ প্রত্যহ প্রদীপের মুখ দেখ্‌তে পান না। আজ আমাদের কল্যাণে তাঁরা একটু দেবত্ব উপভোগ করে নিলেন। শুধু ঘি সলতে নয়, ছেলেটি যথারীতি আড়ম্বর করে ঠাকুরদের আরতি করলে; তারপর আবার উপরে দোকানে গিয়ে খানকত লুচি আর খানিকটা গুড় এনে ঠাকুরদের ভোগ দিলে, বলা বাহুল্য আমাদের জন্যে তার বাপ যে লুচি তৈয়েরী করেছিল,

মন্দিরের ঠাকুর মশায়েরা তারই ভাগ বসালেন। ভোগ হয়ে গেলে ছেলেটী আমাদের প্রসাদ দিতেও ক্রটী কল্লে না। এ অবস্থায় সে বালককে যৎকিঞ্চিৎ না দেওয়া ভাল দেখায় না, সুতরাং তাকে কিছু দেওয়া গেল, সে তা প্রণামী শ্রেণীভুক্ত করে, বকসিসের জন্যে জেদ করতে লাগলো, কায়দা মন্দ নয়। বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক, ফিরে আসবার সময় বকসিসের ব্যবস্থা দেখা যাবে, বোধ হয় আমাদের আর বিরক্ত করা সঙ্গত নয় মনে করে, সে মন্দির ত্যাগ করে চলে গেল, এবং যাবার সময় প্রদীপ নিবিয়ে 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' করে দোরে তালা লাগিয়ে গেল। সে সেই রাত্রে এই চড়াই উঠে যোশীমঠে যাবে, কি সাহস! বাঙ্গালী বালক দূরের কথা, বাঙ্গালী সাহসী যুবকও একাজে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস করেন না, এ জন্যে একবার আমাদের নিজেকে নিন্দা করবার জন্যে মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু ভেবে দেখলুম এ বালকের এই অভ্যাস ও শিক্ষা অনেক দিনের। পর্ব্বত ক্রোড়ে প্রতিপালিত এই সকল বালকবালিকা মাতৃক্রোড় হতে পর্ব্বত ক্রোড়ে প্রথম পদক্ষেপ করেই এই রকম কষ্টসহ, নির্ভীক হ'তে শিক্ষা করেছে, —তাই বুঝি একজন য়ুরোপীয় কবি বলেছেন পর্ব্বত স্বাধীনতার প্রসূতি,—কিন্তু আমরা কোথা হতে সাহসী, কষ্টসহ হতে শিক্ষা করবো? ছেলেবেলা চলতে চলতে দৈবাৎ যদি পদস্খলন হতো তাহলে মা দৌড়ে এসে কোলে নিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতেন এবং মাটীতে লাথি মেরে বুঝিয়ে দিতেন আমার কিছু দোষ নেই যত দোষ সমস্ত মাটীর, সেই তাঁর সোণার যাদুকে গড়াগড়ি খাইয়েছে। তার পর ক্রমে বড় হয়ে হারিকেন লণ্ঠনছাড়া চলতে শিখিনি এবং ঠাকুরমার রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প শুনে নিজের লম্বা ছায়াকেও বিকট ভূত মনে করে কতদিন চীৎকার করেছি, সুতরাং আমাদের সঙ্গে এদের কি রকম করে তুলনা হ'তে পারে? আমরা আহারাদি করে মন্দিরে গমনের উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলুম। পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করবেন, এই আহারের পূর্ব্বে আমার ডাইরীতে এমন একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে যা এখানে উল্লেখ করতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল কিন্তু আমার এই ডাইরি নকল করবার সময় আমার কাছে আমার একটি আত্মীয়া বসেছিলেন, এই ব্যাপারটি গোপন করাতে আমার উপর এমন গঞ্জনা আরম্ভ কল্লেন যে আমি সেটি উল্লেখ না করে থাকতে পাচ্ছিনে, বিশেষ তাঁর অনুরোধ উপেক্ষণীয় নয়। ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর নয় একটু চা খাওয়া মাত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগে এই শীতের মধ্যে একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে যোশীমঠ হতে কিঞ্চিৎ চা সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল, সন্ধ্যার পর বিশেষ আয়েস করে সেই চা পান করা গিয়েছিল, তাতে আমাদের যে তৃপ্তি হয়েছিল তা বর্ণনানীত, এবং স্বামীজী চা পানের উপসংহারে যে "আঃ" বলে আরাম জ্ঞাপক একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন তা অনেকদিন মনে থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মাত্র, তবু আমাদের এই পর্ব্বতের মধ্যে কাত্‌লির অভাবে লোটাতে জল গরম করে, চিনির অভাবে গুড় দিয়ে চা খাওয়ার বিড়ম্বনা কেন এই মনে করে যদি কোন বিদ্রূপপরায়ণা পাঠিকা নাসিকা কুঞ্চিত করেন

এই ভয়ে আমি এই চা খাওয়ার বৃত্তান্তটি বেমালুম গোপনের চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমুর হলে নিতান্তই বিপদ। যাহোক এই ব্যাপার প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য করায় আমি তাঁর উপর বড় রাগ করেছিলুম কিন্তু তাতে আমাকে তিনি যে গল্প শুনিয়ে দিলেন তাতে আমি বড়ই জব্দ হলুম। তিনি বল্লেন, একবার পুরুষোত্তমে এক সন্ন্যাসী একখানা ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়েছিল, কতকগুলি যাত্রী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীদের ডেকে বল্লে "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুখ দেখ; যদি উঁচু জায়গায় মাথা না রাখলে শোয়া না হয়ত সন্ন্যাসী না হলেই হতো।" সন্ন্যাসী এই কথা শুনে ইঁটখানি দূরে ফেলে দিয়ে শুধু মাথায় শয়ন কর্‌লে তাতেও বেচারার অব্যাহতি নেই, পূর্ব্বকথিত যাত্রী বলে উঠলো "হুঁ সুখটুকুও আছে রাগটুকুও আছে।" আগে যদি জানতুম কিছুদিন বাদে আমাকে এমন একটা বিড়ম্বনা সহ্য করত্তে হবে তাহলে কখন বিষ্ণুপ্রয়াগের সেই মন্দিরে বসে চা খাবার যোগাড় কর্ত্তুম না, আর কল্লেও ডাইরীতে তার উল্লেখ কর্ত্তুম না, বুঝলুম ভগবান মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ না করুন, নিদেন দু এক জায়গায় ভবিষ্যতজ্ঞ না করে কাজ ভাল করেন নি।

আহারাদির পর স্বামীজী ও বৈদান্তিক শয়ন কল্লেন, আমার চক্ষে ঘুম নেই। মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল মন্দিরের নীচে সঙ্গমস্থল হতে জলের 'হু' 'হু' শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিচ্ছে। কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলুম, তখন রাত্রি অনেক এবং আকাশে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রের উদয় হয়েছিল, বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ ঘুমন্ত, তার উপর চন্দ্রের মৃদু রশ্মি ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে জলের ধারে এলুম এবং অনেক ক্ষণ সেখানে বসে রইলুম। অতি সুন্দর মধুর রাত্রি, যদি এত শীত না থাকতো। ছোট ছোট ধাপ, তার উপর নির্ম্মল জল আছড়ে পড়ছে আর ফেনিল আবর্ত্তের উপর জ্যোৎস্না পড়েছে, একখানা সুন্দর ছবির মত দেখাতে লাগলো। গভীর রাত্রে এই অবিরাম শব্দ এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব যেন আকুল ভাবে বোলতে লাগলো :—

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!
আমি কেবল কাতর গীত!
কেহবা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসা কাতর ভাষা!"

অনেকক্ষণ এখানে বসে থাক্‌লুম, যতক্ষণ বসেছিলুম বোধ হয়েছিল বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখ্‌ছি, যেন মৃত্যুর আবরণ ভেদ করে এক মহাজীবনের অমর প্রান্তে এসে লেগেছি, এখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় যাব কে জানে?

অনেক রাত্রে স্বস্থানে এসে শয়ন কল্লুম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লুম।

শ্রীজলধর সেন।

অশিক্ষিতা।

শিক্ষায় কি রমনীর কিছু কাজ নাই!
কিছু নাহি জেনে ফল বিশ্ব কিবা ঠাঁই?
প্রতি পত্রে প্রতি পুষ্পে প্রতি কণা মাঝে,
কি মহা করুণা কথা জাগ্রত বিরাজে,—
রবি শশী তারা আর শত কোটি বিশ্ব,
রেখেছেন রশ্মিবদ্ধ কে তিনি অদৃশ্য,
কেন বা পেয়েছি প্রাণ, কার তাহা দান,
কোথায় যাইতে হবে হ'লে অবসান,—
কর্ত্তব্যের তরে যত পুণ্যবানগণ
কেমনেতে করেছেন নিজ প্রাণপণ,
কাজ নাই শুনে কি সে মহত্ত্বের ভাষা!
কাজ নাই বুঝে যত উচ্চ মহা আশা!
উপহাস করি সদা বলিতেছ সবে,
শিক্ষা পেয়ে বাঙ্গালীর মেয়ের কি হবে?
আফিসে যাবে কি তারা বাঁধিয়ে পাগড়ি?
আনিবে টাকার তোড়া করিয়ে চাকরী?
বুঝিয়াছ সারমর্ম্ম তাই কি শিক্ষার?
পাশ দিয়ে ছলে বলে টাকার জোগাড়!
বিনীত মস্তকে তাই আফিসে যাইয়া,
টাকার সহিত আন পাদুকা বহিয়া!
ঘরে বসে সেই ঘৃণ্য ভিক্ষাঅন্ন খাও!
নিন্দা তোষামোদ ঘুমে সময় কাটাও!
বি-এ এম-এ আদি যত কলেজ পরীক্ষা,
তাই কি ভেবেছ সবে চরম সুশিক্ষা?
কি জানি পাইলে নারী সত্য, প্রেম জ্ঞান
তোমাদের কর্ম্মে যদি বাধা করে দান!
পেটে খেলে পিঠে সয় অতি বড় তত্ত্ব,
যদি না বুঝিতে চায় ইহার মহত্ত্ব!
পাঠাতে সন্তানে যদি সংসারের রণে
নাহি বলে "বুঝে চলো, যেমন যে ক্ষণে,
যাহা কর দেখো নিজে থেকো সাবধান,
আর সব হয় শেষ বাঁচিলে পরাণ।"
যদি বলে "শুন বৎস সত্য ধর্ম্মে বরি
করিও কর্ত্তব্য কাজ প্রাণপণ করি।
সুখ দুঃখ যাহা পাও যেয়োনা বিপথে,
মৃত্যু যদি হয় হোক, চলি বিভু মতে।"
হায় হায় একি ঘোর বিপদ আশঙ্কা!
কোথায় পাদুকা বহা, কোথা শুভ্র টঙ্কা!
কাজ নাই রমণীরে শিক্ষা দিয়ে তবে,
তাহলে বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী না রবে!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

লান্‌করানের উজীর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[শোলি খান্নুমের গৃহে ইহা সংঘটিত হয়]

তৈমুর আকা। (নিসাখান্নুমের সম্মুখে দণ্ডায়মান) বল, দেখা যাক্, কি করা উচিত। উজীরের এ কি খেয়াল চেপেছে? আমি কি তবে মরেছি নাকি যে সে তোমায় যাকে তাকে দিয়ে দিতে পারবে? খাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতায় তার কি লাভ?

নিসাখান্নুম। কিন্তু তুমি কি জান না তাঁর কি লাভ? লাভ—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান!

তৈমুর আকা। কিন্তু খাঁ ওকে এ পর্য্যন্ত যত খ্যাতি প্রতিপত্তি দিয়েছেন তাতে কি ওর তৃপ্তি হয় নি?

নিসাখান্নুম। তৃপ্তি হয়েছে বৈকি, কিন্তু তার স্থায়ীত্বে বিশ্বাস নেই। কুটুম্বিতাসূত্রে খ্যাতি আর প্রতিপত্তিকে কায়েমী কর্ত্তে চান।

তৈমুর। বেচারা নিতান্ত আহাম্মক। খাঁ ওর চোখের সামনে নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেন তা ও দেখেও দেখে না বুঝি। যাহোক কোন রকমে এর একটা প্রতীকার বের কর্ত্তে হবে। আমাকে এতদিন তুমি মিছিমিছি ওকে সব কথা খুলে বল্‌তে দাও নি। কাল আমি চাকর দিয়ে বলে পাঠাব যেন এ রকম বৃথা সংকল্প ত্যাগ করে, যদি না শোনে তবে নিজের হিত নিজে বুঝবে না।

নিসাখান্নুম। রক্ষে কর আকাজান। এ রকম খেয়াল ছাড়! এ ব্যাপার উজীরকে জানান অসম্ভব। কতবার না উজীরকে বল্‌তে শুনেছি "তৈমুর আকাকে মেরে ফেলার জন্যে খাঁ হামেষা ছুতা খুঁজে বেড়ান।" আর আমি জানি তিনি এই সম্বন্ধে উজীরের সঙ্গে বারবার পরামর্শ করেন। আমাদের প্রণয়ের কথা যদি উজীর জান্‌তে পারেন নিজের স্বার্থ নিজের হিতের জন্যে তৎক্ষণাৎ খাঁর কাছে গিয়ে জানাবেন যে তাঁর কণের উপর তুমি দৃষ্টি দিয়েছে। আরও বিশেষতঃ এই জন্যে যে উজীর নিজেই তোমার উপর ভারি অপ্রসন্ন।

তৈমুর আকা। আমার বাপের রাজ্য সম্পদ দখল করেও খাঁর সন্তোষ হল না? আমাকে মেরে ফেলার অভিসন্ধি হচ্ছে? বৃথা কল্পনা!

নিসাখান্নুম। অবিশ্যি! তোমায় নিজের সব কাজের বিঘ্ন বলে জানেন। আমি ঢের শুনেছি তিনি সন্দেহ করেন তুমি হয়ত কোন্ দিন পৈতৃকরাজ্যে দাবী করবে। লোকের সামনে বাধ্য হয়ে তোমায় সম্মান দেখান কিন্তু একবার সুবিধা পেলে আর একটি দিনও বাঁচতে দেবেন না।

তৈমুর আকা। এর মতন খাঁদের কস্মিন্‌কালে সাধ্য নেই আমায় মারে। অধিকাংশ প্রজা আর সমস্ত আমীর ওমরারা আমার বাপের গুণে আমায় আন্তরিক ভাল বাসেন। আমি মুরগী নই যে ওরা আমার মাংস খাবে। আচ্ছা বল দিকি উজীরের আমি কি করেছি যে সে আমার প্রতি অপ্রসন্ন?

নিসাখানুম। তুমি যে পুরোণ উজীরের ছেলে মির্জা সলিমকে নিজের কাছে আনিয়েছ, তাকে তোমার পেস্কার করেছ। উজীর মনে করেন তোমার হাতে যদি কখন ক্ষমতা আসে তাহলে বিনা বাক্যব্যয়ে তোমার আশ্রিত মির্জা সলিমও তার বাপের পদ পাবে। আপাততঃ তাঁর এই অভিপ্রায় যে খাঁকে বলে তাকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করে দেন।

তৈমুর আকা। আমার পেস্কার ওর কথায় অমনি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হল আর কি। আমার বাপের নিমক যেন ওর চোখ অন্ধ করে দেয়—আমার সম্বন্ধে এমন মন্দ অভিপ্রায় পোষণ করে? আল্লা যদি সুপ্রসন্ন হন, ওর সব চক্রান্ত উল্টে দিয়ে আমি নিজের মৎলবে চল্‌ব। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ উজীরকে এখনও আমাদের প্রণয়ের কথা জান্‌তে দেওয়া হবে না। শোলি খানুম কোথায়? তাঁর সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে।

নিসাখানুম। মার ঘরে আছেন।

তৈমুর আকা। তুমি গিয়ে তাঁকে একবার এখানে ডেকে আন্‌তে পার না?

নিসাখানুম। মা ঘরে নেই, দুজনেই সেখানে যাই চল।

তৈমুর আকা। বেশ, চল যাই।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ, তদনন্তর)

জীবাখানুম। (প্রবেশ পূর্ব্বক) আরে হতচ্ছারি অবশেষে তোমার এদ্দূর বাড়াবাড়ি হয়েছে যে আমার বাঁদীকে গালমন্দ করেছ, আমার পেছনে লেগেছ? উজীর তোমার এমনিই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে? (গৃহে কেহ নাই অবগত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ) আঃ দেখ দেখ ছুঁড়ীটা আবার কোথায় গেছে দেখ। উজীরের ঘর দোর সব চুলোয় যাক্—শেষ কালেতে আমার এমন দশা করেছে! (নিষ্ক্রমণেচ্ছা। পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ ত্রস্ত হইয়া ভূমে উপবেশন) ওমা কি হবেগো! বেগানা পুরুষের গলার আওয়াজ আস্‌ছে! ওমাগো! কোথায় যাবোগো! এখনি দোর দিয়ে ঢুকে পড়্‌বে! কি করি! কেমন করে বেরিয়ে যাই। হায়! হায়! কোন্ ধুলো মাথায় ছড়াই?

(ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে পরদার পশ্চাতে লুকায়ন। তদনন্তর তৈমুর আকা ও শোলিখানুমের প্রবেশ)।

তৈমুর আকা। তোমার মা কি শীগগির স্নান করে ফির্‌লেন? তাঁর ঘরে কথা কইতে পেলুম্‌না, ফুর্‌সুৎ হলনা। আমার ঢের কথা আছে, কিন্তু এখানে উজীরের আস্‌বার কোন সম্ভাবনা নেইত?

শোলিখানুম। খাতির জমা হয়ে বসে থাক। উজীর আজ এখানে আস্‌তে পারেন না।

তৈমুর আকা। পারেন না কেন?

শোলিখানুম। আজ যে জীবাখানুমের ঘরের পালা। তার গঞ্জনা আর হাঙ্গাম হুজ্জুতের ভয়ে এখানে আস্‌তে সাহস কর্‌বেন না।

তৈমুর আকা। একথা হিসবী বটে; কিন্তু শুধু এর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সতর্কতাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। আর, একবারত তিনি হঠাৎ এসে পড়েও ছিলেন।

শোলিখানুম। নিশ্চিন্ত হও, নিসাখানুমকে দালানের সাম্‌নে বসে থাক্‌তে বলেছি। যদি উজীরকে এদিকে আস্‌তে দেখতে পায় তক্ষুনি আমাদের খবর দেবে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছনাত?

তৈমুর আকা। না, আমি ভয় পাব কেন? কিসের ভয়? আমি কাউকে ভয় কর্‌বার লোক নই! কিন্তু কতক গুলো কারণে আমি চাইনে যে উজীর আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে খাঁকে গিয়ে খবর দেয়। আমার যে মৎলবগুলো আছে সেগুল আগে হাসিল কর্ত্তে চাই।

নিসাখানুম। অবিশ্যি—উজীরকে এসব জান্‌তে দেওয়া হবে না, নয়ত খাঁকে গিয়ে বলে দেবেন, তাহলে আর কি—"গাধাকে আন, তার ঘাড়ে সীম বোঝাই কর।"

(এতদ্দণ্ডে নিসাখানুম গৃহে মাথা ঢুকাইয়া) আল্লা রক্ষে করুন উজীর আস্‌ছেন।

শোলি খানুম।—(ত্রস্তে দ্বারের সম্মুখে গিয়া দেখিতে দেখিতে) রক্ষে আল্লা! উজীর একেবারে সিধে আমার ঘরের দিকে আস্‌ছেন। কিন্তু তৈমুর আকা তোমার আর কোথাও যাবারও যো নেই এখানে থাক্‌বারও যায়গা নেই।

তৈমুর আকা। তাহলে কি করা যায়? কি করব? বোধ হয় ওকে কেউ বলে দিয়েছে যে আমি এখানে আছি। খোদার কসম, যে কেউ ওকে আমার এখানে আসার কথা বলেছে এই খাঁড়া তার নাড়ীভুঁড়ী কুকুরের খাদ্য কর্‌বে (নিজের খড়্গে হস্ত প্রদান)

শোলিখানুম। লক্ষ্মী বাপ আমার এখন কথা কবার সময় নয়, এসো এই পরদার পিছনে যাও। আমি দেখি যদি ওঁকে কোন রকমে বিদায় কর্ত্তে পারি। (কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তৈমুর আকার পরদার আড়ালে গমন)

উজীর (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গৃহে প্রবেশান্তর) শোলি খানুম কি কর্‌ছ? তোমার শরীর ভাল ত?

শোলিখানুম। আল্লা ধন্য হোন! আপনার দৌলতে আমার শরীর সর্ব্বদাই ভাল থাকে। আপনি কেমন আছেন? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে আজ এখানে আপনার আগমন হয়েছে। কিন্তু আপনি এমন খোঁড়াচ্ছেন কেন? ভুরু কুচ্‌কিয়ে রয়েছেন কেন? আল্লা ত কোন বালাই দেন নি?

উজীর। উঃ আজ আমার কাঁধে যে একটা কাজ চেপেছিল তার কথা কয়োনা, জিজ্ঞেসও কোরোনা—কখন আমার কল্পনায়ও আসেনি। কুকুরের মত বিশ্রী দিন গেছে।

আগা মস্থদ এক পেয়ালা কফি তৈরি করে আন। (খোজা মস্থদের শিরোনমণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

শোলিখানুম। বলুন না? শুনি আপনার ঘাড়ে কি এমন কার্য্য চেপেছিল? কি থাক্—হয়ত বল্‌তে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে, আপনার বিরক্ত ধর্‌বে।

উজীর। না, বেশীক্ষণ লাগ্‌বেনা। এই হয়েছিল আর কি যে আজ জন কতক আমীর ওমরার সঙ্গে খাঁর সাম্‌নে বসেছিলুম, তৈমুর আকার জোরের কথা হচ্ছিল। সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল সমস্ত লানকরানে তার জোরের কাছে কেউ এগোতে পারে না। খাঁও তাতে সায় দিলেন। আমি অস্বীকার কর্‌লুম্। বল্লুম, তৈমুর আকার কিছুই জোর নেই, যদিও রোজার মাস্রে ইদের দিন কতক লোককে জমীতে পেড়ে ফেলেছিল বটে, কিন্তু তারা নিতান্ত বাচ্ছাকাচ্ছা। তৈমুর আকা হজুরে দাড়িয়ে ছিল। খাঁ আমার কথা না মেনে বল্লেন "তুমি কোন্ প্রমাণে তোমার কথা প্রতিপন্ন কর্‌বে?" আমি জবাব দিলুম "আমার পদের অনুপযুক্ত যদি না হত তাহলে দেখ্‌তেন এই পঞ্চাশ বছর বয়সে তৈমুর আকার সঙ্গে কুস্তি করে তাকে মাটীতে পেড়ে ফেল্‌তুম।" খাঁরও বরাবর এই রকম কাজেই খুব সখ, হুকুম কর্‌লেন তখুনি আমায় তৈমুর আকার সঙ্গে কুস্তি কর্ত্তে হবে। আমিও নাচার হয়ে উঠ্‌লুম, আমরা হাত ধরাধরি কর্‌লুম, আমার অপমানের ভয়ে গায়ে কেমন জোর এল, এক মিনিট না যেতে যেতে তাকে হাঁটুর নীচে ধর্‌লুম, তারপরে জানিনে কেমন করে মাটীতে ফেলে দিলুম, বেচারা ছোকরা অজ্ঞান হয়ে ছবির মত পড়ে রইল, এদ্দূর হয়ে ছিল যে আধঘণ্টা পরে তার ধাত ফিরে এল, জোর কর্ত্তে দিয়ে আমার কোমরে চার লেগে ভয়ানক ব্যথা হয়েছে তাই সিধে হয়ে চল্‌তে পাচ্ছিনে।

শোলিখানুম। (হাসিতে উপক্রম করিয়া) হে আমার প্রাণপ্রিয় এ কি কাজ করেছেন? পরের ছেলে যদি পড়ে মারা যেত তাহলে তার মায়ের জীবন কি অন্ধকার হয়ে যেত?

উজীর। আমি নিজেও খুব দুঃখিত হয়েছিলেম, কিন্তু তাতে কি ফায়দা বল? মোদ্দা এই রকমটা ঘটে ছিল।

শোলিখানুম। আচ্ছা বেশ, তাহলে বেচারা এখনও সেখানে পড়ে আছে আর তুমি উঠে আমায় তোমার বীরত্বের নিশানা দিতে এসেছ?

(উজীরের এই সকল বাক্যে তৈমুর আকার হাস্য সম্বরণ অসম্ভব হইয়া ফুক করিয়া হাস্য। উজীরের দ্রুত উঠিয়া গিয়া পরদা উঠাইয়া জীবাখানুম ও তৈমুর আকাকে পরদার পশ্চাতে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হওন। শোলিখানুমও জীবাখানুমকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত)

উজীর। শুভনাল্লা। এ আবার কি ব্যাপার? (তৈমুর আকার দিকে চাহিয়া তারস্বরে) আকা তুমি এখানে কি কর্‌ছ?

(তৈমুর আকার ঘাড় হেঁট করিয়া অবস্থান। পুনশ্চ উজীর) নিদেন কথা কও,

শুনি তুমি কোত্থেকে ? এখানে কোথায় ? কি করছিলে এখানে ? তোমার কি কাজ ছিল ?

(তৈমুর আকা কোন জবাব না দিয়া পরদার পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া নিষ্ক্রমণের উপক্রম)

উজীর। (তাঁহার হাত ধরিয়া) যতক্ষণ না বল্‌বে এখানে কি করছিলে ততক্ষণ আমি যেতে দিচ্ছিনে, বল।

তৈমুর আকা। (হাত ঝাঁকাইয়া) ছেড়ে দাও।

উজীর। (আরও শক্ত করিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া) অসম্ভব ! আমার কথার জবাব না দেওয়া পর্য্যন্ত যেতে পারবে না।

(তৈমুর আকা অনন্যোপায় হইয়া এক হস্তে উজীরের ঘাড় ও অপর হস্তে পা ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে বস্তার ন্যায় ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত লাফাইয়া বহির্গমন।)

উজীর। (মুহূর্ত্ত পরে আত্মস্থ হইয়া, জীবাখানুমের দিকে চাহিয়া) আরে পাপিষ্ঠা ! আমার মাথায় ফের এ কি বালাই আন্‌লি ?

জীবা খানুম। আমি তোমার মাথায় আনলুম না কি ? আমার সঙ্গে এর কি যোগ ? যাহোক আহা বেচারা—তুমি খবর পেলে কোত্থেকে ?

উজীর (ক্রোধান্বিত হইয়া) চুপ্ কর্ আবাগীর বেটী, ফের বক্ বক্ করিস্‌নে তোকে আমি চিনেছি। এই সব তোমারই কাণ্ড ! আল্লা যদি রাজী হন আমি তোমায় দেখাচ্ছি মজা।

জীবা খানুম। আরে হতভাগা ! আমাকে মজা দেখাবে কেন বল দিকিন ? আমি কি আইনের খেলাপ করেছি ? কারো সঙ্গে প্রণয় করেছি ? কারো বাড়ী গেছি ? চুরি করেছি ? পাপ করেছি ? না কি করেছি ?

উজীর। বজ্জাত মাগি ! এর বেশী আর কি কর্ত্তে চাস্ ? পরদার পিছনে অমন মোটা গর্দ্দানের সঙ্গে ধরা পড়েছিস্ !

জীবাখানুম। আহা বেচারা !—তোমার স্ত্রী শোলিখানুমকে জিজ্ঞেস কর বেগানা পুরুষ তার ঘরের ভিতর কি করছিল।

উজীর। লক্ষ্মীছাড়ি ! তুই আগে আমায় জবাব দে ! এক পরদার পিছনে পর পুরুষের সঙ্গে কি করছিলি ?

জীবাখানুম। আচ্ছা, খুব ভাল। আগে আমি বলি তারপরে ও বলুক, দেখি ও কি বলে ? তোমার স্ত্রী শোলিখানুম আমার দাসীকে গাল দিয়েছিল, তাই আমি ওকে বল্‌তে এসেছিলুম "তোর গাল্‌চের মাপে পা বাড়াস নে কেন ? আমার বাঁদী তোর রুটী খায় না, তাকে কেন গাল দিয়েছিস্ ?" এসে দেখলুম ঘরে নেই। তখুনি ফিরে যেতে চাইলুম। দেখলুম শোলিখানুম একজন পুরুষের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঐ দিকে

থেকে ঘরের বাগে মুখ করে করে আস্‌ছে। অবাক হয়ে গেলুম, বেরোতে পাল্লুম না, পরদার আড়ালে গিয়ে রইলুম যে দেখি এখানে ওরা কি করে, তার পরে গিয়ে তোমায় খবর দেব। বিশেষ আমার মাথা খালি ছিল তাই পরপুরুষের সাম্‌নে বেরোতে পার্ত্তুম না। এমন সময় তুমি এসে পৌঁছলে। যখন খুব কাছে এসেছ, তখন সে আর উপায়ান্তর না দেখে তোমার কাছ থেকে মুখ লুকোবার জন্যে পরদার আড়ালে এল, যতক্ষণ না তুমি যাও এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।

উজীর। যদি তাই হয় তাহলে তুই তখন বেরিয়ে এসে আমায় খবর দিলিনে?

জীবাখানুম। আমি যদি পার্ত্তুম তাহলে কি আর আস্‌তুম না? সে বল্লে একটী কথা কও ত এই খাঁড়া বাঁট পর্য্যন্ত তোমার বুকে বসিয়ে দেব।

উজীর। (সন্দিগ্ধভাবে শোলিখানুমের দিকে চাহিয়া) শোলি! ঠিক বল দিকিন! এই পুরুষ কি তোমার কাছে এসেছিল?

শোলিখানুম। তোমার এই স্ত্রীটির তোতা পাখীর মত বাজে কথা বেশী কথা আর মিছে কথা কওয়া অভ্যেস। আমি ও ছোঁড়াকে কখন দেখিওনি, চিনিও নে।

উজীর। চেননা কেন? তৈমুর আকাকে দেখনি? খুব ভাল করেই চেন।

শোলিখানুম। তৈমুর আকা এখানে কি করছিল? আর তৈমুর আকাকে তুমি ভুঁয়ে ফেলে দিয়ে তার মার কাছে পাঠিয়ে এসে ছিলে না?

উজীর! যাও যাও! বেশী বক্‌ছ! আমার কথার জবাব দাও। তাহলে এতে করে মান্‌ছ যে তৈমুর আকা তোমার কাছে এসেছিল?

শোলিখানুম। না, মাপ করবেন। তৈমুর আকা যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমাকে ওর সঙ্গে একজায়গায় দেখতেন। জীবাখানুম জানত আজ আমি স্নানে গিয়েছি। আমার ঘর খালি পড়ে থাক্‌বে ঠাওরিয়ে ঠিক করলে এখানে তার প্রণয়ীকে আনবে আর মস্‌গুল হয়ে সুখে দিন কাটাবে। আজ ওর ঘরে তোমার যাবার পালা বলে নিজের ঘরে তাকে নিয়ে যাবার যো ছিল না। এদিকে আজ স্নানের ঘরে জল ছিল না। আমিও কিছু না ভেবে চিন্তে ঘরে ফিরে এলুম। আমি হঠাৎ এসে পড়াতে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে না। দুজনে পরদার আড়ালে গেল যে আমোদপ্রমোদ করবে আর যতক্ষণ আমি ঘরের বাইরে না যাই সেখানে লুকিয়ে থাকবে তার পরে ফুরসুৎ পেলেই বেরিয়ে আসবে। এই হচ্ছে আসল কথাটা। তোমার ঘটে বুদ্ধি জমা কর, এই বেহায়ার চাতুরীতে ঠোকোনা, না হোক আমার সম্বন্ধে মন্দ ভেবো না।

জীবাখানুম। (চীৎকার করিয়া শোলিখানুমের প্রতি) ওরে বজ্জাত! এ সব কি কথা বানাচ্ছিস, তোর নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিস, ওমা গো! একি কথা গো। আমি আত্মহত্যা করব।

শোলিখানুম। তুই বজ্জাত, তুই হতচ্ছারি! ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা কর্ ইচ্ছে হয়

করিসনে। তোর এই সব কারখানা লান্‌করানের সব্বারেরই জানা আছে। চেঁচামেচি করে কেঁদেকেটে আর নিজেকে দোরস্ত চাল বলে চালাতে পারবিনে। তোর স্বামীর চোখ আছে, দেখতে পাচ্ছে এ কাজ তোর কি আমার।

জীবাখানুম! হে আল্লা মেহেরবানী কর! ইনসাফ কর! আমি আত্মহত্যা করে মর্‌ব। ও বেটাছেলে, তুমি এই বেহায়ার মুখে থাপ্পড় মার্‌ছ না কেন? আমার নামে এমন করে বানাচ্ছে তুমিও দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ?

শোলিখানুম। হ্যাঁলা হতভাগী আমার মুখে থাপ্পড় মারতে যাবে কেন? ও যদি পুরুষ হয়ত ওর উচিত তোকে টুকরো টুকরো করে কাটে যে বেগানা পুরুষের সঙ্গে ধরা পড়েছিস্‌।

উজীর। (জীবাখানুমের প্রতি) তাইত তোকে টুকরো টুকরো করা উচিত। একটু সবুর কর্‌ আমি নিজে খাঁর কাছে যাচ্ছি। আগে তোর উপপতির সব বন্দোবস্ত করে আসি তার পরে তোর বিষয়ে মনোযোগ দেব। তুই চিরটা জীবন মিঁছে কথা বলে কাটিয়েছিস্‌। আমি তোকে চিনেছি।

জীবাখানুম (সক্রোধে) ঠিক! আমি মিথ্যেবাদী, কিন্তু আল্লা জানেন তোমরা সবাই সত্যিবাদী, যেমন তুমি একটু আগে যে গল্পটা করলে তার থেকে মালুম হল।

উজীর। আমার সাম্‌নে থেকে বেরো হতভাগি।

(জীবাখানুমের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ)

উজীর। শোলি, সত্যি বল তুমি এর কিছু জান্‌ কিনা ঠিক বল।

শোলিখানুম। আপনার মরার মাথা দেখি আমি যদি এ বিষয়ে দূষ্য কিছু করে থাকি। (এই সময় খোজা মস্দুদের কফি আনিয়া পেয়ালাতে ঢালিয়া উজীরের মাথার পশ্চাদ্দিক হইতে সম্বোধন) আকা কফী নিতে আজ্ঞে হোক্‌।

উজীর। (ফিরিয়া হস্তদ্বারা পেয়ালা আঘাত করিয়া খোজা মস্দুদের শিরে কফি ছিট্‌কান) সরে যা আধ পোড়া গাধা! এই রকম জ্বালা পালার সময় কি কফি খাবার সময় নাকি? এখন আমি খাঁর কাছে যাচ্ছি, তখন সব জানা যাবে (আকামস্দুদ সরিয়া যাইয়া, তাহার পাগড়ীর উপর পরিত্যক্ত কফি পরিষ্করণে উদ্যত।)

উজীর। (ভয়ঙ্কর বিকৃত মেজাজে) শীগগির যাও, আমার লাল ঘোড়া আন্‌তে বল, আর পাট্‌কিলে রঙ্গের জোব্বা জিনের উপর দিতে বল, ঘোড়া যেন শীগগির বের করে আনে।

আকামস্দুদ। যে আজ্ঞে হজুর। চোখের মাথা খাই! যেমন হুকুম করলেন ঠিক তেমনি করে আন্‌ছি এখুনি।

(তদনন্তর উজীরের নিষ্ক্রমণ)

শোলিখানুম। আল্লা হো আকবর! আচ্ছা বিপদে পড়া গিয়েছিল্‌। যাহোক জান বেঁচেছে। খোদার মেহেরবানী! (এই কথা বলিতে বলিতে নিসাখানুমের প্রবেশ, তাহার

দিকে চাহিয়া) নিসা, অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে—জানিস্‌নে? উজীর তৈমুর আকাকে জীবাখানুমের সঙ্গে পরদার আড়ালে দেখ্‌তে পেয়েছেন।

নিসাখানুম। সত্যি? জীবাখানুম কি বল্লে পরদার পিছনে কি কর্‌ছিল?

শোলিখানুম। আমি জানিনে মাগী কখন এসে ওখানে গিয়ে আমার জান বাঁচিয়েছে। কিন্তু খাঁ নিঃসন্দেহ তৈমুর আকাকে মেরে ফেল্‌বে। জানিনে তাকে বাঁচানর কি উপায় আছে।

নিসাখানুম। ভয় কোরোনা! খাঁ তৈমুর আকাকে মার্ত্তে পার্‌বে না। কিন্তু এ রকমটা না হওয়াই উচিত ছিল। এখন যখন ঘটেছে তখন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে। মামণি তোমায় ডাকছেন, তাঁর ঘরে চল। আগা মসুদকে খাঁর দেউড়ীতে পাঠিয়ে দিই আমাদের সব খবর এনে দিক্‌।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও যবনিকা পতন)　　　শ্রীসরলা দেবী।

বিদ্বজ্জন-মিলন।

(কেম্ব্রিজ)

মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। মানুষের সহিত আলাপ ব্যবহারে যে ভাব মনে হয় তাহা যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিলে সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে বোধ হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষাও যে তাহা হইতে অসম্ভব এমন নহে। মানুষ প্রতি দেশেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাই কোন দেশের সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবার ইচ্ছা হইলে সে দেশের মানুষকে শিক্ষার বিষয় করিলে সিদ্ধি লাভের প্রশস্ত উপায় পাওয়া যায়। যত শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইবে ততই উপায় প্রশস্ততর হইবে। ইহার মধ্যে কেবল একটী কথা আছে। গুণী লোক দিগের সহিত আলাপ ব্যবহারের সময় যদি আমরা কেবল গুণের প্রতিই লক্ষ্য করি তাঁহাদের ভিতরকার মনুষ্যত্ব—যাহা শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ, গুণী অগুণী, সকলেরই মধ্যে সাধারণ—সেটির প্রতি দৃষ্টিচ্যুত হই, তাহা হইলে ঠকিতে হয়। পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টি তাঁহার পরিচায়ক মাত্র, গুণ তেমনই মানুষের পরিচায়ক মাত্র—মানুষ গুণের অতীত। এক জন মনুষ্য চুরি করিয়াছে তাহাকে যদি আমরা কেবল চোর বলিয়া জানি তবে তাহাকে আমরা কিছুই জানিলাম না। সচরাচর মনুষ্য-ব্যবহারে তাহাকে চোর ভিন্ন অপর কিছু বলিয়া জানিবার উপায়ও নাই, এজন্য সুচিত্রিত উপন্যাস এত উপাদেয়। কবি নিজের কবিতার অতীত—কবিতা তাঁহার পরিচায়ক মাত্র। কোন কবির কবিতা তন্ন তন্ন করিয়া অভ্যাস করিলেও কবি আমাদের নিকট যথার্থ রূপে পরিচিত হন না। কবিতা উপভোক্তার তীক্ষ্ণ অনুভূতি শক্তি ও কল্পনাপ্রাখর্য্য না থাকিলে কখনও কবিকে

চিনিতে পারেন না। এ নিমিত্তই যথার্থ সহানুভূতির সহিত রচিত জীবন-চরিত এত আদরের বস্তু।

এ দেশে বিদ্যার প্রভাবে পরিচিত এমন যে দুই চারি জনের সহিত সৌভাগ্য ক্রমে লেখকের পরিচয় হয় তাঁহাদের সহিত আলাপ ব্যবহারে লেখকের মনে যে চিত্র পড়িয়াছে তাহারই একটা স্থূল মানসিক ছবির প্রতিরূপ অঙ্কিত করা এখানে উদ্দেশ্য। কালস্রোতে ছবির অনেক সূক্ষ্ম রেখা, অনেক বাঁকা চোরা, অনেক আলো ছায়া, বিলুপ্ত হইয়াছে। ভালই! তাহাতে লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনেক লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে তাহা থাকিবার বস্তু, চিত্রের অনন্যপ্রিয় খুঁটিনাটির বিলোপে সাধারণের সুবিধাই।

ইংলণ্ডে জুন মাস যথার্থ বসন্তের রাজ্য। মাঠে সবুজ কার্পেট বিছান সে সবুজের কাছে আমাদের দেশের সবুজ রং কতকটা হলুদ বর্ণ দেখায়। বড় বড় অক্‌সাইড ডেজী ফুটন্ত,—যেন কার্পেটে বোনা ফুল। ডেজী চসারের আমল হইতে ইংরেজ কবির প্রিয়—কবিতাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা জানেন। ইংরেজ গ্রাম্যকন্যারা এই ফুলে তুক করে। প্রিয়তম ভালবাসে কিনা একথা নির্জ্জনে ডেজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়। একটী ডেজীকে সস্নেহে বৃন্তচ্যুত করিয়া প্রণয়কাতরা "সে ভাল বাসে" বলিয়া একটী পাপড়ি ছিন্ন করে। "সে ভাল বাসে না" বলিয়া অপর একটী পাপড়ি ছিন্ন হয়। এইরূপে He loves me, He loves me not বলিয়া এক একটী করিয়া সমুদয় পাপড়ি গুলি ছিঁড়িলে শেষের পাপড়ির সহিত যে কথার মিল হয় তাহাই ফুলের গণনার ফল। বাল্যাবধি ডেজীর প্রশংসা শুনিয়া প্রথম সাক্ষাতেই যেন পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া স্নেহ জন্মায়। চারিদিকে ফুটন্ত buttercup, cowslip প্রভৃতি ফুলের যে রূপ প্রাচুর্য্য তাহাতে পা ফেলিতে একটুকু সঙ্কোচ হয়। এই মাঠভেদ করিয়া রূপার তারের মত ক্ষুদ্র একটী জল ধারা চলিয়া গিয়াছে—ওই ক্যামনদী। ইহা হইতেই কেম্ব্রিজের নামকরণ হইয়াছে। দুই তীরে গাঢ় শ্যাম নম্রশিরঃ তৃণরাজি—ঘাষও ব্র্যাকন্। অদূরে দীর্ঘ, সরল, ঘনপত্র পাদপের বৃক্ষাবলী—যেন কোন যাদুকর কর্ত্তৃক এই মায়ার রাজ্যে বাস্তবের প্রবেশ নিষেধের জন্য প্রহরী রূপে স্থাপিত হইয়াছে। চক্ষু তুলিয়া আর একটুকু দূরে চাহিলেই গম্ভীর মূর্ত্তি কেম্ব্রিজের প্রাচীন বিদ্যামন্দির সমূহ প্রস্তরময় অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বিদ্যার গতি নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৮৮৪ সন জুন মাসের কোন একটী স্নিগ্ধপূত সায়াহ্নে ট্রিনিটি কলেজের ভিতর দিয়া প্রসারিত রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিলে দেখিতে পাইতে একজন অর্দ্ধ বয়স্ক, লম্বা টুপী, ইংরেজ ও একজন এদেশীয় যুবক পাশাপাশি হাঁটিয়া যাইতেছে। ইংরেজ নাতিদীর্ঘ, কাঁচা পাকায় মিশান দাড়ী, সোণালি আভার চুল, হাতে সাদা কাপড়ের বেরাটোপ দেওয়া ছাতা, ভদ্রোচিত সাদাসিদে পোষাক পরা। ইনি ফ্রেডেরিক মায়ার্স। ইহাঁর Life of Wordsworth অনেক কালেজের ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত। ইনি একজন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর।

আজকের মত স্কুল পরিদর্শন শেষ করিয়া এই কতক্ষণ রেলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ষ্টেশনে পূর্ব্বেকার বন্দোবস্ত মত আগন্তুক ভারতবর্ষীয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইনি বাড়ী ফিরিতেছেন। বিদেশীকে দু'চারি দিনের জন্য আতিথ্য দিবেন।

ক্রমে সহর পিছু রাখিয়া পশ্চিমদিকে সহরতলীর দিকে দুইজন সহযাত্রী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাকাবাড়ী, লাল রাস্তা ক্রমে কমিয়া গাছ পালা, বাগান, cottageএর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। দু'দিকে সবুজ রঙের সজীব বৃক্ষের কেয়ারি করা বেড়ার ভিতরের রাস্তা ধরিয়া দুইজনে চলিতে চলিতে একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িলেন। অনতিদূরে রাস্তার বাম ধারে, দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ বাগানের সামনের দিকে একটী সুদৃশ্য বাড়ী—এ দেশের তুলনায় বাড়ীটি বড় নয়, কিন্তু চৌতলা।

পৌঁছিয়া মায়ার্স পকেট হইতে চাবি লইয়া বাহিরের দরোয়াজা খুলিলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আগন্তুককে সাদরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। দাসীকে হলের টেবিলের নীচে হইতে আগন্তুকের ব্যাগ লইয়া যাইতে বলিলেন এমন সময় সুবেশা, সুন্দরী মায়ার্স-পত্নী আসিয়া উপস্থিত। তিনি অভ্যাগতের সহিত পরিচিত হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন।

মায়ার্স বলিলেন, "আমাদের অতিথির জন্য ঘরের বন্দোবস্ত ঠিক আছে ত?" একবার অভ্যাগতের দিকে একবার পতির দিকে চাহিয়া মায়ার্স-পত্নী বলিলেন, "মিঃ—উহাঁর ঘরে গিয়া বোধ হয় সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক দেখিবেন। তুমি উহাঁকে উহাঁর ঘরে লইয়া যাওনা"—বলিয়া মায়ার্সের দিকে চাহিলেন।

তৃতীয় তলায় অভ্যাগতের ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছিল। সিঁড়িতে যাইতে যাইতে মায়ার্স বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে এখন অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রহিয়াছেন— এড্‌বিন আর্ণল্ড, হেনরি জেমস্, মিস্ ডরথি টেনাণ্ট (ইনি মায়ার্সের শ্যালিকা, এক্ষণে বিখ্যাত আফ্রিকা পরিভ্রামক হেনরি ষ্ট্যান্‌লির সহধর্ম্মিণী)। ঘর সকল অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় তোমার ঘর ততবড় নহে বলিয়া ভাল পছন্দ হইবে না।"

"ঘর বড় না হইলেও এত বিখ্যাত লোকের সমাগমে অভ্যর্থনার কিছুই ত্রুটি রহিল না" আগন্তুক এই উত্তর করিলেন।

"এ কথা বলা কেবল তোমার সৌজন্য।"

নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া পৌঁছিলে মায়ার্স ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "কোন কিছুর দরকার হইলে দড়ী টানিয়া ঘণ্টা বাজাইলে দাসী আসিবে তাহাকে ফরমাস করিও। এখন ৭টা। সাড়ে ৭টার সময় কাপড় ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিবে। আমাদের ডিনার ৮টায়। সুসজ্জিত হইয়া নীচে আসিবার সময় স্মরণ থাকে যেন, যে আমাদের ড্রয়িং রুম সিঁড়ির বাঁ ধারে। এখন বিদায়।"

নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষগণ যথানিয়মে বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া পরে খাওয়ার ঘরে

উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্ত্তার একদিকে একটী বর্ষীয়সী মহিলা ও অপর দিকে একটী সুরম্যা ক্ষীণাঙ্গী তরুণী বসিয়াছিলেন। যতক্ষণ ডিনার শেষ না হইয়াছিল ততক্ষণ মায়ার্স যে কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের বিশেষরূপ পরিতোষ সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদের হাসির ছটায় সে বিষয়ে সন্দেহের স্থল মাত্র ছিল না। আমার একদিকে ছিলেন মিস্ ডরথি টেনাণ্ট অন্যদিকে মিস্ বার্ণার্ড (ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর্ চার্লস বার্ণর্ডের ভগিনী। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার কিছুদিন পরে কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ডাক্তার লেথামের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়)। মিস্ ডরথি টেনাণ্ট সর্ব্ব বিষয়ে মনোজ্ঞা। দীর্ঘাকৃতি সর্ব্বাঙ্গশোভন যেন মুখশ্রী বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত—স্বচ্ছ। যাঁহারা তৎকালের English Illustrated Magazine দেখিয়াছেন বা দেখিবেন তাঁহারা মিস ডিরথি টেনাণ্টের চিত্র নিপুণতা ও ভাষা প্রয়োগ কৌশলের পরিচয় পাইবেন। মরপেথ হইতে প্রেরিত পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ বর্টের ছবি অঙ্কিত করিয়া ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, মনে আছে। আরও মনে হয় যে রয়াল অ্যাকাডেমির চিত্র প্রদর্শনীতে অনেকবার "ডিঃ টেনাণ্ট" স্বাক্ষরিত ছবি দেখিয়াছি। মিস্ ডরথির একটী বিশেষ গুণ এই যে অলক্ষিতভাবে ইনি মানুষের ভিতর যাহা ভাল তাহাই টানিয়া বাহিরে আনিতে পারেন। ইঁহার সহিত আলাপে লোকের মুখে এমনি চক্‌চকে, ফুটফুটে কথা বাহির হয় যে বক্তা সময়ান্তরে তাহা স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়েন। মিস্ বার্ণার্ড গম্ভীর প্রকৃতি, সহজেই সমীহা হয়, ইনি তখন কেম্ব্রিজের একটী স্ত্রীলোকের কালেজের প্রধানা ছিলেন—গার্টন কি নিউণ হাম মনে নাই। ইঁহার সহিত সে দিনের—ঠিক বলিতে হইলে সে রাত্রের—কথার মধ্যে দু'একটী মনে আছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এদেশে কোন্ বিষয়টি বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় ?"

উত্তর। প্রাণের পরিসর। এ দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রাণ অতি অল্প।

প্রশ্ন। এ দেশের সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে কি মনে হয় ?

উত্তর। এ দেশে ঠিক রকমে অঠিক কাজ করা যায় কিন্তু অঠিক রকমে ঠিক কাজ করা যায় না।

মিস্ ডরথি টেনাণ্ট আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন এ দেশে কিছু কাল ধরিয়া বাস করিবার পর বাঙ্গলা কথা শুনিবার জন্য আমার আকিঞ্চন হয় কি না? সেই প্রসঙ্গে চিত্রকর ভ্যাল প্রিন্‌সেপ সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছিলেন তাহা এখানে সংকলন করা উচিত। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ভ্যাল প্রিন্সেপী নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর এদেশে আসেন অনেকের বোধ হয় স্মরণ আছে। তিনি এক সময় নিজের বিভাপ্রয়োগের বিষয় অনুসন্ধানার্থে পাইরিনিস পার্ব্বত্যপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক জন স্প্যানিশ মল্ল আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনি কি ইংরেজ" ? এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপনাদের মঠে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সেই মঠের একজন আইরিষ মঙ্ক মৃত্যু শয্যায় শয়ান। খড়ের বিছানার উপর কম্বল পাতা, তাহার উপর দীর্ঘাকৃতি অস্থিচর্ম্ম শেষ মুণ্ডিতশির মুমূর্ষু খ্রীষ্ট সন্ন্যাসী। প্রিন্সেপকে দেখিয়া তাঁহার গহ্বর-প্রোথিত চক্ষে অস্বাভাবিক জলুষ উদিত হইল। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আজ পনের বৎসর আমি ইংরেজী শব্দ শুনি নাই—ইংরেজের মূর্ত্তি দেখি নাই। তাই আজ মরিবার সময় মাতৃভাষা শুনিবার জন্য প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। আমার গুরু ভ্রাতারা আজ ৫।৬ দিন চেষ্টার পর তোমাকে পাইয়াছেন। তুমি "Last Rose of Summer" গাহিতে পার ?" প্রিন্সেপ দুঃখের সহিত বলিলেন, "আমি গাহিতে জানি না"।

সন্ন্যাসী। তবে কথা গুলি বল।

প্রিন্সেপ। তাহাও মনে নাই।

সন্ন্যাসী। তবে শিস্ দিয়া না হয় "হুঁ হুঁ" করিয়া একবার ঐ গানের সুরটা আমাকে শুনাও।

প্রিন্সেপ নিতান্ত অপারগ হইয়া মনের দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন জীবনের মধ্যে সঙ্গীত অনভিজ্ঞতার জন্য ইহার অধিক বেদনা কখনও অনুভব করেন নাই।

মুমূর্ষু হতাশ হইয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পর দিবস অনুসন্ধান করিয়া প্রিন্সেপ জানিলেন যে, সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইয়াছে।

আহার শেষ হইবার পর গৃহস্বামিনী অপরাপর মহিলাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া খাওয়ার ঘরের দরোয়াজা খুলিয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিলাগণ একে একে বাহির হইয়া গেলেন। চারিদিক রেসমও সাটিণের খস্ খস্ শব্দে অনুরণিত হইল—প্রতিফলিত আলোকে বিদ্যুত চমকিয়া উঠিল। পুরুষেরা আবার টেবিলের চারিদিকে বসিয়া ধূম্রপাণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ডিকাণ্টার হইতে নিজ গেলাসে ক্লারেট বা সেরি ঢালিয়া প্রতিবেশীর সামনে ডিকাণ্টর রাখিয়া দিলেন। মহিলাগণের তিরোধানে পুরুষগণ পরস্পরের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন।

কথাবার্ত্তার উৎস খুলিয়া গেল। রমণীর কোমল সান্নিকর্ষ অন্তর্হিত হওয়ায় অনেক কঠিন বিষয়ের সমালোচনা উঠিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি যথেচ্ছাক্রমে উদিত ও তিরোহিত হইল। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ব্রাইস যিনি এখন ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য তিনি কিছুকাল আমেরিকায় থাকিয়া তদ্দেশের শাসনতন্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল পুস্তকাকারে বাহির হইবে এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরেজ পাঠকমণ্ডলী উদগ্রীবভাবে সেই পুস্তকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ বিষয়ে

উপস্থিত সকলের আগ্রহ দেখিয়া এ দেশীয় লোকের মনে হইল এমন দিন কি কখনও হইবে যখন কোন্ বঙ্গীয় লেখক পাঠকদিগের মনে এরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও ঔৎসুক্য জন্মাইতে পারিবেন।

অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন একটা বড় কৌতুহলজনক গল্প করিয়াছিলেন। সত্য হউক মিথ্যা হউক কথাটা বড় বিস্ময়কর। ইংলণ্ডের উত্তর অংশে এক বাড়ীর দুইটি মেয়ে ছিলেন তাঁহারা সম্পর্কে ভগিনী, সৌহার্দ্দ্যেও ভগিনী। ছোট ভগিনী এক সময় আশ্চর্য্যরূপ স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কাল রাত্রের স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার যেখানে শেষ আজ রাত্রের স্বপ্ন সেইখানে আরম্ভ। আর ঘটনাগুলি বাস্তবের ন্যায় স্থির ও পরিষ্কার। স্বপ্নে রোজই তিনি একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখিতেন যদিও কখন না দেখিতেন তাহা হইলে তাহার উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বপ্নে তাঁহাকে সেই পুরুষের অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে হইত। তরুণীটি কখনও ইংলণ্ডের বাহির হন নাই, কিন্তু সেই পুরুষ ইচ্ছা করিলেই তখন তাঁহাকে দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতে পারিত। "আমরা এখন সুইস্ দেশে যাই" স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ এই কথা বলিবামাত্র যেন সুইটসরলণ্ডে উপস্থিত—সব ভিন্ন দৃশ্য। স্বপ্নদৃষ্ট বিবরণ পরে তদ্দেশ সম্বন্ধীয় পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন ঠিক। এই সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি রোজনামচায় লিখিতেন ও ভগিনীকে বলিতেন। কিছুকাল এইরূপ চলিতেছে এমন সময় দুই ভগ্নী একদিন Liverpoolএ একটা ball এ যান। কোন একবারকার মত নৃত্য শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় দূরে একজন পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। পুরুষ পাশ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু দেখিবামাত্র তরুণী তাহাকে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলিয়া চিনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। সেই পুরুষও ফিরিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া কথা কহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার ভগিনী আসিয়াও পূর্ব্বশ্রুত বিবরণ বলে তাহাকে চিনিলেন। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই লোকটা একজন জর্ম্মাণ ইহুদি। কিছুদিন পরে তরুণীর স্বপ্ন বন্ধ হইল। তখন অনুসন্ধানে জানা গেল সে লোক ইংলণ্ডে নাই। আবার স্বপ্ন আরম্ভ হইল—দেখা গেল সে লোক ইংলণ্ডে আসিয়াছে। এইরূপে দেখা যায় সে ব্যক্তি ইংলণ্ডে আসিলেই স্বপ্ন ঘটিত আর না থাকিলেই স্বপ্ন বন্ধ হইত।

তাহার পর সেদিন, গর্ভনপাশা, কাউন্টটলষ্টয়, পোলবুর্জে, এলেন টেরী পার্লামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনে কৃষাণ মজুরদিগের ভোট ইত্যাদির কথাবার্ত্তা হইল। তাহার মধ্যে একটি কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সেই সময় ভারতেশ্বরীর পৌত্র শোচ্যস্মৃতি ভিক্টর আলবার্ট বিদ্যার্থী হইয়া কেম্ব্রিজে ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া মহারাণী ও রাজপরিবার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিলেন, বন্যার জলের ন্যায় কথাগুলি সরিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। তবে উর্ব্বরতাবর্দ্ধক বন্যার পলিমাটীর ন্যায় ভাব তাহার এখনও রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজের শান্ত,গম্ভীর, তেজস্বী, স্নিগ্ধ রাজভক্তি একটা অপরূপ পদার্থ—আমাদের ধারণা

হয় না। ইংরেজ চরিত্রের এই উপাদানের উপর দৃষ্টি করিলে আমাদের চরিত্রের দারিদ্র্য ফুটিয়া উঠে। এরূপ উৎসাহের পদার্থ আমাদের পক্ষে একেবারেই নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে রাজা রাজন্যবর্গ ও রাজসভা দেখা যায় কি কৃত্রিম, কি অসম্ভব, কি অসার!

যথা সময়ে সকলে আবার ড্রয়িংরুমে সম্মিলিত হইবার পর ক্রমে ক্রমে বাহিরের নিমন্ত্রিতেরা চলিয়া গেলেন। পরে সেই গৃহের রমণীগণও রাত্রের মত বিদায় লইলেন। হেনরি জেম্‌স্, এড্‌্বিন আর্ণল্ড, মায়ার্স ও লেখক ড্রয়িং রুমের পার্শ্বস্থ, লম্বা ঘরে, সিঁড়ির নিকটে বসিয়া সেল্‌টজার ওয়াটার পান ও গল্প করিতে লাগিলেন। হেনরি জেম্‌সের লেখা যেমন চাঁচা ছোলা, চোস্ত,তাঁহার কথাও তেমনই। কথায় তিনি লেখার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিতে সক্ষম। তাঁহার লেখাও যেমন বুদ্ধিগত প্রীতির হেতু কথাও তেমনি। এড্‌্বিন আর্ণল্ড ঠিক বিপরীত। যেমন Light of Asiaতে ইংরেজি কবিতায় কপিলবস্তুর সন্ন্যাসী রাজ কুমারের চরিত্র দেশনির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়ে বসাইয়াছেন, ডেলি টেলিগ্রাফ যে গুণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাঠক সংগ্রহ করিয়াছে, তাঁহার কথাতেও সে গুণ আছে। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের উপর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার কথা বার্ত্তা ও সঙ্গ প্রীতিকর নবীনতায় পরিপূর্ণ। এ কথা শুনিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান জীবনের একটি প্রধান পরিতোষের বিষয় এই যে, তিনি হাঁটা ও ঘোড়ায় চড়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের নিকট একেবারে অপরিচিত নহেন। তিনি নীলগিরি পর্ব্বতে একজন কাফীকর ছিলেন এবং সম্প্রতি উপন্যাসকার বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। তাঁহার রচিত Phra the Phœnician অনেকেই পড়িয়াছেন। ইনি এড্‌্বিন আর্ণল্ডের প্রথম পক্ষের সন্তান। প্রথম স্ত্রী গত হইলে তিনি বিলিয়ম্ হেনরি চ্যানিঙ্গের কন্যাকে বিবাহ করেন। বিলিয়ম হেনরির পিতা বিলিয়ম এলেরি চ্যানিংকে এ দেশে অনেকেই জানেন। তাঁহার লিখিত নেপোলিয়ন-বোনাপার্টের জীবনী ১৫। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষ আদৃত হইত। রামমোহন রায়ের সহিত বৃদ্ধ চ্যানিংঙ্গের দূর হইতে পরিচয় ছিল। বিলিয়ম হেনরি এমার্সনের Chalk Farm এ নূতন সমাজতন্ত্রের অন্যতম পারিষদ ছিলেন। এই সাহিত্যকার পারিষদ high thinking and plain livingএর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। গাছ কাটা, চাষ করা প্রভৃতি কার্য্য ও জীবন্ত সাহিত্য রচনা করা পর্য্যায় ক্রমে ইহাঁদের দৈনিক জীবন ব্যাপ্ত করিত। এড্‌্বিন আর্ণল্ডের শ্যালক হেনরি চ্যানিং বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের একজন সভ্য। যে সময়ের কথা হইতেছে তাহার অল্পদিন পরে এড্‌্বিন আর্ণল্ডের দ্বিতীয় পত্নী বিয়োগ হয়। সেই স্ত্রীর স্মরণার্থেই In my Lady's Praise নামে খ্যাত কবিতাগুলি রচিত। এই দ্বিতীয়বার গৃহশূন্য হইয়া এড্‌্বিন আর্ণল্ড সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

আর একটি কথা। অনেকে মনে করেন এড্‌্বিন আর্ণল্ড ও ম্যাথ্যু আর্ণল্ড সম্পর্কীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ ইহাঁদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই। এ দুইজন খ্যাতিপন্ন লোকের মধ্যে আকার সাদৃশ্যেরও সম্পূর্ণ অভাব। ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের কথাবার্ত্তা চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, কঠিন—তাহাতে তরলতার ছায়া মাত্র নাই। কিন্তু এড্‌উইন আর্ণল্ডের কথার প্রধান আকর্ষণ তাহার স্নিগ্ধতা। একদিন তাড়াতাড়িতে, ভিড়ের মধ্যে ভিক্‌টোরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে এড্‌উইন আর্ণল্ডের সহিত দেখা হয়। অতর্কিত ভাবে পশ্চাৎ হইতে একজন কাঁধে হাত দিল, ফিরিবামাত্র দেখি এড্‌উইন আর্ণল্ডের মুখ সম্মুখে। সম্ভাষণের পর বলিলেন,"ভারতবর্ষীয় লোক দেখিতে চোখের আরাম আছে। আমি উইল করিব যে মৃত্যুর পর আমার হৃৎপিণ্ড যেন গঙ্গার তীরে পোঁতা হয়। আমি এই দু'দিনের ছুটিতে পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছি। আমার এ ব্যাগের ভিতর কি আছে জান? উপনিষৎ। আমি আজকাল উপনিষৎ পড়ি।" এড্‌উইন আর্ণল্ডের উপনিষৎ পাঠের ফল "Secret of Death"—কঠোপনিষদের অনুবাদ। সময়ান্তরে এড্‌উইন আর্ণল্ড Light of Asiaর প্রশংসা শুনিয়া বুকে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "I don't deserve praise. I have done nothing. Here's the Hindu heart and there's good English; the result is my book." "By Jove! Is that the way you speak of your wonderful felicity of expression and rare sympathy of thought?" "I am proud to hear you say so."

যে দিনের কথা হইতেছিল সে দিন প্রথম লক্ষ্য করি যে এড্‌উইন আর্ণল্ড কখনও খালি মাথা করেন না। ঘরের ভিতরে আহারের সময়েও তাঁহার মাথায় কাল রঙ্গের নরম ঝপ্পা-হীন এ দেশী টুপী। কারণ অনুসন্ধানে পরে প্রকাশিত হয় যে, কপালের উপর একটি ক্ষতচিহ্ন আব ঢাকিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। চিত্রনিপুণ আর্চার, যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। তিনি এড্‌উইন আর্ণল্ডের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে মাথায় টুপী নাই দেখিয়া কতকটা বে-মক্কা মনে হয়।

সে দিন নিদ্রার অনুসন্ধানে স্ব স্ব কামরায় যাইবার পূর্ব্বে আহার কালে তাঁহার পার্শ্বস্থ তরুণীটির বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে মার্ক্সার্স বলিলেন, "মিস—কে কি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখ নাই। অ্যাকাডেমিতে বর্ণজোন্‌সের Beggar maid অবশ্য দেখেছ—সে ইহাঁরই মূর্ত্তি।"

"সত্যি?"

পরিষ্কার নিখুঁৎস্বরে মার্ক্সার্স বলিলেন।

> Her hands across her breast she laid
> She was fairer than words can say
> Bare-footed came the beggar maid
> Before king Cophetua.

পরদিন সকালে breakfastএর আগে কয়েকজন আসিয়া বাগানে বেড়াইতেছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে হেনরি জেম্‌স্ একজন। বাগানের অপর ধারে কৃত্রিম পাহাড়, পপী ফুলে

লালে লাল। তাহার উপরে গ্রীষ্মাবাস (Summer-house) ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লতায় বেষ্টিত, তাহাতে নানা রঙের ফোটা ফুল—নীল ও লাল রঙ্গেরই প্রাচুর্য্য। জেম্‌স্ তাহার পদতলে বেড়াইতেছিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে কথা উঠিল যে ইংরেজদের চা-পানের আশক্তি কুরুচি বলিয়া কাফীপ্রিয় অ্যামেরিকানগণ নিন্দা করিয়া থাকেন। জেম্‌স্ বলিলেন, "আমি অ্যামেরিক্যান কিন্তু কফী প্রিয় নহি। একবার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পারিসে কফী পান করিয়া এমনই অসুখ হইয়াছিল যে একেবারে শুইয়া পড়িতে হয়।"

"কি আশ্চর্য্য! কি অসম্ভব!"

পাছে তাঁহার দিকে কথার স্রোত বহমান হয় এই ভয়ে যেন জেম্‌স্ বলিলেন, "মিসেস্ মায়ার্স্ আপনার কচি মেয়েটিকে কখন নাহান্? আমি অনেক দিন ছেলে নাহান দেখি নাই। আপনার আপত্তি না থাকে ত দেখি। টবে বসে ছেলেদের ইলিবিলি করা—বড় চমৎকার দৃশ্য।"

এক জন মহিলা বলিলেন, "আপনি যে রকম ছেলে ভাল বাসেন তা'তে এত দিন যে কেন বিবাহ করেন নাই এই বড় আশ্চর্য্য।"

জেম্‌স্ উত্তর করিলেন, "বিবাহ কি মনে করিলেই করা যায়? লোকে যে কি করিয়া বিবাহিত অবস্থা লাভ করে—আমার পক্ষে একটা রহস্য।"

"বোধ হয় আপনি অনেক বিবাহার্থিনীর ষড়যন্ত্রের বিষয় হইয়াছেন।"

"দুঃখের সহিত সত্যের অনুরোধে এ মধুর অপবাদ অস্বীকার করিতে হয়।"

তাহার পর breakfastএর ঘণ্টার শব্দে সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

Breakfast এ বাহিরের একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নাম প্যাবকফ, —তিনি স্বদেশ রুসিয়া হইতে শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আহারের পর সকলেই বাগানে আসিলেন। মায়ার্স এড্রিন আর্নল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ঘুম হইয়া ছিল?"

উত্তর—"Nuit blanche—আদতে ঘুম হয় নাই।"

"বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এ জায়গাটি এমন নিঃশব্দ তাহাতে ঘুমের কোন বিঘ্ন অনুভব করা যায় না। আমার স্নায়বীয় অবস্থা এমনই যে লণ্ডনে শব্দের জন্য এক রাত্রও ঘুমাইতে পারিনা। কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রেই পূর্ণ মাত্রায় নিদ্রা সেবা করিয়া থাকি।"

"তোমার মত শান্ত conscience থাকিলে আমিও খুব ঘুমাইতে পারিতাম"—এই বলিয়া এড্রিন আর্ণল্ড হাসিতে লাগিলেন।

মায়র্স প্যাবকফ ও লেখককে বলিলেন, "রসিয়ান ও ইণ্ডিয়ান এ উভয়েরই দেখিতেছি বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করা বড় সহজ।" পরে পাবকফের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজি ভাষায় ত তোমার ইংরেজের মত অধিকার। আচ্ছা, তুমি যখন ভাব তখন কি ভাষা ব্যবহার কর—ইংরেজি কি রষিয়ান?"

কিন্তু বস্তুতঃ ইঁহাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই। এ দুইজন খ্যাতিপন্ন লোকের মধ্যে আকার সাদৃশ্যেরও সম্পূর্ণ অভাব। ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের কথাবার্ত্তা চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, কঠিন— তাহাতে তরলতার ছায়া মাত্র নাই। কিন্তু এড্‌উইন আর্ণল্ডের কথার প্রধান আকর্ষণ তাহার স্নিগ্ধতা। একদিন তাড়াতাড়িতে, ভিড়ের মধ্যে ভিক্‌টোরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে এড্‌উইন আর্ণল্ডের সহিত দেখা হয়। অতর্কিত ভাবে পশ্চাৎ হইতে একজন কাঁধে হাত দিল, ফিরিবামাত্র দেখি এড্‌উইন আর্ণল্ডের মুখ সম্মুখে। সম্ভাষণের পর বলিলেন, "ভারতবর্ষীয় লোক দেখিতে চোখের আরাম আছে। আমি উইল করিব যে মৃত্যুর পর আমার হৃৎপিণ্ড যেন গঙ্গার তীরে পোঁতা হয়। আমি এই দু'দিনের ছুটিতে পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছি। আমার এ ব্যাগের ভিতর কি আছে জান? উপনিষৎ। আমি আজকাল উপনিষৎ পড়ি।" এড্‌উইন আর্ণল্ডের উপনিষৎ পাঠের ফল "Secret of Death"—কঠোপনিষদের অনুবাদ। সময়ান্তরে এড্‌উইন আর্ণল্ড Light of Asiaর প্রশংসা শুনিয়া বুকে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "I don't deserve praise. I have done nothing. Here's the Hindu heart and there's good English; the result is my book." "By Jove! Is that the way you speak of your wonderful felicity of expression and rare sympathy of thought?" "I am proud to hear you say so."

যে দিনের কথা হইতেছিল সে দিন প্রথম লক্ষ্য করি যে এড্‌উইন আর্ণল্ড কখনও খালি মাথা করেন না। ঘরের ভিতরে আহারের সময়েও তাঁহার মাথায় কাল রঙ্গের নরম ধারা-হীন এ দেশী টুপী। কারণ অনুসন্ধানে পরে প্রকাশিত হয় যে, কপালের উপর একটি নাতিহ্রস্ব আব ঢাকিবার জন্যই এই ব্যবস্থা। চিত্রনিপুণ আর্চার, যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। তিনি এড্‌উইন আর্ণল্ডের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে মাথায় টুপী নাই দেখিয়া কতকটা বে-মক্কা মনে হয়।

সে দিন নিদ্রার অনুসন্ধানে স্ব স্ব কামরায় যাইবার পূর্ব্বে আহার কালে তাঁহার পার্শ্বস্থ তরুণীটির বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে ম্যায়ার্স বলিলেন, "মিস—কে কি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখ নাই। অ্যাকাডেমিতে বর্ণজোন্‌সের Beggar maid অবশ্য দেখেছ—সে ইঁহারই মূর্ত্তি।"

"সত্যি?"

পরিষ্কার নিখুঁৎস্বরে মায়ার্স বলিলেন।

> Her hands across her breast she laid
>
> She was fairer than words can say
>
> Bare-footed came the beggar maid
>
> Before king Cophetua.

পরদিন সকালে breakfastএর আগে কয়েকজন আসিয়া বাগানে বেড়াইতেছিলেন— তাঁহাদের মধ্যে হেনরি জেম্‌স্ একজন। বাগানের অপর ধারে কৃত্রিম পাহাড়, পলী ফুলে

লালে লাল। তাহার উপরে গ্রীষ্মাবাস (Summer-house) ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লতায় বেষ্টিত, তাহাতে নানা রঙের ফোটা ফুল—নীল ও লাল রঙ্গেরই প্রাচুর্য্য। জেম্‌স্ তাহার পদতলে বেড়াইতেছিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে কথা উঠিল যে ইংরেজদের চা-পানের আশক্তি কুরুচি বলিয়া কাফীপ্রিয় অ্যামেরিকানগণ নিন্দা করিয়া থাকেন। জেম্‌স্ বলিলেন, "আমি অ্যামেরিক্যান কিন্তু কফী প্রিয় নহি। একবার দুর্বুদ্ধি বশতঃ পারিসে কফী পান করিয়া এমনই অসুখ হইয়াছিল যে একেবারে শুইয়া পড়িতে হয়।"

"কি আশ্চর্য্য! কি অসম্ভব!"

পাছে তাঁহার দিকে কথার স্রোত বহমান হয় এই ভয়ে যেন জেম্‌স্ বলিলেন, "মিসেস্ মায়ার্স্ আপনার কচি মেয়েটিকে কখন নাহান্? আমি অনেক দিন ছেলে নাহান দেখি নাই। আপনার আপত্তি না থাকে ত দেখি। টবে বসে ছেলেদের ইলিবিলি করা—বড় চমৎকার দৃশ্য।"

এক জন মহিলা বলিলেন, "আপনি যে রকম ছেলে ভাল বাসেন তা'তে এত দিন যে কেন বিবাহ করেন নাই এই বড় আশ্চর্য্য।"

জেম্‌স্ উত্তর করিলেন, "বিবাহ কি মনে করিলেই করা যায়? লোকে যে কি করিয়া বিবাহিত অবস্থা লাভ করে—আমার পক্ষে একটা রহস্য।"

"বোধ হয় আপনি অনেক বিবাহার্থিনীর ষড়যন্ত্রের বিষয় হইয়াছেন।"

"দুঃখের সহিত সত্যের অনুরোধে এ মধুর অপবাদ অস্বীকার করিতে হয়।"

তাহার পর breakfastএর ঘণ্টার শব্দে সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

Breakfast এ বাহিরের একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নাম প্যাবকফ, —তিনি স্বদেশ রুসিয়া হইতে শিক্ষার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আহারের পর সকলেই বাগানে আসিলেন। মায়ার্স এড্বিন আর্নল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ঘুম হইয়া ছিল?"

উত্তর—"Nuit blanche—আদতে ঘুম হয় নাই।"

"বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু এ জায়গাটি এমন নিঃশব্দ তাহাতে ঘুমের কোন বিঘ্ন অনুভব করা যায় না। আমার স্নায়বীয় অবস্থা এমনই যে লণ্ডনে শব্দের জন্য এক রাত্রও ঘুমাইতে পারিনা। কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রেই পূর্ণ মাত্রায় নিদ্রা সেবা করিয়া থাকি।"

"তোমার মত শান্ত conscience থাকিলে আমিও খুব ঘুমাইতে পারিতাম"—এই বলিয়া এড্বিন আর্ণল্ড হাসিতে লাগিলেন।

মায়ার্স প্যাবকফ ও লেখককে বলিলেন, "রসিয়ান ও ইণ্ডিয়ান এ উভয়েরই দেখিতেছি বৈদেশিক ভাষা আয়ত্ত করা বড় সহজ।" পরে পাবকফের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজি ভাষায় ত তোমার ইংরেজের মত অধিকার। আচ্ছা, তুমি যখন ভাব তখন কি ভাষা ব্যবহার কর—ইংরেজি কি রুষিয়ান?"

প্যাবৃকফ্ উত্তর করিলেন, "তা, অনেকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যদি সাধারণ, ঘরকন্না সম্বন্ধে কোন বিষয় লইয়া ভাবি তবে মনেমনেও রুস্নিয়ান ভাষায় ভাব ব্যক্ত হয়। কিন্তু যে সকল বিষয় ইংরেজি ভাষায় প্রথমে পড়িয়া শিখিতে হইয়াছে তাহা ইংরেজিতেই মনে ব্যক্ত হয়। আসলে মনে হয় যে বিষয় শিক্ষার সময় বা প্রথম অনুভূতির সময় যে ভাষার সহিত ভাবের মিল থাকে সহজ বলিয়া পরেও সেই ভাষায় সে বিষয়কে চিন্তা করাই স্বাভাবিক।"

আমাদের এখনকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা মিশান খিচুড়ি ভাষা উৎপত্তির হেতুও কি এইরূপ?

অনেকেই জানেন যে দেহাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির অনুসন্ধান কার্য্যে মায়ার্স্ সবিশেষ উৎসাহী। দুই এক ঘণ্টা তাঁহার সহিত একত্রে কাটাইলে এ বিষয়ের কথা এক বারে না হওয়া অসম্ভব। বিস্মৃতিবশতঃ এ প্রসঙ্গের অনেক কথা পত্রস্থ হইল না। একটা কথা উল্লেখ যোগ্য। হেনরি জেমস্ বলিলেন, "যাহাকে বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার ব্যাতীত মন হইতে মনে ভাব সংক্রমন বলিয়া বোধহয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমি জানি। এক দিন লণ্ডনে breakfast এর পর আমি একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া গাড়োয়ানকে কোন এক স্থানে যাইতে বলি। রাস্তায় হঠাৎ আমার অপর এক জন বন্ধুর সহিত দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা তখন অযৌক্তিক মনে করিয়া আমি তাহাকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইচ্ছাটা একবার উদয় একবার অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর দরোয়াজা দিয়া দেখি যে যে স্থানে যাইবার বিষয় আমার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল প্রায় তাহার সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাচ্ছ"? গাড়োয়ান হতবুদ্ধির মত উত্তর করিল, "তাইত, কোথায় যাচ্ছি"? পরে গাড়ী ফিরাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিল।"

"পরথটা কি মাটী হইয়া গেল। আর একটুকু চুপ করিয়া থাকিলেই পরখের চূড়ান্ত হইত। গাড়োয়ান থামিত কিনা দেখিলেই বেশ হইত।"

কথাটা গম্ভীর কি ঠাট্টা মীমাংসা করিতে অক্ষম।

উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন এড্বিন আর্ণল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন," এত তাড়া তাড়িতে বড়বড় ইংরেজি প্রাত্যহিক পত্রিকা কি করিয়া এত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়—বিষয় ভাষা ও ছাপা!"

আর্ণল্ড বলিলেন, "ইহা সমবেত চেষ্টার ফল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত লেখকগণ সে দিন যে যে বিষয়ে leading article লিখিতে পারিবেন তাহার তালিকা ও মতামতের স্থূল মর্ম্ম এক টুকুরা কাগজে লিখিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। আমি তাহার মধ্যে যেটা পছন্দ করি তাহার পার্শ্বে দাগ দিয়া দি। সে বিষয় নিশ্চিন্ত। লেখক পরীক্ষিত,

বিষয় অভিমত। প্যারা, নিউস, ও আফিসেই প্রস্তুত হয়—আমার তত্ত্বাবধানে। তাহার পর বিদেশীয় (Foreign) পত্র প্রেরকদিগের পত্র ও টেলিগ্রাম আসে। যদি সে বিষয়ে কিছু লিখিবার থাকে তবে তৎক্ষণাৎ লেখা হয়। লেখকগণ নিজের নিজের লেখার প্রুফ সংশোধন করেন। তাহার পর literary editor সমস্ত লেখা পড়িয়া তাহাতে কোন স্থানে কমা, সেমিকোলনের ভুল থাকিলে বা কোন শব্দ সুপ্রযুক্ত না হইলে তাহা শুদ্ধ করিয়া দেন। ইহার পর night editor। তাঁহার কর্ত্তব্য রাত্রে দেশী বা বিদেশী কোন গুরুতর সংবাদ আসিলে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন হইলে নৈশ সম্পাদক প্রধান সম্পাদককে টেলিফোন করিয়া জানান।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যখন একটা বড়গোছ বক্তৃতা হয়—যেমন গ্ল্যাডষ্টোনের কি সলস্‌বেরির—তখন রাত্রে বক্তৃতা হ'ল আর সকালে তা'র উপর বড় একটা leader বেরুল—এ কি করে হয়?"

আর্ণল্ড উত্তর করিলেন, "ও রকম বক্তৃতার সময় ৮।১০ জন রিপোর্টার ও একজন লেখক বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত থাকেন। নিয়ম এই যে, প্রত্যেক রিপোর্টার এক মিনিট করিয়া রেখাক্ষরে বক্তৃতা লিখিয়া লইবে। প্রথম রিপোর্টার এক মিনিট শেষ হওয়া মাত্র রেখাক্ষরে লিখিত রিপোর্ট সাধারণ অক্ষরে লিখিতে থাকেন এবং দ্বিতীয় রিপোর্টার অমনি রেখাক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন। পর্য্যায়ক্রমে যখন রেখাক্ষরে লিখিবার ভার আবার প্রথম রিপোর্টারের উপর পড়ে তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রথমবারের "কাপি" লইয়া "কাপি"-বাহক বালক আফিসের দিকে ছুটিয়াছে। এইরূপে বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে তাহার ছাপা শেষ হইয়া যায়। আর যে লেখক বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত থাকেন তাঁহাতে ও যিনি আফিসে বসিয়া কাপি দেখেন উভয়ে মিলিয়া অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই leading article তৈয়ারি করিয়া ফেলেন।"

নিঃশ্বাস ছাড়িবার ভাব করিয়া একজন বলিলেন, "দুঃখের বিষয় এই যে, এত পরিশ্রমে এত মস্তিষ্ক শোষণ করিয়া যে সাহিত্য জন্মে তাহার আয়ু কয়েক ঘণ্টা—জোর একদিন—এর অধিক নহে।"

আর্ণল্ড বলিলেন, "ইহা যেমন গভীরতায় কম তেমনি বিস্তৃতিতে বেশী। অতি উৎকৃষ্ট একখানি গ্রন্থ কতদিনে ১০ লক্ষ লোকে পড়ে? এক খানি উৎকৃষ্ট প্রাত্যহিক পত্রিকার প্রতিদিনের পাঠক সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক হইতেপারে।"

মারার্সের বাড়ীর সকলেরই সে দিন অধ্যাপক সিজবিকের বাটীতে lunch এর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যথা সময়ে সকলে পদব্রজে সিজবিকের বাটী চলিলেন। পথি মধ্যে মৃদু ভাষিত কথা কাণে গেল যে, "অধ্যাপক ফসেট"। এ নাম শুনিলে এবং ইহার বাচ্যের সান্নিকট্য সূচিত হইলে ভারতবাসীর হৃদয় যে উদ্বেলিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অদূরে একটি প্রাচীন বৃক্ষের ছায়ায় একজন দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ একজন পুরুষ ও একজন

স্ত্রীলোকের হাতে হাত দিয়া নীচু ভূমি হইতে উঁচুতে উঠিতেছেন। অর্দ্ধস্ফুরিত স্বরে একজন বলিলেন, "ইনিই ফসেট।" সকলেরই মুখ তাঁহার দিকে ফিরিল—সকলেরই চরণ তাঁহার দিকে চলিল। সেই গাম্ভীর্য্য কারুণ্য-রস-প্লাবিত মূর্ত্তির সম্মুখে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বস্থ ফসেটপত্নী পতিকে বলিয়া দিলেন, "মিস্ ডরথি টেনাণ্ট আসিয়াছেন।" ফসেট তাঁহার কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "অন্ধের প্রতি এরূপ সৌজন্য বিশেষ দয়ার কর্য্য।" ক্রমে ক্রমে সকলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন। ভারতবর্ষীয়কে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আপনার দেশীয় লোকের কর-মর্দ্দন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ ও নিজেকে সম্মানিত মনে করিলাম।"

"আপনার মুখে এ কথা শুনা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়—" এ ভিন্ন ভারতবাসী আর কি উত্তর করিতে পারে?

বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বোধ হয় অনেকেই মনে করিয়া থাকিবেন যে এরূপ মানসিক আলো পাইলে বাহিরের আলোক ত্যাগ করা কঠিন নহে।

অধ্যাপক সিজবিক শুভ্রকেশ, ইংরেজের পক্ষে নাতিদীর্ঘ, বয়সে প্রাচীন কিন্তু বুদ্ধির তেজ ক্ষুণ্ণতায় অস্পৃষ্ট। তাঁহার পত্নী লর্ড সলস্‌বেরীর ভাগিনেয়ী, আর্থার ব্যালফোরের ভগিনী। তাঁহার চরিত্র যেমন মাধুর্য্যময়, তাঁহার বুদ্ধি তেমনই তেজস্বিনী। ব্যালফোর বংশ বুদ্ধি-বিদ্যায় বিখ্যাত। আর্থার ব্যালফোর সুলেখক, সুবক্তা। তাঁহার রাজনৈতিক দক্ষতা সর্ব্বত্র বিদিত। জর্জ্জ ব্যালফোরের ৩২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অল্প কালের মধ্যেই তিনি ভ্রুণতত্ত্ব বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতাগুণে বিশেষ যশস্বী হয়েন। জেরাল্ড-ব্যালফোর দর্শন শাস্ত্রে সুদক্ষ—ইনি আমাদের পূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড লিটনের জামাতা। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইনি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধার জন্য ফ্লরেন্সের নিকটস্থ একটি পল্লীগ্রামে একাকী বাস করিতেন। সিজবিকের বাড়ী যেন শান্ত প্রীতির আশ্রম। প্রবেশ মাত্র যেন নূতন ভাবে মন আপ্লুত হয়। অধ্যাপক একটুকু বিশেষ রকম তোতলা। কিন্তু বোধ হয় এ কথাটা তাঁহার কখনও মনে হয় না। সাধারণের সমক্ষে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সময় এক একবার তাঁহার কথা কহিবার পুনঃ পুনঃ বিফল চেষ্টা দেখিয়া শ্রোতার মনে এমনি উদ্বেগ জন্মে যে ইচ্ছা হয় তাঁহার হইয়া চেঁচাইয়া কথাটা বলিয়া দি। কিন্তু যখন কথাটা বাহির হয় তখনি দেখা যায় যে কথাটা শ্রোতব্য।

অধ্যাপক কেম্ব্রিজে কর্ত্তব্যনীতির শিক্ষক। এ বিষয়ে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত—এ দেশে কলেজে পাঠ্য। নীতিশাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার মন সযত্নে রক্ষিত, স্পর্শ-কাতর যন্ত্রের ন্যায় হইয়াছে। কেম্ব্রিজে তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে, যাহাতে তাঁহার স্বভাব পরিষ্কার রূপে প্রতিভাষিত হইতেছে।

একদিন সিজবিককে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে। সময় অতি অল্পই আছে। রাস্তায় একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "যত শীঘ্র পার চালাও—

বক্‌সিস্ পা'বে।" গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল। সিজবিক ভাবিতে লাগিলেন যে, "গাড়োয়ান ত মূর্খ। বকসিসের লোভে প্রাণপণ বেগে গাড়ী ছোটাবে। তাতে যদি কিছু বে-আইনী ঘটে সে দোষ ত হবে আমার"। কিছুকাল এই রূপ বিবেচনা করিয়া গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, যতদূর বেগে গাড়ী ছোটান আইন বিরুদ্ধ না হয়, ততদূর বেগে ছোটাও—তার চাইতে অধিক বেগে যেন ছোটান না হয়।"

সিজবিকের বাড়ী সুন্দর, সরল রুচিতে সুসজ্জিত, বড় অথচ আত্ম প্রকাশে বিমুখ। শীতকালের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় গৃহকর্ত্রী যেন এক স্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন প্রসঙ্গ ক্রমে এ দেশে স্ত্রীলোকের হতাদরের কথা উঠিল। সিজবিক বলিলেন,"পর্য্যালোচনার ফলে ইহাই পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোক বেশী intuitive আর পুরুষ বেশী ratiocinative. পূর্ব্ব-ভূভাগের সাহিত্য আলোচনায় পাওয়া যায় যে প্রাচ্যলোক পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অধিক intuitive তাহাদের বুদ্ধি অনেকটা স্ত্রীস্বভাবাপন্ন। তবে ও দেশে স্ত্রীবুদ্ধির এত অপ্রশংসা কেন?"

উত্তর। "যে কারণে প্রাচ্যলোকের নিকট experimentএর হতাদর সেই কারণেই স্ত্রীলোকের হতাদর—দাসত্ব। ভয়ে যেমন বুদ্ধির বহিঃপ্রচার বন্ধ হয় ভয়ে তেমনই নির্দ্দয়তা, ন্যায়দ্রোহ জন্মায়। আসল আমাদের প্রাণ নাই, মন খালি, বুক খালি। আমাদের দেশে দেখিবেন স্ত্রীজনসুলভ কোমল গুণের প্রাচুর্য্য—সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য, পররঞ্জন, আত্মত্যাগ ইত্যাদি। পুরুষোচিত গুণ আমাদের অল্প।"

একজন হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি যে জন্য স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোকের প্রতি দয়া হয় না পূর্ব্বাঞ্চলে স্ত্রীলোকের হতাদর ও সেই জন্য।"

উত্তর। "তাই কি? যিশুখৃষ্টও ত প্রাচ্য, তাঁহার চরিত্রেও স্ত্রীগুণের প্রাচুর্য্য। তবে স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার এত আদর কেন?"

অন্য কথা উঠিল। বেলা শেষের দিকে চলিল। অনেকে টেনিস্ খেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। এ সকল কথা এখন সুখ স্বপ্নের তুল্য। মন ইহাতে ছাড়িয়া দিলে ফিরাইয়া আনা দুষ্কর। কিন্তু সকল বস্তুই অন্তবান্—দিবসের আলোকে স্বপ্নের প্রলয়, বাস্তবে স্মৃতির নিমজ্জন—প্রসঙ্গের সমাপনও তেমনি।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

স্ত্রীলোকের হাতে হাত দিয়া নীচু ভূমি হইতে উঁচুতে উঠিতেছেন। অৰ্দ্ধস্ফুরিত স্বরে একজন বলিলেন, "ইনিই ফসেট।" সকলেরই মুখ তাঁহার দিকে ফিরিল—সকলেরই চরণ তাঁহার দিকে চলিল। সেই গাম্ভীর্য্য কারুণ্য-রস-প্লাবিত মূর্ত্তির সম্মুখে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বস্থ ফসেটপত্নী পতিকে বলিয়া দিলেন, "মিস্ ডরথি টেনাণ্ট আসিয়াছেন।" ফসেট তাঁহার কর-মর্দন করিয়া বলিলেন, "অন্ধের প্রতি এরূপ সৌজন্য বিশেষ দয়ার কর্য্য।" ক্রমে ক্রমে সকলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন। ভারতবর্ষীয়কে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আপনার দেশীয় লোকের কর-মর্দ্দন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ ও নিজেকে সম্মানিত মনে করিলাম।"

"আপনার মুখে এ কথা শুনা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়—" এ ভিন্ন ভারতবাসী আর কি উত্তর করিতে পারে?

বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বোধ হয় অনেকেই মনে করিয়া থাকিবেন যে এরূপ মানসিক আলো পাইলে বাহিরের আলোক ত্যাগ করা কঠিন নহে।

অধ্যাপক সিজবিক শুভ্রকেশ, ইংরেজের পক্ষে নাতিদীর্ঘ, বয়সে প্রাচীন কিন্তু বুদ্ধির তেজ ক্ষুণ্ণতায় অস্পৃষ্ট। তাঁহার পত্নী লর্ড সলস্‌বেরীর ভাগিনেয়ী, আর্থার ব্যালফোরের ভগিনী; তাঁহার চরিত্র যেমন মাধুর্য্যময়, তাঁহার বুদ্ধি তেমনই তেজস্বিনী। ব্যালফোর বংশ বুদ্ধি-বিদ্যায় বিখ্যাত। আর্থার ব্যালফোর সুলেখক, সুবক্তা। তাঁহার রাজনৈতিক দক্ষতা সর্ব্বত্র বিদিত। জর্জ্জ ব্যালফোরের ৩২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অল্প কালের মধ্যেই তিনি ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতাগুণে বিশেষ যশস্বী হয়েন। জেরল্ড-ব্যালফোর দর্শন শাস্ত্রে সুদক্ষ—ইনি আমাদের পূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড লিটনের জামাতা। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইনি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধার জন্য ব্রুসেল্সের নিকটস্থ একটি পল্লীগ্রামে একাকী বাস করিতেন। সিজবিকের বাড়ী যেন শান্ত প্রীতির আশ্রম। প্রবেশ মাত্র যেন নূতন ভাবে মন আপ্লুত হয়। অধ্যাপক একটুকু বিশেষ রকম তোতলা। কিন্তু বোধ হয় এ কথাটা তাঁহার কখনও মনে হয় না। সাধারণের সমক্ষে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সময় এক একবার তাঁহার কথা কহিবার পুনঃ পুনঃ বিফল চেষ্টা দেখিয়া শ্রোতার মনে এমনি উদ্বেগ জন্মে যে ইচ্ছা হয় তাঁহার হইয়া চেঁচাইয়া কথাটা বলিয়া দি। কিন্তু যখন কথাটা বাহির হয় তখনি দেখা যায় যে কথাটা শ্রোতব্য।

অধ্যাপক কেম্ব্রিজে কর্ত্তব্যনীতির শিক্ষক। এ বিষয়ে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত—এ দেশে কলেজে পাঠ্য। নীতিশাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার মন সযত্নে রক্ষিত, স্পর্শ-কাতর যন্ত্রের ন্যায় হইয়াছে। কেম্ব্রিজে তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে, যাহাতে তাঁহার স্বভাব পরিষ্কার রূপে প্রতিভাষিত হইতেছে।

একদিন সিজবিককে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরিতে হইবে। সময় অতি অল্পই আছে। রাস্তায় একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "যত শীঘ্র পার চালাও—

বক্‌সিস্ পা'বে।" গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল। সিজবিক ভাবিতে লাগিলেন যে, "গাড়োয়ান ত মূর্খ। বকসিসের লোভে প্রাণপণ বেগে গাড়ী ছোটাবে। তাতে যদি কিছু বে-আইনী ঘটে সে দোষ ত হবে আমার"। কিছুকাল এই রূপ বিবেচনা করিয়া গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, যতদূর বেগে গাড়ী ছোটান আইন বিরুদ্ধ না হয়, ততদূর বেগে ছোটাও—তার চাইতে অধিক বেগে যেন ছোটান না হয়।"

সিজবিকের বাড়ী সুন্দর, সরল রুচিতে সুসজ্জিত, বড় অথচ আত্ম প্রকাশে বিমুখ। শীতকালের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় গৃহকর্ত্রী যেন এক স্থানে থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন প্রসঙ্গ ক্রমে এ দেশে স্ত্রীলোকের হতাদরের কথা উঠিল। সিজবিক বলিলেন,"পর্য্যালোচনার ফলে ইহাই পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোক বেশী intuitive আর পুরুষ বেশী ratiocinative. পূর্ব্ব-ভূভাগের সাহিত্য আলোচনায় পাওয়া যায় যে প্রাচ্যলোক পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা অধিক intuitive তাহাদের বুদ্ধি অনেকটা স্ত্রীস্বভাবাপন্ন। তবে ও দেশে স্ত্রীবুদ্ধির এত অপ্রশংসা কেন?"

উত্তর। "যে কারণে প্রাচ্যলোকের নিকট experimentএর হতাদর সেই কারণেই স্ত্রীলোকের হতাদর—দাসত্ব। ভয়ে যেমন বুদ্ধির বহিঃপ্রচার বন্ধ হয় ভয়ে তেমনই নির্দ্দয়তা, ন্যায়দ্রোহ জন্মায়। আসল আমাদের প্রাণ নাই, মন খালি, বুক খালি। আমাদের দেশে দেখিবেন স্ত্রীজনসুলভ কোমল গুণের প্রাচুর্য্য—সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য, পররঞ্জন, আত্মত্যাগ ইত্যাদি। পুরুষোচিত গুণ আমাদের অল্প।"

একজন হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি যে জন্য স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোকের প্রতি দয়া হয় না পূর্ব্বাঞ্চলে স্ত্রীলোকের হতাদর ও সেই জন্য।"

উত্তর। "তাই কি? যিশুখৃষ্টও ত প্রাচ্য, তাঁহার চরিত্রেও স্ত্রীগুণের প্রাচুর্য্য। তবে স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার এত আদর কেন?"

অন্য কথা উঠিল। বেলা শেষের দিকে চলিল। অনেকে টেনিস্ খেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। এ সকল কথা এখন সুখ স্বপ্নের তুল্য। মন ইহাতে ছাড়িয়া দিলে ফিরাইয়া আনা দুষ্কর। কিন্তু সকল বস্তুই অন্তবান্—দিবসের আলোকে স্বপ্নের প্রলয়, বাস্তবে স্মৃতির নিমজ্জন—প্রসঙ্গের সমাপনও তেমনি।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মুদ্রারাক্ষস।

দুই শতাব্দী হইতে দ্বাদশশতাব্দী পর্য্যন্ত, সহস্র বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত নাটকের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, অথচ সবে খানদশেক মাত্র সুপাঠ্য নাটক আমরা পাইয়াছি—অপাঠ্যের সংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নয়, আর গোটাকুড়িক মাত্র। এই কয়খানি মাত্র গ্রন্থে অতীত নিজের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে—সেকালের অগণ্যমনুষ্যসমাজের চিত্র প্রতিফলনের পক্ষে কি স্বল্প স্থান! এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সেকালের মানুষ অতি যৎসামান্যই আমাদের নিকট ধরা দিয়াছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের এই প্রধান অভাব অপ্রাচুর্য্য। আরও একটী গুরুতর অভাব ইহার আছে—বৈচিত্র্যহীনতা। ছোট কবির দল নিজেদের প্রতিভার স্বল্পপুঁজির বশতঃ কেবলমাত্র তদগ্রবর্ত্তী কবিগণের কৃতির অনুকৃতির দ্বারা নাট্যসাহিত্য জগৎকে এরূপ পুনরাবৃত্তি স্রোতে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে অনুকৃত ও অনুকরণ দুই ভাসিয়া যায়, একটীকে ছাড়িয়া আর একটীকে বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হয়। মোটের উপর মনে এই ধারণা থাকিয়া যায় যে সংস্কৃত নাটকগুলি বড় একঘেয়ে, উপাখ্যানাংশেও সকলের প্রভেদ নাই এবং অন্যাংশে প্রভেদ আরও কম। সেই একই রকম উপমার শ্রেণী, একই রকম চরিত্র সমাবেশ, তাহাদের একই রকম আচরণ এবং নাটকান্তর্গত রস মোটের উপর একই—হয় আদি নয় বীর। যে বেগবতী চিত্তবৃত্তি সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যের কার্য্যের মূল এবং যাহাদের সংখ্যা অসংখ্য তাহাদের গুটীকতমাত্রকে লইয়া সকল কবিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তাই সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন সহৃদয়তা স্ফূর্ত্তি পায় না। যাহা হউক ইতর কবির রচনা অনুকরণ দুষ্ট হইলেও কবিগুরুরা তাঁহাদের প্রতিভার যে কটী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহারা পুনঃ পুনঃ আলোচ্য। কিন্তু এই আলোচনার ফলেও একটী অভাব পরিলক্ষিত হইবে। সংস্কৃত নাট্যকাব্যের অংশ বিশেষ ছাড়া সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠের পৌনঃপুন্যের কথা মনে স্থান পাইবে না। অথচ সেক্সপীয়রের নাটকগুলি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও শ্রান্তি জন্মে না, তাহাদের আমাদের চিরসহচর মনে হয়। সংস্কৃত নাটকের সহিত কোথায় সহৃদয়তার অভাব?—মনুষ্য চরিত্রে। কবির যে প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা—স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতি-রিক্ত সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা—সংস্কৃত কবিগণের সে ক্ষমতা চরিত্রবিষয়িণী নহে। তাঁহাদের রচনায় সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। এক একখানি সংস্কৃত নাটক যে অপূর্ব্ব কবিত্বে পরিপূর্ণ, ভাবের যে মাধুর্য্যে পরিপ্লুত তাহার তুলনা কেবল জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই প্রাপ্য। সংস্কৃত কবিহৃদয়ের উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব নিরতিশয় প্রবল। সুন্দরী রমণী তাহার প্রেমমুগ্ধ ক্রীতদাসের উপর যেরূপ প্রভাবশালিনী প্রকৃতি সুন্দরীরও কবিহৃদয়ের উপর তদ্রূপ আধিপত্য। তাহার প্রতি ভঙ্গী প্রতি লীলা কবিকে

মাতোয়ারা করিয়া তোলে, প্রতি হেলনে প্রতি দোলনে সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে, প্রতি অঙ্গে প্রতি প্রত্যঙ্গে মাধুর্য্য অনুলিপ্ত রহে। তাঁহার প্রেয়সী কোথায় গিরিনির্ঝরিণী-মুখরিতা, কোথায় কুসুমহাসা, কোথায় সুনীলাম্বরপরিহিতা, কোথায় কুরঙ্গনয়না পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া কবি তাহা টানিয়া বাহির করেন। তাহাতে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় তাহা অতুলনীয়। আবার মানবহৃদয়ের আবেগ বর্ণনেও ইঁহারা সিদ্ধ হস্ত। ভবভূতি তমসার মুখ দিয়া একবার বলাইয়াছেন সীতা যে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি বিবিধ বিরুদ্ধভাব ব্যক্ত করিলেন সে সকলই এক মূল প্রেমভাবেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। সেই প্রেমের যত প্রকার ক্রম আছে তাহাদের সকলকে লেখনীমুখে কম্পিত করিয়া তোলা কবির আর এক সৃষ্টি।

কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিচাতুর্য্যে প্রাচ্য কবিগণ পাশ্চাত্য কবির নিকট পরিহীন। নাটকের কবিত্ব ও উপাখ্যানাংশ লোকের চিত্তরঞ্জন করে, কিন্তু নাটকান্তর্গত চরিত্রবিশেষ প্রায়ই লোকের মনে স্থায়ী গভীর রেখা পাড়ে না। "প্রায়ই,"—কেন না কখন কখন তাহার অন্যথা হয়, কিন্তু সে সংস্কৃত কাব্য-জগতে যে দুই কবিকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের রচনায় নহে, দুইটী অপেক্ষাকৃত ইতর কবির রচনায়—তাঁহারা মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসকার।

সাহিত্যে চরিত্রমাহাত্ম্যের চিত্র যেরূপ চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে, এমন কোন বক্তৃতা নয়। তাই মহৎ চরিত্রের মহৎ কার্য্য কাব্যের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসে আছে। ইহাদের আরও একটী আকর্ষণ আছে। সংস্কৃত নাটকে প্রজার কথা বড় বিরল, রাজার কথারই ছড়াছড়ি তাই বাস্তবের ভাব তেমন পরিস্ফুট নহে। সেইজন্য যেখানে সাধারণ লোকের দুই একটা ছবি পাওয়া যায় সেখানে আমাদের সহৃদয়তা দ্বিগুণ আকৃষ্ট হয়, কৌতূহল সহসা বেশী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু রাজচরিত্রপ্রধান নাটকে তাহাকে অল্পেই তুষ্ট হইতে হয়। যেখানে নায়ক রাজা নহে সেইখানেই কৌতূহলের চারণক্ষেত্র প্রশস্তপরিসর। মৃচ্ছকটিকে তাৎকালিক উজ্জয়িনীর সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র দেওয়া আছে, ছোট বড় নানা চরিত্র এবং তাহাদের নানারূপ কার্য্যাবলীর সমাবেশে নাটকখানি মনুষ্যের সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী করা হইয়াছে। কেবলমাত্র বহুদারিক রাজার দারান্যলাভের বৃত্তান্ত নহে। রাজা, রাজমহিষী, রাজমন্ত্রী ও বিদূষক এই কটীমাত্র অসামান্য প্রাণীর কার্য্যকলাপের চিত্র নহে। আমাদেরই ন্যায় সামান্য মনুষ্যের বাস্তবিক সুখ দুঃখ বাস্তবিক আশা নিরাশার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তখনকার মনুষ্যজীবনের কতদিক চিত্রিত হইয়াছে, আরও কতদিকের আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

সভ্যতার দুইটি অঙ্গ—বিলাস ও পলিটিক্স্। রাজ্যমধ্যে সাধারণভাবে বিলাসের প্রচার ও বিশেষভাবে গুটীকত রাজনীতিজীবী মনুষ্যের কূটতন্ত্রোদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচর্য্যা। এক দ্যূতশালা ও গণিকাভবনের নিত্যযাত্রীগণ, নগরের চির উৎসবময় ভাব, নাট্যালোচনা,

সঙ্গীতানুশীলন, শ্রেষ্ঠশিল্পীসমবায়ে বিবিধ শিল্পজাতোদ্ভাবন, মহাসমৃদ্ধ বণিকগণের সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রমোদকানন, নগররক্ষক, ধর্ম্মাধিকরণ ও চৌর এবং আর এক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংস্পর্শ, সন্ধি, বিগ্রহ, বিচ্ছেদ, সেনাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গজাধ্যক্ষ বিবিধ ছদ্মবেশধারী গুপ্তচর, গুপ্তমন্ত্রণা, চতুরে চতুরে অবিরত পরস্পর বশীকরণ চেষ্টা। সংস্কৃত সভ্যতার বিলাসাঙ্গের চিত্রকর শূদ্রক এবং পলিটিক্যাল অঙ্গের চিত্রকর বিশাখদত্ত। কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া না যাই, মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসে ছয়শত বৎসরের ব্যবধান। মৃচ্ছকটিকে যে হিন্দুসমাজ চিত্রিত হইয়াছে, মুদ্রারাক্ষসে তাহার ছয়শত বৎসরের পরন্তন সমাজ চিত্রিত আছে। তাহা সত্ত্বেও যে উভয়ের মধ্যে একটী কালগত ঐক্য মনে প্রতিভাত হয়, তাহার কারণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভবের পর মুসলমানের আগম পর্য্যন্ত আর নূতন কোন ঘটনা ঘটে নাই, আর নূতন কোন বিপ্লবে হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হয় নাই। তাই মধ্যযুগের সংস্কৃত সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরিয়া এক ধারায় বহিয়া আসিতেছিল। অবশ্য বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন কবিরা কতক কতক বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা, বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তথাপি দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে তাহাদের সকলকে এক পরিবারভুক্ত বলা যাইতে পারে।

যে সময় কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কনোরাজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সভাকবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান, সেই সময়েই ভারতবর্ষে সিন্ধুপ্রদেশে প্রথম মুসলমান সমাগম হয়। কাসিম কেন সিন্ধু বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদনন্তর কনোজাক্রমণের সংকল্প পোষণ করিয়া তাহা সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই অকালে প্রাণ হারাইলেন, এ সকল ইতিহাসের কথা এখানে বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের শুধু এইটুকু জানা আবশ্যক যখন মুসলমানেরা প্রথম ভারতাকাশের প্রান্তদেশে আবির্ভূত হইলেন, প্রথম বৈদেশিক বলসমাগমে ভারতবর্ষের জীবনীভাব অপেক্ষাকৃত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অথচ ভারতের গৌরবরবি যখনও অস্তাগমমুখী নহে সেই সময় বিশাখদত্ত মুদ্রারাক্ষস রচনা করেন।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত নন্দগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পাদলগ্ন কুশের উন্মূলনের নিমিত্ত তাহার দাহে কৃতসংকল্প অতিকোপণ চাণক্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার সাহায্যে কিরূপে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমাদের দেশে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি যৎসামান্য। বিষ্ণুপুরাণে মগধের ক্ষিতীশ-বংশাবলীর বিবরণে শুধু এইটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে মহানন্দীনের শূদ্রার গর্ভে নন্দ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল নিধন করিবেন, কেননা তাঁহার পর হইতে পৃথিবীর শূদ্র শাসনকর্ত্তা হইবে। নন্দ ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র করিবেন। তাহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্টপুত্র তৎপশ্চাৎ রাজত্ব করিবে। তিনি এবং তাঁহার সন্তানের একশত বৎসর পৃথিবী শাসন করিলে দ্বিজকৌটিল্য নবনন্দের উচ্ছেদ সাধন করিবেন।

নন্দবিনাশের সহিত এই নাটকের উপাখ্যানাংশের বিশেষ যোগ আছে, কিন্তু তাহা এই নাটকের বর্ণনীয় বস্তু নহে। ইহার বস্তু ভক্তির প্রতি বুদ্ধির আকর্ষণ, ভক্তিকে বুদ্ধির স্বীয় সাহচর্য্যে আনয়নচেষ্টা এবং তাহার সফলতা। ইহার নায়ক চন্দ্রগুপ্ত নহে, কুটিলমতি কৌটিল্য নহে, নবনন্দের কোন নন্দ নহে,—নন্দবৎসল, ভক্তিতে অটল, হৃদয়ান্তঃপুরঃপর্য্যন্ত-লব্ধপ্রবেশশত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত, একা, অসহায় নন্দামাত্য রাক্ষস।

নাট্যারম্ভে নান্দীদ্বয়েই বক্ষ্যমান নাটকীয় বস্তু কতকটা ধ্বনিত হইয়াছে। শাঠ্যই যে ইহার প্রধান অঙ্গ তাহা জটাজূটকুহরনিলীনা গঙ্গাসম্বন্ধে পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তরে শিবের ছলোক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় নান্দীতে আধারানুরোধে ত্রিপুরবিজয়ীর হস্তপদ সঙ্কোচপূর্ব্বক দুঃখনৃত্যের বর্ণনায়, রাক্ষসাদির বিনাশনিবারণেচ্ছু চাণক্যের কিঞ্চিৎ সংযত কুটিল নীতিপ্রয়োগ ধ্বনিত হইতেছে। এই নান্দীদ্বয় অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বৈদগ্ধ্যে পূর্ণ কিন্তু কবিত্বসম্পর্কশূন্য।

নন্দকুলবিনাশের পরে যে এই নাটকের ক্রিয়া আরম্ভ তাহা নান্দ্যন্তে সূত্রধার সুকৌশলে সূচিত করিয়াছে। পরিষদের অনুরঞ্জনার্থ সঙ্গীতক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সূত্রধার নটীকে ডাকিতে গিয়া দেখে তাহাদের গৃহে আজ মহা উৎসব। পরিজনেরা সকলেই স্বস্ব কর্ম্মে অধিকতর অভিযুক্ত, কেহ জল বহন করিতেছে, কেহ মসলা পিষিতেছে, কেহ বিচিত্র মালা গাঁথিতেছে। ব্যাপার খানা কি? "হে আমার ত্রিবর্গসাধিকে কার্য্যাচার্য্যে দ্রুত এস, বলে যাও আজ পাকশাকের এত আড়ম্বর কেন? আজ কি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তোমার কুটুম্বটিকে (স্বামী) অনুগৃহীত কর্‌বে না বাড়ীতে অতিথি এসেছে।" নটী উত্তর করিল ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্যই এই সব আয়োজন, যেহেতু আজ চন্দ্রগ্রহণ। "আর্য্যে চতুঃষষ্ট্যঙ্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করা গেছে—তা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে পাকশাক চল্‌ছে চলুক—কিন্তু চন্দ্রোপরাগ বিষয়ে কারও দ্বারা প্রতারিত হয়েছ। দেখনা কেন যোগাযোগ না হলে জোর করে কি ক্রূরগ্রহ কেতু পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে অভিভব কর্ত্তে পারে?"

এমন সময় নেপথ্যে একটা হুঙ্কার উঠিল "আঃ কেরে আমি থাকিতে?"

নটী চমকিয়া বলিল "এ কে? ধরনীগোচর হয়ে কে চন্দ্রকে গ্রহাভিযোগ থেকে রক্ষা কর্ত্তে চায়?" সূত্রধার কাণ পাতিয়া স্বরব্যক্তির দ্বারা বক্তাকে জানিতে চেষ্টা করিল, পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিল "ক্রূরগ্রহ কেতু কি পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে অভিভব করিত পারে?" পুনর্ব্বার হুঙ্কার উঠিল "আঃ কে রে আমি থাকিতে চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে চায়?" সূত্রধার বলিল "বুঝেছি, কৌটিল্য।" কৌটিল্যের নামেই নটী বড় সৌকুমার্য্যের সহিত একটুখানি ভীতির অভিনয় করিয়া আমাদের একেবারে নাটকের কেন্দ্রস্থলে অবতীর্ণ করিয়া দিল। সূত্রধারও বলিল "ইনি কুটিলমতি কৌটিল্য, নন্দবংশকে নিজের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করেছেন, এখন "চন্দ্র" গ্রহণের কথা শুনে নামের মিলেতে করে মৌর্য্যের দ্বিষদভিযোগ কল্পনা কর্‌ছেন। চল এখানথেকে সরে পড়া যাক্।"

প্রস্তাবনা শেষ হইল। অঙ্গুলিদ্বারা উন্মুক্ত শিখা নাড়িতে নাড়িতে পূর্ব্বোক্ত বাক্য আবৃত্তি করিতে করিতে ক্রুদ্ধ চাণক্যশর্ম্মা দর্শকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সংস্কৃত নাটকের এই প্রস্তাবনাগুলি বড় চাতুর্য্যময়। সত্যে মিথ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া ভারি সুকৌশলে দর্শকের মন ভুলান হয়। আরম্ভে সূত্রধার দর্শকগণের সমসাময়িক ষ্টেজম্যানেজাররূপে আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু শেষে তাহাকে নাটকের বর্ণনীয় ঘটনার সমকালবর্ত্তী লোক বলিয়া প্রতিভাত হয়। অথচ অতি সহজে, অতি অবলীলাক্রমে এই ছলনা সাধিত হয়।

চাণক্য শিখায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে গর্জ্জিতে লাগিলেন, "কোন্ বধ্য নন্দকুল কালভুজঙ্গ-স্বরূপিনী আমার এই শিখা বদ্ধ দেখিতে না ইচ্ছা করে?" তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন নন্দকুল ধ্বংস না করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতেছেন। নন্দামাত্য রাক্ষসকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন অটল হইবে না। কিন্তু রাক্ষসের নন্দবংশে ভক্তি অচলা, মনে মনে সেই কথা আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া চাণক্য বলিয়া উঠিলেন, "সাধু অমাত্য রাক্ষস সাধু! পৃথিবীতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐশ্বর্য্যশালীর সেবা করে, কিম্বা ঐশ্বর্য্যচ্যুত ব্যক্তির পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠাপিত হইবার আশা থাকিলে বিপদে তাহার অনুগমন করে, কিন্তু তোমার ন্যায় যে, প্রভুর সম্পূর্ণ বিনাশেও ফলাশারহিত হইয়া কেবলমাত্র পূর্ব্বকৃত স্মরণ করিয়া তাঁর কার্য্যভার বহন করে এরূপ মনুষ্য অতি দুর্লভ।"

তাই চাণক্য রাক্ষসকে বৃষল চন্দ্রগুপ্তের সাচিব্য স্বীকৃত করাইতে চান, কেননা "ভৃত্য যদি নির্ব্বোধ ও কার্য্যাক্ষম হয় তাহা হইলে সে ভক্তিমান হইলেও কোন ফল নাই আবার বিজ্ঞ ও কার্য্যক্ষম যদি ভক্তিশূন্য হয় তাহাও নিষ্ফল, রাক্ষসের ন্যায় বুদ্ধি, কার্য্যক্ষমতা এবং ভক্তি এই তিনটী গুণ যাহার আছে সেইরূপ ভৃত্যের দ্বারাই নৃপতি উপকৃত হয়েন।" তাই চাণক্য এ বিষয়ে অশয়ানভাবে চেষ্টিত রহিয়াছেন।

এদিকে রাক্ষসও নিশ্চেষ্ট নহেন। তিনিও চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য অবিশ্রান্ত অজস্র কৌশল প্রয়োগ করিতেছেন। চাণক্য মহাবল পর্ব্বতেন্দ্রের সৈন্য যোগাড় করিয়া তাহার দ্বারা কুসুমপুর রোধ করিয়াছিলেন, যুদ্ধজয় হইলে অর্দ্ধনন্দরাজ্য তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রাক্ষস যখন বিষকণ্যা নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণসংহার করিতে চেষ্টা করিলেন, চাণক্য কৌশলে পর্ব্বতেন্দ্রের প্রতি সেই বিষকণ্যা নিয়োগ করিয়া অর্দ্ধরাজ্য পণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন এবং রাক্ষস যে তাঁহাদের পরমোপকারী মিত্র পর্ব্বতেন্দ্রকে বিষকণ্যার দ্বারা নিহত করিয়াছেন এইরূপ লোকাপবাদ রটনা করিয়া দিলেন। কিন্তু পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু তাঁহার উত্তরাধিকারী রহিয়াছে, তাহাকে কিরূপে নন্দরাজ্যার্দ্ধ হইতে বঞ্চিত করা যায়? স্বীয় অনুচর ভাগুরায়ণকে দিয়া মলয়কেতুকে গোপনে বলাইলেন "রাক্ষস নহে—চাণক্যই তোমার পিতার প্রাণহরণ করিয়াছে। পালাও, পালাও।" মলয়কেতু প্রাণ ভয়ে

ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাক্ষস তাঁহাকে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধাশায় উত্তেজিত করিয়া এবং সমস্ত নন্দরাজ্যলোভে প্রোৎসাহিত করিয়া স্বপক্ষে আনিলেন। কিন্তু চাণক্য তাহার জন্য কিছুমাত্র ভীত নহেন। তিনি জানেন যথাকালে যথা কৌশলে মলয়-কেতুর উদ্যম ব্যর্থ করিতে পারিবেন। এদিকে বহুবিধ দেশ বেশ ভাষা আচার ও সঞ্চারজ্ঞ নানা ছদ্মরূপধারী চরের দ্বারা তিনি রাক্ষসকে ঘিরিয়াছেন। ইন্দুশর্ম্মা নামক তাঁহার সহাধ্যায়ী মিত্র ক্ষপণক সাজিয়া কুসুমপুর নিবাসী সমস্ত নন্দামাত্যের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে বিশেষতঃ রাক্ষসের অত্যন্ত বিশ্বাসী পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইবে।

অঙ্কমুখে চাণক্যের স্বগতোক্তিতে এই সকল বৃত্তান্ত জানা যায়। এইবার তাঁহার এক চরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে এবং তাহার কার্য্যপ্রণালীর কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একখানা যমপট লইয়া একটা লোক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর অন্যান্য দেবতার উপর যমের প্রাধান্যগীতি গাহিতেছে। চাণক্যের গৃহে প্রবেশকালে শিষ্য তাহাকে নিবারণ করিল,—"ভদ্র ন প্রবেষ্টব্যম্"। শিষ্যের সাধ্য নাই গুরুর রহস্য তলায় বা গুরুর নিয়োজিত চরকে চেনে। চরও চতুর, অজ্ঞতার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্রাহ্মণ এ কার গৃহ?

"আমাদের উপাধ্যায়, সুগৃহীতনামধেয় আর্য্য চাণক্যের।"

"বটে? তবেত আমারই ধর্ম্মভ্রাতার। আমায় যেতে দাও তোমার উপাধ্যায়কে যমপট দেখিয়ে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে আসি।"

শিষ্য চটিয়া আগুণ। "মূর্খ তুই আমার উপাধ্যায়কে ধর্ম্মোপদেশ দিবি? তুই তাঁর চেয়ে ধর্ম্মবিত্তর?"

"ওহে ব্রাহ্মণ অত চোটোনা। সকলেই কিছু আর সব জানে না। তোমার উপাধ্যায় কিছু জানেন, আমরাও কিছু জানি।"

"তুই বল্‌তে চাস্ আমার উপাধ্যায় সর্ব্বজ্ঞ নন?"

"আচ্ছা তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ, তাহলে তিনি জানেন চন্দ্র কার প্রিয় নয়?"

চর ক্রমশঃ বাক্‌কৌশলে চাণক্যের শ্রুতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শিষ্য মহাশয়ের পক্ষে প্রশ্নটা বেশী সূক্ষ্ম হইল, চরদত্ত হেঁয়ালীর কোন অর্থ করিতে না পারিয়া তিনি আরও চটিয়া বলিলেন, "মূর্খ তা জানলেই কি আর না জানলেই কি!" "তোমার উপাধ্যায় বুঝ্‌বেন এ জান্‌লে কিছু লাভ আছে কি না, তুমি মোদ্দা এইটুকু শিখে রাখ যে চন্দ্র কমলের অপ্রিয়।"

শিষ্যের এবম্বিধ প্রগল্‌ভতা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে,—"মূর্খ কি অসম্বদ্ধ বকে যাচ্ছিস্?"

"এই সুসম্বদ্ধ হত যদি উপযুক্ত শ্রোতা পেতেম।"

গৃহমধ্যে বসিয়া চাণক্য সব শুনিয়াছেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ তাঁহারই নিযুক্ত চর চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অপরক্ত পুরুষের সম্বাদ আনিয়াছে। তিনি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "ভদ্র বিশ্বস্তচিত্তে প্রবেশ কর, শ্রোতা এবং জ্ঞাতা উভয়ই পাইবে।"

গৃহে আসিয়া উপবেশন করাইয়া চরের দিকে চাহিয়া চিনিতে চেষ্টা করিলেন এ কে? সে এমন নিপুণতাসহকারে নিজেকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়াছে যে বাস্তবিকই কাহারও চেনা দুঃসাধ্য। কিন্তু চাণক্যশর্ম্মাকে বেশীক্ষণ ঠকিতে হইল না, বুঝিলেন প্রজাগণের চিত্ত পরিচয়ের নিমিত্ত যে নিপুণককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এ সেই। সম্বাদ জানিতে চাহিলেন। নিপুণক কহিল, পূর্ব্ব বিরাগকারণ সকল অপহৃত হওয়া অবধি প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অত্যন্ত

অনুরক্ত। কিন্তু এই নগরে তিনটী পুরুষ আছেন যাঁহারা অমাত্য রাক্ষসের প্রতি স্নেহবশতঃ চন্দ্রগুপ্তের শ্রী অসহনক্ষম।

কোন তরফ হইতে বাধার সম্ভাবনা শুনিয়াই চাণক্যের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, বলিলেন, "বল তারা নিজের প্রাণধারণ অসহনক্ষম। তাদের নাম জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, অজ্ঞাতনামধেয়ের কথা কি আপনার কাছে নিবেদন কর্‌তেম? শুনুন, আপনার শত্রুপক্ষে বদ্ধপক্ষপাত প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে ক্ষপণক জীবসিদ্ধি, যে অমাত্য রাক্ষস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়ে পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যার দ্বারা হনন করে।"

চাণক্য শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। জীবসিদ্ধি আর কেহ নহে তাঁহারই বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা, কিন্তু চরও এ রহস্য ভেদ করিতে পাই—"আর কে?"

"আর অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য কায়স্থ শকটদাস।"

চাণক্য মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "কায়স্থ? লঘ্বী মাত্রা! তবু প্রাকৃত রিপুকেও অবহেলা করা উচিত নয়। তাই সিদ্ধার্থককে সুহৃচ্ছলে তার পিছনে লাগিয়ে দেওয়া গেছে।" প্রকাশ্যে কহিলেন "তৃতীয় ব্যক্তির নাম শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

"তৃতীয়, অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়তুল্য পুষ্পপুরনিবাসী মণিকারশ্রেষ্ঠী চন্দনদাস। তার গৃহে পরিবার রেখে অমাত্য রাক্ষস নগর পরিত্যাগ করে গেছেন।"

চাণক্য মনে মনে ভাবিলেন সুহৃত্তম বটে, তাহা না হইলে তার গৃহে পরিবারন্যাস করিয়া রাক্ষস অন্যত্র গমন করিতেন না। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন রাক্ষস যে তাহার গৃহে পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন নিপুণক তাহা কেমন করিয়া জানিল?

চর চাণক্যের হস্তে একটী অঙ্গুলিমুদ্রা সমর্পণ করিয়া বলিল "এই অঙ্গুলিমুদ্রা আপনাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইবে" তাহার পর সবিস্তারে তৎপ্রাপ্তি বিবরণ কহিল। "আপনা কর্ত্তৃক পৌরজনের চরিতান্বেষণে নিযুক্ত হইয়া আমি পরগৃহপ্রবেশের জন্য সকলের অনাশঙ্কনীয় এই যমপট লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মণিকারশ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করিলাম। সেখানে পট বিছাইয়া গান গাহিতে লাগিলাম। একটী পাঁচ বৎসরের সুন্দর বালক বালসুলভ কৌতূহলবশতঃ একটা পরদার অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিল। তখন পরদার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীকণ্ঠে "হা নির্গত, হা নির্গত" এইরূপ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। একজন রমণী পরদা হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বালকটীকে তিরস্কার করিতে করিতে কোমল বাহুলতা দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেই সময় অঙ্গুলি প্রচলিত হওয়ায় পুরুষের মাপের এই অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলির পক্ষে ঢিলা হওয়ায় তাঁহার হাত হইতে গলিয়া মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে আমার পায়ের কাছে আসিল, তিনি টের পাইলেন না। কিন্তু আমি ইহাতে অমাত্য রাক্ষসের নাম অঙ্কিত দেখিয়া আপনার নিকট লইয়া আসিলাম।"

চাণক্য হর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন, রাক্ষসের অঙ্গুলিমুদ্রা যখন তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে তখন রাক্ষসকে আয়ত্ত করিতে আর বিলম্ব নাই। এই মুদ্রার সাহায্যেই তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ করিবেন, রাক্ষসকে বৃষলের সাচিব্য স্বীকার করাইবেন!

এই মুদ্রাই এই নাটকের মেরুদণ্ড, তাহা হইতেই ইহার নাম 'মুদ্রারাক্ষস'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলা দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শিখযুদ্ধের ইতিহাস। শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ লেখকের বিশ্বাস "আজিকার দিনে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লেখা বিড়ম্বনা মাত্র" বিশেষতঃ ইতিহাস। "যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের বিশ্বাস বাঙ্গলা সাহিত্যে পড়িবার পুস্তক নাই; বাঙ্গলা "ভাষায় ভাল পুস্তক জন্মিবার দিন এখনো আসে নাই, তাঁহারা মাতৃভাষাকে অনেকটা "কৃপাপাত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সেই জন্য বলিষ্ঠ ইংরাজি সাহিত্যের সহিত নিয়ত "সংগ্রামশীল বুদ্ধির ক্লান্তিময় আলস্যের অবসরে, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর করুণা "কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সময় ও অসময়ে উচ্চকণ্ঠে মুহুর্মুহু উত্থানপতনশীল মুষ্টিভূয়িষ্ঠ "অঙ্গসঞ্চালনের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার অযত্নলব্ধ অভিমত প্রচার করিয়া "থাকেন। যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের অনুরাগ উপন্যাস নবন্যাস বা "নাটকের উপর। ইতিহাস অক্ষরের ভিতর তাঁহারা একটা বিভীষিকার ছায়া দেখিতে "পান। কোন শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালিপ্রাণ, রহসি আলাপরত প্রেমিকপ্রেমিকার শ্যামলস্নিগ্ধ "নিভৃত নিকুঞ্জের অন্তরাল ছাড়িয়া প্রলয়ের ঘোর অন্ধকার, ধূমগন্ধপূর্ণ কামানের শ্রবণবিদারি "শব্দ মুখরিত রণক্ষেত্রের পৈশাচিক উৎসবের মধ্যে স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করিতে ইচ্ছা করে।

* * * * * * * * *

"আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিন্তু ধারণা ভিন্নরূপ। ইতিহাসের উদ্দেশ্য মহৎ, কোটি "কোটি মানবের সুখ দুঃখ জীবন মরণ এবং সহস্র সহস্র সাম্রাজ্য উপরাজ্যের উত্থান ও "অবসানের দুর্ভেদ্য, চিরন্তন রহস্যের মধ্যে উহার মূল নিহিত, এবং মানব জাতির সুখ দুঃখ শান্তি বিপ্লব, নূতন পুরাতন, বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে পালিত শুষ্ক ও বর্দ্ধিত হইয়া উহা "আপনার কার্য্যক্ষেত্র কতদূর বিস্তার করিয়াছে এবং আকাঙ্ক্ষা কত উর্দ্ধে উন্নীত করিয়াছে "তাহা কয়েকজন মনীষির ইতিহাস সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।"

আমাদের মনে হয়, লেখক বাঙ্গালীদিগের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক; ইতিহাসের উপকারিতা অস্বীকার করেন অর্দ্ধশিক্ষিতের মধ্যেও এমন কেহ আছেন বলিয়া আমরা অন্ততঃ জানি না। বাঙ্গালী ভীরু, অযোদ্ধা, কামানের ধূমের মুখে যাইতে ভয়ে কম্পমান, এ সমস্তই মানিয়া লওয়া গেল, কিন্তু তাহা হইলেও পুস্তকের ফাঁকা গর্জ্জনের সহিত আলাপ করিতে কেন যে তাঁহার আমোদ না হইবে তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না। বরঞ্চ কাজ যেখানে নাই গল্পের উপভোগ্যতা সেখানে, আরো অধিক হইবারই কথা। তবে ইহা সত্য বটে, বঙ্গ সাহিত্যের অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর অধিক শ্রদ্ধা, তাহার কারণ বঙ্গভাষার প্রতি বীতরাগ নহে, প্রকৃতই ইংরাজি সাহিত্যের মত বাঙ্গলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অভাব। বঙ্গভাষায় যাহা কিছু আদরযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই যে পূর্ণমাত্রায় আদর পাইয়াছে; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। যাঁহারা ইংরাজিতে অত্যুৎকৃষ্ট ভূরি ভূরি নভেল পড়েন, তাঁহাদের নিকটেও বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস অনাদরের নহে। সুতরাং বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচিত হইলে যে তাহা বঙ্গবাসীর নিকট আদৃত হইবে

না, ইহা হইতেই পারে না। লেখক তাঁহার পরিশ্রমের ফল অচিরে লাভ করিবেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদিও পুস্তকখানির ভাষা জটিল, অনুবাদ অস্পষ্ট, তথাপি বিষয়ের গুণে ইহা বঙ্গসাহিত্যের একখানি মূল্যবান পুস্তক হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রধান গুণ, অনেকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ পড়িয়া লেখক তাহার সার সঙ্কলন করিয়াছেন। শিখযুদ্ধের ইতিহাস এবং মহারাজ দলিপসিংহের জীবনী এই গ্রন্থে বেশ সুবিস্তারে বলা হইয়াছে।

পঞ্জাব সর্দ্দারদিগের হীন স্বার্থপর আচরণ, এবং দলিপসিংহের প্রতি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যবহার পড়িতে পড়িতে হৃদয় শোকতপ্ত হইয়া উঠে।

উপনিষদ্। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই ছয়খানি সমগ্র উপনিষদ তাহার বঙ্গানুবাদ সহ। শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য—শ্রীমদানন্দ গিরির টীকা, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের ইংরাজি অনুবাদ, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সংস্করণ এবং বাবু কুঞ্জবিহারী সেন প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা—এই সকল পুস্তক হইতে সাহায্য লইয়া শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত—এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। উপনিষদ ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের আকর। সুতরাং এতন্নিহিত সত্য যত সরলভাবে সাধারণের আয়ত্তসাধ্য হয় ততই ভাল। বাবু সীতানাথ নন্দী এই কার্য্য সাধন করিয়া যে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তচরিতামৃত। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামীর জীবনচরিত।

বইখানি বেশ প্রীতিজনক। সেই সময়কার ইতিহাস, দেশের এবং সমাজের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অবস্থা এই জীবনচরিতখানি পড়িলে বোধগম্য হয়।—আমাদের দেশের চলিত কথা রূপ, সনাতন মূসলমান ছিলেন পরে বৈষ্ণব হইয়া রূপ সনাতন নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু লেখক বলিতেছেন ইঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান।

পদ্যপ্রসূন। শ্রীহরিচরণ আচার্য্য প্রণীত। কবিতাগুলি নিতান্ত নীরস নহে। বইখানি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের যোগ্য।

কুমারসম্ভব। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কৃত। বঙ্গভাষায় এই প্রথম কুমারসম্ভবের সমগ্র অনুবাদ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এজন্য বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনুবাদ বেশ ভালই হইয়াছে। ইহার প্রধান গুণ ইহার ভাষা বেশ সরল, বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং মূল ভাবেরও বড় ব্যত্যয় ঘটে নাই। তবে কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সুরক্ষিত হয় নাই। স্থানাভাব না হইলে আমরা সেইগুলি উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু তাহা না হইলেও মোটের উপর অনুবাদ প্রশংসনীয়।

অঞ্জলিদান। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

প্রতিভাপূজা। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

এই দুইখানিই শোক গাথা। বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। সকলেই জানেন ৺ দীনবন্ধু মিত্রের সহিত বঙ্কিম বাবুর কিরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই শোকগান পিতৃতুল্য পিতৃ-সুহৃদের বিয়োগে তাঁহারি পুত্র জামাতার অকৃত্রিম শোকক্রন্দন।

আর্য্যগাথা। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

বহুদিন পূর্ব্বে ইহার প্রথমভাগ পড়িয়া আমরা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এখানি পড়িয়াও সেইরূপ ...লাম। ইহার কিরূপ কবিত্বশক্তি, পুরাতন ভাবও ইনি কিরূপ নূতন ছাঁদে নূতন সুরে নূতন করিয়া ...লেন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কীর্ত্তন।

১

একবার
যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি,—
...া বিহনে, বঁধু হে ;—
... বি'নে তপন আভাহীন, উদাস মলয়,
...া বি'নে শূন্য ভুবন অন্ধকারময় ;
... বি'নে শুষ্ক ফুলমালা, নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা
... বি'নে, পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায় ;
... বি'নে শিথিল জীবন, একধারে পড়ে' কাঁদে মন,
...ার আশা বীণা করে হায় হায় ;
... বি'নে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয় ;
... বি'নে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

...াধ করেছিনু হে—
...য় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, (মনে ছিল)
...য়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণভরি, (মনে ছিল)
... জীবন নদীর পুণ্যতম তীর
...ব সেথা তোমার মন্দির, (মনে ছিল)
...ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, (মনে ছিল)
...ায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, (মনে ছিল)
... উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
...বে শান্তিভরা গন্ধবহ (মনে ছিল) ;—
...াধ মনে রইল হে।

৩

...ধে নিরাশ কৈলে নাথ,
...শায় নিরাশ কৈলে নাথ—
...থ হে, বঁধু হে,
বড় সাধে—
সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
...গল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল ; বিনা তৈল হে নাথ ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ ;
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়া ছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—
বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি ;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুসুময় অন্তঃপুর ;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা ;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া ;
ভাঙ্গিব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম ;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম ;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম, অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে কেন জাগিলাম হে।
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে ;

না, ইহা হইতেই পারে না। লেখক তাঁহার পরিশ্রমের ফল অচিরে লাভ করিবেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদিও পুস্তকখানির ভাষা জটিল, অনুবাদ অস্পষ্ট, তথাপি বিষয়ের গুণে ইহা বঙ্গসাহিত্যের একখানি মূল্যবান পুস্তক হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রধান গুণ, অনেকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ পড়িয়া লেখক তাহার সার সঙ্কলন করিয়াছেন। শিখযুদ্ধের ইতিহাস এবং মহারাজ দলিপসিংহের জীবনী এই গ্রন্থে বেশ সুবিস্তারে বলা হইয়াছে।

পঞ্জাব সর্দ্দারদিগের হীন স্বার্থপর আচরণ, এবং দলিপসিংহের প্রতি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যবহার পড়িতে পড়িতে হৃদয় শোকতপ্ত হইয়া উঠে।

উপনিষদ্। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই ছয়খানি সমগ্র উপনিষদ তাহার বঙ্গানুবাদ সহ। শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য—শ্রীমদানন্দ গিরির টীকা, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের ইংরাজি অনুবাদ, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সংস্করণ এবং বাবু কুঞ্জবিহারী সেন প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা—এই সকল পুস্তক হইতে সাহায্য লইয়া শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত—এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। উপনিষদ ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের আকর। সুতরাং এতন্নিহিত সত্য যত সরলভাবে সাধারণের আয়ত্তসাধ্য হয় ততই ভাল। বাবু সীতানাথ নন্দী এই কার্য্য সাধন করিয়া যে দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্তচরিতামৃত। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমৎ রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামীর জীবনচরিত।

বইখানি বেশ প্রীতিজনক। সেই সময়কার ইতিহাস, দেশের এবং সমাজের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অবস্থা এই জীবনচরিতখানি পড়িলে বোধগম্য হয়।—আমাদের দেশের চলিত কথা রূপ, সনাতন মূসলমান ছিলেন পরে বৈষ্ণব হইয়া রূপ সনাতন নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু লেখক বলিতেছেন ইঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান।

পদ্যপ্রসূন। শ্রীহরিচরণ আচার্য্য প্রণীত। কবিতাগুলি নিতান্ত নীরস নহে। বইখানি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের যোগ্য।

কুমারসম্ভব। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কৃত। বঙ্গভাষায় এই প্রথম কুমারসম্ভবের সমগ্র অনুবাদ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এজন্য বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনুবাদ বেশ ভালই হইয়াছে। ইহার প্রধান গুণ ইহার ভাষা বেশ সরল, বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং মূল ভাবেরও বড় ব্যত্যয় ঘটে নাই। তবে কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সুরক্ষিত হয় নাই। স্থানাভাব না হইলে আমরা সেইগুলি উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু তাহা না হইলেও মোটের উপর অনুবাদ প্রশংসনীয়।

অঞ্জলিদান। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

প্রতিভাপূজা। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

এই দুইখানিই শোক গাথা। বঙ্কিম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। সকলেই জানেন ৺দীনবন্ধু মিত্রের সহিত বঙ্কিম বাবুর কিরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই শোকগান পিতৃতুল্য পিতৃ-সুহৃদের বিয়োগে তাঁহারি পুত্র জামাতার অকৃত্রিম শোকক্রন্দন।

আর্য্যগাথা। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।
বহুদিন পূর্ব্বে ইহার প্রথমভাগ পড়িয়া আমরা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এখানি পড়িয়াও সেইরূপ হইলাম। ইহার কিরূপ কবিত্বশক্তি, পুরাতন ভাবও ইনি কিরূপ নূতন ছাঁদে নূতন সুরে নূতন করিয়া তোলেন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কীর্ত্তন।

১

একবার
দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি,—
তোমা বিহনে, বঁধু হে ;—
তোমা বি'নে তপন আভাহীন, উদাস মলয়,
তোমা বি'নে শূন্য ভুবন অন্ধকারময় ;
তোমা বি'নে শুষ্ক ফুলমালা, নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা
তোমা বি'নে, পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায় ;
তোমা বি'নে শিথিল জীবন, একধারে পড়ে' কাঁদে মন,
ছিন্নতার আশা বীণা করে হায় হায় ;
তোমা বি'নে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয় ;
তোমা বি'নে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—
তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, (মনে ছিল)
তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণভরি, (মনে ছিল)
খুঁজি, জীবন নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির, (মনে ছিল)
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, (মনে ছিল)
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, (মনে ছিল)
তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ (মনে ছিল) ;—
মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে,
বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল ; বিনা তৈল হে নাথ ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ ;
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়া ছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—
বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি ;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুহুময় অন্তঃপুর ;
সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা ;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোত্তম অভিমান দিয়া ;
ভাঙ্গিব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম ;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম ;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম, অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে কেন জাগিলাম হে ;
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে ;

বুব হৃদয় ভাষা তাহে র'বে পণ,
বে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন ;
লায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
ঝ ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে ;—
ব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
ত্র পুষ্পের ভাষা রচিব চাহিয়া,
খাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
খাব জগতে নহে শুধু বিনিময়,
র রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ ;
দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

র ছিল, সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
জিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী,—
রিব কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে ;
রিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে ;
খিব মিলিত বক্ষ সে কাননে বসি ;
য়ের উপদ্রব, শরতের শশী ;
খিব বিজলি শ্যাম বরিষা অধরে ;
খিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে ;
দুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
তে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি ;
লিবে যুগ্মবক্ষে কাকলীর ভাষা ;
ব—জগৎ এক মহা ভালবাসা।

৮

ন প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
জীবনারে ?
কি কঠিন সংসারের বেড়—
জিতে পার না যারে ?
শুষ্ক কিহে পুরুষের প্রাণ
াইয়ে যায় যাহে—
কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
র, উজ্জ্বল,—তা হে ?

৯

—রমণী পুরুষখেলনা,
প্রণয় পুরুষ খেলা,—
নি কত আদর,
নী অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী-'রাধনা,—
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণীসাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম ;
প্রণয়ই মম জ্ঞান,
প্রণয়ই মম ধরম ;—
শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা ;
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশবভালবাসা।
হায়—পুরুষ প্রণয়ে হাসে, রমণী
পোড়ে অনুরাগে ;
পুরুষ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে ;
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো ;
প্রণয় রমণীজীবন
ইহকাল, পরকাল'।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে ;
কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম ঘরময় পড়ি কাঁদে ;—
সীমন্তে মম সিন্দুরবিন্দু
অর্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে ;
ক্ষীণ গণ্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরিষত
বারি হীনপ্রভ নয়নে ;
পাংশু অধর'পর যায় সভয়গতি
অস্ফুট কম্পিত বাণী ;—
দুর্দ্দিন সখসম ত্যজত বলয় হত-
বৈভব বাহু দুখানি ;—
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
অর্দ্ধ-ভগ্ন মম দেহ ;—
তেয়াগিতে প্রাণ চায় নিতি নিতি
শূন্য এ হৃদয় গেহ।

প্রলয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে তাহার দুইটী বিভাগ রহিয়াছে; একটী পুরোভাগ এবং অপরটী উত্তরভাগ। ইহার পুরোভাগ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সার জন্ হর্শেল (ইন্দ্রগ্রহের আবিষ্কর্ত্তা সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম হর্শেলের পুত্র) কর্ত্তৃক প্রথম লৌকিক ভাষাতে প্রকাশিত হয়। তিনি ইহাকে জগতের "নিগূঢ় সমস্যা" (Great Secret) বলিয়াছেন; তিনি মনে করিতেন যে ইহা ভাবুকদিগের ভাবনাতেই বিরাজ করিবার উপযুক্ত, জগতের জন-সমাজে সাধারণভাবে প্রচারিত হইলে তাহার গাঢ়তা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। একারণ তিনি আপন ভাষাকে এমত আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার চরিত্রে একটী মহান্ হিন্দুভাব প্রকটিত হইয়া থাকে; এই ভাবের নাম "মন্ত্র-গুপ্তি"! সার জন হিন্দুর ঘরে না জন্মিয়াও যে হিন্দুভাব হৃদয়ে পোষণ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি হিন্দুসন্তান হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইতেছি, তাঁহার "নিগূঢ় সমস্যাকে" বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে বসিয়াছি। আমার এই অহিন্দুয়ানী মার্জ্জনীয় কি না বলিতে পারি না; তবে পাঠকগণ ইহা মনে করিয়া আত্মশ্লাঘা উপভোগ করিতে পারিবেন যে আমি তাঁহাদিগকে ভাবুকের দলভুক্ত করিয়া "গোপনে" প্রকাশ্য পত্রিকান্তস্তে তাঁহাদের নিকট এই গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি; তাঁহারা যেন এ বিষয়ে কেবল ভাবনা করেন এবং ভাবুক ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ইহা ব্যক্ত না করেন।

গত বৈশাখের "সাধনা" পত্রিকাতে ঠিক উপরোক্ত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রলয়-সম্ভাবনার কয়েকটী হেতু অতি দক্ষতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি আদৌ বলিয়া রাখিতেছি যে ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা সম্যক্ সমালোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কেবল একস্থলে তিনি প্রলয়ের উত্তরভাগ আলোচনা করিতে গিয়া যে অংশবিশেষ অসম্পূর্ণ রাখিয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূরণ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। রামেন্দ্র বাবু প্রস্তাবের প্রথম অবতারণা করিয়াছেন, আমি তাঁহার পদানুসরণ করিতেছি মাত্র। এই সকল আলোচনা পাঠ করিয়া যদি কোন পাঠকের চিত্তভ্রান্তি জন্মে তবে তিনি তজ্জন্য রামেন্দ্র বাবুকেই দায়ী করিতে পারিবেন; সারজন হর্শেলের "নিগূঢ় সমস্যা" প্রকাশ করিয়া "মন্ত্রগুপ্তির" নিয়ম লঙ্ঘন জন্য যদি কেহ দায়ী হন তবে তাহাও রামেন্দ্র বাবু; কারণ আমি কেবল প্রলয়ের উত্তরভাগ সম্বন্ধেই কথা কহিতে যাইতেছি, আমার উক্তিতে "নিগূঢ় সমস্যা" সংজ্ঞাটী না খাটিতে পারে বলিয়া আমি "আইনতঃ অব্যাহতি" পাইতে সচেষ্ট থাকিব!

কথাটী এইঃ—"চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ একটু করিয়া কমিতেছে ও চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে।............

"যে কারণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে ঠিক সেই কারণে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবে। পৃথিবীর কক্ষ চ্যুতির এই একটা কারণ।"*

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, এবং চন্দ্র ২৭ দিবসের কিঞ্চিদধিক সময়ে একবার পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিয়া পরিভ্রমণ করে। এই হেতু পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ কোন পদার্থাণু চন্দ্রের কেন্দ্র হইতে প্রায় ২৭ গুণ বেগে পৃথিবীর কেন্দ্রকে আবর্ত্তন করে। চন্দ্র ধরাপৃষ্ঠস্থ পদার্থাণু সকলকে স্বীয়াভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু তরল পদার্থের অণু সকল সামান্য বলে আকৃষ্ট হইলেই পরস্পর হইতে স্খলিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করে; এই হেতু স্থলভাগহইতে জলভাগ চন্দ্রাকর্ষণে তাহার দিকে অধিকতর লম্বিত হয় এবং ডিম্বাকৃতি ধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে স্বীয় লম্বিতাংশ প্রসারিত রাখিতে চেষ্টা করে। এ দিকে পৃথিবীর বিঘূর্ণন বশতঃ ঐ জলভাগ ধরাকেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া বিঘূর্ণিত হইতে চেষ্টা করে। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে স্থলভাগ চন্দ্র কর্তৃক বিচলিত না হওয়াতে যে বেগে বিঘূর্ণিত হয় জলভাগ সে বেগে চলিতে পারে না, কারণ চন্দ্রের আবর্ত্তন ধরাবিঘূর্ণনের সহিত তুলনায় মন্থর হওয়াতে চন্দ্র পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকে এবং জলরাশিকে পশ্চাদ্দিগে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। জলভাগ ও স্থলভাগ পরস্পর সংলগ্ন থাকিয়াও বিভিন্ন গতিসম্পন্ন হওয়াতে তাহাদের মধ্যে ঘর্ষণ উৎপাদিত হইয়া থাকে। ঘর্ষণে উত্তাপ জন্মে, এবং উত্তাপে শক্তির অপচয় হয়; পৃথিবীর শক্তির ভাণ্ডার স্বীয় গতিতে, অতএব তাহা হইতে শক্তি ব্যয় করিতে হইলেই গতি হ্রাস করিতে হয়। এইরূপে জল ও স্থলেতে যতই পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রতিকূলে ঘর্ষণ হইতেছে ততই ঘূর্ণনবেগ হ্রাস হইয়া পৃথিবীর গতি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। এ দিগে আবার মাধ্যাকর্ষণবলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে চন্দ্র যেমন পৃথিবীর জলরাশিকে টানিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী করিতেছে সেই প্রকার ঐ জলরাশিও চন্দ্রকে আপনার দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। জলভাগ চন্দ্রের দিকে ঈষৎ লম্বিত হইয়া অগ্রগামী হইতেছে অতএব তাহার আকর্ষণ চন্দ্রকে ঈষৎ অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে যে চন্দ্রের কক্ষপথে পরিভ্রমণের বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার "কেন্দ্রাপসারিণী প্রক্রিয়া" প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং চন্দ্র ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে দূরে গমন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। অপর দিকে আবার দেখা যায় যে পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ হ্রাস হওয়াতে কক্ষাবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণে সূর্য্য হইতে তাহারও দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য্যার্থ, এবং ইহা হইতেই রামেন্দ্র বাবু

* সাধনা, বৈশাখ ১৩০১,—৫১১ পৃষ্ঠা।

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "পৃথিবীর কক্ষচ্যুতির এই একটা কারণ।" কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে—*a caveat*! সাবধান, এখনও আলোচনা শেষ হয় নাই! আগেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসা যুক্তি সঙ্গত নহে।

আমরা উপরোক্ত আলোচনাতে তিনটী মাত্র বিষয় জানিতে পারিতেছি;—(১) পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ হ্রাস হইতেছে, (২) চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং (৩) সূর্য্য হইতে পৃথিবী দূরে সরিয়া যাইতেছে। এ স্থলে একটী কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক, যে রামেন্দ্র বাবু পৃথিবীর ধ্বংসাবস্থাকেই প্রলয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পৃথিবীর আমাদের মতন জীবের বাসের অনুপযুক্ত হওয়াকে তিনিও প্রলয় বলেন নাই আমিও বলিব না।

প্রথমতঃ,—পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ হ্রাস হওয়াতে তাহার কাল পরিমাণ অর্থাৎ আমাদিগের দিনমান বৃদ্ধি পাইতেছে; এখন আমরা যতদিনে বৎসর গণনা করি, অতঃপর আর তাহা হইবে না; বৎসরে দিনের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যাইবে। রামেন্দ্র বাবুও বলিয়াছেন যে এমন সময় আসিবে যখন আমরা ৭।৮ দিনে বৎসর গণিব।

দ্বিতীয়তঃ,—চন্দ্র যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে, তাহার কক্ষায়তন এবং তদনুসারে তাহার আবর্ত্তন কাল ততই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। চন্দ্রের এক কক্ষাবর্ত্তন করিতে যে সময় লাগে তাহাকে যদি স্থূলতঃ একমাস কহা যায় তবে দেখা যায় যে আমাদের মাস পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; অতএব এখন যত মাসে বৎসর হয় অতঃপর তাহা হইতে কম-সংখ্যক মাসে বৎসর গণনা করা যাইবে। কিন্তু দিন এবং মাস উভয়ের পরিমাণ একত্রে বৃদ্ধি পাইলেও দিনের বৃদ্ধি মাসের বৃদ্ধি হইতে দ্রুততর রূপে সম্পন্ন হওয়াতে, এবং মাস পরিমাণ দিন পরিমাণ হইতে অধিক থাকাতে উভয়ে ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার দিগে অগ্রসর হইতেছে। কালে এমত সময় আসিবে যখন আমাদের দিনমান মাসপরিমাণের সমান হইয়া যাইবে;—এই সময়ের পরিমাণ বর্ত্তমান সৌর ঘণ্টায় প্রায় ১২৫০ ঘণ্টা হইবে এবং এইরূপ ৭ দিনে বা মাসে আমাদের বৎসর পূর্ণ হইবে। (রামেন্দ্র বাবু ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বিচার করেন নাই)।

এক্ষণে ইহার ফল আলোচনা করা যাউক। দিন এবং মাস পরিমাণ যতই একত্বের দিগে ছুটিতে থাকিবে ততই চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধিহেতু জলভাগোপরি তাহার আকর্ষণবল কমিয়া আসিবে, অতএব জল এবং স্থলভাগে ঘর্ষণও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যখন দিন এবং মাস সমান হইবে তখন জলরাশি বিঘূর্ণন বশে ধরাকেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া যে বেগে আবর্ত্তন করিবে চন্দ্রও সেই বেগে আবর্ত্তন করিবে অতএব চন্দ্রাকর্ষণ জলভাগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিবে না। ইহার ফলে চন্দ্রাকর্ষণজনিত ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইবে; এবং সেই সঙ্গে দিনমান ও মাস পরিমাণ উভয়েরই বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে এরূপ স্থলে প্রলয়ের কোন সূত্রপাত লক্ষিত হইতেছে না, অতএব আমরা অবাধে "মা ভৈঃ!" রব তুলিতে পারি। কিন্তু এ স্থলে তাহা

পারিয়া উঠিলাম না; যেই রব তুলিব বলিয়া মুখব্যাদান করিতে যাইব অমনি দুর্দ্ধর্ষ লাপ্লাশ কাণে ধরিয়া আবার বলিল—*caveat* ! সাবধান ! চন্দ্র যদি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার কক্ষে পরিভ্রমণ না করে তবে উপরোক্ত অবস্থায় তিষ্ঠিতে পারিবে না, সামান্য মাত্র বিচলনে তাহা কক্ষচ্যুত হইয়া যাইবে। চন্দ্রের কক্ষ কিছুতেই উপরোক্ত স্থলে পূর্ণ বৃত্তে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব দেখা যায় যে প্রলয় ধরাপক্ষে না হইলেও চন্দ্রপক্ষে অনেকটা সম্ভবপর বটে ! কিন্তু এ স্থলে আবার জর্জ্জ ডারুইন্ উঠিয়া বলিতেছেন—*caveat* !

চন্দ্র যে প্রকারে জলরাশিকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয়াভিমুখে লম্বিত করিয়া থাকে সূর্য্যও ঠিক সেই প্রকারে (কিন্তু তাহা হইতে কম মাত্রায়) জলরাশিকে আকর্ষণ করিয়া উক্তরূপে লম্বিত করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিঘূর্ণনবশতঃ জলরাশি সম্মুখের দিগে এবং সৌরাকর্ষণহেতু পশ্চাদ্দিগে গতিশীল হইতেছে; এই উভয় গতির সমাবেশ হেতু স্থলভাগ ক্রমশঃ জলভাগ হইতে অগ্রে গমন করিতেছে এবং উভয় ভাগের গতি অসমন্বিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে ঘর্ষণ উৎপাদিত হইয়া থাকে। (আমরা যে দৈনিক জোয়ার ভাটা দেখিতে পাই তাহা চন্দ্র ও সূর্য্য এতদুভয়কর্ত্তৃক উচ্ছসিত জলরাশির গতি সমাবেশদ্বারা সংঘটিত হয়।) সূর্য্যজনিত ঘর্ষণ চন্দ্রজনিত ঘর্ষণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও কালে তাহার ফল প্রকটিত হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যজনিত ঘর্ষণদ্বারাও গতির হ্রাস হইয়া পৃথিবীর দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যে দিনের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা উভয় ঘর্ষণের ফলদ্বারা গণিত হইয়াছে; কেবল চন্দ্রজনিত ঘর্ষণদ্বারা দিনমান বৃদ্ধি হইতে অধিক সময় লাগিত এবং দিন ও মাস পরিমাণ যখন সমান হইত তখন প্রায় ১৪২০ সৌর ঘণ্টায় দিন বা মাস গণনা হইত।

পূর্ব্বে চন্দ্রপক্ষে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা হইতে সূর্য্যপক্ষেও ইহা সপ্রমাণ হইবে যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে পৃথিবীর আবর্ত্তন কাল, এবং পৃথিবীর বিঘূর্ণনকাল যখন এক সমান হইবে তখন সূর্য্যকর্ত্তৃক লম্বিত জলরাশি পৃথিবীর স্থল ভাগের সহিত সমান বেগে আবর্ত্তিত হইবে অতএব তখন ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া আসিবে; এই হেতু যখন আমাদের দিনমান বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বৎসর পরিমাণের সহিত সমান হইয়া যাইবে তখন পৃথিবীতে আর জলোচ্ছাস থাকিবে না। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে আমরা চন্দ্রকে এক বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ছাড়িয়া আসিব; দেখা যাউক, তখন চন্দ্রের ভাগ্যে কি ঘটিবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে যখন দিনমান ও মাসপরিমাণ সমান হইয়া যাইবে তখন যদি ঘর্ষণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তবে চন্দ্রের কক্ষচ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সেস্থলে ঘর্ষণ একেবারে বন্ধ হইতে পারিতেছে না কারণ তখন দিনমান ও বৎসরের পরিমাণ সমান হইবে না। অতএব সে স্থলেও ঘর্ষণ অল্প মাত্রায় চলিতেই থাকিবে এবং সেই অনুসারে দিনমানও বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু মাস পরিমাণ আর কিছুতেই বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে পৃথিবীর জল ভাগ হইতে চন্দ্র অধিকতর দ্রুত

চলিতে থাকিবে,একারণ চন্দ্রাকর্ষণে জলরাশিকে অগ্রবর্ত্তী এবং জলাকর্ষণে চন্দ্রকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবে। চন্দ্র পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেই তাহার কক্ষপথে গতি হ্রাস হইবে অতএব ধরাকর্ষণ অধিকতর প্রবল হইয়া তাহাকে ধরার নিকটবর্ত্তী করিতে প্রয়াস পাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে চন্দ্র ঐ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াই পুনরায় পৃথিবীর দিগে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে। এ দিগে চন্দ্রের দুরত্ব হ্রাস হওয়াতে তাহার কক্ষায়তন ও কক্ষাবর্ত্তনকাল উভয়ই হ্রাস হইবে; এবং দিনমানের বৃদ্ধির সহিত মাস পরিমাণের হ্রাস হওয়াতে চন্দ্র উত্তরোত্তর পৃথিবীর সন্নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। এ স্থলে আমরা একটী আশু প্রলয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি, কারণ পুনরায় দিন ও মাসের সমকালত্ব ভিন্ন চন্দ্রের দুরত্বহ্রাস বন্ধ হইবার অপর কোন হেতু দেখা যাইতেছে না; এবং এরূপ স্থলে দিনমান ও মাস পরিমাণ সমান হইবারও কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি তাহা না হইল তবে চন্দ্র যে একদিন পৃথিবীর উপর আসিয়া নিপতিত হইবে ইহা কে নিবারণ করিবে? এস্থলে কি *caveat* প্রয়োজন হইবে? জর্জ্জ ডার্‌উইন্‌ বলিতেছেন ইহার কোনই প্রয়োজন হইতেছে না। কারণ চন্দ্র বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছিল; আবার বহু কোটি বৎসর পরে তাহা পৃথিবীর সহিত মিলিত হইবে ইহা প্রকৃতির নিয়তির এক অঙ্গ মাত্র! চন্দ্রসম্পাতে পৃথিবীর অংশবিশেষ বিধ্বস্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কাহারও সমূলে ধ্বংস হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পাঠকগণ জর্জ্জ ডারউইনের এই আশ্বাস বাণীতে কতদূর আশ্বস্ত হইলেন বলিতে পারি না; কারণ চন্দ্র ও পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলেও, যে স্থলে চন্দ্র পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিবে তথায় যদি আমাদের বাসস্থান হয় তবে ঐ সংঘর্ষণে আমাদের কি দশা ঘটিবে? ইহার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে তখন পৃথিবী কি অবস্থায় থাকিবে? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে; তাহা হইলে সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে পৃথিবীতে কম পরিমাণে আসিতে থাকিবে, অতএব পৃথিবীর জলভাগ (এমন কি বায়ু পর্য্যন্ত) জমাট হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন যে কেবল পৃথিবী আমাদিগের মতন জীবের বাসের অনুপযুক্ত হইবে তাহা নহে, তখন পৃথিবীতে জলভাগে ও স্থলভাগে ঘর্ষণও বন্ধ হইয়া যাইবে; এবং ঐ অবস্থায় উপনীত হইবার পর আর পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল কিছুই ঘটিতে পারিবে না। অতএব তখন আর পূর্ণ কিম্বা আংশিক কোন প্রকার ধ্বংসেরই সম্ভাবনা নাই।

পাঠকগণ পাছে এ সমস্তই কল্পনা মনে করেন তাই সৌরজগতে যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর দুই একটী দৃষ্টান্ত আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(১) ধরা কক্ষের অভ্যন্তরে বুধ এবং শুক্র গ্রহদ্বয় বিচরণ করিতেছে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ দ্রবতা শূন্য। * বুধ ৮৮ দিনে এবং শুক্র ২২৫ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের বিঘূর্ণন কাল এতদিন

পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা বলিয়া অনুমান করা যাইত। গত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শিয়াপরেলি নামক জনৈক ইতালীয় জ্যোতিষী প্রচার করিয়াছেন যে ঐ গ্রহদ্বয় স্ব স্ব কক্ষাবর্ত্তন ও বিঘূর্ণন এক সমকালেতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। লাপ্লাশের জগদুৎপত্তি-বিধান মতে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাহারা দ্রবাবস্থায় সূর্য্যের অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমে ঘনীভূত হওয়াতে এক সময়ে পৃথিবীর ন্যায় তাহাদের পৃষ্টদেশে জলভাগ সঞ্চিত হয় এবং সূর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও লম্বিত হওয়াতে স্থলভাগের সহিত ঘর্ষণ উৎপাদন করে। ঐ ঘর্ষণ তাহাদের বিঘূর্ণন কাল খর্ব্ব করিয়া ক্রমে তাহা আবর্ত্তন কালের সহিত একত্বে পরিণত করিয়াছে। ইত্যবসরে গ্রহ সূর্য্য হইতে ক্রমে দূরাপসারিত হওয়াতে তাহার পৃষ্ঠদেশস্থ তরলভাগ জমাট হইয়া গিয়াছে জর্জ্জ ডারউইন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন * এবং রয়েল সোশায়িটিতে তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে ঐ গ্রহদ্বয় প্রায় ২৪ ঘণ্টাতে একবার বিঘূর্ণিত হয়; অতএব তৎকালে ঐ মত পোষকতা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার ৯ বৎসর পরে যখন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণিত হইতে চলিল তখন এবিষয়ে অনেকেই একমত হইয়াছেন। (এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ের আলোচনা শেষ হয় নাই।)

(২) যেহেতু ইহা অনুমান করা যাইতেছে যে গ্রহ হইতে স্খলিত হইয়া উপগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব গ্রহের বিঘূর্ণন কাল-উপগ্রহের আবর্ত্তন কাল হইতে (মাধ্যাকর্ষণ বলে) অধিক পরিমিত হওয়া অসম্ভব। যখন মঙ্গলের দুইটী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় তখন ইহা দেখা গিয়াছিল যে মধ্যবর্ত্তী উপগ্রহটী ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে একবার কক্ষাবর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু গ্রহ স্বয়ং ২৪ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে একবার মেরুদণ্ডাবর্ত্তন করে। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর লাপ্লাশের জগদুৎপত্তি-বিধান লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং ঐ বিধান আর টিকিল না বলিয়া নিনাদ উঠিয়াছিল। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জর্জ্জ ডারউইন আবার আসরে নামিলেন;—তিনি সপ্রমাণ করিলেন যে, যেহেতু মঙ্গলে জলাভাব ঘটে নাই অতএব তাহাতে এখনও ঘর্ষণ চলিতেছে ও গ্রহের ঘূর্ণনবেগ হ্রাস হইতেছে। এদিকে উপগ্রহ স্বীয় আবর্ত্তনের ঊর্দ্ধসীমা অতিক্রম করিয়া এখন ক্রমশঃ গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে উপগ্রহ একদিন গ্রহের উপর নিপতিত হইবে! মঙ্গলে যদি জীব বিদ্যমান থাকে তবে ঐ দিন তাহাদের পক্ষে বিধ্বংসাবস্থা না ঘটিলেও জলপ্লাবন হেতু খণ্ডপ্রলয় ঘটিবে !!

এস্থলে রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। সাধনার ৫০৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "অলবার্স সাহেবের অনুসন্ধান ফলে উনবিংশ

---

* শুক্রগ্রহে এখনও অত্যল্প পরিমাণ বাষ্পাবরণ রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু তাহা এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শতাব্দীর প্রথম বৎসরেই···বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের কক্ষপথের অভ্যন্তরে নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।" এইস্থলে দুইটী ভ্রম প্রকটিত হইয়াছে; প্রথমতঃ,—ক্ষুদ্র গ্রহগুলি মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের কক্ষাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; বৃহস্পতি ও শনির কক্ষাভ্যন্তরে কোন গ্রহ বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়তঃ,—১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি পিয়াজি সাহেব কর্তৃক প্রথম ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়; তৎপর বৎসর অর্থাৎ ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ্চ অল্‌বার্স সাহেব অপর একটী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কার করেন। একাধিক গ্রহ আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিয়া অল্‌বার্স ইহা প্রচার করেন যে একটী বৃহৎ গ্রহ বিচূর্ণিত হইয়া ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে; তৎপর ক্রমে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া অনেকে অল্‌বার্সের মতে সায় দিলেন। কিন্তু এক্ষণে ঐ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞানসূত্রমতে ইহা অবশ্যজ্ঞাতব্য যে যদি একটী গ্রহ কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিচূর্ণিত হয় এবং খণ্ডগ্রহ সকল নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, তবে ইহা অবশ্যম্ভাবী যে ঐ সকল গ্রহকক্ষ উপরোক্ত সংঘাতবিন্দুর মধ্যদিয়া গমন করিবে; কিন্তু অনেক গুলি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে পর তাহাদের কক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা দেখা গিয়াছে যে গগনে এমত কোন বিন্দু নাই যাহার মধ্য দিয়া ঐ সকল কক্ষপথ গমন করিতে পারে। অতএব সংঘাতবশে ক্ষুদ্র গ্রহদিগের উৎপত্তি অপ্রামাণিক! এস্থলে রামেন্দ্র বাবু যে "আমাদের নিকটেই প্রলয় ব্যাপার সূচনা" দেখিতে পাইতেছেন আমরা তাহা দেখিতে অক্ষম।

লর্ড কেলবিনের 'জাগতিক শক্তির অপচয়' এবং হেল্‌মহোল্‌ট্‌জের 'সূর্য্য নির্ব্বাপন, সম্বন্ধীয় মতদ্বয় সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা অপ্রতিবিধেয় নহে; ১৮৮২ খৃঃ অঃ ২০ শে ফেব্রুয়ারি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাইমেন্‌স্ সাহেব "সৌরাপচয়িত শক্তির প্রতিবিধান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ* প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি ইহা দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সূর্য্য যেমন উত্তাপ বিকীরণদ্বারা শক্তিক্ষয় ও দেহের সঙ্কীরণ করিতেছে তেমন আবার ঐ শক্তি অন্য উপায়ে উক্ত অপচয়িত শক্তির সম্পূরণ ও সৌর দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। অবশ্য সৌরদেহ যে আয়তনে বৃদ্ধি পাইবে তাহা তিনি বলেন না, কিন্তু তাহাতে শক্তি জন্মাইবার অন্য উপকরণ রহিয়াছে। এবিষয়ের আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

* See 'Proceedings of the Royal Society,' Vol. 33, pp. 389-98.

কি দোষ তোমার !

কি দোষ তোমার !
দোষ যদি কারো থাকে বিধাতার দোষ !
দেবতা ক'জন হেথা,—ফুল শত শত !
যদি কোন পুণ্যবলে, কোন সুপ্রভাতে
ঊষার আলোক শুভ্র শুভ্রতর করি
কোন সৌম্য দেবমূর্ত্তি প্রকাশে নয়নে,
থাকিতে পারে কি তারা—থাকিবে কেমনে !
মুক্ত করি দিয়া রুদ্ধ চির জীবনের
আবেগিত, তরঙ্গিত, আলোড়িত, স্ফীত—
মানস-পূজার তপ্ত আকাঙ্ক্ষা-উচ্ছ্বাস—
নিমেষেতে শত ফুল পায়ে এসে পড়ে—
তুমি কি করিবে, তাহে, কি দোষ তোমার !
চরণ সরায়ে নিয়ে তুলিতে একটি,
প্রফুল্ল পাপড়ি গুলি মুহূর্ত্তে দলিত !
ঐরূপ ভাগ্য লয়ে জন্মিয়াছে ওরা,
তুমি কি করিবে, দেব, করুণা করিয়া !
ভালবেসে লও যারে হৃদয়ে তুলিয়া,
সরমে মরমে ঢাকি সভয়ে সঙ্কোচে
সে-ও চাহে খসিবারে শতধা হইয়া,
প্রতিক্ষণে অনুভবি হীনতা আপন।
চরণ সামগ্রী ওরা, নহে হৃদয়ের ;
চরণে লভিতে চাহে দুর্লভ মরণ—
সহস্র সোহাগময় আদর যতন
বাঁধিয়া রাখিতে নারে হৃদয়ের পরে।
এই যদি—এই হবে—এই হোক তবে,
বিফল জীবন-চেষ্টা করোনা ওদের।
মরিয়া যাদের সুখ মরুক তাহারা—
তুমি কি করিবে, দেব, কি দোষ তোমার !

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

ষ্টীমারে।

আমরা সপরিবারে ইংলণ্ড যাইতেছি। ৭ই মার্চ্চ বুধবার প্রত্যূষে আমাদের ষ্টীমার কলিকাতা হইতে রওনা হইবে। পূর্ব্বরাত্রে আহারাদির পর আমরা জাহাজে উঠিলাম, কিন্তু একে রাত্রিটা গরম তাহাতে আবার আমরা জাহাজে শয়নে অনভ্যস্ত, কাহারই ভাল করিয়া ঘুম হইল না। আমিত ৫টা না বাজিবার পূর্ব্বেই জাহাজ হইতে কলিকাতা কেমন দেখায় তাহা দেখিবার জন্ত তাড়াতাড়ি ডেকের উপর আসিয়া বসিলাম। চতুর্দ্দিকের দীপমালা ব্যতীত আর অধিক কিছু দেখা গেল না বটে, কিন্তু সেই দীপাবলী গঙ্গাবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উত্তরে পুলের শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্পের শ্রেণী, উভয়পার্শ্বে কলিকাতা ও হাবড়ার দীপরাজি, মধ্যে মধ্যে গঙ্গাবক্ষগামী জাহাজে নানা বর্ণের দীপ সকল এবং উপরে মেঘশূন্ত তারকা-খচিত নভোমণ্ডল অতি রমণীয় দৃশ্য! কিন্তু এরূপ দৃশ্য অধিকক্ষণ রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্বগগন উষার লোহিত আভায় রঞ্জিত হইল এবং তারকার ও দীপমালার আলোক ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া কিছু পরে একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। এদিকে জাহাজে গোলমাল আরম্ভ হইল, আরোহীরা তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে লাগিল ও নাবিকেরা নঙ্গর তুলিবার ও জাহাজ রওয়ানা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, ক্রমশঃ সমুদয় আরোহীরা আসিয়া পৌঁছিল, জাহাজও সমুদ্রাভিমুখে চলিল।

সেদিন সমস্তদিন জাহাজ চলিল এবং ক্রমশঃ আমরা কলিকাতা মাটীয়া-বুরুজ বোটানিকাল গার্ডেন ও গঙ্গাতীর সন্নিহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অন্তান্ত স্থানগুলি পার হইয়া চলিলাম। কিন্তু গঙ্গাতীরের সমুদয় স্থানের নাম আমি জানি না, এবং অনেক সময় জিনিষ পত্র ও ছেলেদের লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ডেকে বসিয়া উভয়পার্শ্বের দৃশ্য সকল দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। ক্রমশঃ গঙ্গা বিস্তৃত হইয়া আসিল এবং সময়ে সময়ে তীরের দ্রব্যগুলি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে লাগিল। রাত্রিতে গঙ্গায় জাহাজ চালাইলে অনেকপ্রকার আপদের সম্ভাবনা থাকে, সেইজন্ত রাত্রিতে আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিয়া রহিল, পরদিন আবার নঙ্গর তুলিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটস্থ হইতে লাগিল। গঙ্গার স্থায় নদীতে জাহাজ চালান অতিশয় কঠিন এবং সেজন্ত বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে বলিয়া এই কার্য্য একজন প্রবীন পাইলটের হস্তে সমর্পিত হয়, আমাদের জাহাজের পাইলট ৮ই তারিখে জাহাজের ভার কাপ্তেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকাল হইতেই জাহাজে একটা বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল যে যাহার যে পত্র পাঠাইবার থাকে তাহা তিনি লিখিয়া ৩টার পূর্ব্বে জাহাজের পোষ্টবাক্সে দিলে সেই সকল চিঠি কলিকাতার ডাকঘরে পৌঁছিয়া দেওয়া যাইবে। এই কারণে অনেক আরোহীরা সে দিন পত্র লিখিতে

ব্যস্ত ছিলেন, আমরাও আমাদের আত্মীয় বন্ধুদিগকে পত্র লিখিলাম। পাইলটের সঙ্গে পত্রগুলিও চলিয়া গেল, আর কিছুকালের জন্য আমরাও বহির্জ্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলাম, এই জাহাজখানিই আমাদের পৃথিবী স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, ইহার বাহিরের লোকেদের সঙ্গে আমাদের আর কোনও প্রকার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক রহিল না। ৮ই তারিখ ৩টার সময় পাইলট চলিয়া গেল, তীরও তখন হইতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইল। জাহাজের আরোহীদের সঙ্গে তখনও আমাদের ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় হয় নাই, ক্রমশঃ আলাপ হইতে আরম্ভ হইল। ৯ই মার্চ্চ ১২টা পর্য্যন্ত আমরা ২২২ মাইল মাত্র গেলাম তার পরদিন আমরা ২৩২ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম। জাহাজ প্রতিদিন কত পথ যায় তাহা মাপিবার কয়েকটি উপায় আছে। জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ছোট ছোট যন্ত্র সন্নিবেশিত আছে, তাহার দ্বারা জাহাজের গতির বেগ নিরূপণ করা যায়, ইহার মধ্যে একটি অট'মাটিক্ অর্থাৎ তাহা স্বতঃই জাহাজের গতি নির্ণয় করিয়া দেয়। এই যন্ত্রটি দেখিতে একটি ঘড়ির মত; তাহার পশ্চাদ্দিকে একখানি ছোট পিতলের চাকা আছে, এই চাকাখানি দিবারাত্রি অবিরাম সবেগে ঘুরিতেছে। এইচাকার কেন্দ্র হইতে এক গাছি তারের রজ্জু নির্গত হইয়া জাহাজের পশ্চাদ্দিকে জলমগ্ন; এই চক্রে যে ঘড়ি আছে তাহাতে কত মিনিটে জাহাজখানি এক মাইল পথ যায় তাহা দেখা যায়, এবং জাহাজখানি এক মাইলের আট ভাগের এক ভাগ গেলেই ঘড়িটি একবার করিয়া বাজিয়া উঠে। দ্বিতীয় যন্ত্রটি অন্য প্রকারের। ইহার প্রধান অংশ এক গাছি তারের রজ্জু। তাহার অগ্রভাগে একখানি গোলাকার কাষ্ঠফলক সংলগ্ন। রজ্জু গাছটি একটা লৌহের লাটাইয়ের উপর জড়ান থাকে। প্রতি ঘণ্টায় জাহাজের একজন কোয়াটরমাষ্টার দুইজন খালাসিকে লইয়া এই যন্ত্রদ্বারা জাহাজের গতির বেগ নির্ণয় করে; কোয়াটর মাষ্টার কাষ্ঠ-ফলকখানি জাহাজের পিছনদিকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেয় এবং একটা ছোট বালির গ্ল্যাস দ্বারা দেখে যে এক মিনিটে কতটা রজ্জু বাহির হইয়া যাইতেছে। যতটা রজ্জু এক মিনিটে বাহির হয় এক ঘণ্টায় জাহাজ তার ষাটগুণ যায়। আমাদের জাহাজ বাতাস ও জলের স্রোতের তারতম্য-বশতঃ ঘণ্টায় ১০ মাইল হইতে ১৩ বা ১৩৷৷০ মাইল চলে। কোন কোন জাহাজ ঘণ্টায় ১৫, ১৬ বা ১৮ মাইল পর্য্যন্ত যায়, কিন্তু এ প্রকার দ্রুতগামী জাহাজ কেবল ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে চলে। জাহাজ এত দ্রুতবেগে চালাইতে হইলে অত্যন্ত ভাল এঞ্জিনের প্রয়োজন এবং অনেক অধিক কয়লার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইয়ুরোপ হইতে আমেরিকায় যাইতে ৭ দিন মাত্র লাগে, অনেক অধিক করিয়া কয়লা পোড়াইলেও জাহাজে ৭ দিনের কয়লা রাখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ, চীন, ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সকল জাহাজ ইয়ুরোপে যায়, তাহাদিগকে এত পথ যাইতে হয় এবং এক এক যাত্রায় এত অধিক কয়লা প্রয়োজন যে বেশি মাত্রায় কয়লা পোড়াইলে অধিকাংশ জাহাজে সেই বহুল পরিমাণ কয়লার সহজে স্থান হয় না।

জাহাজের গতি নির্ণয়ের যে দুইটি উপায়ের বিবরণ আমি উপরে লিখিলাম তাহাতে কোন্ জাহাজ কোন এক সময়ে কি বেগে যাইতেছে তাহাই জানা যায় কিন্তু এক ঘণ্টায় বা এক দিনে জাহাজ কত পথ অতিক্রম করিল তদ্দ্বারা তাহা ঠিক করিয়া জানা যায় না। পূর্ব্ব ২৪ ঘণ্টায় যত পথ চলিল প্রত্যহ ঠিক মধ্যাহ্নের সময় জাহাজের আফিসরদের তাহা নির্ণয় করিতে হয়। তাহারা সেই সময়ে সেক্সটাণ্ট নামক যন্ত্রের দ্বারা জাহাজ ঠিক কত লাটিট্যুড ও কত লঙ্গিট্যুডে আছে তাহা নির্ণয় করে। এইটি জানিতে পারিলে পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নের সময় জাহাজ যে স্থানে ছিল সে স্থান হইতে কত পথ আসিয়াছে তাহা অতি সহজেই জানা যায়।

আমরা প্রতিদিন কত পথ চলিলাম তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই, এবং লিখিলেও পাঠকদিগের তাহা স্মরণ থাকার সম্ভব নাই। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম। মান্দ্রাজ-হারবর নির্ম্মাণ করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং হারবরটি অতি বিস্তৃত এবং বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা অতি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত, যখন এই হারবর প্রস্তুত হয় নাই তখন মান্দ্রাজে উঠিতে বা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লোকের বিলক্ষণ কষ্ট হইত। এখন সে কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই মান্দ্রাজে পৌঁছিলাম। সে সময়ে সহরে কিছুই দেখা যাইবে না বলিয়া অতি অল্পসংখ্যক আরোহীই জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। জাহাজে কয়লা লইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল; এবং অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের সমুদয় অনাবৃত অংশ কয়লার গুড়াতে ঢাকিয়া গেল। যাঁহারা নিতান্ত কয়লাকে ভয় করেন এমন কয়েক জন সৌখীন আরোহী জাহাজ ছাড়িয়া গিয়া হোটেলে স্থান লইলেন। কিন্তু হোটেলেও স্থানাভাব ছিল, সেই জন্য অনেকেই কোন প্রকারে আপনাদের কাবিনের মধ্যে রাত্রিটা কাটাইলেন। ১১ই মার্চ্চের প্রাতঃকালটা ত আমরা মান্দ্রাজ হারবরে রহিলাম; কিন্তু আমরা তীরে অবতরণ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলাম না। মান্দ্রাজের বিশেষ কোন্ সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি নাই সুতরাং আমাদের মান্দ্রাজ দেখিবার বড় আগ্রহ ছিল না। প্রাতঃকাল হইতে অনেক প্রকার খেলনা ও অন্যান্য সামগ্রী লইয়া কতকগুলি মান্দ্রাজী জাহাজে আসিল, ও আরোহীদিগকে যথাসাধ্য ঠকাইতে চেষ্টা করিল। ১১ই মার্চ্চ ১০টা ১১টার সময় আমাদের মান্দ্রাজে যাহা কিছু করিবার ছিল তাহা শেষ হইল, কতক মাল জাহাজ হইতে নামান হইল, এবং কতক নূতন মাল নেওয়া হইল; কয়েকজন আরোহী চলিয়া গেলেন এবং কয়েকজন নূতন আরোহী জাহাজে আসিলেম এবং আমরা পুনর্ব্বার কলম্বো অভিমুখে চলিলাম।

১২ই মার্চ্চ দ্বিপ্রহরের সময় আমরা মান্দ্রাজ হইতে ২৫৫ মাইল পথ গেলাম। এই দিন আমাদের জাহাজে একটি ক্রীড়া-কৌতুকের কমিটি সংগঠিত হইল, কমিটির একজন সভাপতি একজন কোষাধ্যক্ষ একজন সম্পাদক ও কয়েকজন সদস্য মনোনীত হইলেন, এবং তাঁহারা আরোহীদিগের নিকট ১০ সিলিং করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিলেন ও একটি ক্রীড়া কৌতুকের

কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ক্রীড়ার মধ্যে সতরঞ্চ, হুইষ্ট (তাস), ব্যাকগ্যামান, ল্যপ্ স্তেকিল্, বুল্‌স্, বকেট ইত্যাদি ছিল। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি বোধ হয় অনেক লোকেই জানেন, কেননা এ গুলি কেবল জাহাজে খেলা হয় এমন নহে, কিন্তু শেষ দুইটি কেবল জাহাজেই খেলা হয়, এবং ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি নিম্নে লিখিতেছি। বুল্‌স্ খেলিবার জন্য একখানি বোর্ড ও ছয়খানি চর্ম্ম-নির্ম্মিত ডিস্কের প্রয়োজন। বোর্ড খানিতে ১২টি ঘর আছে এবং তাহার ১০টি ঘরে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে, বক্রী দুইটি ঘরে দুইটি বৃষের মাথার চিত্র আছে। সচারাচর দুইজন লোকেই 'বুল্‌স্" খেলা হয়, কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকেও খেলিতে পারে। প্রত্যেক খেলোয়ার পর্য্যায়ক্রমে ডিস্কগুলিকে ১ হইতে ১০এর ঘরে ফেলিতে চেষ্টা করে তার পর দুইটা বৃষের ঘরে ফেলে এবং তার পর আবার বৃষের ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ১০ হইতে ১এর ঘরে আসিতে হয়। যে খেলোয়ার প্রথমে যথাক্রমে সকল ঘরে ডিস্কগুলি ফেলিতে পারে তাহারই জিত হয়। যে সময় ১এর ঘরে ফেলিবার কথা সে সময়ে ২এর ঘরে ফেলিলে কোন ফল হয় না, অথচ কোন দোষও হয় না; কিন্তু যখন বৃষের ঘরে ডিস্ক ফেলিবার কথা নয় তখন যদি কোন খেলওয়ার সেই ঘরে আপনার ডিস্ক নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার অনতিপূর্ব্বের খেলাটা পচিয়া যায়। মনে কর একজন খেলওয়ার ৪এর ঘরে ডিস্ক ফেলিয়া ৫এর ঘরে ডিস্ক ফেলিবার সময় তাহার ডিস্ক সে ঘরে না পড়িয়া বৃষের ঘরে পড়িল তাহা হইলে তাহাকে আবার ৪এর ঘরে ফেলিতে হইবে। বকেট খেলাটা আরও সহজ, এই খেলাতে একটা বকেট বা বাল্‌তি ও ক্যানবিস-মোড়া কয়েকটি ছোট ছোট বিঁড়ার প্রয়োজন; প্রত্যেক খেলওয়াড় পর্য্যায়ক্রমে বিঁড়া-গুলিকে বাল্‌তির ভিতর ফেলিতে চেষ্টা করে, যে অধিক সংখ্যক বিঁড়া বাল্‌তির মধ্যে ফেলিতে পারে তাহারই জিত হয়।

প্রত্যেক রকম খেলার একটা করিয়া 'টুর্ণামেণ্ট' হইয়াছিল, একখানি কাগজ লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে যিনি যে খেলাতে যোগ দিতে চাহেন তিনি সেই খেলার নীচে আপনার নাম লিখিয়া দিলেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মনে করুন 'ক' 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ', ও 'চ', এই ছয় জন চেস্ খেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ক, খ'র সঙ্গে, গ ঘ'র সঙ্গে, ও ঙ চ'র সঙ্গে খেলিলেন। মনে করুন ক, ঘ, ও ঙ,জয়ী হইলেন, তখন ক আবার ঘ'র সঙ্গে খেলিলেন এবং ধরুন ক জয়ী হইলেন; এখন 'ক'কে ঙ'র সঙ্গে খেলিতে হইবে, এবং এই দুই জনের মধ্যে যিনি জয়ী হইলেন তিনি চেসে সর্ব্বজয়ী হইলেন, এবং ১০ সিলিং ১৫ সিলিং বা এক আউণ্ড পুরস্কার পাইলেন।

কমিটির প্রোগ্রামে এই সকল টুর্ণামেণ্ট ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার আমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাচ কন্‌সর্ট্ ও ব্যায়াম-ক্রীড়াই লিখিতব্য। ডান্সের রাত্রিতে একজন মহিলা পিয়ানো বাজাইতেন এবং যে সকল পুরুষ ও মহিলারা ইচ্ছা করিতেন তাঁহারা নাচিতেন, কনসর্টের রাত্রিতে এইরূপ একজন পিয়ানো বাজাইতেন ও

অন্য একজন গান করিতেন। ব্যায়াম ক্রীড়ার প্রথম দিন ছয় প্রকার খেলা হইয়াছিল। প্রথমটার নাম affinity stakes। ইহাতে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পরস্পরের হাত ধরিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দৌড়িয়া আর একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবেন; সেখানে পুরুষটি একটা চুরুট ধরাইবেন এবং স্ত্রীলোকটি এক গ্লাস মদ্য বা জল পান করিবেন, তাহার পর উভয়ে আবার হাত ধরিয়া প্রথম স্থানে ফিরিয়া আসিবেন। এইরূপ পাঁচ সাতজন পুরুষ ও পাঁচ সাতজন রমণী একত্রে দৌড়িলেন, যে পুরুষ ও রমণী সর্ব্বাগ্রে ফিরিলেন তাঁহাদেরই জিত হইল। দ্বিতীয় খেলার নাম egg and spoon race। ইহাতে কেবল মহিলারাই যোগ দিয়াছিলেন, প্রত্যেক মহিলাকে একখানি করিয়া চামচ্ এবং একটা করিয়া ডিম দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহাকে ডিমটি চামচে করিয়া লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দৌড়াইয়া আর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে হইয়াছিল। যিনি ডিমটি না ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে পৌঁছিলেন, তাঁহারই জিত। আমাদের জাহাজে এই রেসে ডিম না দিয়া আলু দেওয়া হইয়াছিল, বোধ করি ডিমটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলে পাছে স্থানটা অপরিষ্কার হয় এই ভয়ই এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। তৃতীয় খেলার নাম Driving race। ইহাতে একজন পুরুষ ঘোড়া ও একজন রমণী তাহার চালক হইলেন। ঘোড়াটার চোক বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং একগাছা রজ্জু তাঁহার দুই হাতে বাঁধিয়া রমণী লাগাম করিয়া ধরিলেন, যে চালক তাঁহার ঘোড়াকে সর্ব্ব প্রথমে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন, তাঁহারই জিত হইল। চোক-বাঁধা ঘোড়াগুলোর দৌড় দেখিতে বড় কৌতুকজনক হইয়াছিল, কোন ঘোড়া এক বারে হুটপাট করিয়া দৌড়িয়া এখানে তাল ঠুকিয়া ওখানে ঢু মারিয়া দৌড়িয়া গেল, আবার কোন ঘোড়া কোন প্রকারে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল, এই ঘোড়দৌড়ের জন্য ঘোড়াগুলোকে আগে খুব ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল। একটা খুব লম্বা চৌড়া ঘোড়া, ১৬ হাত ওয়েলর বলিলেই হয়, ট্রেনিংএর সময় খুব লাফাইয়া ছিল। পরে তিনি যখন অশ্বত্ব হইতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি নিজের দৌড়ানর বিষয় দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় একজন দর্শক বলিলেন, "Oh you ran like a horse in hydrophobia!" আসল দৌড়ের সময় এই ঘোড়াটার একটা বিপদ ঘটিয়াছিল, ঘোড়াটা পূর্ব্বের মত পাগলা ঘোড়ার ন্যায় দিখিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়িয়া গিয়া একটা স্কাই-লাইটের উপর পড়িয়া রক্তাক্ত কলেবর হইয়া মাঠ হইতে ফিরিয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আঘাতটা গুরুতর বা সাংঘাতিক হয় নাই। আর একটা খেলার নাম Potato race। এই খেলাতে ৮ কি ১০টা আলু ৩ফিট অন্তর রাখা হইয়াছিল। প্রথম আলুটার নিকট একটা বাল্তি ছিল। যে যে লোক এ খেলাতে যোগ দিলেন তাঁহারা বাল্তির নিকট হইতে দৌড়াইয়া গিয়া একটি আলু তুলিয়া আনিয়া বাল্তিতে ফেলিলেন আবার গিয়া আর একটি আনিয়া বাল্টিতে ফেলিলেন, এইরূপে যিনি সর্ব্বপ্রথমে সমুদয় আলুগুলি বাল্তিতে ফেলিতে পারিলেন তাঁহারই জিত হইল। আর এক রকম খেলার নাম বালাক্লাভা রেস (Balaclava race)। সম্ভবতঃ বালাক্লাভার যুদ্ধ হইতে এই নামের

উদ্ভব। ইহাতে একজন মানুষ ঘোড়া হয়, অপর একজন তাহার সোয়ার হয়, এবং একখান চেয়ারের কুসন কিম্বা সেইরূপ কোন একটা জিনিষ আহত সৈনিক হয়। সোয়ারেরা এক স্থান হইতে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া গিয়া যে খানে আহত সৈনিক পড়িয়া আছে সেই খানে ঘোড়া হইতে নামিয়া, আহত সৈনিকটাকে উঠাইয়া লইয়া আবার ঘোড়ায় চড়িয়া প্রথম স্থানে ফিরিয়া যায়—যে ঘোড়া ও সোয়ার সর্ব্ব প্রথমে ফিরিতে পারে তাহাদেরই জিত। শেষ খেলাটার নাম Chalking the pig's eye। এই খেলাতে একটা শূয়রের ছবি ডেকের উপর আঁকা হইয়াছিল, তার পর যে কয়জন লোক এই খেলাতে যোগ দিলেন, এক এক করিয়া তাহাদের চোক বাঁধিয়া দিয়া তাহাদিগকে সেই ছবির নিকট হইতে ১০ ফিট তফাতে লইয়া গিয়া তিন পাক ফিরাইয়া সেই শূয়ারের চোখের উপর একটা ক্রস আঁকিয়া দিতে বলা হইল—যিনি চোকের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে ক্রস আঁকিতে পারিলেন তাঁহারই জিত হইল।

প্রথম দিনের ব্যায়াম ক্রীড়ার বর্ণনা এত দীর্ঘ হইয়াছে যে দ্বিতীয় দিনের কথা আমি অতি সংক্ষেপেই লিখিব। এই দিনও ছয় রকমের খেলা হইয়াছিল। প্রথমটির নাম Liliput race এই দৌড়টি কেবল বালক ও বালিকাদের জন্য। যাহারা বয়সে ছোট তাহাদিগকে কিছু কম দূর দৌড়িতে হইল যাহারা বড় তাহাদিগকে কিছু বেশীদূর। দ্বিতীয় খেলার নাম Cinderella race। ইহা কেবল রমণীদের জন্য। তাঁহারা এক পায়ে স্লিপর দিয়া একখানি স্লিপর হাতে করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দৌড়িয়া গিয়া অন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাতের স্লিপার খানি আপনার পায়ে পরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যিনি আগে ফিরিতে পারিবেন তাঁহারই জিত। তৃতীয় খেলার নাম Bath room Scury। ইহাতে কয়েক জন লোকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দৌড়িয়া অন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নিজের নিজের ড্রেসিংগাউন, তোয়ালে, স্পঞ্জ ও একখানা সাবান উঠাইয়া লইবে; যিনি এই সকল দ্রব্যগুলি উঠাইয়া লইয়া আগে ফিরিতে পারিবেন তাঁহারই জিত। চতুর্থ খেলার নাম Thread and needle race or hopping race। এক জন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে এক স্থান হইতে দৌড়িলেন, পুরুষটি এক পায়ে লাফাইতে লাফাইতে যাইবেন অন্য এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া স্ত্রীলোকটি একটা ছুঁচে সুতা পরাইয়া দিবেন আবার সেই ছুঁচ ও সুতা লইয়া দুইজনে প্রথমোক্ত স্থানে ফিরিয়া আসিবেন। পঞ্চম খেলাতে প্রত্যেকে একটা লাইনের নিকট দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ হেঁট হইয়া বাম হাত ডেকের উপর রাখিয়া ডান হাতে একখানি খড়ির টুকরা লইয়া ডেকে একটি দাগ কাটিবে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে দাগ কাটিতে পারিবেন তাঁহারই জিত। যদি কাহারও পা নড়িয়া যায় কিম্বা পদদ্বয় ও বাম হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ ডেকে ছুঁইয়া যায় তাহা হইলে সে আর জিতিতে পারিবে না। শেষ খেলার নাম Tug of war। ইহার অর্থ বোধ হয় অনেকেই জানেন। এই দড়ি টানা খেলা প্রথমে প্রথমশ্রেণীর আরোহীদের ও জাহাজের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এবং

তৎপরে জাহাজের কর্ম্মচারীদের ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের মধ্যে হইয়াছিল। এই সকল প্রকার খেলার উপর জাহাজে আবার প্রত্যেক দিন এক প্রকার জুয়া খেলা হইত ইহার নাম Sweep stakes or Sweep on the day's run। যে কয়জন এই খেলাতে যোগ দিতেন তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া টাকা দিতে হয়। যে কয়জনে এইরূপে টাকা দিয়া টিকিট কিনিতেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে সেই দিন ১২টা পর্য্যন্ত যত মাইল জাহাজ চলিত সেই নম্বর উঠিত তিনি প্রথম প্রাইজ এবং যে দুই জনের নামে তাহার উপরের ও নীচের নম্বর উঠিত তাঁহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাইজ পাইতেন। যদি সেদিন ৫০ খানা টিকিট বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথম প্রাইজ ২০৲ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাইজ ১০৲ করিয়া দেওয়া হইত, আর বাকি ১০৲ টাকা জাহাজের দরিদ্র ভাণ্ডারে বা বৃদ্ধ নাবিকদের জন্য প্রদত্ত হইত।

আমাদের জাহাজে যে সকল ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ কিছু দিনের জন্য একত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহারা কিরূপে সময় কাটান ভারতীর পাঠকেরা ইহা হইতে তাহার আভাষ পাইবেন। যে সকল ক্রীড়া-কৌতুকের কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে বিশেষ কোন মানসিক উৎকর্ষের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। কিন্তু, বল উদ্যম ও তেজস্বীতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয় আমাদের দেশের কতকগুলি লোক এইরূপে একত্র হইলে অধিকাংশ সময়টা লম্বমান হইয়া ধূমপানেই অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা এত প্রকার নূতন নূতন আমোদ ও কৌতুকের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিতেন না; আর পারিলেও এরূপ অপ্রতিহত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই সকল খেলাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সকল খেলাতে কোন বুদ্ধি প্রাখর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অনেকে এমনও বলিতে পারেন যে ইহার মধ্যে অধিকাংশ খেলা কেবল ছেলেদেরই উপযোগী, পূর্ণবয়স্ক লোকের এই সকল খেলাতে যোগদান শোভা পায় না। একথাটি কিন্তু ঠিক নয়, পূর্ণবয়স্ক ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ যে এইরূপ খেলাতে যোগ দিতে পারেন ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে তাঁহাদের যৌবনের উদ্যম ও তেজস্বীতা আমাদের অপেক্ষা অধিক দিন থাকে ও তাঁহারা আমাদের মত অল্প বয়সেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন না।

আজ এই পর্য্যন্ত শেষ। আমরা কলম্বোতে কি কি দেখিয়া ছিলাম তাহা আবার আগামী পত্রে লিখিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দে।

পাণ্ডুকেশ্বর।

২৮এ মে বৃহস্পতিবার। ইতিপূর্ব্বে যে ভয়ানক রাস্তার কথা বলেছি আজ সেই রাস্তায় চল্‌তে হবে এত দিন ত অনেক ভয়ানক পথই দেখে আসা গেল, আরো ভয়ানক! আমার ত তার একটা ধারণাই হলো না, এখন যদি কোন পথে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যাওয়া যায় তাহলেই তা একটু নূতন রকমের ভয়ানক হবে বলে বোধ হয়; যাহোক এই রাস্তার ভয়ানকত্ব জানবার জন্যে মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহও জন্মালো। বিষ্ণু-প্রয়াগ হতে বদরিনারায়ণ বারো ক্রোশ অর্থাৎ আঠারো মাইল, এ দেশের এক ক্রোশে দেড় মাইল; কিন্তু এই বার ক্রোশের এক এক ক্রোশকে—"ডালভাঙ্গা" ক্রোশ বলা যেতে পারে; আমাদের সহরাঞ্চলের পাঠক মহাশয়দের বোধ হয় ডালভাঙ্গা ক্রোশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। বাঙ্গলার কোন কোন জেলায় পথিকরা গন্তব্য স্থানে রওনা হবার সময় কোন গাছের ডাল ভেঙ্গে তা হাতে নিয়ে চল্‌তে থাকে, পথ চল্‌তে চল্‌তে রৌদ্রের উত্তাপে যখন এই ডালের পাতাগুলি শুকিয়ে যায় তখনই এক ক্রোশ পথ চলা হয়, তা আট ক্রোশ যাওয়ার পরই ডাল শুকোক্ কি দশ ক্রোশ চলার পরই শুকোক্। বদরিনারায়ণের এই বার ক্রোশ, আমাদের দেশের "আটবারং ছিয়ানব্বই" ক্রোশের ধাক্কা।

রাস্তায় বের হয়ে ধীরে চলা আমার শাস্ত্রে লেখে না। যখন দুই সন্ন্যাসিনী জয়ন্তি ও শ্রী পুরুষোত্তম দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় শ্রীকে কিছু দ্রুতগামিনী দেখে জয়ন্তি বলেছিলেন, "ধীরে চ, বহিন, তাড়াতাড়ি চল্লে কি অদৃষ্টকে ছাড়াতে পারবি?"— তাড়াতাড়ি চল্লে যদি অদৃষ্টকে ছাড়ান যেতো তা হ'লে এতদিন এ দগ্ধ অদৃষ্ট অনেক পেছনে পড়ে আর কোন পথিকের স্কন্ধাবলম্বনের অবসর খুঁজতো, কিন্তু তা তো হবার নয়, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে, এবং তা জেনেও আমি তাড়াতাড়ি চলি, অভিপ্রায়, অদৃষ্টে যা কিছু আছে শীঘ্র শীঘ্র ঘটে যাক্ তার পরে দিন কত একটু বিরাম ভোগ করা যাবে। বৈদান্তিক ভায়াও আমার তাড়াতাড়ি চলার একটা ভালরকম কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন, সেবার তাঁকে আমি এই কৈফিয়ৎই দিয়েছিলুম; কিন্তু তাতে তিনি আমাকে যে সম্ভাবনা জানিয়ে ছিলেন তার মধ্যে কতখানি বেদান্ত ও কতটুকু মায়াবাদ ছিল তা ঠিক কর্ত্তে পারিনি। যাই হোক কিন্তু তাঁর গল্পে একটু নূতনত্ব ছিল এবং পথ চল্‌তে চলতে সেই নূতনত্ব টুকু বেশ আমোদজনক বোধ হয়েছিল, আমার সহৃদয় পাঠকগণকে আমি সে রস হ'তে বঞ্চিৎ কর্ত্তে চাইনে, কারণ সেটা সাধুর লক্ষণ।"

বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন, "আমি যে অদৃষ্টের ভোগটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দিন কত আরাম ভোগের উচ্চকাঙ্ক্ষায় স্ফীত হচ্ছি তা আমার মত নূতন বিরক্ত মূঢ় সন্ন্যাসীর কাছে বড় সহজ

বলে বোধ হলেও কাজে তা বিলক্ষণ কঠিন। যার ললাটে আরাম ভোগের কক্ষে শূন্য অঙ্ক লেখা আছে সে কি ঋণ ক'রে আরাম ভোগ করবে? আরাম বিরামের রাজ্যে দেনা পাওনার কারবার থাকলে অনেক রাজা-রাজড়া অতি উচ্চ দাম দিয়ে এই জিনিষটে কিনতেন, কিন্তু ভগবানের মর্জ্জি অন্য রকম। বাস্তবিক অদৃষ্ট জিনিষটা বড়ই খারাপ, শুধু ইহলোক নয়—পরলোকের পার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোটে এবং তার জন্যে কোন মুটে বা কুলীর আয়োজন কর্ত্তে হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভায়া বল্লেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন লোকের কাক চরিত্র বিদ্যায় খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল; লোকটা একদিন শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লে একটা অনেক দিনের পুরোণো মড়ার মাথা পড়ে রয়েছে, সেই নরকপালের সাদা সাদা অক্ষর গুলোর উপর লোকটার নজর পড়লো—কাক-চরিত্র বিদ্যাবলে সে পড়্‌লে

"ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে,
মরণং গোমতি তীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

লোকটা শুধু কাকচরিত্রই যে জান্‌তো তা নয়, একটু বুদ্ধি-বৃত্তিরও ধার ধারতো। "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" প'ড়ে তার মনে কৌতূহল হোল এর পরে আর কি হয় জান্‌তে হবে। মরে গিয়েছে, শ্মশানে মাথার খুলিটে শুধু পড়ে রয়েছে, এখনো "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?" পণ্ডিত মড়ার মাথা-টা কুড়িয়ে বাড়ী এনে তা একটা হাঁড়িতে পুরে একটা নির্জ্জন স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌লে; আরও নূতন কিছু হলো কি না পরীক্ষার জন্যে প্রায়ই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখে। এক দিন পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে দু চারদিনের জন্যে বিদেশ যাত্রা করলে পর কৌতূহলাবিষ্টা পণ্ডিত-পত্নী সেই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখ্‌লেন একটা নরকপাল তার মধ্যে পরম সমাদরে রক্ষিত হয়েছে; পণ্ডিতের যিনি সহধর্ম্মিণী, তাঁর পক্ষে এই নরকপাল দেখে তার প্রকৃত তথ্য অনুমান করে নেওয়া অবশ্য নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত কল্লেন, আর কিছু নয় পণ্ডিতজির বোধ হয় কোন প্রিয়তমা ছিল, তার মৃত্যু হওয়াতে বিরহক্লিষ্ট পণ্ডিতবর তার মস্তকটি কুড়িয়ে এনে এইরূপ সঙ্গোপনে হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই কঙ্কালাবশেষখানি দেখেই দুঃসহ বিরহ-জ্বালা প্রশমন করেন। পণ্ডিতপত্নীর দুর্জ্জয় ক্রোধ এবং অভিমানের উদয় হোল পণ্ডিত সশরীরে সেখানে বর্ত্তমান থাকলে বোধ হয় তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আহূত হ'তেন। সে বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে পণ্ডিত-পত্নী সেই নরকপালখানি হাঁড়ি থেকে বের করে ঢেঁকিতে চূর্ণ করে একটা পচা নর্দ্দমার মধ্যে নিক্ষেপ কল্লেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরে সর্ব্ব প্রথমেই হাঁড়ি দেখ্‌তে গিয়ে দেখেন হাঁড়িও নেই, সে নরকপালও নেই, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন হাঁড়ি কোথায়? পত্নী পণ্ডিতমহাশয়কে বিরহ ব্যথায় অত্যধিক ব্যাকুল করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত কথা সবিস্তারে ব'লে তার প্রিয়তমার কপালের

দুরবস্থা দেখাবার জন্তে নর্দ্দমার কাছে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের কিন্তু চক্ষু স্থির!—"অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" এই রকম ভাবে ফলবে তা কে জান্‌তো ?

বৈদান্তিক বোল্লেন,মরণের পরও যখন অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তখন আমার সুখ-ভোগের আশাটা অলীক মাত্র! বৈদান্তিকের আর কোন ক্ষমতা না থাক্ তিনি মনটিকে বেশ দমিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমার তাতে বিশেষ বড় আসে যায় না।

গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। উপক্রমণিকাতেই স্বামীজি আমাকে খুব ধীরে চলবার জন্তে অনুমতি কল্লেন, এবং আজ যদি তাড়াতাড়ি চলি তা হলে আমার অসুখ হতে পারে বলে ভবিষ্যৎবাণী কর্ত্তেও ছাড়লেন না, কিন্তু তাঁর এরকমের ভবিষ্যৎ বাণী এ নূতন নয়, কাজেই আমার কাছে তার তেমন দর হোল না।

আমরা খানিক দূর অগ্রসর হ'য়ে একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে অলকনন্দা পার হলুম; সাঁকোটীর উপর দিয়ে যেতে বড়ই ভয় করতে লাগলো। ইংরেজের তৈয়েরী লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে বেশ সগর্ব্বে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ী কারিকরদের তৈয়েরী এই কাঠের সাঁকোর কাছে এসে আমার সে কালের সেই লছমন ঝোলার কথা মনে পড়লো। বাস্তবিক এমন খারাপ সাঁকো আমি এ পর্য্যন্ত একটাও দেখিনি। যাহোক অতি সাবধানে ত সাঁকোটা পার হওয়া গেল, খানিক দূর এগিয়ে যখন পেছন ফিরে চাইলুম তখন সঙ্গীদের কাকেও দেখ্‌তে পেলুম না। এই বাঁকা রাস্তায় ৫০ হাত এগিয়ে এলে আর কাকেও বড় দেখবার যো নেই।

সাঁকো পার হয়ে রাস্তার ভীষণতা বুঝতে পাল্লুম। এ পর্য্যন্ত অনেক "চড়াই উৎরাই" দেখেছি কিন্তু এমন "চড়াই উৎরাই" আর কোন দিন নজরে পড়েনি। বরাবর শুধু চড়াই আর উৎরাই। বহুকষ্টে আধ মাইল চড়াই উঠলুম, ওঠা যেই শেষ হলো অমনি আবার উৎরাই আরম্ভ; আবার যেই উৎরাই শেষ হলো অমনি চড়াই আরম্ভ। নাগর-দোলার মত কেবল চড়াই আর উৎরাই। সমান জমী কি সামান্ত উচু নীচু রাস্তা মোটেই নেই; এই তিন চারটে চড়াই উৎরাই পার হোলেই মানুষের জীবাত্মা ত্রাহি মধুসূদন হাঁক ছাড়ে। আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি কিন্তু কখন এত কষ্ট হয়নি। একবার উঠা তার পরেই নামা, এতে যে কি কষ্ট তা বুঝান সহজ নয়, বুকের হাড় ও পাঁজরাগুলো যেন চড় চড় করে ভেঙ্গে যায়, আর তার সঙ্গে আবার সর্ব্বনেশে তৃষ্ণা। এই মাত্র ঝরণার জল খাওয়া গেল পরক্ষণেই মুখ নীরস, গলা শুকনো,যেন কতকাল জল খাওয়া হয়নি, বুকের মধ্যে কে যেন মরুভূমি সৃষ্টি করে রেখেছে। তবে সুখের মধ্যে এই পথে যত ঝরণা এত ঝরণা আর এ পাহাড়ে রাজ্যের কুত্রাপি দেখিনি, আর এত ঝরণা আছে বলেই এ পথে মানুষ চলাচল করতে পারে।

রাস্তায় চলতে আরম্ভ করে গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিয়ে আর আমি কখন বিশ্রাম করিনে, কিন্তু এই ভয়ানক পথে এ রকম জিদ বজায় থাক্‌লো না। চলি আর বসি এবং ঝরণা

দেখ্‌লেই সেখানে গিয়ে অঞ্জলি পূরে জল নিই, রাস্তায় চার পাঁচবার বিশ্রাম করে এবং দশবারো বার জল খেয়ে শরীরের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, আর এই বিষম পথের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে করতে আট মাইল দূর পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হলুম ; বেলা তখন প্রায় ৯টা। এতখানি রাস্তা আমি তিন ঘণ্টায় এসেছি, শুনলুম যে সকল সন্ন্যাসী পাহাড় ভ্রমণে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁহারাও পাঁচ ছয় ঘণ্টার কম বিষ্ণু প্রয়াগ হ'তে পাণ্ডুকেশ্বরে আস্‌তে পারেন না, খুব অল্প সংখ্যক পাহাড়ী জোয়ানেরাই তিন ঘণ্টায় এ রাস্তা হাঁট্‌তে পারে। আজ এই ভয়ানক দুর্গম রাস্তা অতিক্রম কর্ত্তে একজন দুর্ব্বল বঙ্গ-সন্তান প্রবল বিক্রম, বলিষ্ঠ দেহ পাহাড়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে মনে করে অহঙ্কারে আমার বুকখানা দশ হাত হয়ে উঠ্‌লো এবং নিজেকে অদ্বিতীয় বঙ্গবীর স্থির করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল। কিন্তু হায়, সকলে আমার মত বঙ্গবীর নয়, বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলও সকলের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয় ; আমি অমিত পরাক্রমে তিনঘণ্টায় বিষ্ণু প্রয়াগ হতে পাণ্ডুকেশ্বরে এলুম বটে কিন্তু স্বামীজি, বৈদান্তিক কারো দেখা নেই, এ বেলা যে তাঁরা আসতে পারেন সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হোল, তাঁরা দেখছি বাঙ্গালীর নাম রাখতে পাল্লেন না।

কি করা যায়, পাণ্ডুকেশ্বরে এসে একটু ঘুরে বেড়ান গেল। প্রথমেই পাণ্ডুকেশ্বরের নাম-রহস্য জানবার জন্য কৌতূহল হলো ; শুনলুম এখানে মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা করেছিলেন তাই এস্থানের নাম "পাণ্ডুকেশ্বর।" এখানে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখ্‌তে পেলুম, বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এপর্য্যন্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে দুটির মত প্রাচীন মন্দির আর আমার নজরে পড়েনি, একটি হৃষিকেশে আর একটি এই পাণ্ডুকেশ্বরে ; অনেক কালের পুরানো ব'লে মন্দিরটার খানিক অংশ মাটীর মধ্যে বসে গিয়েছে, মন্দিরের পাশে ছোট ছোট চার পাঁচটা পাথরের কোটা বাড়ী আছে, সেগুলিরও জীর্ণ অবস্থা, নানা রকমের গাছ পালা তাদের মাথার উপর সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; গাছগুলোই কি অল্প দিনের ? তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলি পাথরের মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে কতকাল লেগেছে ! এই সকল মন্দিরের সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নেই, আর বিশ পঁচিশ বছর পরে সমস্ত ভেঙ্গে পড়ে যাবে, এবং এগুলি কি ছিল তা জানবার পর্য্যন্ত উপায় থাকবে না ; এরকম ভাঙ্গা স্তূপ আমরা এপর্য্যন্ত কত দেখেছি, সেগুলি উদাসীন চোকের সামনে দুদণ্ডের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করেনি, কিন্তু এককালে সে সকল স্তূপ যে কত গৌরব, কত পবিত্রতা এবং মহিমার অখণ্ড বাসস্থান ছিল, তা ভাব্‌লে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ পূর্ণ ভক্তির আবির্ভাব হয়, মনে হয় জীবন ও মৃত্যু শুধু জীব জগৎকেই যে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তা নয়, এই জড় জগতের বহু দ্রব্যও জীবিতের ন্যায় উচ্চ সম্মান এবং এবং প্রবল খ্যাতি লাভ করে কিন্তু কালক্রমে তাদের মৃত্যু হলে, তখন তাদের মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টক বা প্রস্তর-স্তূপের নিম্নে সমাহিত হ'য়ে যায় এবং দর্শকগণ কদাচিৎ তাদের দিকে একবার চক্ষু ফিরিয়ে অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করে।

পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারটী নিতান্ত ছোট নয়, কিন্তু যদি বার মাস এখানে লোক বাস করতে পারতো তাহ'লে বাজারটী আরও ভাল হতো, গ্রীষ্মের চার পাঁচ মাস কেবল এখানে লোকে বসবাস কর্ত্তে পারে, দোকানেও কেবল সেই কয় মাস খরিদ-বিক্রী হয়, শীত পড়তে আরম্ভ হ'লে দোকানী পসারী এবং বাসিন্দা লোকজন বিষ্ণু-প্রয়াগ, যোশীমঠ প্রভৃতি স্থানে উঠে যায়, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার সকলে ফিরে এসে নিজ নিজ আড্ডা দখল ক'রে বসে। এত-দিন এ স্থানটা জনসমাগমশূন্য ছিল, আজ কয়েক দিন হতে আবার লোক জুটতে আরম্ভ হয়েছে। কারণ এখানে এই গ্রীষ্মের সূত্রপাত মাত্র। গ্রীষ্মের সূত্রপাত শুনে পাঠক মনে করবেন না আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসের শেষে যে অবস্থা হয় এখানেও সেই রকম। মাঘমাসের শীতের তিনগুণ শীত কল্পনা করে নিলে এখানে গ্রীষ্ম সম্বন্ধে খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালের অবস্থা আমরা কিছুতেই কল্পনা ক'রে উঠ্‌তে পারিনে—তা আমাদের কল্পনাশক্তি যতই প্রবল হোক। এখন বরফ গলছে আর সহরগুলি বরফের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে, এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর, শীতকালে সমস্ত বরফে ঢাকা থাকে। একটা স্থান দেখলুম সমস্ত বরফে ঢাকা, একদিন পরেই দেখা গেল বরফ গ'লে গ'লে তার মধ্য হ'তে একটা দীর্ঘচূড় প্রকাণ্ড মন্দির বের হয়ে পড়েছে, হঠাৎ এই রকম পরিবর্ত্তন দেখলে মনে ভারি আনন্দ হয়। আমি চল্‌তে চল্‌তে দেখচি সহরের অনেক স্থান এবং অনেক পথ এখনো বরফে ঢাকা রয়েছে, স্থানে স্থানে বা বরফ গল্‌ছে আর তার ভিতর হতে ঘাস বেরিয়ে পড়ছে, চারদিক সাদা, মধ্যে মধ্যে নবীন তৃণ মাথা তুলে দিয়ে চারিদিকের তুষার-ধবল স্তূপের মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব বিস্তার করচে।

ঘুরে ঘুরে একটা দোকান ঘরে এসে বসলুম। দশটা বেজে গিয়েছে, এখনও সঙ্গীদের দেখা নেই; এই অপরিচিত জনবিরল স্থানে একা বড়ই কষ্ট বোধ হ'তে লাগলো, সঙ্গীদের জন্যও ভাবনা হতে লাগলো।

ক্রমে যত বেলা বাড়তে লাগল ততই শরীরের মধ্যে গরম বোধ কর্ত্তে লাগলুম, বোধ হতে লাগলো যেন শরীরের মধ্যে দিয়ে আগুণ ছুটে বেরোচ্ছে; আমি আর ব'সে থাকৃতে পাল্লুম না, কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই দোকানেই শুয়ে পড়লুম। ক্রমে এমন মাথা ধরলো যে তা আর বলবার নয়, মনে হ'লো মাথার মধ্যে কে ক্রমাগত হাতুড়ীর বাড়ি মারছে, চোক দুটি ছুটে বের হবার উপক্রম হলো এবং বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা হ'তে লাগলো। স্থির হ'য়ে থাকৃতে পাল্লুম না, যন্ত্রণায় ছট্ফট্ কর্ত্তে লাগলুম, শুয়ে থাকি তাতেও কষ্ট, উঠে বসি তারও উপায় নেই; তার উপর এমন জায়গায় এসে পড়েছি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এ রকম লোকও একটি নেই। যে দোকানে পড়ে রয়েছি সে দোকানদার এখনও নীচে হতে এসে পৌঁছেনি, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, অদূরে ঝরণা কিন্তু সাধ্য নেই উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসি। অল্পক্ষণ পরে বমি আরম্ভ হলো, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও বৃদ্ধি হলো। এই দারুণ পথে বেড়াতে বেড়াতে অনেক বারই আসন্ন মৃত্যুর হাত হ'তে উদ্ধার

পেয়েছি, কিন্তু মনে হোল যেন আজ আর অব্যাহৃতি নেই। এই মহাপ্রস্থানের পথে একটা ব্যর্থ জীবন তার অলস মধ্যাহ্নেই কি আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হোল। হায়, আজ সকালেও জানতুম না এই নির্জ্জন স্থানে, সঙ্গীহীন অবস্থায় এ রকম ভাবে প্রাণ বিয়োগ হবে! শারীরিক যাতনার সঙ্গে এইরূপ মানসিক চিন্তার উদয় হওয়ায় প্রাণ আরো ছট্ ফট্ কর্ত্তে লাগলো; মৃত্যুভয়ে যে বেশী কাতর হয়েছিলুম এমনও বলতে পারিনে, দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা কিসের অভাব আছে যার জন্যে মৃত্যুর শান্তি এবং নিরুদ্বেগ তুচ্ছজ্ঞান করবো? তবে এত যন্ত্রণাতেও যে বেঁচে থাকৃতে ইচ্ছা হচ্ছিল, এটাও অস্বীকার করতে পারছিনে। আসল কথা, আমাদের জীবনের প্রতিদিনের এই অভ্যস্ত স্রোত, এবং সুখ দুঃখ হাসি কান্নার চক্রের—মধ্যে হঠাৎ যে একটা অজ্ঞাত, পরীক্ষাতীত, রহস্যসঙ্কুল ঘটনার নূতনত্ব এসে সমস্ত গোল ক'রে দেবে এবং বর্ত্তমানের সমাপ্তি হ'য়ে যাবে এ দেখ্‌তে আমরা রাজী নই, তাই হাজার দুঃখেও আমরা মৃত্যু চাইনে; কে জানে মৃত্যুর পর আমাদের প্রাণ বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষা, অভাব, ও কষ্টের প্রাবল্যকেই কত সুমধুর ব'লে পুনর্ব্বার তা পাবার জন্যে আগ্রহ করে কি না?

বেলা যখন দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে তখন আমার সঙ্গীদ্বয় সেখানে এসে পৌঁছলেন; তাঁরা পথশ্রমে দুইজনে মরার মত হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তাঁরা নিজের কষ্ট ভুলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পরেই স্বামীজি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আমাকে কোলে তুলে বাতাস কর্ত্তে লাগলেন, এবং ব্যাকুল-ভাবে আমাকে কত স্নেহের ভৎর্সনা কল্লেন! অচ্যুতভায়া আমার সর্ব্ব শরীরে হাত বুলোতে লাগলেন আমার মাথাটা যাতে একটু ভাল থাকে এজন্যে সহস্র চেষ্টা হতে লাগলো। আমার আরোগ্যের জন্যে এঁদের দুজনের প্রাণের সমস্ত আগ্রহ এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হোল; কিন্তু তাঁদের চেষ্টার ফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়লুম; নিরুপায় দেখে স্বামিজী ও অচ্যুতভায়া একজন চাকরকে জল গরম করতে অনুমতি দিলেন। তাঁরা ক্রমাগত জল গরম করে আমার পায়ে ঢাল্‌তে লাগলেন। জলই কি শীঘ্র গরম হয়? অনেক চেষ্টাতে জল খানিকটে গরম হোল,—টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটচে, হুহু ক'রে তাপ উঠ্‌চে, উনোন হতে নামিয়ে যেমনি পায়ে ঢালা অমনি ঠাণ্ডা। আমাদের দেশে শীত কালে কলসীর জল যে রকম ঠাণ্ডা হয় সেই রকম। অনেকক্ষণ এই রকম জল ঢালতে ঢালতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোল। তখন তাঁরা আমাকে ধরাধরি ক'রে চারিদিকে বন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। ক্রমে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম, অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম।

শেষ বেলা জেগে উঠে দেখি অচ্যুতানন্দ ও স্বামিজী আমার পাশে বসে আছেন, আর আমার সম্মুখে একখানি আসনে একজন গায়ে জামাজোড়া মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি ভদ্র-লোক ঘরখানা জমকে নিয়ে ব'সে রয়েছেন। লোকটির চেহারা দেখেই একজন বড় লোক বলে বোধ হল। হঠাৎ এখানে তাঁর কি রকমে আবির্ভাব হো'ল ভেবে আমি একটু

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লুম তাঁর সঙ্গে অন্য দুই চারজন লোকও আছে। এঁদের পরিচয় জানবার জন্য আমার ভারী কৌতূহল হোল, কিন্তু ক্ষুধার প্রবৃত্তিটা আরো প্রবল হয়ে ওঠায় আগে ভাগে আহারের চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হতে হোল। আমি নিদ্রিত হ'লে স্বামিজী ও অচ্যুতভায়া রুটি তৈয়েরী ক'রে নিজেরা খেয়ে আমার জন্যে কতক ভাগ রেখে দিয়েছিলেন, আমি উঠে বসে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি উদরস্থ কল্লুম, আহারান্তে এক ফোটা জল খেয়েই সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম যেন দূর হয়ে গেল।

একটু সুস্থ হয়ে এই অভ্যাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ কল্লুম। এঁর নাম পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী, জন্মস্থান গুজরাট্‌; সংপ্রতি কলকাতা হতে আসছেন। কলকাতায় ইনি মহারাজা সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাড়ীতে বাস করেন, শুন্‌লুম মহারাজ বাহাদুর এঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বাঙ্গালা দেশের কোন সংবাদই অনেক দিন পাইনি, জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা হোল, তিনি কলকাতার অনেক বড় বড় ঘরের কথা বলতে লাগলেন, দেখলুম লোকটি শুধু জ্যোতিষের রহস্যময় পর্য্যালোচনাতেই যে সময় ক্ষেপ করেন তা নয়, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁর স্বাধীন মতামতের পরিচয় পাওয়া গেল, আর বাস্তবিক এতে আশ্চর্য্য হবারও বিশেষ কিছু নেই, লোকতত্বে যাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব আছে—রাজনীতি সমাজনীতিও তাঁদের সহজে বোঝাই সম্ভব।

এতক্ষণ পরে জ্যোতিষী-মহাশয় নিজের কথা পাড়লেন, কলকাতার ধনকুবের এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের মধ্যে কার কি রকম অদৃষ্ট গণনা করেছেন, কার কি কি ফ'লেছে এবং কে তাঁকে কি রকম শ্রদ্ধা ভক্তি করেন সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন, নিজ মুখে যদি কাকেও আত্ম-প্রশংসা কর্ত্তে শোনা যায়—তবে সে হাজার ভাল লোকের মুখে হলেও ভাল লাগে না। জ্যোতিষী-মহাশয় খুব বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ধার্ম্মিক লোক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ আত্মপ্রশংসায় আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করতে পেরেছিলুম, বিশেষ এই অসুস্থ শরীরে। যা হউক আমার এই ধৈর্য্যাতিশয্যে জ্যোতিষী-মহাশয়ের উৎসাহ বা সাহস বোধ হয় বেড়ে গেল, হয়ত এমন নির্ব্বিবাদ শ্রোতা বহুদিন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে তাঁর বাক্স আন্‌তে বললেন। বাক্স আনা হলে তিনি তার মধ্য হতে কতকগুলি খাতা পত্র বের কল্লেন, আমার বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হোল,—বিবেচনা কল্লুম এখনি বা আমার অদৃষ্ট গণনা করে আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব নখ দর্পণে দেখিয়ে দেন। আমার ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, জানি সেখানে আমার জন্যে অনেক দুঃখ জমান আছে, আলাদা আলাদা ক'রে কর্দ্দমাগিক সে সমস্ত দুঃখ জেনে আর কি ফল হবে?—মনে মনে এই রকম তর্ক করচি, এমন সময় জ্যোতিষী-মহাশয় আমার হাতে কতকগুলি কাগজ-পত্র দান কল্লেন। ওহরি, এগুলো জ্যোতিষের কোন পুঁথি নয়—ইংরাজী পারসীতে লেখা জ্যোতিষী

মহাশয়ের কতকগুলি প্রশংসা পত্র। সে সমস্ত আমার দেখবার কিছু মাত্র আবশ্যক ছিল না এবং সেজন্যে আমার মনে একটুও কৌতূহলের উদ্রেক হয়নি। কিন্তু জ্যোতিষী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন, ইংরেজীগুলো পড়ে তাঁকে তার অর্থ বোঝাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ কল্লেন, এবং আমি পারসি জানিনে বলে দুঃখ ক'রে তিনিই পারসি প্রশংসা পত্রগুলি পড়ে আমাকে তার অর্থ বোঝাতে লাগলেন, পড়ার ভঙ্গিমাই বা কি! আমি বলি আমার অর্থ বোঝবার দরকার নেই, কিন্তু তিনি যদি কিছুতে ছাড়েন! দেখলুম ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ হ'তে তিনি প্রশংসা-পত্র পেয়েছেন, এবং সকল প্রশংসা-পত্রেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী ব'লে খ্যাতি আছে। দেশে মহারাষ্ট্রাদের প্রদত্ত অনেক জায়গীর আছে, তা হ'তে জ্যোতিষীজির প্রচুর অর্থাগম হয়, ইনি নিজের অর্থে তীর্থ পর্য্যটনেএসেছেন, যেখানে যান সেখানেই অনেক অতিথিসেবা করান, সঙ্গে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও চাকর বাকর আছে, এই দুরারোহ পাহাড় কি হেঁটে পার হওয়া যায়?—তাই পাহাড়ীদের কাঁধে চ'ড়ে তীর্থ ভ্রমণ করচেন, ইত্যাদি নানা কথা বল্‌তে লাগলেন। লোকটার লেখা পড়াও জানা আছে কিন্তু নিজের গরিমা, বিদ্যার গরিমা, ধনের গরিমা, দানের গরিমা, মানসম্ভ্রমের গরিমা, প্রকাশ করবার জন্যে লোকটা মহাব্যস্ত। ভারী আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই রকম গরিমা প্রকাশ করাটা নিতান্তই অনুচিত কাজ, এবংএতে মানুষের কাছে বরঞ্চ আরো লঘু হয়ে পড়তে হয় এতটুকু সাধারণ জ্ঞানও কেন এঁদের নেই? যা হউক সুবিধার বিষয় এই, যাঁরা ঐরূপ প্রশংসা-প্রিয়, তাঁদের খোসামোদ দ্বারা সময় সময় ঢের কাজ বাগান যায়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। বন্ধুটি কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁর অর্থ অনেক। কিন্তু আমাদের ন্যায় বন্ধুগণের ভোজে সে অর্থের সৎ ব্যয় কদাচিৎ মাত্র হয়ে থাকে। আমরা একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করায় তাঁর ভ্রাতা একটা খুব বড় রকমের মাছ এনে একটু ভাল রকম খাওয়ার আয়োজন করেন, বন্ধুটী ভ্রাতার এই কার্য্যে একেবারে খড়্গাহস্ত; রাগে কত কথাই বল্লেন, একবার বল্লেন, "এ কালের ছোঁড়াগুলা কর্ত্তাব্যক্তিদের গ্রাহ্যই কর্ত্তে চায় না, (তাঁর অনুমতি না নিয়ে মাছ আনা হয়েছিল তাই বোধ করি একথা)। আবার বল্লেন, "এ কালের ছেলেগুলো ভারি অমিতব্যয়ী, বাজে পয়সা খরচ না কল্লে এদের হাত যেন শুড়শুড় করে" (১।০ সিকা দিয়ে মাছ কেনা হয়েছে সে কি সহ্য হয়?) আহারান্তে বল্‌লেন "ছেলেগুলো ইংরেজী শিখে দেশটা উচ্ছন্ন দিলে"। (নিজে ইংরেজী জানেন না)। এই ঘটনার পরদিন আমি আর উল্লিখিত মিতব্যয়ী বন্ধু এই দুজনে বেলা আটটার সময় ট্রামে চেপে চৌরঙ্গির দিক হতে ফিরে আস্‌চি। বিডন স্কোয়ারের কাছে এসে আমাদের খাওয়া দাওয়ার গল্প আরম্ভ হ'ল। আমি বল্লুম, "আগে আগে কলকাতায় এসে ভাল খাওয়া পাওয়া যেতো, এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, যারা খাওয়াবে তারা সকলেই এখন কলকাতা ছাড়া, তবু যে মধ্যে মধ্যে এখানে এলে ভাল খাওয়া যায় সে কেবল এক তোমার জন্যে, তুমি ত আর

কিছু বন্ধু-বান্ধবকে খারাপ খাওয়াতে পার না, এজন্যে পয়সা ব্যয় কর্ত্তেও তোমার আলিস্যি নেই, নিজেই ভাল জিনিস সন্ধান করে খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ কর, এ গুণটি তোমার যেমন আর কারো সে রকম দেখ্‌তে পাইনে।" বন্ধু যেন স্বর্গ পেলেন, অমনি তাঁর মুখ খুলে গেল, আমার হাত দুটি ধরে সবিনয়ে বল্লেন, "দেখ, ভাই, তোমাদের খাওয়ানর জন্যে আমার বড়ই আগ্রহ হয়, এক সঙ্গে যে পাঁচদিন আমোদে কাটান যায় সেও পরম সুখের কথা, টাকাকড়ি আরত সঙ্গে যাবেনা, কিন্তু এ কথা বোঝে কজন ?"—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্র্যাম গাড়ী ঘড় ঘড় শব্দে নূতন বাজারের রাস্তার মধ্যে এসে পড়লো, বন্ধুবর চীৎকার ক'রে বল্লেন, "বাঁধো" ? গাড়ী না বাঁধলে ভায়া নামতে পারতেন না, সুতরাং তাঁর নামবার আবশ্যক হলে তার জন্যে অনেক খানি আয়োজন কর্ত্তে হ'তো ; অনেক সোর গোল ক'রে তিনি নেমে পড়লেন, তারপর আমার হাত ধরেও টানাটানি, আমি বল্লুম "নামতে হবে শোভাবাজারের মোড়ে, এখানে হঠাৎ তোমার কি কাজ পড়ে গেল ?" ভায়া কোন দিকে কাণ না দিয়ে আমার হাত ধ'রে বাজারের ভিতর প্রবেশ কল্লেন, এবং খেজুর গাছের মাথার মত মাথাওয়ালা এক ডজন গল্দাচিংড়ি, দুর্ম্মূল্য ফুলকপি, এবং কড়াই সুঁটি প্রভৃতিতে তিন টাকার বাজার নিয়ে বাসার দিকে চল্লেন। শুধু আমি অবাক্ নই, বাসায় উপস্থিত হ'লে সকলেই অবাক্ হয়ে গেলেন। রাত্রে মহাধূমে পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত হ'লো। সে দিন দাদার মিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে অমিতব্যয়ী ছোট ভাইটি যে সকল স্বগত উক্তি করেছিল, তা প্রকাশ্যে বল্লে বোধ হয় আমোদ আর একটু বেশী হ'তো। যাহোক ইংরাজী না শিখ্‌লে দেশ কি রকম ক'রে উদ্ধার হয় রাত্রে দাদার কাছে সে তার অতি সুন্দর পরিচয় পেয়েছিল। সেই অনেক দিনের পুরানো কথা আজ খুলে লিখলুম এখন বন্ধু বিচ্ছেদ না হ'লে বাঁচি।

যা হোক শতশত প্রশংসা-পত্র দেখিয়েও জ্যোতিষী-মহাশয়ের আশ মিট্‌লো না। শেষে বাক্সের ভিতর হ'তে দু তিন খানা "অমৃত বাজার" বের ক'রে আমাকে দুই তিনটে জায়গা পড়তে দিলেন, পাশে লাল দাগ দেওয়া—দেখলুম হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার সময় ইনি নিজে খরচ পত্র ক'রে অনেক গরীব এবং সাধু সন্ন্যাসীকে আহার দিয়ে ছিলেন, এতদ্ভিন্ন প্রচুর বস্ত্র অর্থাদিও দান করেছিলেন, এই কথা কে অমৃতবাজারে টেলিগ্রাম করেছে ইনি সেই সমস্ত টেলিগ্রাম সংগ্রহ করে রেখেছেন।

জ্যোতিষীর কাছে মহারাজ ঠাকুর বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরের ফটো দেখতে পেলুম, উজ্জল, প্রসন্ন, শান্তিপূর্ণ বদন এবং তাতে পুরুষ-সুলভ কাঠিন্যের অভাব দেখে মনে আপনি একটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে উপস্থিত হলো। কত দিন স্বদেশ দেখিনি—স্বদেশীয় মুখ পর্য্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছি আজ এই ছবি দুখানি দেখে ভারি আনন্দ লাভ কল্লুম, এই প্রবাসের মধ্যে বোধ হলো এঁরা আমার পরম আত্মীয়। কোথায় মহৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজ পরিবার আর কোথায় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আমি, কিন্তু এখানে

আমাদের মধ্যে এই গভীর ব্যবধান ভুলে গেলুম। স্বর্গে, শুনেছি, মানুষে মানুষে ব্যবধান নেই, স্বর্গের এই দ্বারদেশে কি তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ?

সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার বাতাসে এবং স্নিগ্ধতার মধ্যে শরীর অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে ; আস্তে আস্তে পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির এবং আরও গোটাকত ভাল মন্দির দেখে ঘুরে এলুম, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশে মেঘ করে এল, আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হ'লো, শীতে আমরা আড়ষ্ট হয়ে পড়লুম—ভাগ্যি আমরা আগেকার সেই দোকান ঘরটা ছেড়ে এসেছি তাই, নতুবা আজ মারা পড়া শক্ত ছিল না। যতক্ষণ জেগেছিলুম বৃষ্টি একবারও থামেনি, রাত্রে আর কিছু আহারাদি হোল না, বেশ আরামের সঙ্গে রাত্রি কাটান গেল। স্বামীজি বলেছিলেন আগামী কল্যই আমরা বদরিকাশ্রম পৌঁছতে পারবো, সেই কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার বড় আনন্দ হয়েছিল। এত কষ্ট, এত পথশ্রম, এত কঠোর উদ্যম, কাল সমস্ত সার্থক হবে ! যারা নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক, ভগবানের চিরপ্রসন্নতাই যাদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই যারা এই জীবন পথের অমূল্য পাথেয় বলে ধ্রুব জেনেছে, তাদের শান্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই, বদরি নারায়ণের মধুরসত্তা কি আমার হৃদয়ের দারুণ পিপাসা নিবারণ কর্ত্তে পারবে ? দেখি, যদি হিন্দুর এই অভিষ্ট মন্দিরে এই সনাতন ধর্ম্মের পীঠতলে একটু শান্তি, একটু তৃপ্তি যুগান্তব্যাপী মাহাত্ম্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ! আশা উৎসাহে এবং স্বপ্ন জাগরণে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল।

শ্রীজলধর সেন।

কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন।

যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষাপ্রণালী হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাল্পনিক চিত্র গড়িতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের নিতান্তই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। যেমন "লণ্ডন ইউনিভার্সিটি" বলিলেই বার্লিংটন হাউসের কথা মনে পড়ে, তেমনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে 'সেনেট হাউস'ই বুঝায়। আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে গেলে হয়ত পরীক্ষা পরীক্ষক ও পুস্তকের তালিকার কথাও মনে আসিতে পারে, কিন্তু কেম্ব্রিজ কি অক্সফোর্ড সম্বন্ধে তাহা কখন হয় না। সেখানেও এ সকলই আছে, (যদিও তাহাদের ধারা অন্য প্রকার) কিন্তু এই গুলিই তাহার বিশেষত্ব নহে, অন্যতম অঙ্গমাত্র। ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি বিষয় আছে, সেই সকলগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাই অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। যাঁহারা কিছুদিন অক্সফোর্ড কি কেম্ব্রিজে যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নিজের ইউনিভার্সিটির ও নিজের কালেজের প্রতি, এমন একটা ভক্তি ও ভালবাসা দাঁড়াইয়া যায়, যাহা কখনই লোপ পাইবার নহে। বাস্তবিক Alma Mater কথাটী অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিই এরূপ প্রযুজ্য মনে হয় না। যাঁহারা লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর উপাধিধারী তাঁহারা হয়ত, উহার পরীক্ষার কাঠিন্য লইয়া গর্ব্ব করিবেন, জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা, হেল্মহোল্ট্জ (Helmholtz), ভির্কো (Virchow) প্রভৃতির নাম করিয়া কি তাহাদের বড় বড় Laboratoryর কথা বলিয়া দর্প করিতে পারেন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের লোকেরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করাই আপনাদের যথেষ্ট সম্মানসূচক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদেরও বড় বড় লোক আছেন; নিউটনের সময় হইতে প্রতিভাশালী লোকের অভাব নাই; আজ কাল কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের চর্চ্চার উপযুক্ত অনেক Laboratory হইতেছে, কিন্তু সে সকলের জন্য কেহই গর্ব্বপ্রকাশ করেন না। কেম্ব্রিজের ট্রাইপস্ ও অক্সফোর্ডের Honor Schools, লণ্ডনের অনার পরীক্ষা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে, কিন্তু তাহা এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরবের কারণ বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। ইহাদের ছাত্র-জীবনে এক বিশেষ ভাবের সহিত ইহারা এক বিশেষ ভাবে সংলগ্ন বলিয়াই ইহাদের এত গৌরব। তবে বিদ্যালয়ের প্রাচীনত্ব, ইহাদের সমৃদ্ধি, ইহাদের শিক্ষাপ্রণালী অবশ্য সেই গৌরব বর্দ্ধন করে; এবং ইংরাজ জাতীয় মহত্ব সে গৌরবকে আরও জাজ্জ্বল্যমান রাখে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটী আরও এক বিশেষ শিক্ষার স্থল। দুইজন লোকের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহারা অন্যতম "ভার্সিটির" লোক হন তাহা হইলে আর অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। এই যে এক ইউনিভার্সিটীর পূর্ব্বতন ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ট ভ্রাতৃভাব

ইহার সঙ্গে ইংরাজ জাতীয় জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক বলিতে গেলে ইংরাজের মধ্য উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের যে সকল সদ্গুণ আছে, যাহার জন্যই ইংরাজী ইতিহাস এত উপাদেয় গ্রন্থ, এই সকল উন্নতিতে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনেক হাত আছে। সেই জন্যই তাহা বিলাতের ভদ্রলোকদের বিশেষ আদরের জিনিষ এবং সাধারণ লোকদিগের ভক্তি আকর্ষক।

যদিও আমি কেম্ব্রিজের বিবরণই বিশেষভাবে দিতে সক্ষম, তথাপি উপরোক্ত কথাগুলি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে খাটে বলিয়াই দুইটীর কথাই একেবারে বলিলাম। ইহারা এক অর্থে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু এ প্রতিদ্বন্দ্বীতা এ কালে আপনাদের ভিতরে। সাধারণের সমক্ষে ইহারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। বাস্তবিক সাধারণের চক্ষে, ইহারা জাতীয় জীবনের এক বিশেষ পরিচ্ছেদের দুইটী শাখামাত্র।

কেম্ব্রিজের ছাত্র জীবনের বিবরণ দিবার অগ্রে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইউনিভার্সিটী এক অর্থে ছাত্রসমষ্টি। তাঁহারাই এম, এ হইবার তিন বৎসর পরে সেনেটের মেম্বর হন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। Chancellor ও Vice-Chancellor নিযুক্ত করা, পার্লামেণ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা সমিতির সভ্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ সকলই তাঁহাদের হাত। অন্য কথায় ইউনিভার্সিটী অর্থে, কালেজ সকলের সমন্বয়; তাঁহাদের প্রতিনিধিরাই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই দুই অর্থের বিভিন্নতা নাই। কারণ, কালেজ অর্থে ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষ (ফেলোর) সমষ্টি।

আমাদের এখানে কালেজ বলিলে যেমন কেবল বক্তৃতার জায়গা মনে হয়, সেখানের কালেজ অর্থে তাহা নহে। প্রত্যেক কালেজে দুইটী দরদালান আছে। একটীর নাম হল, সেখানে দীনান্তে একবার ছাত্রদের ও কর্ত্তৃপক্ষদের সমবেত আহার হয়। আর একটীর নাম Combination room কর্ত্তৃপক্ষদের বসিবার স্থান। এতদ্ব্যতীত একটী ধর্ম্মালয় ও কতকগুলি ছোট বড় বক্তৃতার স্থান, একটী কালেজের পুস্তকাগার ও একটী ছাত্রদের সভাগৃহ আছে। বাকি অধিকাংশই ছাত্রদের ও ফেলোদের থাকিবার জন্য ঘর। প্রত্যেক ছাত্রের কিংবা ফেলোর একটী (ছোট) শয়নঘর ও একটী (বড়) বসিবার ঘর। সকল ছাত্রদেরই কালেজে স্থান হয় না সুতরাং প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের সহঁরে বাসা করিয়া থাকিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে অন্য ছাত্রদের তফাত কিছুই নাই কেবল স্থানের বিভিন্নতা। এখানে বৎসরে প্রায় ছয় মাস ছুটী। অক্টোবর হইতে জুন পর্য্যন্ত বাকি ছয় মাস তিন টার্ম্মে বিভক্ত।

ব্যায়াম, সামাজিকতা, বিদ্যানুশীলন, এই তিনটীই সেখানকার ছাত্রজীবনের প্রধান অঙ্গ। যেখানে এত যুবকের সমাগম (কেম্ব্রিজে প্রায় তিন চার হাজার ছাত্র আছেন), আর জীবনীভাব এত অধিক, সেখানে অবশ্য নানা রকমের ছাত্র পাওয়া যায়। একদল পড়া শুনাতেই ব্যস্ত সাধারণতঃ তাঁহাদের নাম Smugs। একদল ব্যায়াম লইয়াই থাকেন তাঁহাদের

কিছু নাম নাই, কারণ তাঁহাদের দলই বেশী এবং তাদের মাস্তও অধিক। আবার একদল হয়ত ব্যায়ামাদি সকলেরই কিছু কিছু করেন। প্রথম দলের কথা কিছু বলিবার নাই। তাহাদের সংখ্যা অতি কম তবে তাঁহারাও যে একেবারে আর কিছুই করেন না এমনও নহে। ইউনিভার্সিটীর এমন কতকগুলি ধারা আছে, যাহাতে কাহাকেও সমস্ত দিনরাত্রি পুস্তক পুস্তক, কার্য্য কার্য্য করিয়া পাগল হইতে দেয় না। দ্বিতীয় দলের অবস্থা (এক অর্থে) কিঞ্চিৎ শোচনীয়। ইহাঁরা প্রায়ই কিছু দেরীতে (৯টা ১০টার সময়) শয্যা হইতে উঠেন। কেহ কেহ কখনও ১২টা পর্য্যন্তও নিদ্রাসুখ ভোগ করেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে কোন রকমে ১টা বাজে। এই দলের একটা নিয়ম, প্রায়ই তাঁহারা হয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেন, না হয় নিজে নিমন্ত্রিত হন। ইহারা ১টার সময় lunch করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম ক্রীড়ায় নিযুক্ত হন। দাঁড়টানা, ফুটবল, ক্রিকেট, পলো, গল্প, প্রভৃতিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সেখান হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া, "হলে" কিম্বা অন্য কলেজে নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে যাওয়া হয়। আহারান্তে ক্লাবে গিয়া, তামাক টানিয়া, কাগজ পড়িয়া ঘণ্টাখানেক কাটে। তারপর নিজের কালেজে কি অন্য কালেজের বন্ধুদের ঘরে গিয়া তাসখেলা, গল্প করা কাফি খাওয়া,—কি আরও কিছু খাওয়া। কিম্বা হয় ত থিয়েটার দেখিতে বা কিছু খেলিতে যাওয়া হয়। নিয়ম মতে ১০টার আগে কালেজে (কিম্বা বাসায়) ফিরিয়া আসা উচিত। ১১টার মধ্যে আসিলে জরিমানা দিতে হয়; তারপর আসিলে আর কালেজে (কিম্বা বাসায়) ঢুকিবার হুকুম নাই।

অনেকেই হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন তাঁহাদের পড়াশুনার সময় কখন। আমি যাঁর কথা মনে করিয়া লিখিতেছি, তিনি প্রায় কখন পরীক্ষার পড়া পড়িতেন না; তবে সকলকেই না পড়িলে চলে না। ৯টা হইতে ১টার মধ্যেকার সময়টা বাধ্য হইয়া কোনদিন পড়া শুনা করিতে ও কালেজের বক্তৃতা শুনিতে যাইতে হয়। রাত্রে আর ইহাদের পড়া শুনা হইয়া উঠে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ দলভুক্ত লোকের সংখ্যাই বেশী। তাহারা অধিকাংশই ভদ্র ঘরের সন্তান। ইহাদের উপাধি বেচিয়া খাইতে হইবে না, আমাদের দেশের জমীদার তালুকদার যে শ্রেণীর লোক ইহারাও সেই শ্রেণীর। ইহাদের অনেকেরই টাকা ব্যবসা হইতে। তাঁহাদের শিক্ষা—পুস্তকগত শিক্ষার কথা বলিতেছি না, আমাদের বড়লোকের শিক্ষা কি শিক্ষার অভাব হইতে যথেষ্ট বিভিন্ন। সেখানকার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ নহে। সেখানে কেবল শিক্ষার আরম্ভ মাত্র। স্থানীয় ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি পর্য্যালোচনা ইংলণ্ডে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র; তাহাতে নিজের ক্ষমতা ও স্থানানুসারে কার্য্য করা কম শিক্ষাপ্রদ নহে। শুধু কেম্ব্রিজে কেন বিলাতের সর্ব্বত্রই এই জীবনী ভাব লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে নিবিষ্ট থাকিলে আমাদের পল্লীগ্রামের বড়লোকদিগকে নির্জীবতা পরিত্যাগ করিতে হইত।

তৃতীয় দলের কার্য্য কলাপই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্বের পরিচায়ক। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ৯টার মধ্যেই কাজ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন; কেহ বক্তৃতা শুনিতে যান কেহ নিজের ঘরে বসিয়া পড়েন। ২টার পর কিন্তু কেহই প্রায় আর পড়েন না, তখন হইতে ডিনারের সময় পর্য্যন্ত কোন রকম ব্যায়াম, বা কাহারও ঘরে গিয়া চা খাওয়া গল্প ইত্যাদি-তেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হয়। যাঁদের Smugs বলে, তাঁরাও অনেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বেড়াইতে যান। ব্যায়ামের মধ্যে যাহারা কেবল বেড়াইতে যান তাঁদের লোকে কিছু অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করে, Loafer বলিয়া উপহাস করে। যদিও কেম্ব্রিজের ছাত্রদলের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন যাহাঁরা সর্ব্বরকম ব্যায়ামের কিছু না কিছু জানেন, তবে বিশেষ কারণে অনেককেই loafer হইতে হয়। একদলের ছাত্রেরা, রাত্রেও কিছুক্ষণ কাজ কর্ম্ম করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গতি কম কাজেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, থিয়েটার ইত্যাদিতে যাইবার তত সঙ্গতিও থাকেনা, তদ্ব্যতীত ট্রাইপসের জন্য পড়িতে গেলে এত সময়ও কুলায় না। মোটের মধ্যে ছয় হইতে আট ঘণ্টা পড়াই সাধারণতঃ নিয়ম তবে বক্তৃতা শোনা (এখানে যেমন কালেজে যাওয়া) ইহারই মধ্যে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এখানকার শিক্ষাপ্রণালীতে পুস্তকগত শিক্ষার সহিত অন্য প্রকার শিক্ষা বিশেষভাবে সম্বদ্ধ।

প্রথমতঃ, যাহাকে সামাজিকতা বলিয়াছি তাহার শিক্ষা অনেক। এক বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যুবকদের একত্রে ভ্রাতৃভাবে বাস; ইহাতে জাতীয় জীবন গঠনে বিশেষ অনুকূলতা করে। সেখানে হাইল্যাণ্ডের যুবকও আছেন, আয়র্লণ্ডের পশ্চিমসীমাবর্ত্তী লোকও আছেন, আবার লণ্ডনের লোকেরও অভাব নাই। ইংলণ্ড, স্কট্লণ্ড, আয়র্লণ্ডের যত বড় বড় স্কুল আছে, সকল স্থান হইতেই যুবকের সমাগম। কেবল একমাত্র অসুবিধা, তাঁহারা সকলেই প্রায় হয় উচ্চশ্রেণীর নয় মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোক। মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও যাঁহারা অনেক টাকা কড়ি, কিম্বা জলপানী পান, তাঁহারাই অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজে আসিতে পারেন; সাধারণ লোকের একবারেই আসিবার যো নাই। দুই একজন বোর্ড স্কুলের ছাত্র মধ্যে মধ্যে ইউনিভার্সিটীতে আসিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন, কিন্তু তাহাতে সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক হয় না। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটী স্থিতিশীল দলের দুর্গস্বরূপ। এই দোষ সত্বেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, দেশের রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, যাঁহারা স্বাভাবিক নেতা, তাঁহাদের এইরূপ পরস্পর মিলনে অনেক সুফল ফলে। সকলেই জানেন, পল্লিগ্রামের বালকেরা কলিকাতায় আসিলে তাহাদের কত উদারতা (যাহা অনেক সময়ে মন্দ দিকে যায়) বাড়ে; ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকে অল্প দিনের জন্যেও একত্র সমাগমে কত সুফল ফলিতে পারে; কিন্তু আমি যে সমাগমের কথা বলিতেছি তাহা আরও বিশেষ ভাবের। সুধু একত্র বাস নহে। প্রত্যহ একত্র ভোজন, একত্রে ব্যায়াম শিক্ষা, অনেকটা একত্র পাঠ। তদ্ব্যতীত পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয়ের আরও বিধি

আছে। যে সকল ছাত্র, দুই বৎসর কি তাহার অধিক দিন ইউনিভার্সিটীতে আসিয়াছেন, তাহাদের প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া প্রথা। পরস্পরের ঘরে গিয়া চা খাওয়া প্রায়ই ঘটে। পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করারও বিধি আছে। এতদ্ব্যতীত ক্লাবে দেখা হয়, সেখানে সপ্তাহে বক্তৃতার জন্য এক সভা হয়। সেখানেও পরস্পর পরিচয় হইবার সুবিধা। নিজের কালেজের ছাত্রদের সঙ্গে যেমন, অন্য কালেজের ছাত্রদের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সম্ভব, এবং তাহা হইয়াও যায়। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া 'Guest Hall' হয়; অর্থাৎ সেই দুই দিন, অন্য কালেজের বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান চলে, তাহার দরুণ অবশ্য যিনি নিমন্ত্রণ করেন তাঁহাকে টাকা দিতে হয়। নিজের ঘরেও যাহাকে ইচ্ছা নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। কালেজের রন্ধনশালায় হুকুম করিলেই ডিনার প্রেরিত হয়, টার্মের শেষে, অন্য খরচের টাকা দিবার সময়, ইহার দাম দিলেই চলে।

এই সকল রীতি পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়। কত চিরজীবনব্যাপী বন্ধুতা হইয়া দাঁড়ায়, কত রকম দোষ সংশোধিত হইয়া যায়, কত রকম চরিত্র শিক্ষা করিবার সুযোগ হয় তাহা বলা যায় না। অধিকাংশ ছাত্রই প্রায় উনিশ বৎসর বয়সে ইউনিভার্সিটীতে আসেন। প্রথম যৌবন হইতেই সাধারণ মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে শিক্ষা হয়। কোন রকম 'অভদ্র' ব্যবহার করিলে তাহার ফল হাতেহাতেই পাওয়া যায়। অবশ্য অভদ্র ব্যবহার কথায় হয়ত বিশেষ অর্থ আছে; সাধারণ মতেরও যৌবনসুলভ ধৃষ্টতা আছে। সামাজিকতা হইতে অনেক রকম দোষও আসিতে পারে। বড় লোকের দলে মিশিতে গিয়া অনেক মধ্যবিত্ত ছাত্র আপনার ও বাপের সর্ব্বনাশও করিয়া ফেলেন। সমাজের মধ্যে আবার নানা প্রকার বিভেদ হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ এক একটী দলকে 'সেট্' বলে। যাঁহারা অনেক খরচ পত্র করেন, তাঁদের ও তাঁদের মোসাহেবদের লইয়া একটী সেট্, বোর্ডিং সেট্, পঠনশীলদের সেট্ ইত্যাদি। বড় বড় কালেজের এ রকম সেট্ অনেক। সুধু তাই নয়; বিলাতে Eton আর Harrow দুইটী প্রধান স্কুল আছে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদেরও সেইরূপ। এই দুই স্কুলের যে সকল ছাত্র কেম্ব্রিজে আছেন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে, বিশেষতঃ নিজের কালেজে এক সেট্ বাঁধেন। তাঁহারা প্রায়ই হয় 'ট্রিনিটি' কিম্বা কিংস্ কালেজে যান, সেখানে তাঁহাদের দল পৃথক। এখানে আরও এক প্রকার দলবিভাগ আছে। কোন কালেজে হয়ত অধিকাংশ ছাত্রই সুরতি খেলেন সেখানে এরূপ প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভর্ত্তি হইলে তাহাকে সকলে হেয় জ্ঞান করে, তাহার সহিত মেশেনা। আবার কোন কালেজে হয়ত অধিকাংশ ছাত্র দাঁড় বাহা কিম্বা অন্য খেলা লইয়া ব্যস্ত, সেখানে loafer'এর স্থান বড় নাই। এ সকল দোষ মনুষ্য স্বভাবসুলভ; ইহার জন্য পদ্ধতির দোষ দিতে পারা যায় না।

সামাজিকতার এক বিশেষ লক্ষণ এখনও বর্ণনা করা হয় নাই। কেম্ব্রিজে নানা

বয়সের নানা শ্রেণীর লোক আছেন। যাঁহাদের কথা এতক্ষণ বলিতেছি, তাঁহারা ছাড়া এম, এ, বি, এ উপাধিধারী ছাত্রও অনেকে কেম্ব্রিজে কিছুদিন থাকেন। তদ্ব্যতীত, প্রত্যেক কালেজে কতকগুলি করিয়া ফেলো আছেন, ইহাঁরাই কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষক, ইহারাই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা। এই সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই পরস্পরের বিশেষ সামাজিক বন্ধন আছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহারা কখনও কখনও ছাত্রদের তর্কসভায় আসেন ও বক্তৃতা দেন; ছাত্রদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করেন। কাহারও পীড়া হইলে তত্ত্বাবধান করেন। ছাত্রগণ আবার কোন প্রকার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাঁহাদের কাছে যান। তাঁহাদের বাটীতে কোন ছাত্র যাইলে যতদূর খাতির যত্ন করা উচিত তাঁহারা তাহা করেন। সাধারণত বলিতে গেলে ছাত্রদের শারীরিক, আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক, ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। ফলকথা শিক্ষক ও ছাত্রদের, কর্ত্তৃপক্ষ ও তদধীনস্থ লোকের যেরূপ সম্বন্ধই স্বাভাবিক ও সুনীতি সঙ্গত তাহাই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, শুধু কেম্ব্রিজে কেন, বিলাতে সর্ব্বত্রই বোধ হয় শিক্ষক ও ছাত্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে যথার্থ শিক্ষা হওয়া দুরূহ। শিক্ষক যদি কেবল বক্তৃতাই দেন, তাঁহার জীবনের সহিত যদি ছাত্রদের জীবনের কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের ছাত্রজীবন গঠনে প্রভাব অতি অল্পই এবং ইহার অভাবে শিক্ষা বিশেষ অঙ্গহীন বলিয়া মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকতার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হইলে এতদ্বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ কি অভিজ্ঞতা আছে বলা আবশ্যক। এক সময়ে ভারতবাসীদের কেম্ব্রিজের কোন কালেজেই প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ এক সময়ে যাহারা ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত বিশেষ ধর্ম্মমতাবলম্বী তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই কোন কালেজের প্রবেশ করিতে পাইতেন না। তৎপরে যদিও তাঁহারা প্রবেশ অনুমতি পাইলেন, ফেলো হইবার অধিকার পাইতে আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। আর এক কথা। ইংরাজদিগের কতকগুলি জাতিগত কুসংস্কার আছে। শিক্ষার গুণে, অনেকেই সে সকল পরিহার করিতে পারেন ভদ্রতার খাতিরে অনেকে তাহা লুক্কায়িত রাখিতে পারেন কিন্তু ইহাদের সম্পূর্ণ পরিহার করিতে বহুকাল ও চেষ্টার আবশ্যক। বিদেশীয়দের বিশেষতঃ কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর, ইংরাজদের স্বভাবতঃ একটা কুসংস্কার আছে। শিক্ষার, সভ্যতার কিন্তু এমনি বল, যে সে কুসংস্কার প্রায়ই প্রকাশ পায়না। ক্রমশঃ আবার বিশেষ আলাপ পরিচয়ে তাহা প্রায় লোপ পাইয়া যায়। আমাকে কেম্ব্রিজে থাকিতে এ কুসংস্কারের জন্য মনোকষ্ট প্রায়ই পাইতে হয় নাই। আমি যে কেম্ব্রিজ সাধারণ সমাজ হইতে বিভিন্ন ইহা কেহই প্রায় আমাকে জানিতে দিতেন না। এমন কি একবার Debating Societyতে

আমার একজন বন্ধু আমার নাম করিতে গিয়া আমি যে ভারতবাসী শুধু এই কথাটী অতি মিষ্টভাবে উল্লেখ করাতেও অনেকেই তাহা bad form বলিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। শুধু কেম্ব্রিজে কেন, অন্যান্য স্থানেও ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাদের এইরূপ ব্যবহার। তাঁহাদের মতে আমি সেখানে ভারতবাসী নহি শুধু কালেজের একজন ছাত্র ও সেই সভার সভ্য।

দুই একবার ক্লাবের কথা বলিয়াছি। প্রত্যেক কালেজে একটী করিয়া ক্লাব আছে। এখানে শীতকালে সপ্তাহে একবার করিয়া বক্তৃতা হয়; গ্রীষ্মকালে দিন বড়, সন্ধ্যার আগে বেড়ানর বড় সুবিধা, এজন্য সে সময় বক্তৃতাদি চলেনা। ইহা ব্যতীত ক্লাবের সঙ্গে খবরের কাগচ পড়িবার বন্দোবস্ত আছে একটী ছোট লাইব্রেরীও আছে তাতে কেবল উপন্যাস। এই সকলের মস্তকের উপর ভার্সিটি ক্লব The Union। ছোট কালেজের প্রায় সকল ছাত্রই এই ক্লাবের সভ্য কিন্তু বড় বড় কালেজে বড় দুটী তিনটী করিয়া এই রকম ক্লাব আছে। এই ক্লাব ছাড়া, সঙ্গীত তাসখেলা প্রভৃতির নানা প্রকার ক্লাব আছে। ইহাদের মধ্যে Amalgamation Club সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। বোটিং ফুট্‌বল ইত্যাদি ব্যায়াম বিষয়ক ক্লাবযোগে এই ক্লাবের সৃষ্টি। কালেজের অধিকাংশ ছাত্রকেই ইহার সভ্য হইতে হয়। চাঁদা প্রত্যেক টার্মে প্রায় ২৫ শিলিং, সকলের এই টাকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাবের খরচের জন্য টাকা দেওয়া হয়। ইহার সম্পাদক, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রতি বৎসর নিযুক্ত হন। কালেজের যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ইহারও শুভাকাঙ্ক্ষী। যে কালেজে ইহার কার্য্য ভালরূপে চলিতেছে না, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, সে কালেজের অবস্থা মন্দ। কারণ তাহার জন্য সে কালেজে ব্যায়ামে উৎসাহী, অধিক লোক নাই। সুতরাং তাহার ছাত্রসংখ্যাও অল্প। কোন বৎসর, সিনিয়ার র‍্যাঙ্গলার কি সিনিয়র ক্ল্যাসিকএর উপযুক্ত ছাত্র কালেজে ভর্ত্তি হইলে কি হইবে, যদি সে বৎসর দক্ষ ফুটবলের দল সংগ্রহ না হইল! কোন বৎসর ট্রাইপসে ৭।৮ জন ছাত্র প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে কি হইবে, যদি লেন্ট কি মে রেসে কালেজের বোট্ এক পদ নামিয়া গেল! আমাদের কয়েক বৎসর পরীক্ষার ফল ভাল বটে,কিন্তু কই আমাদের মধ্যে একজন চিহ্নিত 'ব্লু' নাই ত! আমাদের কলেজে এমন অনেক লোক শিক্ষালাভ করিলেন, যাঁহারা এখন পৃথিবীর মধ্যে খ্যাতনামা, কিন্তু কই ১৮১৬ সাল হইতে আমাদের কালেজের বোট ভার্সিটির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে নাই ত। এই প্রকার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারা যায় ব্যায়ামের বিষয়ে কেম্ব্রিজে লোকের কত যত্ন ও উৎসাহ। সে যত্ন, সে উৎসাহ, শুধু ব্যায়ামশীল লোকের ভিতরেই আবদ্ধ নহে। যাঁহারা ব্যায়ামের কিছুই জানেন না, তাঁহারাও ইহাতে মনোযোগ না দিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ উৎসাহ, শুধু ভার্সিটীর লোকের ভিতরে আবদ্ধ নহে; বিলাতের ছোট বড় সকল লোকেরই এ বিষয়ে আগ্রহ। ভদ্রমহিলাদের মধ্যেও এই আগ্রহ

প্রবেশ করিয়াছে। রাজনীতির কথা অনেকেই হয়ত বুঝিতে সক্ষম নন ; ব্যবসা বাণিজ্যের কথাতেও সকলে যোগ দিতে পারেন না কিন্তু গত ক্রিকেট খেলাতে কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৌড়িয়াছিল, টেনিসে আজকাল প্রধান খেলোয়ার কে এই সকল বিষয়ে সকলেরই বক্তব্য আছে। হাজার হাজার লোক পয়সা দিয়া বড় বড় খেলা দেখিতে যান। দুঃখের বিষয় কেবল উৎসাহ দেখাইয়াই ইঁহারা নিরস্ত নহেন। এই সকল লইয়া বাজির খুব ধূম পড়িয়া যায়। এটী ইংরাজদের জাতীয় স্বভাবের একটী কলঙ্ক। 'কি বাজি,' এটী ভাষার এক বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুরতিখেলা আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু কই তাহাতে কিছুই ফল হয় না। ইউনিভার্সিটিতেও—যেখানে এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষরা খুব কড়া নিয়ম জারি করিয়াছেন—ইহার খুব প্রাদুর্ভাব। দেশের প্রকাশ্য সাধারণ মত ইহার অত্যন্ত বিরোধী, তাহা কেবল পাদরীদের প্রভাবে। কিন্তু তাহাতে আভ্যন্তরিক রোগের প্রতিকার হয় না।

ইউনিভার্সিটীর ব্যায়ামানুশীলন বিষয়ে রীতি পদ্ধতি অতি সুন্দর। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই প্রতীত হইয়াছে, স্বায়ত্বশাসন ও স্থিতিশীল উন্নতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। যেমন রাজকীয় বিষয়ে ইংরাজ এই সকলের সামঞ্জস্য করিবার পন্থা বাহির করিয়াছে, তেমনি এ সকল বিষয়েও বিফল যত্ন হয় নাই। বৎসর বৎসর নূতন নূতন ছাত্র আসিতেছে তথাপি বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম ঠিক সুপ্রণালীমতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে প্রথার উন্নতিই হইতেছে। ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলিতে প্রথম শিক্ষা চাই, সমস্ত স্কুলেই এ সকলের চর্চ্চা আছে। কাজেই অধিকাংশ নূতন লোক এ বিষয়ে অনেকটা দক্ষ। কালেজের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাঁহাদের লইয়া কলেজ-টিম (দল) হয়। ইঁহারা অন্য কলেজের টিমের সঙ্গে খেলিতে পান। এইরূপে সকল ইউনিভার্সিটীর মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের লইয়া ভার্সিটী-টিম হয়। ইহারাই অক্সফোর্ডের সঙ্গে এবং বিলাতের অন্যান্য বড় বড় ক্লাবের সঙ্গে খেলিতে পায়। ইহারাই 'ব্লু' উপাধিধারী। ব্লু উপাধি পাওয়া মহাসম্মান। ব্যারিষ্টারদের যেমন লর্ড্ চান্‌সেলার হওয়া আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা, তেমনি ইউনিভার্সিটীর ব্যায়ামশীল ছাত্রদের মধ্যে ইহাই চরম উদ্দেশ্য। ইহাদের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের সম্মান সিনিয়ার র‍্যাংলারের অপেক্ষাও অনেক বেশী।

সকল খেলার অপেক্ষা, নৌকার দাঁড় বাহার উপর লোকের মনোযোগ অধিক। তাহার কারণ বৎসরের সকল সময়েই ইহা চলিতে পারে, তদ্ব্যতীত এবিষয়ে দুই ইউনিভার্সিটিতে প্রতিদ্বন্দিতা কিছু বিশেষ রকমের। যাহাদের ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই দাঁড় বাহিতে হয়। প্রত্যহ অভ্যাস করার কথা। কি করিয়া দাঁড় ফেলিতে হইবে, কি করিয়া রজ্জু লইতে হইবে, কি করিয়া তাল রাখিতে হইবে, তাহা প্রণালীবদ্ধ রহিয়াছে। বোটের সঙ্গে সঙ্গে তীর দিয়া প্রত্যহ একজন এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতে দিতে দৌড়ান—ইহাদের কোচ বলে। পারদর্শী লোকের দাঁড় বাহা

একটী অতি সুদৃশ্য। তাহার উপর তাহাদের ব্যায়ামশীল সবল শরীর, কালেজের অনুযায়িক রঙ্গিন কোট (ব্লেজার ও ক্যাপ) আরও সে দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। মার্চ্চ মাসের প্রথমে ও মে মাসের শেষে এই দুইবার ভিন্ন ভিন্ন কালেজে এই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দীতা হয়। প্রত্যেক কালেজের বোটের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যদি কোন বার পরবর্ত্তী বোট, পূর্ব্বের বোটের নাগাইল পায় তবে তাহার এক পদ উন্নতি হয়। কোন কালেজ এপ্রকার উঠিতে পারিলে, ছাত্রদের মহলে খুব ধূমধাম, খাওয়া দাওয়া নৃত্যগীত। এই বাচ খেলার সময়ের দৃশ্য অতি সুন্দর। সারি সারি বোট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্লেজার পরিহিত ছাত্রের হস্তকৌশলে বেগে চলিতেছে; তীরে দলে দলে ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ব্লেজার পরিয়া নিজ কালেজের বোটকে উৎসাহ দিতে দিতে (well rowed Trinity ইত্যাদি) দৌড়িতেছে, দুই পার্শ্বে লোকের জনতা, চীৎকার,—তখন কাহার মন, উৎসাহে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে? মে মাসের বাচে আরও বিশেষ জাঁক জমক। তখন বিলাতের নানা স্থান হইতে ছাত্রদের বন্ধুগণ কেম্ব্রিজে আসেন। তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভ। যুবতীগণের নানা প্রকারের বেশভূষা সে দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। বাচের পর বোট সকল একদিন দুদল মিলিয়া নানা রকমের ফুল পত্রে সজ্জিত হইয়া কালেজের পশ্চাৎ দিয়া কিছু দূর যায়। তখনকার রঙ্গের বাহার কি চমৎকার।

মে মাসের শেষভাগে, এই বাচ ছাড়া, আরও অনেক আমোদ আহ্লাদ আছে। নানা প্রকার খেলা, বল (Ball) ও চারিদিকে সুভূষিতা সুরূপা রমণীর সমাগম। বৎসরের শেষ কয়দিন অধিকাংশ ছাত্রের সুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

অকস্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বাচখেলার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। এমন ইংরাজ কমই আছেন যাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ না করেন। নির্দ্ধারিত দিনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই (এক অর্থে প্রায় সমস্ত বৎসরই) ইহার জন্য অভ্যাস চলে; কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রতিদিন তাহার বিবরণ সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় বাহির হয়। অধিকাংশ ইংরাজই 'মধ্যভারতে রুস' প্রভৃতি বিষয় অপেক্ষা ইহা অধিক আগ্রহের সহিত পড়েন, এবং এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন। ভার্সিটীর লোকের সঙ্গে এ সময়ে সাক্ষাৎ হইলে আর অন্য কিছু বিষয়েই আলোচনা হয় না।

এক্ষণে শিক্ষাপ্রণালীর কথা কিছু বলা আবশ্যক। 'পাস' পরীক্ষার কথা কিছু বলিতে হইবে না। অনার পরীক্ষা বা ট্রাইপস্‌ লইয়াই এখানকার জাঁক জমক। পুস্তক বিশেষ অধ্যয়ন করিবার রীতি নাই এবং যে বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া সূক্ষ্ম বিসূক্ষ্মভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার উপযোগী বক্তৃতা আছে কিন্তু বিশেষ শিক্ষা বিশেষ শিক্ষকের (Coach) নিকটেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উপাধিধারী অনেকেই এইরূপ শিক্ষকতা করেন কারণ ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ। একজন দুইজন কি দশ বার জন ছাত্র পর্য্যন্ত এক সঙ্গে সপ্তাহে তিনদিন তাঁহার বাড়ীতে পড়িতে

যায়। তিনি বক্তৃতা দেন, পড়িবার পদ্ধতি বলিয়া দেন ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা করেন। কোন কোন কালেজে আজ কাল (যেমন অকসফোর্ডে) এইরূপ শিক্ষকতার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। শিক্ষার এক বিশেষ দোষ, বিষয় বিশেষে (যেমন গণিতশাস্ত্র) কূটত্ব লইয়া অনেক সময় কাটিয়া যায়। তাহার কুফলও ফলে, অনেকের শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে, অনেকের শাস্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়; অনেকেই সত্তম উপাধি পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করেন না। এই জন্য অনেকে জর্ম্মণির ধারা আদরণীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, এইরূপ মানসিক ব্যায়ামের গুণ অনেক অল্প বয়সে (১৯ বৎসর হইতে ২২ পর্য্যন্ত) সুফলপ্রদ; অধিক বয়স্ক লোকের পক্ষেই জর্ম্মণির প্রথা সুফলপ্রদ। তবে শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ দোষ, ইহাতে খরচ অনেক পড়ে, 'coach' রাখিতে হয়। সেই জন্যেও শিক্ষাতে কূটত্ব আসিয়াছে। পরীক্ষকদিগের সহিত ছাত্রদের ও তাহাদের শিক্ষকদের এক প্রকার যুদ্ধ চলিতেছে। দুই দলই আপনাদের নিপুণতা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। পরীক্ষকেরাও হয়ত ৪।৫ বৎসর অগ্রে ছাত্র ছিলেন। তাহাতে এরূপ প্রতিদ্বন্দিতা বৃদ্ধিই পায়, কম হয় না। আজকাল কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে এইরূপ কূটত্ব অধিক চলিবে না। ইউনিভার্সিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিজেই পূর্ব্বপ্রণালীর দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন। যেখানে 'স্বায়ত্বশাসন' আছে, এবং লোকে আপনাদের সাহায্য করিতে পারে, সেখানে উন্নতির ভাবনা কি?

আজকাল কেম্ব্রিজে বিজ্ঞানচর্চ্চার বড়ই ধূম পড়িয়া গিয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে অনেক বড় বড় Laboratory, Museum ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে ইংলণ্ড ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের পরে। কিন্তু শীঘ্রই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। স্থিতিশীলতাই ইংরাজের স্বাভাবিক; কিন্তু ইহার সহিত উদ্যম, উৎসাহ, জাতিগরিমা জড়িত; এই সংলগ্নে উন্নতির বেগ আসিলেই আর সকল জাতিকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হয়।

শুধু শিক্ষাপ্রণালীতেই বিদ্যার যথার্থ উন্নতি হয় না। বিদ্যাচর্চ্চার ভাব চতুর্দ্দিকে জাগরিত থাকা প্রয়োজন। এই ভাব মনে উদ্দীপ্ত না হইলে লোকে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিজ্ঞান-সত্য আবিষ্কার বিষয়ে যথার্থ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বতন ছাত্রগণের যশ, ইহার ইতিহাস, ইহার চিরন্তন প্রভাব, সকলই ইহার বর্ত্তমান ছাত্রদিগকে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে সুকার্য্যে—মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইতে, অভিলাষী ও পারক করে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বঙ্কিমচন্দ্র।*

(৪)

যে অসাধারণ প্রতিভার অকালমৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশে শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না। তিনি নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁটালপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহার পিতা বঙ্গদেশের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটীকলেক্টর ছিলেন।

সুকবি Wordsworth যথার্থই বলিয়াছেন—"Child is father of the man"। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একথা সর্ব্বথা সত্য। তিনি শৈশবে যে অতুল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, জীবনের পরিণত অবস্থায় তাহা পূর্ণ বিকশিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। জীবনের প্রভাত সময়ে তিনি তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে তাঁহার ভবিষ্য মহত্ব সম্বন্ধে যে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন, জীবনের মধ্যাহ্নকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অদ্ভুত অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি একদিনেই সমস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ণমালা শিক্ষার পর তিনি কিছুদিন পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। অসাধারণ স্মরণ-শক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রভাবে তিনি গুরুমহাশয়ের গভীর ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা ইংরাজী শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মেদিনীপুরে লইয়া যাইয়া তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় যেরূপ উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ছয়মাস অন্তর একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বৎসরে দুই শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করিতেন, এবং পরীক্ষার সময় প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক সকলের ভালবাসা ও সমাদরের পাত্র হইতেন।

* মহানুভব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-জনিত শোক প্রকাশার্থ ভবানীপুরের একটী প্রকাণ্ড সাধারণ সভায় লেখক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এই প্রবন্ধটি তাহারই সার সঙ্কলন। কিছুদিন হইল প্রবন্ধটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে—স্থানাভাববশতঃ উহা গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধের কলেবর কিছু দীর্ঘ হওয়ায় উহার কোন কোন স্থান একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাঃ সং।

তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা ২৪ পরগণায় নিয়োজিত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকেও পিতার সহিত মেদিনীপুর ছাড়িয়া আসিতে হইল। এই সময় তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার অসীম জ্ঞান-পিপাসা মিটিত না—তিনি পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় হইতে রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। ইহাতে তাঁহার বার্ষিক পরীক্ষাদানের কোন ব্যাঘাত বা ক্ষতি জন্মিত না—প্রতি বৎসর পরীক্ষাতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ও বহুবিধ মূল্যবান পুরস্কার লাভ করিতেন। হুগলী কলেজ হইতেই তিনি যথা সময়ে বিশেষ দক্ষতার সহিত সিনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি কাঁটালপাড়ার কোন কৃতবিদ্য অধ্যাপকের নিকট চারি বৎসর কাল যত্ন-সহকারে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

হুগলী কলেজের পাঠ শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র আইন শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৮ সালে বি, এ, পরীক্ষার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি আইন পাঠ বন্ধ রাখিয়া উক্ত পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিলেন। তিনিই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম বি, এ, উপাধিধারী। প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি গণিত, কি বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন গুণগ্রাহী লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি এই অযাচিত রাজ-সম্মান গ্রহণ পূর্ব্বক যশোহর গমন করিলেন। প্রায় ৫।৬ মাসের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য ও বিচার-দক্ষতার প্রশংসা শুনা যাইতে লাগিল। এই স্থানে অবস্থান কালেই ইনি তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত সুলেখক দীনবন্ধু মিত্রের সহিত সুদৃঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। যখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পাঠ করিতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" নামক সংবাদপত্রে দীনবন্ধুর বিদ্যাবুদ্ধির প্রথম পরিচয় পান। উক্ত সংবাদপত্রে দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী বিবিধ বিষয়ে কবিতা লিখিতেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনের জন্য উহাতে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাত মাস কাল যশোহরে অবস্থিতির পর তিনি কাঁথি মহকুমার কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। একবৎসর কাল দক্ষতার সহিত তথায় বিচার ও শাসন-কার্য্য সম্পাদন করিয়া খুলনায় প্রেরিত হইলেন। এই সময় দুর্দ্দান্ত নীলকরগণের অত্যাচারে তত্রত্য দরিদ্র প্রজাবর্গ একান্ত উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। প্রবল নীলকরদিগের ভীষণ উৎপীড়ন ও অসহায় দুর্ব্বল প্রজাবর্গের দুর্গতি ও কাতর ক্রন্দন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইল। যে হতভাগ্য উৎপীড়িত প্রজাবর্গের দুরবস্থা ও সকাতর ক্রন্দনে

তাঁহার প্রিয়সুহৃদ সহৃদয় দীনবন্ধু নীলকরগণের বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য "নীল দর্পণ" রূপ অমোঘ অস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তিনিও খুলনায় স্বচক্ষে তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া অবিলম্বে নির্জ্জনে দীনবন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া নীলকর-অত্যাচার দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিলেন।

এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম বদ্ধমূল হইতে লাগিল—এই সময় হইতেই তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগের পরিচয় প্রদানে কি বিদেশীয়, কি স্বদেশীয়, সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সাহিত্য-জগতে যে অতুল প্রতিভার পরিচয় দানে অমরতা লাভ করিয়াছেন, খুলনায় অবস্থিতি কালেই তাহার প্রথম বিকাশ। এই সময় কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত "Indian field" নামক পত্রিকার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে প্রথমতঃ "Rajmohan's wife" নামক একটী উপন্যাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল—ইচ্ছা করিলে তিনি উপন্যাসখানি শেষ করিয়া ইংরাজী ভাষায় আরও অনেকগুলি উপন্যাস ও বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া ইংরাজী ভাষায় সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমুজ্জ্বল-রত্ন-রাজি-সুশোভিত ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডারের অঙ্গ-পুষ্টি সাধন ও শোভা সম্বর্দ্ধনে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস বঙ্গীয় লেখকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশানুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র শুভক্ষণে ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনার ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপুল উৎসাহ ও অতুল আনন্দের সহিত মাতৃভাষার পরিচর্য্যা ও পরিপুষ্টি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রদর্শিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি সংস্কৃতানুসারিণী দুর্বোধভাষা সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় পরিণত এবং উহাতে হৃদয়ের বিবিধ ভাব-নিচয় সহজে সুন্দররূপে বিকশিত করিবার উপযোগী উপকরণ লইয়া "দুর্গেশনন্দিনী" রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যে সময় মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত ভাষার যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত "বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক স্কটের "Ivanhoe" গ্রন্থের ছায়ামাত্র অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নূতন ভাব ও নূতন কল্পনা ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে বঙ্গভাষাকে প্রথমতঃ কতকগুলি কুসংস্কার ও কুপ্রথার নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। খুলনা হইতে বারুইপুরে প্রেরিত হইবার অল্পকাল পরেই এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অমনি চারিদিকের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। এই সকল

সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণের অগ্রণী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রতি সমধিক নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত আক্রমণ সহ্য করিতে লাগিলেন, এবং সমালোচনা-স্রোত মন্দীভূত হইতে না হইতেই নব তেজ নব উৎসাহ ও নব অধ্যবসায় সহকারে সুচারু আভরণে নূতন নূতন গ্রন্থ রচনায় বঙ্গভাষার শোভা সম্পাদন ও সম্পদ বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। বারুইপুরে অবস্থানকালে "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী"নামক দুইখানি উপন্যাস প্রকাশ করিলেন।

বহরমপুর অবস্থান কালে, ১২৭৯ সালে তিনি "বঙ্গ দর্শন" মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই বঙ্গদর্শন হইতে তাঁহার প্রতিপত্তি ও গৌরব দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল। বঙ্গদর্শন চারি বৎসর কাল নিয়মিত রূপে তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি-পথে এক নূতন যুগ আনয়ন ও মহা-বিপ্লব সাধন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উহার পত্রে পত্রে কত প্রাণ কত আলোক, কত তেজ, কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা, কত মধু ও কত মদিরা ঢালিয়া দিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির স্রোত পূর্ণ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, করিয়াছেন। তিনি একদিকে নির্ম্মাণ ও অপর দিকে সংস্কার ও উচ্ছেদ সাধনে বঙ্গ ভাষার উন্নতির স্রোত বেগে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অদূরদর্শী ও চিন্তা-শক্তি-বিহীন লেখকগণের যথেচ্ছাচারে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পথে যে সকল জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা জন্মিতেছিল, তাঁহার কঠোর অনুশাসনে তৎসমস্ত ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ অনাদরে বিক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত পথ পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। বঙ্গ দর্শনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তানুসরণে দিন দিন কত পুস্তক, কত পত্রিকা, ও কত প্রবন্ধ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে লাগিল।

নানা কার্য্যে ঘোরতর পরিশ্রম বশতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে ১২৮২ সালের শেষ ভাগে তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিলেন। যতদিন বাঙ্গালি জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা জগতে বিদ্যমান রহিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে জগতের বিশাল স্মৃতি-ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিবে।

১২৮৩ সালে তাঁহার সুযোগ্য মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পুনঃ সম্পাদন ভার লইলেন। তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বঙ্গদর্শন আরও কয়েক বৎসর সগৌরবে স্বকর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও উহাতে বিবিধ উপন্যাস ও প্রবন্ধের অবতারণায় বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচর্য্যায় বিরত হন নাই।

বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে "বিষবৃক্ষ," "চন্দ্রশেখর," "কৃষ্ণ কান্তের উইল," "দেবী চৌধুরাণী," "আনন্দ মঠ," "সীতারাম," "ইন্দিরা," "কমলাকান্তের দপ্তর," "বিজ্ঞান রহস্য," ও "সাম্য," প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় দিন দিন বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এক একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন-স্বরূপ।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় তাঁহার তেজস্বিনী কল্পনা ও উদ্দাম ভাব-তরঙ্গ সুসংযত

করিয়া জগতের কল্যাণকর অভিনব ধর্ম্মতত্বের আলোচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের নবজীবন বিধান ও নবশোভা সম্বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্বে তিনি সরলান্তঃকরণে সহজ প্রণালীতে যে সকল কুসংস্কার বর্জ্জিত গভীর ধর্ম্ম-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। তিনি হিন্দুর গৃহ-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব ও মহত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যেরূপ ধীর ও সংযতভাবে সৎসাহস, সুন্দর যুক্তি, পরিমার্জ্জিত বিচার-শক্তি গভীর অনুসন্ধিৎসা ও কঠোর সত্যানুরাগের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরও হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও অপার বিস্ময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অল্প দিন হইল তিনি হিন্দুর অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ গীতার বিশদ ব্যাখ্যা ও বেদের বিশুদ্ধ ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমির ঘোর দুর্ভাগ্য বশতঃ এই দুইটি অবলম্বিত বিষয় পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে অনন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করিল! এই দুইটি মহৎ বিষয় সংসাধিত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ ও বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত।

লেখক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বঙ্কিমটী সকলের পরিচিত নহেন। তাঁর হৃদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগ তাঁহার হৃদয়ের উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। তোষামোদ ও অযথা স্তুতিবাদে রাজপুরুষগণের মনোরঞ্জনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘৃণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন; এজন্য তিনি দুই একবার দুই একজন উদ্ধত-স্বভাব দাম্ভীক রাজ-কর্ম্মচারীর একান্ত অপ্রিয় ভাজন হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার স্বাধীনতা ও সত্যানু-রাগ খর্ব্ব হয় নাই। ন্যায়-বিচার ও কার্য্য-বিচক্ষণতা প্রভাবে তিনি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সমান ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

তিনি চিরদিন নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে উদার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিতেন। একবৎসর গত হইল শোভাবাজারের সুশিক্ষিত ও সহৃদয় কুমার বিনয় কৃষ্ণদেব, হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি হৃদয়গ্রাহী যুক্তির সহিত হিন্দুর সমুদ্র-গমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন সে তাঁহার উন্নত হৃদয় কুসংস্কার হইতে অতি দূরে অবস্থিতি করিত।

বন্ধুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল। কয়জন লোক তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রতি সমাদর ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে জানেন? যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি একবার তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি চিরদিন তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম ও প্রীতি উপভোগ করিয়াছেন। দীনবন্ধুর প্রতি তাঁহার কিরূপ অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, যাঁহারা দীনবন্ধুর জীবন চরিত ও আনন্দ মঠের উৎসর্গ-পত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা

পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া এখনও স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণার্থে নিযুক্ত আছেন—বঙ্কিমচন্দ্রের অকাল অস্তগমনে আজি তাঁহাদের হৃদয় একান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। একদিন কোন একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমি তাঁহার শিষ্টাচার ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরে এক দিন আমি তাঁহার কলিকাতার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি একখানি সোফায় বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহার চরণ তলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলে তিনি শিষ্টাচার বশতঃ তদীয় চরণ-যুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বলিলেন "পদধূলি পাইবে না"। তখন আমি তাঁহাকে বিনম্রভাবে বলিলাম, "আমি হিন্দুর সন্তান—হিন্দুর প্রথানুসারে আপনাকে বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি—পদধূলি গ্রহণে আমার বিশেষ প্রয়োজন।" তিনি হাসিমাখা মুখে বলিলেন, "প্রণাম করিয়াছ, তাহাতেই আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি—পদধূলী পাইবে না—বিশেষ আত্মীয় ও গুরুজন ভিন্ন যার তার পদধূলি গ্রহণ ভাল নয়।" আমি বলিলাম, "সত্যই কি আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার অধিকার নাই?—বিদ্যালয়ে আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করি নাই সত্য, কিন্তু গৃহে বসিয়া আপনার পুস্তকরাশি হইতে যে অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। আপনার বঙ্গদর্শন যৎকালে প্রকাশিত হয় তখন আমি ক্ষুদ্র বালক—তখন উহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতাম না, কিন্তু পরে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে কত গভীর তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আপনার "চন্দ্রশেখর" ও "প্রতাপ" আমার নিকট দেবতার ন্যায় আরাধ্য। আপনার "আনন্দ মঠ" হইতে গভীর স্বদেশভক্তি ও স্বদেশের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য শিক্ষা পাইয়াছি। অতএব আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে যদি আপনি আমাকে উহা গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কাযে কাযেই আমি নিরস্ত হইব।" এই কথা বলিবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত চরণদ্বয়ের বস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই লও! "এতক্ষণ পায়ে মোজা আঁটা ছিল, এই মাত্র উহা খুলিয়া ফেলিয়াছি! মোজা আঁটা পরিষ্কার পায়ে একবিন্দুও ধূলি পাইবে না।" আমি আপন মনে আমার বাসনা পূর্ণ করিলাম। তিনি দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা তোমার মাথায় এক বিন্দুও লাগে নাই, কিন্তু সত্য সত্যই আর কোথা হইতে মস্তকে ধূলা লাগিয়াছে, আমি তাহা

ঝাড়িয়া দিতেছি,"— এই বলিয়া তিনি গভীর স্নেহের সহিত আমার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রায় ৫ মিনিট কাল ঐরূপ অবস্থায় আমি তাঁহার আলিঙ্গন মধ্যে আবদ্ধ রহিলাম। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহ আমার স্মৃতি-পথে দেদীপ্যমান রহিবে।

আমরা উভয়ে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি আজ কেবল বিজয়াদশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছ, অথবা আরও কিছু প্রয়োজন আছে?" আমি বলিলাম, "আমার আর একটী বিনীত প্রার্থনা আছে।" "আমি স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্য কতিপয় মাননীয় আত্মীয় বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আপনার মুখে আমি অনেকবার উক্ত মহাত্মার প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি—আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল—আমি তাহা অবশ্য করিব।" আমি বলিলাম, "আপনাকে প্রস্তাবিত পুস্তকের আদ্যোপান্ত যত্নের সহিত দেখিয়া সংশোধন ও পরিবর্ত্তনাদি করিয়া দিতে হইবে, এবং পুস্তকখানির জন্য একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিতে হইবে।" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত এই ভার লইতে প্রস্তুত আছি—আমি পুস্তকখানি যত্নের সহিত দেখিয়া দিব এবং উহাতে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিব।" এই বলিয়া তিনি আমার যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন ও প্যারীচাঁদের কতই গুণকীর্ত্তন করিলেন। এই দিন তিনি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক সুলেখক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি অকপটে প্যারীচাঁদের গুণবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই দিন হইতে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালরূপে চিনিলাম—এই দিন হইতে আমি তাঁহার প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে শিখিলাম।

তিন বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলে একদিন আমি কোন প্রয়োজন উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেই সময় দেশীয় সংবাদপত্রে কোন একটী রাজনৈতিক বিষয়ের ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমার সহিত উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ করিলেন। প্রতি কথায় আমি তাঁহার গভীর রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "ভারতবাসীর দুঃখ ও অভাবে প্রকৃত রূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, এরূপ ইংরেজ এ দেশে অল্পই আছেন—যাঁহারা সেরূপ উদার প্রকৃতির লোক

তাঁহারা ক্ষণজন্মা।" এই বলিয়া তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত রেণল্ড্স্ সাহেবের কোন কোন গুণের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই লোকটি যতদিন এ দেশে ছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পায় নাই। এ দেশ ছাড়িয়া গেলে পর অনেকে তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছে—এখন অনেকেই তাঁহার মহত্ব অনুভব করিতেছেন। আমাদের কন্‌গ্রেসের সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।" যখন আমি তাঁহার মুখে "আমাদের কন্‌গ্রেস্" এই কথা শুনিলাম, তখন মনে বড়ই আনন্দ জন্মিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি সুযোগ পাইয়া বলিলাম—"আপনি এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছেন—এখন যদি আপনি কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন তাহা হইলে উহার বিশেষ হিত সাধিত হইতে পারে; আপনি কি উহাতে যোগদান করিবেন না?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপাততঃ নয়।" আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন দিবেন না?" তিনি বলিলেন, "তুমি একজন কন্‌গ্রেসের চেলা, সুতরাং উহার বিশেষ পক্ষপাতী—আমি কি জন্য উহাতে এখন যোগ দিতে পারি না, তাহা বলিলে হয় ত তুমি ব্যথিত হইবে, এজন্য উহা না বলাই ভাল—তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ বা উহার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নহি।" কন্‌গ্রেসে তাঁহার যোগ দান না করিবার কারণ জানিবার জন্য আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে তিনি বলিলেন,—"কন্‌গ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, এ কথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই—দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে এবং অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না। দেশের সাধারণ জনসমষ্টিকে মন্ত্রণা-গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া বৎসরান্তে একবার ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে প্রমত্ত হইলে তাহাতে দেশ জাগিবে না যতদিন দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত লোকদিগের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইবে, যতদিন তাহারা তাহাদের প্রকৃত অভাব ও স্বদেশের প্রতি তাহাদের কঠোর কর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম না হইবে, যতদিন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলভিত্তি না হইবে, ততদিন কেবলমাত্র নীরস রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহার গৃহে চির অন্ধকার, দুর্নীতি স্রোতে যাহার সমস্ত অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে, কেবল রাজনীতির আলোচনায় তাহার কি স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে

পারে? আমার বিবেচনায় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলন সমস্ত দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়া উচিত। সর্ব্বাগ্রে সকলের অধিক পরিমাণে সরলতা ও আত্মত্যাগ শিক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নানা চিন্তা ও নানা আন্দোলনের পর এক্ষণে ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ব ও উন্নতি সাধিত হয় না—একমাত্র ধর্ম্মানুরাগই জাতিমাত্রকে প্রভূত বলশালী ও গৌরবান্বিত করিতে পারে। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সৎ ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে, অন্যথা কোন আন্দোলন সুফল প্রদান করিবে না।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরভাবে তাঁহার জলন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, তিনি যথার্থই বিদেশীয় কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন—

"Religion comes from God's right hand,
And needs a godly train,
For 'tis righteousness that makes our land,
A nation once again."

কন্‌গ্রেসের পৃষ্ঠপোষক অনেকেই হয়ত বঙ্কিম বাবুর এই উক্তি পাঠে স্তম্ভিত হইবেন—অনেকে হয় ত মনে মনে তাঁহার প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু আমাদের আশা আছে যে, যাঁহারা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা ও অসারতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য স্বজাতীয় কলঙ্কের কথা ভাবিয়া ধীরে ধীরে এক একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ের ভার লঘু করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ ছিলেন না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কন্‌গ্রেস্-সৃষ্টির বহুদিন পূর্ব্বে তিনি তৎপ্রণীত আনন্দমঠ নামক গ্রন্থে অপূর্ব্ব সন্তানদলের সৃষ্টি ও মাতৃপূজার বিরাট আয়োজনে "বন্দে মাতরং" এই অমৃতময় সঞ্জীবনী উদ্বোধন মন্ত্রে কোটী কোটি সন্তানের নিদ্রামগ্ন হৃদয়ে কিরূপ অত্যুগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, কন্‌গ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট C. I. E. উপাধি দানে বঙ্গসাহিত্য সেবকবৃন্দের সম্মান-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ ডেপুটী বলিয়া জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নাই—তিনি মৃতবৎ বঙ্গসাহিত্যের প্রাণদাতা ও উন্নতি বিধাতা বলিয়াই লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট সুপরিচিত—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অতুল প্রতিপত্তিই তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্মশানে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চির-নিদ্রিত মুখ দেখিয়াছিলাম। মৃত্যুর পরে মুখে এমন শান্তি কখন দেখি নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পশ্চাতে মহানগরীর সান্ধ্য কোলাহল, সম্মুখে জাহ্নবীবক্ষস্থিত তরণীতে দীপালোক। বর্ষশেষে, শতাব্দীশেষে, দিবাবসানে বঙ্কিম তিরোহিত হইলেন। সেই প্রশান্ত প্রসুপ্ত মুখমণ্ডল দর্শন করিতে করিতে মনে হইতেছিল বঙ্গবাসী কেমন করিয়া এই বঙ্গসন্তানের ঋণ পরিশোধ করিবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালী শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শোকের মধ্যে কি সান্ত্বনা নাই? কালাকালের অপেক্ষা কীর্ত্তি জীবনের প্রকৃত মানদণ্ড। যে কীর্ত্তি বঙ্কিম রাখিয়া গিয়াছেন তাহা না থাকিলে আজ আমাদের কিসের আশা থাকিত? তাঁহাকে ত্যাগ করিলে আমাদের গৌরবের আর কি অবশিষ্ট থাকে?

জাতীয়তার মূলে ধর্ম্ম এবং ভাষা। ধর্ম্ম জীবনের এবং উন্নতির ভিত্তি, সাহিত্য তাহার সূচনা। শুক্রতারা যেরূপ উষার পূর্ব্বে উদিত হয় সাহিত্যের সৃষ্টি সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পূর্ব্ব লক্ষণ। আমাদের কোন আশা ছিল না, কোন উৎসাহ ছিল না, কোন বল ছিল না, কোন গৌরব ছিল না। বঙ্কিমকে পাইয়া আমরা সকল আশার অধিকারী হইয়াছি।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্যের সৃষ্টি এক প্রকার অসম্ভব বোধ হয়। আমাদিগকে অন্ন সংস্থানের জন্য অতি কঠোর বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি, সেই ভাষায় লিখিতে ও বলিতে শিখিলে প্রশংসিত হই। কেবল স্বদেশে নহে; বিদেশে সে প্রশংসা ধ্বনিত হয়। রাজকর্ম্মে, ক্রিয়াক্ষেত্রে, সর্ব্বদা সেই ভাষার প্রয়োজন। আমাদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা তাহাতে ইহার পর কতটুকু মনস্বিতা অবশিষ্ট থাকে? মাতৃভাষার সেবা এবং উন্নতি কল্পে যে তন্ময়তা ও সাধনা আবশ্যক তাহার জন্য কতটুকু ক্ষমতা বা অবসর থাকে? এমন অবস্থায় ইংরাজীতে গ্রন্থ রচনা করিয়া, কবিতা লিখিয়া, সংবাদ পত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালি যশস্বী হইবার প্রয়াস পাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? স্যর ওয়াল্টার স্কট্‌কে যদি পারষী ভাষা শিখিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছারীতে উর্দ্দুতে কর্ম্ম করিতে হইত তাহা হইলে তিনি কয়খানা উৎকৃষ্ট ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতেন?

বঙ্কিম যখন অধ্যয়ন সমাপন করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হন সে সময়কার অবস্থা আরও কঠিন। সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালি বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিত। মাতৃভাষায় অজ্ঞ, মাতৃভাষা লিখিতে জানে না বলিয়া গৌরব করিত। লেখকের মধ্যে তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাল জানিতেন না, যাহারা ইংরাজী শিখিয়াছিল তাহারা

তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত না। বঙ্কিম যেরূপ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, মনে করিলে অল্প কালের মধ্যে ইংরাজীতে সুলেখক বলিয়া প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন। অলৌকিক প্রতিভা বলে সে লোভ তিনি সম্বরণ করিলেন। ইংরাজীর প্রবল স্রোতে আমাদের সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইতেছিল। হলধর যেমন হলের মুখে যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন বঙ্কিম একাকী সেইরূপ সেই তীব্র স্রোতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় লেখনীর বলে সেই স্রোত ফিরাইয়া মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির অভিমুখে প্রবাহিত করাইলেন।

হয়ত বঙ্কিমের প্রতিভার যথাযথ আলোচনা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। কালের ব্যবধান আরও দীর্ঘ হওয়া উচিত। আমরা বঙ্কিমের মায়ায় মুগ্ধ। তিনি গুরু, আমরা শিষ্য; তিনি রাজা, আমরা প্রজা। তিনি আমাদের কি না করিয়াছেন, কোন ঋণে না আবদ্ধ করিয়াছেন? তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া আমরা—বাঙ্গালি জাতি—মাতৃভাষাকে, মাতৃভূমিকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। তাঁহার কথায় কাঁদিয়াছি, মনে আশাকে স্থান দিয়াছি। যে যেখানে থাকি, স্বদেশে হউক, বিদেশে হউক, যখন যেমন অবসর পাইয়াছি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মাতৃভাষার সেবায় যথাসাধ্য উৎসর্গ করিয়াছি, জীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী নূতন কর্ত্তব্য গণনা করিতে শিখিয়াছি। অর্থদান ত অতি তুচ্ছ দান। কর্ণের ন্যায় দাতা হইলেও সকলের দারিদ্র্য মোচন করিতে পারে না। বঙ্কিমের দান মহাদান। সাহিত্যের সহিত হৃদয়, হৃদয়ের সহিত ভক্তি, ভক্তির সহিত প্রীতি, প্রীতির সহিত বিমল বিশুদ্ধ অক্ষয় আনন্দ। প্রতিভার এই দান। প্রতিভার আলোচনার সময় উপস্থিত না হইলেও দান প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এরূপও মনে হয় যে বঙ্কিমের প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে আমরা বুঝিতেও পারি না। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সে প্রতিভা জ্বলিতেছে; সেই আলোকে আমরা সকল বস্তু দেখিতেছি, কিন্তু আলোকদাতার প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাধ্য নাই। বঙ্কিম কীর্ত্তির যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আমাদের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আমরা সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছি। এই জন্য তাহার নির্ম্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। যাহারা দূর হইতে আসিতেছে, তাহারা আমাদের অবর্ত্তমানে আমাদের স্থানীয় হইবে তাহারা উৎকৃষ্ট রূপে বুঝিতে পারিবে। জীবিত সমালোচক অথবা বোদ্ধাদিগের দ্বারা বঙ্কিমের প্রতিভা অতি-প্রশংসিত হইতে পারে না।

বঙ্কিমের পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষার কি অবস্থা ছিল, তাঁহার সাক্ষাতে, তাঁহার পরে সে অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পরিচয় দিবার কেহ ছিল না এমন নহে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস মুকুন্দ রাম, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ বঙ্গ ভাষায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা ভাষাকে সমাদৃত করাইয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিম তাঁহার নিকট ঋণী। মধুসূদন দত্ত নূতন মধুচক্র করিয়া চির-যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তথাপি বঙ্গভাষা অত্যন্ত দীনাবস্থায় ছিল। কাব্য, কবিতা সাহিত্যের অলঙ্কার। সাহিত্যের

বল, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা কেবল কাব্যে প্রকাশিত হয় না। ছন্দ ব্যতীত ভাষায় ভাব প্রকাশের অন্য উপায় ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত যে গদ্য প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা প্রাণশূন্য, বলশূন্য। তাঁহার কবিতার ন্যায় সে ভাষা আড়ম্বর অনুপ্রাস ভারে পীড়িত, শব্দের শৃঙ্খলে বদ্ধ, অপরিস্ফুট, বেগশূন্য। প্রথম অভাব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোচন করিলেন। গদ্যে প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা জন্মিল। আর একদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত ভাষার এই গুরুতর অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুইজন লেখক অসাধারণ ক্ষমতাশালী, কিন্তু অনুবাদেই তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যবসিত হইল। মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঠিত হইল মাত্র; প্রতিমার অলঙ্কার, প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সমস্তই অবশিষ্ট রহিল। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্র কতক পরিমাণে ইহা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার পর এই উভয় কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের সহিত সম্পাদিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। ভাষার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যে মহামূল্য অলঙ্কার পরাইয়াছেন তাহার তুলনা কোথায় হইবে? ব্রাহ্মণ-কুলতিলক বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতর ব্যক্তি কে? বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে বঙ্গসাহিত্যে বিচিত্র বিপ্লব উপস্থিত হইল। সাহিত্যের পল্লী সহসা বিস্তৃত হইয়া সাহিত্যের রাজ্যে পরিণত হইল, দগ্ধ মরুভূমে শীতল-সলিলা কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী বহিল। দরিদ্রের কুটীর সহসা ধনধান্য মণিমুক্তা পরিপূর্ণ হইল। সমগ্র শিক্ষিত বঙ্গবাসী সেই অভিনব আনন্দপূর্ণ রাজ্যের প্রজা হইল। সকলে একবাক্যে হর্ষ জয়ধ্বনি করিয়া বঙ্কিমের শিরে রাজমুকুট পরাইল। রাজোচিত সকল গুণেই তিনি ভূষিত ছিলেন। যেমন ঔদার্য্য তেমনি প্রতাপ। শিষ্টের পালনে যেমন মনোযোগী দুষ্টের দমনে সেইরূপ ক্ষিপ্রহস্ত। তিনি জানিতেন সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, অযোগ্য ব্যক্তির ক্রীড়া কৌতুকের নহে। ভাবের, ভাষার উৎস মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি স্বয়ং প্রহরী হইয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কেহ সেই নির্ম্মল সলিল আবিল করে। সেই সলিলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণ উৎপাদিত করিল। বঙ্গবাসী বিস্মিত, মুগ্ধ, আনন্দিত হইয়া সেই প্রবাহ এবং সেই বর্ণবৈচিত্র্য দর্শন করিতে লাগিল।

বঙ্গ ভাষার স্তরে স্তরে যে রূপরাশি এতদিন লুক্কায়িত ছিল বঙ্কিম একে একে তাহা উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন। ভাবের অভাবে যে ভাষা মৃতপ্রায় ছিল ভাবপ্রাচুর্য্যে তাহা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া উঠিল। যে ভাষা নিরর্থ শব্দভারে প্রপীড়িত হইয়াছিল সেই ভাষা ছন্দোময়ী, আবেগময়ী হইয়া উঠিল। মহামহিমাময়ী প্রতিভা, অপূর্ব্ব সৃষ্টি কুশলী কল্পনা বঙ্গ ভাষার অভাব মোচনে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত নিযুক্ত হইল। মহাশক্তিশালী ঐন্দ্র-জালিকের কৌশলে ভাষায় মোহমন্ত্র বিরচিত হইল। যেমন বেগ তেমনি সংযম, যেমন তীব্রতা তেমনি কোমলতা, যেমন মাধুর্য্য তেমনি গাম্ভীর্য্য! কে জানিত এই সঙ্কীর্ণ দরিদ্র ভাষায় এত বল এত বৈচিত্র্য ছিল! পল্বলের, গোষ্পদের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ভাষা সমুদ্রগামিনী পূর্ণ প্রবাহিনীর ন্যায় সহস্রমুখী হইয়া, নানা তরঙ্গভঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া, বঙ্গসন্তানের

হৃদয় সরল কোমল করিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালির হৃদয়ের নির্জ্জ প্রদেশে কোথায় একতারা বাজিতেছিল, সহসা একেবারে সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়া উঠিল।

প্রতিভা কিরূপ বলবতী হইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত কোমলতা, গভীরতা, তন্ময়তা বঙ্গসাহিত্যে ইতি পূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এমন বলবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বলে বঙ্কিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে, চরিত্র গঠনে অতুলনীয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে এই বল সর্ব্বত্র জাগিয়া রহিয়াছে। এই বলে তাঁহার করুণ এমন মর্ম্মস্পর্শী, প্রেম এত বলবান, পরোপকার এরূপ সর্ব্বত্যাগী। এইজন্য কোন স্থানে তাঁহার রসভঙ্গ হয় নাই, কুত্রাপি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে সুরে বাঁধা থাকিত, যখন যে তারে অভ্রান্ত সিদ্ধ হস্তে আঘাত করিতেন, সেইরূপ প্রতিশব্দ হইত। এই জীবনব্যাপী সাধনা ও একাগ্রতায় তিনি কদাপি আত্মবিস্মৃত হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বলদৃপ্ত প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। আড়ম্বরের লেশ নাই, ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা আছে। ভাবে, যুক্তিতে, রসিকতায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্র আদর্শ মিলন। কোথাও আয়াস নাই, অঙ্গভঙ্গী নাই, নীরস চপলতা নাই। শব্দ বিন্যাসের অন্ধকার ঘনঘটা কোথাও নাই, শ্রুতিমধুর শব্দপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল কারুকার্য্য সর্ব্বত্র আছে। নিরবচ্ছিন্ন অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষা, অথচ শব্দলালিত্যের নিমিত্ত ভাবগৌরব কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। স্মরণ করিতে হইবে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন তখন ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। কিঞ্চিৎ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যদি বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ভাষার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কিন্তু ভাষার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা, সর্ব্বোপযোগিতা বঙ্কিম চন্দ্রের ব্রত। কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সমালোচনায়, কূট প্রবন্ধে, বিশুদ্ধ রহস্যে; ধর্ম্মের গভীর আলাচনায় তিনি এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা পরিচালিত করিলেন—দেখাইলেন কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, ভাষার কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্র তিনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত অপরিসীম বলবত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

এই বলের সহিত তেজস্বিতা ও তীব্রতার সংযোগ বিচিত্র নহে। এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা বঙ্কিমের লেখনীর মুখে শাণিত অসির তীক্ষ্ণতা, বজ্রবিদ্যুতের বল ধারণ করিয়াছে। তর্কে, সমালোচনায় এই তীব্র তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। এক মুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া পুরাকালে সমরাচার্য্য যেরূপে শত্রু নিবারণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে সংক্ষেপে অবলীলা ক্রমে সাহিত্য সাধনক্ষেত্র হইতে ভণ্ড অক্ষমকে খেদাইয়া দিতেন। তাঁহার হস্তে ব্যঙ্গ বজ্র হইয়া উঠিত।

গ্রন্থের অবয়ব বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইলেও মানব চরিত্র সৃজনে বঙ্কিমের প্রতিভা প্রাচীন আর্য্যদিগের অনুযায়ী। ঋষিদিগের বিশাল আকাশব্যাপী সৃষ্টির তুলনা বোধ হয় কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে পারিবে না, কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা দুর হইতে

তাঁহাদিগেরই পদানুসরণ করিয়াছে। বঙ্কিমের মানব মানবী সেই ছাঁচে ঢালা, তবে ছাঁচের আকার ক্ষুদ্র। আদর্শ সেইরূপ উচ্চ। বাঙ্গালির ঘরেও বঙ্কিম সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের আদর্শ ধ্যানধারণার সামগ্রী, হাত বাড়াইয়া নিকটে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের আদর্শ মনে হয় খুঁজিয়া দেখিলে বাঙ্গালির ঘরেও পাওয়া যায়।

বঙ্কিম যখন সাহিত্যে প্রথমে আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন রসিকতার নামান্তর গালি ছিল। ইতর অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়াকে লোকে কৌতুক বিবেচনা করিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গুড়্গুড়ে যখন অশ্রাব্য ভাষায় ভয়ানক দ্বন্দযুদ্ধ করিতেন তখন লোকে আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইত। উচ্চ শিক্ষার ফলে, উচ্চ আদর্শের গুণে, নির্ম্মল প্রতিভার বলে সে দোষ বঙ্কিমকে স্পর্শ করিতে পায় নাই। লোকের গায় কাদা ছিটাইয়া তিনি কখন লোক হাসান নাই। বিশুদ্ধ রসিকতা প্রতিভার অতি উচ্চ অঙ্গ। বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় তাহা পাইয়াছিলেন। নির্ম্মল হাস্যকৌতুক পরিহাসের আদর্শ তিনিই বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে রসিকতা অতি গভীর, অতি বিশুদ্ধ, যে হাসির গভীর তলদেশে অশ্রুজল লুক্কায়িত থাকে বঙ্কিম স্বজাতিকে তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার বিচার বিস্তারিত রূপে স্বতন্ত্র স্থলে হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চায় তিনি সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস কেবল ভক্তিমূলক ছিল না, অসামান্য যুক্তিকৌশলে তিনি বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। কালে ধর্ম্মসংস্কারকের মধ্যেও যে তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্মভূমিকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় বঙ্কিম তাহার উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এখন সংবাদ পত্রে, বক্তৃতায় স্বদেশবাৎসল্যের ছড়াছড়ি। তর্জ্জন গর্জ্জন চীৎকারে কর্ণ প্রায় বধির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বদেশকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় বঙ্কিমই একা তাহা শিখাইয়াছেন। ভারতমাতার সম্বন্ধে অসংখ্য গীত গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতা কাহার স্মরণ আছে? কিন্তু এমন হতভাগ্য বাঙ্গালি কয়জন আছে যাহাদের "বন্দে মাতরং," অন্ততঃ এক ছত্র, স্মরণ নাই? সেই কয়টী কথা বঙ্কিম বাঙ্গালির হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছামত তাহা স্মরণ করিতে অথবা ভুলিতে পারা যায় না। যে হৃদয় হইতে এমন কথা উৎসারিত হইয়াছে সে হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি কেমন গাঢ় অনুরাগ তাহা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। ধমনীর ছন্দে, হৃদয়ের শোণিতে চক্ষের অশ্রুতে, সে অনুরাগ মিশ্রিত ছিল। জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিখিয়া বাঙ্গালি উন্মত্ত শূর বীর হইতে পারে বঙ্কিম তাহার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

জীবন শেষে কয়জন এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারে যে জীবনের কর্ত্তব্য এমন উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়াছে? এই কারণে মহাপ্রস্থানকালে অন্তরাত্মার সুগভীর শান্তি বঙ্কিমের মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল!

হৃদয় সরল কোমল করিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালির হৃদয়ের নির্জ্জন প্রদেশে কোথায় একতারা বাজিতেছিল, সহসা একেবারে সপ্তস্বরা বীণা বাজিয়া উঠিল।

প্রতিভা কিরূপ বলবতী হইতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত। কোমলতা, গভীরতা, তন্ময়তা বঙ্গসাহিত্যে ইতি পূর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এমন বলবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বলে বঙ্কিম সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে, চরিত্র গঠনে অতুলনীয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সমূহে এই বল সর্ব্বত্র জাগিয়া রহিয়াছে। এই বলে তাঁহার করুণা এমন মর্ম্মস্পর্শী, প্রেম এত বলবান, পরোপকার এরূপ সর্ব্বত্যাগী। এইজন্য কোন স্থানে তাঁহার রসভঙ্গ হয় নাই, কুত্রাপি দুর্ব্বলতার চিহ্ন নাই। মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে সুরে বাঁধা থাকিত, যখন যে তারে অভ্রান্ত সিদ্ধ হস্তে আঘাত করিতেন, সেইরূপ প্রতিশব্দ হইত। এই জীবনব্যাপী সাধনা ও একাগ্রতায় তিনি কদাপি আত্মবিস্মৃত হন নাই, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বলদৃপ্ত প্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। আড়ম্বরের লেশ নাই, ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা আছে। ভাবে, যুক্তিতে, রসিকতায়, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্র আদর্শ মিলন। কোথাও আয়াস নাই, অঙ্গভঙ্গী নাই, নীরস চপলতা নাই। শব্দ বিন্যাসের অন্ধকার ঘনঘটা কোথাও নাই, শ্রুতিমধুর শব্দপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল কারুকার্য্য সর্ব্বত্র আছে। নিরবচ্ছিন্ন অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষা, অথচ শব্দলালিত্যের নিমিত্ত ভাবগৌরব কোথাও বিনষ্ট হয় নাই। স্মরণ করিতে হইবে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন তখন ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। কিঞ্চিৎ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। যদি বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে ভাষার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কিন্তু ভাষার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা, সর্ব্বোপযোগিতা বঙ্কিম চন্দ্রের ব্রত। কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সমালোচনায়, কূট প্রবন্ধে, বিশুদ্ধ রহস্যে; ধর্ম্মের গভীর আলোচনায় তিনি এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা পরিচালিত করিলেন—দেখাইলেন কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, ভাষার কোন অভাব নাই। সর্ব্বত্র তিনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত অপরিসীম বলবত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

এই বলের সহিত তেজস্বিতা ও তীব্রতার সংযোগ বিচিত্র নহে। এই দুর্ব্বল বঙ্গভাষা বঙ্কিমের লেখনীর মুখে শাণিত অসির তীক্ষ্ণতা, বজ্রবিদ্যুতের বল ধারণ করিয়াছে। তর্কে, সমালোচনায় এই তীব্র তেজের পরিচয় পাওয়া যায়। এক মুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া পুরাকালে সমরাচার্য্য যেরূপে শত্রু নিবারণ করিতেন বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে সংক্ষেপে অবলীলা ক্রমে সাহিত্য সাধনক্ষেত্র হইতে ভণ্ড অক্ষমকে খেদাইয়া দিতেন। তাঁহার হস্তে ব্যঙ্গ বজ্র হইয়া উঠিত।

গ্রন্থের অবয়ব বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইলেও মানব চরিত্র সৃজনে বঙ্কিমের প্রতিভা প্রাচীন আর্য্যদিগের অনুযায়ী। ঋষিদিগের বিশাল আকাশব্যাপী সৃষ্টির তুলনা বোধ হয় কোন জাতি কোন কালে দেখাইতে পারিবে না, কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা দূর হইতে

তাঁহাদিগেরই পদানুসরণ করিয়াছে। বঙ্কিমের মানব মানবী সেই ছাঁচে ঢালা, তবে ছাঁচের আকার ক্ষুদ্র। আদর্শ সেইরূপ উচ্চ। বাঙ্গালির ঘরেও বঙ্কিম সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ঋষিদিগের আদর্শ ধ্যানধারণার সামগ্রী, হাত বাড়াইয়া নিকটে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমের আদর্শ মনে হয় খুঁজিয়া দেখিলে বাঙ্গালির ঘরেও পাওয়া যায়।

বঙ্কিম যখন সাহিত্যে প্রথমে আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন রসিকতার নামান্তর গালি ছিল। ইতর অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়াকে লোকে কৌতুক বিবেচনা করিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গুড়্গুড়ে যখন অশ্রাব্য ভাষায় ভয়ানক দ্বন্দযুদ্ধ করিতেন তখন লোকে আনন্দে হাসিয়া অস্থির হইত। উচ্চ শিক্ষার ফলে, উচ্চ আদর্শের গুণে, নির্ম্মল প্রতিভার বলে সে দোষ বঙ্কিমকে স্পর্শ করিতে পায় নাই। লোকের গায় কাদা ছিটাইয়া তিনি কখন লোক হাসান নাই। বিশুদ্ধ রসিকতা প্রতিভার অতি উচ্চ অঙ্গ। বঙ্কিম পূর্ণমাত্রায় তাহা পাইয়াছিলেন। নির্ম্মল হাস্যকৌতুক পরিহাসের আদর্শ তিনিই বঙ্গসাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে রসিকতা অতি গভীর, অতি বিশুদ্ধ, যে হাসির গভীর তলদেশে অশ্রুজল লুক্কায়িত থাকে বঙ্কিম স্বজাতিকে তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার বিচার বিস্তারিত রূপে স্বতন্ত্র স্থলে হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চায় তিনি সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বাস কেবল ভক্তিমূলক ছিল না, অসামান্য যুক্তিকৌশলে তিনি বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। কালে ধর্ম্মসংস্কারকের মধ্যেও যে তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্মভূমিকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় বঙ্কিম তাহার উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এখন সংবাদ পত্রে, বক্তৃতায় স্বদেশবাৎসল্যের ছড়াছড়ি। তর্জ্জন গর্জ্জন চীৎকারে কর্ণ প্রায় বধির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বদেশকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় বঙ্কিমই একা তাহা শিখাইয়াছেন। ভারতমাতার সম্বন্ধে অসংখ্য গীত গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতা কাহার স্মরণ আছে? কিন্তু এমন হতভাগ্য বাঙ্গালি কয়জন আছে যাহাদের "বন্দে মাতরং," অন্ততঃ এক ছত্র, স্মরণ নাই? সেই কয়টী কথা বঙ্কিম বাঙ্গালির হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছামত তাহা স্মরণ করিতে অথবা ভুলিতে পারা যায় না। যে হৃদয় হইতে এমন কথা উৎসারিত হইয়াছে সে হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি কেমন গাঢ় অনুরাগ তাহা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারা যায় না। ধমনীর ছন্দে, হৃদয়ের শোণিতে চক্ষের অশ্রুতে, সে অনুরাগ মিশ্রিত ছিল। জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিখিয়া বাঙ্গালি উন্মত্ত শূর বীর হইতে পারে বঙ্কিম তাহার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

জীবন শেষে কয়জন এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারে যে জীবনের কর্ত্তব্য এমন উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়াছে? এই কারণে মহাপ্রস্থানকালে অন্তরাত্মার সুগভীর শান্তি বঙ্কিমের মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল।

বাঙ্গালি জাতির জীবনের যুগ পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে বঙ্কিমের আবির্ভাব। সাহিত্য তাঁহার প্রতিভা বিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। জাতীয় মহিমশালিত্ব প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এই শিক্ষা দেয়। দুর্ব্বল জাতির মধ্যে তিনি মহা বলবান। বঙ্গ সাহিত্য দরিদ্র ছিল, তিনি তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ তেমন দৃঢ় ছিল না, তিনি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে সে অনুরাগ দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসংস্কারের প্রয়োজন ছিল, তিনি তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যে পথের প্রদর্শক বঙ্গবাসী কি সাহস করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেই পথের পথিক হইবে?

যোগী।

চকিতে চমকি চেয়ে ফিরাই নয়ন—
ঝলসিত দুই আঁখি
চমকি সভয়ে ঢাকি,
জ্বলন্ত জ্যোতির মাঝে আঁধার ভীষণ!
শূন্যাসনে ঊর্দ্ধাননে,
বসিয়ে মগন মনে,
আচম্বিতে হেরি এক মহাযোগী জন;
জুড়িয়ে গগন গায়
বিরাট মুরতি ভায়,
ললাটে জ্বলিছে স্থির মধ্যাহ্ন তপন;
নিমীলিত আঁখি ভেদি
ধায় কিরণের নদী,
উরসে পূরণ শশী শোভিন দর্শন!
ধূমকেতু করতলে
আকাশ উজলি চলে,
বিজড়িত চরণেতে তারা অগণন।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে ফুটে
দীপ্ত বহ্নি জ্বালা ছুটে,
রূক্ষ রূক্ষ জটাজূট লটপট প্রায়,
লুটায় চরণ তলে,
লুটায় ধরণী তলে,
ধীরে ধীরে জটাজালে বিজুলি বেড়ায়।
দূরে দূরে ঘিরে ঘিরে
ইন্দ্রধনু ফিরে ফিরে
মণ্ডল করিয়ে ধীরে ঘুরে অবিরল,
চন্দ্রাতপ সম শিরে
উলট আকাশ ঘিরে,
দুলিয়ে দুলিয়ে যেন পড়ে পদতল!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্বরমিলন।

আমাদের দেশের রাগরাগিণী অর্থাৎ কতকগুলি সুবিন্যস্ত সুরপরম্পরা সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণমালা মাত্র। যেমন অ, আ,ক, খ, গ, চ, ন প্রভৃতি স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রত্যেকের চেহারা ও আমাদের মনে তাহাদের ধারণা একরূপ এবং কখন কলম কাপড় প্রভৃতি তাহাদের মিলনজাত বাক্যের চেহারা এবং আমাদের মনে তাহাদের ধারণা অন্যরূপ, সেইরূপ আমাদের দেশীয় একহারা সুর ও ইয়ুরোপীয় বহুমিলনাত্মক সুরের মধ্যেও প্রভেদ। আমাদের গানের সুর সঙ্গীতের বর্ণমালা এবং ইয়ুরোপীয় কর্ড তাহার সার্থ বাক্য। শৈশবে জ্ঞানের প্রথম উন্মেষে যাহা কিছু লাভ করা যায় তাহাকেই অপূর্ব্ব কবিত্বময় বোধ হয়, মনে আছে, "বড় গাছ" "ছোট পাতা" "লাল ফুলের" সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয় তাহারা কি আনন্দ প্রদান করিয়াছিল—এই বয়সে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা পড়ার সমান! আরও আরম্ভে "ক খ গ ঘ উঁয়া" "চ ছ জ ঝ ঈঁয়"ও বিশেষ রসাত্মক ঠেকিয়াছিল। সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে, আরও বিশেষতঃ এই জন্য যে ক খ গ ঘ অপেক্ষা রাগ রাগিণীর সুর পরম্পরা কর্ণের অধিক তৃপ্তিকর। আমরা সরস্বতীর বীণার একটীমাত্র তার লাভ করিয়াছি আমাদের নিকট তাহারই লালিত্য অপরিসীম। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁর সব কটা তারের সন্ধান পাইয়া যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় ভাবপ্রগাঢ় ভাষার সৃজন করিয়াছেন তাহার নিকট আমাদের সুর ক খ গ ঘ মাত্র।

আমরাও বেহালা বাজাইয়া থাকি, ইংরাজেরাও বাজান, আমাদের সুরে একটি ক্ষীণ কারুণ্য ব্যক্ত হয়, ইংরাজের সুরে মানবের সহস্রতরঙ্গতাড়িত বেদনাবান্ আত্মা শতধা বিদীর্ণ হইতে চাহে। কেন এ প্রভেদ? তাঁহাদের স্বরমিলন আছে আমাদের নাই।

এ স্বরমিলন শিক্ষার ইংরাজী সঙ্গীতচর্চ্চাই একমাত্র উপায়। বাঙ্গলা গানের সুরে ইংরাজী পদ্ধতি অনুযায়িক কর্ড বসাইয়া তাহার স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া ইয়ুরোপীয় সঙ্গীতের বৃহত্ত্বের কোন আভাষই দেওয়া হইবে না। তথাপি এ বিষয়ে অনেকের দ্বারা বারম্বার অনুরুদ্ধ হওয়ায় নিম্নে একটী কর্ডযুক্ত বাঙ্গলা গানের স্বরলিপি দেওয়া গেল। বাঙ্গলা গানেও এরূপ কর্ডের উপযোগিতা প্রভূত, প্রথমতঃ কর্ণের পরিতৃপ্তি হয়, দ্বিতীয়তঃ কর্ডের সাহায্যে গানের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিবার সুবিধা হয়। যদি বাঙ্গলা গানে স্বরমিলনের আস্বাদ পাইয়া কেহ ইয়ুরোপীয় সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রলুব্ধ ও যত্নবান হন তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সঙ্কেতের ব্যাখ্যা।

স—মধ্য সপ্তকের স। র্স—উহার উপরের সপ্তক। স্—উহার নীচের সপ্তক।

সুরের মাথায় যটা রেফ থাকিবে তটা উপরের সপ্তক বুঝাইবে, সুরের নীচে যটা হসন্ত থাকিবে তটা নীচের সপ্তক বুঝাইবে।

ডান হাতে প্রধান সুর বাজাইতে হইবে, বাম হাতে তাহার আনুষঙ্গিক সুর বা কর্ড। মনে কর শুধু সরগমপধনর্স বাজাইতে চাহ। একহাতে বাজাইলে তাঁহার এইরূপ স্বরলিপি হইবে। স১ ঋ১ গ১ ম১ । প১ ধ১ ন১ র্স১ ॥ যদি ঐ সুরই দুই হাতে দুই বিভিন্ন সপ্তকে বাজাইতে হয়, তবে তাহার স্বরলিপি প্রণালী এইরূপ ঃ—

ড	স১ ঋ১ গ১ ম১	প১ ধ১ ন১ স১	
ব	স্১ ঋ্১ গ্১ ম্১	প্১ ধ্১ ন্১ র্স১	

'ড' অর্থাৎ ডান হাত, ঐ পংক্তির সুর ডান হাতে বাজাইতে হইবে। 'ব' অর্থাৎ বাম হাত, ঐ পংক্তির সুর বাম হাতে বাজাইতে হইবে। এখন ডান হাত ও বাম হাত পরস্পরের সহিত মিলিয়া কিরূপে তাল রক্ষা করিয়া চলিবে তাহা বুঝান আবশ্যক। দেখা যাইতেছে একহারা সুরের স্বরলিপির ন্যায় ইহারও নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পর দাঁড়ি রহিয়াছে। ডান হাতেও চারি মাত্রার পর দাঁড়ি এবং বাম হাতেও চারি মাত্রার পর দাঁড়ী। ডান হাতের প্রথম স১ ও তাহার নিম্নবর্ত্তী বাম হাতের স্১ সমমাত্রিক। সুতরাং স১ ও স্১ দুই হাতে একত্রে বাজাইতে হইবে এবং উভয় সুরে সমান কাল অবস্থান করিতে হইবে। ঋ১ ঋ্১, গ১ গ্১, ম১ ম্১ প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম। আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

ড	স১ ঋ১ গ১ ম১	
ব	স্২ গ্২	

এখানে ডান হাতের সুরের মাত্রা সংখ্যাও চার এবং বাম হাতের সুরের মাত্রা সংখ্যাও চার, কিন্তু ডান হাতে চারটী সুর আছে, আর বাম হাতে মোটে দুটি সুর। এখানে ডান হাতের স১ ও ঋ১ বাজাইতে যতক্ষণ লাগিতেছে, বাম হাতের শুদ্ধ স্২ বাজাইতে ততক্ষণ লাগিবে। স১ এর সহিত স্২আরম্ভ করিয়া ঋ১ বাজান পর্য্যন্ত স্২ কে টানিয়া রাখিতে হইবে আবার গ১ ও ম১ র বেলায় গ১র সহিত গ্২ আরম্ভ করিয়া ম১ বাজান পর্য্যন্ত গ্২কে বাম হাতে টিপিয়া রাখিতে হইবে।

স্বরলিপির সঙ্কেতে বলা আছে গমপ১ এরূপ লেখা থাকিলে একমাত্রার মধ্যে গ ম ও প এই তিনটি সুর তাড়াতাড়ি বাজাইতে হইবে। কিন্তু গ ম ও প এই তিনটী সুর যদি একত্রে বাজাইবার ইচ্ছা হয়, হার্ম্মোনিয়মে এই তিনটী সুরকে একসঙ্গে টিপিয়া রাখিতে চাহি তাহা হইলে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন (গমপ)১। উপরে যে স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহার একটু আকার পরিবর্ত্তন করিয়া দেখাইলে ইহা বুঝা সহজ হইবে।

(১)	ড	স১ ঋ১ গ১ ম১	
	ব	স্২ গ্২	

র পরিবর্ত্তে লেখা যাউক—

(২)	ড	স১ ঋ১ গ১ ম১	
	ব	স্২ (গ্প্স্)২	

প্রথম স্বরলিপির বাম হাতে গ্২র পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় স্বরলিপিতে (গ্প্স)২ লেখা হই য়াছে এইটুকু মাত্র প্রভেদ। শুধু গ্২ র পরিবর্ত্তে গ্প্ ও স এই তিনটী স্বর একত্রে টিপিয়া দুই মাত্রাকাল রাখিতে হইবে। এই একাধিক স্বরের সংযোজনই কর্ড। (গ্প্স)২ না থাকিয়া বাম হাতে গ্ প্স২ থাকিলে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে দুই মাত্রার মধ্যে ঐ তিনটী স্বর বিচ্ছিন্নভাবে তাড়াতাড়ি বাজাইতে হইত।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।　　স্বর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত।
মিল—শ্রীমতী সরলা দেবী কর্ত্তৃক রচিত।

কর্ণাটিভজন—একতালা।

সকাতরে ওই　　কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে　　শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে,　　রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায়　　হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা!
সুখ আশে　　দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা　　ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা,　　ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হয়ে আসে,
কাঁদে তখন　　আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি,　　বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও,　　আশা পূরাও
তুমি এস কাছে ॥

						নো১		র্স১*			
ড	গোর্মপধো১	ধো১	ধো১	নো১	নো১	র্স১	|	রে১	গো১	গো১	র্ম১
ব	(ধ্ৃধ্ৃ)২		(সগোধো)২		(সগোধো)২		|	(ধ্ৃধ্ৃ)২		(সগোধো)২	
	স	কা	ত	রে	ও	ই		কাঁ	দি	ছে	স
	ক্ষু	দ্র	আ	শা	নি	য়ে		র	য়ে	ছে	বাঁ
	সু	খ	আ	শে	—	—		দি	শে	দি	শে
	ফু	রা	য়	বে	লা	—		ফু	রা	য়	খে
	কি	হ	বে	গ	তি	—		বি	—	শ্ব	প

ড	গো১	গোর্মগো১	|	রে১	রে১	গোরে১	র্স২	রে১	|	গো১২
ব	(সগোধো)২		|	ধ্১	গো১	ধো১	ধ্১	গো১ধো১	|	ধ্১২
	ক	লে		শো	ন	শো	ন	পি		তা
	চি	য়ে		স	দা	ই	ভা	ব		না
	—	—		বে	ড়া	য়	কা	ত		রে
	লা	—		স	ন্	ধ্যা	হয়ে	আ		সে
	তি	—		শা	—	ন্তি	কোথা	আ		ছে

ড	র্সরেগোর্ম১	গো১৩	|	র্সরে গো১	রে১	র্স১	নো১	নো১	নো১
ব	(সগোধো)১	(সগোধো)১	|	(গোগো)২		(রোগোপ)২		(রোগোপ)২	
	—	—		ক	হ	কা	ণে	কা	ণে
	—	—		যা	কি	ছু	পা	—	য়
	—	—		ম	রী	চি	কা	—	—
	—	—		কাঁ	দে	ত	খ	—	ন
	—	—		তো	মা	রে	দা	—	ও

ড	র্সরে গো১	রে১	র্স১	নোর্সনোধো১	প১	ধো১	|	র্স১	র্স১	রো১
ব	(গোগো)২		(রোগোপ)২		(রোগোপ)২		|	ধ্১	গো১ধো১	
	শু	নাও	প্রা	ণে	প্রা	ণে		ম	ঙ্গ	ল
	হা	রা	য়ে	যা	—	য়		না	মা	নে
	ধ	রি	তে	চা	—	য়		এ	ম	রু
	আ	কু	ল	ম	—	ন		কাঁ	—	পে
	আ	শা	পূ	রা	—	ও		তু	মি	এ

---

* প্রথম শ্লোক ব্যতিরেকে অন্য সকল সকল শ্লোকের বেলায় নীচের সুরের পরিবর্ত্তে উপরের সুরে গানের পদ যোজনা করিতে হইবে।

ড	নো১	সনোধে১	প১	ধে১৬	গোমর্পধে১	ধে১
ব	গে১	(রোগোপ)১	(রোগোপ)১	(ধোসগোধো)৬	(ধে ধে)২	
	বা	—	র	তা	ক	হ
	সা	—	ন্ত	না	যা	কি
	প্রা	—	ন্ত	রে	ম	রী
	ত	—	রা	সে	কাঁ	দে
	স	—	কা	ছে	তো	মা

ড	ধে১	নো১	নো১	নো১	স১	গে১	গে১	ম১	গে১
ব	(সগোধো)২		(সগোধো)২		ধে১	গো১	ধো১	ধে১	গো১
	কা	নে	কা	নে	শু	নাও	প্রা	ণে	প্রা
	ছু	পা	—	য়	হা	রা	য়ে	যা	—
	চি	কা	—	—	ধ	রি	তে	চা	—
	ত	খ	—	ন	আ	কু	ল	ম	—
	রে	দা	—	ও	আ	শা	পূ	রা	—

ড	গেমর্গে১	রে১	রে১	গোরে১	স২	রে১	গে২
ব	ধো১	রো১	ম১	ধো১	স১	ম১ ধো১	(সগোধো)২
	ণে	ম	ঙ্গ	ল	বা	র	তা
	য়	না	মা	নে	সা	ন্ত	না
	য়	এ	ম	রু	প্রা	ন্ত	রে
	ন	কাঁ	—	পে	ত	রা	সে
	ও	তু	মি	এ	স	কা	ছে

ড	সরগেম১	গে৩	সরেগে১	রে১	স১	নো১
ব	(সগোধো)১	(ধে ধে)৩	(গোগো)২		(রোগোপ)২	
	—	—	ক	হ	কা	নে
	—	—	যা	কি	ছু	পা
	—	—	ম	রী	চি	কা
	—	—	কাঁ	দে	ত	খ
	—	—	তো	মা	রে	দা

ড	নো১	নো১	সরেগে১ রে১	স১	নোসনোধে১		প১	ধে১
ব	(রোগোপ)২		(গেগো)২		(রোগোপ)২		(রোগোপ)২	
	কা	নে	শু	নাও	প্রা	ণে	প্রা	ণে
	—	য়	হা	রা	য়ে	যা	—	য়
	—	—	ধ	রি	তে	চা	—	য়
	—	ন	আ	কু	ল	ম	—	ন
	—	ও	আ	শা	পূ	রা	—	ও

ড	স´´১	স´´১	রে´া১	নো´১	স´´নে´াধ´১	প´১	ধে´া৬
ব	ধো১	গো১	ধো১	গো১	(রোগোপ)১	(রোগোপ)১	(ধোসগোধো)৬
	ম	ঙ্গ	ল	বা	—	র	তা
	না	মা	নে	সা	—	ন্ত্ব	না
	এ	ম	রু	প্রা	—	ন্ত	রে
	কাঁ	—	পে	তা	—	রা	সে
	তু	মি	এ	স	—	কা	ছে

শ্রীসরলা দেবী।

রামমোহন রায়।*

জগতের মধ্যে মনুষ্য যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। এবং অনেকেই অনুমোদন সহকারে কবি পোপের উক্তি উদ্ধৃত করেন যে,

> The best study of mankind is man.
> মনুষ্যজাতির শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কিন্তু সচরাচর লোকব্যবহারে কার্য্যতঃ এ বাক্যের সম্পূর্ণ ব্যভিচার লক্ষিত হয়। মনুষ্যের তুলনায় মনুষ্যের কীর্ত্তিকলাপের প্রতি লোকের দৃষ্টি অধিক। তাজমহলের তুলনায় পরিদর্শকের নিকট ভারতবাসীর আদর অল্প। অকৃটরলোনি মন্যুমেণ্টের দর অকৃটরলোনির অপেক্ষা অধিক। যদিও বা কোন সময় মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে তবে সে এক অদ্ভুত "গড়পড়তার" মনুষ্য, রক্তমাংসের সংসারে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে প্রকৃত মনুষ্যের সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা একটা দুরূহ ব্যাপার নহে। যে জাতি, যে দেশ ও যে শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের চরিত্র আলোচনার ফলস্বরূপ যে শিক্ষালাভ করা যায় সেই জাতি, দেশ ও শ্রেণীর সম্বন্ধে তাহাই প্রশস্ত শিক্ষা।

এই কথাটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে লোকে বা সমাজে কোনও ব্যক্তি কি কি গুণ থাকিলে মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মহাপুরুষ পদ দিবার অধিকার রাজার নাই, লোক বিশেষেরও নাই, কোন লোকমণ্ডলীরও নাই। মহাপুরুষত্ব পদ ঈশ্বরদত্ত, স্বাভাবিক। যাঁহারা না তলাইয়া আংশিক ভাসা ভাসা রূপেও মহৎচরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও এ সত্যটি অনায়াসে ধরিয়াছেন। মহাপুরুষ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমেই দেখা যায় যে অসাধারণ সূক্ষ্ম, দূর দৃষ্টি ঐ চরিত্রের একটি প্রধান গুণ বা শক্তি। মানুষ বা মনুষ্যমণ্ডলী অজ্ঞাতসারে কি বস্তুকে নিজের কল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করে, কিসের উদ্দেশে লোকপ্রবাহ

---

* "রামমোহন রায়" ক্লবের বিগত ষাণ্মাষিক অধিবেশনে অভিব্যক্ত বক্তৃতার সারাংশ।

সহস্র বিঘ্নসঙ্কুল পথে চালিত হইতেছে, কিসের অভাবে যথার্থ দুঃখ ও দুর্গতি, এই শক্তির প্রভাবে মহাপুরুষের তাহা যথার্থ ধারণা হয়। ইহার পরে দেখা যায় যে অসাধারণ লোক-স্নেহ বা অনুকম্পা বলে মহাপুরুষগণ লোক বা লোকমণ্ডলীর প্রকৃতির অনুকূল যে যে উপায়ে সেই উপেয় লাভ হইতে পারে তাহার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়েন। এবং অদম্য উৎসাহ উদ্যোগে সেই উপায় ও উপেয় জ্ঞান কথায় ও ব্যবহারে লোক সমাজে প্রচার করেন। মহাপুরুষের জ্ঞান, দয়া ও উদ্যম অসাধারণ। ইহার একটিরও অভাব হইলে মহাপুরুষত্বের ক্ষুণ্ণতা হয়। আর এই তিনটি গুণ বা শক্তির তারতম্যে মহাপুরুষদিগের মধ্যে তারতম্য ঘটে। মনুষ্য নিজের হিত সর্ব্বসময়ে বুঝিতে পারে না কিন্তু সেই হিত যদি কেহ দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে মানুষ চিরকাল তৎপ্রতি ঔদাস্য ও অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—ইহা একটি প্রাকৃতিক সত্য। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে নানা কারণে এ সত্যের অপলাপ দৃষ্ট হইতে পারে ও হয়, কিন্তু মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম ইহাই। মানুষের জ্ঞান শক্তি, দয়া বৃত্তি, ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা অনাবৃত হইলেই মানুষ মহাপুরুষের সহিত সম প্রকৃতি হইয়া পড়ে, কেবল পরিমাণের তারতম্য থাকে।

এই গুণগুলির উপর দৃষ্টি করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে সাধারণ্যের স্বভাব মহাপুরুষের স্বভাবের অন্তর্গত। মহাপুরুষ সাধারণ্যের আদর্শস্বরূপ। মহাপুরুষ সাধারণ মানুষের এক প্রকার দৈবী প্রকৃতি। মহাপুরুষের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ভিন্ন আপনার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা রক্ষিত হইতে পারে না। এজন্য মহাপুরুষ-চরিত্রের আলোচনায় সাধারণ লোকের চরিত্র বিজ্ঞাত হয়। এই ভাবটি ফুটাইয়া রাখিবার জন্য কেহ কেহ মহাপুরুষ শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতিনিধি পুরুষ (Representative man) শব্দ ব্যবহার করিতে চাহেন।

মহাপুরুষের যে সকল সাধারণ ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সেই গুলি রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে।

যাঁহারা আস্তিক্য বুদ্ধিতে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। ঈশ্বরই মানুষের পরম কল্যাণ, তদ্ভিন্ন অপর কল্যাণ নাই। অপর যাহা কিছু কল্যাণ বলিয়া বোধ হয় তাহা তৎসৃষ্ট বা তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র। মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক—

নৃণাং ত্বমেকো গন্তব্যোঽসি পয়সামর্ণবইব।

যেমন নানা দিগ্বাহিনী নদীর শেষ এক গতি সমুদ্র, তদ্রূপ মানুষের এক মাত্র গতি তুমি।

রামমোহন রায় সুবোধ্য ভাবে এই সেই পরম গতি ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া এবং তৎপ্রাপ্তির সুগম উপায় দেখাইয়া এবং অদম্য উৎসাহের সহিত সেই উপায় সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জগতে প্রচার করিয়া আপনার মহাপুরুষত্বের অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মদানে জগতের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন—সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।

যাঁহারা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না রামমোহন রায় তাঁহাদেরও নিকটে মহা-

পুরুষ। "ভারতীতে" পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক যে একত্ব আছে তাহার ধারণা ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। যে জাতি এই একত্বের ভাবটিকে শ্রদ্ধার সহিত আতিথ্য দিয়াছে জগতে তাহারই অভ্যুদয় ও যে জাতি এই ভাবটিকে অশ্রদ্ধার সহিত প্রত্যাখান করিয়াছে তাহারই অধঃপাত লক্ষিত হয়। স্পেন এক সময় সমুদ্রের একাধিপত্য লাভ করিয়া পৃথিবীতে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন মনুষ্যের যে মনুষ্যত্ব আছে স্পেনের মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে এ কথা স্থান পায় নাই। এইরূপ বিপরীত ধারণা বশতঃ যখনই স্পেন ধর্ম্ম-পরীক্ষা (inquisition) প্রবল করিয়া তুলিল সেই অবধি স্পেন অবনতির পথে অগ্রসর হইল—এ কথা ইতিবেত্তাগণ সকলেই স্বীকার করেন। সে সাম্রাজ্য এখন কোথায়? আফ্রিকার অর্দ্ধসভ্য আরবদিগের নিকটও এখন স্পেন ত্রস্ত—জিব্রলটারে এখনও বৃটিশ পতাকা উড্ডীয়মান। যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপর সূর্য্যাস্ত নাই, যে এঙ্গলো-সাক্‌সন জাতি পৃথিবীর উপর অখণ্ড প্রভুত্ব করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের মধ্যেই মনুষ্যের একত্ব জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। মানুষ যে মানুষকে কেনা-বেচা করিবে ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজ যে কত অর্থব্যয় ও জীবনপাত করিয়াছে—তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। আমেরিকার সমবেত রাজ্যে যখন এঙ্গলো সাক্‌সনগণ নিজের হৃদয়-রক্তে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে তখন প্রথমেই বিধিবদ্ধ করিয়া সমুদয় দেশ সমগ্র বিশ্ববাসী মনুষ্যকে দেয়—যে কেহ তদ্দেশীয় ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবে দেশ তাহারই। একজন বাঙ্গালী আজ মার্কিন সমবেত রাজ্যে বাস করিলে তাঁহার পুত্র রাজ্যেশ্বর হইতে পারে। আমেরিকান আঙ্গলো সাক্‌সনেরা মানুষ কেনা-বেচা বন্ধ করিবার জন্য ঘোরতর আত্মবিচ্ছেদ ও ক্রূরকর্ম্মা সমরাগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই ধন্য হইয়াছে।

যেদিক দিয়াই দেখা যাউক-না কেন মানুষের একত্ব এখন কোমৎ প্রভৃতি জ্ঞানিদিগের বিশ্বাস, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের স্বপ্ন ও আংশিক রূপে কাভুর, বিস্‌মার্ক, গর্ষাকফ্, রোজবেরি প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞের কার্য্যক্ষেত্র। সর্ব্বত্রই একত্বের দিকে মানুষের গতি, প্রবৃত্তি।

জ্ঞানোন্নতির দিকে দেখিলেও ইহা পাওয়া যায় যে, যত বহুত্বের ভিতর একত্ব বাহির হয় ততই জ্ঞানের উপচয়। বর্ত্তমান সময়ের মতি গতি যাঁহারা বুঝিতে পারেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে science এখন ভিন্ন ভিন্ন আকার সত্ত্বেও এক science of existence বলিয়া পরিচিত হইতেছে। Art ও এখন সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া এক art of expression বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য প্রতীতি জন্মিবে যে রামমোহন রায় মানুষের বৈচিত্র্য-সংরক্ষক একত্ব অতি বিশদরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই একত্ব অনুভূতি দুই রকমে প্রকাশ করিয়াছেন। এক সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূলনিহিত একত্ব দর্শাইয়া

রামমোহন রায় একরূপ comparative theologyর প্রবর্ত্তক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিদ্যা তাঁহার স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক ফলবতী হইয়াছে। দ্বিতীয়, লৌকিক বিদ্যার সহিত আধ্যাত্মিক বা পরা বিদ্যার আন্তরিক অবিরোধ দেখাইয়া তিনি এদেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

রামমোহন রায় নিজ "অনুষ্ঠান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া প্রশ্নোত্তর ক্রমে বলিয়াছেন ঃ—

"প্রশ্ন। বিচারতঃ এই উপাসনার কেহ বিরোধী আছে কি না।

উত্তর। এ উপাসনার বিরোধী বিচারতঃ কেহই নাই। যে হেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি? অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা রূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও তিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

প্রশ্ন। আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কিনা।

উত্তর। কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ বা বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।"

ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিৎ ও তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে রামমোহন রায় বলিয়াছেন;—

"দশনামা সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী ও সন্ত মতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়।"

খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব মানেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন;—

"তাঁহাদিগেরও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। * * * তাঁহাদের সহিত পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিৎ নহে।"

তিনে এক ঈশ্বর যে সকল খৃষ্টিয়ানের এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্ত্তব্য নহে। "বরঞ্চ যেরূপে আমাদের মধ্যে যাঁহারা যাহারা যাহাতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না

করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপ অবিরোধভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দিগের প্রতিও কর্ত্তব্য ।"

আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদির প্রতিমা কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদের ও যে সকল খৃষ্টিয়ান যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর জানিয়া প্রতিমা রচনা করেন এদুয়ের প্রতি একইরূপ ব্যবহার করা উচিৎ—রামমোহেন রায়ের উপদেশ এই।

মুসলমান ইহুদি প্রভৃতি উপাসকের কথা বর্ণিত নাই কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত জানা কঠিন নহে—সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

একটুকু মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে উপলব্ধ হয় যে সিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভার বীজ কোন দেশে কাহা কর্ত্তৃক রোপিত। এই কথাটীর বিচারকালে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, রাম মোহন রায়ের কথা ও কার্য্য অপরাপর দেশের তুলনায় নূতন হইলেও এদেশের তুলনায় নূতন নহে। এজন্তই রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকত্ব আরোপের অপনোদন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালেও ঐ সকল কথা পুরুষ বিশেষের নিকট শুনা গিয়াছিল। মাণ্ডুক্যোপানিষদের কারিকায় গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন,—

নাম রূপাদি নির্দ্দৈশৈ র্বিভিন্নানামুপাসকাঃ।
পরস্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতৎ বিরুদ্ধতে॥

নামরূপাদি নির্দ্দেশ হেতু বিভিন্ন উপাস্যের উপাসকদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয় কিন্তু ইহার অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার সহিত তাহাদের বিরোধ ঘটে না।

বিদ্যা শিক্ষার সহিত আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক উন্নতির সম্বন্ধ বিচার করিয়া রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের বিস্তারে লোকে বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনায় দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক তাহাদের অভ্যান্তরিক অভেদ ভাব উপলব্ধ করিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে ভেদ বিরোধ যে সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির বিনাশক ইহা জানিয়া সেই ভেদ বিরোধ ত্যাগ করিতে ও করাইতে যত্নশীল হয়। এই বুদ্ধিতেই তিনি দেশে বিদ্যা চর্চ্চার প্রচারের জন্য অত যত্নশীল ছিলেন। পৃথিবীর পক্ষে রামমোহন রায়ের মহাপুরুষত্ব এই সকল কথার আলোচনায় কতক পরিমাণে পরিস্কার হয়।

এখন আমাদের দেশের দিক হইতে রামমোহনের মহত্ব আলোচনার আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইতিহাস লব্ধ জ্ঞান সমন্বয় করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে মনুষ্য জাতির এখন মানুষের একত্ব অনুভূতির দ্বারা ব্যবহার রঞ্জিত করিতে প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রতিরোধ যেমন ভারতবর্ষে এমন আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতবাসীরা যেমন কূপ মণ্ডূকবৎ আপন আপন জন্মস্থানে আপন আপন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে এমন আর কাহারও ভিতর দেখা যায় না। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার, ভিন্ন

ভিন্ন ভাষা যেরূপ ভারতবর্ষে সমবেত এমন আর কোন স্থানে লক্ষিত হয় না। যে অদৃষ্ট শক্তি মানুষকে একত্বের দিকে চালিত করিতেছে তাহা ভারতবাসীকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে দেয় নাই। প্রাকৃতিক শক্তির কার্য্য করিবার একটী নিয়ম এই যে, যদি তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বশবর্ত্তী না হও তাহা হইলে তোমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশের ন্যায় তাহার বশবর্ত্তিতা স্বীকার করিতে হইবে। পর্ব্বত যগুপি মহম্মদের নিকট না আসে তবে মহম্মদকে পর্ব্বতের নিকট যাইতে হইবে। ভারতবর্ষ কাহাকেও চাহে না তাহাই ভারতবর্ষকে সকলে চাহিতেছে। চীনেরা মোগলদিগকে দূরে রাখিবার জন্য তদ্দেশীয় বিখ্যাত দেওয়াল গড়িল কিন্তু সেই মোগল এখন চীনের সম্রাট।

ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে এই একত্বের অনুশীলন ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই একত্বের উপদেষ্টা রামমোহন রায়। অন্যান্য যে সকল বিষয়ে রামমোহন আমাদের অভাব মোচন করিয়াছেন ও আমাদের আশা ফলবতী করিবার পথ পরিস্কার করিয়াছেন তাহার উল্লেখ এখানে আবশ্যক নাই। যে ভাবটীর ধারণা ভিন্ন আমাদের উন্নতি কেন সংস্থিতির পর্য্যন্ত সম্ভাবনা নাই তাহারই আলোচনা যথেষ্ট। আমরা যদ্যপি এই বৈচিত্র্যসঙ্কুল দেশের মধ্যে কোন প্রকারে এই একত্বের ভাবকে কার্য্যকারী করিতে পারি তাহা হইলে দেশের পরমোপকার ও জগতের একটী বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং তাহাতে আমরা জগতের দৃষ্টান্তস্থল ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করিব, সন্দেহ নাই।

উপসংহারে একটী কথার আবশ্যক। অনেকে আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখেন যে রামমোহন রায় প্রতিমা উপাসনার বিদ্বেষী ছিলেন। উপাসনা সমন্বয় করিতে গিয়া তিনি এই উপাসনার স্থল দেখিতে পান নাই। যখন মানুষের মধ্যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত রহিয়াছে তখন উহার প্রতি কেবল মাত্র বিদ্বেষ দেখাইয়া উহাকে বুঝিতে চেষ্টা না করা অজ্ঞানের কার্য্য কিন্তু এ অজ্ঞান রামমোহন রায়কে অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রতিমা পূজা যে যথার্থতঃ কি তাহা রামমোহন রায় বুঝিতেন ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তাঁহার চেষ্টা ইহাই ছিল যে প্রতিমা পূজার যথার্থ অধিকার সীমা উপযুক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রামমোহন রায়ের কয়েকটী কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্ত্রান্যুক্তান্য শেষতঃ। অধিকারী প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমার্থতত্ত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোরপথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরোমন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ ও পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেন ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দু মাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটী

কুল উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রীসুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়া ঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতো হনুশৃনুয়াদথবর্ণয়েযদ্ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রবণ করে ও বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয় তাহাদের প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যাদি। মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য হয় যে আত্মতত্ত্ববিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবতঃ অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রী পুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত রকমে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয়। * * * আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে, যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যে সকল উপদেশ সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। তস্মাদিত্যাদিকংকর্ম্ম লোকরঞ্জন কারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥"

নিষ্কলস্যাদ্বিতীয়স্য ইত্যাদি বচন সকলেই অবগত আছেন বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।*

রামমোহন রায়ের মহৎ চরিত্রের এই একটী মাত্র অংশ আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কি আসে যায়? যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "যদি আমাকে স্নেহ কর তবে আমার মেষশাবকদিগকে ভক্ষ্য দাও।" যদি রামমোহন রায়ের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা কর তবে যাহাতে তাঁহার কার্য্য অপ্রতিহতবেগে বহমান থাকে তাহার জন্য চেষ্টা কর। মানুষের মধ্যে যে মনগড়া একত্ব নহে স্বাভাবিক একত্ব আছে তাহার যাহাতে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি হয় সে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা অতন্দ্রিত ভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

* এ বিষয়ে বিস্তারিতরূপে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইলে রামমোহন রায়ের কৃত ঈশোপনিষদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হরপার্ব্বতীর তপস্যা।

পার্ব্বতী।

হায়, সখি, হায়!
নিতান্ত বিফল হবে, জীবন আমার তবে?
সেকি শুধু একবার চাবে না আমায়!
দিন রাত্রি নাহি—
নাহি শ্রান্তি না বিশ্রাম, তার তরে অবিরাম
বসিয়ে রয়েছি হেথা সেই মুখ চাহি!
দিন পরে দিন—
ঋতু পরে ঋতু যায়, আমি বসে আছি হায়!
লইয়ে বাসনা এই চিরতৃপ্তি হীন।
প্রভাতের রবি
যায় যবে সন্ধ্যাকালে ধরণীর অন্তরালে,
তখন দেখিয়া যায় মোর এই ছবি।
সন্ধ্যার চাঁদিমা—
সুদীর্ঘ যামিনী শেষে, মিশে যায় ক্ষীণ বেশে
চাহিয়া অবাক নেত্রে একই মূর্ত্তি দীনা।
প্রতি বিভাবরী—
হেরি মোরে একাসনে, তারকা ব্যথিত মনে
শিশিরের অশ্রুধারা ঢালে শিরোপরি।
বসন্ত মুকুল—
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, আকুল সুবাস ছোটে
আবার সুধীরে সেই ঝরে যায় ফুল।
নিদাঘ তপন—
মোর শূন্য শিরে হানে অনল-কিরণ বাণে,
বর্ষার নীরদ করে ধারা বরিষণ।
শরৎ হেমন্ত—
করুণ সঙ্গীত ধারে চেতনা আনিতে নারে
ব্যাকুলি ডাকিয়া আনে হিমানী দুরন্ত।
মুহূর্ত্ত একটি—
নহে স্থির নহে চুপ, নহে কেহ একরূপ
মোর চিত্ত এক নিত্য ভজিছে ধূর্জ্জটি।
জনম ধরিয়া—
এমনে যাহারে হৃদি পূজিতেছে নিরবধি
না পেয়ে তাহারে প্রাণ যাবে কি ঝরিয়া!
কার পূজা করি?
পূজা করি যাঁর পায়, সে কি তা জানিতে পায়
ধ্যান ভরে আপনারে রয়েছে বিস্মরি।
মহাযোগীবর
রহিয়াছে সদা ভোর, বিশ্বব্যাপী যোগে ঘোর;
কে আমি তাহার কাছে অতি তুচ্ছতর।
আমি যেন তুচ্ছ,
কিন্তু সারা প্রাণ দিয়ে, একমনে একহিয়ে
এই যে তপস্যা মোর নহে কি তা উচ্চ!
ক্ষুদ্র তৃণ ফুল—
রবিরে সে উপহার, দেয় ক্ষুদ্র হৃদি তার—
নাহি কিছু মূল্য তার, সবি মিথ্যা ভুল?
এ মোর প্রণয়
একবার মেলি আঁখি, চেয়ে দেখিবে না তা কি?
একটি করুণা কণা পাবে না হৃদয়!
চিরকাল প্রাণ—
করিয়া বিফল ধ্যান—হয়ে যাবে অবসান,
জানিতেও নারিবে সে ধ্যানেতে অজ্ঞান।
নহে তাহা নয়;
ত্রিকালজ্ঞ মহেশ্বর, জান সর্ব্ব চরাচর
জান এ হৃদয় মোর আকুলতা ময়।
এই মত আমি—
তব ধ্যানে চিরদিন জীবন করিব লীন,
প্রেমময় মহাদেব প্রাণেশ্বর স্বামী।

হর।

সব পরিহরি—
ত্যজিয়ে বিলাস ভোগ দিন রাত তার যোগ
একেলা বিজনে বসি এক মনে করি।
কঠিন পর্ব্বত—
ছায়াহীন গৃহহীন, হিমে দেহ সমাসীন
সগর্ব্বে রয়েছে তুলি মস্তক উন্নত!
এই স্তব্ধ স্থানে
পাসরি সংসার মায়া, পাত করিতেছি কায়া,
এক মনে এক প্রাণে থাকি তার ধ্যানে।
আমি হইলাম—
হায়রে যাহার লাগি, এইরূপ সর্ব্বত্যাগী
কই তবু এত করে তারে পাইলাম?
ত্রিলোক রাজিনী,
আলো করে দশ দিশি, দশ রূপে আছ মিশি
সন্ধান কেমনে পাব অনন্ত রূপিণী।
এই রণ রঙ্গে—
মহিষ মর্দ্দিনী বালা, গলে নরমুণ্ড মালা
চরণে দলিত দীন কম্পিত আতঙ্গে।
কখনো জননী—
পুত্র কন্যাগুলি সব, আশে পাশে নিয়ে তব
স্নেহময়ী মাতা রূপে ভুলাও অবনী।
কত জান মায়া,
এই অন্নপূর্ণা বেশে অন্নদান কর দেশে
অন্ন কভু নাহি মেলে ভিখারীর জায়া।
কত ধর ছল!
কত হাসি সুধাভরা, অনুনয় অশ্রুধারা
পিতৃগৃহে যাবা তরে সোহাগ-কৌশল।

পতি অপমান—
শুনি উগ্র ক্রোধ ভরে, যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড ক'রে
বিসর্জ্জন কর সতী আপনার প্রাণ।
যেই দিকে চাই—
ক্ষণে ক্ষণে নব বাস প'রে হও পরকাশ
চিনিতে পারি না আমি তত্ত্ব নাহি পাই।
ইচ্ছায় তোমার—
মুহূর্ত্তে সৃজন হয়, মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডলয়
কমল করেতে রাজে অনন্ত সংসার।
মহাশক্তি রূপী,
এ নিখিল চরাচর, জড়, প্রাণ, দেব নর,
করিছে তোমার ধ্যান যুগ যুগ ব্যাপী।
সর্ব্ব ভূতময়ী,
তবু না দেখিতে পাই, কেবল আকুলে চাই,
কেবল আকুলে ডাকি কোথা তুমি অয়ি!
উন্মত্তের মত—
শ্মশানে মশানে ঘুরি তোমার সন্ধানে ফিরি
সমস্ত বিশ্বেতে খুঁজি ভ্রমি অবিরত।
অচিন্ত্য রূপসী—
তোমার মূরতি দিয়ে, ব্রহ্মাণ্ড রাখি ভরিয়ে
কেমন দেখিতে তোমা জানিনে প্রেয়সী।
অয়ি যোগময়ী
কোথা আছ কোথা নাই, অন্ত তব নাহি পাই
কর গো দর্শন দানে সর্ব্ব যোগজয়ী।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

আকবরসাহের হিন্দুপ্রীতি

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গতবারে আমরা কেবল আকবরের সময়ের হিন্দু রাজগণের কষ্ট-সংগৃহীত তালিকা দিয়াছি। এইবার হইতে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মোগল রাজত্বের সহিত তাঁহাদের ধারাবাহিক সম্বন্ধ ও কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিব। মুসলমানের লিখিত ইতিহাস হইতে মনের মত করিয়া হিন্দুর জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন কাজ।* অজ্ঞতাবশতঃই হউক, বা ঈর্ষা, কিম্বা অন্য কোন কুপ্রবৃত্তি চালিত হইয়াই হউক, তাঁহারা স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মী আমীর ওমরাহদের সম্বন্ধে যেরূপ বিশদবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিধর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলেই সেরূপ করেন নাই। "দশহাজারী মন্সবদার" মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি সিংহাসনের অধিকারী তিনিই এই গৌরবান্বিত পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। তার নীচে "আটহাজারী" "সাতহাজারী," ইহা অন্যান্য রাজকুমারদিগের প্রাপ্য। আকবরের সময়ে, সাহজাদা সুলতান সেলিম, দশহাজারী ও সাহজাদা মুরাদ ও দানিয়েল যথাক্রমে আট ও সাতহাজারী মন্সবদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সাত হাজারের নীচে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ পাঁচহাজারী মন্সবদারি। এই পদে থাকিয়া সম্রাটের পৌত্রগণ যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষানবিশী করিতেন। রাজ্যের প্রধান সেনানী ও মন্ত্রী এই পাঁচ-হাজারীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইত।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্সবদারেরা এক এক সুবার শাসনভার পাইতেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা,

---

* "আকবর নামা" "তুজুক্-ই-জাহাঙ্গিরী" "তবকাৎ-ই-আকবরী"। বদৌনির গ্রন্থ হইতে বর্ত্তমান প্রস্তাবের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইবে। মুসলমানে হিন্দু ওমরাহগণের সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের সুশৃঙ্খল ঘটনাবলী কিরূপ বিশৃঙ্খলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহারও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কাবুল প্রভৃতি এক একটী সুবায় সর্ব্ববিষয়ে শাসন কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তাঁহারা বাদসাহের নিম্নেই কর্ত্তৃত্ব উপভোগ করিতেন। ইহাদিগকে প্রথমে "সিপাহি-সালার" বলা হইত, তৎপরে ইহারা "সাহেব-সুবা" ও ক্রমশঃ "সুবাদার" এই নামে পরিচিত হইয়া পড়িতেন।

মন্সবদারেরা বেতন ব্যতীত, পদমর্য্যাদার উপযুক্ত জায়গীরাদি পাইতেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ যদিও এই প্রকার জায়গীরাদি ব্যবহার বা তাহার স্বত্ব ভোগ করিতেন না, তথাপি নিয়মমত সরকার হইতে ইহার সনন্দ লইয়া অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। পদ পরিবর্ত্তনের বা কর্ম্মচ্যুতির সঙ্গে সম্রাট প্রদত্ত এই সমস্ত সম্পত্তি হস্ত পরিবর্ত্তন করিত।

মন্সবদারেরা কখন কখন বা রাজ্য মধ্যে সামরিক ও দেওয়ানী উভয়বিধ শাসন ক্ষমতা পরিচালন করিতেন, আবার কখনও বা সমরক্ষেত্রে বাদসাহের পৃষ্ঠপোষক প্রধান সেনাপতি-রূপে বাহিনীদল পরিচালনা করিতেন। প্রতি বৎসরে একটী নিয়মিত সময়ে মন্সবদার নির্ব্বাচিত হইত।

"আকবর নামা" হইতে দেখিতে পাওয়া যায় দেশীয় হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা সম্রাটদিগের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। মন্সবদার শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদের দুই চার জনের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইরাণী, তুরাণী ও বৈদেশিক পাঠান। আফগানের দলই কিছু বেশী। সাধারণ সৈন্যশ্রেণীও ঐরূপে নির্ব্বাচিত। আকবরের সময়ে চারিশত পনের জন মন্সবদারের মধ্যে আমরা ৫৫জন হিন্দুর নাম দেখিতে পাই; এবং আকবরের সময়ে হিন্দু মন্সবদারের অনেকেই উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহজাহানের সময়ে ইহার বিপরীত দেখা যায়। সাহজাহানের রাজত্বের বিংশ বৎসরে দ্বাদশজন পাঁচহাজারী মন্সবদারের মধ্যে একজনও হিন্দু ছিলেন না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ আকবর যে নীতি চালিত হইয়া অধিক পরিমাণে হিন্দু নিয়োগ করিতেন, সাহজাহান হিন্দু রাজ্ঞীর গর্ভ সম্ভূত হইয়াও তাহার বিপরীত নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এক কথায় উচ্চশ্রেণীর মন্সবদারেরা সম্রাটের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কি সামরিক ক্ষমতায় কি রাজকার্য্য পরিচালনে সকল বিষয়েই তাঁহারা সম্রাটের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহারা পদমর্য্যাদার অনুযায়ী বেতন পাইতেন, এতদনুরূপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কৃতিত্ব দেখাইলে সদ্‌গুণের পুরস্কার পাইতেন, বিশ্বাসঘাতকতায় দণ্ডিত হইতেন। মন্সবদারী পদের সৃষ্টি করিয়া সামরিক বিভাগ নিজ হস্তে কেন্দ্রীকৃত না করিলে আকবরসাহ বোধ হয় অত শীঘ্র মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারিতেন না।

ইংরাজ রাজত্বের পদস্থ শাসন বিভাগীয় ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের সহিত তৎকালীন মন্সবদারদিগের অবস্থার যে বিশেষ বিভিন্নতা ছিল, তাহার প্রমাণ জন্য আমরা নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

পদমর্য্যাদা	উৎকৃষ্ট অশ্ব	উৎকৃষ্ট হস্তী	ভারবাহী পশু	মাসিক বেতন		
				১ম শ্রেণী টাকা	২য় শ্রেণী টাকা	৩য় শ্রেণী টাকা
১০০০০	৭০০	২০০	৫২০	৬০০০০	...	...
৮০০০	৫০০	১৬০	৪২৪	৫০০০০	...	...
৭০০০	৩৯২	১৪০	৩৬৭	৪৫০০০	...	...
৫০০০	৩৪০	১১০	২৬০	৩০০০০	২৯০০০	২৮০০০
৪৯০০	৩০০	৯৮	২৫৩	২৭৬০০	২৭৪০০	২৭৩০০
৩০০০	২৪০	৭০	১৬৪	১৭০০০	১৬৮০০	১৬৭০০
২০০০	১৫০	৪০	১৩৭	১২০০০	১১৯০০	১১৮০০
১০০০	১০৪	২৪	৬৭	৮২০০	৮১০০	৮০০০
৫০০	৩০	১২	২৭	২৫০০	২৩০০	২১০০
২৫০	১৪	৬	১১	১১৫০	১১০০	১০০০
২০০	১২	৬	১০	৯৭৫	৯৫০	৯০০
১০০	১০	৩	৭	৭০০	৬০০	৫০০
৫০	৭	২	৩	২৫০	২৪০	২৩০
২০	৫	২	২	১৩৫	১২৫	১১৫
১০	৪	...	...	১০০	৮২½	৭৫

প্রত্যেক মন্সবদারের অধীনে নিয়মিত সংখ্যক পদাতিক থাকিত। পদ-মর্য্যাদার গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে সেই সকল পদাতিকও অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ সৈন্য চালনা করিতেন। মন্সবদারের অধীনস্থ হস্তী ও অশ্বাদি সম্রাটের হস্তী ও অশ্বশালায় রক্ষিত হইত।*

* আকবরের হস্তী ও অশ্বশালার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর ছিল। এতৎ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। মোটের উপর দুই চারিটী কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ও পাঠকগণের তাহাতে বিরক্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে আকবর নামার গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—"হিন্দুদিগের শাস্ত্রে এক কিম্বদন্তী আছে যে অষ্ট দিক (?) আটটী হস্তীর দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে,—১ ঐরাবত পূর্ব্বদিকে, ২ পুণ্ডরীক দক্ষিণপূর্ব্বে, ৩ বামন দক্ষিণে, ৪ কুমার দক্ষিণপশ্চিমে, ৫ অঞ্জন পূর্ব্বে, ৬ পুষ্পদণ্ড উত্তরপশ্চিমে, ৭ সার্ব্বভৌম উত্তরে, ৮ সুপ্রতীক উত্তরপূর্ব্বে অবস্থান করিতেছে। ভূমণ্ডলের সমস্ত হস্তী এই অষ্ট গজের বংশোদ্ভব। শ্বেতচর্ম্ম ও শ্বেতকায় হস্তী ঐরাবতের; বৃহৎমূর্দ্ধা দীর্ঘকেশ

বিহারীমল কছ্‌ওয়াহা। রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে অম্বররাজ বিহারিমল্ল সর্ব্বপ্রথমে আকবরের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধে প্রবিষ্ট হন। আকবরের রাজত্বের প্রথম বৎসর অতীত হইয়াছে এই সময়ে তিনি সখ্যতা করণার্থে রাজা বিহারী মলকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া পাঠান। রাজা তাঁহার পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহকে লইয়া সম্রাটের সহিত সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিহারী মল্ল তবে কি ক্ষীণহস্তে তরবারি ধারণ করিতেন? রাজপুতের পবিত্র শোণিত তবে কি তাঁহার শিরায় শিরায় মন্দীভূত তেজে বহিতেছিল? তিনি যে সহজে পূর্ব্ব পুরুষের বীরত্বকাহিনীময় জ্বলন্ত গাথা ভুলিয়া গিয়া তুর্কীয় বস্ত্র-প্রান্ত চুম্বন করিলেন, তাহাতে কি তাঁহার হীনবীর্য্যতা ও মোগলভীতি প্রকাশিত হইয়াছে? না তাহা নহে; রাজা বিহারীমল্ল

পদ্মদ্বয় উন্মুক্ত সাহসী ও ভীষণ দর্শনহস্তী পুণ্ডরীকের; সুদৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ উন্নতপৃষ্ঠ হস্তী বামনের; দীর্ঘকায় অশান্ত ক্ষুদ্রকেশ কৃষ্ণ বা লোহিত চক্ষুবিশিষ্ট হস্তীগণ কুমারের; কৃষ্ণোজ্জ্বল-পৃষ্ঠ দীর্ঘদন্ত শ্বেতবক্ষ ও শ্বেতোদর দীর্ঘ অথচ স্থূলপাদ হস্তী অঞ্জনের; ক্ষুদ্রকর্ণ দীর্ঘশুণ্ড ভীষণদর্শন হস্তী পুষ্পদণ্ডের; ক্ষীণোদর লোহিত চক্ষু দীর্ঘশুণ্ড হস্তী সার্ব্বভৌমের এবং এই সপ্তবিধ গুণের একত্র সমীকরণবিশিষ্ট হস্তী সুপ্রতীকের বংশোদ্ভব।

লোকের মনে আগে এরূপ কুসংস্কার ছিল যে হস্তী পালন করিলে সংসারের অমঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু মহাজ্ঞানী সম্রাট আকবরের সময়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে সেই কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক একটী হস্তীর মূল্য গুণানুসারে এক লক্ষ হইতে শত মুদ্রা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইত।

সম্রাটের হস্তীশালায় চারি প্রকারের হস্তী থাকিত। প্রথম শ্রেণী—"ভদ্র"; দ্বিতীয় শ্রেণী "মন্দ্র"; তৃতীয় "মৃগ" ও চতুর্থ "মীর" জাতীয় ছিল। "ভদ্র" হস্তী, সাহসী সমরকুশল সুগঠনশালী দীর্ঘবক্ষ দীর্ঘকর্ণ ও পরিশ্রম সহিষ্ণু হইত। ইহাদের মস্তকের অভ্যন্তরে এক প্রকার মাণিক্য পাওয়া যাইত যাহাকে "গজমানিক" বলে। "মন্দ্র"—কৃষ্ণকায় পীত চক্ষু সুগঠিত শরীরবিশিষ্ট বন্য ও অদম্য। ইহারাও সমরের সহায়তা করিত। "মৃগের" শরীরের চর্ম্ম শ্বেতাভ এবং কৃষ্ণবর্ণের চিতাবিশিষ্ট, চক্ষের বর্ণ পীত লোহিত ও কৃষ্ণশুক্ল বর্ণের সংমিশ্রণ। "মীর" ক্ষুদ্রমূর্দ্ধা সহজেই বশীভূত হয় কিন্তু বজ্রের শব্দে বড় চমকিত হইয়া উঠে।

এই চারি জাতীয় হস্তীর সংমিশ্রণে নূতন শ্রেণীর হস্তী উৎপাদন করা হইত। হিন্দুরা সত্ব, রজঃ, তম, তিনটী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। বাদসাহ হস্তীদিগকে এই তিনটী গুণের অবতার স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। সত্বগুণবিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য স্বল্পাহারী প্রশান্তগুণবিশিষ্ট আজ্ঞাবহ এবং হস্তিনীসংসর্গবিমুখ; রজঃগুণবিশিষ্ট হস্তী ভীষণদর্শন মদগর্ব্বিত সাহসী অশান্ত। শেষোক্ত অর্থাৎ তমোগুণবিশিষ্ট হস্তী স্বেচ্ছাপরায়ণ নিদ্রাশীল কর্ম্মক্ষম এবং ক্রোধশীল।

যুদ্ধকার্য্যে ব্যতীত হস্তী অন্যান্য ব্যবহারেও লাগিত। বাদসাহ তাহাদিগকে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে শিখাইতেন। যন্ত্রের তালে তালেও তাহারা নৃত্য করিতে শিখিত। ধনুক হইতে তীর নিক্ষেপ, কামানছোড়া, ভূমিতল হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তু উত্তোলন ইত্যাদি অসম্ভব কার্য্যেও তাহারা পটু ছিল। মাহুতের প্রতি তাহারা এত অনুরক্ত হইত যে ঘাসের আটী খাইতে দিলে তাহা মুখের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া নির্জ্জনে মাহুতকে দিত।

পাচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হস্তীশিশু মাতৃস্তন্য পান করিত। এই সময়ে ইহাদের আখ্যা "বালহস্তী"।

মৌখিক প্রীতি ও সম্মান দেখাইলেও মনে মনে মোগলকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু কতক-গুলি কারণে তিনি অগত্যা সম্রাটের সহায়তাপ্রার্থী হন। তারপর সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের সহিত একত্রীভূত হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও আকবর স্বীয় উদার স্বভাবে তাঁহাকে আপনার করিয়া তোলেন।

আকবরের বন্ধুত্বপূর্ণ আহ্বান তিনি সহজেই প্রত্যাখান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিয়াই বা ফল কি? তাঁহার ক্ষুদ্র অম্বর রাজ্য তখন স্বজাতীয় শত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন, অন্যান্য রাজপুত ভূপতি ও সামন্তগণ দিল্লী হইতে অনেক দূরে, তাঁহারা মোগলের ক্ষীণতেজ দেখিয়া অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু বিহারী মল্লের পক্ষে সেরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। দিল্লীর অত সান্নিধ্যে থাকিয়া সেই প্রভূত প্রতাপ, যুবক বাদসাহের সহিত প্রতিযোগীতা করা ক্ষুদ্র অম্বররাজের সম্ভবপর নহে বলিয়া, তিনি গৌরবজনক বন্ধুত্ব আহ্বানে আকবরকে আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

আকবর তখন আদিলশার প্রধান হিন্দু সেনানী হিমুকে পরাজিত করিয়া নিজ শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিহারী মল্ল সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দিল্লীর সৈন্যাবাসে তখনও রণরঙ্গের উন্মত্ত ভাব তিরোহিত হয় নাই। জয়োল্লাসবিকৃত সৈনিকের উষ্ণ মস্তিষ্ক হইতে তখনও যুদ্ধ বাসনা তিরোহিত হয় নাই। আকবরের শিবিরে একটা বীরত্বের মহা আস্ফালন পড়িয়া গিয়াছে। সৈনিকেরা তরবারি লইয়া তখনও পরস্পরে আমোদ প্রমোদ স্বরূপে আপনার আপনার কসরৎ দেখাইতেছে। বিহারী মল্ল শিবিরেব এক প্রান্তে এই গোলযোগের সময় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক সুসজ্জিত কায়,সৌম্যমূর্ত্তি যুবক এক সুবিশাল উন্মত্ত হস্তীর উপর বসিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাতে অবনত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই বিপুলকায় মাতঙ্গরাজ কিছুতেই অবনত হইবে না বা আজ্ঞাপালন করিবে না কিন্তু তাহার আরোহীও আবার তাহার অপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সর্ব্বশেষে আরোহীরই জয় হইল। মত্তমাতঙ্গ আরোহীর উদ্যম ও মহাশক্তির নিম্নে অবনত হইল। বিহারী মল্ল এই যুবককে চিনিতেন না, কিন্তু তাহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাময়, শক্তি সঞ্চালনী ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার অন্তরস্থ তেজের পরিচয় পাইলেন। যুবক হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, বিনয়ের সহিত নিজের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে হাত ধরিয়া শিবির মধ্যে লইয়া গেলেন।

দশ বৎসর বয়সে ইহাদের নাম "পুত," বিশ বৎসরে "বিক্কা" এবং ত্রিশ বৎসরে "কলবা"। সুবা আগরা, নারওয়ার, ইলাহাবাদ, (আলাহাবাদ) যোড়াঘাট রতনপুর, নন্দনপুর, মালওয়া, চন্দোরী, বিজাগড়, রোটাস্ চারখণ্ড ও বাঙ্গলা সুবার সপ্তগ্রামে (হুগলী) বিস্তর হস্তী সংগৃহীত হইয়া সম্রাট দরবারে বিক্রীত হইত।

হস্তীর সেবার জন্য বাদসাহ ভৃত্য ও মাহুত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। হস্তীর রক্ষার জন্য "হালকা" আখ্যাধারী সেনাদল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের অধ্যক্ষ একজন ফৌজদার। ফৌজদারেরা হস্তীদিগকে যুদ্ধকুশল বলিষ্ঠ-সাহসী ও শিক্ষিত করিতেন। তাহাদের আহার ও শ্রমের বন্দোবস্ত করিতেন। প্রত্যেক হস্তীর অবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্রাটের নিকট এত্তলা করিতে হইত। * * * *

অম্বররাজ পূর্ব্বে আকবরকে দেখেন নাই। এই অবাধ্য বিদ্রোহী হস্তী দমনকারী পুরুষকে আকবর জানিয়া তিনি তাঁহার গুণের ও শৌর্য্যবীর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

বীরের সহিত বীরের সম্মিলন হইল। যে যুবক একাকী এক মত্তমাতঙ্গকে অঙ্কুশাঘাতে পদানত করিতে পারে, সে যে অগণ্যবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থান পদানত করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অম্বররাজ ও আকবরের মধ্যে শীঘ্র বন্ধুত্ব জন্মিল। সেই বন্ধুতার ও প্রীতির পরিণাম স্বরূপে আকবর সাহ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।*

বিহারী মল্ল "কছ্ওয়াহা" শ্রেণীভুক্ত রাজপুত। কছ্ওয়াহাগণ—"রাজাবৎ" ও "সৈকোবৎ" এই দুই শ্রেণী বিভক্ত। অম্বর ইহাদের মাতৃভূমি। ৯৬৭ খৃঃ অব্দে ধোলা রায় অম্বর স্থাপন করেন। বিহারী মল্ল, ধোলা হইতে অষ্টাদশ পুরুষ। জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা ধোলা রায় হইতে চতুঃত্রিংশ পুরুষ।

বিহারী মল্লের—চারি ভাই ছিল। (১) পুরাণ মল্ল, (২) রূপ্সী (৩) আস্কারণ, (৪) জগমল্ল। বিহারী মল্ল পুরাণ মল্লের কনিষ্ঠ।

রূপ্সী—আকবরের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হন। রূপ্সী দেড় হাজার মন্সবদার ছিলেন। রূপ্সীর পুত্র জয়মল্ল আজমীর ও মীরাথার থানাদার ছিলেন। পত্তন ও আহাম্মদাবাদের যুদ্ধে তিনি বাদসাহের সহচর হইয়া মহা বীরত্ব প্রকাশ করেন। আকবর উঁহাকে একবার বঙ্গদেশে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বৌসা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি জ্বর রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন।

উদয়পুরের "মোটারাজার" কন্যাকে জয়মল্ল বিবাহ করেন। পতির মৃত্যুর পর তিনি সহমরণে যাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায়, উঁহার গর্ভজাত সন্তান উদয়সিংহ তাঁহাকে পীড়ন করেন। আকবর এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

জয়মল্লের বর্ম্ম একটী বিখ্যাত দ্রব্য। এতাদৃশ ভার বিশিষ্ট বর্ম্ম তৎকালিন কোন রাজপুতেরই ছিলনা। জয় মল্লের মৃত্যুর পর আকবর সেই বর্ম্ম মালদেবের পৌত্রকে প্রদান করায় রূপ্সীর সহিত তাহার মনোবিবাদ উপস্থিত হয়।

আস্কারণ—সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অতি সামান্য রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি তিনহাজারী মন্সবদার ছিলেন। ঝান্সির নিকট, উরচাধিপতি মধুকরের বিরুদ্ধে তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। আকবরের ২৫ বৎসর বয়সে বেহারে তিনি টোডর মল্লের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তার পর আগরার সুবাদারি করেন। ইহার পুত্র রাজসিংহ পিতার মৃত্যুর

* বিহারীমল্লের কন্যা যে জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। জাহাঙ্গীর যে হিন্দু রমণীর গর্ভসম্ভূত ইহার এক প্রমাণ এই, তিনি নিজ জীবনবৃত্তান্তে সকলের কথাই বলিয়াছেন কিন্তু মাতৃ নামোল্লেখ করেন নাই।

পর রাজসাহ সরকার হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। আকবরের রাজত্বের চতুঃচত্বারিংশ বৎসরে ইনি গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তৎপরবৎসর আকবরের অধীনে আসীর দুর্গ অবরোধ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে সুলতান সেলিম্ বীরসিং দেউ বুন্দেলার সাহায্যে আবুল ফজলকে নিহত করেন। আকবর রাজসিংহকে, রায়রাঁয়া পাত্রদাসের সহিত বুন্দেলার দমনার্থে পাঠান। পরিশেষে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ইনি চারি হাজার মুন্সবদারীতে উন্নীত হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসর দক্ষিণাত্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন।

জগমল্ল—সম্বন্ধেও বিশেষ বৃত্তান্ত কিছু নাই। কেবলমাত্র তিনি আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পত্তন ও আহম্মদাবাদে যুদ্ধযাত্রা করেন। তৎপুত্র কাঙ্গার রাজা বিহারী মল্লের সহিত আগরার রাজসভাতেই থাকিতেন, ইব্রাহিম হোসেন দিল্লী আক্রমণ করিলে কাঙ্গার তৎবিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েন। তারপর আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পত্তনে যুদ্ধযাত্রা করেন। মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালীন ইনি রাজা মানসিংহের অধীনে যাত্রা করিয়াছিলেন। শেষকালে সাহাবাজ খাঁর অধীনে তিনি বঙ্গদেশে সুবাদারী করিয়াছিলেন। ইনি এক হাজারী মন্সবদার ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোলাপি কাণ্ডারি।

"কাণ্ডারি" বলায় অনেকে উপহাস করিবেন। আজকাল ক্রিটিকের ত অভাব নাই। বাজে আওয়াজে লিটারারি গড়েরমাঠ সতত থরহরি কম্পিত। ওরিজিন্যালিটি বেচারা একদম কোণ্‌ঠেসা। তবে মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া হুম্‌কি দেখাইয়া থাকে বটে। ফলে মুখে আর 'টু' শব্দটিও নাই। পাছে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সমালোচক বাবাজীরা মনে করেন আমি হিন্দি জানি না, কথাটা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া যথোচিত হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ডিস্‌ক্রিমিনেসন অভাবে এরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাই ফাঁকতালে একটু আত্মগরিমা করিলাম। আমি হিন্দি বিলক্ষণ জানি ও বুঝি। শুধু শুনিলে বুঝিতে পারি এমন নয় অনায়াসে অনর্গল বলিতেও পারি। তবে অ্যানি বেশান্ত যেমন ইংরাজী বলেন, তেমন না হইলেও অনেক কথা পেসাদার অপেক্ষা ভাল পারি। কখন তানপুরা লইয়া গলা সাধি নাই, তাই এখনও এখানে হাঁ করিয়া বসিয়া আছি; নতুবা এতদিন কবে একটা বিটকেল বক্তার হইয়া বিলাতে বা আমেরিকায় রপ্তানি হইতাম। যাহা ইউক "কাণ্ডারি" কথাটা আমি জানিয়া শুনিয়া সুস্থ শরীরে ও খোষতবিয়তে লিখিয়াছি এবং লিখিবারও যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রত্নকত্রনন্দিনী।

আগে আমার নূতন নূতন সকলি ভাল লাগিত। এমন কি, প্রায়ই দিবারাত্র নূতন পরিচ্ছদে মোড়া থাকিতাম। নূতন কলাই, নূতন আলু, নূতন পটল, নূতন বেগুণ, নূতন কোপি প্রভৃতিতে একপ্রকার মজিয়া ছিলাম। শুদ্ধ নূতন চাউল বরদাস্ত হইত না বলিয়া দুঃখের সীমা থাকিত না। এখন কিন্তু আর আমার সে মতি নাই। এখন প্রাচীন আমার প্রাণ। কেহ "নবজীবন" বলিলে রাগে সমস্ত শরীরের রক্ত ফুটিতে থাকে। একখানি প্রাচীন ইষ্টকখণ্ড পাইলে সর্ব্বদা বুকে করিয়া পড়িয়া থাকি। একটী পুরাতন আমকাঠের সিন্দুক দেখিলে হৃদয়ে স্নায়সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া উঠে এবং ভাব-গদ্‌গদ-চক্ষে লবণাম্বু গড়াইয়া বক্ষ ভাসিয়া যায়। নূতন কথা যেন কাণে বজ্রাঘাতের মত বোধ হয়। নূতন সামগ্রী চক্ষের শূল। তাই নিত্য অনিত্য নূতন কাপড় ছিঁড়িয়া তালি লাগাই এবং যাহাতে পুরাতন দেখায় বিধিমতে তাহাই চেষ্টা করিয়া থাকি। নূতন বাড়ীতে সদাই কত কি কেরামতী করি, এবং জরাজীর্ণ দেখাইবার জন্য আর্টের বাকি রাখি না। উঠিতে নামিতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিবার ভয় সত্বেও প্রাচীন দুরারোহ অন্ধকূপ সিঁড়ি পাইলে মহানন্দের সহিত বারম্বার উঠা নাবা করি। কলিকাতার পয়োনালি স্বরূপ অপার প্রাচীন চিৎপুর রোডেনানা বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা অবহেলা করিয়া বিনা কারণে অবলীলাক্রমে দশবার গমনাগমন করি; কিন্তু সাংঘাতিক আবশ্যক হইলেও নূতন হ্যারিসেন রোডের মুখাবলোকন করি না। বলিতে কি অনেক সময় প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃতে প্রাচীন কাঁটাঝোঁপ বঁটঝোঁপ করিয়া থাকি।

ইচ্ছা হয়, কয়েকটা নূতন কথা গঙ্গা পার করিয়া দিয়া আসি। জানি না কি দুঃখে, কোন অভাবে, লোকে, কৃতবিদ্য লোকে—এ কথাগুলাকে জিহ্বাগ্রে প্রশ্রয় দেয়। দেশহিতৈষীতা, বাগ্মিতা, তাড়িৎবার্ত্তা, ব্যোমযান, ল্যাম্প, রেলের গাড়ি, কন্‌গ্রেস, জুরি-নোটিফিকেসন্, টেলেফোঁ, ফনোগ্রাফ প্রভৃতি ভজকট কথা কোন্ আস্বাদে লোকে মুখে আনে? আমার তো শুনিবামাত্রজ্বর আইসে এবং প্রকৃত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। যদি বেলাডেন্ হত্যার মামলার মত এ কথাগুলার বিচার ভার আমার হাতে থাকিত ত দেখিতাম কেমন করিয়া ফাঁসি ছিঁড়িত। মুড়ুলি, বাজে বকা, উড়ো খবর, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দেউটী, দের্কো, এক্কা, একজাই, সোণার চ্যাংড়া, চর্কা, ফুস্‌মন্ত্র প্রভৃতি কথায় শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। ভুকো ভুলোর কবি, ফক্‌রে ধোবার পাঁচালি, সন্ন্যাসী ময়রার তুক্কো, কাঙ্গলা বিশের ঝুমুরে যে রস ছিল তাহা কি আর থিয়েটর, সখের যাত্রা, সার্কাস, ঘোড়দৌড়, একজিবিসন্, টাউনহল বক্তৃতায় কখনও পাই-বার যো আছে? মনে হয় লোকে চুঁচুড়ার সঙ্ হারাইয়া কি সুখে বাঁচিয়া আছে। নূতন ভারতে;

শিক্ষিত ভারতে, আজ কি আছে যে তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে? লেভিতে, ছোট বড় লাটসভায়, খৃষ্টীয় হরিসংকীর্ত্তনে কি সে আনন্দের সিকি পাওয়া যায়?

আর অধিক কি বলিব? মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়। ছোটবড় লাটসভায় যে টুকু বা সুখ ছিল, তার তো এখন আর অর্দ্ধেকও নাই। নাস্তিক ব্রাডলো কটা দেশীয় অকাল কুষ্মাণ্ডের সংযোগে আমাদের সে সুখে ত কাঁটা দিয়াছে। ইচ্ছা হয়, এ কজন বেন-জীর-বদরে-মুনেকে দারুণ গ্রীষ্মকালে তৃতীয় শ্রেণীর রেল গাড়িতে বোঝাই দিয়া একদম হরিদ্বার চালান করি এবং ভাঙা-কুঁজা-কাঁধে পানিপাঁড়ে যেন সর্ব্বত্র মেঘনাদের মত অন্তরীক্ষে থাকিয়া কটাক্ষ বাণ বর্ষণ করে। চড়ক গাজন তো আর নাই। একটা বৃহৎ প্রাচীন পার্ব্বণ একবারে লুপ্ত হইয়া গেল! তখন যে কত ধর্ম্মপরায়ণের সুমধুর মধুমাসে পৃষ্ঠদেশ চুলকাইয়া উঠিত তাহা কে গণনা করিতে পারে? কালের কি কুটিল গতি! কাঁলচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে এখন সেই সুমধুর দশ আনি চুলকানি বদন কন্দরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই নিতি নিতি বিরাট বিভ্রাট সভায় জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত প্রতিভা গগণ স্পর্শ করিয়া থাকে। ওষ্ঠাধর সন্তাড়নে, দন্তসংঘর্ষণে, শুষ্ক জিহ্বাতালুর আস্ফালনে চতুর্দ্দিকে দুগ্ধ-ফেণ-নিভ উজ্জ্বল কথামুক্তাপাঁতি উঠিয়া, ফুটিয়া, ছুটিয়া আর্য্যবঙ্গের গৌরবের বুকনির মত করতালিশীল শ্রোতৃবর্গের শরীর বিভূষিত করে বটে। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে? হায় সে প্রাচীন—অতি প্রাচীন—অপ্রাপ্যবহর প্রাচীন বিশ্বজনবঞ্চিত "দিল্লীকা লাড্ডু"! আত্মশাসন প্রণালীতে তাহার এক আনা সুখও নাই।

আজকাল তো আমার মনের এইরূপ ভাব। "প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী" পড়িয়া অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এখন আমার নবজীবন—ছি! প্রাচীন জীবন উপস্থিত। প্রত্নতত্ত্বে মর্ম্মান্তিক যত্ন জন্মিয়াছে। সুতরাং কোন কথা উপস্থিত হইলে, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি বিস্তৃতি, পরিণতি প্রভৃতি মীমাংসা না করিয়া জল গ্রহণ করি না। তাই গোলাপি কাণ্ডারি সম্বন্ধে যতদূর পারিয়াছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন করিতে লেশমাত্রও অনুষ্ঠানের ক্রটী করি নাই। আমার যথাশক্তি ইহার প্রত্নতত্ত্বরূপ পঙ্কোদ্ধার করিয়া সাধারণ সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিলাম। কায়মনোবাক্যে বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে সুপাঠক এবং সুপাঠিকা-গণের মনোনীত হইলে সমস্ত গলদ্‌ঘর্ম্মশ্রম সুসার্থক মনে করিব।

প্রাচ্য তত্ত্ব।

"গোলাপি কাণ্ডারি" দুইটি কথা বুঝিতে হইবে। একটি বিশেষণ এবং অপরটি বিশেষ্য। 'গোলাপি' কথাটীর আলোচনা করিতে গেলে আ-বৈদিক গ্রন্থের তন্ন তন্ন সমালোচনার

আবশ্যক। যিনি ভুবনমোহিনীর প্রতিভা হইতে ৺ কালিদাসের নক্সা এবং উৎকলকুল-তিলক সুরসাল গোপালের টপ্পা হইতে বৃদ্ধ বেদব্যাসের খেয়াল ধ্রুপদ পর্য্যন্ত আওড়াইয়াছেন তাঁহার অবশ্যই প্রতীত হইয়াছে যে 'গোলাপি' কথাটি বিশেষ্য-বিশেষণ। 'গোলাপি বনেদী বিশেষ্য। ইহার অর্থে ফুল বিশেষ বুঝাইয়া থাকে। তবে অলঙ্কারশাস্ত্রানুমোদিত রূপকে মানুষও বুঝায়; যথা, গোলাপসিংহ। আরও মিষ্ট করিতে হইলে সুন্দরীও বুঝায়; যথা,—আর যথায় কায নাই। 'গোলাপি' (কথাটি বিশেষ্য বিশেষণ যেন মনে থাকে) অর্থে কুসুম বিশেষের গুণবিশিষ্ট বুঝায়। ফলে ফাঁকিব্যবসায়ী নৈয়ায়িক এস্থলে একটু থাপচা কাটিয়া থাকেন। কোথাও গোলাপের গন্ধ এবং কোথাও গোলাপের বর্ণবিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেন। সটিক ব্যবসায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে নৈয়ায়িক। তাঁহারাও 'গোলাপি' এই দ্বৈতভাবেই ব্যবহার করেন; যথা, গোলাপি নারিকেল তৈল। গোলাপের গন্ধবিশিষ্ট বলিয়া লইলেও বিক্রি, আর বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া লইলেও বিক্রি। এতদুভয় অর্থের সঙ্গতিতে খরিদারের দ্বিগুণ সঙ্গতি; অথচ যে পদার্থ সেই পদার্থই রহিল; কোন দিকে কোন ব্যত্যয়ই জন্মিল না। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে ইহার অর্থের আর একটু পরিণতি হইয়াছে। উন্নতশীল প্রশস্তচেতা সুবুদ্ধি যুবকদিগের নিকট ইহার আর একটি সুমধুর ঝিমঝিমে ঢলঢলে অর্থ আছে; যথা, গোলাপি নেশা।

ইক্ষুখণ্ডের অন্নপ্রাশনের দিন যে মহাপুরুষ 'গোলাপি কাণ্ডারি' নাম দিয়াছেন, তিনি একজন প্রভাতচিন্তানুমোদিত মূক কবি। Brevity is the soul of wit. তিনি দুই কথায়—সামান্য দুই কথায় বিশ্বসংসারের সমস্ত রস একত্র করিয়াছেন। মহাকবি গইতে বলেন স্বর্গের গরিমা, মর্ত্ত্যের মাধুরিমা সমস্তই এক শকুন্তলায় নিহিত আছে। ফলে 'গোলাপি কাণ্ডারি'তে যে কাব্যরস প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়, তাহা শত শকুন্তলা একত্র করিলেও পাবার যো টুকু নাই। শুদ্ধ দুটি কথায় যে সুমধুর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা দশ-সের-পরিমাণ-কাগজে-মুদ্রিত সেক্ষপীয়রে নাই। অধিকন্তু 'গোলাপি কাণ্ডারি' নামদাতা বর্ত্তমান বঙ্গকবিদের প্রথানুসারে নিজ ভাবের আভাস খুলেন নাই, লোকের আশার আশয়েই রাখিয়া গিয়াছেন। গোলাপের গন্ধও নাই, বর্ণও নাই, স্পর্শও নাই; অথচ ভাবুকের মনে ছায়াবৎ, মায়াবৎ, প্রেমের গাথাবৎ, নির্ব্বাচন বক্তৃতাবৎ, হোমরুল বিলবৎ, সাইমলটেনিয়স একজামিনবৎ, ভারতের উন্নতিস্বপ্নবৎ, রএল-কমিসনবৎ, আমাদের রিফর্ম্মেসন নেশাবৎ কি-যেন-কি চটক লাগিয়া যায়।

কি-যেন-কি লাগল পরাণে!
শ্রবণহি ঢুকল, কোথাদে পলাওল,
মরম মরল মাঝখানে
আছে-নাই সোহি সুমধুর গানে !!

কাণ্ডারিকে মূঢ় লোকে গেণ্ডেরি বলে। যাহাদের বর্ণজ্ঞান নাই, অমার্জ্জিত মেধা, শুষ্ক হৃদয়, তাহারাই এমন ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকে। প্রথমতঃ, গেণ্ডেরি কথাটা নিতান্ত শ্রুতিকটু। কাব্যরস দূরে থাক, ইহা কখন খেজুররসের কাছ দিয়াও যায় নাই। শুনিবামাত্র কাণে যেন রাবণের চুলি জ্বলিয়া উঠে। পায়নিয়রের "বাঙ্গালিবাবু" ইহাপেক্ষাও মিষ্ট। ম্লেচ্ছ মুখে আদ আদ বরং একটু লাগে ভাল। কিন্তু গেণ্ডেরি কথাটা যেন বাপ-রে মা-রে করিয়া মুখ দিয়া বাহির হয়। রসভরা ইক্ষুখণ্ডের এ প্রকার কদর্য্য নাম কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য কোন মিষ্ট কথার ব্যভিচার হইবে, সন্দেহ নাই। এখন ভাষাসমুদ্রে পলি পড়িয়া সে রত্নটি যে কোথায় ঢাকা আছে, তাহা ভাষাবিজ্ঞানের প্রথানুসারে কাচিম খোঁজা না করিলে কদাপি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কোন দিগ্‌গজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন "গানদারী ইহার স্বরূপ নাম। রায় গুণাকর ভগবন্ ভারতচন্দ্র ইক্ষুর প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় থাকা প্রযুক্ত "গানদারী" হইতে বীভৎস "গেণ্ডেরি" হইয়া পথমধ্যে বা মধ্যপথে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ, পূর্ব্বে ইহার নাম "গালদারী" (গানের মত মজাদারী) ছিল; পরে নিষ্ঠুর কবির নিষ্ঠুর পৃষ্ঠপোষকেরা পূর্ব্বজন্মের আক্রোশে "গেণ্ডেরি" করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে একথা নিতান্ত অমূলক। এই কার্য্যপ্রধান, ন্যায়-প্রধান, দর্শনপ্রধান, আর্য্যবঙ্গে যে জিহ্বার আস্বাদ কর্ণে প্রযুক্ত হইবে, ইহা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিবেন ? এক্ষণে ভাষাবিজ্ঞানের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শব্দভেদি বাণে লক্ষভেদ করাই শ্রেয়।

শব্দসাদৃশ্যে এ রহস্য ভেদ করাও মহা নটখটি ব্যাপার। শুদ্ধ বিশালদৃষ্টি থাকিলে ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার দূর নিকট, ভিতর বাহির প্রভৃতিতে তীক্ষ্ণ চৌখোস জ্ঞান আছে, তাঁহারই এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা উচিত।

'গাণ্ডারী' কেমন লাগে ? অতি বৃহৎ, অতি কদর্য্য, অতি কর্কশ, অতি কুরূপ। এমন যদৃচ্ছ নাম রসাত্মক, মোলায়েম, সুরূপ, শুভ্র ইক্ষুতে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। মানুষ কখন এমন কঠোর নির্ম্মম বলিয়া মনে আইসে না। ব্ল্যাঙ্কভার্ষী কটুকাটব্যেও এমন ঠকঠকি ব্যাপার স্বপ্নাতীত। "গন্ধারী" কেমন দেখায় ? ইক্ষুর আবার বিশেষ সুগন্ধ কোথায় ? কেন ?—"গোলাপি"তে ? সাহিত্যপ্রেমিক লোকে কখনই এরূপ উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে আরোপ করিবেন না। গান্ধারী ? সতীত্বের আদর্শ গান্ধারী আমাদের গৌরবের ধন—আর্য্যজীবন বটে। তবে ইক্ষুর কাণাভাব আদৌ ভাল লাগে না। 'খণ্ডরী' বা 'খণ্ডারী' ?— অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড (টিকলি) বিক্রি। কথাটা কতক লাগে বটে; কিন্তু পাছে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "কণ্টিকারি" হইয়া পড়ে, তাই ভয়ে স্থান দেওয়া গেল না। আর তদ্ব্যতীত কথাটায় ন্যায় আছে, দর্শন আছে, বিজ্ঞান আছে; শুদ্ধ কাব্য নাই, তাই ফেলিয়া দিলাম।

আর যদি শব্দসাদৃশ্যই একমাত্র ইহার সম্বল হইল, তবে 'কাণ্ডারির' অপরাধ কি ? ইহাতো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরই হইতেছে। কাব্য, দর্শন প্রভৃতি সকল দিক্‌ই বজায় থাকিতেছে।

'কাণ্ডারির' সংসর্গে তো মনে স্বতঃই কাণ্ড, মানুষ, জল, নৌকা আইসে। ইক্ষুতেই বা তাহার অপ্রতুল কই? ইক্ষুতো স্বয়ংই একটা কাণ্ড—প্রকাণ্ড কাণ্ড; বিক্রেতা এবং চর্ব্বয়িতা বা চার্ব্বাক উভয়েই মানুষ; নৌকাস্থলে ঠোঙ্গা। জল তাহারই বা অপ্রতুল কই? ইহার অন্তর্ভূত রস। And to make assurance doubly sure; বিক্রেতার মলিন তৈলাক্ত গামচাকসায়িত জলে ইহাতো প্রভাতশিশিরধৌত পদ্মের মত সতত জব জব করে। এ-নালজিতো চুলে চুলে মিলিয়া গেল। তবে ভবকাণ্ডারি রূপকটুকুতে একটু গোল রহিল। ফলে বিলাসী চার্ব্বাকের পক্ষে কোন গোলই নাই। ভক্তিরস ও ইক্ষুরস তাহার পক্ষে একই কথা। তবে দুই চারিজন বিটকেল বেপেটেণ্ট ব্যাদড়া ভক্তের কথা ছাড়িয়া দাও। অধিকন্তু সাদৃশ্যের তো মলামাটি বাদ আছে। "সদৃশ" অর্থে 'সেই' নহে; তাহার মত। চন্দ্রমুখ বলিলে চাঁদের মত গোল মুখ বুঝায় না। সদৃশ বস্তুতে সকল পয়েণ্ট মেলে না; তবে কতক মেলা চাই।

ইতিহাস।

'কাণ্ডারির' প্রকৃত ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিতে গেলে মান্ধাতার আমোলের আর্য্য নরপতি ইক্ষাকুর সিংহাসনের পদপ্রান্তে দাঁড়াইতে হয়। নরসিংহ নাকি ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া (ইন্দ্র বেচারা অমর হইয়া চিরকালই মানুষের হাতে জীবন্মৃত) নন্দনকানন হইতে অমৃতখণ্ড আনিয়া নিজ রাজধানীতে ক্ষেত্রস্থ করেন। সেই জন্য প্রাচীনেরা 'কাণ্ডারিকে' ইক্ষু বলিতেন। আমাদের হতভাগ্য দেশে তো কোন ইতিহাসই নাই; সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানের শব্দভেদি বাণে এই অবধি লক্ষভেদ হইল। আর সকল কথাই কালের করাল কবলে কবলিত রহিল। আকাশ হইতে space, নক্র হইতে night, আর ইক্ষাকু হইতে ইক্ষু স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

কোন আধুনিক ভাষাতত্ত্বসাগর সে দিন এ কথার প্রতিবাদ করিয়া মহা হুলস্থূল ঘটাইয়া ছিলেন। তাঁহার মতে ইক্ষুর আদৌ জেরুজেলামে জন্ম। ভারতে দৈবাধীন আমদানি মাত্র। মথিলিখিত সুসমাচারে কথিত আছে যে ইডেন গার্ডেনে দুইটী প্রধান উদ্ভিদ্ ছিল, একটী জ্ঞান ও অপরটি জীবন। প্রথমটি তাঁহার মতে বর্ত্তমান নারিকেল বৃক্ষ; কেননা নারিকেল খাইতে গেলে অনেকটা জ্ঞানারুণোদয় হয়। কারণ ইহার ত্বক ও শস্য সম্বন্ধে মহাগোল আছে। এমন কি অনেক সময় ত্বক ও শস্যে পার্থক্য করা বড়ই কঠিন সমস্যা হইয়া পড়ে! জীবন বৃক্ষটি হয় ইক্ষু নয় অম্র। তাঁহার মতে ইক্ষুই প্রকৃত জীবনবৃক্ষ সাব্যস্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে নাকি অম্রের একটা বিশ্রী কিম্বদন্তি আছে এবং তাহাতে

নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদাদি দেখিয়া তিনি ইক্ষুই যথার্থ জীবন বৃক্ষ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় হনুমানচন্দ্রের সংশ্রব বড়ই অলীক কথা। তাই তাঁহার নিকট অম্রের গৌরব লাঘব হইল। অধিকন্তু ইক্ষুর রসেই যে শুদ্ধ জীবন আছে এমন নহে; ইহার সকল অংশই জীবনে পরিপূর্ণ। ভূমিস্থ হইলেই গজাইয়া উঠে। অপিচ ইক্ষুদ্বারায় একটি ভয়ঙ্কর নাস্তিক তর্ক খণ্ডিত হয়। আগে বীজ, না আগে গাছ? এতাবৎকাল ইহা কর্তৃক হিন্দু প্যান্‌থিয়িজম প্রবল রাখিয়া আসিতেছিল। ইক্ষু বিষয়ক অজ্ঞতাই উহার মূল কারণ। ইক্ষুর জেনেসিসে (genesis) অগ্রে বৃক্ষই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ ইহার যে কোন অংশ উপ্ত হইবে তাহাই বাড়িয়া উঠিবে।

যাহা হউক, দিক্‌পাল ভাষাতত্ত্বনিধি অনেক গবেষণার পর একখণ্ড ইক্ষু মহাপ্রলয়ের সময় নোয়ার জাহাজে বহুযত্নে সংরক্ষিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। পরে গোমরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসকেনজ (অক্কেনজ) কৃষ্ণসাগরের পাড়ে উহার চাষ আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহার নামেই উহা প্রচলিত। তবে ইংরাজী, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি পার্থক্যে অক্কেনজ হইতে ইক্ষুতে দাঁড়াইয়াছে। মেষপালকুলপাল মুসা একদা একখণ্ড ইক্ষু দাঁতে ছাড়াইতে ছাড়াইতে ইস্রেলদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়নশীল ছিলেন। সম্মুখে পথ আগলাইয়া লোহিত সমুদ্রকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া রোষকশায়িতলোচনে সেই অর্দ্ধভক্ষ ইক্ষুদণ্ড দ্বারা জলে সজোরে আঘাত করিলেন। প্রচণ্ড লগুড় আঘাতে যেমন মেধমাংসাদি পৃথক হইয়া জীবদেহে অস্থি বাহির হইয়া পড়ে, সমুদ্রের জল সেইরূপ আহতস্থলের দুইধারে সরিয়া পড়িল এবং মধ্যে কঠিন মাটি দেখা দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ভীষণ আঘাতে অর্দ্ধ ভক্ষ ইক্ষু দুই খণ্ড হইয়া গেল। এক খণ্ড হাতের ধন হাতেই রহিল; অপরটি সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কেলিকটের সন্নিকট ঠেকিবামাত্র শত মূল বাহির করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল। তদবধিই ভারতে ইক্ষুর উৎপত্তি।

এই লোমহর্ষণ কথায় চারি দিকে রৈঃ রৈঃ পড়িয়া গেল। ধর্ম্মভীত ভারতের আজ মহা ভয় উপস্থিত। উচ্ছিষ্ট ইক্ষু! ধর্ম্মলোপ! জাতিনাশ! এক কথায় সব মাটি! কৃষ্ণ ও খৃষ্ট একাকার! কনভার্টেরা এতদিন বাঙ্গালায় মরি মারি করিয়া কৃষ্ণে ও খৃষ্টে যে পার্থক্য রাখিয়া আসিতেছিল তাহা সব এক কথায় গোল্লায় গেল! ঘোর ব্যাপার! মহা মনস্তাপ! ভয়ঙ্কর অন্তর্দাহ! বিষম বিপ্লব! ইংরাজদের দ্বিতীয় সিপাহি বিদ্রোহের ভয় হইল! চারিদিকে সশস্ত্র পাহারা! ফিরাঙ্গী ভলাণ্টিয়রেরা Bivoac করিতে লাগিল। বেওয়ারিস গড়ের মাঠে পিপড়ার মত পিলপিল করিয়া লোকস্রোত চলিল। হিন্দুদিগের বিরাট সভা! কালিঘাটে বিরাট সস্ত্যয়ন! কেল্লার কামান সব বারুদঠাসা! বড়লাটের সার্সী খড়খড়ি বন্ধ! পাছে বিদ্রোহের বাক্‌স্রোত বায়ুভরে প্রবেশ করে! এদিকে বিরাট সভায় বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাট বক্তৃতা! বিরাট রেজলিউসনের উপর বিরাট রেজলিউসন! বিরাট রেজলিউসন বিরাট একবাক্যে পাশ! বক্তাবাগীশদের চিৎকারে কামান নীরব! ভাব, ভঙ্গি, দস্তকড়মড়িতে

গাছের পাতা খসিয়া পড়িতে লাগিল! আকাশ কাক চিলে ভরিয়া গেল! শেষ আর্য্যকেশরীরা সাব্যস্ত করিলেন মিছা বিবাদে ফল নাই! শান্তি উনবিংশতি শতাব্দের জয়পতাকা!. সেনা-নায়ক বজ্রনাদে বলিলেন "আজ হইতে ইক্ষুর নাম কাণ্ডারি করা গেল" এক কথায় সকলদিক্ বজায় রহিল! আর খৃষ্টানী কোন সংস্পর্শের ভয় রহিল না! চারিদিকে জয়োল্লাশের বিরাট করতালি পড়িল অনায়াসে ধর্ম্মরক্ষা হইল! আনন্দে, বিরাট আনন্দে যে যাহার পদ্ম কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন! মাঠে প্রতিধ্বনি বলিতে লাগিল! জয় ভারতের জয়!

সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা।

সম্প্রদায় বিশেষে কাণ্ডারির আদর সমধিক। যাঁহারা প্রকৃষ্ট সিদ্ধ, (spiritualist) এ solid দেহকে অনায়াসে গাছে চড়াইয়া চতুঃসাগর ভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ইহার মর্য্যাদা বুঝেন। যাঁহারা দিবারাত্র solid হইতে liquid, liquid হইতে gas এবং ক্রমে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সত্বায় উঠিবার প্রয়াসে আফিমের সাধনা করেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থ মর্ম্মগ্রাহী। solid আফিম ধূমে পরিণত হইলে কাণ্ডারি ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম হওয়া বড়ই কঠিন। সেইজন্য আমাদের সচ্চিদানন্দ রঘুনাথ আকের চিবা পাইলে মহাপ্রসাদের মত কদর্য্য স্থান হইতেও কুড়াইয়া খান। কখন চিবা শুষ্ক বোধ হইলে ক্ষেপককে কৃপণ বলিয়া দারুণ গালি বা অভিশাপ প্রদান করেন। তাঁহার মতে সরশ চিবা ফেলাই লোকের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। একটুও রস না রাখায় মহাপাপ। শুনিতে পাই গবর্মেণ্ট পক্ষে ইনি নাকি অপিয়ম কমিসনে একজন প্রধান সাক্ষিই ছিলেন। জানি না, বলিতে পারি না। নূতন বর্ষের সম্মানতালিকা না দেখিয়া কোন মীমাংসাই করা যায় না। রঘুনাথের মতে আফিম অমৃত বিশেষ। এই বিপুল প্রাচীন ভারতভূমি এখনও আফিমের জোরে বাঁচিয়া আছে,নতুবা এতদিন কবে চারিদিকের সমুদ্রের জোলো হাওয়ায় সংক্রামক জ্বর বা উদরাময়ে মরিয়া যাইত। আফিমের ধূমে বায়ুর নাকি ওজন (ozone) বাড়িয়া থাকে।

নাম সম্ভ্রম।

নূতন লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা ভক্তি সহকারে গোলাপি কাণ্ডারির অনুসরণ করে। পরে সামান্য ইক্ষুর এতবড় জমকাল নামে হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহারা ভাবে কলিকাতার

ব্যাপারই স্বতন্ত্র। এখানে নামে ডাকে গগণ ফাটে। বস্তুতঃ ইটি তাহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি। বহুদর্শীতার অভাব পরিচায়ক। ইক্ষু সরস সারবান পদার্থ; সুতরাং নামের ভড়ঙে আরও সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু জগতে কত নাম আছে—সম্ভ্রম আছে, পদার্থ নাই; তাহা কে গণনা করিতে পারে? কত রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর, ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়ের অস্তিত্ব সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। টাইটেলের বস্তার জাবদা ও খতিয়ান রাখিয়াও কত কৃতমহাপুরুষ সমাজে ভেরেণ্ডা ভাজিয়া থাকেন। যশ ভাগ্যাধীন ব্যাপার। ইচ্ছায় হয়ওনা, করাও যায় না। লর্ড বাইরণ ঠিক বলিয়াছেন, "আমি একদা প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম যশস্বী হইয়াছি।" বস্তুতঃ যখন হয়, তখন এইরূপই হয়। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় যে ইরুমেতর, নিমুখানসামা, গুরিয়ামা, পাঁচী ধোবানী, ইহার সাক্ষ্যস্থল। লোকের মানসিক ভক্তি ফলমাকারে পথে পথে আপনি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আজ সেই কীর্ত্তিস্তম্ভের জন্য কত রাজারাজড়া পিতৃমাতৃদায়ের মত লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও কৃতকার্য্য নহেন। নাম একটা মহাভাগ্য। কোথাও গুণে হয়, কোথাও দোষে হয়, কোথাও কেন যে হয় তাহা বলা যায় না।

নূতন কর।

সেদিন পাওনিয়রের "ঘরের সংবাদদাতা" নাকি লিখিয়াছেন যে অচিরাৎ ভারত-মহাসভায় কাণ্ডারির উপর কর সংস্থাপন সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি পঠিত হইবে। গবর্ণ-মেণ্টের প্রাইভেট খবরের পক্ষে পায়নিয়র authority বিশেষ। সুতরাং একথা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। বিলাতী বস্ত্রাদিতে কর স্থাপিত হইলে যে টাকা আমদানি হইত, ইহাতে তাহার চতুর্গুণের প্রত্যাশা আছে। কারণ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সে জানা যায় যে এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বস্ত্রাদি অপেক্ষা কাণ্ডারির কাট্‌তি অধিক। বিশেষতঃ যে দেশে মদ, চা, সোডা, প্রভৃতির খরচ অল্প, তথায় কাণ্ডারির যে ভয়ঙ্কর আবশ্যক তাহার আর দ্বিরুক্তি নাই।

টাইম্‌সের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা তদ্দর্শনে মহা ব্যগ্রভাবে ও সাতিশয় eloquently ঘরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে আফিমের মত কাণ্ডারির চাষ ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা উচিত। ইহা আফিম অপেক্ষা লভ্যজনক অথচ কমিসন বসিবার ভয়শূন্য। তিনি অনেক ডাক্তার ও ইন্‌জিনিয়রের মত পত্রস্থ করিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার ও ইন্‌জিনিয়র সভ্য জগতের দুই হাত। কাণ্ডারির গাঁট নাকি বনিয়াদে দিলে ড্যাম্প নিবারণ হয় এবং ভালরূপ পরিপক্ক হইলে কাণ্ডারিতে বাঁসের কার্য্যও হইতে পারে। ইহার রসে রেক্তার গাথুনি ও পঙ্কের কাজ অতি পরিপাটি হইতে পারে। গুড়ে ভালরূপ মেহগ্‌নির

আঁস ফেলা যায়। অধিকন্তু কাণ্ডারি চর্ম্মকারক ঘর্ম্মকারক, বিরেচক পিত্তনাসক, পুষ্টিকর, তুষ্টিকর, ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্টের হাতে করিবার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ এই যে ইহার রসে ভিনিগর প্রস্তুত হয়, সুতরাং আবগারী আইনের অধীনে আসাই ন্যায্য।

নব আবিষ্কার।

শুনিতে পাই লঙ্কাসায়ারে নাকি একজন দ্বিতীয় এড়িসন্ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার আবিষ্কৃত কলে কাণ্ডারি ফেলিয়া দিলে এক দিকে ভিনিগর এবং অপর দিকে ঢাকাই কাপড় বুনিয়া বাহির হইতেছে। কাণ্ডারির রস খাইয়া খোয়ায় তুলা ধুনিয়া ভারতে কাপড় করিয়া পাঠান বড় সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। তথাকার তন্তুবায়-সমিতি কাণ্ডারির উপর করস্থাপনের কথায় একবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি বাবাজীর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ উলুবনের তাঁতি নহে! তাঁহারা বড় বড় ডাক্তার ও এন্‌জিনিয়ারের মত সংগ্রহ করিয়া "টাইমসের কলিকাতা সংবাদ-দাতাকে" বড়ই অপ্রতিভ করিয়াছেন। সংগৃহীত মতে কাণ্ডারি সর্ব্ব রোগের মূল। ইহার সহিত বহুমূত্রের বিশেষ সংশ্রব। ড্যাম্প নষ্ট হওয়া দূরের কথা, ইহাতে কাদা হয়, বাদাবন হয়; সুতরাং ম্যালেরিয়ার ভিত্তি। ভারতে অনাবৃষ্টির কারণ সুন্দরবনের শোভা নষ্ট নহে; কাণ্ডারির আধিক্য। ইহা দ্বারা ভূবায়ুর জলকণা অপহৃত হইয়া থাকে। কাণ্ডারিতে ঘোড়া কিছু মোটা করে বটে; কিন্তু The nation of racers কখনই ইহার পক্ষপাতী হইতে পারে না। কারণ মোটা ঘোড়া রেসে কোন কাযেরই নহে। ভারত গবর্মেণ্ট মহা বিপাকে পড়িয়াছে। অনারেবল মেম্বার্সদের প্রশ্ন পটকায় প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। এবার ভারতে সাদা কাল একমত একপ্রাণ হইয়া এক-তানে সাদা কালর (in black and white) গৃহে (Home) তোটকচ্ছন্দে হাঁকুলি বিকুলি (agitation) করিবেন। জয়! ভারতের জয়! চাই গোলাপি কাণ্ডারি!!

আকর্ষণী শক্তি।

কাণ্ডারির লোকাকর্ষণী শক্তি কাহারও অবিদিত নাই। মধ্যাকর্ষণী শক্তির ন্যায় ইহা লোকগুলাকে "হড় হড় হড়ে" টানিয়া থাকে। রামলীলায় যাও, কাণ্ডারি; রথে, চড়কে, গাজনে, টাউনহলের মিটিংএ, কাণ্ডারি। মিউনিসিপ্যাল আফিসের দ্বারে, ছোট বড়

আদালতের চাতালে, পুলিসের চারি ধারে কাওয়ারি বিরাজমান। বেলুনে, প্যারেডে, দ্বাদশ-গোপালে, খড়দহর রাসে, বড়বাজারের দোলে, রামকৃষ্ণের মহোৎসবে, একজিবিসনে, ফ্লাওয়ার শোএ, ঠাকুর বিসর্জ্জনে, বারওয়ারি পূজায়, বিবাহের প্রোসেসনে কাওয়ারি সারি সারি অগ্রণীভাবে দেদীপ্যমান দেখা যায়। যত্র অগ্নি তত্র ধূম ; ধূম হইতে অগ্নির অনুমান অপরিহার্য্য। যথায় জনতা তথায় কাওয়ারি ; সুতরাং কাওয়ারি হইতে জনতার অনুমানও স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ অনুমানে cow-killing riotএর মূলে কাওয়ারি বই আর কি হইতে পারে ? গাছে মাটির তদন্তের জন্য সন্ন্যাসী ফকির না ধরিয়া একটা বড় বাজারের মোটা গোছের কাওয়ারিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিলে এত দিন কবে ইহার সটীক রহস্য ভেদ হইত। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এবং সামান্য অনুমানে বোধ হয় সিপাহী-বিদ্রোহ অবধি তলাইয়া দেখিলে কাওয়ারি পাওয়া যায়। কথায় বলে, "কাওয়ারি বিহনে তরী" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাওয়ারি ব্যতীত লড়াই-হাঙ্গাম দূরের কথা সামান্য নৌকাখানাও চলে না। বোধ হয় ইংরাজি canard কাওয়ারি কথারই অপভ্রংশ। তাহা হইলে Scientific Frontier একটি সরস কাওয়ারি। রুষ মধ্য এসিয়া সভ্য করিতেছে, উদ্দেশ্য গোলাপি কাওয়ারি। ভারতের পদপ্রান্তে ফ্রান্স তোষদান, বন্দুক, বারুদের শ্রাদ্ধ করিতেছে এবং তার সঙ্গে শ্যামবাসীদেরও শ্রাদ্ধ হইতেছে, উদ্দেশ্য গোলাপি। তাই বলি কাওয়ারি সকল গোলমালের অমূল-মূল।

মাহাত্ম্য।

আহা ! গোলাপি কাওয়ারির কি সুমধুর নাম ! কি চিত্তাকর্ষণী মহিমা !! কি অপার অতল প্রভাব !!! কি অতুল অপরিসীম শক্তি !!!! পারি আর নাহি পারি, বেচি আর নাই বেচি, কিনি আর নাই কিনি, একবার 'গোলাপি কাওয়ারি' বলিয়া জিহ্বার ক্ষোভ মিটাই—জীবন সার্থক করি। যখন ঘোর বর্ষাকালে অপার চিৎপুর রাস্তা ক্লার্ক সাহেবের প্রতিভায় ক্ষীরদ সমুদ্র হইয়া পড়ে এবং পালভরে বিশাল ট্রামগাড়ি হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে তখন গোলাপি কাওয়ারির উচ্চ নাম শ্রবণ করিয়া কাহার না হৃদয়ে ভবকাওয়ারির বল ও ভরসা উছলিয়া উঠে ? তখন মাভৈঃ মাভৈঃ করিয়া আশা মায়াবিনী দৌড়াদৌড়ি করিয়া সকলের কাণে কাণে যেন বলিয়া যায় "পার হইলেও হইতে পার"। যখন দারুণ গ্রীষ্মকালে ওষ্ঠাগতপ্রাণ রেপ্রেজেনটেটিভ বা chosen কমিসনর বেচারা উদরস্থ বক্তৃতা উদ্গার করিতে না পারিয়া খেই হারাইয়া ছাই গিলিতে থাকেন, তখন অদূরে গোলাপি কাওয়ারির মধুমাখা নামে কি যে আনন্দ তাহা কি অন্যে অনুভব করিতে পারে ? যখন প্যারেড, রিভিউ বা নবাগত লাট দেখিতে গিয়া ক্ষীণায়ু বায়ুগ্রস্ত বাঙ্গালি ভিড়ে পেশিত বা পুলিষ সন্তাড়িত হইয়া

ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ও খড়ি উড়া দন্তে প্রাণ হাতে করিয়া পলায়ন করেন, তখন গোলাপী কাণ্ডারীর যে কি অপরিসীম মহিমা তাহা তাঁহারই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন ঘরমুখো ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর পরিশ্রান্ত কেরাণী বাহাদুর আফিসে লাঞ্ছিত হইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে সকল পথ মাড়াইয়া অদৃষ্ট খেয়াইয়া চলেন, তখন গোলাপি কাণ্ডারির স্বর্গীয় যে নাম তিনিই অনুভব করিতে পারেন। যখন পাহারাওয়ালা ঘুমন্ত স্বপ্নের মত দ্বারে দ্বারে আস্তাবোলে, খিলির দোকানে গুড়ুক টানিয়া ঘুম ছাড়াইতে থাকে, এবং মরিমারি করিয়া রোঁদে "খবর আচ্ছা খোদাবন্দ" বলিতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম মনে করে, তখন কাণ্ডারির অপ্সরাকণ্ঠগীতিবৎ নামে তাহার হৃদয়ে সুধাসমুদ্র ঢালিয়া দেয়। যখন দারুণ নিদাঘের দ্বিপ্রহর বেলায় ঘরের পয়সা দিয়া সুসভ্য ইংরাজ রাজ্যে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে প্যাক্ হইয়া "পানি পাঁড়ের", মোহন মূরতি অদর্শনে বিরহবেদনা উপস্থিত হয় এবং মনস্তাপে শুষ্ক জিহ্বা গলায় ঢুকিয়া যায় তখন কাণ্ডারির সুধাময় নামে কে না তন্ময় হইয়া যায়? যখন লাটসভায় peoples champion গ্রীবা বাঁকাইয়া কোন অত্যাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া রাজপুরুষদিগকে অপ্রতিভ করিবেন ভাবিয়া লম্ফ ঝম্ফ করেন, পরে 'মুড়ি খাই ত খাই" উত্তরে আহত হইয়া লেজ মুখে করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন পৃষ্টপোষকেরা আশায় সারি সারি বসিয়া আছেন তখন যে তাঁহার সাংঘাতিক পিপাসা হয়, তাহা কাণ্ডারির অমৃত রস ব্যতীত কি নিবারিত হইতে পারে? যখন বিএ পাশ জামাই কিনিবার জন্ম ভিটস্থ ঘুঘুস্থ হইয়াও গাত্র হরিদ্রার দিন অভরস্তি-পেট পূজ্যপাদ বেয়াই প্রভুর হাতে মার খাইয়া কন্যাকর্ত্তা বেচারি বিবাহভঙ্গ প্রযুক্ত রাগে, ক্ষোভে, যাতনায়, ঘৃণায় শুষ্ক কলিজায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন কন্যাপ্রসবিনী গৃহিণী তাঁহাকে কাণ্ডারি ব্যতীত আর কি দিয়া সান্ত্বনা করিতে পারেন? যখন একমাত্র পুত্রের লেখাপড়ার জন্য পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন ও পুত্র হাইকোর্টের ওকালতী পাশ করিবামাত্র গৃহলক্ষ্মী পুত্রবধূ ড্যামেজ মাল বৃদ্ধ শ্বশুরকে গৃহ হইতে খেদাইয়া দেন এবং সেই বিনাইটেড ওল্ড্ ফুল পরদ্বারে "হা কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ" করিয়া উদরান্নের জন্য মাথা কুটিতে থাকেন, তখনই তাঁহার গোলাপি কাণ্ডারির প্রেমময়ভাব চিত্তফলকে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যখন তীরস্থ মুমূর্ষুর পাপ প্রাণ বাহির হইয়া বৈতরণীতে খেয়া দিতে ইতস্ততঃ করিয়া বিলম্ব করে এবং আত্ম অন্তরঙ্গেরা সেই ভীরুতায় নিতান্ত ব্যথিত হয়, তখন কাণ্ডারি ব্যতীত এই দুস্তর ভবসাগরে কে আর পার করিতে পারে? এরূপ পাপতাপহারী কাণ্ডারির গুণ কীর্ত্তন করিতে স্বয়ং পঞ্চানন্দ পঞ্চমুখে অপারগ, আমরা ক্ষুদ্রাশয় একমুখো মানুষ আর কি করিতে পারি?

সদারঙের খেয়াল।

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্মমত।

(শেষ প্রস্তাব)

৫। মুসলমান ধর্ম্মের নৈতিক এবং আনুষ্ঠানিক অংশ।

মুসলমান ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যদিও এই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার বাহ্যানুষ্ঠানের বিরোধী তথাপি কর্ম্মশীলতা বিষয়ে ইহা কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা উদাসীন নহে। অন্য ধর্ম্মে যাহাই হউক, কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহারা অভীষ্টপথে অগ্রসর হইয়াছে মুসলমানধর্ম্ম তাহাদিগের জন্য স্বর্গপথ উন্মুক্ত করিয়া রাখে।

যে যুগে ও যে কুসংস্কারান্ধ অসভ্যজাতির মধ্যে কোরাণ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহার তুলনায় কোরাণের নীতির আদর্শ অতি উচ্চ। এমন কি কোন কোন বিষয়ে উদার এবং সুপবিত্র খৃষ্টীয়নীতি অপেক্ষা ইহা কোন অংশে হীন নহে। কোরাণের দ্বিতীয় সুরা, ১৭২ অংশ পাঠ করিলে অতি উন্নত ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, পাঠকের অবগতির জন্য আমরা রডওয়েল সাহেবের অনুবাদিত কোরাণের উক্ত অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"পূর্ব্ব বা পশ্চিমে মুখ ফিরাইলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, কিন্তু সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, শেষদিন, দেবদূত, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদিগের প্রতি যাঁহার অবিশ্বাস নাই, যাঁহার ভগবদ্ভক্তি তাঁহার স্বজাতিগণের মধ্যে, অনাথ ও আর্ত্তদিগকে, ভিক্ষুক এবং ফকিরবর্গকে ধনদানে উন্মুখ করে এবং যিনি ক্রীতদাসদিগের মুক্তি পণ্যদানে সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত। যিনি উপাসনা করেন, ব্যবস্থানুরূপ ভিক্ষা প্রদান করেন, যিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেন ও রোগী, পরিশ্রান্ত এবং বিপন্ন ব্যক্তিগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন, যিনি ন্যায়পর এবং ধর্ম্মভীরু।"

মুসলমানদিগের আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য পাঁচভাগে বিভক্ত:—১ম কালিমা পড়িয়া ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের কথা স্বীকার করা (সাহাদৎ); ২য়, উপাসনা (সলাৎ, নমাজ); ৩য় উপবাস (রুজা); ৪র্থ ভিক্ষাদান (জাকাৎ); ৫ম, তীর্থ দর্শন (হাজ)।

প্রত্যহ পাঁচবার উপাসনার নিয়ম; প্রত্যেকবার উপাসনা করিবার পূর্ব্বে হস্তপদ ধৌত করা বিধেয়, এমন কি উপাসনার সহিত এই নিয়ম এমনি বিজড়িত যে ইহাকে "উপাসনার চাবি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।* উপাসনার ভাষা আরব্য। হিন্দুদিগের দেবপূজার উদ্বোধনে যেমন 'সঙ্কল্প' আছে, মুসলমানদিগেরও উপাসনার পূর্ব্বে সেইরূপ "সংকল্প"

আছে, ইহাকে "নিয্যাত" বলে। ঈশ্বরের নিরনব্বই টি বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করাও ধার্ম্মিক মুসলমানগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কার্য্য, এইরূপ নাম জপকে 'জিকর' বলে।

রমজানের মাসে 'রুজা' অর্থাৎ উপবাস করিবার নিয়ম। সূর্য্য মধ্যাকাশ পরিত্যাগ না করিলে কোন আহার্য্যদ্রব্য এমন কি একবিন্দু জল পর্য্যন্তও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। রমজান প্রায়ই গ্রীষ্মকালে পড়িয়া থাকে, প্রবল গ্রীষ্মে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিলে এবং পিপাসায় তালু শুষ্ক হইলেও কাহারও বিন্দুমাত্র জলপানে অধিকার নাই।

ভিক্ষাদান মুসলমান ধর্ম্মের একটি অবশ্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ভিক্ষার অর্থ—"ঈশ্বরে অর্পিত ঋণ"—এই ভিক্ষাই দাতাদিগকে নরক হইতে উত্তোলন করিয়া স্বর্গপথে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কথিত আছে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে মুসলমান ধর্ম্মের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়; আতুরগণের প্রতি যত্ন করা মুসলমান ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীগণের প্রতিও মহম্মদের যত্ন এবং অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে মুসলমান ধর্ম্মে পশুদিগকে পরকালের অংশভাগী করা হয় নাই বটে।

যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য এবং অর্থবল আছে, তাহাদিগের জীবনে অন্ততঃ একবারও মক্কা দর্শন করা উচিত; কিন্তু এই তীর্থভ্রমণের মধ্যেও বিবিধ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় কাবা মসজিদকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, কৃষ্ণপ্রস্তরখণ্ড চুম্বন করা, জোড় পাহাড়ের ভিতর দিয়া সাতবার আনাগোনা করা ও প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীগণ এই ধর্ম্মের কঠোর সমালোচনার অবসর প্রাপ্ত হন।

যাহা হউক একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত প্রাচীন কুসংস্কার দেশের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল মহম্মদ সে সমস্ত অপবিত্রতা বিদূরিত করিতে পারেন নাই এবং যে যুগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহাতে সেরূপ কার্য্য করাও যথেষ্ট পরমাণে অসম্ভব ছিল, এমন কি তাঁহাকেও কিয়ৎ পরিমাণে এই সকল সাধারণ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইয়াছিল। তিনি কাবা মন্দিরের অপবিত্রতা বিদূরিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে তাহার প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিতে হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় মহম্মদ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উপর বিশেষ বীতস্পৃহ ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষাসূচক কোন প্রকার প্রাথমিক সংস্কারই ছিল না, পরে তিনি বাপ্তাইজ করাই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন কিন্তু অবশেষে তিনি এই প্রথার পরিবর্ত্তে ত্বকচ্ছেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

তথাপি ইহা অবিসংবাদিতরূপে সত্য যে মহম্মদের মনুষ্যসুলভ বিবিধ দোষ সত্ত্বেও তিনি একজন অতি উচ্চশ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বহুবিবাহ প্রথা এবং দাস ব্যবসায় বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। তিনি ঐ সকল কুপ্রথা দমনের জন্য কোন

প্রকার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে পাবেন নাই। হয়ত তাঁহার মনোবৃত্তি এ চিন্তা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারে নাই যে এই সকল সুবিধা ত্যাগ করিয়া সমাজ কিরূপে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহাতে এই সকল কুপ্রথার আর বৃদ্ধি না হয় এজন্য তিনি অনেক কঠোর এবং সুশৃঙ্খল নিয়মের অনুষ্ঠান করেন, এবং শিশু হত্যা, মাদক সেবন, দ্যূতক্রীড়া, প্রভৃতি নিবারণের জন্য তিনি সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের কৃতজ্ঞতা লাভের পাত্র।

৬। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। মহম্মদ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানগণ ভিন্ন ভিন্ন ৭৩ অংশে বিভক্ত হইবে।

মুসলমানগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—শিয়া, সুন্নি এবং ওহাবি। তুর্কী, ইজিপ্সিয়ান, আরব, এবং ভারতীয় মুসলমানগণ সুন্নি। পারস্যবাসীগণ অধিকাংশই শিয়া। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব আরবের অধিবাসীগণ ওহাবি সম্প্রদায়ভুক্ত। পারস্যে এখন অনেক সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান দৃষ্টিগোচর হয় এবং যে সকল দেশে সুন্নি অধিবাসী অধিক সেখানেও অনেক শিয়া বাস করে। শিয়া ও সুন্নির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, সুন্নিরা মহম্মদের শ্বশুর আবুবেকর এবং ওমার ও তাহার জামতা ওস্মানকে খালিফ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহারা সুন্নার (শ্রুতির) ভাষ্যকার হানিফা, বালিক, সফিয়াই ও হনবল এই চারিজন ইমামকে মান্য করিয়া থাকেন এবং সুন্নার আদেশ শিরোধার্য্য করেন।

শিয়া সম্প্রদায় কেবলমাত্র মহম্মদের জামাতা আলিকেই খালিফ বলিয়া স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁরা দ্বাদশজন ধর্ম্মগুরুকে (ইমাম) শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। ইহাদের মধ্যে আলি, হাসেন, হুসেন এবং আবু কাশেম প্রধান। আবু কাশেম শেষ ধর্ম্মগুরু, ইহাঁর অপর নাম ইমাম মেহেদী (অর্থাৎ ঈশ্বর পরিচালিত ধর্ম্মগুরু।) ইনি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন বলিয়া মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস। কথিত আছে ইনি ২৫৮ হিজিরা সালে বোগদাদের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর তিরোধানের ব্যাপার রহস্যপূর্ণ এবং জনরব প্রলয়কালে ইনি পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইবেন। এক্ষণে শিয়াদিগের কেহ ধর্ম্মোপদেষ্টা নাই তবে "মস্তাহি"গণ (ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত) যে উপদেশ ও ব্যবস্থা প্রদান করেন শিয়ারা তদনুসারেই চলিয়া থাকেন।

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা আলিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দান করেন এবং তাঁহাকে "ওয়ালি" এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, "ওয়ালি" অর্থে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি।" শিয়া সম্প্রদায় আবার বত্রিশ বিভিন্ন দলে বিভক্ত, ইহাদের অধিকাংশই আলিকে মহম্মদের অপেক্ষাও উচ্চ সম্মান দান করে।

শিয়া সুন্নি সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মভাবের সহিত মহরমে যোগ দেয়। মহরমের দশমদিনে আদম ও ইভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই উপলক্ষে সুন্নিরা উক্তদিন বিশেষ সংযমের সহিত যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু শিয়ারা এই দশদিনই আলির দেহপাত ও তৎপুত্র হাসেন

ও হুসেনের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য শোক করিয়া থাকে। জনৈক মুসলমান লেখক প্রণীত বিষাদসিন্ধু নামক পুস্তকে মহরমের শোচনীয় কিন্তু হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কৌতূহলী বঙ্গীয় পাঠক সেই পুস্তক পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হাসেন শত্রুর পরামর্শে তাঁহার স্ত্রীকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন; এবং হোসেন বাহাত্তরজন আত্মীয়ের সহিত বোগদাদের নিকটবর্ত্তী কার্ব্বালাক্ষেত্রে উমজাদ খালিফের পুত্র এজিদ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন।

মক্কায় কাবা মসজিদ দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা ভিন্নও শিয়ারা কার্ব্বালায় হুসেনের সমাধি দর্শন উপলক্ষে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে। শিয়াগণ সুন্নি সম্প্রদায় অপেক্ষা চিন্তাশীল এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, কোরাণের বাক্যার্থ অপেক্ষা ভাবার্থকেই অধিক আদর করিয়া থাকে। উপাসনা কালে অঙ্গভঙ্গি করা সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখা যায়। নমাজ করিবার সময় সুন্নিরা বক্ষস্থলের উপর ভাজ করিয়া হাত রাখে, শিয়ারা সরলভাবে নামাইয়া দেয়। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকার দার্শনিক মত বিদ্যমান আছে, এই নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বকে 'সুফী' মত বলে, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের বেদান্ত দর্শনের অনুরূপ।

ওহাবি সম্প্রদায় অত্যন্ত আধুনিক; কিছুকম দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি এই দল সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য আবদুল ওহাব এই নামে সম্প্রদায়ের নামকরণ করেন। ইহারা সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানিকতার বিরোধী এবং মহম্মদের অনুচরবর্গ যে সকল উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা ভিন্ন অন্য কাহারও উপদেশ গ্রহণ করেনা, কিম্বা ইমামদিগের প্রতিমূর্ত্তি এবং পীরদিগের 'দরগা' যে পুণ্য সঞ্চয়ের সোপান এ কথাও স্বীকার করে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্রতার পরিসর বৃদ্ধি করাই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ইহারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং খৃষ্টিয়ান 'ক্রুসেডের' ন্যায় 'জেহাদ' অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের বিশেষ পক্ষপাতী।

ভারতীয় মুসলমানগণ অধিকাংশই সুন্নি, ইহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। সৈয়দ মোগল, পাঠান ও সেখ। সৈয়দগণ মহম্মদের বংশাবলী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং হিন্দুর নিকট ব্রাহ্মণের যেরূপ শ্রেষ্ঠতা, মুসলমান সমাজে ইহারাও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সৈয়দদিগের সাধারণ উপাধি সৈয়দ বা মির।

ভারতবর্ষে যে সকল তাতারবংশীয় মুসলমান সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ মোগল বলিয়া খ্যাত ইহাদিগের উপাধী মির্জ্জা বা বে। পাঠানগণ আফ্‌গানবংশ সম্ভূত, ইহাদিগের উপাধি খাঁ। এই সকল মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানগণ যাহারা পূর্ব্বে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল কিন্তু দিগ্বিজয়ী মুসলমানদিগের পরাক্রমে, কৌশলে অথবা প্রলোভনে বশীভূত হইয়া পৈত্রিক ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহারা এবং তাহাদের বংশধরগণ "সেখ" নামে আখ্যাত। তবে এমনও দেখা যায় অনেক সেখ অতি সম্ভ্রান্তবংশে বিবাহ করিয়া উচ্চ বংশগৌরব লাভ করিয়াছে। আবার অনেক সেখ

হলাঙ্গল টানিয়া বা মোট বহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে কিন্তু তাহার সহোদর ভ্রাতা হয়ত নীলকুঠিতে গোমস্তাগিরি লাভ করিয়া বিশ্বাস বা মণ্ডল উপাধি মণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে অনেক অপবিত্রতা, পৌত্তলিকতা এবং বহুবিধ কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। অনেক স্থলে বিসূচিকা বা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইহারা ওলা-বিবি ও শীতলাদেবীর পূজা করিয়া থাকে এবং হিন্দুমন্দিরেও তাহাদিগকে মাথা ঠুকিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই, এই সকল মুসলমানের পূর্ব্ব পুরুষ নিঃসন্দেহ হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন; আমি রাজসাহিতে অনেক পুরাতন দলিল পত্রাদিতে দেখিয়াছি অনেক মুসলমান ব্রহ্মত্ব সম্পত্তির অধিকারী। জানিতে পারা গিয়াছে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন—মুসলমান শাসনকালে তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়াও অনেকে পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহার বা সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বে অতি সহজে জাতিপাত হইত; একালে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান গোপনে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিয়া হিন্দুত্বের অসার অংশের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হিন্দুর জাতি মারিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অল্প কারণে জাতি চ্যুতি ঘটিত। সুতরাং ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও তাহারা চিরাভ্যস্ত লোকাচার পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। এদিকে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাহার উপরও তাহারা তেমন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিত না আবার নূতন ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার অনুষ্ঠানও তাহারা ছাড়িতে পারিত না; ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ইহারা দুর্গোৎসবের সময় নূতন কাপড় পরিয়া দলে দলে পূজা বাড়ীতে প্রতিমা দেখিতে যায় এবং দেবমহিমার নিকট প্রণত মস্তকে আপনার কাতর প্রার্থনা জানায়, আবার বকরিদের সময় হিন্দুমন্দিরের নিকট গো-বধ করিবার প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারে না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভুল।

গেছে চলে ঘুম ঘোর,
তবুও পরাণ মোর
রয়েছে স্বপনে ভোর
কেন গো এমন ?
সে যদি গিয়েছে চলে
কি জানি কি মন্ত্রবলে
কেন তার স্মৃতি ছলে
দেখায় স্বপন ?
তাহার সে হাসি রাশি
কেন কেড়ে নেয় আসি
আমার মুখের হাসি ?
কম্পিত অধর !
কেন আনে অন্ধকার
নয়নের জ্যোতি তার ?
আঁখি হতে অশ্রুধার
ঝরে ঝর ঝর !

বুঝিনা কোনটি মায়া
কোনটি সত্যের কায়া
হৃদয়েতে আলো ছায়া
রচে দুজনায়।
তাই স্বপ্নে ভোর থাকি
হৃদয় মাঝারে ঢাকি
দোঁহে একসাথে রাখি
স্নিগ্ধ স্নেহ ছায়।
দুটি মিলে খেলা করে
আমার প্রাণের ঘরে ;
একে রাখি অন্য তরে,—
দুই বুঝি ভুল !
ভুলিতে পারিনা তারে,
পারিলেও চাহিনারে,
তাই বুঝি স্বপ্ন ভারে
পরাণ আকুল !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

চক্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশীনাথ এবং শ্রীপতি বাল্যবন্ধু। শ্রীপতি ধনীর সন্তান, সচ্চরিত্র, বিদ্যানুরাগী। কাশীনাথ তাহার স্বজাতি কিন্তু দরিদ্র সন্তান। লক্ষ্মী যাহার প্রতি বিমুখ, বাণী তাহার প্রতি অনেক সময় সদয়। কাশীনাথ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তর্ককুশল, জ্ঞানপিপাসু; স্বভাব উদ্ধত এবং গর্ব্বিত। শ্রীপতি এবং কাশীনাথ অনেক সময় একত্রে শাস্ত্রপাঠ করিত। বিদ্যা ও চিন্তার প্রথম গৌরবে কাশীনাথ সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত করিত। শ্রীপতির চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব হইত, কাশীনাথের ন্যায় অল্পে বিচলিত হইত না। যৌবনের উদ্দাম চঞ্চলতাবশতঃ উভয়ে নানা প্রসঙ্গে তর্ক করিত, নানা স্থানে ভ্রমণ করিত, নানা বিষয়ে চিন্তা করিত। সংসারের প্রবেশ দ্বারে এই উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চলতা সর্ব্বদা লক্ষিত হয়।

একদিন কাশীনাথ শ্রীপতিকে কহিল, "দেখ, একটা নূতন কথা মনে হইতেছে। আইস, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া পালাই।"

শ্রীপতি কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন, পলায়ন করিবার কারণ? পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব।

"আরে, সত্য কি আর পলাইব! দুই চারি দিন নিরুদ্দেশ হইয়া কোথাও চলিয়া যাই, আবার ফিরিয়া আসিব।"

শ্রীপতি কহিল, "বাড়ীর সকলকে ভাবাইবার আবশ্যক কি? বলিয়া গেলেই ত হইবে যে দুই চারি দিনের জন্য বেড়াইতে যাইতেছি।"

কাশীনাথ কহিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"সঙ্গে পাথেয় লইয়া যাইব না। পথে যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই দিনাতিপাত করিতে হইবে।"

শ্রীপতি কহিল, "এ কথা ভাল।"

এই কথা স্থির করিয়া একদিন দুইজনে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধু ভাগীরথী তীরে উপনীত হইল। নিকটে গ্রাম নাই, কোন দিকে লোকালয় দেখিতে পাওয়া যায় না। পথজনিত শ্রান্তি এবং ক্ষুৎপিপাসায় দুইজনে কাতর।

অন্ধকার হইয়া আসিল। অন্ধকারে নদীর জল অন্ধকার হইল, জলে নক্ষত্র বিম্বিত হইল, চারিদিক নিস্তব্ধ হইল, কেবল সময়ে সময়ে নদীতীরে বালুকায় টিট্টিভের রব শ্রুত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে নদীতীরে দূরে আলোক দেখা দিল। সেই আলোকের নিকট-বর্ত্তী হইয়া শ্রীপতি ও কাশীনাথ দেখিল তীরে একটী নৌকা লাগিয়াছে। নৌকারোহীগণ চড়ায় নামিয়া পাকের আয়োজন করিতেছে। আরোহীদিগের সংখ্যা বিস্তর নহে।

নৌকার সমীপবর্ত্তী হইলে যষ্টিধারী দুইজন দরওয়ান অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন হ্যায় ?"

কাশীনাথ কহিল, "ভয় নাই। আমরা ডাকাত নই।"

এই কথা শুনিয়া আর এক ব্যক্তি নিকটে আসিল। অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পলিত কেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?"

শ্রীপতি কহিল, "আমরা অতিথি।"

বর্ষীয়ান সন্দিহানের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বেশ ত ভিক্ষুকের মত নহে ?"

সস্মিত মুখে শ্রীপতি কহিল, "আমরা ভিক্ষুক নহি, ভদ্রসন্তান। ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহ হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, নিকটে গ্রাম নাই। রাত্রে উপবাসী থাকিতে হয় বলিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

যুবকদ্বয় দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে দরওয়ান দুইজন সতর্কভাবে দাঁড়াইয়াছিল। বালুকার উপর যে স্থানে পাকের উদ্যোগ হইতেছিল বৃদ্ধ সেই দিকে গমন করিলেন। এক বর্ষীয়সী রমণী পাক করিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া দুইটী কিশোরী পাকের আয়োজন করিয়া দিতেছিল।

এই দুইজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হইয়াছে ? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে ?"

মামা বলিলেন, "দুইজন অতিথি আসিয়াছে। তাহাদের আহার হয় নাই, আহার করিতে চায়।"

দ্বিতীয়া কিশোরী কহিল, "এখানে অতিথি ? যদি ডাকাত হয় !"

বর্ষীয়সী কহিলেন, "তুই আর বকিস্‌নে, নির্ম্মলা! আহা, তারা খেতে পায়নি, তাই এসেছে। তা বেশ হয়েছে, আমি এই ভাত চড়াচ্চি। প্রভা, আর দু মুটো চাল দে, আর গোটা দুই আলু ছাড়িয়ে দে, ভাতে দেব। তুমি তাদের মুখ হাত ধুয়ে বস্‌তে বল। আমরা ব্রাহ্মণ তাদের বলেছ ত ? জিজ্ঞাসা কর ত কি জাতি।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, অতিথি দুইজন স্বজাতি। অতিথিকে আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

আহার প্রস্তুত হইলে শ্রীপতি ও কাশীনাথ আহার করিতে বসিল। বালুকার উপর শাল পাতায় অন্ন; আলু আর মুগের ডাল ভাতে, বেগুন পোড়া, আলুর একটা ডান্‌লা। ক্ষুধার্ত্ত পথিকদ্বয়ের মনে হইল যেন এমন উপাদেয় সামগ্রী তাহারা কখনআহার করে নাই। তাহাদের মুখে রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিয়া বৃদ্ধা পুলকিত হইলেন। মনে করিলেন, গরিবের ছেলে, নহিলে এই সামান্য সামগ্রী খাইয়া এত সুখ্যাতি করিবে কেন?

নির্ম্মলা ও প্রভাবতী দূরে বসিয়া গা টিপাটিপি করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল।

প্রভাবতীর মাতুলের নাম নিরঞ্জন। নিরীহ ভাল মানুষ, কিছু ভীতস্বভাব। আহারান্তে অতিথিদ্বয়কে তাম্বুল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমরা কোথায় যাইবে?"

শ্রীপতি কহিল, "নিকটেই কোন গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

অতিথি দুইজন বিদায় হইল। নিরঞ্জন দরওয়ানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে দুইজন অতিথি আসিয়াছিল, ইহাদিগকে ভাল মানুষ বোধ হইতেছে। তবু সাবধান থাকা ভাল। তোমরা পালা করিয়া রাত্রি জাগিও, খবরদার ঘুমাইয়া পড়িও না।"

দরওয়ানেরা ভ্রুকুটীকুটিল মুখ চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "মামা বাবু, আপ বেফিকির রহিয়ে। চোর ডাকু আওয়েগা তো কেয়া ভাগ যায়গা? উন্‌কা টাঙ্গ তোড় দেঙ্গে।" বলিয়া হাতের লাঠি সবলে বালুকায় প্রোথিত করিল। ভাব এই যে বালুকায় লাঠি পোঁতা আর ডাকাতের পা ভাঙ্গা এই বীরপুরুষদিগের পক্ষে সমান সুসাধ্য। তাহাদের কথা শুনিয়া এবং হস্তমুখের ভঙ্গী দেখিয়া নিরঞ্জন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

দরওয়ানেরা প্রত্যেকে তিন পোয়া আটার রুটী, দুইটা বেগুনের চোখা, আর সাড়ে চারিটা লঙ্কা খাইয়া আল্‌গোচে দুই ঘটী জল খাইল। তাহার পর দোক্তা এবং চূণ মিশাইয়া খইনি খাইতে খাইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। নাবিক দুই চারিজন পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল।

বয়সের গুণে বা বিগুণে নিরঞ্জন মৌতাতী লোক। এরূপ পথে বাহির হইলে মাত্রা একটু বাড়িত। তিনি তামাকু দুই এক ছিলিম বেশী খাইলেন; খানিক ক্ষণ কাসিলেন; খানিক ঢুলিলেন; অবশেষে অহিফেনের দিব্য নেশার সঙ্গে তন্দ্রা আসিল। নৌকায় একটা কামরার মত ছিল। স্ত্রীলোকেরা তাহার ভিতর শয়ন করিয়াছিল।

দরওয়ানেরা বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। একজন একটা বৈশাখী বিরহ গায়িল— "বেরি বেরি যালে সঁইয়া পূরবি বণিজিয়া।" দ্বিতীয় দরওয়ান, বনওয়ারী সিং, গায়িতে জানিত মন্দ নয়। লছমন তেওয়ারীর ভগ্ন, কদর্য্য কণ্ঠ শুনিয়া, গলা ছাড়িয়া, জল কাঁপাইয়া গায়িল, "পিয়া কি আওয়ন কি ভই রে বেরিয়াঁ, সঁইয়া দরওয়জওয়া ঠাঢ়ি রহুঁ!" লছমন্ তেওয়ারী গান শুনিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "ভইয়া, পহেলা পহর তুম জাগো। হম তো জরা করওয়ট্ ফের লেওয়েঁ।"

তেওয়ারীর উদরে রুটি জীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

গানের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া বনওয়ারী সিং বড় স্ফূর্ত্তিতে ছিল, কহিল, "কোই চিন্তা নহি, তেওয়ারী জি, ময় বয়ঠা হুঁ, তুম সো যাও।"

বলাও যেই তেওয়ারী জীও সেই নিশ্চিন্ত হওয়া। বনওয়ারী সিং গায়িতে লাগিল, তেওয়ারীর নাসাধ্বনি তাহার গানের সঙ্গে ভাঙ্গা বেসুরা তানপূরার মত বলিতে লাগিল। ক্রমে তানপূরাটাই প্রবল হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল। শেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বনওয়ারী সিং আর দুই একবার গায়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা খুলিল না। দুই চারিবার ঢুলিল, অবশেষে পা ছড়াইয়া শয়ন করিল। নৌকার উপর নানাবিধ নাসিকাগর্জ্জন ভিন্ন অন্য শব্দ রহিল না।

নৌকাতলে জল ঠেকিয়া অতি মধুর, তন্দ্রাকর্ষক, পত পত ছল ছল শব্দ হইতেছিল। কখন নৈশ পক্ষীর রব, কখন বৃক্ষপত্রে নৈশ সমীরণের সর সর গতি।

নৌকা হইতে অদূরে, এক প্রাচীন বটবৃক্ষতলে শ্রীপতি ও কাশীনাথ শয়ন করিয়াছিল। গভীর রাত্রে কাশীনাথের অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল, মনে হইল যেন কোথায় একটা শব্দ হইতেছে। মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিল, মুখ চাপিয়া ধরিলে মনুষ্য যেরূপ অস্ফুট কাতরোক্তি করে সেইরূপ শব্দ শোনা যাইতেছে। শ্রীপতির অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সে উঠিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

কাশীনাথ শ্রীপতির অধরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া, চুপি চুপি কহিল, "চুপ করিয়া শোন।"

দুইজনে শুনিতে লাগিল। নৌকা হইতে শব্দ আসিতেছে। সেই কাতরোক্তির পর এক ব্যক্তির ভীতিবিহ্বল চীৎকার, তাহার পর রমণীর আর্ত্তকণ্ঠ, তাহার পর কর্কশ, গম্ভীর স্বর, তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

শ্রীপতি লম্ফ দিয়া উঠিল। কাশীনাথও তাহার দেখাদেখি উঠিল। শ্রীপতি কহিল, "আইস!"

কাশীনাথ শ্রীপতির স্কন্ধে হস্ত দিয়া কহিল, "আমরা গিয়া কিছু করিতে পারিব? আমরা মোটে দুই জন, তাহাতে একেবারে নিরস্ত্র। গিয়া কিছু ফল হইবে?"

শ্রীপতি কহিল, "সে কথা বিচার করিবার কি এই সময়? আমরা উহাদের অন্ন খাইয়াছি, আর যদি নাই খাইতাম তাহা হইলে কি দাঁড়াইয়া উহাদের বিপদ দেখিতাম? কাশীনাথ, তোমার মুখে এমন কথা আমি কখন শুনি নাই।"

দুই বন্ধু গৃহ হইতে এক এক গাছি ছড়ি লইয়া বাহির হইয়াছিল। তাহারা না কি একেবারে শূন্যহস্ত, এজন্য তাহাদের দস্যুভয় ছিল না। কাশীনাথ শ্রীপতির ব্যগ্রতা দেখিয়া কহিল, "তবে আইস। ছড়ি হাতে লও। কোন কাজে না আইসে ফেলিয়া দিও। একটীও কথা কহিও না, নীরবে আইস। যেরূপ দেখা যাইবে সেইরূপ করা যাইবে।"

দুইজনে নীরবে, বেগে নৌকার অভিমুখে গমন করিল। দুই জনই বলবান, ব্যায়ামপটু, সাহসী। নৌকায় উঠিয়া দেখিল চারিটা কৃষ্ণকায়, বিকটাকার পুরুষ দরওয়ান দুইজনকে

বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে, দরওয়ানেরা সাধ্যমত বল প্রকাশ করিতেছে। নিরঞ্জন দূরে বসিয়া কাঁপিতেছেন। নাবিকেরা ভয়ে জড়সড় হইয়া একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আর একটা কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মনুষ্য বলপূর্ব্বক কামরার দ্বার ভাঙ্গিবার উপক্রম করিতেছে।

শ্রীপতি গিয়া এই ব্যক্তিকে ধরিল। সে বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কেরে ?" তাহাকে বল প্রকাশের অবকাশ না দিয়া শ্রীপতি তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিল।

চীৎকার শুনিয়া আর চারিজন দস্যু ফিরিয়া চাহিল। শ্রীপতি ও কাশীনাথ তখন তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। দরওয়ানেরা হতবুদ্ধি হইয়া, আগন্তুক দুই ব্যক্তিকে দস্যু বিবেচনা করিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। শ্রীপতি এবং কাশীনাথ তাহাদের নিকট কোনরূপ সহায়তা পাইল না। দরওয়ানদিগের নিকট তাহাদের লাঠি পড়িয়া ছিল। কাশীনাথ একটা লাঠি তুলিয়া লইল। শ্রীপতি তাহার দেখাদেখি আর একটা লাঠি তুলিয়া লইল। দস্যুদিগের মাথায় দুই চারি ঘা পড়িতেই তাহারা জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহাদের মনে হইতেছিল বহুসংখ্যক লোক আসিয়াছে। যে দস্যুকে শ্রীপতি জলে ফেলিয়া দিয়াছিল সে আবার আসিয়া নৌকা ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার কালো মুণ্ড দেখিয়া শ্রীপতি তাহার মাথায় লাঠি ঘুরাইয়া মারিল। দস্যুরা তখন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। নৌকা নিষ্কণ্টক দেখিয়া দরওয়ান দুইজন উঠিয়া শ্রীপতি ও কাশীনাথের হস্ত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া পলাতক দস্যুদিগের উদ্দেশে গালি দিতে দিতে লাঠি আস্ফালন করিতে লাগিল। শ্রীপতি ও কাশীনাথ হাসিতে হাসিতে নৌকার উপর বসিয়া পড়িল।

তেওয়ারী জী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কেঁও বাবু, হাস্‌তা হ্যায় কেঁও ?"

নিরঞ্জন অতিথি দুই জনকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহারাই ডাকাতের সর্দ্দার। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "বাবা, দোহাই তোমাদের আমাদের কাছে কিছু নাই। এই সন্ধ্যার সময় তোমরা আহার করিয়া গেলে, তার পর— বাবা—আমি কিছু জানি না।"

কাশীনাথ হাসিয়া কহিল, "সে কি, মহাশয়, আমাদের কি ডাকাত মনে করিতেছেন না কি ? এই যে আপনাদের সম্মুখে তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম।"

কামরার ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠ আসিল, "মামা, উঁহারাই ত আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। উঁহাদের বল যে এ উপকারের শোধ আমরা জন্মে দিতে পারিব না।"

তখন নিরঞ্জনের চৈতন্য হইল। তিনি বিস্তর বাগাড়ম্বর করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে যুবকদিগের নাম ধাম জানিতে পারিলে রাজধানীতে উপনীত হইয়া কিছু পুরস্কার পাঠাইয়া দিবেন।

বীণা ঝঙ্কারের ন্যায় রমণীকণ্ঠ শুনিয়া নিরঞ্জনের কথায় শ্রীপতির ক্রোধ অথবা বিরক্তি হইল না। উঠিয়া কহিল, রাত্রি অল্পই অবশিষ্ট আছে, আর কোন আশঙ্কা নাই। এখন আমরা বিদায় হই।"

নিরঞ্জন উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, না, এখন যাইও না। এখনও রাত্রি আছে, এখনও অনেক আশঙ্কা। যদি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ ত সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নৌকায় থাক।"

বৃদ্ধা ভিতর হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "এখন উঁহাদিগকে যাইতে বারণ কর। আমাদের বড় ভয় করিতেছে। কাল সকালে যেন আহার করিয়া যাওয়া হয়।"

তাহার পশ্চাৎ অন্য স্বরে আর একজন বলিল, "আমাদের সকলেরই ভয় করিতেছে উঁহারা এখন যেন না যান।"

শ্রীপতি ও কাশীনাথ উপবেশন করিল। শ্রীপতি কহিল, "তবে আমরা এখন আর যাইব না। কাল প্রাতেই যাইব।"

নিরঞ্জন তখন নিশ্চিন্ত হইয়া দরওয়ানদিগের উপর ধমক চমক করিতে লাগিলেন—"নিমকহারাম, পেটুক, বিভীষণের মত খাইবে আর কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইবে। একটা রাত্রি জাগিতে পারে না।" বিভীষণ যে অত্যন্ত পেটুক ছিলেন এটা নিরঞ্জনের নিজের কল্পনা।

অবশিষ্ট রাত্রি বসিয়াই কাটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইলে নিরঞ্জন দেখিলেন শ্রীপতি ও কাশীনাথ যথার্থ ভদ্র সন্তান বটে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহারাও রাজধানী যাইতেছে। কহিলেন, "আমাদের সঙ্গে চল না।"

শ্রীপতি কাশীনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাদের কোন অসুবিধা না হয় ত আমাদের কোন আপত্তি নাই।"

শ্রীপতি ও কাশীনাথ নৌকা হইতে নামিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাককার্য্য শীঘ্র সমাধা হইয়া গেল। যে স্থানে নৌকা লাগিয়াছিল সে স্থান হইতে রাজধানী এক বেলার পথ। বেলা অধিক না হইতে যাত্রা করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছিবার সম্ভাবনা।

প্রভাবতী ও নির্ম্মলা কাননবাসিনী, তাহাদের, বিশেষ প্রভাবতীর বড় লজ্জা ছিল না। শ্রীপতি ও কাশীনাথ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। সন্ধ্যার সময় নৌকা রাজধানীর সম্মুখে লাগিল। শ্রীপতি ও কাশীনাথ নিরঞ্জনের সঙ্গে অদ্বৈতপ্রসাদের গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিল।

পরদিবস শ্রীপতি নিরঞ্জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। শ্রীপতি যে এত ধনবান নিরঞ্জনের প্রথমে তাহা বিশ্বাস হয় না। এমন ধনীর সন্তান হইয়া শ্রীপতি

ভক্ষুকের মত বেড়াইতেছিল কেন? শ্রীপতি কহিল, "এমন করিয়া না বেড়াইলে কেমন করিয়া আপনার সহিত আলাপ হইত?"

নিরঞ্জন কহিলেন, "তোমরা না থাকিলে আমাদিগকে রক্ষা করিতই বা কে?"

নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া নিরঞ্জন অদ্বৈতপ্রসাদকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। নৌকার ঘটনাটা অলঙ্কারবাহুল্যে আর একরূপ হইয়া দাঁড়াইল। পত্র পড়িয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে দস্যুদিগকে দেখিয়া নিরঞ্জন ভয় পাইয়াছিলেন। দুই বন্ধুর গুণ এবং শ্রীপতির ঐশ্বর্য্যও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল। উত্তরে অদ্বৈতপ্রসাদ লিখিলেন, আমার কর্ত্তব্য নিজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু এখন যাওয়া আমার পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। তাঁহারা বেড়াইতে ভালবাসেন; এ স্থান নির্জ্জন, রম্য, শান্তিপূর্ণ। তাঁহারা যদি একবার এখানে আসেন ত আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুখী হই!"

এই পত্র নিরঞ্জন শ্রীপতিকে দেখাইলেন। শ্রীপতি একটু চিন্তা করিয়া, কিছু লজ্জিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি এখানে কিছুদিন থাকিবেন?"

নিরঞ্জন কহিলেন, "না, এই দুই চারিদিনের মধ্যে ফিরিয়া যাইব। আমি কিন্তু আবার এখানে চলিয়া আসিব।"

"আপনারা সকলে?"

"না, আমি একা। আর সকলে সেইখানে থাকিবেন।"

শ্রীপতি অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আপনি লিখিবেন যে তাঁহার দর্শনসৌভাগ্য-লাভের জন্য আমরা শীঘ্রই যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিবস অপরাহ্ণকালে রাজধানী হইতে কয়েক ক্রোশ দূর্ব্বে কাশীনাথ একাকী ভ্রমণ করিতেছিল। নিকটে যে দুই একখানি গ্রাম ছিল, তাহাতে প্রবেশ না করিয়া শস্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিল। ক্ষেত্রের সম্মুখ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী কিছু বেগে বহিতেছিল। কাশীনাথ অন্য মনে কখন শস্যশীর্ষের দিকে, কখন নদীর জলের দিকে, কখন পশ্চিমাকাশে চাহিয়া গমন করিতে করিতে একটা গ্রাম্য পথের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইল। গ্রামের লোক আবশ্যক মত সেই পথ দিয়া নদীর ধারে যাতায়াত করে।

পশ্চাতে অশ্বক্ষুরের শব্দ শ্রবণ করিয়া কাশীনাথ ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, একটা অশ্ব অত্যন্ত বেগে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী বালক, কোন মতে অশ্বকে

সংযত করিতে পারিতেছে না। কাশীনাথ অশ্বের পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। অশ্ব সেইরূপ বেগে আসিয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া, জল দেখিয়া একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইল। আকৃষ্ট ছিলা হইতে মুক্ত হইলে শর যেরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হয়, বালক সেইরূপ বেগে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জলে নিক্ষিপ্ত হইল। জলে পড়িবামাত্র অদৃশ্য হইল।

বালক কোথায় ডুবিল কাশীনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তৎপরে কিছু দূর ধাবিত হইয়া পাদুকা ত্যাগ করিয়া জলে প্রবেশ করিল। এই সময় বালক ভাসিয়া উঠিল। কাশীনাথ সন্তরণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া তীরে তুলিল। দেখিল বালক সংজ্ঞাশূন্য। জলে অতি অল্পক্ষণ নিমজ্জিত ছিল, অধিক জল পান করে নাই, কিন্তু ভয়ে, জলপতনের বেগে, এবং নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে। বালকের বয়স অনুমান ত্রয়োদশ বৎসর, বেশ ধনীর সন্তানের ন্যায়। কাশীনাথ বালককে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া গ্রামের অভিমুখে চলিল। কিছু দূর গমন করিয়া দেখিল গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক লোক কোলাহল করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। কাশীনাথের আর্দ্র বস্ত্র এবং তাহার স্কন্ধে মৃতকল্প বালককে দেখিয়া তাহারা মনে করিল বালক ডুবিয়া মরিয়াছে। কয়েকজন রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

কাশীনাথ কহিল, "কোন ভয় নাই। বালকের মূর্চ্ছা হইয়াছে, এখনই চৈতন্য হইবে। ইহাকে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?"

কয়েক ব্যক্তি আসিয়া বালককে বহন করিতে উদ্যত হইল। কাশীনাথ কহিল "আমি ইহাকে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতেছি, তোমরা পথ দেখাইয়া চল।"

কিছুদূর গিয়া কাশীনাথ দেখিল সম্মুখে এক সুবিস্তৃত প্রাসাদ। কয়েক ব্যক্তি তাহার সঙ্গে প্রাসাদের অভিমুখে চলিল, আর সকলে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রাসাদের ভিতরেও অত্যন্ত গোলযোগ। একজন প্রবীন পুরুষ অস্থির হইয়া কাশীনাথের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বাঁচিয়া আছে কি?"

কাশীনাথ অনুমান করিল ইনিই গৃহস্বামী এবং বালকের পিতা। কহিল, "কোন চিন্তা করিবেন না, মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এখনই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে।"

বালকের আর্দ্র বস্ত্র খুলিয়া, তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া, কাশীনাথ তাহার চৈতন্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইল। অল্পক্ষণেই বালক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিল।

তখন কাশীনাথ শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া বালকের পিতাকে কহিল, "আর কোন ভয় নাই। অল্প দুগ্ধ আহার করাইলে ভাল হয়। এখনই নিদ্রা আসিবে।"

কাশীনাথ গমন করিতে উদ্যত হইল। গৃহস্বামী কহিলেন; "সে কি কথা! বিপ্রদাস!"

কাশীনাথের সমবয়স্ক এক যুবা পুরুষ সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আজ্ঞা!"

"ইহাকে কাপড় ছাড়াইয়া আহারাদি করাও। আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যেন চলিয়া না যান।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া বিপ্রদাস কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া আপনার ঘরে লইয়া গেল।

কথাবার্ত্তায় কাশীনাথ জানিল গৃহস্বামীর নাম গৌরীশঙ্কর; যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি আছে, নিজে সে সম্পত্তি বাড়াইতেছেন। বিপ্রদাস এবং গুরুদাস দুই পুত্র। বিপ্রদাস উপযুক্ত হইয়া পিতার নিকট বিষয় কর্ম্ম দেখিতে শিখিতেছে।

আহারের সময় গৌরীশঙ্কর স্বয়ং আসিয়া কাশীনাথের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকেরা দ্বারের এবং গবাক্ষের অন্তরাল হইতে কাশীনাথকে দেখিতে লাগিল। অলঙ্কারের শিঞ্জন এবং মৃদু কথোপকথন শব্দ অনেক বার কাশীনাথের শ্রবণে গেল। গৌরীশঙ্কর রাত্রে কোন মতে কাশীনাথকে ছাড়িয়া দিলেন না। প্রভাতে যাইবার পূর্ব্বে কাশীনাথকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ, তুমি আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছ। এখন হইতে তুমিও আমার পুত্রতুল্য। তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; অর্থাভাবে যদি ভবিষ্যতে কোন ব্যাঘাত হয় ত আমাকে তোমার পিতৃস্থানীয় বিবেচনা করিবে। শীঘ্রই তোমার ভাল কর্ম্ম করিয়া দিব, কিম্বা আপনি কর্ম্ম শিখাইব। এই গৃহ তোমার গৃহ জানিবে। যেমন বিপ্রদাস তেমনি তুমি।"

কাশীনাথ কহিল, "আপনি আমায় অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি বিষয় কর্ম্মে আমার অভিরুচি নাই। আমার জন্য আপনি কেন অনর্থক কষ্ট স্বীকার করিবেন?"

গৌরীশঙ্কর সুচতুর, বহুদর্শী। কাশীনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "অর্থ-[ল]ালসা নাই? উত্তম কথা। বিষয়বাসনা নাই রহিল? ধন লোভ ত্যাগ করিলে কি কোন কামনা [থ]াকে না? যশের আকাঙ্ক্ষা আছে ত, কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত নিষ্কাম নিষ্ঠা থাকা উচিত।"

কাশীনাথ কহিল, "তাহাও বলিতে পারি না। কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কিছুতেই যেন [বি]শ্বাস হয় না।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সে কথা আরও ভাল। তোমার সহিত আমার মনের ভাব [অ]নেক মিলে। আবার শীঘ্র আসিও, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

কাশীনাথ প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় হইল। অঙ্গীকার মত আবার আসিল, আবার [পূ]র্ব্বের ন্যায় সমাদরের সহিত সকলে অভ্যর্থনা করিল। দিন কয়েক এইরূপ যাতায়াত [ক]রিতে করিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। প্রতিবারেই গৌরীশঙ্কর কাশীনাথের সহিত [এ]কান্তে নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেন। একদিন অন্যান্য কথার পর গৌরীশঙ্কর [ক]হিলেন, "যদি বিষয় কর্ম্মে তোমার অনুরাগ না থাকে, আত্মজ্ঞানই যদি তোমার অভীষ্ট [হ]য়, তাহা হইলেও কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি রূপে? ইচ্ছা করিলে অতি মহৎ কর্ম্মে তুমি [আ]মার প্রধান সহায় হইতে পার। সে কর্ম্মে আমার স্বার্থ নাই, তোমার স্বার্থ নাই, অথচ [দে]শ শুদ্ধ লোকের স্বার্থ আছে।"

কাশীনাথ ব্যঙ্গের ভাব চাপিয়া রাখিয়া কহিল, "দেশোদ্ধার না কি?"

গৌরীশঙ্করের ঘন ভ্রুর তলে গম্ভীর চক্ষে আকাশপ্রান্তে অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় [আ]লোক জ্বলিল, আবার তখনি নিভিয়া গেল। কহিলেন, "আমাদের দেশে কথাটা [উপ]হাসব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ কি হাসির কথা? আমি প্রাচীন, আমার তেমন

উৎসাহ না থাকিতে পারে; কিন্তু যুবকের পক্ষেও কি ইহা বিদ্রূপের বিষয়? এমন কথা লইয়া কি ব্যঙ্গ করা যায়? আমাদের জাতিতে সেরূপ স্বার্থশূন্যতা নাই, তেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, সেরূপ নির্ভীকতা নাই বলিয়াই কি এমন বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করিতে হইবে? পুরুষানুক্রমে আমরা পদদলিত পরাধীন জাতি বলিয়াই কি জীবনের এরূপ মহৎ আদর্শ রহস্যের সামগ্রী হইবে? স্বদেশের উদ্ধার অসম্ভব বলিয়া কি সেই কথা লইয়া আমরা কৌতুক করিব? যে জাতির বংশধর বলিয়া আমরা গৌরব স্পর্দ্ধা করি সেই জাতির নিকট কি এই শিক্ষা পাইয়াছি? অসাধ্য সাধনই তাঁহাদের ব্রত ছিল, অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তির, তাঁহাদের জ্ঞানের, তাঁহাদের গৌরবের আমরা উত্তরাধিকারী, তাঁহাদের নিষ্ঠা, তাঁহাদের ঐকান্তিকতা, তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান চেষ্টা করিলে কি আমরা পাই না? আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের স্রোতে ত আমরা বিন্দু মাত্র। সিদ্ধি কি সর্ব্বদা করতলগত ফলের ন্যায়? সিদ্ধির মার্গ অবলম্বন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বান্তঃকরণে এক ব্যক্তি যদি এই মহৎ উদ্দেশে আপনার জীবন উৎসর্গ করে ত কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব ফল না ফলিতে পারে? তোমার মত স্বার্থশূন্য ব্যক্তি এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিলে আর কে করিবে? সাধারণ লোকের যে সকল প্রলোভন তোমার তাহা কিছুমাত্র নাই। অর্থের, পদমর্য্যাদার তোমার কোন লোভ নাই। তুমি পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুযত্নসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে নানাবিধ রত্ন আহরণ করিয়াছ। তোমার চিত্ত নির্ম্মল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, অধ্যবসায় দৃঢ়। কর্ম্মযোগী হইবার তোমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্র কে? যে কথা লইয়া মূর্খ, স্বার্থপর ব্যক্তিরা বিদ্রূপ করে তুমি তাহাই জীবনের লক্ষ্য কর, স্বদেশহিত ব্রত গ্রহণ কর।"

শুনিতে শুনিতে কাশীনাথের বক্ষ স্ফীত হইল, নিশ্বাস দ্রুত বহিল, চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় হইল। আবেগপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এই ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য একটী সম্প্রদায় আছে। তুমি সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হও। আমি আপাততঃ উহার অযোগ্য নেতা।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কাহারও নাম শুনিতে পাই?"

"এখন পাইবে না। কিছুদিন পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে। পরে সকল কথাই জানিতে পারিবে। আমার আশা আছে কালে তুমি আমাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইবে।"

কাশীনাথ কহিল, "আপনার কথাই স্বীকার করিলাম। এখন কি করিতে হইবে?"

গৌরীশঙ্কর উঠিয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহ হইতে এক খণ্ড কাগজ লইয়া আসিলেন। কহিলেন, "ইহাতে স্বাক্ষর কর, আমি সাক্ষী স্বরূপে স্বাক্ষর করিতেছি।"

কাশীনাথ স্বাক্ষর করিল। তখন গৌরীশঙ্কর বিপ্রদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইহাকে মন্দিরে লইয়া যাও।"

বিপ্রদাস কিছু বিস্মিত হইয়া পিতার প্রতি চাহিল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "ইনি দীক্ষিত হইয়াছেন।"

বিপ্রদাস আর কোন কথা না কহিয়া, কাশীনাথকে অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কেত করিয়া, অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। কাশীনাথও বিনা বাক্যে তাহার অনুসরণ করিল।

গৌরীশঙ্করের বৃহৎ অট্টালিকার সকল অংশ কাশীনাথ দেখে নাই। বিপ্রদাস প্রথমে অন্দরমহল পার হইল। আরও কয়েকটী প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া একটা দরদালানে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহ। চাবি দিয়া কবাট খুলিয়া বিপ্রদাস প্রথমে প্রবেশ করিল। তৎপরে গৃহের প্রাচীরে একটী দ্বার মুক্ত করিল। দ্বার অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নিঃশব্দে মুক্ত হইল। বিপ্রদাস বর্ত্তিকা জ্বালিয়া কাশীনাথকে কহিল, "সাবধানে আমার পশ্চাতে আইস।"

দ্বারপথে উভয়ে প্রবিষ্ট হইলে বিপ্রদাস পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল। বর্ত্তিকালোকে কাশীনাথ অস্পষ্ট দেখিতে পাইল সম্মুখে সোপানাবলী রহিয়াছে। বিপ্রদাস এবং কাশীনাথ সাবধানে সেই সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। পথ অন্ধকার, সঙ্কীর্ণ, কোন স্থানে মস্তক অবনত করিয়া গমন করিতে হয়। কাশীনাথের মনে হইল গৌরীশঙ্করের গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহারা অনেক দূর যাইতেছে। অবশেষে বিপ্রদাস একটী ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দ্বারও পূর্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত কঠিন, সেইরূপ নিঃশব্দে মুক্ত হইল। তাহারা প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হইল।

বিপ্রদাস বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করিল। কাশীনাথ দেখিল, অকস্মাৎ আলোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে উচ্চ, প্রশস্ত গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। গৃহের আয়তন বৃহৎ, উচ্চ গবাক্ষশ্রেণী হইতে দিবালোক আসিতেছে। গৃহের আকৃতি এবং সজ্জা দেখিয়া কাশীনাথ বিস্মিত, চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইল। হর্ম্ম্যতল মার্জ্জিত মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত। গৃহের প্রাচীরে চারিদিকে শিল্পকুশল চিত্রকরকৃত নানা বর্ণের নানাবিধ চিত্র। এক স্থানে সুরাসুরের যুদ্ধ, দূর হইতে মোহিনী অমৃতভাণ্ডহস্তে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন; আর এক স্থানে প্রাচীন উপনিষদের ইতিবৃত্ত—অগ্নি তৃণদাহনে এবং বায়ু তৃণগ্রহণে অশক্ত হইয়া, অভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মমূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া লজ্জাবনতমস্তকে দেবমণ্ডলী মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছেন, ইন্দ্র ব্রহ্মের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইতেছেন, বিদ্যারূপিণী উমা ইন্দ্রের অজ্ঞান দূর করিবার জন্য আর এক দিক হইতে আগমন করিতেছেন; বেদোক্ত আর্য্য এবং দস্যুদিগের যুদ্ধ অন্যত্র চিত্রিত রহিয়াছে—দস্যুগণ পরাজিত হইয়া দূরস্থিত পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিতেছে; ব্রহ্মচারী অর্জ্জুন ছদ্মবেশী পশুপতির সহিত বিচিত্র মল্লযুদ্ধ করিতেছেন; সভাস্থলে শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জনার্দ্দন সুদর্শনকে স্মরণ করিয়াছেন, প্রখর জ্বালারশ্মিতে সভামণ্ডল উজ্জ্বলিত করিয়া ঘূর্ণ্যমান চক্র বেগে শিশুপালের প্রতি ধাবিত হইতেছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ

যজ্ঞ করিতেছেন, চন্দনোক্ষিত মাল্যভূষিত অশ্ব নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আহূত পরাজিত নরপালগণ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; রাবণের বিপুল মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সীতাদেবী উত্থিত হইতেছেন, নিকটে অগাধ প্রেমপরিপূর্ণ কাতর লোচনে রামচন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; দ্রুপদের সভাতলে ব্রাহ্মণবেশধারী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেধ করিবার মানসে ধনুকে জ্যা রোপণ করিতেছেন, ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী এক হস্তে কমণ্ডলু অপর হস্তে কৃষ্ণাজিন লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন, ক্ষত্রিয়গণ হাসিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ঘৃণা কটাক্ষপাত করিতেছেন। গৃহতলে চারিদিকে সুনিপুন ভাস্করখোদিত বহুবিধ প্রতিমূর্ত্তি। একদিকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণের প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি—নবঘনশ্যাম কান্তি, লোহিত করতল, লোহিত পদতল; অন্যদিকে দ্বিভুজ শ্যামেন্দীবর শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি; গাণ্ডীবধারী দেবেন্দ্রতুল্য সব্যসাচী; ভীমকায়, ভীমগদাধারী ভীম; সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন; গন্ধমাদনবাহী অঞ্জনানন্দন; প্রাচীন, তেজস্বী ভীষ্ম ; ধীর প্রশান্তমূর্ত্তি যুধিষ্ঠির; যোগেশ্বর মহাদেব। গৃহের মধ্যস্থলে বিভূতিভূষিত, জটাজূটধারী তাপস মূর্ত্তি; তাহার পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদী। কাশীনাথ সবিস্ময়ে একে একে এই সব দেখিল। আরও দেখিল, প্রাচীরে, গৃহের কোনে, গৃহের পার্শ্বে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। খড়্গ, তরবারি, ত্রিশূল, বর্শা, ধনুক; একদিকে বহুসংখ্যক বন্দুক স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। পরে কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে হইবে?"

বিপ্রদাস কহিল, "তোমাকে একটী অস্ত্র লইতে হইবে। ধনুক ও বন্দুক ছাড়া যাহা তোমার ইচ্ছা লইতে পার।"

কাশীনাথ বাছিয়া একটী তরবারি লইল। কোষমুক্ত করিয়া দেখিল, অসি লঘু এবং শাণিত, লঘুহস্ত, শিক্ষিতকৌশল ব্যক্তির হস্তে প্রচণ্ড অস্ত্র। কহিল, "এই অসি লইলাম।"

বিপ্রদাস বলিল, "তবে এখন চল।"

"এখানে আর কিছু করিতে হইবে না?"

"আর কিছু না।"

বিপ্রদাস দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তিকা জ্বালিল। সেই অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া উভয়ে ফিরিয়া চলিল।

বিপ্রদাস অগ্রে, কাশীনাথ তাহার পশ্চাতে যাইতেছিল। অন্দরমহল পার হইবার সময় কাশীনাথ দেখিল একটা দ্বারের অন্তরালে একটী রমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই দ্বারের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় রমণী হস্ত প্রসারিত করিয়া কাশীনাথের হস্তে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ দিল। চকিতের ন্যায় চক্ষে চক্ষে মিলিল—কাশীনাথ দেখিল রমণী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী। চকিতের ন্যায় রমণী আবার সরিয়া গেল।

বিপ্রদাসের অলক্ষ্যে, কটাক্ষে কাশীনাথ পাঠ করিল, "সাবধান! এ জালে পড়িলে আর মুক্তি নাই।" পত্রখণ্ড কাশীনাথ বস্ত্রমধ্যে গোপন করিয়া, মনে মনে হাসিয়া বলিল, আর সব জাল ছিঁড়িতে পারা যায়, রূপের জাল বড় বিষম!

গৌরীশঙ্কর বসিয়া কাশীনাথের অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাশীনাথের হস্তে অসি দেখিয়া কহিলেন, "উত্তম। পুরুষের অস্ত্রই এই।"

ক্ষণেক পরে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আর একটি কর্ম্ম আছে।"

কাশীনাথ কহিল, "বলুন।"

গৌরীশঙ্কর কহিল, "তোমার ঐ অসি দিয়া তোমার হস্তে একটী চিহ্ন করিতে হইবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, সুস্থ শরীরে আঘাত করিবার কারণ কি? ইহাও দীক্ষার একটী অঙ্গ। এই দেখ।"

গৌরীশঙ্কর আপনার বাহুমূলে খত-চিহ্ন দেখাইলেন। কাশীনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, চক্রবর্ত্তী চিহ্ন। গৌরীশঙ্কর বিপ্রদাসকে হস্ত দেখাইতে বলিলেন। বিপ্রদাসের বাহুমূলে কাশীনাথ ছত্রচিহ্ন দেখিতে পাইল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যে কর্ম্ম আমি স্বয়ং করিতে না পারি, অথবা পুত্রকে করিতে আদেশ না করিতে পারি সে কর্ম্ম তোমাকে করিতে বলিব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

কাশীনাথ গৌরীশঙ্করেব হস্তে অসি দিয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, "চিহ্ন করিয়া দিন।"

"কি চিহ্ন করিয়া দিব!"

"শূল চিহ্ন।"

অসি লইয়া গৌরীশঙ্কর কাশীনাথের বাহুমূলে, অত্যন্ত কৌশলের সহিত শূল চিহ্ন করিয়া দিলেন। কাশীনাথ যন্ত্রণায় শব্দ করিল না, মুখ বিকৃত করিল না, তাহার নেত্রপক্ষ্ম পর্য্যন্ত হেলিল না। চিহ্নান্তে বিপ্রদাস ক্ষতস্থানের উপর এক প্রকার প্রলেপ লেপন করিয়া দিল, তাহাতে শোণিত স্রাব বন্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন হইল।

গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমাতে আশাতীত গুণ-রাশি দেখিতেছি। তোমার ন্যায় শত জন যুবক পাইলে অল্প দিনেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি।"

গৃহে ফিরিবার সময় পথে কাশীনাথ সেই পত্র বারকয়েক পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। পত্রদাত্রী রমণীকে দর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল।

এই সকল কথা কাশীনাথ শ্রীপতিকে বলে নাই। পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে যাহা ঘটিতেছিল কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার অনিচ্ছা দেখিয়া শ্রীপতিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। ক্রমশঃ।

সৌর প্রতিকরণ

মানমন্দির ও তদভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি পরিদর্শন করিয়াছেন এমত লোক বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে এত অল্প বলিয়া অনুমান করা যায় যে ঐ সকল বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে যন্ত্রাদির আকারপ্রকার ও ব্যবহারাদি বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া পারা যায় না। এদিগে আবার জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের যে সকল গূঢ় রহস্য উদ্ভেদন জন্য ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার জ্ঞান ব্যতিরেকে যন্ত্রসমূহের ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে আমি গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দির পরিদর্শন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে যন্ত্রবিশেষের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমার কয়েকজন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করেন যে ঐ সকল প্রবন্ধ ক্রমশঃই 'দুরূহ হইয়া পড়িতেছে, তাহা পাঠ করিয়া আর সুখ অনুভব করা যাইতেছে না। মানমন্দির দর্শনে দুঃখ বিস্তর, বিপদের ত কথাই নাই,—কোনদিক হইতে কোন লৌহমুদ্গররূপী দূরবীক্ষণ দণ্ড স্খলিত হইয়া পিতৃমাতৃসুকৃতিফলে বহুপুণ্যার্জ্জিত মস্তকটী. চূর্ণ হইয়া যাইবে,—কাজ নাই এমন মানমন্দির দর্শনে শ্রবণে বা! এইরূপ দুঃখ বিপদের বর্ণনা, তাহার উপর আমার আজন্ম সঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ক উপলখণ্ড (সকল?) পাঠকবর্গের পরিদর্শনার্থ উন্মোচিত করা,—এতদ্দ্বারা কাহাকেও সুখ অনুভব করাইতে চেষ্টা করার ধৃষ্টতা আমার কখনও হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এ কারণ আমি আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই ভারতীর পাঠকদিগকে গ্রীণ্‌উইচ্‌ মানমন্দিরের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে* পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু ইত্যবসরে আমার অপর কয়েকজন বন্ধু ঐ নির্জ্জন গৃহে একটী অব্যব্হার্য্য "প্রতিফলক দূরবীক্ষণের" সাহচর্য্যসুখ পসন্দ না করিয়া তথা হইতে সত্বর নির্গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

হিংস্র জন্তু হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। পশুশালায় যাঁহারা পশু দর্শন করিতে গমন করেন তাঁহারা হিংস্রজন্তুদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে ভালবাসেন এবং পরিদর্শনকালে তাহাদিক হইতে আপনাকে বিশিষ্টরূপ ব্যবধান রাখিতে চেষ্টা করেন। মানমন্দির একটী ভীষণ পশুশালা; তথায় অতি সতর্কিতভাবে চলিতে হয়, আমি এ যাত্রায় পাঠকদিগকে হিংস্রপশুদিগের সন্নিধান হইতে যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা এই পাঠকগণ যেন ইহা স্মরণ রাখেন যে মানমন্দিরের পশু সকল মহিষজাতীয়,—যাঁহাকে ভয়চকিত দেখিতে পাইবে তাঁহাকেই তাড়না করিতে চেষ্টা পাইবে।

* গত চৈত্র (১৩০০) মাসের ভারতী দ্রষ্টব্য।

অতঃপর আমি যন্ত্রের আকার ও গঠন ইত্যাদি বর্ণনা যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সচেষ্ট থাকিব।

প্রতিফলক দূরবীক্ষণ পরিদর্শন করিয়া আমরা বিশেষ কিছুই জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই; কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে তাহা তখন অব্যবহৃত ছিল। ঐ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা মানমন্দিরের অপর এক অংশে প্রবেশ করিলাম। পথে যাইবার সময় মানমন্দিরের কার্য্যগৃহ (আফিস,—যে গৃহে মানমন্দিরের গণকগণ বসিয়া গণনার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে) হইয়া যাইতে হয়। তথায় দেখিতে পাইলাম কতকগুলি যুবক এক মনে গণনাতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা গণনার কলমাত্র,—যেন গণনার জন্যই তাহারা সম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এই টুকু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে অধিকাংশেরই মুখের গঠন ঠিক একরূপ বলিয়া মনে হইতেছিল, এবং বয়সও প্রায় এক বলিয়া অনুমান হইল। আমার সঙ্গী বন্ধুটী তাহাদের মুখ দেখিয়া এমন একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে তাহা শুনিয়া আমি অতি কষ্টে ঐ কার্য্যগৃহের নিস্তব্ধতাবিদারক উচ্চ হাস্য সংবরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমরা ঐ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার্থ মস্তক উত্তোলিত করিয়া আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; আমার বন্ধুটী অমনি বাঙ্গলাভাষায় বলিয়া উঠিলেন (অবশ্যই জনান্তিকে)—"ভাই, এই গণকের দল ফরমাইশ দিয়া গড়াইয়া আনা হইয়াছিল? তা নইলে সবগুলি এমন ছাঁচের তৈয়ারী হবে কি করে?"—আমি ইত্যবসরে গৃহটী পরিদর্শন করিতে করিতে তাহার এক কোণে দেখিতে পাইলাম একটী মাত্র প্রাণী বসিয়া আছেন যিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে উদাসীন বা পরাঙ্মুখ ছিলেন। তিনি একটী মহিলা, যুবতী গণক! এই নূতনত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই বোধ হয় আমি বন্ধুর কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিয়াছিলাম।

তথা হইতে আমরা যে গৃহে গমন করিলাম তাহাতে একটী যন্ত্র ছিল,—ইহার নাম "সৌর প্রতিকরণ যন্ত্র" Photo-heliograph। এই যন্ত্রদ্বারা, যে সকল দিবসে সূর্য্য মেঘমুক্ত থাকে সেই সকল দিবসে সূর্য্যের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

সৌর প্রতিকরণ যন্ত্র বৈষুব দূরবীক্ষণের ন্যায় একটী স্তম্ভোপরি স্থাপিত; তাহার গতিবিধি সমস্তই বৈষুবের ন্যায়। কেবল একটীমাত্র বিশেষত্ব ভিন্ন অপর সর্ব্ববিষয়ে ইহা বৈষুব হইতে কোন প্রকারে বিভিন্ন নহে;—সেই বিশেষত্ব এই যে বৈষুবের দূরবীক্ষণ হইতে "দৃষ্টিখণ্ডের" কাচ খসাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তথায় একটী "প্রতিকরণ যন্ত্র" ফটোগ্রাফিক ক্যামারা বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব দূরবীক্ষণের কেন্দ্রস্থলে দৃশ্যবস্তুর যে প্রতিবিম্ব সম্পাতিত হয় যাহা দৃষ্টিখণ্ডের কাচদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে প্রতিকরণ যন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, পরিবৰ্দ্ধিতাকারে দৃষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে, প্রতিকৃতি উৎপাদিত করিয়া থাকে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রীণ্‌উইচে যে সকল প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা দৃষ্টে জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত বৎসর ৩৬৫ দিবসের মধ্যে ৯৩ দিন মাত্র প্রতিকৃতি তুলিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, অবশিষ্ট ২৭২ দিবসে সূর্য্যকে এক মিনিটও সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত পাওয়া যায় নাই। এই ৯৩টী প্রতিকৃতির মধ্যে আবার ৩২টী অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কারণ প্রতিকৃতি গ্রহণের সময় বায়ুতাড়িত মেঘস্তবক আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল; অতএব সমস্ত বৎসরে ৬১টী মাত্র প্রতিকৃতি এরূপ পাওয়া গিয়াছিল যদ্দ্বারা কার্য্যসাধন হইতে পারে। মানুষের দুর্ভাগ্যের সীমা আয়ত্ত করা সহজ ব্যাপার নহে; এত চেষ্টা যত্ন ও এত আয়োজন করিয়া যে যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সামান্য বায়ুতাড়িত মেঘখণ্ড আসিয়া তাহার কার্য্যসাধনপথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইতেছে। মেঘের গতি নিয়মিত করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে, কাজেই এই যন্ত্রের ব্যবহার সাময়িক ব্যাপারে পরিণত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মতন স্থানে,—যেখানে মেঘমুক্ত সূর্য্য আবির্ভূত হওয়া 'মাহেন্দ্রক্ষণের' পরিচায়ক,—তথায় এই যন্ত্রের কার্য্য অতিশয় সঙ্কীর্ণ।

আবার ইহাও জানা যায় যে যেখানে দুর্ভাগ্য যত প্রবল, সেখানে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানবের চেষ্টা ও অধ্যবসায় তত অধিকতর,—যেখানে কার্য্যসাধন পথে যত বাধা, সেখানে ঐ বাধা অতিক্রমণের জন্য চেষ্টা তত অধিকতর। ইহাই মানবধর্ম্ম এবং ইহাই মনুষ্যত্ব! ল্যাটিন কবি Cicero বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি বা প্রাণী যতটুকু বাধা অতিক্রম করিয়া অন্তর্জ্জগতে অগ্রসর হইতে পারে ততটুকুকে তাহার "জীবন" বলা যায়।" কার্য্যসাধন, বাধা অতিক্রমণ,—অবশ্যম্ভাবী, ইহাই অধ্যবসায়ের লক্ষণ। তাহাকে স্থান এবং কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যাহা এক স্থানে সাধন করিতে হইবে; যাহা এক্ষণে সাধন করা যায় না তাহা কালান্তরে সাধিত হইবে। গ্রীণ্‌উইচে যে অত্যল্প সংখ্যকপ্রতিকৃতি পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না; কার্য্যসাধনতৎপর বৈজ্ঞানিক সমাজ এই স্থানগত বাধা অতিক্রম করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইংরাজদিগকে এইরূপ স্থাননির্ব্বাচন জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, কারণ ভারতে সূর্য্যের আবির্ভাবের অপ্রতুল নাই। গ্রীণউইচের অভাবপূরণ জন্য হিমালয়ের উপত্যকাপ্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি স্থলের মধ্যভাগে দেরাদুন নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র মানমন্দির স্থাপিত হইল। ইহার সৌর প্রতিকরণ বিভাগ গ্রীণউইচের শাখা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহা হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি উৎপাদিত হইয়া গ্রীণউইচে প্রেরিত হইয়া থাকে। যাঁহারা কখনও দেরাদুন গমন করেন তাঁহারা তত্রত্য জরীপবিভাগের শাখা আফিসের কোন কর্ম্মচারীর সাহায্যে অনায়াসে সৌর প্রতিকরণ যন্ত্র পরিদর্শন করিতে পারেন। এই যন্ত্রটী গ্রীণ্‌উইচের যন্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহাতে প্রত্যেকবার দুইটী করিয়া প্রতিকৃতি গৃহীত হয়, তাহার একটী ফরাশি রাজধানীতে 'পারিমানমন্দিরে' প্রেরিত হয়। গ্রীণ্‌উইচ্‌ প্রেরিত প্রতিকৃতি Royal Society এবং পারিতে প্রেরিত প্রতিকৃতির ব্যয়ভার French Institude বহন করিয়া থাকে।

পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে মান্দ্রাজে একটী মানমন্দির আছে, তাহা ভারত সাম্রাজ্যের স্বকীয় সম্পত্তি। তাহাতে সৌরপ্রতিকরণ বিভাগ নাই। এক্ষণে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে মান্দ্রাজ মানমন্দির ও দেরাদুন মানমন্দির উভয়কে একত্র করিয়া নীলগিরিতে স্থাপিত করা হইবে।

সূর্য্যের প্রতিকৃতিতে তাহাকে একটী গোলাকার বিম্বরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রঙ্গীন কাচ সহযোগে সূর্য্যের দিকে নেত্রপাত করিলে তাহার দেহকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া অনুভব করা যায়; কিন্তু দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহা প্রতীত হয় যে ঐ দেহ স্থানে স্থানে কালিমা দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কালিমার আকৃতি এবং প্রকৃতি কিছুতেই সর্ব্বেব একরূপ নহে। সৌরদেহে তাহাদের সংখ্যা এবং স্থিতিও সকল সময়ে একরূপ থাকে না। এই সকল পরিবর্ত্তনের ক্রম, কালিমা সমূহের স্বরূপ, এবং তাহদের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে সৌরদেহের ধারাবাহিক কালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া ইহা লক্ষিত হইয়াছে যে সৌরদেহকে বহুক্ষণ দূরবীক্ষণের দৃষ্টিক্ষেত্রের অন্তর্ভূত রাখিতে না পারিলে তাহার দেহে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ধারণার আয়ত্ত করা যায় না। এই সকল অসুবিধা বিদূরণ জন্য, এবং সৌরদেহের দিকে বহুক্ষণ নেত্রপাত করিয়া থাকিতে সক্ষম হইলেও তদ্দ্বারা দৃষ্টি শক্তির অবশ্যম্ভাবী অপচয় নিবারণ জন্য, সৌরপ্রতিকরণ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

এই প্রণালী অনুসারে যথাক্রমে বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরাপর একত্র মিলিত করিলে দেখা যায় যে, কালিমা সকল অধিকাংশ স্থলেই উত্তপ্ত ফেনবুদ্‌বুদের ন্যায় সৌরদেহে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে; অনেক স্থলে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহারা যেন অভ্যন্তর-ভাগ হইতে বাহিরের দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্দারা সহজেই ইহাদিগকে, সৌরদেহাবরণের তরলত্ব হেতু, আভ্যন্তরিক দুর্দ্দমনীয় উত্তাপের ফল বলিয়া প্রতীতি করা যায়। আবার কোনটা বা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইতে হইতে মিলাইয়া যায় এবং কোনটা প্রস্ফুটিত হইয়া বহুদিবস পর্য্যন্ত সৌরদেহে গহ্বরাকারে বিরাজ করিতে থাকে। এই সকল গহ্বর সময় সময় এত বৃহৎ হয় যে সহস্রাধিক পৃথিবী তাহার ভিতরে ফেলিয়া দিলেও তাহা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে না। ইহারা যতদিন সৌরদেহে অবস্থিতি করে ততদিন ঠিক এক স্থানে থাকে না; পরন্তু অল্পে অল্পে ক্রমশঃ বাম হইতে দক্ষিণদিকে অপসৃত হইতে থাকে, এবং দেহের দক্ষিণ প্রান্তে অপসৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে বামপ্রান্তে পুনরাবির্ভূত হয়। সকল কালিমা পক্ষে এই অপসরণ প্রণালী সাধারণ এবং সর্ব্বস্থলে উক্তরূপ আবর্ত্তন কাল এক সমান হওয়াতে ইহা প্রতীত হইয়াছে যে ঐ সকল কালিমা সম্বলিত সৌরদেহই উক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে নিয়ত আবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে, অর্থাৎ সূর্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবার করিয়া স্বীয় মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করিতেছে। এই বিঘূর্ণন কাল সৌর সপ্তবিংশতি দিবস বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা জানিতে হইবে যে সদাগতিশীল ধরাপৃষ্ঠ হইতে ঐ

বিঘূর্ণনকাল নিরাকরণ করা হইয়াছে। যদি ঐসময়ে ধরার স্বীয় কক্ষে গতি উক্ত সৌর বিঘূর্ণনের সহিত সমন্বয় করা যায় তবে দৃষ্ট হইবে যে সূর্য্য সৌর ২৫ দিবসে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডাবর্ত্তন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রতিকরণ প্রণালী কেবল যে সৌর রহস্য উদ্ভেদন জন্য ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নহে; ইহাদ্বারা অনেক নক্ষত্র পুঞ্জ ও নীহারমালার স্বরূপাবিষ্কৃত হইয়াছে। রবার্ট্‌স্‌ নামক জনৈক ইংরাজ জ্যোতিষী নানাবিধ নাক্ষত্রিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন; ইহার যাবতীয় আবিষ্ক্রিয়া একমাত্র প্রতিকরণ প্রণালীতে সাধিত। নাক্ষত্রিক প্রতিকরণ প্রবন্ধান্তরের আলোচ্য বিষয় হইবে।

শ্রী অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

সমুদ্র লঙ্ঘন।

দেবদৈত্যত্রাস রাক্ষসরাজ রাবণকে বধপূর্ব্বক জানকীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা নগরে প্রত্যাগত হইলে নাগরিকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বহুবিধ উৎসবে নগর পরিপূর্ণ হইল। কয়েক দিবস অতীত হইলে পরমভক্ত মহাবীর হনুমান যুক্ত করে শ্রীরামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

পবননন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, স্মিতমুখে জানকীবল্লভ কহিলেন, "বীর, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?"

হনুমান যথোচিত বিনয় সহকারে কহিলেন, "বহু দিন প্রবাসে বাস করিয়া একবার স্বদেশ দর্শন করিবার অভিলাষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে এই উৎসব আনন্দময়ী নগরীতে আমার কোন কর্ম্ম নাই। মহারাজের অনুমতি পাইলে কয়েকদিবস কিষ্কিন্ধ্যায় যাপন করিয়া পুনরায় মহারাজের নিকট আগমন করি।"

রাম সহাস্যে কহিলেন, "তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর। গমনকালে মৈথিলীর অনুমতি লইয়া যাইও।"

জানকীর নিকট অনুমতি লইবার কালে দেবী কৌতুক করিয়া হনুমানকে কহিলেন, "বৎস, তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া বিবাহ করিয়া বধূকে সঙ্গে লইয়া আসিও। তোমার বয়স অধিক হইতে চলিল, আর কত কাল অবিবাহিত রহিবে? তোমার কীর্ত্তি এবং

যশোরাশিতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিপূরিত সুরভিত হইয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই কোন সুন্দরী বানরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পার।"

হনুমান কহিলেন, "দেবি, আপনি কি জানেন না আমার হৃদয়ে রাম নাম শোণিত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে? সেই হৃদয়ে অপরকে গ্রহণ করিব? আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের দাস্য স্বীকার করিব, পরন্তু অপ্সরীতুল্যা বানরীর প্রতি কটাক্ষপাত করিব না। রামের সেবক আমি, আমি রামসর্ব্বস্ব, জয় রাম বলিয়া যে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছি। সংসারাশ্রমে কিরূপে অভিরুচি জন্মিবে?"

আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া জানকী কহিলেন, "ধন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ! তোমার সাধনা যেরূপ সিদ্ধিও তদনুরূপ। তুমি কিস্কিন্ধ্যাবাসীদিগের নয়ন পুলকিত করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তোমার অনুপস্থিতি কালে আর্য্যপুত্রের ও আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইবে।" অতঃপর সীতা হনুমানের মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হনুমান তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং রামের পাদবন্দনা করিয়া শুভ দিনে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর কিস্কিন্ধ্যা নগরে হনুমানের আগমন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইলে সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল। বানরশিশুগণ কিলকিলা রবে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বানরীগণ মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি করিয়া তাঁহার মস্তকে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। যুবকবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কেহ সুপক্ব কদলী লইয়া আসিল, কেহ তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। অবিবাহিতা যুবতী বানরীগণ পরস্পর কহিতে লাগিল, এই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ যে বানরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, বানরীকুলে সেই ভাগ্যবতী। হনুমান আনন্দিত হইয়া যথারীতি সকলকে সম্ভাষণ করিলেন।

কিন্তু নগরবৃদ্ধগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন না। তাঁহারা স্থবির, বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। কেহ বৃক্ষকোটরবাসী, কেহ বৃক্ষারোহণে অক্ষম হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করেন। নগরের বাহিরে গমনাগমন কাহারও ঘটে না। কেহ মহামহোপাধ্যায়, কেহ আচার্য্য, কেহ শাস্ত্রী, কেহ নৈয়ায়িক। তাঁহারা বালক যুবক এবং রমণীদিগের আচরণে রুষ্ট হইলেন। পর দিবস মহতী সভা আহূত হইল। হনুমান সেই সংবাদ অবগত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

সভা সমবেত হইল। বানর বানরীগণ সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। বালকেরা দূর হইতে সভয়ে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃদ্ধগণ আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র, চক্ষু কোটর গত, দংষ্ট্রা গলিত, চর্ম্ম লোল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, তাঁহাদিগের গতির অনুকরণ করিতে করিতে, বানর শিশুগণ কিচিমিচি শব্দে পলায়নপর হইল। অপর বানরগণ তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিল।

বৃদ্ধগণ আসন গ্রহণ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বৃদ্ধতম, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা উল্লুক ভট্ট সভার শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। শ্রোতাগণ অবহিতচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বাক্যবিন্যাস শ্রবণ

করিতে লাগিল। উল্লুক ভট্ট কহিতে লাগিলেন, "এই পুণ্যদর্শন কিস্কিন্ধ্যা নগরীতে হনুমান নামে এক বানরাধম বাস করিত। বানরকুলকলঙ্ক সেই পামর দেশান্তরে গমন করে। অধুনা এই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার আগমনে বানর যুবক এবং বানরী যুবতীসমূহ বানর সমাজের নেতৃবর্গের বিনানুমতিতে, অগ্রপশ্চাৎ ফলাফল বিবেচনা না করিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। বালকদিগের কোন উল্লেখ করিব না, কারণ তাহারা যেরূপ অল্পবুদ্ধি তাহাদিগকে বানর না বলিয়া মনুষ্য বলিলেও ক্ষতি নাই। যুবকগণ সেই কুলপাংশুল হনুমানকে নগরবৃদ্ধের ন্যায় সম্মান করিয়াছে, নারীগণ তাহাকে লাজাঞ্জলি দিয়া মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক নগরদ্বারে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এমন কি, কোন কোন যুবতী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে মনস্থ করিয়াছে।" সভাস্থ যুবক যুবতীগণ লজ্জায় অধোবদন হইল। উল্লুক ভট্ট বলিতে লাগিলেন, "এই অপরাধে ইহারা সকলেই সমাজচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জ্জনা আছে। এই দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার হনুমান সমাজের নিকট কিরূপ অপরাধী, এবং তাহার অপরাধের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না অপরাপর পণ্ডিতগণ বিবৃত করিবেন।"

পণ্ডিতপ্রবর বিবৃতানন তর্কষড়ানন কহিলেন, "যে সকল মূঢ় মতিচ্ছন্ন যুবকগণ এই কুলাঙ্গার হনুমানকে ঈদৃশ সম্মানিত করিয়াছে সমাজচ্যুত করিলেও তাহাদিগের গুরু দণ্ড হয় না। যে রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। তথাপি ভট্ট মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন যে অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনীয়। এক্ষণে এই হনুমানের দুষ্কৃতের কথা সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পুণ্যভূমি কিস্কিন্ধ্যায় বানরগণ পুরুষপরম্পরায় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ, পক্ক এবং অপক্ক ফল ভক্ষণ, দুর্ব্বলকে নখাঘাত ও দংশন, বলবানকে দংষ্ট্রাপংক্তি প্রদর্শন করিয়া পলায়ন, এই সকল প্রধান কর্ত্তব্য বানরগণ চিরকাল পালন করিয়া আসিতেছে। প্রবাসে কালযাপন বানরদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৃহৎ কলেবরা, গভীরসলিলা নদীর পরপারে গমন করিলে জাতিনাশ হয়। সমুদ্রের পারে গমন করিলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই দুর্ব্বিনীত হনুমান সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরম পবিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ বানরকুল কলঙ্কিত করিয়াছে। সমুদ্র লঙ্ঘনকালে এই মহাপাতকী সুরসা নাম্নী রাক্ষসীর আস্যবিবরে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হয়। এক্ষণে এই পামর সেই রাক্ষসীর উদ্গীর্ণ উচ্ছিষ্ট মাত্র। এই নষ্ট, ভ্রষ্ট, উচ্ছিষ্ট পতিতের প্রতি এই সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী কি দণ্ড বিধান করেন?

দংষ্ট্রাবহুল, প্রকাণ্ডোদর মর্কটশাস্ত্রী ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিলেন, "স্পর্দ্ধায় হিতাহিত শূন্য হইয়া এই অর্ব্বাচীন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। রাক্ষসরাজের উদ্যান হইতে এই লুব্ধ একাকী অমৃতফল ভক্ষণ করিয়াছে, আমাদিগের জন্য কিছুই লইয়া আইসে নাই। লঙ্কাদহনকালে এই হতভাগার মুখ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময় ইহার লজ্জাও দগ্ধ হয়। লজ্জার লেশমাত্র থাকিলে এই দগ্ধানন এখানে কিরূপে আগমন করিত?"

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কপিকুলভূষণ ভ্রষ্টলাঙ্গুল বিদ্যাবারিধি মহাশয় কহিলেন, "কোন লোভে এই মূর্খ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল? এই কিস্কিন্ধ্যার বাহিরে দর্শন করিবার অথবা শিক্ষা করিবার কি আছে? সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম এই স্থানে, সকল বিদ্যার পরাকাষ্ঠা এই স্থানে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চরম উন্নতি এই স্থানে। মহামূর্খ ব্যতীত কে এই কিস্কিন্ধ্যাপুরী পরিত্যাগ করে?

পণ্ডিতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভাস্থলে ঘোর কোলাহল সমুত্থিত হইল। "সমাজ হইতে পাতিত কর," "মুখভঙ্গী প্রদর্শন কর," "লাঙ্গুল আকর্ষণ কর," "দংষ্ট্রা উৎপাটন কর," "নগর বহিষ্কৃত করিয়া দাও," এইরূপ নানাবিধ শব্দ হইতে লাগিল। সেই কোলাহলের মধ্যে এক উগ্রমূর্ত্তি বানর চীৎকার করিয়া কহিল, "কাহার জন্য এই বর্ব্বর বানর সমুদ্র পারে গমন করিয়াছিল? সীতাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য? সীতা ত মানবী—"

বক্তার বক্তৃতাপ্রবাহ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। সংক্ষুব্ধ, ভীমগর্জ্জিত সমুদ্রের ন্যায় সেই কোলাহল নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হইল। সভাস্থ সকলে সভয়ে দেখিল মহাবীর হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘনকালে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশাল, ভীতিবর্দ্ধক দেহ দশন করিয়া বানরগণ ত্রাসে বাক্‌শূন্য হইল। ঘন ঘোর মেঘগর্জ্জনের তুল্য গভীর স্বরে হনুমান কহিলেন, "কিস্কিন্ধ্যা নিবাসী পণ্ডিতগণ! আমাকে তোমরা সমাজচ্যুত কর, অথবা আমার নিন্দা কর তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবনে সাধ থাকিলে জানকী অথবা শ্রীরামচন্দ্রের অবমাননাসূচক বাক্য আমার সমক্ষে মুখে আনিও না। তোমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। রাজরাজেশ্বরী রাজলক্ষ্মী জননী জানকীর উদ্ধারের নিমিত্ত, অথবা তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য লঙ্কায় গমন ত অতি তুচ্ছ কথা, সপ্তসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারি, হাস্যমুখে এই দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

মুদ্রাবিপ্লব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে ভারতীয় রাজস্বের দুরবস্থার কারণ তিনটী।

(১) ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের ক্রমোন্নতি অর্থাৎ ব্যয়বৃদ্ধি।

(২) ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের দেনা পাওনা বিষয়ে অন্যায় ব্যবহার।

(৩) মুদ্রাবিপ্লব।

ভারতের আয় ব্যয় বিবরণীর সহিত স্বায়ত্বশাসনভোগী অষ্ট্রেলিয়ার আয় ব্যয় বিবরণ তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। সেখানেও সম্প্রতি বজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্টোরিয়ার ব্যয় ৭৩৮৪০০০ পাউণ্ড মাত্র তথাপি গত চারি বৎসর বার্ষিক ব্যয় ২০০০০০০ পাউণ্ড কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানকার রাজস্বসচীব বলেন, এইরূপ ব্যয় লাঘবতা বিষয়ে আরও যত্ন করা হইবে। প্রধান প্রধান রাজস্বসচীবদের ও পার্লামেণ্টের সভ্যদের (সেখানে পার্লামেণ্টের সভ্যেরা বেতন পান) এবং সিভিল সার্ভাণ্টদের বেতন আরও কমান হইবে। কুইন্স ল্যাণ্ডেও এইরূপ ব্যয় লাঘব করিবার চেষ্টা হইতেছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ। আমাদের দেশে তাহার বিপরীত ভাব। ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সকলের তত্বাবধারণের জন্য যে মন্ত্রী নিযুক্ত, তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের বেতন ইংলণ্ড দেন, কিন্তু ভারতীয় ব্যয়, আমাদিগকেই বহন করিতে হয়। অবশ্য ইংরাজ অধ্যুসিত উপনিবেশ সকলের সহিত ভারতের তুলনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু ইহা কোন ইংরাজ রাজনীতিবিদই অস্বীকার করিবেন না, যে ইংরাজের ভারতরাজ্য, সুধু ভারতবর্ষেরই উপকারার্থ নহে; ব্রিটিশজাতির গৌরবের, ঐশ্বর্য্যের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং ব্যয়ভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করা, মহত্ব ও নীতি সঙ্গত! কার্য্যে কিন্তু তাহার বিপরীত দাঁড়াইতেছে। লাভের সময়ে দেখি ইংলণ্ডের সমুদয়, লোকসান ভারতের ঘাড়ে। সুয়েজ কেনালের লাভ, ভারতবর্ষ এক পয়সাও পান না। বর্ম্মার সমস্ত লোকসান তাহাকে বহন করিতে হয়। এই শেষোক্ত ব্যয়ভার কিছু অল্প নহে। গত আট বৎসরে সাড়ে বার ক্রোর টাকা লোকসান হইয়াছে, গত পাঁচ বৎসর, বার্ষিক ১২৫ লক্ষ টাকা করিয়া লোকসান হইতেছে; কখন লাভ হইবে কি না বলা যায় না। দরিদ্র ভারতের পক্ষে সুদূর ভবিষ্যৎ লাভের আশায় এরূপ ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। অগাধ ধনশালী ইংরাজেরই এরূপ কর্ম্ম শোভা পায়।

বজেট বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে দুই একটী সংবাদ দেওয়া হয়। তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ভারতসচীব আগামী বৎসর একটী কমিটি করিবেন। ভারত ও ইংলণ্ডের পরস্পর দেয়াদেয় বিষয়ে বিচার করিবার ভার তাহার উপর পড়িবে। অনেকে

হয়ত মনে করিবেন ইহাতে আমাদের লাভ হইতে পারে। তাহার আশা কম। এরূপ কমিটি ত বরাবরই বসিয়া আসিতেছে ফল কিছুই হয় নাই। তবে ইহার কিঞ্চিৎ আশাজনক ভাব এই। গতবৎসর যখন মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ জিজ্ঞাসা করেন মন্ত্রিসভা এইরূপ এক কমিটি নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, তখন লর্ড কিম্বার্লির প্রতিনিধি কমন্স সভায় বলেন "As any just revision of the existing adjustment of Military expenses would affect several departments of the Government, the Secretary of State is *unable* to give an answer to the question." তার অর্থ (যদি কিছু অর্থ থাকে) এ বিষয়ে তাঁর হাত নাই। এক্ষণে এ উত্তরের অর্থ কি ?

ভারতসচীব অঙ্গীকার করিয়াছেন যদি রাজস্বের অবস্থা ভাল না হয় তাহা হইলে তুলার বস্ত্রের শুল্ক স্থাপন বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। ইহারও বিশেষ অর্থ আছে। সকলেই জানেন ফ্যামিন্ গ্রাণ্ট এবং প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের টাকা লইয়া দেড় ক্রোর টাকা পূরণ করা হইয়াছে। ভারতসচীব সে কথা আর তুলিবেন না। ইহার উপরেও যদি ব্যয়াধিক্য হয় তবেই শুল্ক বসান হইবে। যাহারা এই শুল্কের পক্ষপাতী তাহাদের ইচ্ছা অবশ্য এই শুল্ক বসাইয়া ঐ দেড় ক্রোর টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহা না হইলে আর কি হইল। আর কোন প্রকারে ব্যয় বাড়াইয়া দিয়া এই শুল্ক ধার্য্য করিলে ও তাহার সহিত বোম্বাইয়ের কলের উপর শুল্ক চাপাইলে আমাদের লাভ নয় বরং লোকসান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় রাজস্বসচীব মুদ্রা বিপ্লবই আমাদের দুরবস্থার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার অর্থ এই—ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার লাঘব করিতে হইলে, বড়লাটের ও রাজস্বসচীবের যেরূপ উদারতা, যেরূপ জ্ঞান, শাসন পারদর্শিতা, ও যেরূপ সাহস প্রয়োজন তাঁহাদের তাহা নাই। ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ যে ভারতবর্ষের ও সমস্ত সাম্রাজ্যের উপকারার্থে, বিলাতীয় ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিয়া ন্যায় বিচার করিবেন, যতদিন বিলাতের সাধারণ লোকের ভারতের প্রতি নজর না পড়ে, ততদিন তাহারও আশা বৃথা। সুতরাং সকল দোষ, মুদ্রাবিপ্লবের উপর আরোপ করা সহজ ও রাজনীতিসঙ্গত। ইহার গতিরোধে অসমর্থতা ভারতীয় রাজপুরুষগণের অপারকতায় পরিচায়ক বলিয়াও কেহ বলিতে পারিবেন না। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ যাহাতে বিফল প্রযত্ন হইল, ভারতবর্ষ তদ্বিষয়ে সফল হইবে এ কথা মনেও কল্পনা করা যায় না। তাহা বলিয়া মুদ্রা বিষয়ক আইন যে নিষ্ফল হইয়াছে, সে আইন রদ করা উচিত, এ কথা বলিতে পারা যায় না। ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যত কিছু লিখিত হইয়াছে, সমস্তই মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ইহা একবারেই নিরর্থক নহে। কিন্তু এরূপ বিষয়ে কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামত গ্রাহ্য নহে। মুদ্রাবিপ্লব বিষয়ে যে সকল তর্ক বিতর্ক চলিতেছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুদ্রাবিপ্লবের কারণ কি ? ইহার উত্তরে অনেকেই বলিবেন সুলভ রৌপ্যই ইহার কারণ।

এতদ্বিষয়েও মতভেদ আছে। কিছুদিন হইল মিঃ গ্রেণফেল যিনি ভারতবর্ষীয় মুদ্রাআইনের জন্য গ্ল্যাডষ্টোনীয় দল হইতে ও পার্লমেণ্ট সভা হইতে অবসর গ্রহণ করেন তিনি এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, স্বর্ণের মাহার্ঘ্যই ইহার কারণ। অর্থাৎ শস্যাদির মূল্যের সহিত তুলনায় স্বর্ণের মূল্য চড়িয়া গিয়াছে, রৌপ্যের মূল্য প্রায় স্থায়ীভাবে রহিয়াছে। আর একভাবে ধরিলে, স্বর্ণ মুদ্রার হিসাবে অন্যান্য জিনিষের ও রৌপ্যের দাম (বিলাতে) কমিয়া গিয়াছে। ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতস্থির করিবার অগ্রে দুই একটী সংবাদ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইহা নিশ্চয় যে রৌপ্যের কাটতি আমদানি অপেক্ষা অনেক অধিক। এমন কি, 'শার্ম্মান অ্যাক্ট' রদ হইবার আগেই কাহারও কাহারও মতে (M. ottoman Hanpt in the Mexican Financier) সমস্ত পৃথিবী লইয়া বার্ষিক বিক্রেয় রৌপ্যের অর্দ্ধেকেরও কম খরচ। শার্ম্মান অ্যাক্ট রদ হওয়ার পর, আরও অধিক রৌপ্য বাজারে আসিয়াছে। সেই আইন অনুসারে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর রৌপ্য (৫৪০০০০০০ আউন্স) ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিতেন, সুতরাং রৌপ্য তাহাতে তত সুলভ হইতে পাইত না। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, হয় রৌপ্য উত্তোলনের কার্য্য কমিবে, না হয় রৌপ্যের মূল্য সুলভ হইয়া যাইবে এবং যতদিন রৌপ্য খননের খরচ না পোষায়, ততদিন মূল্যের অবনতি হইতে থাকিবে। ২ভরি রূপার তুলিবার খরচ আজকাল ২০। ২৫ পেন্স মাত্র, সুতরাং রূপার দাম পূর্ব্বেকার অর্দ্ধেক হইয়া যাইতে পারে। সে অবস্থা প্রায় দাঁড়াইয়াছে।

স্থূলতঃ রৌপ্য মূল্য সুলভ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেইরূপ স্বর্ণের মহার্ঘতার কারণও নির্দ্দেশ করা যায়। এক সময়ে (আজ ২০ বৎসর মাত্র হইল) নূতন খনির আবিষ্কার না হইলে স্বর্ণের দুর্ভিক্ষ হইত। এক্ষণেও স্বর্ণের যেরূপ প্রয়োজন, উৎপত্তি তত নহে। বৎসর বৎসর ২৫০০০০০০ পাউণ্ড মাত্র। তদ্ব্যতীত প্রায় ইয়ুরোপের সর্ব্বত্রই স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন, কিছুদিন আগে (১৮৭৬ সালের পূর্ব্বে) তাহা ছিল না। সুতরং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পার্থক্যের কারণ দুইটি। এই পার্থক্য মুদ্রাবিপ্লবের একটী প্রধান কারণ। অনেকে মনে করেন ইহাই একমাত্র কারণ। তাহা যে ভ্রমাত্মক পরে দেখান যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই পার্থক্য ঘটিত মুদ্রাবিপ্লবের ভারত সম্বন্ধে কি ফল? প্রথমত দেশে যত রৌপ্য আছে তাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত আমাদিগকে বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে যে রাজস্ব (ইহা একপ্রকার কর বলিতে হইবে) প্রেরণ করিতে হয় তাহা স্বর্ণ মুদ্রার হিসাবে। কিন্তু ভারতীয় রাজস্ব রৌপ্য মুদ্রায় গৃহীত হয়। রৌপ্যের ও রৌপ্যমুদ্রার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া কি ভারতের ভার অধিক হইয়াছে?

এই প্রশ্নের সহিত আর একটী প্রশ্ন জড়িত এই বাৎসরিক করের কথা যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যদি কেবল বাণিজ্য সম্বন্ধই হইত, তাহাহইলে এই মুদ্রাবিপ্লবের কি ফল ঘটিত।

ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না, মুদ্রাবিপ্লব হওয়াতে রৌপ্য মুদ্রার হিসাবে

ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনেক বেশী কর পাঠাইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বাস্তবিক রৌপ্য প্রেরণ করা হয় না, এদেশ জাত ফসলাদি রপ্তানি করা হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা। যখন টাকার দর ২ শিলিং ছিল তখন যদি ১৭০০০০০০ পৌণ্ডের দরুণ ১৭ মণ জিনিষ পাঠাইতে হইত, টাকার দর ১ শিলিং হওয়াতে সেই ১৭ মণ, কি ৩৪ মণ, কি তাহার কম পাঠাইতে হয়, দেখিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতজাত জিনিষের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের সহিত কমিয়া আসিতেছে, কি সুবর্ণের মূল্যের সহিত চড়িতেছে, কি পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে? যদি কমিয়া যাইতেছে প্রমাণ হয়, তাহা হইলে দেশের লোকসান, গবর্ণমেণ্টেরও লোকসান। যদি বাড়িতেছে কিম্বা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের ও যাহাদের আয় রৌপ্য মুদ্রায় নির্দ্ধারিত, তাহাদের লোকসান। কিন্তু দালালদের ও (হয়ত অল্পপরিমাণে) প্রজাদের লাভ। একটী উদাহরণ দিলে হয়ত ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। ধরা যাক, ১মণ ভারতীয় জিনিষের দাম পূর্ব্বে (যখন টাকার দাম ২শিলিং) ১পাউণ্ড অর্থাৎ ১০টাকা ছিল; এক্ষণে (যখন টাকার দাম ১শিলিং মাত্র) সেই জিনিষের দাম কত? দাম যদি ১০ টাকাই থাকে তাহা হইলে বিলাতে ১পাউণ্ড পাঠাইতে হইলে আমাদিগকে দুই মণ জিনিষ পাঠাইতে হইবে। রূপার দাম বাজারে কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু ভারতের পক্ষে কিছু সস্তা হইল না। কিন্তু যদি সেই ১মণ জিনিষের দাম এখন ২০ টাকা হয় তাহার ফল কি হইবে দেখা যাউক। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রৌপ্য মুদ্রায় গৃহীত হয়, সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম (ফসলের হিসাবে প্রায় অর্দ্ধেক) গ্রহণ করিতে হইল। এর লাভ কাহার? ফসল যে বিক্রয় করে, না যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া ব্যবসা চালায়? না মহাজনের? ভারতবর্ষীয় সামাজিক অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই প্রতীত হইবে যে এই লাভ উক্ত দুই দলের হস্তেই যায়। এতদ্ব্যতীত যাহাদের আয় রৌপ্যমুদ্রায় নির্দ্ধারিত তাহাদের লোকসান, আর গবর্ণমেণ্টের লোকসানের অর্থ—ভারতবর্ষের লোকসান। কিন্তু সে লোকসান যদি রাজস্বের লাভের সামিল হইত তাহা হইলে ইহা তত দোষণীয় হইত না। এক্ষণে দেখিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ফসলের মূল্য (ইংলণ্ডের বাজারে) রৌপ্য মুদ্রার হিসাবে পূর্ব্ববৎই আছে কি অধিক হইয়াছে। লর্ড হার্সেলের সভাপতিত্বে মুদ্রাবিষয়ক যে সমিতি স্থাপিত হয় তাঁহাদের মতে রৌপ্যের দাম যেরূপ কমিতেছে, সেইরূপ ভারতজাত দ্রব্যের রৌপ্য মূল্য বাড়িতেছে—তবে এই কমবেশীর সামঞ্জস্য হওয়া কাল সাপেক্ষ। যতদিন না হয় ততদিন অবশ্য ব্যবসার ক্ষতি। আর এই সামঞ্জস্য ঘটিলেও এক শ্রেণীর লোকের ব্যয়ভার আর এক শ্রেণীর উপর গিয়া পড়িবে, এবং গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষতি, কারণ অনেক স্থলেই তাঁহারা প্রজাদের সহিত কিছুদিনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নহে। এই কথার যাথার্থ্য বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতে গিয়া পাটনা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ইয়ুব্যাঙ্ক একটী দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে।

মনে কর একজন ইংরাজ ব্যবসাদার ভারতবর্ষ হইতে চামড়া রপ্তানি করিতেছে। যখন ১ পাউণ্ডের মূল্য ১০৲ টাকা ছিল তখন ১ পাউণ্ডে ১০খানি চামড়া পাওয়া যাইত। যখন ১ পাউণ্ডের দাম ২০৲ টাকা, যদি রূপার টাকার হিসাবে চামড়ার দর পূর্ব্ববৎ থাকে তবে লাভ ব্যবসাদারের—এ দেশের প্রজা ১০খানা চামড়ার দরুণ ১০ টাকাই পাইবে। কিন্তু যখন সে এই টাকা লইয়া ধর বিলাতী কাপড় কিনিতে গেল বিলাতী কাপড়ের দাম চড়িয়া গিয়াছে সুতরাং সে দেখিতে পাইবে তাহার চামড়ার দরুণ অধিক দাম লওয়া উচিত ছিল। ইহাতে মিঃ ইউব্যাঙ্ক বলেন ব্যবসা এইরূপ বিনিময় মাত্র, মুদ্রার মূল্য যখন কমিতেছে কি বাড়িতেছে মূর্খ প্রজা তখন ব্যবসাদারের কাছে ঠকিতে পারে, কিন্তু পরিশেষে মুদ্রার মূল্যের উপর ব্যবসা নির্ভর করে না। আমাদের মনে হয় এই যুক্তি সম্পূর্ণ নহে। যদি চামড়ার টাকা লইয়া প্রজাকে বিলাতী দ্রব্যই কিনিতে হইত, তাহা হইলে কারবার এই প্রণালীতেই হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই টাকার কতকাংশ খাজনা দিতে এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় হয় যাহা রৌপ্যমুদ্রার নির্দ্ধারিত, সুতরাং এ দেশজাত দ্রব্যের মূল্য রৌপ্যমূল্যের হ্রাসের সহিত বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

এই কথার যাথার্থ্য আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিবার জন্য লর্ড হার্সেলের বিপরীত মতাবলম্বীদিগের যুক্তি বিবেচনা করা যাক্। মিঃ নারোজির মতে মুদ্রার মূল্য যখন ১ শিলিং তখন আমাদিগকে ইংলণ্ডে ঋণশোধের জন্য পূর্ব্বেকার দুই গুণ ফসল রপ্তানি করিতে হইবে। তিনি এইরূপ একটী উদাহরণ দেন, আমি বিলাতে এক গাঁট তুলা পাঠাইলাম। আমার তাহার উপর ১০০০ হাজার টাকা মূল ধন ও ১০০ টাকা লাভ পোষাণ দরকার। রূপার দাম চড়িলে আমি অধিক সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা পাইব। রূপার দাম কমিলে কম সংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা পাইব—এইমাত্র। কারণ, তিনি বলেন, আমি যদি সুবর্ণমুদ্রার হিসাবে বিক্রয় করিতে যাই, আর একজন তুলাওয়ালা আমা অপেক্ষা অল্প দামে বিক্রয় করিতে পারিবে, কিম্বা আমার লোকসান হইবে। এই যুক্তির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তির তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে দুইটার কোনটাই সম্পূর্ণ নহে।

এস্থলে একটু পুনরুক্তি আবশ্যক। চীনের মত স্বাধীন দেশেও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন থাকায় মুদ্রাবিপ্লবে কিঞ্চিৎ লোকসান হইবে। তদ্ব্যতীত মুদ্রা বিনিময়ের অস্থিতির দরুণও ইয়ুরোপীয় জাতিদের সহিত তাহাদের ব্যবসায় কিছু অসুবিধা। তত্রাচ প্রথমোক্ত যুক্তি তাহাদের সম্বন্ধে অনেকটা খাটে। ভারতবর্ষের কিন্তু অবস্থা অন্যপ্রকার। ইহাকে বৎসর বৎসর আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি অধিক করিতে হয়; অর্থাৎ অন্য দেশের পক্ষে যেরূপ ব্যবসা অর্থে এক দেশের ব্যবহার্য্য জিনিষের সহিত অন্য দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বিনিময়, আমাদের তাহা নহে। আমাদের দেশের মূল ধন বিলাত হইতে আসিয়াছে, আমাদের দেশের বিদ্যাবুদ্ধি শাসন জ্ঞান প্রভৃতি তথা হইতে আগত, সৈন্যসামন্তও বিলাতী। ইহার খরচের দরুণ আমাদিগকে বৎসর বৎসর অনেক শস্য বাধ্য হইয়া প্রেরণ করিতে হয়, তাহা বিক্রয় না

হইলেই নয়। কাজেই আমাদিগকে সস্তাদরে সে সকল ছাড়িয়া দিতে হয়। একজন চাষীকে যদি নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে কতক টাকা যোগাড় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনেক লোকসান করিয়াও শস্যাদি ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহা সকলেই জানেন। সেইরূপ ইয়ুরোপীয় ব্যবসাদার নিজের দরে ভারতীয় জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন। চীনেরা ইয়ুরোপীয় জিনিষের বিনিময়ে আপনাদের জিনিষ দেন, সুতরাং এই দুই জিনিষের মূল্যের সামঞ্জস্য অনেকটা আপনা হইতেই হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ভারতের সে স্বাধীনতা নাই। যখন মুদ্রাবিষয়ক আইন প্রকটিত হইবার পর ভারতসচীব ১ শিলিং ৪ পেনির কম তাঁহার বিল বিক্রয় করিবেন না মনস্থ করিলেন, তাহাতে কি ফল হইল? কেহই বিল কিনিতে চাহিল না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে পূর্ব্বোক্ত দরিদ্র চাষীর অবস্থাপন্ন হইয়াও নিজের দরে শস্য বিক্রয় করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। আমরা বলিতেছি না এরূপ চেষ্টা করা অন্যায়, সে চেষ্টা যে বিফল হইবার নিশ্চিৎ সম্ভাবনা ছিল, নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও তাহা বলিতে পারিত। কলিকাতা মুদ্রা সমিতির কয়েকজন সভ্য ব্যতীত বোধ হয় কেহই এরূপ যত্ন সফল হইবে বলিয়া আশা করিতে পারেন নাই। আমরা তখন এক বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই সাধারণ নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া ইহার বিফলতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। এখন দেখা যাইতেছে ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচীব স্যর ডেভিড্ বারবারও ইহার বিরোধী ছিলেন। বোধ হয় লর্ড ল্যান্সডাউনের পরামর্শেই ইহা অবলম্বন করা হয়। তাঁহার মতে যখন ভারতে ব্যবসা মন্দা ছিল তখন এই পরীক্ষা করিয়া যে সময়ে ভারতীয় দ্রব্যের কাটতি অধিক সেই সময়ে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। ইহার যাথার্থ্য কতদূর প্রমাণিত হইত বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে অবশেষে ইহা অবশ্যই নিষ্ফল হইত। আমরা যে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতেছি তাহা কিছু নূতন কথা নহে। মিল এ বিষয়ে বিশদভাবে সাধারণ নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "যে দেশকে অন্য দেশে নিয়মিত কর প্রেরণ করিতে হয় তাহার ক্ষতি দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। যাহা পাঠাইতে হয় তাহাত" ক্ষতিই, তাহার উপর আরও অধিক ক্ষতি এই, তাহাকে বেশী দামে ও অন্যদেশের জিনিষ কিনিতে হয় ও অল্প দামে নিজের জিনিষ ছাড়িয়া দিতে হয়।"

এই বিষয়টী আমাদের পক্ষে এরূপ প্রয়োজনীয় যে ইহা আর এক ভাবে দেখিলে হয়ত মন্দ হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রৌপ্যের মূল্যের হ্রস্বতাই মুদ্রাবিনিময়ের গোলযোগের কারণ নহে। যদি আমাদের দেশে স্বর্ণ মুদ্রারও প্রচলন থাকিত তাহা হইলেও দুই মুদ্রার পার্থক্য লক্ষিত হইত। সকল দেশেই ব্যবসা বিনিময়ে এইরূপ হয়। কিন্তু আমাদের ইংলণ্ডের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় এই পার্থক্য আমাদের বিরুদ্ধে বরাবরই চলিত। এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে চর্চ্চা করিতে চান তাঁহারা মিঃ গোসেনের পুস্তক (Mr. Goschen on Foreign Exchanges) পাঠ করিয়া দেখিবেন। স্থূলতঃ মুদ্রাবিনিময়ের হার দুই জাতির পরস্পরের নিকট দায়িত্ব

অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। এখান হইতে বিলাতে কোন জিনিষ রপ্তানি হইল তাহার দাম টাকায় সেখান হইতে আসে না। সেখানকার কাহারও যদি এখান হইতে কোন কারণে টাকা পাওনা থাকে তাঁহার বিল কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেই চলে। সুতরাং যদি বিলাতের বাজারে আমাদের দায়িত্ব অনেক হয়—তাহা হইলে আমাদের বিল বাজারে অনেক পাওয়া যাইবে কাজেই এ সকল বিলের দাম সস্তা হইবে। ইহার বিশেষত্ব এই বাণিজ্যের অবস্থা যাহা হউক বিলগুলি বিক্রয় হওয়া চাইই।

পূর্ব্বে দুই জাতির পরস্পরের যে দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ সকল প্রকারেরই দায়িত্ব। মিঃ গোসেনের একটী উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন রুসিয়ার বড় লোকেরা যে বিদেশে টাকা খরচ করেন যাহার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গের ব্যাঙ্কারদের উপর চেক কাটেন, তাহাতে রুসিয়ার বিলের দাম কমিয়া যায়। এই দৃষ্টান্ত আমাদের প্রতি আরোপ করিলে ভারতের বিশেষ অবস্থার কথা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশে লোকে বিলাতে যাহা খরচ করেন, তাহাতে মুদ্রাবিনিময়ের হার আমাদের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের দেশের লোকের অর্থে অবশ্য আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারী, ইংরাজ ব্যবসাদার, চা-কর সাহেব প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বার্ত্তাশাস্ত্রানুসারে ভারতলক্ষ্মী কি অবস্থায় পড়িয়াছেন ও পড়িবেন।

ভারতসচীবের বিল সকলের আরও এক বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে কার্য্যকলাপ সূত্রে যদি ফ্রান্সের বিলের দাম কমিয়া যায় তথাপি সে কম বড় বেশী দূর যাইতে পারে না। ফ্রান্স হইতে সুবর্ণমুদ্রা পাঠান অসুবিধাজনক বলিয়াই এইরূপ বিলের প্রথা হইয়াছে। কিন্তু সুবর্ণমুদ্রা পাঠাইবার খরচ যদি বিলের ডিস্‌কৌণ্টের অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে মুদ্রা পাঠাইয়া ইংলণ্ডের ঋণ শোধ হইবে। বলা বাহুল্য এরূপ উপায় ভারতবর্ষ অবলম্বন করিতে পারে না। ইহার দূরতা, ইহার রৌপ্য মুদ্রার চলন, ইহার অসঙ্গতি, যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। সুতরাং এ সকল বিলের দামের নিম্ন সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

আমাদের যুক্তি অকাট্য না হইলেও ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে সুলভ রৌপ্যের ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনই মুদ্রাবিপ্লবের একমাত্র কারণ নহে। ভারত রাজপুরুষগণ কিন্তু ইহার উপরই একমাত্র দোষারোপ করিতেছেন। ইহার কারণ এক প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ গোলমাল বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অতি অল্পই। যাহা হউক এই বিষয়ের এই ভাগটী লইয়াই মুদ্রা আইন জারি হইয়াছে। তাহার ফল যে কিছুই হয় নাই, এমন বলা যায় না। টাকাতে যে পরিমাণ রূপা আছে তাহার দাম ১০ পেন্স মাত্র কিন্তু টাকার দাম প্রায় ১৪ পেন্স।

ইহার ফলাফল কি? ইহা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে মিঃ নাউরোজির যুক্তিই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক। অর্থাৎ স্বীকার করা যাক যে রৌপ্যের হিসাবে (রৌপ্য ও রৌপ্যমুদ্রার মূল্য আগে একই ছিল) ভারতজাত দ্রব্যের মূল্য রৌপ্য মূল্যের হ্রাস সত্ত্বেও,

পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। তাহার কারণ, তিনি বলেন, কোন ব্যবসাদার ইহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে গেলে অন্য ব্যবসাদারেরা তাহার অপেক্ষা অল্প মূল্যে সে দ্রব্য বিক্রয় করিবে। এক্ষণে কিন্তু সকলকেই অধিক রৌপ্য বিনিময়ে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে—কারণ, তাহাদের খরচ রৌপ্য মুদ্রায়, (খাজনা ইত্যাদি) এবং ইহার রৌপ্যমূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য এইরূপ। ভারতের সহিত অন্য রৌপ্যব্যবহারী দেশের ব্যবসার গোলমাল পড়িয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত তাহাদের জিনিষের কাট্‌তি অধিক হইতেছে, কারণ তাহাদের দ্রব্য সস্তা। শিল্পজাত দ্রব্যের পক্ষে এরূপ কাট্‌তিও বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মুদ্রাবিষয়ক আইন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হইলেও লর্ড ল্যান্‌সডাউনের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে ইংলণ্ডের সহিত ব্যবসাদির বিষয়ে যে আইনদ্বারা কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় দোষ সত্ত্বেও তাহা পরীক্ষণীয়।

মুদ্রাবিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিতে গেলে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এক ভাগ সমগ্র রৌপ্যমুদ্রাব্যবহারী দেশের পক্ষে খাটে—আর একটী ভারতের পক্ষে বিশেষ-ভাবে প্রযুজ্য। এই শেষ ভাগের কথা বিবেচনা করিলে অনেক চিন্তার উদয় হয়। ইংলণ্ডের অধীনে আসিয়া ভারতবর্ষ অনেক ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু কে ভাবিয়াছিল যে এই উন্নতির জন্য আমাদের এত অধিক মূল্য দিতে হইবে ?

বদরিনাথ।

২৯ মে শুক্রবার,—কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকনন্দা পার হয়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্লুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম; বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের একটা ভয়ানক আবেগ, অভীষ্টস্থানে এসে সমস্তই যেন সংযত হয়ে গেল। এই রকমই হয়ে থাকে।

পথে যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে তখন মনে হয়েছিল, এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্ম্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো যেখানে পূজার্চ্চনার অবিরাম কলরবে, মানবহৃদয়ের সুখ দুঃখ ও হর্ষ শোকের বিপুল উচ্ছ্বাসে, এক সুগভীর কল্লোল উত্থিত হচ্ছে। নদীর জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল উর্ম্মিরাশির নির্ব্বোধ নৃত্যের মধ্যে মিশে যেমন হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে, নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে, দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাকুল বাসনা এবং অশান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হয়ে পড়লুম।

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ করেই চারদিকের একটা নিরুত্তম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হলো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মবিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উত্তম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্ম্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকনন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর গমনে বরফ রাশির নীচে দিয়ে চলে যাচ্ছে, সহরের অধিকাংশ ঘর বাড়ী এখন পর্য্যন্তও বরফের তলায় পড়ে আছে। যে কয়খান ঘর দেখা যাচ্ছে তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়। কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমাদের পূর্ব্বগত সন্ন্যাসী মশায়দের কৃপায়, আর কতক বা ঘরগুলি এই তিন বৎসর কাল ধরে বন্ধ থাকা বশত। সন্ন্যাসী মশায়রাই ক্ষতি করেছেন কিছু বেশী। ঘরের দ্বার জানালাগুলি বেবাক্ অন্তর্হিত হয়েছে, অবিশ্যি সে গুলো যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে তা নয়। যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন তখনও হাট বাজার বসেনি, সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব, তাই আপনাদের শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্যে এই সমস্ত জানলা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন, এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিষপত্র নাশ করে "আত্মানাং সততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—এই সমস্ত জানালা দরজার অভাবই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আস্‌বে তারা এই বরফ রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে, এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয়নি।

পুর প্রবেশ করবার পূর্ব্বে যে সকল পাণ্ডা আমাকে পেয়ে বসেছিল তাদের হাত থেকে যে কি রকম করে অব্যাহতি পেলুম সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠ্‌বো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই ব'লে দিয়েছিল। তার শ্রীহস্ত লিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডাইরী বয়ে আছে, তা এই:—"কূর্ম্মধারা কি উপর মোকান লছমীনারায়ণ পাণ্ডা, বেণীপ্রসাদ রাম নাথকী চাচী।"—প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে কূর্ম্মধারার উপরে লছমীনারায়ণ পাণ্ডার বাড়ী, আর যেখানে বেণীপ্রসাদ আছেন। তা সে বেণীপ্রসাদ মানুষই হোন, আর লছমীনারায়ণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাসনে অসমর্থ হয়ে তখনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কিন্তু কি কারণে জানিনে উক্ত পাণ্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টার অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করার আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করেনি। আমার কৌতূহল প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু বলেছিল, "বস্, উয়ো বাৎ বোল্‌নেসেই তেরা মালুম হোগা"—সুতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয়নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে সে দিন সমস্ত অপরাহ্নটা এই কথার অর্থ নির্ণয়ের জন্য বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন একজন সুরসিক এবং ভারি সমজদার লোক; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হোল এই বেণীপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক না হয় ভগিনীপতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুর রসাত্মক বলেই পাণ্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্ম্ম

ভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান করেছিল। যাহোক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্ষান্ত হলেন না, এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করেছিলুম। সুতরাং তিনি কথাটার ধাতু এবং শব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গভীর গবেষণা এবং প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির কল্লেন যে সেখানে বেণীপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেন না "চাচী" শব্দের অর্থ খুড়ী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, কাজেই "রামনাথকী চাচী" এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধরে আড্ডা খুঁজতে হবে এই যা মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইল। বৈদান্তিক ব'লে বস্‌লেন যায়গায় যায়গায় অমনতর দুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি। কারণ, সে আরও কয়দিন দেবপ্রয়াগে না থাক্‌লে অনেক নূতন যাত্রী তার বেদখল হয়ে যাবে তার এই ভয় ছিল; তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যাহোক বদরিনাথে এসে সেই "রামনাথকী চাচীর" অনুসন্ধানে বেশী নিগ্রহ ভোগ কর্ত্তে হয়নি। সকল পাণ্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় ব'সে থাকে, যখন তারা শুন্‌লে যে আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ বলে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার প্রকার কি রকম তা আমরা কেহই জানতুম না। সুতরাং কলিকাতা, কালীঘাট কি ঐ প্রকার কোন স্থান হলে স্বতঃই সন্দেহ হ'তো যে হয়ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর করেছে, এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে পড়বে তখন আমাদের এক বিষম মুস্কিলে পড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয়নি! সুতরাং এই লোকটা বেণী-প্রসাদ বলে পরিচয় দেবা মাত্র আমরা অসঙ্কোচে তার সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহা বিপদে পড়লো। তাদের ঘরবাড়ী এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ষোল দিন না গেলে তারা বরফ স্তূপের মধ্যে হতে প্রকাশ হচ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিজে অন্য লোকের একটা কুঠুরী দখল করে বাস কচ্ছে; সুতরাং এ রকম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হয়ে পড়লো। যাহোক শেষে সে পাহাড়ের উপর আর একজনের একটা ঘরে আমাদের আড্ডা স্থির করে দিলে। এই ঘর যার সে এখনও এখানে এসে পৌছেনি, আমাদের আশঙ্কা হতে লাগলো ঘরওয়ালা হটাৎ এসে আমাদের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে। কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথীপরায়ণ হলেও—অতিথীসেবার পুণ্যটুকু তাদের জন্যে রেখে অন্য লোকে যে তার অর্থগত উপস্বত্ব টুকু ভোগ করবে এ এদের পক্ষে অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আমরা সেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার যোগাড় করে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, দ্বারগুলি পূর্ব্বাগত সাধু সন্ন্যাসীদের অগ্নি সেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জ্জয় শীত আস্‌ছে তখন এই ঘরে কি করে

তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লুম। সন্ধ্যা হতেও আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্নেই নারায়ণের দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং রাত্রি যাপনের জন্যে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হতেই এমন শীত বোধ হতে লাগলো যে কার সাধ্য ঘরের বাহির হয়! শীতে দাঁতে দাঁতে ঠেকতে লাগল এবং সর্ব্বশরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকাসত্ত্বেও শীতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালীদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল "মাঘে শীত না মেঘে শীত?"—তার উত্তরে কবিবর নাকি বলেছিলেন, "যত্র বায়ু তত্র শীত।" কখন বদরিকাশ্রম দর্শন কর্ত্তে এলে কালীদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয়ই লজ্জিত হতেন। চার দিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এই বায়ু-প্রবাহ-শূন্য স্থানেও যেরকম মারাত্মক শীত তা কবি-প্রতিভার আয়ত্বভূত নয়, যে সকল পুণ্য-প্রয়াসী তীর্থ-যাত্রী এ সকল স্থানে আসে তাঁরাই তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। তবুত এ যে মাস মাঘ মাসের প্রবল শীত অনুমান করবার শক্তি মানুষের নেই। আমরা বহুকষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আগুণ জ্বাল্লুম এবং তার পাশেই শয্যা রচনা করা গেল। সে রাত্রে আর কিন্তু আহার হলো না।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এতদূরে জনমানবশূন্য চির তুষাররাশির ভিতরে এতখানি সম-তল ভূমি দেখ্‌লে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার হতে যাত্রা করে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা কিছু অল্প সমতল জমী দেখিছি তা শ্রীনগরে, তা ভিন্ন সমস্ত যায়গাই "কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ"—অষ্টবক্র বিশেষ। হরিদ্বার হতে বদরিকাশ্রম দুইশত মাইলেরও বেশী। একেত হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর, এ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্য্যের তুলনা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ দুই জিনিষের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের তফাৎ। একটি মহাউচ্চ, অসমান, কঠিন; সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তপের বাসভূমি,—আর একটি সুগভীর, সমতল, তরল, উদ্ভিজ্জের নাম বর্জ্জিত, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গভীর নিলীমায় সমাচ্ছন্ন। তবু এ প্রভেদের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে তা ঠিক বলা যায় না, বোধ করি এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে, এই মহান সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বপিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গম্ভীর দৃশ্য তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর, দুই দিকে দুইটা পর্ব্বত একে-বারে আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধচ্ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনলুম এই দুটি পর্ব্বতের একটির নাম "নর"· অপরটির নাম "নারায়ণ," আরও শুনলুম এই পর্ব্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। শাস্ত্রে না কি লেখা আছে ক্রমে এরা বর্দ্ধিত কলেবর হ'য়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে, সুতরাং বদরিকাশ্রম তীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণবক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরসা করে যে দু চার শ বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই, কাজেই আশু

দারিদ্রতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ, তবে তাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা রইল বটে!

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত তা অতি সুন্দর, শুধু ভক্তের নয় কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ করে অলকনন্দা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু বছরের বেশী সময়ই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখনও ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছু দিন পরে বরফ গলে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে, সে দৃশ্য ভারি সুন্দর!

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা, দৈর্ঘে বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থান টুকুই খুব দীর্ঘ ব'লে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হ'লেও প্রস্থে বেশী নয়; আরও দেখ্‌লুম প্রস্থ-দেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌লেই তবে তা বুঝতে পারা যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দুই পর্ব্বত হতে অনেকগুলি ঝরণা বের হয়ে অলকনন্দায় পড়েছে এবং নদীবক্ষে বরফ ভেদ করে সেই জল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্ম্ম-ধারার কথা বলেছি তা এই বদরিনাথের বাজারের মধ্যে দিয়ে নেমে নদীতে পড়ছে, এই ঝরণাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। 'কূর্ম্ম-ধারা' ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে। বাজারে যে কত গুলি দোকান আছে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে তা ঠিক বুঝতে পাল্লুম না, এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে সুপ্তাবস্থায় লুপ্ত আছে, কিন্তু সমস্ত ঘর বাড়ীর একটা সঠিক ধারণা না হলেও বোধ হ'লো পাণ্ডাদের বাসস্থান ও দোকান সব শুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ খান ঘরের বেশী হবে না। বাজারে দরকার মত জিনিষ পত্র সকলই পাওয়া যায়, তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অনুমান ক'রে থাকেন জুতা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি সৌখীন রকমের জিনিষপত্র সব পাওয়া যায়, তবে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাড়ের মধ্যে এসে অনাবশ্যক বহুবিধ দরকারী জিনিষের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; আবশ্যক বোধ হত আটা, ভাল ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কাঠ। আর বাঙ্গালী মানুষ, অনেকদিন উপরি উপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ করতে করতে এক এক দিন চাট্টি ভাতের জন্যে প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌তো, সুতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের খোঁজও যে না হতো এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবী করবার প্রবৃত্তি হতো সে দিন গোটা দুইচার "পেড়া"র (সন্দেশ) আয়োজন করা যেত, কিন্তু এ রকম দুঃসাহস প্রকাশ কর্ত্তে প্রায়ই ভরসা হতো না—কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন স্থির কর্ত্তে হলে বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্ব্বক ইতিহাস অনুসন্ধান কর্ত্তে হয়, কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা বেঁধে বংশানুক্রমে বাস করে তারও ঠিক নেই। এখানে যে কয়খান দোকান আছে, তার সকলগুলিতেই কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় থাকে, আর প্রত্যহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিষের আমদানীও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ী কি বলদ বা ঘোড়ার উপর জিনিষ পত্র চাপিয়ে একস্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার যো নেই। পাহাড়ে ঘোড়াই হোক আর বলদই হোক এই সকল দুর্গমপথে তারা বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ দুরারোহ, তার উপর এত সংকীর্ণ যে বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলা ফেরা করতে পারে না, আর যদিই বা তা সম্ভব হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁফিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রকায় কষ্টসহ ছাগল জাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর করচে। বাঙ্গলা দেশে যখন ছিলুম তখন জানতুম মা দুর্গার কাছে বলি দেওয়া ছাড়া ছাগলের ছাগজন্ম সার্থকের আর কোন পথ নেই, এমন কি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মুগ্ধ গুপ্ত কবি লিখে গিয়েছেন "এমন পাঁঠার নাম কে রেখেছে বোকা, শুধু সেই বোকা নয় তার ঝাড়ে

বংশে বোকা।" উদর-পরায়ণতার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি রহস্যপূর্ব্বক মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়ের 'বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত' সেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগদুগ্ধ পানে উদরাময় নিরাকৃত হয়, এরূপও শুনা গিয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশ ছাগবংশের প্রতি যা কিছু কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই বরফরাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই এখানে রেলওয়ের কাজ চলছে এবং ছাগলই এ দেশের সুখ সমৃদ্ধির কারণ হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিষ চাপিয়ে পাহাড় হতে পাহাড়ান্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন দিনও তাদের পদস্খলনের কথা শুনতে পাওয়া যায় নি। তবে এরা যেমন ছোট জানোয়ার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। বলিষ্ঠ ছাগলের পিঠেও দশ সেরের বেশী বোঝা চাপাতে দেখিনি, কিন্তু এরা তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেক দূর চলতে হয় বলে বোঝা লঘু করা হয়, আর যখন দলে দলে ছাগল এই কাজে লাগান হয় তখন বোঝা ছোট হওয়াতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষতিও হয় না, বরং বেশী বোঝা দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হয়ে পড়ে ত বিপদের কথা। এই সকল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমনও নয়। ভোট ও তিব্বতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কেনবার জন্যে দলে দলে ছাগল নিয়ে আসে। চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আষাঢ়ের কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বৃহদাকৃতি ছাগল যাতায়াত করে। তার পর যখন বর্ষা নামে তখন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরণা সকল হ'তে অবিশ্রাম জল ঝরতে থাকে, পথও দারুণ পিচ্ছিল হয়, তখন চলাচল এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠে। তার পরে শীতকাল— তখন ত বরফে রাস্তাঘাট সমস্তই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং যা কিছু কেনাবেচা তা এই ক মাসের মধ্যেই শেষ করে নিতে হয়।

বদরিনাথে একটা মন্দির আছে, মন্দিরটি দেখতে তত পুরাণ ব'লে বোধ হয় না। তবে যে অল্পদিনের মন্দির তাও নয়। মন্দিরের বাহিরে চার পাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারদিকে একটা এক মহলা ছোঠ চক; তাতে অনেক ছোট খাট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পাণ্ডাঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এদের স্থান হয়েছে তখন এরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত খাট নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এই সকল বিগ্রহের মাথায় দুই এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামী দেয়)। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কপাট অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই, মন্দিরের গায়ে বিশেষ কিছু কারুকার্য্য দেখলুম না, আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্র-বিহীন এও তাই, তবে দেবমাহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচুতে কালীঘাটের মন্দির চেয়েও খাট বলে বোধ হলো। তবে এটি আগাগোড়া পাথরে গাঁথা—এ পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্ম্মিত তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়, বরং ইষ্টক-নির্ম্মিত হলেই একটু আশ্চর্য্য হবার কারণ থাকতো। এ দিকে যত মন্দির দেখলুম সকলগুলিই পাথরে গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হয়েছে। কিন্তু উপরেই বলেছি বাহ্য দৃশ্যে তা তেমন জীর্ণ বলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নাই, ইহা বহু-প্রাচীন জনপ্রবাদ, এবং তার কতক কতক প্রমাণও যে নেই এমন নহে। কিন্তু মন্দিরটি দেখ্‌লে কেহই বিশ্বাস করবেন না যে এটি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত, এমন আধুনিকের মত দেখায়। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, কিন্তু পরে

ভেবে দেখ্‌লুম যে মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট ন মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌদ্র বৃষ্টির সঙ্গেও বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং তার উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু আর বেশী দিন বেমেরামত অবস্থায় রাখা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাধ্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ করেছেন, তবে কত দিনে যে এই কাজ শেষ হবে, কখনও হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ জ্ঞান না থাকলে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বলা ভারি শক্ত। হয়ত মেরামত শেষ হতে না হতে আরও দুচার জন মোহান্তের জীবন কাল কেটে যাবে। কারণ, একেত বছরে দু তিন মাসের বেশী কাজ হবার যো নাই, তার উপর যে রকম "গদাই লস্কর" ভাবে কাজ চল্‌চে তাতে একদিক গোড়ে তুল্‌তে, আর একদিক ভেঙ্গে না পড়ে! হায় কলিকাল! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা থাকৃতে নারায়ণের মন্দির মেরামতের জন্য আজ কিনা সামান্য রাজমিস্ত্রী তাদের দুর্ব্বল হাতে ছোট ছোট পাথরের চাপ নিয়ে টানাটানি করচে এবং যতটুক কাজ করচে তার চেয়ে অনেক বেশী পয়সা ফাঁকি দিয়ে খাচ্চে—এদের নরকেও স্থান হবে না!

এখন পর্য্যন্ত অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি, কিন্তু বাল্যকাল হতে শুনে আসছি বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্ত্তি পরশ পাথরে নির্ম্মিত। স্পর্শমণি উপকথার বস্তু, এবং কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে রকম একটা জিনিষের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল। বাটাবিভ্রাটের ভয়টা ত কমে যেতই, তা ছাড়া ইনকম্ ট্যাক্সের জন্যও এতটা কষ্ট পেতে হতো না, এবং অনাহারে থেকে ভদ্রতার দণ্ডস্বরূপ ঘটি বাটী বিক্রয় করে ট্যাক্স দেবার দায় হতেও অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। কিন্তু কবিতা ও কল্পনাতে যা মেলে এ নিষ্ফলতার পৃথিবীতে তা কোথা হতে মিল্‌বে? দেশে থাকতে কতদিন শুনেছি, কখন ঠাকুরমার কাছে কখন বা বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে—হিমালয় পর্ব্বতে এমন সব যোগীঋষি আছেন যাঁরা যোগবলে ভস্মকে কাঞ্চন এবং বিষকে অমৃত করতে পারেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ পর্য্যন্ত বিষের জ্বালা অনেক সহ্য কল্লুম বটে, কিন্তু অমৃতের আস্বাদন ত বড় একটা ঘটল না, তা ঘটলে বোধ করি আবার এই সংসারের কর্ম্মভোগের মধ্যে এসে পড়তে হতো না। তবে এটুকুও বলা যেতে পারে যে অমৃতের আস্বাদন না পাই, এমন এক আধ জন সন্ন্যাসী দেখা গিয়েছে বটে যাঁরা সচ্চিদানন্দের করুণামৃত-ধারা পান করে জীবনকে কৃতার্থ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটেনি, তাঁদের সেই স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হলে সাংসারিক আসক্তি-পূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পাপহৃদয়ে যে আশ্বাসবাণীর ঘোষণা হয় আমরা তার উপযুক্ত নই, সুতরাং দুদিনের মধ্যে সে কুহকও অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন বাস্তবিকই একটা অনন্ত যাতনায় প্রাণ আকুল হয়ে উঠে, এবং কাতর হৃদয় বিদীর্ণ করে স্বতঃই ধ্বনিত হয়ঃ—

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে
শেষে দেখি হায়! ভেঙ্গে সব যায় ধুলা হয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে;
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে।"

রাতে শুয়ে হী হী করে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। বৈদান্তিকের সুখ-নিদ্রাটা আমার কাছে নিতান্ত চক্ষুশূল বলে বোধ হচ্ছিল। বিশেষ যতক্ষণ ঘুম না আসে চুপ করে পড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা কহাতে বোধ করি একটু বেশী আরাম আছে, কিছু না হোক কথাবার্ত্তায় শীতের প্রকোপটা অনেক কম বিবেচনা

হয়। অতএব বৈদান্তিকের সদ্যোজাত নিদ্রাটুকু বিনষ্ট কর্ত্তে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হলো না, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে বৈদান্তিক বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি যেই তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম "আচ্ছা নারায়ণের দেহ যে পরশ পাথরে নির্ম্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি? আমি ত অনেকক্ষণ ভেবে কিছুই ঠাহর কর্ত্তে পাল্লুম না সত্তি সত্তি পরশ পাথর ত আর নেই!"—আশু তর্কের একটী সুন্দর সম্ভাবনা দেখে ভায়ার নিদ্রা এবং বিরক্তি দুই এককালে দূর হয়ে গেল! তিনি সোৎসাহে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে বল্‌তে লাগলেন যে, পরশ পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল কচ্ছি, আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা নিগূঢ় অর্থ আছে—যাকে আজকাল আমরা আধ্যাত্মিক অর্থ বলে থাকি, এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাতও করে থাকেন। বোধ হয় তিনি আমার উপর কটাক্ষ করেই কথাটা বল্লেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি গুরু আমি শিষ্য, সুতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে শুন্‌তে লাগলুম। তিনি অর্দ্ধরাত্র-ব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা আমাকে যা বুঝালেন তার মোদ্দাখানা এই যে পরশ পাথরের গূঢ় অর্থ ধর্ম্ম। কারণ, কল্পিত পরশ পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোণা হয়ে যায়—তেমনি ধর্ম্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্রব্যও মূল্যবান হয় এবং যা নিতান্ত মলিন তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় হয়ে উঠে, লোকে তখন তা আগ্রহভরে কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়। নারায়ণের দেহ পরশ পাথর নির্ম্মিত, তার অর্থ কি না তিনি ধর্ম্মস্বরূপ, তাঁকে স্পর্শ করা দূরের কথা দর্শন মাত্র মানুষ খাঁটী সোণা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ পবিত্র করে তুলতে পারে—লোহাকে তুচ্ছ সোণা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে!

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাস্তবিকই বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্তৃতা আমার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা সসার কথা তাঁর কাছ হতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার হৃদয়ে আর একটা নূতন চিন্তার উদয় হলো—হায়! দেবতার পদতলে এসেও আমার সেই জীবনব্যাপিনী চিন্তা দূর হয়নি! আমার মনে হলো—এ সংসারে রমণীহৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে, এবং পুরুষের লৌহময় কঠোর হৃদয়কেও পুণ্যময় এবং পবিত্র ক'রে তুলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেলেছি। দেখি যদি হিন্দুর এই মহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই—যাতে এই পাপভার-নত ধূলিম্লান জীবনকে সজীব উজ্জ্বল এবং পবিত্র করে তুলতে পারে!

শ্রীজলধর সেন।

বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণ।

য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণ বাবিলোনীয়দিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্‌পরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকগণও প্রাচীনদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রতিষ্ঠার উচ্চাসন বাবিলোনীয়দিগকে দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারা এই উচ্চ সম্মানের উপযুক্ত পাত্র কি না তাহা বড় কেহ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই, এবং অনেকেই প্রাচীন লেখকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া পুরাতন মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীনগণের যুক্তিহীন কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের আমূল ইতিহাস যথাসম্ভব পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই প্রসঙ্গে বাবিলোনীয় জ্যোতিষের ইতিহাসও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে বাবিলনে প্রথম জ্যোতিষ-চর্চ্চা আরম্ভ হয় তাহা আজও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, এবং কোন সময়ে হইবে কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান। প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে দুই এক স্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অভ্যুদয়-কাল নিরূপণের কোনই সহায়তা করে না। কারণ, এই সকল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ কালের প্রায়ই একতা লক্ষিত হয় না এবং একাধিক গ্রন্থলিখিত, একই ঘটনার বিবরণ-মধ্যে অনেক সময়েই নানা পার্থক্য দেখা গিয়া থাকে। কাজেই এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির নানা গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত তাহা এখন নির্দ্দেশ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অন্যান্য উপায়ে নিরূপিত কাল ও বিবরণের উপরও সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বেলস্ নামক সুবিখ্যাত নৃপতির রাজত্বকালে জ্যোতিষ-চর্চ্চা বাবিলনে প্রথম আরম্ভ হয়। বেলস্ একজন নানা বিদ্যাপারদর্শী গুণবান নৃপতি ছিলেন, ইঁহার রাজত্বকালে অনেক জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য বেরোসস্ লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন সেগুলি সমস্তই উক্ত বাবিলোনীয় নৃপতি বেলস্ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেরোসস্ কেবল গ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন মাত্র।

সকল শাস্ত্রের মূলে প্রায়ই কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এই সকল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল বিশ্বাস দ্বারা কাজ করা শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা স্বতঃই একটি দৃঢ় অবলম্বন খুঁজিতে আরম্ভ করে, এবং শেষে পূর্ব্ববিশ্বাসের নানা সংস্কার করিয়া ও ইহাকে নানাপ্রকারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অন্ধবিশ্বাসের মূলগত সত্যটি আবিষ্কার করে, এবং

পূর্ব্বেকার ভিত্তিহীন শাস্ত্রকে সজীব ও সমূল করিয়া গড়িয়া তোলে। বাবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা কতকটা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ অধিবাসীগণ গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশমণ্ডলকে পার্থিব ঘটনাবলির অবিকল প্রতিবিম্ব বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং গ্রহাদির ভেদযোগ প্রভৃতি জ্যোতিষিক ব্যাপার সংঘটনকালীন পৃথিবী যে অবস্থায় থাকে ও যে সকল ঘটনা ইহাতে সংঘটিত হয় গ্রহাদির সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ ঘটনা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই লক্ষিত হইবে বলিয়া তাহাদের মনে দৃঢ় সংস্কার ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা ভবিষ্য ঘটনা জানা যায়, এ প্রকার বিশ্বাস আদিম বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণের মধ্যে ছিল না। পৃথিবীতে কোন একটি ঘটনা সংঘটিত হইবে, নভঃস্থ জ্যোতিষ্কগণ পরস্পর কি প্রকার অবস্থায় থাকিবে, এবং এতদুভয় মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি, তাহাই নির্ণয় করা ইহারা শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের মধ্যে আরও একটি বিশ্বাস অতি প্রবল ছিল। ইঁহারা বলিতেন,—অদ্য পৃথিবীতে যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ হইল তিনশত ষাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে অবিকল সেই সকল ঘটনা পৃথিবীতে লক্ষিত হইয়াছিল, এবং ৩৬০,০০০ হাজার বৎসর পরেও ঠিক ঐ ঘটনাগুলি সংঘটিত হইবে।

জ্যোতিষীগণ কি প্রকারে গণনা করিয়া এই তিনশত ষাইট হাজার সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। অনেকেই বলেন গ্রহাদি পরিদর্শন বা অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলম্বনে উক্ত সংখ্যা আবিষ্কৃত হয় নাই। সেমাইট (Semite) ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মূল সংখ্যা ছয়কে দশ (উভয় হস্তের অঙ্গুলি সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ৬০-কে বাবিলোনীয়গণ সস্ বলিত, এবং ইহাকে আবার দশ দ্বারা গুণ করিয়া লব্ধ সংখ্যা ৬০০ শত নার্ নামে অভিহিত হইত। এই শেষোক্ত সংখ্যাটি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, এবং ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে আগত পবিত্র সংখ্যা বলিয়া পূজ্য ছিল। ইহা হইতে আজকাল অনেকেই অনুমান করিতেছেন, এই স্বর্গীয় ও পবিত্র সংখ্যা ৬০০ শতের বর্গ করিয়াই সম্ভবতঃ বাবিলোনীয়গণ ৩৬০,০০০ সংখ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, বাবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার এই প্রথম উদ্যমের ইতিহাসে কোনই বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। যে কোন জাতির আদিম ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুই একটি সংস্কার প্রায়ইলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশব-প্রকৃতি ঘোর অসভ্যজাতির মধ্যেও সৃষ্টিপ্রকরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ অনেক আজগুবি সিদ্ধান্ত বড় দুষ্প্রাপ্য নহে।

বাবিলনে প্রকৃত জ্যোতিষচর্চ্চার সূত্রপাত ঠিক কোন সময়ে হয় তাহার স্থিরতা নাই। আকাডিয়ানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব সাত সহস্র অব্দে লিখিত যে সকল গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রহণাদির পূর্ণ বিবরণ ও গ্রহোপগ্রহাদির উদয়াস্ত সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় খৃঃ পূঃ সপ্ত সহস্রাব্দে বাবিলোনীয় পণ্ডিতগণ কিঞ্চিৎ জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন, এবং গ্রহতারকাদির

পরিদর্শন প্রথা তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রাচীন বাবিলনের কয়েকখানি প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে, ইহার সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার কাল নিরূপণার্থে কয়েক বৎসর হইল নানাবিধ চেষ্টা হইয়াছিল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তর-ফলকগুলি যথার্থই বাবিলনের খোদিত হইলে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু উক্ত প্রস্তরস্থ খোদিত গ্রহণাদির চিত্র ও বিবরণের মধ্যে কোনটিতেই সংঘটন-কালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে এগুলি অপ্রকৃত এবং আধুনিক সময়ে খোদিত বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছেন। কাজেই জ্যোতিষচর্চ্চারম্ভের প্রকৃত কাল নির্ণয় অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাবিলোনীয় পণ্ডিতগণ নভঃস্থ দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কগণকে নানা অংশে বিভক্ত করিতেন। এই গ্রহনক্ষত্রযুক্ত আকাশের অংশ সকল এক একটি পৃথক দেবতার নামে অভিহিত করিয়া তৎ তৎ দেবতার নির্দ্দিষ্ট গুণাবলি তারকামণ্ডলিতে আরোপিত করিতেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এই শৈশবাবস্থায় গ্রহাদি নামকরণের পূর্ব্বোক্ত প্রথা প্রচলিত থাকায় আকাশের তাৎকালিক অবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এক এক দিগাংশস্থ সকল গ্রহতারা একই নামে অভিহিত হওয়ায়, এবং কখন কখন গতি বৈচিত্র্য দ্বারা একই জ্যোতিষ্ক একাধিক নামে আখ্যাত হওয়ায়, প্রাচীন গ্রন্থোল্লিখিত গ্রহাদির সম্যক পরিচয় পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। এতদ্ব্যতীত এক জাতীয় সাতটি করিয়া জ্যোতিষ্ক লইয়া শ্রেণী-বিভাগদ্বারা নামকরণ প্রথা কয়েক খানি গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক গ্রন্থে সপ্তগ্রহ ও সপ্ত যমজ তারকা ডিফু ও মাস্থু নামে অভিহিত হইয়াছে শুনা যায়। এই গ্রন্থে নামকরণের আরও একটি অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আকাশের যে অংশে যে জ্যোতিষ্ক অবস্থিত সেই অংশের নামানুসারে গ্রহগণের নামকরণ হইত, এবং এই প্রকার এক একটি তারকাপুঞ্জ এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতা কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া কল্পনা করিয়া উক্ত দেবতাগণকে বৎসরের নানা অংশের অধিপতিরূপে উল্লেখ করা হইত।

প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থাদি পাঠ করিলে বাবিলোনীয়দিগের জ্যোতিষ চর্চ্চার একটী গূঢ় কারণ দৃষ্টিগোচর হয়। আজকাল আমরা যে উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা করি তাহাদের সেই উচ্চতর উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না, কোন প্রকারে শুভাশুভ লক্ষণাদি জ্ঞাত হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বোধ হয়, এই হীন উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ চর্চ্চা আরম্ভ হওয়া বশতই ইহার আশানুরূপ উন্নতির কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। তাহাদের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটি পরিতৃপ্ত হইলেই যাহারা যথেষ্ট মনে করিত, এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ গ্রহ তারকাদির গতিবিধি নির্দ্ধারণ তাহাদের নিকট একটি অনাবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন একটি আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল স্থির করিতে হইলে বাবি-লোনীয়গণ সাধারণতঃ আকাশকে আট সমানাংশে বিভক্ত করিত এবং প্রত্যেক বিভাগস্থ নক্ষত্র সকল কি অবস্থায় আছে তাহা পরিদর্শন করিয়া আবার কোন সময়ে জ্যোতিষ্কগণ

ঠিক উক্ত প্রকার অবস্থায় ছিল তাহা পঞ্জিকা সাহায্যে দেখিয়া সেই অতীত কালের সংঘটিত কার্য্যাদির যে ফল হইয়াছিল বর্ত্তমান কালেও অবিকল সেই ফল হইবে বলিয়া স্থির করিত।

মানবজাতির মধ্যে একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই প্রথমতঃ কাল ও স্থান দুইটি জগতের চিরন্তন সামগ্রীর উপর তাহাদের মন স্বতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং ক্রমে এই অনন্ত ও অব্যয় ভাবদ্বয়কে মানববুদ্ধির ক্ষুদ্র ভাব মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ইহাদের একটা স্মৃতি যাহাতে থাকিয়া যায় তাহার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার আবির্ভাব হয়, এবং এই চেষ্টার ফলস্বরূপ সময়াদি পরিমাপের একটি স্থূল নিয়ম আবিষ্কৃত হয়। এই কারণেই বোধ হয় সময়ের স্থূল পরিমাপ বিষয়ে মহা অসভ্য জাতি হইতে সভ্যতম জাতি মধ্যেও একই নিয়ম বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঋতু পরিবর্ত্তনটি সহজ দৃশ্য ও সুবৃহৎ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, ইহাদ্বারা সময় নির্দ্দেশ করিবার প্রথা সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। এক ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ঋতুর পুনরাগমন পর্য্যন্ত কালটিকে সকলেই স্থূল সময় গণনার পরিমাপ দণ্ড-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানালোকবর্জ্জিত মহারণ্যবাসী কাফ্রির মধ্যেও কাল গণনার এই নিয়মটি লক্ষিত হয়। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই, সুসভ্য জাতিগণ সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা এই কালকে বৎসর নামে অভিহিত করিয়া গণনা কার্য্যের সুবিধার্থে বৎসরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে মাত্র। বাবিলোনীয়দেরও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মে বৎসর গণনাপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাস ইত্যাদি গণনাকার্য্যে ইহাদের সহিত অন্যান্য জাতীয় প্রথার কিছুই ঐক্য লক্ষিত হয় না। ইহারা বৎসরকে দশমাসে বিভক্ত করিত, কিন্তু ইহাদের বৎসর ঠিক কতদিনে পূর্ণ হইত তাহা জানিতে না পারায় মাসের দিনসংখ্যা কত ছিল তাহা এখন আর জানিবার যথার্থ উপায় নাই। তবে যে আজকালের মত চন্দ্রমাস প্রচলিত ছিলনা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, ত্রিশদিনের মাস গণিত হইলে দুই তিন বৎসর পরে মাসের সহিত ঋতুর একতা ক্রমে লোপ পাইয়া নানা বিভ্রাট উপস্থিত করিত। এইজন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বাবিলোনীয় মাস ৩৬ দিন পূর্ণ হইয়া দশমাসে বৎসর শেষ করিত। ঈজিপ্টের ন্যায়, প্রাচীন বাবিলোনে মাসের বিশেষ কোন নাম ছিল না। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা মাসের পরিচয় পাওয়া যাইত। এই প্রথা বহুকাল ধরিয়া বাবিলনে প্রচলিত ছিল। আকাডিয়ানদিগের অভ্যুদয়ের অনেক পরে ইহারা মাসের নামকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

বাবিলোনীয়গণ মাস গণনার পূর্ব্বোক্ত নিয়ম কয়েক শতাব্দি পরে পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে গণনাপ্রথার সংস্কার করিয়া অধুনাতন নিয়মে দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। বোধ হয় চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ত্রিশ দিনে মাস গণনা সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় এই নবপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৭০০০ অব্দে বাবিলন আকাডিয়ানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে জেতাগণের প্রভাবে বাবিলনের

প্রাচীন গণনাপ্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, এবং জেতাগণেরও জাতীয় প্রথায়-ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। আকাডিয়ানগণ পূর্ব্বে ত্রয়োদশ ভাগে বৎসর বিভক্ত করিয়া ২৮ দিনে মাস পূর্ণ করিত। কিন্তু বাবিলন জয়ের পর বিজিতগণ মধ্যে মাস গণনার অভিনবপ্রথা দেখিয়া তাহারা ভ্রমসঙ্কুল জাতীয় প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বাবিলনের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতি মাস ত্রিশদিনে পূর্ণ করিয়া এই প্রকার দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং এই গণনা দ্বারা সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন অপেক্ষা কমিয়া যায় দেখিয়া কোন কোন বৎসর ত্রয়োদশ মাসে পূর্ণ করিয়া বৎসরের অল্পতা পূরণ করিত। এই পরিপূরক মাস পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অনির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্ধারিত হইত। আকাডিয়ান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাবিলোনীয়গণও বৎসরের পূর্ব্বোক্ত স্বল্পতা অন্য উপায়ে পূরণ করিতেন। ইহারা প্রতি বৎসরের একটি একটি নির্দ্দিষ্ট মাসের বিংশতি দিবসের পর উপর্য্যুপরি দুই দিবস এক-বিংশতি দিবস বলিয়া গণনা করিতেন। জ্যোতিষের সকল ব্যাপারেই আকাডিয়ানগণ প্রাচীন বাবিলোনীয়দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে আকা-ডিয়ানদের প্রাধান্য দেখা যায়। দিন ও মাসের পৃথক পৃথক নামকরণ দ্বারা যে সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ইহারা বেশ বুঝিত। প্রতি মাস চারি সমানভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগস্থ দিন সকল পরিজ্ঞাত গ্রহাদির নামানুসারে আখ্যাত করা ইহাদের মধ্যে একটি সুন্দর প্রথা ছিল। অনেকে অনুমান করেন দিবসাদি নামকরণের আধুনিক প্রচলিত প্রথা আকাডিয়ান জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বাবিলোনীয়গণ তাহাদের প্রাচীন নামকরণ প্রথা পূর্ব্বাপর এক অবস্থায় রাখে নাই। কাল সহকারে ইহার অপকর্ষতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে জোতিষ্কগণ সুবিধাজনক নামে অভিহিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে আকাডিয়ান প্রথা অনু-সরণ করে নাই। পরস্পর নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রত্যেক পুঞ্জকে পশু ইত্যাদির প্রতিকৃতি কল্পনা করিয়া তাহারা এগুলিকে মেষ বৃষ মহিষাদি জীবগণের নামে অভিহিত করিত। নক্ষত্র নামকরণের অন্যান্য অনেক প্রকৃষ্টতর উপায় থাকিতে বাবি-লোনীয়গণ কেন যে এই অপূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। যে যে জীবের নামে নক্ষত্রপুঞ্জকে অভিহিত করা হইত, তাহাদের সহিত জীবদিগের আকৃতিগত যে কোন সৌসাদৃশ্য ছিল তাহা কোনক্রমেই বোধ হয় না। অধুনাতন চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অনুমাণ করেন নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় ঋতুতে কর্ত্তব্য কৃষি বাণিজ্যাদির উল্লেখ করিয়া তদর্থে আবশ্যকীয় জীবাদির নামে তারকাপুঞ্জগুলিও আখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্যোতিষ্কগণের নামকরণ কার্য্য শেষ হইলে বাবিলোনীয় জ্যোতির্বী-গণ উল্লিখিত জ্যোতিষিক সঙ্কেত ও প্রতিকৃতি ইত্যাদির সাহায্যে রাশিচক্র বিভাগ দ্বারা তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল সকল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধু-নিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন,—এই রাশিচক্র লিখন প্রথা বাবিলোনীয়গণ সর্ব্ব

প্রথম উদ্ভাবন করেন এবং বহু শতাব্দি পরে ইজীপ্টের জ্যোতিষীরা বাবিলনে ইহা শিক্ষা করিয়া পরে পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এই প্রথার বিস্তার করেন।

যদিও বাবিলোনীয়গণ তাঁহাদের উন্নতি যুগের শেষাংশে জ্যোতিষ্কগণের নামকরণাদির উপযোগিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিকগণের নিকট সেই সকল নাম সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ বহু গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিয়াও কোন জ্যোতিষ্কটি বাস্তবিক কি নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা এখন পরিজ্ঞাত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে অল্পদিন হইল পূর্ব্ববর্ণিত রাশিচক্রাঙ্কিত কয়েকখানি সুবৃহৎ প্রস্তর-ফলক একটি প্রাচীন বাবিলোনীয় ভজনালয়ের তলদেশে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বাবিলোনীয় ভবিষ্যৎবক্তাদিগের কয়েকখানি প্রাচীন পঞ্জিকার উদ্ধার সাধিত হওয়ায়, ইহাদের দ্বারা নক্ষত্রাদির পরিচয় অবগতির কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাবিলোনীয়গণ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাদের গতি নির্দ্ধারণ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। জ্যোতিষ্ক সকল গতিশীল ও ইহারা রাত্রিকালে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করে, বাবিলোনীয়গণ ইহাই জানা যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিত। পৃথিবীর কক্ষে বিষুবরেখা হেলিয়া থাকায় দক্ষিণাকাশস্থ যে সকল নক্ষত্র প্রায়ই অদৃশ্য থাকে তাহাদের আকস্মিক উদয় বাবিলোনীয়গণ বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ করিত, এবং এই সকল নক্ষত্রের উদয়কালে তাহারা নানাবিধ শুভ ও দৈবকার্য্য মহোৎসবে সম্পন্ন করিত। গ্রহদিগের জটিল গতির বিষয় ইহারা কিছুই জানিত না এবং বাহ্যতঃ ইহাদের গতি উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক দেখিয়া গ্রহগণকে অপদেবতা বলিয়া ভয় করিত ও শান্তপ্রকৃতি দেবগণের আশু বিঘ্নশান্তি মানসে সর্ব্বাগ্রে জগতের নিয়ম সংহারকারী দুষ্ট গ্রহগণকে পূজাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিত। অনেকে অনুমান করেন এই সময় হইতেই সুপ্রসিদ্ধ সেমেটিক ধর্ম্ম সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। বাবিলোনীয়গণ কেবলমাত্র কাল্পনিক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া সপ্তগ্রহকে তাহাদের উপাস্য দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল এবং অবিকল একই কারণে দুর্ভিক্ষ, মারিভয়, বজ্রাগ্নি ভয়াদি আপদকেও দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহারা চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকে একটি মহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া ভয় করিত। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার এই মত পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণকে একটি শুভ চিহ্ন বলিয়া দেখিত।

আধুনিক জ্যোতিষীদিগের নিকট বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র যে সর্ব্বাংশে হীন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ডায়োডোনস্ নামক জনেক খ্যাতনামা বাবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণব্যাপার বাবিলনের জ্যোতির্ব্বিদগণ কিছুই বুঝিতেন না, এবং কি উপায়ে গ্রহণের কাল নিরূপিত হয় সে বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। বেরোসস্ স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বাবিলোনীয়গণ চন্দ্রের একার্দ্ধ উজ্জ্বল এবং অপরার্দ্ধ চিরতমসাবৃত বলিয়া বিশ্বাস করিত। দুই একখানি প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থেও জ্যোতিষ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুই একটি ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ইহাও বাবিলনীয়দিগের ভুল বিশ্বাসের ফল মাত্র। বাবিলোনীয় জ্যোতিষ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের পর ক্রমে ইজীপ্টে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তদ্‌পরবর্ত্তী গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারগণ তাৎকালিক সার্ব্বভৌম বিদ্যার কেন্দ্রস্থল আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে সম্ভবতঃ ঐ সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কি উপায়ে বাবিলন হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র ইজিপ্ট ও অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে সময়ে য়িহুদী, সিরিয়ান্, ও বাবিলোনীয়গণ সিলুসিডিয়াগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইজিপ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইহারা বাবিলোনীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও তদানুসঙ্গিক কুসংস্কারাদিও সঙ্গে আনিয়া তদ্‌সাহায্যে জাতীয় উৎসব ও পূজাদি সম্পন্ন করিত। নূতন অধিবাসীগণ এই প্রকারে তাহাদের জাতীয় বিশ্বাসাদি ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ইজিপ্সীয়ান্ পণ্ডিতগণ বাবিলোনীয় জ্যোতিষের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া তাহা নানা দেশে বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

উপসংহারে বক্তব্য এইমাত্র যে, অনেকে মনে করেন আধুনিক উন্নত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বাবিলনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। বাবিলনের প্রাচীন গ্রন্থকার বেরোসসের লুপ্ত গ্রন্থ সকলের যদি সম্পূর্ণ উদ্ধার হইত তাহা হইলেও যে আমরা বিশেষ কোন শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাইতাম, এরূপও আশা করা যায় না। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঘোর তমসাচ্ছন্ন প্রাচীনকালেও জোতির্ব্বিদ্যার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করা বাবিলোনীয়গণ কর্ত্তব্য স্বরূপে জ্ঞান করিতেন, এবং অধুনাতন কালের পরম্পরাগত শিক্ষার সুফল ও আকাশ পরিদর্শনার্থ আবশ্যকীয় সুন্দর যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রাচীন জ্যোতিষীগণ যে তাঁহাদের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ইহাও বড় কম গৌরবের বিষয় নহে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

গল্প ত অল্প—।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ!—হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে ব্যথা ধরে গেল। আরে না হেসে কি থাকা যায়—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! বাপ্, কি ভয়টাই পেয়েছিলুম! এখনও মনে হলে গায় কাঁটা দেয়। কথাটা কি? তাই ত বল্‌চি। বল্‌তে গেলেই হাসি পায়। অত ব্যস্ত করিস্ কেন? রোস না, বল্‌চি।

দেখ্ ভাই ছিরে, যখন আমি সহরে চাকরি কোর্‌তে আসি তখন সব আমায় পাড়াগেঁয়ে ভূত বল্‌ত—বুঝেছিস্, ভূত। ভূত ও বুঝি সহরে আর পাড়াগেঁয়ে হয়। পাড়াগাঁয়ে ছেলে-বেলায় কি কর্‌তাম জানিস ত? চৌধুরীদের বাগান থেকে জামরুল পেড়ে খেতুম, শালিক পাখীর বাসা থেকে ছানা পেড়ে আন্‌তুম। একবার সেই ভট্‌চায্যিদের মাচা থেকে লাউ পেড়ে আন্‌তে—বাপ্! কি মারটাই মেরেছিল! পাড়াগেঁয়ে ভূতের বুঝি এই সব কাজ! আর সহরে ভূত বুঝি গায়ে গন্ধ মেখে, হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে, বুকে চাদর এঁটে গড়ের মাঠে বেড়িয়া বেড়ায়! তখন তখন পাড়াগেঁয়ে ছিলুম বইকি! আরে তোর চেয়ার টেবিল সোফা, বাহারে বাহারে ছবি, অত শত সাত সতের পাড়াগাঁয়ে কে জানে?

তখন ভাই কথায় কথায় নাকাল হতুম। নতুন নতুন কথা শুন্‌তেই দিন যেত। বাবু বল্লে, "ও কেনারাম, ড্রয়িং রুম থেকে অ্যালবাম্‌টা নিয়ে আয় ত!" কি বলেরে বাবা! যদি জিজ্ঞাসা কর্‌তে যাই ত তেড়ে খেতে আসে। সেই সাজান ঘরটায় গোটাকতক ছোট ছোট পিঁড়ী ছিল, তার উপর আবার গদি মোড়া—ঠিক যেন শালগ্রামের সিংহাসন। আমি অনেক ঠাউরে তাই একটা নিয়ে এলুম। বাবুর হাসির চোটে ঘর ফেটে গেল। "আন্‌তে বল্লুম অ্যালবাম্ নিয়ে এল ফুট্‌ষ্টুল!—বেটা পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না!" বাড়ীর ভিতরে ছেলে মেয়েরা সারাদিন আমার কথার ছল ধর্‌ত আর আমায় ক্ষেপাত। তাদের উপদ্রবে পাড়া-গেঁয়ে ভূত সহর ছেড়ে পালায় আর কি!

সেই এক কাল গিয়েছে—বুঝ্‌লি ছিরে? কই, এখন ত আর কেউ পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে না। আজ কালকার দিনে ভূত ও আবার মানুষ হয়। এখন আমি বাবুর খাস চাকর। আমি কাপড় না কুঁচিয়ে দিলে বাবুর এখন পছন্দ হয় না, সখের যত জিনিস আমি না এনে দিলে এখন আর মনে ধরে না। বাবা, সেই কেনারাম, পাড়াগেঁয়ে ভূত—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! গল্পটা কি? আরে, তাইত বল্‌চি—তা অত তাড়াতাড়ি কেন? গল্প বল্‌চি না ত পাঁচালি গাইচি না কি? হ্যাঁ দেখ্, ছিরে, অমন করে তাড়া দিলে সব ভুলে যাব, আসল কথাটাই বলা হবে না। তুই ততক্ষণ আর একবার তামুক খা না! হ্যাঁ ভাই, বল্‌ছিলাম কি যে এখনত আর পাড়াগেঁয়ে ভূত নই। বাপ্, কতই দেখ্‌লুম, কতই শিখ্‌লুম এই সহরে এসে! এই যে জুতো পায় দিয়ে রয়েচি বাপ পিতামহ কি কখন এমন দেখেছিল? বাবুর কাপড় যখন কোঁচাই তখন কি আমার একখানা কাপড় কোঁচাই নে? বাবু বেড়াতে গেলে আমি—ঘর আগ্‌লে বসে থাকি, কেমন? তা আমার ত প্রাণে কোন সাধ যায় না? আমায় কত বিশ্বাস, জানিস্? ওসব গন্ধ জিনিস টিনিস আমার হাতেই থাকে—বুঝেছিস্? তা আমি—সে কি আবার বল্‌তে হবে না কি? মদটা আসটাও বাবুর একটু আধটু চলে—সেও আমার হাতে। এখন আর পাড়াগেঁয়ে ভূত নেই—এখন নড়্‌তে চড়্‌তে কেনারাম—কেনারাম নইলে আর কিছু হয় না। তা এই যে বাবু পাঁচ শো টাকা মাইনে পায় আর আমি আট টাকার চাকর, বাবুতে আর আমাতে তফাৎ কি! বাবু না হয় লিখ্‌তে পড়্‌তে

শিখেছে আমি শিখিনি—এই যা। বাবু কি আমার চেয়ে সেয়ানা? আমি যে তাকে এই এত ঠকাই সে কি কিছু টের পায়? কি বল্লি, কপাল? তাই হবে।

গল্পটা বল্‌ব? এই বলি। আরে সে বড় মজার—বাপ্, এমন ভয় আমি কখন পাই নি। গেল বার পূজার সময়, বুঝেছিস্, বাবু বাড়ী যাবে বলে অনেক জিনিস কিনেছিল। আমিও দেশে যাব—কিছু কিনেছিলুম। যাবার দু দিন আগে রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া কোরে, জিনিস পত্র সব দেখে শুনে বাবু ঘুমুল। ঘরে একটা ছোট্ট আলো এক কোনে ঢাকা ছিল—প্রায় অন্ধকার, বেশী আলো থাক্‌লে বাবুর ঘুম হয় না। আমি বাবুর পাশের ঘরে শুয়েছি। খানিক ক্ষণ আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম কত কি ভেবে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম।

"সাপ!"

"বাপ!" বলে চেঁচিয়ে এক লাফে আমি ঘরের বাহিরের বারান্দায়।

বাবু ডাকে, "ওরে কেনারাম, দৌড়ে আয়। আমায় সাপে কাম্‌ড়েছে! একবার দেখে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি ঘরে ঢুকি আর আমাকেও খাক্! চাকরী কোর্‌তে এসেছি বলে ত আর প্রাণ দিতে আসি নি। আমি বল্লুম, "বাবু, আমি চল্লুম ডাক্তারের কাছে।"

বাবু বলে, "আরে, না, না, ডাক্তার আস্‌তে ততক্ষণ অমি মরে থাক্‌ব। শীঘ্র এসে আমার পা বেঁধে দিয়ে তবে ডাক্তার ডাক্‌তে যা।"

আমি বল্লুম, "বাবু আপনি তবে বাইরে বেরিয়ে আসুন। ও ঘরে যেতে আমার বড় ভয় কোর্‌চে। আমায় যদি তেড়ে খায়!"

"তবে রে বেটা নেমকহারাম, আমি মরি আর তোর প্রাণের ভয় বড় হল!"

আমি বল্লুম, "বাবু, আপনার যা হবার তা ত হয়েচে, আমায় আর কেন মারেন! আপনি বেরিয়ে আসুন না।"

বাবু বল্‌লে "আরে কেনারাম, আমি যদি চল্‌তেই পার্‌ব তা হলে আর তোকে ডাক্‌ব কেন? আমার সর্ব্ব শরীর কেমন কোর্‌চে, মাথা ঘুর্‌চে, কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে। অমি মরি, আর তুই এসে একবার আমায় দেখবি নে? তোর শরীরে কি দয়ামায়া নেই!"

দেখ্ ভাই ছিরে, তখন আর চুপ কোরে থাক্‌তে পার্‌লুম না। দেশলাই কাঠি একটা জেলে আলো জাল্‌লুম। দরজার একটা হুড়্‌কো ছিল সেইটে না নিয়ে বাবুর ঘরের দরজা গোড়ায় গেলুম। হুড়্‌কটা রেখেছি এগিয়ে—যদি কিছু দেখি ত এক ঘা দিয়েই দেব দৌড়। আমায় দেখে বাবু বলে, "আয়না, তোর কোন ভয় নেই।" না, তা কি আর আছে! হয়ত ঘরের ভিতর গজ্‌রাচ্ছে, আমি গেলেই আমায় খেয়ে ফেল্‌বে! সে কথাটা আর না বলে প্রাণটা হাতে কোরে আমি বাবুর কাছে গেলুম। বাবু ঘরের কোনে মাটীতে বসে আছে, দরদর করে ঘাম পড়্‌চে, চোক কপালে উঠেচে। আমি দেখে ভাব্‌লুম আর ডাক্তার ডেকে কি হবে! যার কাল এসেচে তাঁকে আর ডাক্তারে কি কোর্‌বে! বাবুর পায়ের বুড়

আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়্‌চে। বাপ্‌রে কি সর্ব্বনেশে কামড়্‌টাই কাম্‌ড়েছে! বাবু কোঁচার কাপড় এঁটে হাঁটুর নীচে বেঁধেচে। আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বাবু, সেই—নতাটা—কোথায়!"

বাবুর সর্ব্বশরীর এলিয়ে পড়্‌চে। বল্‌লে, "ওই খাটের ভিতর ছিল, কি জানি এখন কোথায় আছে?"

আমি দূর থেকে আলোটা তুলে ধরে মশারির ভিতর চেয়ে দেখি—ওরে বাবারে! আমি বাবুকে একেবারে হড়্ হড়্ কোরে টেনে আমার ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ কোরে দিলুম। খাটের ভিতর এতখানি চক্র ধোরে—বাপ্‌রে, গিয়েছিলুম আর কি!

বাবু বল্লে, "দেখ্‌চিস কি, বাঁধ্, বাঁধ্, যা কিছু থাকে তাই দিয়ে প্রাণপণে বাঁধ্ যেন বিষটা না ওঠে।"

এদিকে বিষ যে প্রায় মাথায় উঠ্‌ল বাবু তার কিছুই টের পায়নি। আমি তার মন বোঝাবার জন্য আলনার দড়ী ছিঁড়ে পায় খুব করে বাঁধ্‌লুম।' যেখানে যেখানে বাঁধ্‌লুম তার দুই দিক ফুলে উঠ্‌ল। তখন বাবু বল্লে, "ওটা কি এখনও খাটে আছে না কি?"

"আছে বই কি!"

"তবে একবার ভাল করে দেখ্ দেখি। যদি জাত সাপ না হয় ত কোন ভয় নেই।"

রাত্রে না কি আর কিছুতে থায়! তবু যদি চক্র আমি না দেখ্‌তুম! তা সে কথা বল্‌লে বাবু আরও ভয় পাবে বলে আমি আলোটা হাতে কোরে একটা জান্‌লা খুলে দেখলুম! সেখান থেকে বেশ দেখা যায়, কোন ভয়ও নেই। চক্র—কই—নেই ত! প্রথম বার দেখ্‌বার ভুল হয় নি ত? কিন্তু মস্ত একটা বিছানায় পড়ে রয়েচে। জান্‌লায় ঠক্ ঠক্ কোরে শব্দ কোরলুম, তা নড়েও না চড়েও না। এ আবার কি জাতের! খোলষ ছাড়্‌ছে বুঝি, তা হলে খাটে উঠ্‌বে কেমন করে? গলা খাঁকরাণি দি, তবু নড়ে না। হুড়্‌কোটা নিয়ে খাটের বাজুতে বার কতক ঠক্‌ঠক্ কোরলুম—কিছুতেই কিছু হয় না। তখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে ওটা ঘায়েল হয়েচে। তবে আর ভয় কি! আর দু চার ঘা দিলেই হয়ে যাবে। দেখ্ ভাই ছিরে, এমন আশ্চর্য্য কখন দেখি নি। অত যে ভয় কোথায় যেন চলে গেল। বাবুকে বল্‌লুম, "বাবু, আপনি যখন খাট থেকে নামেন তখন কি ওটার ঘাড়ে পা দিয়েছিলেন?"

"অত কি আমার মনে আছে! কিন্তু আমার পায়ের তলায় যেন কি পড়েছিল।"

আমি বল্লুম, "তবে ঠিক হয়েছে। আপনার পায়ের তলায় পড়ে ওটা জখম হয়েচে।" এই বলে আমি বাবুকে তুলে ধরে দেখালুম। বাবু বলে, "হ্যাঁরে, ওই ট্রে রে! তা এখন ত কোন ভয় নেই, নড়্‌তে পার্‌চে না, তুই একবার দেখ না কি ওটা!"

"ভয় আবার কিসের? আমি এখুনি দেখ্‌চি," বলে অমি দরজা খুলে, হুড়্‌কো হাতে কোরে আস্তে আস্তে মশারির এক কোন তুলে একেবারে দে দমাদ্দম্! সাপের গুষ্টি সেখানে

থাক্‌লে তাদের নিব্বংশ কোরে ফেল্‌তুম। খাট খানা ভেঙ্গে যায় আর কি! তার পর যে আর নড়্‌বে না সে ত জানাই কথা। তখন আমি আলোটা কাছে নিয়ে ধরে দেখি—ও—হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! —ও—

বাবু বলে, "বেটা আমার শ্বাস হয়ে এল আর তুই হেসে বাড়ি মাথায় কোর্‌চিস্? আমায় ত সাপে খেয়েচে, আর তুই কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস্ না কি?"

আমি হাসি চাপ্‌তে না পেরে বল্‌লুম, "আপনিও দেখুন না এসে।" বলে আমি বাবুর হাত ধরে জোর কোরে টেনে নিয়ে এলুম। বাবু দেখে বলে, "সত্যি না কি!"

"সত্যি না ত আমি কি আর ভোজবাজি জানি না কি?"

বাবু বলে, "ওরে, বাঁধন গুল খুলে দে, পা সমস্ত টাটিয়ে উঠেচে যে!"

বাবুর পায় আট দিন ফুলো ছিল, আর দশ দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁট্‌ত।

বাবু বল্‌লে, "দেখ, কেনারাম তুই হাস্‌লি হাস্‌লি, অনেক দিনের চাকর, ক্ষতি নেই; আর আমি যে ভয় পেয়েছিলুম। তোর উপর এখন রাগ হচ্চে না কিন্তু খবরদার, আর কারুর কাছে যদি গল্প করিস্, টের পেলে তোকে তাড়িয়ে দেব।"

তা ভাই গল্পটা এই। জিনিসটা কি? বল্‌লে যে বাবু আমায় তাড়িয়ে দেবে! তোকে চুপি চুপি বল্‌ব, তুই কাউকে বল্‌বি নি? মাইরি, কাউকে বল্‌বি নি? আচ্ছা, তবে—খবরদার, খবরদার, যদি কাউকে বলিস। সেটা একটা রেশমের নতুন কোমর বন্ধ, বাবু দেখ্‌বার জন্য বার কোরে খাটে ভুলে ফেলে রেখেছিল। আঁউমাঁউ কোরে লাফিয়ে উঠ্‌তে বাবুর পায়ে একটা পেরেক ফুটে গিয়েছিল, তাইতে রক্ত বেরিয়েছিল। দেখ্ ভাই ছিরে, তোকে এই বল্‌লুম—চুপিচুপি—কেউ যেন না টের পায়, বুঝেছিস্? কি ভয়টাই পেয়েছিলুম, কি মজাটাই হয়েছিল—তোকে তাই চুপিচুপি বল্‌লুম—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চক্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌরীশঙ্করের মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে যথেষ্ট রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাজজাতি বিদেশী, দেশের শাসনকর্ত্তা বিদেশী, কিন্তু রাজদরবারে গৌরীশঙ্করের অত্যন্ত সম্মান। কাশীনাথ ইহা বুঝিতে না পারিয়া একবার এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "রাজকর্ম্মচারীরা কি করিতেছে, তাহাদের কি অভিসন্ধি জানিতে না পারিলে আমরা কি করিব? যাঁহারা আমাদিগকে এই কঠিন কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের আদেশানুসারে আমি রাজগৃহে যাতায়াত করি।"

বিস্মিত হইয়া কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে আবার কে নিয়োগ করিবে? আপনিই ত এ কর্ম্মে অগ্রণী।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "কেবল তোমাদের চক্ষে। আমি ত সামান্য নিমিত্ত মাত্র। এই মহৎ কর্ম্মে যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী তাঁহারা মহাপুরুষ। তাঁহারাই গুরু, পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক।" যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া গৌরীশঙ্কর মহাপুরুষদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

কাশীনাথ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কহিল, "তাঁহাদের দর্শন পাই না?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যথা সময়ে তাঁহারা স্বয়ং দর্শন দিবেন। দর্শন চাহিলে পাইবে না। যাহাকে তাঁহারা সাক্ষাৎ উপদেশ দিবার, অথবা কোন কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে দর্শন দেন। তুমি হয়ত শীঘ্রই দর্শন পাইবে। কিন্তু আপাততঃ আমার নিয়োগানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে।"

কাশীনাথ কহিল, "আমি কেবল আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছি।"

গৌরীশঙ্কর তির্য্যক্ দৃষ্টিতে মধ্যে মধ্যে কাশীনাথকে দেখিতেছিলেন। কাশীনাথের শেষ কথা শুনিয়া তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যদি পার ত তোমায় কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারি।"

কাশীনাথ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, "করিয়া দেখুন।"

"আমাদের সকল কথাই যে গোপনে হয় এ কথা তোমায় বলা নিষ্প্রয়োজন?"

"সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

"আমাদের দলভুক্ত নানা ব্যক্তি নানা স্থানে বাস করেন, আবশ্যক মত তাঁহাদিগকে

সংবাদ দিতে হয়, আবশ্যক মত লোক পাঠাইতে হয়। তোমাকে কয়েক স্থানে যাইতে হইবে।”

“স্বীকৃত আছি।”

“যাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি মনে করিয়া রাখ। আজি পূর্ণিমা। অমাবস্যার রাত্রে মন্দিরে সকলকে সমবেত হইতে হইবে। বলিও মহাপুরুষেরা কোন সম্বাদ পাঠাইবেন, তাহাই শ্রবণ করিতে হইবে।”

“পত্র লিখিয়া দিবেন?”

“একটী অক্ষরও না। আমাদের কোন কর্ম্মে পত্র লিখিবার আদেশ নাই। নিদর্শন দেখিতে চাহিলে দেখাইও।”

“কি নিদর্শন দেখাইব?”

“তোমার বাহুতে যে চিহ্ন আছে তাহাই নিদর্শন। যাঁহাদিগকে দেখাইবে তাঁহাদিগেরও বাহুতে চিহ্ন দেখিবে।”

কোন কোন স্থানে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, গৌরীশঙ্কর বুঝাইয়া দিলেন। কাশীনাথ বিদায় হইলে, গৌরীশঙ্কর রাজগৃহে গমন করিলেন। গম্ভীর মূর্ত্তি, পিঙ্গল চক্ষু রাজপুরুষ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। গৌরীশঙ্কর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

রাজপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেশের সংবাদ কি?”

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “আপনারা ত সকল সংবাদই রাখেন, নূতন কি বলিব?”

“তোমাদের মত লোকের নিকটই ত সংবাদ পাই। তোমরা অনেক দেখ শুন, অনেক বুঝিতে পার, স্বদেশীয়দিগের মনের অবস্থা জান, তোমাদের নিকট অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারি।”

“আপনারা কি মনে করেন, সকলে আপনাদের নিকট সকল কথা সত্য বলে?”

“কেহ সত্য, কেহ মিথ্যা, কেহ কতক সত্য কতক মিথ্যা বলে। সেই সকল কথা মিলাইয়া আমরা এক রকম মোটামুটি বুঝিয়া লই। আমাদের জানিবার অনেক উপায় আছে।” রাজপুরুষ অল্প হাসিলেন।

গৌরীশঙ্কর কিছু মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সম্প্রতি কোনরূপ আশঙ্কাজনক কোন সম্বাদ পাইয়াছেন?”

“কই, না, আশঙ্কার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। তুমি কিছু জান?”

“আপনারা দেখিতেছেন চারিদিকে শান্তি, এই কোটি কোটি প্রাণী রাজদণ্ড ভয়ে নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু আপনাকে কি বলিতে হইবে যে, সমুদ্রের শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া, আত্ম-প্রতারিত হইয়া মনে করা উচিত নহে যে, চিরকালই সে মূর্ত্তি সেইরূপ থাকিবে? এ কথা আপনারা যেমন জানেন, এমন আর কে জানে? এই নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত-

দর্শন সমুদ্রে পর্ব্বতপ্রমাণ সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ উঠিতে কতক্ষণ? এই সাম্রাজ্যের কীর্ত্তি-অট্টালিকায় অগ্নি লাগিতে কতক্ষণ?"

রাজপুরুষ গৌরীশঙ্করের দিকে মস্তক হেলাইয়া, দৃষ্টি স্থির করিয়া দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন, "তোমাদের ঐ মূল ধারণা ভ্রান্ত। তোমাদের সংখ্যা বিস্তর বলিয়া সমুদ্রের সহিত তুলনা করিও না। সমুদ্রে সমষ্টি রহিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেবল ব্যষ্টি। সমুদ্রের জল তুলিয়া যদি বহু কোটি গোষ্পদে নিক্ষেপ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের সহিত প্রকৃত তুলনা হয়। এই দেশ এত জলসিক্ত এবং আর্দ্র যে এখানে কিছুতে অগ্নি জ্বলে না। এই কারণে আমরা নিশ্চিন্ত আছি।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বুঝিলাম, এ দেশে একতা নাই। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া পরাধীনতা আত্মবিরোধ প্রভৃতি নানা কারণে একতা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আপনারা কি মনে করেন, একতার বীজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে?"

"তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যতদিন অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন আর কি বিবেচনা হইতে পারে?"

"অঙ্কুরোদ্গম ত অলক্ষ্যে হইবার সম্ভাবনা আছে?"

"অঙ্কুর দেখিতে না পাইলেও অন্যান্য লক্ষণে কিছু জানিতে পারা যায়। তোমাদের মত রাজভক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতেই প্রথমে সংবাদ পাওয়া যাইবে।" রাজপুরুষ পূর্ব্বের ন্যায় মৃদু হাস্য করিলেন।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আমাদিগের কর্ত্তব্য আমরা সর্ব্বদা করিব। কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় না যে অতি সামান্য কারণে রাজ্যে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে?"

"না হইতে পারে এমন কিছুই নাই। কিন্তু তোমাদের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতেই আমরা কতক নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আমাদের রাজত্ব এ সময় ফুরাইলে তোমাদেরই অমঙ্গল। আমাদের ক্ষতি নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু আমাদের রাজ্যনাশের আশঙ্কা, তোমাদের সর্ব্বনাশের ভয়। অরাজকতা হইলে তোমাদের মত ধনী, সম্মানিত ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।"

"সেই কারণে আমরা নিরন্তর আপনাদিগের মঙ্গলপ্রার্থী। কিন্তু যদি কখন শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা হয়; আর আপনারা সে বিষয়ে কিছু অবগত না থাকেন তাহা হইলে এরূপ সংবাদ যাহার নিকট হইতে প্রথমে প্রাপ্ত হইবেন তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না।"

"সামান্য উপকারের জন্য যখন আমরা সর্ব্বদা পুরস্কার দিয়া থাকি তখন এরূপ মহৎ উপকার বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে।"

অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া গৌরীশঙ্কর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপবনবাহিনী তটিনী তীরস্থিত তরুচ্ছায়াশীতল শান্তি নিবাসে ফিরিয়া আসিয়া অদ্বৈত-প্রসাদের বর্ষীয়সী ভগিনী ভ্রাতাকে সকল কথা বলিলেন। নৌকার প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, নিরঞ্জনের পত্র স্মরণ করিয়া অদ্বৈতপ্রসাদ কৌতুক অনুভব করিলেন।

অন্যান্য কথার পর বৃদ্ধা কহিলেন, "দেখ, শ্রীপতি আর কাশীনাথ ছেলে দুইটী বড় ভাল। আমার মনে হয় কি জান?"

অদ্বৈতপ্রসাদ কহিলেন, "বল।"

প্রভাবতী ও নির্ম্মলা সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিল।

বৃদ্ধা কহিলেন, "শ্রীপতির সঙ্গে প্রভার আর কাশীনাথের সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহ দিলে ভাল হয়। কাশীনাথের অবস্থা তেমন ভাল না হউক সে বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছে, আর তুমি মনে করিলেই তাহার একটী ভাল চাকরী করিয়া দিতে পারিবে। শ্রীপতিদের ঘর তোমাদের সমান, কুটুম্বিতা বেশ ভাল হইবে।"

নির্ম্মলা লজ্জিত হইয়া উঠিয়া পলাইল, কিন্তু প্রভাবতী বসিয়া রহিল। পিতৃস্বসার কথা শুনিয়া কেবল চক্ষু নত করিল।

অদ্বৈতপ্রসাদ কহিলেন, "আমি ত তাহাদিগকে দেখি নাই, এখানে আসিবে বলিয়াছে, আসিলে দেখিতে পাইব। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তখন বুঝিতে পারিব।"

"কাজটী হইলে কিন্তু বড় ভাল হয়। মেয়ে দুইটী ডাগর হইয়া উঠিতেছে, তা তুমি ত কিছু চেষ্টা করিবে না! দুইটী বেশ ভাল ছেলে পাওয়া গিয়াছে তাহাদের যেন হাতছাড়া করিও না।"

"দেখি, তাহারা ত আসিবে বলিয়াছে। ঠাকুর শীঘ্র আসিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি পরামর্শ দেন।"

বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মেয়ের বিবাহ দিবে তাও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তিনি গুরু আছেন তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। কিন্তু এ সব কাজে তিনি কি পরামর্শ দিবেন? তুমি নিজে বুদ্ধিমান, অত বড় চাকরী করিয়াছ, এতদিন কি সকল কর্ম্মে গুরুর পরামর্শ লইতে?"

অদ্বৈতপ্রসাদ বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "এতদিন সদ্‌গুরু পাই নাই। এখন তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোন কর্ম্ম করিব না।"

সে সময় কথা এই পর্য্যন্ত রহিল। অদ্বৈতপ্রসাদের ভগিনী কথা মন্দ বলেন নাই। মানুষ সংসারের ব্যবস্থা সর্ব্বদা উত্তম করে, কিন্তু জীবনের গতি, ঘটনার সমবায় মনুষ্যের ব্যবস্থাধীন নহে।

নির্ম্মলা প্রভাবতীকে নির্জ্জনে পাইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "হ্যাঁ লা, তুই হলি কি?"

"হলাম আবার কি !"

"তোর কি এতটুকুও আক্কেল নেই, লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েচ ?"

প্রভাবতী বুঝিয়া, মুচ্‌কিয়া হাসিয়া কহিল, "কখন আবার লজ্জা সরমের মাথা খেলাম !"

"আ মরণ, যেন কিছু জানেন না ! এই যে এখন কাকা আর পিসিমা তোর বিয়ের কথা বল্‌ছিলেন, আর তুই দিব্য বসে হাঁ কোরে শুন্‌ছিলি !"

"শুধু আমার বিয়ের কথা ?"

"আবার রঙ্গ ! পোড়া মুখ তোমার ! কথা কইতে লজ্জা করে না ? আমি কি আমার বিয়ের কথা বসে বসে শুন্‌ছিলাম না কি ?"

"শুনে ত পালিয়ে এলে, না শুনে ত আর এসনি, তা হলেও না হয় বুঝ্‌তাম যে তোমার বড় লজ্জা। তা পালিয়ে আস্‌বার কি কথাটা হয়েছিল ?"

"তোর মতন বেহায়া না হলে ত কেউ আর অমন কোরে বসে থাক্‌তে পারে না ?"

তখন প্রভাবতী কিছু গম্ভীরভাবে কহিল, "যদি সে কথা আমার শোন্‌বার না হত তা হলে বাবা আমায় উঠে যেতে বল্‌তেন। আমি ত এতে দোষের কিছু দেখ্‌চি নে।"

নির্ম্মলা কিন্তু এ কথার অনুমোদন করিল না।

কয়েক দিবস পরে নির্ম্মলা ও প্রভাবতী অপরাহ্নকালে নদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় নির্ম্মলা দেখিল, শ্রীপতি ও কাশীনাথ সেই দিকে আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া নির্ম্মলা প্রভাবতীর অঞ্চল টানিয়া কহিল, "ও মা, কি লজ্জার কথা ? আমাদের বোধ হয় দেখ্‌তে পেয়েচে। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয় !"

"কেন, কি হয়েচে ?"

"কারা আস্‌ছে দেখ্‌তে পাস্‌নি ? দিব্য দাঁড়িয়ে আছিস্‌ যে ?"

প্রভাবতী দেখিতে পাইল, কাশীনাথ ও শ্রীপতি আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া, লজ্জিত বা ত্বরান্বিত না হইয়া, নির্ম্মলাকে কহিল, "তা পালাতে হবে কেন ? চোর ডাকাত ত আর নয়, বাঘ ভাল্লুকও নয়।"

নির্ম্মলা কহিল, "আমার যেমন গ্রহ, তোকে আবার লজ্জার কথা বল্‌তে গিয়েছি ! তোর যদি লজ্জাই থাক্‌বে তা হলে আর ভাবনা কি ! আমি যাই, তুই ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প কর্‌।" বলিয়া, প্রভাবতীর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া নির্ম্মলা বেগে গৃহাভিমুখে পলায়ন করিল। গমনকালে মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া চাহিল। প্রভাবতী ধীর গতিতে, কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া, গৃহে চলিয়া গেল।

অদ্বৈতপ্রসাদ, শ্রীপতি এবং কাশীনাথের পরিচয় পাইয়া, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া পরম সমাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আহারের সময় অদ্বৈতপ্রসাদের ভগিনী স্বয়ং পরিবেশন করিলেন। ফল ও মিষ্টান্ন প্রভাবতী দিয়া গেল। নির্ম্মলা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইল না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অদ্বৈতপ্রসাদ যুবকদ্বয়ের সহিত নানা বিষয়ে সদালাপ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রসাদ গভীরবুদ্ধি, মানবচরিত্রতত্ত্বে সবিশেষ অভিজ্ঞ, শ্রীপতি এবং কাশীনাথের স্বভাবে প্রভেদ শীঘ্রই লক্ষ্য করিলেন। বুঝিলেন দুই জনই সুশিক্ষিত, নানা শাস্ত্রে সুদৃষ্টি, সজ্জন, মিষ্টভাষী। বরং কাশীনাথ শ্রীপতির অপেক্ষা তীব্রমেধাবী। কিন্তু শ্রীপতির চরিত্রে গাম্ভীর্য্য, গভীরতা অধিক, যৌবনসুলভ দাম্ভিকতা অল্প। কাশীনাথ অব্যবস্থিত চিত্ত, চপল, পণ্ডিতম্মন্য। অদ্বৈতপ্রসাদ রাত্রে শয়ন করিয়া ভগিনীর কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহারও বিবেচনা হইতে লাগিল শ্রীপতিই প্রভাবতীর উপযুক্ত পাত্র।

অদ্বৈতপ্রসাদের অনুরোধে দুই বন্ধু দুই চারি দিন থাকিতে সম্মত হইল। অনিচ্ছাও বড় ছিল না। কলকোলাহলপূর্ণ মহা নগরী পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির এই শান্ত শোভায় তাহাদের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রসাদকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, শ্রীপতি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিল। কাশীনাথ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

প্রভাবতী নদীতীরে উদ্যানে পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমণ করিত। নির্ম্মলা কখন আসিত কখন আসিত না। তাহার যেমন লজ্জা তেমনি কৌতূহল, সকল সময় ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকিতে পারিত না। শ্রীপতি অথবা কাশীনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, প্রভাবতী কিছু লজ্জা প্রকাশ করিত না, কথা কহিলে নিঃশঙ্ক চিত্তে কথা কহিত। কাশীনাথের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইত। একদিন কথায় কথায় কাশীনাথ সেই নৌকার ঘটনা উত্থাপন করিল। কহিল, "যে ডাকাতটা তোমাদের দরজা ভাঙ্গিতেছিল আমি তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।"

কথাটা মিথ্যা। কাশীনাথ না বুঝিয়া, কথাটা না তলাইয়া, দম্ভপ্রগল্ভতাবশতঃ, অথবা প্রভাবতীর মনে কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল করিবার জন্য, বলিল। প্রকৃত ঘটনা প্রভাবতী স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ফেলিয়া দিয়াছিলে?"

"তুমি বুঝি দেখ নাই?" কাশীনাথ হাসিতে লাগিল।

প্রভাবতীকে কয়েক বার দেখিয়া কাশীনাথের মনে স্বপ্নের ন্যায় নানা কথা উদিত হইতেছিল। প্রভাবতী তাহার সহিত অকপট হৃদয়ে কথোপকথন করিত। কাশীনাথ আত্মঅনুরাগে অন্ধ হইয়া মনে করিল প্রভাবতী তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। এই অমূলক কল্পনাকে চিত্রপট করিয়া তাহার উপর দৃষ্টিসুখকর নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। প্রভাবতী স্থিরবুদ্ধি, সুন্দরী—এমন স্ত্রীরত্ন কাহার প্রার্থনীয় নহে? হউক শ্রীপতি ধনীর সন্তান, কাশীনাথের তুল্য বুদ্ধিমান, গুণবান নহে। কাশীনাথের আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। আপনার মনোভাব কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিল। স্পষ্ট কহিল, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, নহিলে নৌকায় যখন তোমাদের বিপদ আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব কেন? আমি তোমার পিতাকে বলিব, কিম্বা আর কাহাকেও দিয়া বলাইব, তিনি আমাদের বিবাহে আপত্তি করিবেন না।"

এরূপ কথা শুনিয়া প্রভাবতী চমকিত, ভীত হইল। এ সকল কি কথা? এমন কথা কি তাহার শুনিতে আছে? স্থির বুদ্ধি প্রভাবে শীঘ্রই আত্ম-সম্বৃত হইল। কাশীনাথের কথার কোন উত্তর না দিয়া স্পষ্টাক্ষরে, অতি ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি দস্যুকে জলে ফেলিয়া দাও নাই, তোমার বন্ধু ফেলিয়া দিয়াছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম।"

শ্রীপতির উল্লেখ শুনিয়া কাশীনাথ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল। কহিল, "শ্রীপতি ধনী, আমি দরিদ্র, তাহার তুলনায় অমি কে? শ্রীপতিকে দেখিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিবে কেন? কেন তোমায় দেখিয়াছিলাম? দস্যুর হাতে যখন পড়িয়াছিলে কেন তখন তোমায় মুক্ত করিলাম? তোমায় না দেখিলে আমার এ যন্ত্রণা হইত না।"

প্রণয়ের অনুরাগ অভিমান জানিবার পূর্ব্বেই প্রণয়ের অভিশাপ প্রভাবতীর ললাটে লিখিত ছিল।

মিথ্যা অনুযোগ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভাবতীর আকর্ণ মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। পুনর্ব্বার আত্মসংযম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু স্বরে কহিল, "তুমি মিথ্যা কথা কহিয়াছ। মিথ্যা বলিলে কেন?"

তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় এই কথা বারম্বার কাশীনাথের মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। আর কোন কথা না কহিয়া দ্রুত গমনে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেই সময় তটিনীর কলপ্রবাহ যেন আরও মধুর হইয়া আসিল, বিহঙ্গের সান্ধ্য কূজন মন্দ হইয়া আসিল, পাটল পশ্চিমাকাশের কোমলতা কমনীয়তর হইল। প্রভাবতীর হৃদয়ে তুমুল কোলাহল, জীবন সমুদ্রের প্রথম তরঙ্গ প্রবল বেগে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, চক্ষে কর্ণে অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির বিশাল শান্তিতে তাহার ক্ষুদ্র অশান্তি মগ্ন হইয়া যাইতেছে। শান্তিজলের ন্যায় তটিনী বহিয়া যাইতেছিল, তপ্ত ললাটে স্নেহশীতল স্পর্শের ন্যায় শীকরসম্পৃক্ত বায়ু স্পৃষ্ট হইতেছিল। প্রভাবতী পাষাণের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীপতি সেই স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে প্রভাবতীকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাতাহত কদলী যেরূপ অন্যদিকে নমিত হয় প্রভাবতীর হৃদয় কাশীনাথের পরুষ, নিষ্ঠুর বাক্যে শ্রীপতির প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীপতিকে দেখিয়া, অন্য কথা না কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকাতে সে দস্যুকে কে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল?"

আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীপতি প্রভাবতীর দিকে চাহিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শ্রীপতি এবং প্রভাবতীতে অধিক বার সাক্ষাৎ বা অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। শ্রীপতি ভাল করিয়া প্রভাবতীর মুখ দেখিল না—সেই অল্পস্ফুরিত ওষ্ঠাধর, ক্ষণে রক্তবর্ণ ক্ষণে পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল, আর্দ্র নয়ন পল্লব, এবং বিরক্তি ও আগ্রহে উজ্জ্বল চক্ষু দেখিল না। যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিত তাহা হইলে—তাহা হইলে—কাশীনাথ যে আশঙ্কা করিয়াছিল হয়ত তাহাই

ঘটিত। কিন্তু শ্রীপতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল না, কেবল বিস্ময়াকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন নৌকা? কোন দস্যু?"

"সেই যখন আমাদের প্রথম দেখা হয়, তোমরা আমাদের রক্ষা করিলে!"

"সে কথা এখন আবার কেন?"

"তোমার বন্ধু বলিতেছেন যে দস্যুকে ধরিয়া তিনি জলে ফেলিয়া দেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তুমি ফেলিয়া দিয়ছিলে। সত্য ঘটনা তুমি জান।"

"আমার বন্ধু আর আমি এক। এ কথা লইয়া আবার তর্ক কেন?"

কথাটাকে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া প্রভাবতী কহিল, "তর্ক নয়। তুমি কি মিথ্যা বলিতে পার?"

শ্রীপতি মাথা তুলিয়া কহিল, "মিথ্যা বলিব কেন?"

"কোন একটা কর্ম্ম অপর লোকে করিয়াছে সে কর্ম্মটা তুমি করিয়াছ বলিয়া গৌরব করিতে পার?"

"এমন দুর্ব্বুদ্ধি যেন কখন আমার না হয়!"

"বাবা বলেন গাছের শিকড় কাটিলে গাছের যে দশা হয় মিথ্যা বলিলে মানুষের তাহাই হয়!"

শ্রীপতি ভক্তি সহকারে কহিল, "তিনি মহাপুরুষ। তুমি অনেক পুণ্য করিয়া এমন পিতা পাইয়াছ।"

পিতার প্রশংসা শুনিয়া হর্ষগর্ব্বে প্রভাবতীর মুখে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে সময়ও শ্রীপতি যদি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত! কিন্তু তাহা ত দেখিল না, প্রভাবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, "অন্ধকার হইয়া আসিল, গৃহে যাও।"

"যাই," বলিয়া প্রভাবতী উঠিল। স্বরের কোমলতাও শ্রীপতি লক্ষ্য করিল না।

শ্রীপতি আসিয়া দেখিল কাশীনাথ ললাট অন্ধকার করিয়া একাকী বসিয়া রহিয়াছে। কাশীনাথই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "দরিদ্রের কোন রূপ সুখের আশা করা অন্যায়। সম্পদ থাকিলে সকল প্রকার সৌভাগ্যই সহজে লাভ হয়।"

"এমন কথা কেন বলিতেছ?"

"ধনীর সন্তান হইলে কি আমি প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে পারিতাম না?"

"কই এ কথা ত তুমি আমাকে বল নাই। আমি মনে করিতেছিলাম এ পর্য্যন্ত তোমার সংসারে আস্থা জন্মে নাই, গৃহস্থ হইবার ইচ্ছা নাই।"

"বিদ্রূপ করিতেছ?"

"বিদ্রূপ করিব কেন? কিন্তু যদি তুমি বিবাহ করিতে চাও তাহা হইলে ত কোন আপত্তি দেখিতেছি না। প্রভাবতীর পিতাকে আমি বলিব যে, আমার অর্দ্ধেক বিষয় তোমার—আমি এত সম্পত্তি লইয়া কি করিব? যদি কোন আপত্তি থাকে এই কথায় মিটিয়া যাইবে। আর প্রভাবতীও ত পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে।"

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির স্থায় যে ক্রোধ কাশীনাথের হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল তাহা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কহিল, "ভিক্ষা লইব? ভিক্ষালব্ধ ধনে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিব? প্রভাবতী বলিবে তুমি আপনার ঔদার্য্য গুণে আমায় ভিক্ষা দিয়াছ? তোমার ঐশ্বর্য্যে সে এখনই মুগ্ধ, চরিত্রের মহত্ব দেখাইয়া তাহাকে আরও বশীভূত করিবে? কেন, আমি কি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং উপার্জ্জন করিতে পারি না যে তোমার অর্থের প্রত্যাশা করিব?"

দুই ব্যক্তি পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলে, পর্ব্বতশিখরমুক্ত প্রচণ্ড ধারাপাত তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া যেমন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, কাশীনাথের কথা সেইরূপ দুই বন্ধুর মধ্যে আসিয়া পড়িল। জলরাশির প্রচণ্ড আঘাতে অন্ধপ্রায় ব্যক্তি যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্ত পুনরায় ধারণ করিবার আশায় হস্ত প্রসারিত করে শ্রীপতি সেইরূপ কাশীনাথের হৃদয় স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইল। কহিল, "তুমি আমার বাল্যবন্ধু, যদি কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, ক্ষমা কর। তোমার সুখে আমি কণ্টক হইব না, এখানে বিঘ্নরূপী হইয়া থাকিব না। কি করিলে প্রভাবতীর সহিত তোমার বিবাহ হয় বল, তাহাই করিব।"

তথাপি কাশীনাথ বুঝিল না। কহিল, "প্রভাবতী তোমাতে অনুরক্ত, তুমি চলিয়া গেলে কি সে তোমায় ভুলিবে, না আমায় ক্ষমা করিবে? তাহার পিতাই বা তোমাকে ছাড়িয়া আমায় কন্যা দান করিতে সম্মত হইবেন কেন? তোমাতে আর আমাতে! তুমি ধনী, গুণবান, ভাগ্যবান, উদার চরিত্র, আমি দরিদ্র, দুর্ভাগ্য, গুণহীন, ঈর্ষাপূর্ণ। আমি তোমার সমকক্ষ হইব? শার্দ্দূল দেখিলেই শৃগাল লাঙ্গুল গোপন করিয়া পলায়ন করে। তুমি কেন যাইবে, আমি যাইব।"

হলাহলতুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীপতি স্তব্ধ হইল। কাশীনাথের ব্যবহারে যেরূপ মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইল তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল না।

স্বর্ণরৌপ্য পরীক্ষা করিবার জন্য যেরূপ কষ্টিপাথরের আবশ্যক মনুষ্যের স্বভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্তও সেইরূপ নিকষের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষায় পড়িয়া, নিকষে ঠেকিয়া কাশীনাথের স্বভাব প্রকটিত হইল। আত্মাভিমানে পূর্ণ বলিয়াই বদ্ধমূল বাল্যবন্ধুত্বের মূলে আঘাত করিতে তাহার কিছুমাত্র মমতা বোধ হইল না।

রাত্রে বিস্মৃতিময়ী, শান্তিময়ী নিদ্রা কাশীনাথের চক্ষে আসিল না। কাশীনাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। রাত্রি অন্ধকার—চন্দ্র নাই, মেঘে কখন নক্ষত্র ঢাকিতেছে, কখন একমাত্র ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্র দৃষ্ট হইতেছে। অন্ধকারে বায়ু বেগে বহিতেছিল, যেন পৃথিবীময় শূন্যতা বহন করিয়া বিচরণ করিতেছিল। শূন্য, শূন্য, শূন্য—আকাশ শূন্য, শূন্য পৃথিবী, অন্ধতমসে সেই সর্ব্বব্যাপী শূন্যতা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কাশীনাথ আপনার হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল—সেখানেও সেইরূপ শূন্য, সেইরূপ অন্ধকার—নক্ষত্রশূন্য,

অপরিমেয়, অনন্ত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অন্তরাত্মা আশাশূন্য হইয়া, হাহাকার করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। অন্ধকার ভবিষ্যৎ—সুখ নাই, শান্তি নাই, বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, বিশ্বাস নাই, আশা নাই। কাশীনাথের চক্ষের সমক্ষে জীবনাকাশে তরুণ সূর্য্য তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

প্রভাত হইতেই গৃহে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া, অদ্বৈতপ্রসাদের নিকট বিদায় লইয়া, আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কাশীনাথ চলিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় নির্ম্মলা প্রভাবতীকে ব্যঙ্গ করিতেছিল। সে দেখিয়াছিল প্রভাবতী কাশীনাথের সহিত কথা কয়, শ্রীপতির সহিত ও কথা কহিতে লজ্জা বোধ করে না। সন্ধ্যার সময় যাহা ঘটিয়াছিল নির্ম্মলা তাহার কিছু জানিত না। প্রভাবতীকে বলিল, "কি লো, স্বয়ম্বরা হবি না কি?"

প্রভাবতী অন্যমনস্ক ছিল, নির্ম্মলার কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। কহিল, "হয়েছি!"

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে* বৌদ্ধমতের অধঃপাত ও তাহার কারণ আংশিকরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখন সেই অধঃপাতের চতুষ্পার্শ্বস্থ কএকটী ঘটনা ও পরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক জীবনের তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জন স্থূলতঃ বিবেচ্য।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বৌদ্ধমতের নির্ব্বাসন একটী প্রকাণ্ড ঘটনা। দেশীয় ইতিবৃত্তে এ ঘটনার যে বিবরণ আছে, অনেক পণ্ডিতজনের নিকট তাহা অনুপাদেয়। বস্তুতঃ এ ঘটনার উপর এমনই এক গুরু অন্ধকার রহিয়া গিয়াছে যে, কস্মিনকালেও তাহার ভেদ হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু স্বীয় জন্মভূমিতে বৌদ্ধমত যে এক প্রকার সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত তাহার সন্দেহ নাই। যদিই বা বৌদ্ধসম্প্রদায় ভারতবর্ষে জৈনদিগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সংখ্যায় তাহারা ও পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রকাশ্য বৌদ্ধেরা অতি অল্প। দেশের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তাহাদের বল নগণ্য।

---

* বৈশাখ মাসের ভারতী।

বৌদ্ধ অধঃপাতের প্রায় সমকালে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বিশেষ প্রবলভাবে অভ্যুদিত হয়। এরূপ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন বোধ হয় না। মতামতের সূক্ষ্ম, কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বিভেদ লইয়া একটা ব্যাপক আন্দোলন চলা অসম্ভব। অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিস্থল বাহ্যভাবেই আবদ্ধ থাকে। তাহাই সম্প্রদায়-বিরোধে বিল্বদল ও তুলসীপত্র, তিলক ও অর্দ্ধচন্দ্র লইয়াই মারামারি কাটাকাটি। কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয়ের প্রধান নায়ক দুইজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ—কুমারিলা ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্র। মণ্ডন কুমারিলার ভগিনীপতি। প্রবাদ এই যে, কুমারিলা কার্ত্তিকেয় ও মণ্ডন ব্রহ্মার অংশ সম্ভূত। কুমারিলার ভগিনী মণ্ডনপত্নী স্বয়ং সরস্বতী।† শৈবাগম মতে কার্ত্তিকেয় শব্দব্রহ্ম যথা—

ভিদ্যমানাৎ পরাৎ বিন্দো রব্যক্তাত্মা রবোঽ ভবৎ।
শব্দ ব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগম বিশারদাঃ॥

শব্দব্রহ্ম পক্ষান্তরে বেদ। এজন্যই বোধ হয়, কুমারিলাকে কার্ত্তিকের অংশ বলা হয়াছে। নতুবা পৌরাণিক কার্ত্তিকের সহিত কুমারিলের প্রকৃতি সাম্য দেখা যায় না।

বেদ ও বেদ অনুগত ধর্ম্ম বিদ্বেষী বৌদ্ধদিগের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশব্যাপী এক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধের বিরুদ্ধে কুমারিলার প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি ব্রাহ্মণ না হইয়াও সাধারণের শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্ণাধিকার অতিক্রমই তাঁহার চক্ষে বুদ্ধের অমার্জ্জনীয় অপরাধ। রাজপুত-অধিকৃত হিন্দুস্থানে কুমারিলা যে অধিক শ্রদ্ধা বা সাহায্য পাইয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাহার কারণও ছিল। প্রথমতঃ, অনেকের অভিপ্রায় যে, আমরা এখন যাহাকে হিন্দুজাতি বলি, রাজপুতগণ তাহার অন্তর্গত নহে—শক বা অন্য কোন আগন্তুক জাতি হিন্দুমণ্ডলীর অন্তর্ভূত হইয়া রাজপুত নামে পরিচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল যাবৎ তাহারা বেদ-বহির্ভূত শক্তি উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য এখনও স্থিতিশীল—প্রাচীন আচার এখনও দ্রবীড়, তৈলঙ্গে যেরূপ বলবৎ আছে দেশের আর কোথাও সেরূপ নাই। ব্রাহ্মণ পিটার দি হার্মিট দক্ষিণ প্রদেশ উত্তপ্ত করিয়া তুলিলেন। তদ্দেশীয় প্রধান রাজাকে স্বীয় মতে স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে বৌদ্ধ নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। দেশীয় ইতিবেত্তারা বলেন যে, হিমালয় হইতে আসমুদ্র ভূভাগ বৌদ্ধরক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। এই কথাতেই পণ্ডিতদিগের বৌদ্ধ-নির্য্যাতনের প্রতি অবিশ্বাস। তৎকালে কোন রাজারই সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত অধিকার ছিল না। এ নিমিত্ত বহুস্থানব্যাপী বৌদ্ধনির্য্যাতন হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের তলে যে কথাটি আছে তাহা সিদ্ধ নহে। এ দেশের রাজারা য়ুরোপের আধুনিক রাজাদিগের ন্যায় প্রজার জীবনরক্ষা করিতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যত্ন ছিলেন না। তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। নরবলি, বলবান কর্ত্তৃক দুর্ব্বল পীড়ন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপার তাহা হইলে

† মাধব শঙ্কর-বিজয়দেখীয়।

এ দেশে স্থান পাইত না। তাহা হইলে প্রজারা বিদেশীয় আক্রমণকালে রাজার জন্য যুদ্ধ করিত। এই বিষয় আলোচনা করিলে বৌদ্ধনির্য্যাতনের দেশীয় ইতিবৃত্তি নিতান্ত হেয় বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক বৌদ্ধমতের অধঃপাত ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয় হইতে গুরুতর বহুদূর-ব্যাপী ফলোৎপত্তি হইয়াছে। যে শক্তির প্রভাবে ব্রাহ্মণধর্ম্ম মুসলমানদিগের আন্তরিক ও বাহ্যিক অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার সঞ্চার এই আন্দোলন হইতে। হিন্দুমণ্ডলীর যে পরস্পর্শকাতরতা ও আভ্যন্তরিক প্রতিরোধ শক্তি তাহার উৎপত্তি বর্ণিত ঘটনাবলী হইতে। সিংহল দ্বীপে অত্যাচারী খৃষ্টিয়ান রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয়ের কতক পরিমাণে উদ্ভাসন হয়। সিংহলবাসীদের সহিত এ দেশীয়দের জাতিগত প্রভেদ নাই। ওলন্দাজেরা সিংহল অধিকার করিবার পর বৌদ্ধমতাশ্রিত সিংহল-বাসীরা অচিরে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া নিজের দাসত্বের তিলকস্বরূপ বৈদেশিক নাম গ্রহণ করে। সিংহল দেশীয় "টম ডিসিল্‌ভা গুণবর্দ্ধন" ইত্যাকার কিম্ভূত নাম এখনও এই দাসত্বের স্মারক। ইহাতে সন্দেহের স্থল অতি অল্পই যে, বর্ণবিভেদ নিবারক ও মনুষ্যের মধ্যে সমতার বিধায়ক ধর্ম্মতন্ত্রের বিলোপ না হইতে ভারতবর্ষে হিন্দুমণ্ডলীর নিজত্ব মুসলমান অধিকারের স্রোতে ভাসিয়া বহুকাল অন্তর্হিত হইত। বস্তুতঃ বলা কঠিন যে, বিজিত ভারতবর্ষের উপর মুসলমান অভ্যুদয়ের পদাঙ্ক দৃঢ়তররূপে সন্নিবিষ্ট কিম্বা অজিত য়ুরোপে দৃঢ়তর।* আকবর বাদসাহের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ উপনিষদের উপদেশের অনুগত—এ বিষয়ের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এখানে এ কথার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "বেদবাদরতাঃ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" পণ্ডিতদিগের চেষ্টার যে ফল তাহা একদিকে মন্দ হইলেও অন্যদিকে মন্দ হয় নাই। এরূপ দুঃখ তাড়িত দুর্দ্দিনের মধ্যেও যে হিন্দুমণ্ডলীর একটা নিজত্ব আছে তাহার একটা প্রধান কারণ পূর্ব্বোক্ত সেই কর্ম্মকাণ্ডের অভ্যুদয়।

বেদের ভাবার্থ ত্যাগ করিয়া শুধু শব্দার্থের উপাসনায় যে কুফল তৎসম্বন্ধে অত্যুক্তি করা অসম্ভব। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ভট্টপথাবলম্বীদিগের কর্ত্তৃক উদ্‌বুদ্ধ আলোচনা এমন একটি ভাব ধারণ করিল, যাহাতে ফলাংশে মন্দ অপেক্ষা ভালই অধিক ঘটিয়াছিল। ইহার অনতিপরে আধুনিক ভারতের ব্রাহ্মণাচার্য্যশ্রেষ্ঠের প্রযত্নে কর্ম্মকাণ্ড, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি এমনি একটী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইল যে, সহস্র চেষ্টাতে তাহা উলঙ্ঘন করা সম্ভব হইবে না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ-প্রধান জাতির পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন বলিলে ঠিক বলা হয়—কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য প্রবরের জীবনী আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের

* Draper's History of the Intellectual Development in Europe ও Robertson's Charles V. দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তাঁহার যে প্রভাব তাহারই আলোচনা এখানে যথেষ্ট হইবে।

যে ঘটনার মধ্যবর্ত্তী হইয়া শঙ্করাচার্য্য সাধারণের সম্মুখে উদিত হন তাহা সম্যক্‌রূপে মর্ম্মস্পর্শী। বৌদ্ধনাশ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া কুমারিলা নিজকার্য্যের কৈফিয়ৎ লইতে বসিলেন। বৌদ্ধ আচার্য্যগণের মুখ হইতে কদাচিত সত্য বাহির হইয়া থাকিতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের বিনাশে কুমারিলা সত্যনাশরূপ ঘোর পাতকে পতিত হইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তা করিয়া তিনি নিজের তুষানলের ব্যবস্থা করিলেন। ঘৃতচর্চ্চিত দেহে মন্ত্রপূত অগ্নিতে দেহ আহুতি করিতে কুমারিলা প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময় দুর হইতে তরুণ সন্ন্যাসীবেশী আচার্য্য বলিবেন, এরূপ অতি বিগর্হিত কার্য্যে কাহার প্রবৃত্তি ?

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতঃ।
উভৌ তৌ ন বিজানিতৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

"আঃ, এ মৃত্যুর সময় কে আবার বৌদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইল ?"—অগ্নিশয্যা হইতে কুমারিলা এই উত্তর করিলেন।

আচার্য্য নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি বৌদ্ধ নহি—শঙ্কর যতি।"

পরে শঙ্করের উপদেশ শুনিয়া কুমারিলা স্বীকার করিলেন যে, বেদের ভাবার্থ বুঝিতে তাঁহার ভুল হইয়াছে। আচার্য্য তাঁহাকে আত্মহত্যার সঙ্কল্পে বিরত হইতে বলিলেন। জীবন রক্ষা করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতর নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া বেদের যথার্থ মর্ম্মানুসারে সত্য প্রচারে ব্রতী করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কুমারিলার শরীরাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে কুমারিলা স্বীকৃত হইলেন না। তবে সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বলিলেন যে, "আমার ভগিনীপতি কর্ম্মকাণ্ডে আমার অপেক্ষা পারদর্শী ও তাহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ। তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনিলে সত্যের প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইবে।"

শঙ্কর ও মণ্ডনের বিচারে যে একটি সত্য সন্ধিৎসার সৌরভে পরিবাসিত তাহাতে মুগ্ধ হইয়া কালক্ষেপ করা এরূপ প্রবন্ধের পক্ষে অনুচিত। অভিমানশূন্য হইয়া কেবলমাত্র সত্য নির্ব্বাচনের চেষ্টার যেমন দৃষ্টান্ত শঙ্কর মণ্ডনের বাদ তেমন বোধ হয় জগতের সাহিত্যের আর কোন স্থানে নাই। বিচার অন্তে মণ্ডন স্বীকার করিলেন যে, বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সেই এক অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডনের মনে কেবল একটীমাত্র দুঃখের উদয় হইল। সে দুঃখ নিজের পরাজয় জনিত নহে। দুঃখ এই যে, জৈমিনি ঋষির বাক্য সমূহ প্রমথিত হইল। শঙ্কর তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, বস্তুতঃ জৈমিনি ঋষির বাক্য প্রমথিত হয় নাই। তবে ঋষির যথার্থ হৃদ্‌গত ভাব মণ্ডন ধারণ করিতে পারেন নাই। ঋষির যথার্থ উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা পরব্রহ্মে বিমুর্খ তাহারা বেদে বিশ্বাস করিয়া বেদোদিত কার্য্য করিলে ক্রমে বেদের উপর দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে পারে। পরে সমগ্র বেদ বিশেষতঃ বেদের শিরোভাগ উপনিষদ সমগ্র মেলন করিয়া তাহার যথার্থ অর্থ জানিতে পারিয়া ব্রহ্মে নিষ্ঠা স্থাপনারূপ পরম পুরুষার্থ লাভে সক্ষম হয়।

এই বিচার হইতে একটী মহৎ ফল উৎপন্ন হইল। মণ্ডন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আশ্রমান্তর গ্রহণে ইঁহার নাম হয় সুরেশ্বর আচার্য্য। মহীশুর দেশে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত শৃঙ্গ গিরির মঠের ইনি প্রথম অধিপতি। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর প্রণীত ভাষ্যের বার্ত্তিককার এবং "নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি" নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া ইনি অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে বিশেষরূপ পূজ্য। "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ" প্রভৃতির গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সমাদৃত মাধবাচার্য্য ইঁহারই শিষ্য পরম্পরায় অবস্থিত। এ কথা বলায় অযুক্তি হয় না যে, সুরেশ্বরাচার্য্য হইতেই বেদান্ত মতের বহুল প্রচার। ইঁহার শৃঙ্গগিরির মঠে প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্প কালের মধ্যেই শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাব ঘটে। দক্ষিণ অঞ্চলে যত স্মার্ত্ত অর্থাৎ বিশেষ সম্প্রদায়-হীন ব্রাহ্মণ অদ্যাপিও সুরেশ্বরের আসন হইতে তাহাদের শাসন হইতেছে।

শঙ্করাচার্য্য যে দশটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত বহু কাল যাবৎ তাঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। পরে যখন রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যেরা বিশিষ্ট-অদ্বৈতাদি মতের স্থাপনা করেন, তখন তাঁহারা যে শঙ্করাচার্য্যের দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শুদ্ধাদ্বৈত পন্থার প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য প্রথম বয়সে শাঙ্কর দণ্ডী ছিলেন। ইঁহার শিষ্যবর্গ মহারাজ সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষা গুরু কেশব ভারতীও একজন শাঙ্করদণ্ডী ছিলেন। রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজকে শঙ্করের উপদেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন একথা সকলেই জানেন।

গত দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যতরূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অর্থাৎ বেদমূলক সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহাদের উপর শঙ্করের কীর্ত্তির উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়া আছে।

শঙ্করকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা অসম্ভব, আচার্য্যপ্রবর সন্ন্যাসী সপ্রদায়ের প্রবর্ত্তণা না করিলে বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বের লোপ হইত ইহাই সম্ভাবনা।

আর একটি কথা। শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে জ্ঞান প্রচারের জন্য যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন, তাহা যে অনেক অংশে পূর্ব্বপ্রচলিত বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে গঠিত ইহাই স্থির বলিয়া বোধ হয়। তবে এ বিষয়টির সম্যক আলোচনা এখনও বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে ঘটে নাই বলিয়া একটু সংকুচিত ভাবে এ কথাটা বলা আবশ্যক।

শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ ও কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে কি বিষয়ে অনুপাদেয় তাহা সময়ান্তরে বিবেচ্য।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাবু-ভীতি বা বাবু-ফোবিয়া।

"বাবু-ভীতি" কি তাহা বুঝিতে হইলে, "বাবু" পদার্থটি যে কি তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। "বাবু" বলিতে কেহ কেহ বুঝিবেন দাড়ি-ছড়ি-ঘড়ি-চেন-চসমা-চুরুট-ধারী, ইংরাজী-শিক্ষাভিমানী, অভক্ষ্যভোজী, বাকসর্ব্বস্ব, স্বধর্ম্মত্যাগী, বঙ্গদেশীয় জীববিশেষ। কেহ কেহ বুঝেন প্রকৃত শিক্ষিত, স্বদেশহিতৈষী, উদারপ্রকৃতি, স্বাধীনচেতা, চিন্তাশীল ও পরদুঃখ-কাতর এক সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষ। "বাবু-ভীতি" এক প্রকার নূতন রোগ। এই রোগের অন্যতম কারণ দ্বিতীয় প্রকারের বাবু। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে এই রোগ সম্বন্ধে কেবল বঙ্গদেশীয় বাবু বুঝায় না, কুমারিকা হইতে শিমলা শিখর, বঙ্গোপসাগর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ভূ-বিভাগবাসী উক্ত দ্বিতীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই 'বাবু' নামে অভিহিত। এক্ষণে সাধারণকে সাবধান করণার্থ অতি সংক্ষেপে এই রোগ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাইতেছে।

রোগের নাম করণ—কতকগুলি বহুদর্শী চিকিৎসক ইহাকে "বাবু-ম্যানিয়া" নাম দিতে চাহেন। কিন্তু বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার মতে ম্যানিয়া নাম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। যত প্রকার ম্যানিয়া আছে সকল প্রকারের লক্ষণের সহিত ইহার লক্ষণ-সমূহ মিলাইয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশের সঙ্গেই ইহার অনৈক্য দৃষ্ট হইল; কিন্তু যত প্রকার ফোবিয়া আছে তাহার লক্ষণের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলে। যেমন হাইড্রোফোবিয়ায় জলকে ভয় হয়, সেইরূপ "বাবু-ফোবিয়ায়" বাবুর চেহারাকে ভয়, কলমকে ভয়, ও বক্তৃতাকে ভয়। সুতরাং 'বাবু-ফোবিয়া' নামই বিজ্ঞান, অভিধান, ও যুক্তি সঙ্গত।

রোগের ইতিহাস—১৮৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এই সংক্রামক রোগের কোন প্রকার লক্ষণ কোথাও দেখা যায় নাই। ইহার পূর্ব্বে কদাচিৎ কখন এই রোগাক্রান্ত দু একটী রোগীর কথা শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না। বিশেষতঃ ভাল ভাল চিকিৎসকের মত এই যে তাহা আদৌ 'বাবু-ফোবিয়া' নহে, অন্য প্রকার ফোবিয়ার বিকার বা পরিণাম ফল মাত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে হঠাৎ ইহার সংক্রামক ভাব প্রথম প্রকাশ পায়। ইলবার্ট বিলই তাহার মুখ্য কারণ। কলিকাতার ব্রান্সন নামে এক ফিরিঙ্গী ব্যারিষ্টার ও এলাহাবাদের [illegible]ং পোষ্ট পত্রের এ্যাটকিন্স নামক অপর একটী ফিরীঙ্গী এই রোগাক্রান্ত হয়েন। এ সময়ের ইহাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডাক্তারেরা তাঁহাদের পীড়া গুরুতর বলিয়া স্থির করেন। তাঁহাদের প্রাণহানি না হইলেও একজনের পসার ও অন্যের খ্যাতি নষ্ট হয়। তৎপরে ৩৷৪ বৎসর ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় নাই। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ইহার সংক্রামকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। "জাতীয় সমিতি"ই তাহার মূল কারণ। সুতরাং স্যর লিপেল গ্রিফিণ এই

পীড়াগ্রস্ত হইলেন। যাহাতে মহারাষ্ট্রবাসীগণ এই আন্দোলনে যোগ দান না করেন, বাবুদের দ্বারা বিপথে চালিত না হয়েন, তজ্জন্য মধ্য ভারতের কোন দরবারে তিনি বিধিমত চেষ্টা করেন ও ভারতবাসীকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেন। স্যর সায়েদ আহম্মদ খাঁও এই পীড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। লক্ষ্মৌ সহরে তিনি জাতীভায়াদিগকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে, যদি তাঁহারা বাবুদের পদধূলি লেহানাভিলাষী না হন, তবে যেন ত্বরায় লম্ফ প্রদানে ট্রেনে উঠিয়া মান্দ্রাজ গমন করেন; কারণ, বিলম্বে বিপৎপাতের সংপূর্ণ সম্ভাবনা। গ্রিফিণ ও আহম্মদ কর্ত্তৃক এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ভয়ানক ভাব ধারণ করে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ইহার প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ অব্দে এই রোগের কথঞ্চিৎ প্রশমন হয়। ১৮৯১ সালে ইহা মৃদুভাব ধারণ করিয়া ১৮৯২ সালে পুনরায় ভয়ানক আকারে প্রকাশ পায়। এবার সুদূর ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ লক্ষিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার পুনঃগঠনই ইহার কারণ। ম্যাকলীন নামে একজন ইংরাজ এই রোগাক্রান্ত হয়েন, আর তাহার ফলে তাঁহার নামান্তস্থ M. P. নামক উজ্জ্বল উপাধিটি খসিয়া পড়ে। অদ্যাবধি এই রোগ সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ফিলিপ্স, কনষ্টাম, র‍্যাডিস, বেল প্রভৃতি অনেকেই কতক মাত্রায় এই রোগে ভুগিতেছেন। অধুনা কোন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীও এই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিতে পাওয়া যায়—কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের "ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট" পত্রে তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এই রোগ মারাত্মক না হইলেও অতিশয় যন্ত্রণা-দায়ক এবং সংক্রামক বটে। ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ইহা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং চিরকালের জন্য বুদ্ধি-বৈকল্য সংঘটন করে।

রোগোৎপত্তির কারণ—এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদগণের গবেষণায় ইহার দুইটী কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১ম—ভারতে ভারতবাসীর নম্রস্বভাব, ২য়—ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন। ভারতবাসী সাধারণতঃ শান্তপ্রকৃতি ও ধীরস্বভাব। নম্রতা ও বিনয় তাহাদের চরিত্রের প্রধান সদ্‌গুণ। ইংরাজী শিক্ষা লোকের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করে। ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা-লিপ্সাই বাবু-ভীতির একটি প্রধান কারণ। রোগের বিস্তৃতি ও সংক্রামকতা বৃদ্ধি হইবার বহুবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাবুদের প্রার্থনা পূরণ, এবং তাহাদের অভিমতানুযায়ী শাসনতন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের আশঙ্কাই প্রধান।

রোগের লক্ষণ—এই রোগ মজ্জাগত, অস্থিগত ও স্বার্থগত। কিন্তু প্রধানতঃ ইহাকে যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়াই বলা যাইতে পারে। যকৃৎ বিকৃত হইলে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং মেজাজ সদা সর্ব্বদাই বিগড়াইয়া থাকে। মেজাজ খারাপ হইলে কাণ্ডাকাণ্ড, কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য, বক্তব্যাবক্তব্য জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে; নিজের কার্য্য ও চিন্তা প্রভৃতির উপর আয়ত্ত থাকে না, আত্ম-শাসন নষ্ট হয়। পীড়িতাবস্থায় রোগী এমন কথা বলে, এমন কাজ করে যে রোগোন্মুক্ত হইলে তাহা স্মরণ করিতেও মরমে মরিয়া যায়। ইহার আর একটী লক্ষণ এই যে রোগী পীতবর্ণ বা কামলা রোগগ্রস্ত হয়। যকৃৎ যেমন পিত্তের, মস্তিষ্ক তদ্রূপ চিন্তার, আধার।

যকৃতের পীড়া হইলে যেমন পিত্ত দোষিত হয়, মস্তিষ্কের পীড়া হইলে সেইরূপ হিতাহিত জ্ঞান বা বিবেক অন্তর্হিত হয়। কোপিত পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া ন্যাবা বা কামলা রোগ উৎপন্ন করে। পীতবর্ণ চক্ষুই এই রোগের লক্ষণ। কামলারোগী সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখে। তদ্রূপ "বাবু-ভীতি" রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি এরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ হয় যে কোন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ সে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। অতএব এই রোগের লক্ষণ—১ম বিকৃত মেজাজ, ২য়—কূট বা বিকৃত দৃষ্টি-শক্তি।

চিকিৎসা—এ পর্য্যন্ত এই রোগের কোন ঔষধই আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার অব্যর্থ বা অমোঘ কোন ঔষধ নাই—ইহার ডীঃ গুপ্ত এখন পর্য্যন্ত উদ্ভূত হন নাই। যকৃৎ পীড়ার যে চিকিৎসা, ইহাতেও তাহা ফলদায়ক হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তবে ঠেঙ্গাপাথি মতে মুষ্টিযোগ প্রয়োগেও দু একস্থলে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। জোলাপ, জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ, শিরা-চ্ছেদ দ্বারা রক্তনিঃসারণ, বিশেষ উপকারী। কোন কোন স্থলে পদোন্নতি, ফার্লো, প্রিভিলেজ লিভ, স্থান পরিবর্ত্তন, বাতুলালয়ে বাস ও হাইকোর্টের গুতায় এ রোগের আশু উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ রোগের প্রকোপ হ্রাস করিবার শেষোক্তটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্য—কোন প্রকার মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন নিষেধ। গরম মসলা ও মাংস অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। শৈলাবাস আবশ্যক। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, ফার্লো লইয়া বিলাত যাত্রা প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকারের উদ্বেগ উত্তেজনার কারণ সর্ব্বথা পরিহার একান্ত কর্ত্তব্য।

মন্তব্য—এই পীড়া মারাত্মক না হইলেও অতিশয় সংক্রামক বটে। এই বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে পুত্র পৌত্রাদি পর্য্যন্ত রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা একেবারে কখন আরোগ্য হইতে দেখা যায় নাই। ইহা হইতে নানা প্রকার জটিল রোগের উৎপত্তি হয়, অতএব রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এই পীড়া কেবল শাসনকার্য্যে লিপ্ত ইংরাজগণের মধ্যে দেখা যাইত, এখন অনেক দেশীয় লোককেও বাবু-ভীতি রোগগ্রস্ত দেখা যায়—যথা, সতীশ বাবু। বিচার ভিন্ন অন্য বিভাগেও ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। শিক্ষা বিভাগে সম্প্রতি ইহার বিকটমূর্ত্তি বর্ত্তমান যথা—নিয়োগ সম্বন্ধে নূতন সারকিউলার।

যাহাতে এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং ইহার অধিক বিস্তার ঘটিতে না পারে, তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি এখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার সংক্রামকতা নিবারণে সচেষ্ট না হয়েন, তবে অতীত বাবু, বর্ত্তমান বাবু, ভবিষ্যৎ বাবু, ভ্রূণ বাবু, আদি বাবু [illegible]স্ত বাবু, বাবু-ভীতি বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভয়ানক মারী ভয় ও অনর্থ উপস্থিত করিবে। ইহার বিস্তার নিবারণ ও রোগ শান্তির জন্য একটী আশ্রম বা asylum, এবং এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কারার্থ পুরস্কার ঘোষণা করা কর্ত্তব্য।

জনৈক "বাবু-ভীতি" চিকিৎসক।

কবি কৃত্তিবাস।

আজকাল আমাদের দেশে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে। স্থানে স্থানে সভাসমিতি, কৃত্তিবাসের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের সাগ্রহ উদ্যোগ, সাময়িক পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে নানারূপ আন্দোলন চলিতেছে। আশা করি বাঙ্গালীর অন্যান্য কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় ইহারও যেন কেবল আন্দোলনেই উপসংহার না হয়।

এতদিন পরে বাঙ্গালীর এই হঠাৎ উদ্রিক্ত ভক্তির আবেগ অনেকের নিকট বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। প্রিয়জন বিয়োগে বহুদিন বিগত আত্মীয়-সুহৃদ্‌গণের কথাও মনে পড়ে। বর্ত্তমান শোকান্ধকারে স্মৃতির আলোকে ভূতপূর্ব্বের সুদূর তিমির গর্ভও আলোকিত হয়, ইহা স্বভাবের নিয়ম। বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠনে প্রধানতঃ যে তিন জন মনীষী সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মনে পড়িয়াছে। তাঁহারা কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও কবিকঙ্কন।

প্রায় চারিশত বর্ষের পূর্ব্বে ফুলিয়া গ্রামে এই মহাকবির জন্ম হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যকুঞ্জ তখন অনেক বিহঙ্গকাকলীতে সুস্বরিত হয় নাই। বৈষ্ণব কবিদের মধুর কলতান তখন নৈশাকাশে না মিলাইয়া যাইলেও অস্পষ্ট ও দূরশ্রুত হইয়া আসিতেছিল। সেই অস্পষ্ট উষালোকে আর একটা পাপিয়ার উচ্চকণ্ঠ শ্রুত হইতেছিল। সে স্বর পঞ্চমে উঠিলেও মর্ম্মবেদনা ব্যঞ্জক, দারিদ্র্য দুঃখকাতর—উহা কবিকঙ্কণের।

বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের প্রতিভা সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাঁহাদের পূর্ব্ব ও পররর্ত্তী কবিদের সহিত পরিচিত হইতে হয়। বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক টেইন্ মিল্টনের প্রতিভায় সেক্ষপীয়র্ বেন্‌জনসন্ প্রভৃতির উচ্ছৃঙ্খল অসংযত কল্পনার সহিত পিউরিটান্‌দের কঠোরতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পান। একদিকে এলিজেবেথীয়ান কবিদের অলৌকিক কল্পনা ও স্বভাব-কবিত্বের যুগ,—অপরদিকে ড্রাইডেন্, পোপ প্রভৃতির কৃত্রিমতার যুগ—এই যুগসন্ধি স্থলে পিউরিটান কবি মিল্টন্—সাহিত্যের এই যুগদ্বয়ের যোজন শৃঙ্খল।* বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনায় যদি অন্যায় না হয়, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সাহিত্যে কৃত্তিবাসের স্থানও কতকটা এইরূপ। একদিকে বৈষ্ণব কবিদের উচ্ছৃঙ্খল ভাবপ্রবণতা, অপর দিকে ভারতচন্দ্র, কাশীদাস প্রভৃতির কৃত্রিমতার মধ্যে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস। এজন্য কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস, বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতে বৈষ্ণব কবিদের গভীরতা ও ভারতচন্দ্রের কবিতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা ইহাদের কল্পনা তজ্জন্যই সুদূরগামী, তজ্জন্যই ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা ইহাদের গভীরতা অধিক। কৃত্তিবাসের চরিত্র চিত্রণ ও রসবর্ণনায় তাহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের শব্দযোজনা, ভাবার পারিপাট্য বঙ্গীয় সাহিত্য

* See His "History of English Literature" Vol. II. Bk. II. Pp. 31 -18.

সংসারে অতুল। কিন্তু মৌলিকত্বের হিসাবে ধরিতে গেলে ফুলিয়ার দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবিকে ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা উচ্চ আসান দিতে হয়। কারণ পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রাজ-কবি শুধু কবিকঙ্কণের নিকট নহে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নিকটেও অনেকাংশে ঋণী। এ সময়কার বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের নিকট এ কথা নূতন নহে। অন্যান্য বিদেশীয় কবিদের নিকট ঋণী বলিয়া কোন কোন সমালোচক কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টনকে তাঁহার উচ্চ সিংহাসন হইতে অধঃপাতিত করিবার বিফল চেষ্টা করেন আর তজ্জন্যই বোধ করি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু কবিকঙ্কণকে মাইকেল মধুসূদনের অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিদের পর এজন্য মৌলিক প্রতিভার অমর মুকুট কেবল কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসই ধারণ করিবার উপযুক্ত। বৈষ্ণব কবিদের পর বলিবার কারণ, ইঁহাদের কবিতায় প্রকৃতির যে বিজন রহস্য সংবাদ ছিল,—যে নির্ম্মল, স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ বায়ু ও উজ্জ্বল স্বচ্ছ সূর্য্যালোক ছিল—যে বিশ্বব্যাপ্ত আকুলতা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মোচ্ছাস ছিল—উহা কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কাহারও ছিল না—ভারতচন্দ্রের ত আদৌ নহে। তদবধি আজ প্রায় পাঁচ শতাব্দীর পরে বিহারিলাল ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই বৈষ্ণব কবিদের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে।

কৃত্তিবাস বঙ্গের আদি কবি। বঙ্গীয় আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন সে আজ প্রায় চারি শত বৎসরের কথা। তখন না জানি বঙ্গদেশ কিরূপ ছিল! "সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা" বঙ্গভূমি তখন দুর্ভিক্ষের হাহাকারে ও শোচনীয় অন্নচিন্তারূপ বিষাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হয় নাই। আমরা কৃত্তিবাসের অতুলনীয় গ্রন্থ পাঠ করি আর আজকালকার আমাদের এই কঠোর ক্লিষ্ট জীবন সংগ্রামের কথা মনে পড়ে। তখন বাঙ্গালীর জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাদে প্রবাহিত হইত। এখন কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ গিয়াছেন, আমাদের জীবন প্রণালীও স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াছে—কেবল জানকী ও ফুল্লরার শোকগাঁথা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমররেখায় "স্তরে স্তরে পুঞ্জিভূত" করিয়া রাখিয়াছে।

অথবা এ বিষয়ের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গুরুভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পণ করিয়া অতঃপর আমরা রামায়ণ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রকৃত পক্ষে ইহা সমালোচনা হইবে কি না বলিতে পারি না, কারণ সে যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে এ সম্বন্ধে অনেকে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিলেও দুই এক বিষয় পরিত্যক্ত থাকিতেও পারে, সে সকল বিষয়ে আলোচনার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

কৃত্তিবাসের গ্রন্থ মূল বাল্মীকির রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ নহে—অনেক স্থলে উপাখ্যান ভাগেরও অনুযায়ী নহে। অক্ষম লোকেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির কাব্য অনুসরণ করিতে গিয়া কেবলমাত্র অনুবাদ করিয়া বসেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আদর্শের অনুসরণ সত্ত্বেও স্বীয় ক্ষুণ্ণ মার্গ অবলম্বন করেন। মহাভারতকার বাল্মীকির কাব্য অনুকরণ করিয়াছেন; তথাপ প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে অনুকৃত কাব্যও কিরূপ উজ্জ্বল আকার

ধারণ করিয়াছে! ভর্জ্জিলের ঈনীয়াদ্ কাব্য হোমারের অনুকরণ; মিল্টন ও ভর্জ্জিল দান্তের অনুকারী, মার্লোর"ফষ্টচসর" মূল ভাবটা অন্ততঃ আধুনিক কবি গেটে অনুকরণ করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্য-জগতে বিরল নহে। তথাপি উক্ত কোন কবিই কেবলমাত্র অনুকরণের উপর নির্ভর করেন নাই, স্বীয় প্রতিভাবলে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কৃর্ত্তিবাসও অনেক স্থলে উপন্যাস ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন ও তত্তৎস্থলে নিজ কল্পনার সাহায্যে নূতন কাহিনী রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থলে এরূপ স্বাতন্ত্র্যে লিপিকুশলতার গুণে বর্ণনীয় বিষয় উজ্জ্বল হইয়াছে, অনেক স্থলে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাস অনেক স্থলে এক কাণ্ডের কথা অন্য কাণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অনেক স্থলে মূলের ঘটনা বিবৃত না করিয়া স্বকপোল কল্পিত রচনা গ্রথিত করিয়াছেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সাপক্ষে বহুল উদাহরণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। উঁমার জন্ম কথা, তপস্যা, ও মদনভস্ম ইত্যাদি মূলে আদিকাণ্ডে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাস এ সব কথার আদৌ উল্লেখ মাত্র করেন নাই। বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্টের কলহ, বিশ্বামিত্রের তপস্তেজঃ, ত্রিশঙ্কুর কথা, মূলে আদিকাণ্ডে আছে। কিন্তু কৃত্তিবাস এ সকল কথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ণনীয় বিষয় উজ্জ্বল হইয়াছে, কৃত্তিবাসের বিচার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, মূলে এই দুইটী কাহিনী জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রধান ঘটনার সহিত মুখ্য ভাবে ইহাদের কোনও ঘনিষ্ট স্বম্বন্ধ নাই। আদিকাণ্ডে উমার জন্ম কথা ইত্যাদি পরিত্যাগের আর এক কারণ সম্ভব। এদেশে শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ চিরপ্রসিদ্ধ। এ কারণ শ্রীরামভক্ত কৃত্তিবাস যে উমার জন্ম কথা পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছু আশ্চার্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না—কিরূপে তাহা আমরা পরে দেখিব। ইতিপূর্ব্বে কোন সাময়িক পত্রিকার লেখক দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যে, অহল্যার পাষাণ কাহিনী মূল রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাস এখানে সম্ভবতঃ পদ্ম পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্গদ রায়বার কবির মৌলিক সৃষ্টি, ইহাতেও মহীরাবণের মৌলিক উপাখ্যান কল্পনার দুরগামিতা ও লিপিকুশলতার গুণে, বর্ণনীয় বিষয় বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু এ সকল অতি সামান্য ঘটনা। শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন ও দুর্গোৎসব ও নীল পদ্মের স্থানে দেবীর চরণে স্বীয় নীল নলিনের উৎসর্গ কথা মূলে আদৌ নাই—কৃত্তিবাস এ কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এটা একটা প্রধান ঘটনা—কারণ, আমাদের দেশের একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব অনেকটা ইহার উপরেই স্থাপিত। অথচ মূলে রাবণবধার্থ অগস্ত্যমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে সূর্য্যস্তব পাঠ করিতে উপদেশ করার কথা বর্ণিত আছে। আমাদের বোধ হয় যে মহীরাবণের এই দুর্গোৎসব বৃত্তান্তও প্রক্ষিপ্ত। যে কৃত্তিবাস আদিকাণ্ডে উমার জন্ম ও তপস্যা ইত্যাদির কথা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যে তিন কাণ্ড লিখিতে না লিখিতে এরূপ দেবীভক্ত হইয়া পড়িবেন, ইহা আশ্চার্য্য বলিয়া বোধ হয়। আর এরূপ ভক্তির একটা প্রাসঙ্গিক কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। বোধ হয় কোন শাক্ত কবি রামায়ণে আপনার ধর্ম্মানুরাগের কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

শুধু ইহাই নহে। কৃত্তিবাস এক কাণ্ডের কথা অপর কাণ্ডেও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এরূপ স্বরুচি অনুসারে পরিবর্ত্তন কার্য্য কোথাও সঙ্গত কোথাও বা অসঙ্গত হইয়াছে। যথা, চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত-মিলন বৃত্তান্ত মূলে অযোধ্যা কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস অরণ্য কাণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন, এরূপ হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু সেতু বন্ধন ইত্যাদি লঙ্কাকাণ্ডের কথা কেন যে সুন্দরাকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে বলিতে পারি না। এরূপ স্বাধীনতায় কৃত্তিবাসের কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইবার বিলক্ষণ অবকাশ পাইয়াছে। কবি যদি কেবল মূলের উপর নির্ভর করিতেন তবে আমরা মহীরাবণবধ, অঙ্গদ রায়বার রাবণের যথার্থ ব্রহ্মাস্ত্র আনয়ন কাহিনী ইত্যাদি আমরা দেখিতে পাইতাম না। ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুকম্পায় কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ আমাদের সকলের নেত্রগোচর হওয়া দুর্লভ। তথাপি এখন আমরা এই পরিবর্ত্তিত গ্রন্থ দেখিয়াও স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের মনোহর কল্পনায় বিমোহিত হই। ভারতচন্দ্রের ভাষার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতচন্দ্রের কল্পনা, কৃত্তিবাসের তুলনায় বিমোহিনী হইলেও তাদৃশ সুদূরগামিনী নহে। তাঁহার কল্পনা বর্দ্ধমানের রাজবাটী, বকুলতলা, মালিনীর বাটী বিশেষরূপে চিত্রিতা করিতে পারে, মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা গণনা করিতে পারে, তাঁহার কৈলাস পুরীর সুখসমৃদ্ধির কল্পনাও এই রাজবাটীর অনুপাতে! কৃত্তিবাসের কল্পনা এরূপ ক্ষুদ্র রাজবাটীর চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ নহে। উহা যমপুরীতে গিয়া পাপীদের অনন্ত নরক যাতনায় শিহরিয়া উঠে; চন্দ্রলোকে শীতে অসাড় শরীর রাবণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। উত্তরাকাণ্ডে এই চন্দ্রলোকে গমন ও যমপুরীর বর্ণনা স্থানে স্থানে আমাদের "স্বর্গ-বিচ্যুতি" স্মরণ করাইয়া দেয়।

কিন্তু কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসের অপেক্ষা আর একজনের সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা খুব সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি হিন্দি সাহিত্যের তুলশীদাস। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের কোন সমালোচককে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে দেখিলাম না। অথচ কৃত্তিবাসের ও তুলশীদাসের যত সাদৃশ্য এরূপ আর কোনও দুই কবির মধ্যে লক্ষিত হয় না। উভয়েই প্রতিভাশালী কবি। উভয়ের কার্য্যের বর্ণনীয় বিষয় একই। উভয়ে একই কবিকে অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়েই নিজ নিজ সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গঠনে অশেষ সহায়তা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের অপেক্ষাও বোধহয় তুলশীদাসের কৃতিত্ব এ বিষয়ে অধিক। কারণ, হিন্দি সাহিত্যের পরিসর অতি অল্প। উভয়ের কাব্য পাঠে আমাদের বোধ হয় যে তুলশীদাস কৃত্তিবাস অপেক্ষা সুপণ্ডিত ও অশেষ শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ কেবল মূল রামায়ণ ও স্বীয় কল্পনার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। তুলসীদাস অনেক শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া নিজের কাব্যামৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। † উভয়ের চরিত্রাঙ্কণে,

"† নানা পুরাণ নিগমাগম সম্মতং যৎ রামায়ণে নিগদিতং কচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথ গাথা ভাষা নিবন্ধমতি মঞ্জুল মাতনোতি॥"

তুলশীদাসের রামায়ণ—আদিকাণ্ডের মঙ্গলাচরণ।

কৃত্তিবাসের ভাষা সরল, সুমধুর, ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী, বিবিধ অলঙ্কার ভারে জড়িত নহে। তুলশীদাসের ভাষা পণ্ডিতের ভাষা,—শব্দপারিপাট্যে দুরূহতায় ও উপমা বহুলতায় জটিল। অন্যান্য হিন্দী কবির ন্যায় ইহা সরল হিন্দীতে লিখিত নয়—ইহার তিন ভাগ নির্ভাঁজ সংস্কৃত, এক ভাগ হিন্দী। উত্তরাকাণ্ডের শেষাংশ ব্যতীত তুলশীদাস বাল্মীকিকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় তিনি স্বাধীনভাবে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন নাই। অনুকৃত কাব্যের যথাযথ অনুসরণে, অভিনব বিবিধ ছন্দ রচনায়, সুকুমার শব্দনির্ব্বাচনের মমতায় তুলশীদাসের কল্পনা তত স্ফূর্ত্তি পায় নাই। তুলশীদাস যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও দার্শনিক, তাহার আভাষ তিনি ছত্রে ছত্রে রাখিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের বিশেষ সুখ্যাতির কথা এই যে তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া বর্ণনীয় বিষয় বেশ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। এ সকল কথার যাথার্থ্য বারান্তরে উপলব্ধি হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

পার্শি সম্প্রদায়।

পার্শিগণ ভারতে ঔপনিবেশিক মাত্র। পার্শ অর্থাৎ আরবিক "ফার্শ" নামক প্রদেশের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। গ্রীক জাতি যখন আপনাদিগের প্রচণ্ড তেজগর্ব্বে প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রবল বীর্য্যবত্তা প্রকাশ করেন, সেই সময় তাঁহারা এই প্রদেশকে 'পার্শিস্' অর্থাৎ পারস্য এই নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। কিন্তু পারস্যবাসীগণ স্বদেশকে 'ইরান্' এই নামে অভিহিত করিত, এবং আপনাদিগকে 'ইরাণী' বলিত। 'ইরাণী' এবং সংস্কৃত আর্য্য এ উভয় শব্দই এক ধাতু মূলক।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ যেমন বিশুদ্ধ আর্য্য বংশোদ্ভব, পারস্যবাসী ও পার্শি সম্প্রদায়ও সেইরূপ সুপবিত্র আর্য্য বংশ হইতে সমুদ্ভূত। বাহ্য প্রকৃতি হইতে বিচার করিয়া কোন কথা বলিতে হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, প্রতীচ্য ভূখণ্ডের প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহের অধিবাসী-বৃন্দ যদি আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিগণিত হন, তাহা হইলে মধ্য এসিয়ায় অদূরে অবস্থিত ভারতের প্রতিবাসী পারস্যবাসীরাও সেই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। এতদ্ভিন্ন ভারতের অনেক পৌরাণিক কাহিনী পারস্য পুরাবৃত্তে রূপান্তরিত ভাবে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, এবং এই উভয় দেশের পৌরাণিক দেব-দেবীগণের মধ্যেও নামগত সাদৃশ্যের বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পারস্যের আদি ধর্ম্মমত ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্যে প্রবর্ত্তিত

ধর্ম্মমতের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। কিন্তু মহাত্মা জোরস্তার এই ধর্ম্মের সংস্কার সাধন পূর্ব্বক ইহাকে অপেক্ষাকৃত উদার এবং মহত্ত্বাবলী-সম্বদ্ধ ধর্ম্মমতে পরিবর্ত্তিত করেন। জোরোস্তারের ধর্ম্মমত পারস্যে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর মেজীয় ধর্ম্মের সংমিশ্রণে ইহার প্রচুর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; এবং তাহাই ভারতীয় পার্শি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ধর্ম্মান্ধ ক্ষমতাদর্পিত মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচার ও কঠোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া পার্শিগণ বোম্বাই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মের সংশ্রবে ইহাদিগের ধর্ম্মমতের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটে।

পার্শিদিগের রাজনৈতিক জীবনের কথা চিন্তা করিলে সহসা ইহুদি জাতির সহিত ইহারা তুলনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহুদী জাতির ন্যায় ইহারাও যুগাতীত কাল হইতে বিদেশীয়গণের নিকট হইতে ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে, ইহুদীদিগের ন্যায়ই ইহারাও পর-জাতির উৎপীড়নে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসনে এবং বৈষয়িক ব্যাপারেও—বাণিজ্য কুশলতা, ধনবত্তা প্রভৃতি বিষয়ে—ইহুদী জাতির সহিত ইহাদের সমতা লক্ষিত হয়। দুই একটি বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়—পার্শিদিগের নিকট পুণ্যভূমি পারস্য স্বর্গাদপি গরীয়সী, ইহুদীদিগের নিকট প্যালেষ্টাইনও তদ্রূপ আদরণীয়। কিন্তু এই উভয় দেশেই মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত। যাহাই হউক পার্শি সম্প্রদায় যে ইহুদীগণ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালে পারস্যেও ইহারা সুখে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছে। ভারতবর্ষে স্যর দিনসা মাণিকজি পেটিট্, স্যর জেমসেট্‌জি জিজিভাই, স্যর কাউয়াস্‌জি জাহাঙ্গীর রেডিমনি প্রভৃতি পার্শি ধন-কুবেরগণের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই, তাঁহাদের অদ্ভুত দানশীলতা পাশ্চাত্য সভ্য জগতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। রাজনৈতিক বিষয়েও ভারতীয় সকল জাতি অপেক্ষা পার্শিদিগকেই অধিক সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। জেতার রাজ্যে বৃটীশ রাজ-তরণীর পরিচালকগণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া আজ পার্শি-কুল-গৌরব দাদাভাই নৌরজী ভারতের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রসঙ্গ জলদ গম্ভীর স্বরে উত্থাপিত করিতেছেন,—এ সৌভাগ্য অপর কোনও ভারতবাসীর অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। কিন্তু ইহুদীগণের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? গৃহহীন অনাথ পথিকের ন্যায় ইহারা এখনও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরদেশে বিচরণ করিতেছে; এবং তদ্দেশীয় রাজেন্দ্রবর্গের বিন্দুমাত্র কৃপা-কটাক্ষের উপর ইহাদের ইহ জীবনের সুখ, মনের শান্তি, এবং অর্থের গৌরব, সমস্তই নির্ভর করিতেছে। অসীম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও ইহাদের অনেকের জীবন পরান্নভোজী পরকৃপাপ্রার্থী ভিক্ষুকের ন্যায় বিড়ম্বনাপূর্ণ।

পার্শিদিগের সংখ্যা ইহুদীগণের অপেক্ষা অনেক অল্প; এবং ইহুদী জাতির ন্যায় ইহারা নানা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। কয়েক সহস্র মাত্র ইহাদের পিতৃভূমি পারস্যের য়েদ্ নগরে ও তাহার চতুঃপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে বাস করিতেছে, অবশিষ্ট পার্শিগণ

ভারতেই তাহাদের বাসস্থান সংস্থাপিত করিয়াছে। ইহুদী জাতি মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তাহাদের মধ্যে অনাথ দরিদ্র এবং অসহায় ভিক্ষুকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, অনাবৃত পথপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষুধায় সমস্ত দিন আর্ত্তনাদ করিলেও অনেকের অদৃষ্টে মুষ্টিভিক্ষাও দুর্ল্লভ হইয়া থাকে। কিন্তু পার্শি সম্প্রদায়স্থ ধনাঢ্যগণ স্বজাতীয় দরিদ্রগণকে দারিদ্র্যের হস্ত হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। দানশীলতার জন্য পার্শি সম্প্রদায় জগদ্বিখ্যাত,—কিন্তু কৃপণতার কলঙ্ক ছাপ ইহুদী জাতির সমাজ-দেহ হইতে বুঝি কখনই অপনীত হইবে না!

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে পার্শির সংখ্যা এক লক্ষেরও ন্যূন,—অশীতি সহস্র হইবে। এই সুবিস্তীর্ণ ভারতের তরঙ্গায়িত লোক-সমুদ্রের মধ্যে এই কয়টি প্রাণীর স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহই বিলুপ্ত হইত; কিন্তু কতকগুলি সামাজিক এবং পরিচ্ছদগত ব্যবহার-বৈচিত্র্য বশত জনসাধারণ হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে। অন্যান্য সকল জাতির সহিত তুলনায় ইহাদের পরিচ্ছদগত পার্থক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশেষত্ব পূর্ণ। ভারতের কোন জনপূর্ণ নগরীর রাজপথে অগণ্য পথিকের মধ্যে একজন মাত্রও জোরোস্তারের মন্ত্র দীক্ষিত শিষ্যকে দেখিয়াই তাহাকে পার্শি বলিয়া চিনিতে পারা যায়। পার্শিদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন নাই, এবং অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য সমুদ্র পারবর্ত্তী দেশ-সমূহে ব্যবসায় উপলক্ষে গমনাগমন করিলেও সমাজ-চ্যুতির সম্ভাবনা নাই। অর্থানুরাগে ইহারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই প্রায় একরূপ অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জড়োপাসক নহে বটে, কিন্তু সমুজ্জ্বল রজত খণ্ড ইহাদের প্রিয়তম দেবতা; লৌহময়, পাষাণ-নির্ম্মিত, কিম্বা মৃত্তিকা-গঠিত কোনও প্রকার পুত্তলিকার পূজা করিতে ইহারা প্রস্তুত নহে, এবং লক্ষ্মীদেবীর সাকার দেহের উপাসনায় ইহারা কিছুমাত্র ব্যস্ত নহে সত্য, কিন্তু মহারাণী ভারতেশ্বরীর মস্তকাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রের উজ্জ্বল মহিমার উদ্দেশে ইহাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি এবং ভক্তি সমর্পিত হইয়াছে।

অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে পার্শিদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য নহে। প্রথম, জোরোস্তারের ধর্ম্ম পারস্য দেশ হইতে বিদূরীত হইয়া কিরূপে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল; দ্বিতীয়, ভারতীয় পার্শিগণের দ্বারা এই ধর্ম্মের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে অগ্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইরাণীয় আর্য্যগণের প্রাথমিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে একিমেনিয়ান, সিলিউসিডি এবং আর্সাসিডি বংশীয় রাজগণ বংশ পরম্পরায় পারস্যের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন। তাহার পর শাসেনিয়ান রাজ বংশ পারস্য সিংহাসন অধিকার করিয়া পার্শিদিগের লুপ্তপ্রায় জাতীয়তাকে সুপ্রকাশিত এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই বংশীয় প্রথম রাজা আৰ্দ্রশীর বাবকান্ বিশেষ চেষ্টায় নানা স্থান হইতে জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি পবিত্র গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রাচীন পারসীয় ধর্ম্মকে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দী হইতে (প্রায় ২২৫ খৃষ্টাব্দ)

পরবর্ত্তী ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই শেষোক্ত বংশীয় শেষ রাজা ইয়াজাগীরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত (৬৫৯ খৃষ্টাব্দ) জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রাজানুগ্রহের ছায়ায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল।'

কিন্তু ইহা জন সাধারণের হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবসর পায় নাই। কারণ, উপরোক্ত ঘটনার অল্পকাল পরেই খালিফ উমারের অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ ভীষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সাশেশীয় বংশের শেষ রাজা ইয়াদাগীর্দ নাহাবন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান হস্তে পরাস্ত হইলে পারস্যে মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল। এই ঘটনা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ প্রায় ৬৪২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্মের অধোগতি হইতে আরম্ভ হইল, কোরাণ আবেস্থার স্থান অধিকার করিল, এবং মহম্মদের সমুজ্জ্বল মহিমা জোরোস্তারে পুণ্যস্মৃতির ক্ষীণ প্রভা মলিন করিয়া ফেলিল। যে ভাষায় এই ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত ক্রমে সেই জেন্দভাষাও সাধারণের আয়ত্বের অতীত হইয়া পড়িল।

কিন্তু তথাপি সমগ্র পার্শি সম্প্রদায় এই বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। অনেকই বিবিধ উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও বীরের ন্যায় আপনার পৈত্রিক বিশ্বাস এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিল। কিন্তু অত্যাচার দুঃসহ হইয়া উঠিলে ইহাদের অনেকে খোরাসানের পর্ব্বতময় দুর্গম প্রদেশে কিম্বা সন্নিকটবর্ত্তী মরুভূমিতে বাস করিয়া প্রায় শতবর্ষ পর্য্যন্ত আপনাদিগের শান্তিময় পৈত্রিক ধর্ম্মের উদ্বোধনে রত হইয়াছিল, কিন্তু এখানেও তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। ক্রমে একদল ইয়েদা কির্ম্মাণে বাসস্থান সংস্থাপিত করিল; অন্য একটি [illegible]র দল পারস্য উপসাগরের প্রবেশ পথে অর্ম্মজ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে, কিন্তু এখানেও মুসলমানদিগের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই সকল জোরস্ত্রীয় পলাতক পোতারোহণ পূর্ব্বক ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইল। এই প্রদেশের যে স্থানে ইহারা সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে তাহার নাম ডিউ।

ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার ভারতবর্ষের ভাষা এবং রীতি নীতির সহিত পার্শিদিগের এই প্রথম পরিচয়। এখানে পঞ্চদশ বর্ষকাল অবস্থানের পর এই সকল প্রবাসী ৭১৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে উপনীত হয়। এ সময়ে যাদবরাণা নামক একজন ক্ষুদ্র রাজা এই প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেন, এই ব্যক্তি সুশিক্ষিত এবং উদারপ্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি পার্শিদিগকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ধর্ম্মমত জানিতে চান। কিন্তু তাহারা এরূপ কৌশল সহকারে আপনাদিগের ধর্ম্মমত প্রকাশ করিল যে, জোরোস্ত্রীয় ও হিন্দু মতের মধ্যে বহুবিধ সাদৃশ্য আছে তাহাতে যাদবরাণার আর অপ্রতীতি জন্মিল না। তাহারা বলিল, "আমরা ঈশ্বরের, সূর্য্যের এবং পঞ্চভূতের পূজা করি; আমরা গো জাতির বিশেষ সম্মান করিয়া থাকি ও গো-মূত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন করি; দিবসে পাঁচবার উপাসনা করা আমাদের অভ্যাস,

আমাদের বিবাহ উৎসবে নৃত্য গীতাদির প্রচলন আছে এবং আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি, ক্রিয়াও সম্পাদিত করিয়া থাকি !”

হিন্দু রাজা পার্শিদিগের ধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের এই প্রকার সৌসাদৃশ্য দেখিয়াই হউক বা অপর কোনও কারণ বশতই হউক অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে তাঁহার অধিকার মধ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পার্শিগণ এই অভিনব বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশের জন্য ৭২১ খৃষ্টাব্দে এখানে এক অগ্নি মন্দির সংস্থাপিত করিলেন।

ইহার পর তিনশত বৎসর কাল পার্শিগণ নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত সঞ্জানে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই সময়ে ইহাদের মধ্যে জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে অল্পদিনের মধ্যেই পার্শিগণকে গুজরাট, সুরাট, নৌসারি, ব্রোচ এবং কাম্বে প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছিল। ক্রমশ আরও দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া বহুসংখ্যক পার্শি পারস্য হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাসস্থান সংস্থাপন করিতে লাগিল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণের প্রবল আক্রমণে সঞ্জানের হিন্দু রাজাকে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল ; কিন্তু পার্শিদিগের সাহায্যে সঞ্জানরাজ আততায়ীগণেক পরাস্ত করিতে সক্ষম হইলেন। বাধাপ্রাপ্ত জলস্রোতের ন্যায় মুসলমানগণ কিছুদিন নিবৃত্ত ছিল বটে কিন্তু শীঘ্রই তাহারা অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নব বল ও উৎসাহ সহকারে পুনরায় হিন্দু ও পার্শিদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। পার্শিগণ নৌসারীতে পলায়ন করিলেন, এবং প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে সঞ্জানের অগ্নি মন্দিরে যে পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া প্রতিনিয়ত সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন তাহাও সঙ্গে লইয়া গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রাচীন ও নবাগত ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ আরম্ভ হইল। অবশেষে সুরাটের ৩২ মাইল দক্ষিণে উদওয়ারা নামক একটি মন্দিরে পবিত্র অগ্নি পরিরক্ষিত হইল। বর্ত্তমান কালে ভারতের সমস্ত অগ্নি মন্দিরগুলির মধ্যে এইটীই সর্ব্ব প্রাচীন। সেই পুরাপ্রজ্বলিত অগ্নি এখনও সেখানে অব্যাহত ভাবে প্রজ্বলিত আছে, বিশ্বাসী-হৃদয় পার্শিগণ এই মন্দিরের প্রতি অতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ইংরাজ বণিকদিগের কুঠী সংস্থাপিত হইলে পার্শিগণ দলে দলে আসিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল ; এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাহারা এমন কার্য্যনৈপুণ্য ও উৎসাহ দেখাইতে লাগিল যে অল্প কালে মধ্যেই তাহাদের প্রচুর অবস্থাগত উন্নতি লক্ষিত হইল। এই সময় তাহারা সুরাটের নবাবের বিশ্বাসভাজন হইয়া অনেকে উচ্চ রাজকর্ম্মেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যেও দক্ষতা লাভ করিয়াছিল ; এবং নেক সাত খাঁ নামক জনৈক পার্শি ভাস্কর বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে এই ব্যক্তি মোগল

সম্রাটের নিকট হইতে সুরাটস্থ ইংরেজ বণিকদিগের জন্য কয়েকটি বাণিজ্য বিষয়ক অধিকার লাভ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরই বোম্বাই নগরে বৃটীশ অধিকার সংস্থাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পার্শি বণিক ও জাহাজ নির্ম্মাতাগণ সেখানে আপনাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। এখন বোম্বাই সহর ভারতপ্রবাসী পার্শিদিগের প্রধান বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতের পশ্চিমোপকূলে ইংরাজাধিকার বিস্তৃতির সূত্রপাত হওয়াতেই ভারতবর্ষে পার্শিদিগের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাগত উন্নতি ইহাদের স্বজাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করার পর ইহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণকে যে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। পার্শি পিতার সন্ততি ভিন্ন অন্য কেহ এ পর্য্যন্ত পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর মনিয়ার উইলিয়ামস্ বোম্বাই নগরে অবস্থানকালীন একজন সম্ভ্রান্ত পার্শি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য নানান্ কথাবার্ত্তার পর তিনি উক্ত পার্শি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে তাঁহাদের উদাসীনতা প্রকাশ করিবার কারণ কি ?

উক্ত পার্শি ভদ্রলোকটি এইরূপ ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর করিয়া ছিলেন :—

"আমাদের ধর্ম্মে এমন কিছু নাই যাহাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে নিষেধ করে, বরঞ্চ আবেস্থাতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে অগ্নি-পূজক প্রচারক বর্ত্তমান ছিল। ইতিহাস পাঠেও জানিতে পারা যায় যে জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ না করায় নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সাহ নামা গ্রন্থেও এ প্রকার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। ...... সাধু ও অসাধু উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া জোরোস্তারের প্রতি আদেশ ছিল। কিন্তু আমরা স্বীকার করি এখন আর আমাদের ধর্ম্ম প্রচারের কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই এবং পার্শি পিতামাতার সন্ততি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আমাদের বিশ্বাস আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্মের সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এমন লোক অনেক আছে—ইহাদেরই ধর্ম্ম-বন্ধনীর মধ্যে আনা প্রধান আবশ্যক, বিধর্ম্মীদের মধ্যে প্রচার তাহার পরে।"

উক্ত পার্শি ভদ্রলোকটী যে একজন চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার এই কথা কয়টির মধ্যে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে—বিশেষতঃ আমাদের অযাচিত হিতাকাঙ্ক্ষী পাদ্রিগণের!

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

আলোচনা।

প্রথমবর্ষের "সাধনা" পত্রে "নিছনি" শব্দের অর্থ লইয়া একটী জ্ঞানপ্রদ ও কৌতুহলবর্দ্ধক আলোচনা হয়। প্রথমতঃ "শব্দতত্বান্বেষী" এই ছদ্ম নামে একজন প্রশ্ন করেন যে, "নিছনি" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ও তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। (১) তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় লিখেন, ইহার অর্থ "অনিচ্ছা।" (২) পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, "নির্ম্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" (৩) এবং নির্ম্মঞ্ছন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লইয়া প্রাচীন কবিদিগের প্রযুক্ত 'নিছনি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেন যে,"সাধারণতঃ "নিছনি" শব্দের উপহার অর্থ করিলে সর্ব্বত্র সঙ্গতি হইতে পারে।" (৪) পরিশেষে ত্রিপুরা হইতে "জনৈক পাঠক" লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশীয় বৃদ্ধ ব্যবহার অনুসারে "নিছনি" বস্তুবাচক নাম। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি এমন কি মরকতাদি মণিও "নিছনি" রূপে ব্যবহার করা প্রচলিত আছে। * * * মঙ্গলোদ্দেশে অথবা অমঙ্গল অঘ, দুরীকরণার্থে মহিলাগণ * * * মুদ্রা বা মণিরূপ নিছনিদ্বারা নিছাইয়া থাকেন।" (৫)

প্রশ্ন দুইটি—"নিছনি" শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ। উৎপত্তি স্থির হইলে অর্থ নিষ্কাস সুগম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু "নির্ম্মঞ্ছন" শব্দ হইতে "নিছনি" শব্দের উৎপত্তি ধরিয়াছেন। কিন্তু যে নিয়মে সংস্কৃত শব্দ দেশভাষায় রূপান্তরিত হয় সে নিয়মে প্রথমোক্ত শব্দের কি শেষোক্তের পূর্ব্ব বা মূলরূপ হওয়া সম্ভবপর? মকারের কি একেবারে লোপ সম্ভব হয়? সংস্কৃত "নিমন্ত্রণ" শব্দ দেশভাষায় অপভ্রংশ ব্যবহারে "নেওঁতা" রূপ ধারণ করিয়াছে কিন্তু এখানে মকারের সাক্ষী স্বরূপ ওকারের শিরস্থ চন্দ্রবিন্দু। আর একটী কথা এই যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যাহারা গ্রন্থে এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা রচনার বৈশুদ্ধি রক্ষায় যত্নশীল হইয়া "নিছোনি" লিখিয়াছেন। "রাজাবলী" গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক "আঠার শ যিশবীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হয়।" ইহাতে "নিছোনি" শব্দ দুই স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এই ব্যবহার অনুসারে এ শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। "জাহাঁগীর বাদসাহ্......অনেক বহুমূল্য রত্ন পুত্রের (সাহজাহাঁর)

(১) "সাধনা" ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৬।
(২) "সাধনা" ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৮১।
(৩) "সাধনা" ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৮৬।
(৪) "সাধনা" ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৬০।
(৫) "সাধন" ১ম বর্ষ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৩৮।

নিছোনি করিয়া দিলেন।" (৬) "বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রের চারিদিকে সাহজাঁহার হাত ধরিয়া সাতবার ফিরাইয়া কহিল যে, বা আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দিলাম।" (৭)

এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয় যে, 'নিছোনি' শব্দের আটপ্রহরিয়া অবস্থা 'নিছনি।' হিন্দী তাহার প্রকৃতি অনুসারে বিচার করিলে বোধ হয় সংস্কৃত উপসর্গ 'নি' পূর্ব্বক হিন্দী ধাতু 'ছুনা' অর্থাৎ ছোঁয়া হইতে এ শব্দের উৎপত্তি। অপবিত্র, অশুদ্ধ, হেয় এইরূপ অর্থেও হিন্দী ও বাঙ্গালায় "ছুনা" বা "ছুঁয়া" ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। যথা, ছুঁতো হাঁড়ী (বাঙ্গলা)—ছোতা হণ্ডী (হিন্দী)। "ইয়ে চিজ্ ছোতা হুয়া" এরূপ প্রয়োগও হিন্দীতে আছে। অযোধ্যা প্রদেশে সরযূনদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে "ছোঁতা" শব্দ "ছোনা" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। সে দেশে "ছোনা অর্থে অপবিত্র, অশুদ্ধ। "অছোনা" তাহার বিপরীত। অতএব ইহাই সম্ভবপর যে নি পূর্ব্বক ছুনা ধাতুর উত্তর এ "ই" প্রত্যয় হইতে "নিছোনি" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ই প্রত্যয় ক্রিয়ার উত্তর কি অর্থে সংযুক্ত হয় তাহা স্থির করিবার জন্য যথাক্রমে বাঙ্গালা ও হিন্দীর দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে:—

বাঙ্গলা।	হিন্দী।
মন্থন+ই=মন্থনি। (৮)	মথ্‌না+ই=মথ্‌নি।
চালন+ই=চালনি।	চাল্‌না+ই=চাল্‌নি।
দর্শন+ই=দর্শনি। ইত্যাদি।	দর্শন+ই=দর্শনি। ইত্যাদি।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যায় যে করণ বাচ্যে ই বা ঈ প্রত্যয় হয়। নিছুনা বা নিছোনা ক্রিয়ার করণের নাম নিছোনি বা নিছনি অর্থাৎ যাহার দ্বারা নিছোনা করা যায়। ছুনা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন পদে যে ধাতুর উকারের স্থানে ওকার হয় তাহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে (যথা, ছোতা বা ছোনা)। এখন দেখিতে হইবে যে এই সকল পদে ছুনা ধাতুর অর্থের কিরূপে ব্যাপ্তির আধিক্য হইয়াছে। ছুনার অর্থ প্রথমতঃ স্পর্শ। পরে স্পর্শের বিশেষত্ব অর্থাৎ যে স্পর্শের দ্বারা অপবিত্রতা বা অশুদ্ধি জন্মায় এইরূপ স্পর্শ সূচিত হয়। শেষে আবার অন্য-দিক হইতে বিশেষণের লোপ হইয়া দাঁড়াইতেছে সামান্যতঃ দোষ অকল্যাণ, পাপ ইত্যাদি।

অতএব মীমাংসা করিয়া পাওয়া যায় যে, নিছোনি বা নিছনি শব্দ দাঁড়াইতেছে "যাহার দ্বারা দোষ নিবারিত হয়।"

---

(৬) ২য় সং। শ্রীরামপুর ১৮১৪ খৃঃ পৃঃ ১৫৪।

(৭) ২য় সং। শ্রীরামপুর পৃঃ ১৫৫। "নিছোনি" কেবল ত্রিপুরায় আবদ্ধ মহিলা ব্যবহার সাহে।

(৮) সর্ব্বত্র ঈ হওয়া বোধ হয় উচিত।

যে সকল বাক্যে "নিছনি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোক্তভাবে "নিছনি" শব্দ গ্রহণ করিলে সুন্দর অর্থ সঙ্গতি হয়।

পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে
জীবন নিছনি তব পাশ।—বসন্তরায়।

এখানে "জীবন-নিছনি" অর্থ বুঝিতে হইবে "এমন বস্তু যদ্দ্বারা জীবনের দোষ খণ্ডন হয়। (৯)

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে কি কালাও আর কি দিব নিছনি।—বসন্তরায়।

এখানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বাবু বলিয়াছেন, "এখানে নিছনি বলিতে কি বুঝাইতেছে বলা শক্ত। এরূপ স্থলে সংস্কৃত মূলটী বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।"(১০)

ত্রিপুরাস্থ "জনৈক পাঠক" ইহার যেরূপ অর্থ নিষ্পত্তি করিয়াছেন স্থূলতঃ তাহাই ঠিক বোধ হয়।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ॥

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেনঃ—"এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্থ বুঝাইতেছে।"

"জনৈক পাঠক" ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেনঃ—"আমার বংশ মর্য্যাদা অকলঙ্কিত বলিয়া জগৎ বিখ্যাত, তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাতে 'নিছনি' রূপে ছিলাম।" ইত্যাদি।

স্থূল কথা দোষ বা অমঙ্গল নিবারক বস্তু এ অর্থ এখানেও সুপ্রযুজ্য। এইরূপ আলোচনায় ইহাই নিষ্কৃষ্ট অর্থ দাঁড়ায় যে, নিছোনি বা নিছনি শব্দের অর্থ প্রধান বা মৌলিক পূর্ব্বোক্ত রূপ। পরে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়াছে যাহার নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য নহে। "নিছনি লইয়া মরি" এরূপ স্থলে নিছনি গৃহীতায় পূর্ব্ব ব্যক্তির দোষ সংক্রমন সূচিত হয়।

শেষে আর একটী কথা আছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় কোথা হইতে 'নিছনি' শব্দার্থে 'অনিচ্ছা' পাইয়াছেন জানা আবশ্যক। কেন না কেরি প্রণীত বাঙ্গলা ইংরেজি অভিধানেও(১১) ঐরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

(৯) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন "এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।"

(১০) ইতি পূর্ব্বে নির্মঞ্ছন শব্দকে নিছনি শব্দের মূল রূপ বলিয়া রবীন্দ্র নাথ বাবুর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে বোধ হয় বর্ত্তমান বাক্যের দ্বারা কথঞ্চিৎ তাহার অর্থ সঙ্কোচ করা তাঁহার অভিপ্রেত।

(১১) ২য় সংস্করণ। শ্রীরামপুর ১৮১৮ খৃঃ অব্দ।

উদ্ভিজ্জাণু—ব্যাক্‌টিরিয়া।

এই বিশাল বিশ্ব-সংসারে অন্য সহস্র সহস্র উদ্ভিদের মধ্যে এক প্রকারের উদ্ভিজ্জ আছে যাহারা সম্পূর্ণরূপে মানব চক্ষুর অগোচর, মানব ইন্দ্রিয়ের বোধাতীত এবং অনন্তগুণে ক্ষুদ্র। কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র হইলেও, এমন কি আণুবীক্ষণিক অন্য অনেক পদার্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও, ইহাদিগের জীবন-কাহিনী ও কার্য্যকলাপ অতিশয় বিস্ময়জনক। নিতান্ত নগণ্য, নিতান্ত নিরীহ অহিংস্রক উদ্ভিদ জাতীয়, এবং একটি মাত্র কোষাবশিষ্ট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ হইয়াও, এই উদ্ভিজ্জাণু, সকলের অজ্ঞাতসারে অহর্নিশা কত যে অপ্রতিবিধেয় অত্যাচার দ্বারা কেবল ফল, মূল, পশু পক্ষীর নহে, কিন্তু আমাদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত সভ্য ও জ্ঞানাভিমানী "সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব" মানবের পর্য্যন্ত, অপূরণীয় মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না। দুশ্চিকিৎস্য ও অনারোগ্য নানাবিধ ব্যাধি কত সহস্র সহস্র কত কোটি কোটি মানব সন্তানকে অপরিণত কালে ভূপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। কি অপরিজ্ঞাত কারণে এক এক মহামারী উঠিয়া কত সময়েই না কোন কোন দেশের গৃহ-পালিত পশুপক্ষীদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিবার উপক্রম করিয়াছে! কত সময়েই না কৃষকের সমুদয় আশার এক মাত্র সম্বল ক্ষেত্রজাত শস্য অকস্মাৎ শুকাইয়া গিয়া গরিব কৃষক পরিবারদিগকে দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর ক্রোড়শায়ী করিয়া দিয়াছে! কিন্তু কে জানিত এ সমুদায় অলক্ষিত, অজানিত 'দৈব' কারণের মূলে এককোষী আণুবিক্ষণিক উদ্ভিজ্জের জৈবনিক ক্রিয়া; কে স্বপ্নেও ভাবিত যে দেশ-উৎসন্নকারী মহামারীর সাংঘাতিক ব্রহ্মাস্ত্র এক ক্ষুদ্রতম উদ্ভিজ্জাণু; নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ও মারাত্মক ব্যাধির মূল কারণ—এক নিরীহ উদ্ভিদ জাতীয় ক্ষুদ্রতম পদার্থ-বিশেষ! নিঃস্বার্থ বিজ্ঞান-পরিসেবকগণের অক্লান্ত গবেষণা অনুসন্ধিৎসা ধন্য! আমরা এক্ষণে এই আপাতনিরীহ ও নগণ্য উদ্ভিদ কোষাণু-গুলিকে প্রকৃতপক্ষে চিনিয়াছি। ইহাদের মারাত্মক প্রকৃতি, অতি নিষ্ঠুর ও নিদারুণ অত্যাচার এবং অপকার সাধনের অমিত ক্ষমতা সিংহ শার্দ্দূল বা অন্য হিংস্রক পশু পক্ষী অপেক্ষা অতীব ভয়ানক। বিশেষতঃ আমরা বরং হিংস্র শ্বাপদ বা অন্যবিধ শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে পারি, কিন্তু অলক্ষিত এই আনুবীক্ষণিক লিলিপুবিয়ান শত্রু হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষণের কোনও উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অনেক সময়ে নিতান্তই অসমর্থ। তবে, এ জগতে যেমন কোন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের নিদান নয়, সেইরূপ এই উদ্ভিজ্জাণুগণও কেবল মাত্র অনিষ্টের নিদান নহে। ইহাদিগের হইতেও এই পৃথিবীর প্রভূত উপকার সাধন হইয়া থাকে। জন্তু ও উদ্ভিদ রাজ্য এই ক্ষুদ্রতম উদ্ভিজ্জাণু দ্বারা অশেষরূপে উপকৃতও হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই উপকারী ও অপকারী আণুবীক্ষণিক ঔদ্ভিদিক লিলিপুষিয়ানদিগের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিবার মনস্থ করিয়াছি।

আজকাল অনেকেই "ব্যাক্‌টিরিয়া," "কমা ব্যাসিলি", "মাইক্রোব" ইত্যাদি শব্দ গুলির সহিত পরিচিত। কিন্তু অতি অল্প লোকেই উক্ত নামধেয় পদার্থগুলির প্রকৃতি ও কার্য্যের বিষয় অবগত আছেন এবং উহাদিগকে ভয়ানক শত্রুরূপে পরিগণনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। যাহাহউক, আমাদিগের উল্লিখিত লিলিপুষিয়ান শত্রু আর কেহই নহে এই ব্যাক্‌টিরিয়া বই। বলা বাহুল্য ইহারা উদ্ভিদ জাতীয় এবং অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর উদ্ভিদ। আমরা জানি অনেকে ব্যাক্‌টিরিয়া, কিম্বা মাইক্রোব, কিম্বা ব্যাসিলিকে কীটাণু মনে করিয়া এক বিশেষ ভ্রমে পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের জন্য এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য আমরা পুনরায় বলিতেছি, ব্যাক্‌টিরিয়া, অথবা মাইক্রোব, অথবা ব্যাসিলি উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদিগকে অনায়াসে জীবাণু বলা যাইতে পারে। কেননা,জীব শব্দ বৈজ্ঞানিক ভাষায় উদ্ভিদ ও জন্তু উভয় শ্রেণীর সাধারণ সংজ্ঞা, উভয়ার্থবোধক ও উভয়েতেই প্রযুজ্য। কিন্তু অনেকেই নাকি জীব বলিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জন্তুই বোঝেন, আমরা তাই কোন ভ্রম বা সংশয়ের সামান্যতম ছায়া পর্য্যন্ত যাহাতে না স্পর্শে এমন সংজ্ঞা —উদ্ভিজ্জাণু—ব্যাক্‌টিরিয়া—অবলম্বন করিয়াছি।

ভাবনা বা ছাতা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ বর্ষাকালে যে প্রচুর পরিমাণে পুস্তকের গাত্রে ইহারা জন্মে প্রত্যেক পাঠক নিশ্চয়ই তদ্বিষয় বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। আমাদের প্রবন্ধ শীর্ষক উদ্ভিজ্জাণু সেই ভাবনা জাতীয়। ইংরাজিতে ইহাকে Fungus বলে। তবে ব্যাক্‌টিরিয়া অতি ক্ষুদ্র, অনন্তগুণে ক্ষুদ্র, এবং নিতান্তই আণুবীক্ষণিক ভাবনা। নিতান্তই আণুবীক্ষণিক এই জন্য বলিলাম যে অতি প্রবলতম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাদিগের প্রকৃত অবস্থা গোচরীভূত হইবার নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে মতদ্বৈধ ছিল যে ব্যাক্‌টিরিয়া ভাবনা (Fungus) পরিবারভুক্ত কি এক প্রকার শৈবাল (Algae) পরিবারভুক্ত। কিন্তু এক্ষণে সে দ্বিধা আর নাই। আমাদের ব্যাক্‌টিরিয়া ভাবনা-পরিবারভুক্ত। যদি কেহ ইচ্ছা করেন জানিয়া রাখিতে পারেন ব্যাক্‌টিরিয়ার সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম সিঝোমাইসিটিজ (Schizomycetes) কথাটা লম্বা বটে কিন্তু মানে হচ্চে 'ভাঙ্গা ভাবনা'। ব্যাক্‌টিরিয়া সাধারণতঃ এক দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বংশবৃদ্ধি করে, এইজন্য উক্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। সিঝোমাইসিটিজ ব্যতীত অন্য আর এক রকম আণুবীক্ষণিক ভাবনা আছে, তাহাদিগকে saccharomycetes (শর্করা-ভাবনা) বলে। সাক্‌কারোমাইসিটিজ শর্করাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অ্যালকোহল প্রস্তুত করে। সিঝোমাইসিটিজ (ভাঙ্গা-ভাবনা) ও সাক্কারো-মাইসিটিজ (শর্করা ভাবনা) উভয়ই ভাবনা পরিবার ভুক্ত। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি ও কার্য্যগত পার্থক্য অনেক এবং সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। শর্করা-ভাবনার কথা কোন ভবিষ্য প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া আমরা বর্ত্তমানপ্রবন্ধে কেবল ভাঙ্গা-ভাবনা অর্থাৎ সিজোমাইসিটিজের বিষয়ই আলোচনা করিব।

সিঝোমাইসিটিজ একটি মাত্র কোষ সম্পন্ন উদ্ভিজ্জাণু। এক দুই বা ততোধিক ভাগে

বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে, অথবা আপনাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু (Spores) উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ভবিষ্য কোষাণুর বিকাশ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। ইহারা একাকী বা দলবদ্ধ হইয়া জলে অথবা জীবন্ত বা মৃত জান্তব ও ঔদ্ভিদিক পদার্থ মধ্যে বাস করে। ইহারা উদ্ভিদের সবুজ অংশ (chlorophyl) বিহীন। এইনিমিত্ত সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে আপনাদের আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। জীবিত বা মৃত জান্তব পদার্থ হইতেই ইহাদিগকে আহার সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু আহার সংগ্রহ করিবার সূত্রে ইহারা যেখানে বাস করে তন্মধ্যে অতি আশ্চর্য্য ধরণের ও বহুল পরিমাণের বিশ্লেষণ কার্য্য সাধন করে। যে জলে কোন পচিত জৈবিক পদার্থ না থাকে, সে জলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। বস্ততঃ অতি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জল মধ্যে ইহারা কখনই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যে জলে বা যে আর্দ্র স্থানে পচা ফল মূল জীব জন্তু বিদ্যমান থাকে, সেইখানেই ইহারা জন্মে। যদিও ইহারা উদ্ভিজ্জাণু বলিয়াই অভিহিত, তথাপি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জান্তবাণুর সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ উদ্ভিদ ও জন্তু রাজ্যের মধ্যে গঠন, ক্রিয়া ও প্রকৃতিগত নানা সাদৃশ্য-সম্পন্ন যে অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু ও জান্তবাণু বিদ্যমান থাকিয়া সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিকের উক্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ একটা কেশ সমানও সীমারেখা নির্দ্দেশ করিবার সমুহ প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া থাকে, ব্যাক্টিরিয়া সেই উদ্ভিজ্জাণু শ্রেণীভুক্ত।

এই উদ্ভিজ্জাণু বাস্তবিক কত ক্ষুদ্র আমরা কতক পরিমাণে তাহা ধারণা করিতে পারি, যখন মনে করি যে এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানের উপর একটি একটি করিয়া বিছাইয়া দিলে চল্লিশ কোটি ব্যাক্টিরিয়া একস্তরের (layer) মধ্যে ধরিতে পারে। প্রত্যেকের সাধারণ দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির বিংশতি সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাদের আকার নানা প্রকার। কতকগুলি (যেমন মাইক্রোকস্) এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র গোলাকার বিন্দুর ন্যায়। অন্য কতকগুলি (যেমন ব্যাসিলি জাতীয়) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার। আবার অন্য কতকগুলি (ইহাদিগকে স্পিরিল্লা বলে) কর্ক-স্ক্রুর মতন ঘোরান ঘোরান। এই কর্কস্ক্রু গঠনের মতন উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে যাহাদের ঘোরান বা পাক দেওয়া অংশ অল্প অর্থাৎ একটি বার ঘোরান এবং দেখিতে (,) চিহ্নের ন্যয়, তাহাদিগকে 'কমা' বলে। অন্য কেহ কেহ আবার ডিম্বাকৃতি। এই নানাবিধ আকারের সকলের সাধারণ নাম ব্যাকৃরিটিয়া। ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে কতকগুলি গতি শূন্য, আবার অনেকেরি গতি আছে। গতিমান গুলি কখন বা আপনাদের চতুস্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন বা বেগে সন্তরণ করে। কেহ কেহ বা পর্য্যায়ক্রমে আপনাআপনি একবার কুঞ্চিত হয়, আবার সরল হয়। সাধারণতঃ ব্যাসিলি ও স্পিরিল্লারা গতিশীল। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক প্রকারের ব্যাসিলি বা স্পিরিল্লা গতিশীল নহে, অনেকে আবার স্থিতিশীল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে মাইক্রোকস জাতীয় উদ্ভিজ্জাণুও গতিশীল। ব্যাসিলির সন্তরণ করিবার সুবিধার জন্য পুচ্ছের মতন একটা অংশ (Flagella) থাকে।

পুচ্ছ সাহায্যে ব্যাসিলি-কোষ সবেগে সন্তরণে সক্ষম হয়। কিন্তু গতিমান ব্যাক্‌টিরিয়া ও এই রূপ এক অবস্থার অধীন, যখন তাহাদিগকে স্থিতিশীল বা অচঞ্চল হইয়া থাকিতে হয়। এই অবস্থা উহাদিগের বীজাণু গঠনের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। ব্যাক্‌টিরিয়ার বংশ বর্দ্ধন দুই প্রকারে হয়। এক প্রকার এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণু কোষগুলি পরিণতি লাভ করিয়া আপনারাই দুই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। অপর প্রকার এই যে এক একটি কোষ আপনার মধ্যে বীজাণু (Spores) উদ্ভাবন করে এবং এই বীজাণু হইতেই উহার ভাবী বংশ উৎপন্ন হয়। আমরা এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাইক্রোক্কস কেবল বিভক্ত হইয়া এবং ব্যসিলি বিভাজিত হইয়াও বীজাণু উৎপাদন করিয়া আপনাদিগের বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বীজাণু গঠনের পূর্ব্বে অসংখ্য অসংখ্য পরিণত উদ্ভিজ্জাণু কোষ নানাকারে একত্রে দলবদ্ধ হয়, এবং জেলির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নিঃস্বরণ করিয়া বিশ্রাম করে। এইরূপ জেলিবৎ বিশ্রামকারী উদ্ভিজ্জাণুদিগকে zoogtœa বলে। এই অবস্থায় প্রত্যেক দল বিশ্রাম করিয়া যথাসময়ে বীজাণু উৎপাদন করে। বীজাণু পরিগণিত হইবার কালে কোষের অভ্যন্তরস্থ তাবৎ পদার্থ একটি দিকে সঞ্চিত হয়। এই নিমিত্ত কোষের ঐ অংশটি একটু উচ্চ হইয়া উঠে। পরে এই উচ্চাংশটি মূলকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মূল কোষের মৃত্যু হয়। ঐ বিচ্ছিন্ন অংশটিই মৃত কোষের বীজাণু। এই বীজাণু নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থাপন্ন ও নানা অপকারজনক তাপ বা শৈত্যাধীন হইয়াও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া বহু বৎসর পরেও যদি কোনরূপে মৃত্তিকার উপর নীত হয় তাহা হইলে ইহা অনুকূল অবস্থার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া পুনঃ আপন বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। বীজাণুর এই আশ্চর্য্য শক্তির জন্যই নানা রোগমূলক উদ্ভিজ্জাণুর অপকার সাধন ক্ষমতা এত অমিত। অঙ্কুরণের পূর্ব্বে বীজাণু একটু স্ফীত হয় এবং ইহার ঔজ্জ্বল্য একটু হ্রাস হইয়া যায়। পরে বীজাণুর উপরি-ত্বক মধ্যস্থলে বিদারিত হইলে বীজাণুর অভ্যন্তর দেশ সেই বিদারণ পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং ইহাই ক্রমে সূত্রাকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া নূতন কোষ বা উদ্ভিজ্জাণু রূপে পরিণত হয়।

এই উদ্ভিজ্জাণুদিগের মধ্যে নানা বিভিন্ন জাতি ও বংশ আছে। কিন্তু তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। গঠনগত (morphological) অসদৃশতা হইতে জাতি ও বংশ নির্ণয় একবারেই অসম্ভব বলিলেই হয়। কেননা একই বংশের অণু-ভাবনা অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদিগের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মধ্যেও বিশেষ মতভেদ হইয়া থাকে। তবে আমরা জানি ইহারা যে কোনরূপ জৈবিক পদার্থ আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে বাস ও বংশবৃদ্ধি করে, সেই পদার্থের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্যকর বিশ্লেষণ আনয়ন করে। অতি জটিল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থকেও রূঢ় বা অতি সরল যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল সাধারণতঃ তিন প্রকারের।

(১) রঞ্জিত পদার্থ নিঃসারণ ও উৎপাদন।

(২) ফার্মেণ্টরূপে অনেক পদার্থকে উত্তেজিত করিয়া উহাদের রূপান্তর সাধন।

(৩) নিম্নশ্রেণীর জন্তু ও মনুষ্যশরীরের রস বিশ্লেষণ করিয়া দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামক রোগজনন।

উক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়াকলাপানুসারে উদ্ভিজ্জাণুদিগকে বর্ণোৎপাদক (Chromogenous,) ফার্মেণ্টেশনজনক (Zymogenous) ও রোগজনক (Pathogenous) এই তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে জন্তুদেহে রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু দ্বারা যে সমুদয় রোগোৎপন্ন হয়, তাহা ফার্মেণ্টেশন দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য এই সকল সংক্রামক ও বিষাক্ত রোগকে Zymotic বা ফার্মেণ্টেশন মূলীয় বলা হয়।

যবক্ষারজান-সম্বলিত পদার্থ—যেমন, সিদ্ধ আলু, মাংস, পাঁউরুটি, ডিম্বের শ্বেতাংশ, নানাবিধ পিষ্টক প্রভৃতি—বাসি রাখিলে কখন কখন উহাদের উপর চাকা চাকা লাল দাগ দেখা যায়। মধ্যযুগে খৃষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় খৃষ্টের মৃত্যুদিবস স্মরণ (Eucharist) পর্ব্ব উপলক্ষে বাসি পাঁউরুটির গায়ে কখন কখন এইরূপ লোহিত চিহ্ন দেখিয়া নিরক্ষর লোক সাধারণকে বোঝাইতেন যে, ইহাতে যিশুর শোণিতবৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, খৃষ্টান-দিগের উক্ত পর্ব্ব উপলক্ষে পুরোহিতগণ যে রুটি ও সুরা উৎসর্গ করিয়া পরে উপাসকদিগকে বণ্টন করেন, সেই রুটি ও সুরাকে যিশুর সাক্ষাৎ শরীর ও শোণিত বলিয়া ঘোষণা করেন। সহজ-বিশ্বাসী মূর্খ লোকদিগের বিশ্বাস কতই না ঘনীভূত হয় যখন তাহারা বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করে যে রুটির গায়ে শোণিতের ন্যায় লোহিত চিহ্ন রহিয়াছে! কিন্তু বস্তুতঃ উক্ত লোহিত চিহ্ন অতি ক্ষুদ্র মাইক্রোকস জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুর সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ণ কীর্ত্তি বই আর কিছুই নহে। আমাদের এ দেশেও কখন কখন বাসি পিষ্টকের উপর উক্ত উদ্ভিজ্জাণু-দ্বারা ঐরূপ লোহিত বর্ণের চক্রাকার চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে কুসংস্কারাপন্ন গৃহিণীগণ সিতলা ওলাবিবি বা পঞ্চানন্দের "খেলা" মনে করিয়া কতই না সন্ত্রস্ত হন। কিন্তু এ সমুদয় ভীতি-ভাবনা-উদ্দীপক দেবলীলা রহস্যের মূলীভূত একমাত্র কারণ বায়ু-অবলম্বিত পরাচিত (parasitic) উদ্ভিজ্জাণু। ইহারা বায়ু সহকারে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হয়ত কোন গতিকে রুটি বা পিষ্টকোপরি পতিত হয়, এবং বলা বাহুল্য উপাদেয় খাদ্য পাইয়া অনাহূত হইয়াও আপনারা আপনাদের উদর পূর্ত্তি করিতে থাকে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুষ্ট ভোক্তাগণের ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ" হইয়া যায়। (পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া লেখককে মার্জ্জনা করিবেন, উদ্ভিজ্জাণুর বাস্তবিক বিবাহ না হইলেও জন্ম সন্তানোৎপাদন ও মৃত্যু হয় বটে।) সুতরাং উদ্ভিজ্জাণুগণ পিষ্টকের উপর বসিয়া বসিয়াই আপনাদের বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিশেষ ধর্ম্মানুসারে বর্ণোৎপাদন করে। এই বর্ণ প্রথমে বিন্দু বিন্দু, পরে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বড় গোলাকার চিহ্নবৎ হয়। কেবল লালবর্ণ নহে, অন্য

নানা বর্ণ—যেমন পীত, সবুজ, নীল, পীত-হরিৎ, নীলাভ-হরিৎ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জাণুদ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে। আমাদের গাত্রমার্জ্জনীতে (গামছা) সময়ে সময়ে নীল বর্ণের ছাবকা ছারকা দাগ জন্মে। উহাও এই বর্ণোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণুঘটিত। এই বংশীয় উদ্ভিজ্জাণুর নাম Micrococcus cyaneus—ইহারা গোল আলুর খণ্ড খণ্ড অংশের উপর গাঢ় নীলবর্ণ উৎপাদন করে।

নানা পদার্থের মধ্যে ফার্মেণ্টেশন উৎপাদন করিয়া উদ্ভিজ্জাণুরা অনেক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই পরিবর্ত্তন ফল অনেক সময়েই সমূহ অনিষ্টজনক। বিশেষতঃ জীবদেহে ইহাদিগের অনিষ্টকর ফল অতি ভয়ানক। আমরা অবশ্য ফার্মেণ্টেশনের কথা উল্লেখ করিয়াও এস্থলে যে ফার্মেণ্টশনদ্বারা সুরা, দধি, সির্কা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, সে ফার্মেণ্টেশনের সম্বন্ধে কোন কথা বলা এস্থলে অনাবশ্যক। শর্করা-ভাবনার বিষয় যখন আমরা আলোচনা করিব, তখন এতৎসম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইবে। আমরা বলিতেছিলাম যে, নানা দুরারোগ্য ও সংক্রামক ব্যাধি বা দেশব্যাপী মড়ক ও মহামারী এক এক সময়ে পল্লী, গ্রাম, জনপদ, নগর এবং সমগ্র দেশ পর্য্যন্ত একবারে উৎসন্ন করিয়া দেয়, যাহার প্রচণ্ড প্রকোপ প্রশমনে বিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ শক্তি পর্য্যন্ত অসমর্থ—সে সমুদয় ভীষণ ব্যাধির মূল কারণ এই উদ্ভিজ্জাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর ফার্মেণ্টেশন জনিত এক বিষাক্ত পদার্থ। রোগজনক উদ্ভিজ্জাণু কোন মতে একবার জন্তু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে অতি শীঘ্রই দেহস্থ শোণিতের মধ্যে আপনাদের বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে এবং সত্বর এত ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পায় (আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি প্রত্যেক পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে এক এক নূতন বংশ উৎপন্ন হয়) যে কিছুতেই তাহাদের বেগ নিবারণ হইবার নহে। ইহারা শরীরের শোণিতের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহাই শোণিতসহ সংশ্লিষ্ট হইয়া জন্তুর সম্পূর্ণ অনিষ্টসাধন এমন কি প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। আর মারাত্মক নানা রোগ যে সংক্রামক হয় তাহাও ঐ সকল উদ্ভিজ্জাণুর জন্য! রোগীর থুতু, গয়ের, প্রশ্বাস, শোণিত, পুঁজ, মল, মূত্র প্রভৃতির সহিত অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু কোষ বহির্গত হইয়া জল বা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, এবং সুস্থদেহী জন্তুগণ পানীয় ও নিঃশ্বাস গ্রহণের সহিত অজ্ঞাতসারে ইহাদিগকে শরীরস্থ করিয়া আপনাদের জীবনকে মহা বিপদাপন্ন করে। হাম, বসন্ত, বিসূচীকা, ধনুষ্টঙ্কার, টাইফইড্ জ্বর, পীত জ্বর, সূতিকা জ্বর, উপদংশ, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, ইরিসিপেলাস, এবং খুব সম্ভব হাইড্রোফোবিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের একমাত্র কারণ এই সকল উদ্ভিজ্জাণু। ইহাদিগের অনিষ্টকারী শক্তি কত ভয়ানক বোঝা যায় যদি আমরা স্মরণ রাখি যে ইহারা বিশেষতঃ ইহাদিগের বীজাণুগণ বেশী তাপও শৈত্যে (ফুটন্ত জলের উত্তাপ এবং মেরু প্রদেশের শৈত্য) সহজে নষ্ট হয় না। বীজাণু বহু বৎসর আনুকূল অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াও অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরিত হইয়া বংশ-বর্দ্ধন করিতে পারে। সুতরাং মারাত্মক রোগ-মূলীয় একটি বীজাণু যদি (যত বৎসর পরেই হউক না কেন)

কোনমতে একবার কোন জন্তুদেহে প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা পায়, উহা কেবল সেই হতভাগ্য জন্তুরই সর্ব্বনাশ করিয়া নিরস্ত হয় না। রোগের বীজ দেশময় পরিব্যাপ্ত করিয়া সমগ্র দেশকে উৎসন্ন করিতে পারে। এইরূপেই ইয়ুরোপে পীতজ্বর সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া কত সহস্র সহস্র লোককে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিয়াছে। কেবল মনুষ্যজাতি নহে, গো, মেষ, ছাগ, মহিষ, ঘোটক, হস্তী, কপোত, কুক্কুট, খরগস প্রভৃতি নানা গৃহপালিত পশু পক্ষী, রেসমকীট এবং চা, কাফি, আলু, কপি, বিট, আঙ্গুর, গম প্রভৃতি নানা উদ্ভিদও নানাবিধ মারাত্মক উদ্ভিজ্জাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কত সময়ে কত দেশে কত প্রকারের মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সূচনা করিয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জাণু ব্যাক্‌টিরিয়া সাধারণতঃ বায়ু ও জলের সহিত মিশিয়া থাকে। বায়ুসহ কত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ উদ্ভিজ্জাণু বিদ্যমান থাকে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই বলিলেই হয়। পরীক্ষাদ্বারা জানা যায় যে প্রত্যেক মিনিটে একবর্গ ফুট স্থানের উপর সহস্র সহস্র উদ্ভিজ্জাণু পতিত হইতেছে। যেখানে বেশী লোকের সমাগম হয়, সেখানে বেশী পরিমাণে বায়ুর সহিত মাইক্রোব মিশ্রিত থাকে। পর্ব্বতের উপরে অথবা আরও উচ্চদেশে উদ্ভিজ্জাণুর বড়ই অভাব। তীর হইতে ৬০।৭০ মাইল দূরে সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ু মধ্যে কোন মাইক্রোব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু স্তরে অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু বিদ্যমান থাকে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগর ও জনপদের বায়ুতে অধিক পরিমাণে নানা উদ্ভিজ্জাণু সংমিশ্রিত পাওয়া যায়। অগাধ বায়ু-সাগরে অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু একত্রে থাকিলেও ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিজ্জাণুগণ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া এক এক ভিন্ন দলরূপে অবস্থান করে। একদল অপর দলের সহিত মিশ্রিত হয় না। বায়ু-মণ্ডলে সাধারণতঃ যে উদ্ভিজ্জাণু বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহারা মাইক্রোক্কস্ জাতীয়। ইহা ব্যতীত সুরা প্রস্তুতকারক "ঈষ্ট" নামক শর্করা-ভাবনা শ্রেণীর একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণুও সচরাচর পাওয়া যায়।

বায়ুর ন্যায় জলের সহিতও অসংখ্য অণু-ভাবনা মিশিয়া থাকে। সকল প্রকার জলের সহিত অর্থাৎ যেমন নদীর জল, কূপের জল, পুষ্করিণীর জল, উৎসের জল, ঝরণার জল, ইত্যাদি সমান পরিমাণে উদ্ভিজ্জাণু পাওয়া যায় না। শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু ভেদে উদ্ভিজ্জাণুর পরিমাণ ভেদ হয়। পুষ্করিণী ও নদীর জলে সাধারণতঃ অনেক অধিক পরিমাণে নানাপ্রকারের অণু-ভাবনা মিশ্রিত থাকে। গভীর কূপের জল অনেক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাণু শূন্য। সমুদ্র জলে কোন প্রকারের মাইক্রোব বা ব্যাসিলি থাকিতে পারে না। জলের অপেক্ষা নদী বা পুষ্করিণীর পাঁকের সহিত অসংখ্য পরিমাণে মাইক্রোব বাস করে। এমন কি সমুদ্রের তলে পাঁকের সহিত অনেক মাইক্রোব পাওয়া যায়। চা খড়ির স্তরের উপর গভীর কূপ খনন করিতে পারিলে সে কূপের জল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মাইক্রোব-শূন্য হয়। জলে এত প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ উদ্ভিজ্জাণু থাকে বলিয়া পানীয় জলের বিশুদ্ধতা নিতান্ত আবশ্যক। অনেক সংক্রামক রোগের বীজ অর্থাৎ উদ্ভিজ্জাণু জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুকাল

বাঁচিতে পারে। এই জন্য অনেক সময়ে পানীয় দ্বারা আমরা সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইয়া থাকি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোগের মূল কারণ নানা উদ্ভিজ্জাণু বিশেষতঃ ইহাদের বীজাণু নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। শীত ও উত্তাপাতিশয্যে ইহারা যেমন নষ্ট হয় না, সেইরূপ জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াও ইহারা পচে না। অতএব এই ক্ষুদ্রতম শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পানীয় জল যথাসাধ্য বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে বালিস্তরের ভিতর দিয়া মাইক্রোবপূর্ণ জল নিঃসৃত করিলে উহার মাইক্রোব সংখ্যায় অনেক হ্রাস হইয়া যায়। পানীয় জল শোধিত করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়—উহাকে প্রথমে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তৎপরে বালি ও কয়লা সংযোগে পরিষ্কার করা। ইহাতে উত্তাপ ও বালি এই উভয়বিধ উপায়ে অধিকাংশ মাইক্রোব বিনষ্ট ও বিদূরিত হইয়া পানীয় জলকে বিশুদ্ধ করে। ব্যাসিলি জাতীয় উদ্ভিজ্জাণুই সচরাচর জলের সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে।

উদ্ভিজ্জাণু তত্ত্ব অতি অল্পদিন হইতে বিজ্ঞানের চর্চ্চাধীন হইয়াছে। যদিও ইতিপূর্ব্বে কোন কোন জার্ম্মাণ পণ্ডিত এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইলেও কিঞ্চিদধিক ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে জীবের স্বতঃজনন সমস্যা (Spontaneous Generation of Life) লইয়া পণ্ডিতযশা ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টর, সুবিখ্যাত ইংরাজ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বাষ্টিয়ানের সহিত যে সুপ্রসিদ্ধ তর্ক-দ্বন্দ্বে অবতরণ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ মেধাবলে বায়ুস্তরে অসংখ্য অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবাণুর বিদ্যমানতা প্রমাণ করিয়া স্বতঃজনন মতবাদের ভ্রম নিঃসংশয়িতরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, সেই অবধি উদ্ভিজ্জাণু বা মাইক্রোব তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। পরে মাইক্রোব প্রকৃতি তত্ত্বানুশীলনেও পাষ্টর অগ্রগণী। নানা কঠোর ত্যাগস্বীকারে অণুমাত্র পরাঙ্মুখ না হইয়া মহামতি পাষ্টর স্বকীয় অশেষ সহিষ্ণুতা, অসদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানপ্রভাবে মাইক্রোব প্রকৃতি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া এবং কতিপয় স্থলে মাইক্রোবদিগের মারাত্মক শক্তি রোগের উপায় ও সাংঘাতিক কার্য্যফলের প্রতিবিধান পন্থা উদ্ভাবন করিয়া অসংখ্য অসংখ্য মানব ও জন্তুর যে অপরিশোধনীয় উপকার সাধন দ্বারা জগৎসংসারে আপনার অক্ষয় অমর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র মানব পরিবার চিরদিন অশেষ ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিবে। মাইক্রোব তত্ত্বানুশীলন ক্ষেত্রে পাষ্টরের নব নব অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও আবিষ্কার ঐ ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য সহযোগী কর্ম্মচারীদিগকে প্রভূত সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া সকলের সমবেত যত্ন ও কার্য্যফলে মাইক্রোব-বিজ্ঞানকে বর্ত্তমানের উন্নত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

শকুন্তলা।

একেলা কুটীর দ্বারে করতলে মাথা রাখি,
বালিকা চাহিয়া আছে দৃষ্টি হারা স্থির আঁখি।
সমাধি-মগন যেন বিকচ-ললিত তনু,
কোন দেবতার পায় মিশে অণু পরমাণু।
সমুখেতে উপবনে ফুলে ফুলে গেছে ভরে,
সখী দোঁহে আনমনে জল দেয় ঝারি করে।
পালিত হরিণী-শিশু খেলা করে ছুটে ছুটে,
বিহগের কল কণ্ঠে কি মাধুরী উঠে ফুটে।
সুস্নিগ্ধ প্রভাত সেই অতি শুভ্র নীলাম্বর,
প্রভাতের শিশু রবি বরষিছে মৃদু কর।
নিশির শিশিরে ভেজা শ্যামল পল্লব দলে,
সমুজ্জ্বল শুভ্র প্রায় রবির কিরণ জ্বলে।
অদূরে মালিনী নদী কূলে কূলে বহে যায়,
কম্পিত তরঙ্গ বুকে কাঁপে রবি কর হায়!
স্নিগ্ধ শান্ত তপোবন, তাপস-তনয় দূরে,
শুনা যায় বেদ গান করিতেছে সমস্বরে।
প্রকৃতির নীরবতা ভেদ করি উঠে গান,
যেন ভেদি নীলাম্বর স্বর্গে উঠে সে তান।
সমীরে ভাসিয়া আসে বহু দূর শোনা যায়,
সমস্ত অরণ্য-হৃদি কাঁপিয়া উঠিছে তায়।
বালিকা আপনা হারা নিশ্বাস পড়ে না, যেন,
রয়েছে অচলময়ী পাষাণ প্রতিমা হেন।
শুভ্র তুষারের মত শুভ্র সুকোমল করে,
হেলাইয়া তনু-লতা মাথা রাখি তার পরে।
চেয়ে আছে এক দৃষ্টে দুটি সে নলিন আঁখি,
দেখাতেছে প্রাণে তার যেন কি স্বপন আঁকি।
কোথা কোন দূর দেশে কোন সমুদ্রের পারে,
উড়িয়া গিয়েছে প্রাণ চেতনা লয়েছে হরে।
কোথা কোন সিংহাসনে কোন প্রাসাদেতে হায়!
হৃদয়-দেবতা তার ভুলিয়া আছেন তায়।
ভুলেছেন মনে নাই হৃদয় পরাণ তার,
মিশে সে চরণ তলে চিহ্ন মাত্র নাহি আর।

শুক্লাম্বরে দীপ্ত রবি আপন জ্যোতিতে ভরা,
সূর্য্যমুখী তারি পানে চাহিয়া আপনা হারা।
তেমনি নিস্পন্দ আঁখি প্রাণহীন তনু-লতা,
চাহিছে উদ্দেশে কার ভুলিয়া জগৎ কথা।
আপনি আপনা হারা বালিকা বিরহ-ভরে,
দ্রুতপদে মুনি যান অদূরে গম্ভীর স্বরে—
বজ্রসম অভিশাপি "যার ভাবে হলি ভোর,
মোর শাপে সেও যেন না হেরে আনন তোর।
অবহেলা করি মোরে রহিলি পাষাণ হেন,
এ গরব যার লাগি সে ফিরে না চাহে যেন।
দেবতার অপমানে প্রেম উপাসনা লাগি
সে করিবে হেয় জ্ঞান যার লাগি সর্ব্ব ত্যাগী"।
কথা শেষে মুনিবর চলে যান ক্রোধভরে,
সখীরা মিনতি করি ফিরাইতে চাহে তাঁরে।
কি দুঃখ অদৃষ্টে লয়ে কহি যান দোঁহাকার,
বিষণ্ণ মলিন মুখে ফিরে দোঁহে আসে হায়।
দেখে হায় তখনো বসি পাষাণ প্রতিমাখানি,
রয়েছে তেমনি ভাবে প্রাণ আছে কিনা জানি।
উঠানে ফুটিয়া আছে কোমল মালতী-লতা,
চাহিল দোঁহার পানে মেলিয়া নয়ন-পাতা।
তেমনি নিস্তব্ধ শান্তি বিকশিত উপবন,
তেমনি মধুরে বহে প্রভাতের সমীরণ।
অদূরে মালিনী নদী কল্লোলে বহিয়া যায়,
সমুখের কুঞ্জবনে মধুর স্বরটি ভায়।
সহসা পলক হারা বিস্ময়েতে আঁখি ভরা,
স্বপ্নময়ী বেশে যেন চাহিছে আপনা হারা।
হৃদয়ের প্রান্তে পাছে আকুল বিস্ময়-রাশি,
একটি স্বপন কথা অলখিতে যায় ভাসি।
বুঝিতে পারে না, হায়, স্বপ্ন সে কি জাগরণ,
যদি স্বপ্ন তবে কেন ফুরাইল সে স্বপন!

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কার্ণো।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নোলাই নগরে লাজেয়র কার্ণোর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার অষ্টাদশ সন্তান ছিল, তন্মধ্যে কার্ণো (লাজেয়র) সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সন্তানদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছিল যে কার্ণোর ভ্রাতা ভগিনীরা সকলেই আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। কার্ণোর বয়স যখন নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু গুণবতী মাতার যত্নে তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় নাই; কার্ণোমহিলা স্বামীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কনিষ্ঠ সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

কার্ণোর বয়স যখন দশ বৎসর তখন একদা তিনি মাতৃসমভিব্যাহারে তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শীলতা ও শিষ্টাচারে সকলে মোহিত হইয়া এক বাক্যে প্রকাশ করেন যে, এত অল্প বয়সে এরূপ ভদ্রব্যবহার সন্তানদিগের মধ্যে অতি বিরল। মাতা সন্তানের প্রশংসা শ্রবণে নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করণার্থ তাঁহার অভিলাষানুসারে ঐ রজনীতে তাঁহাকে এক নাট্যশালায় অভিনয় দেখাইতে লইয়া গেলেন। তথায় যে নাটকের অভিনয় হইতেছিল তাহার এক স্থলে, এক দল সৈন্য আসিয়া একটি দুর্গ আক্রমণ করিতেছে এবং দুর্গবাসী সৈন্যেরা দোর্দ্দণ্ড যুদ্ধদ্বারা আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত করিতে প্রয়াস পাইতেছে, ইহা অভিনয় হইতেছিল। যুদ্ধ সূত্রপাত হইতেই কার্ণো আন্তরিক মনোযোগের সহিত অভিনয় দেখিতেছিলেন। যখন আক্রমণকারী দল তাহাদের কামান সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখে সজ্জিত করিতে লাগিল তখন বালক কার্ণো অধীর হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উপরোক্ত দুর্গ একটি অনুচ্চ পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত। তাহার এক পার্শ্বে প্রাচীরের বহির্ভাগে ঐ পাহাড়ের একটি অংশ ঈষৎ নমিত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে ও পশ্চাতে সমতল ভূমি ঈষৎ বিস্তৃত হইয়া পাহাড়ের গাত্র বহিয়া নিম্নগামী হইয়াছে এই সমতল ভূমিতে প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে দুর্গপ্রাচীর সম্মুখে রাখিয়া আক্রমণকারী সেনাদল কামান সজ্জিত করিতেছে। ইহাই নাট্যকারের কল্পনা এবং অভিনেতৃবর্গের অভিনয়।

কামান সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া কেবলমাত্র সেনাপতির আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছে। দর্শকগণ উৎসাহে ও ঔৎসুক্যে পরিপূরিত হইয়া নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে ঘটনা পরম্পরাতে মনোভিনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। এমন সময়ে নাট্য-শালা বিদীর্ণ করিয়া বালক কার্ণোর চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, — তিনি আক্রমণকারী সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে নির্ব্বোধ! তুমি দেখিতে পাইতেছ না,

তোমার গোলন্দাজ সকল অরক্ষিত? দুর্গপ্রাচীরাভ্যন্তর হইতে একবার গোলাবর্ষণেই তোমার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে! সত্বর তোমার কামান সকল পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া গোলন্দাজদিগকে তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ কর, নতুবা তোমার আক্রমণ চেষ্টা বিফল হইবে!"—অভিনেতৃদল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিশ্চল হইয়া রহিল; দর্শকবৃন্দ মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল কার্ণোর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া উচ্চরবে হাস্য করিয়া করতালি দিয়া উঠিল; নাট্যশালার অধিকারী এবং নাটককারের বর্ণনাকৌশলের ত্রুটি দেখিয়া ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন; এবং কার্ণোমাহিলা পুত্র কর্ত্তৃক এবম্বিধ আকস্মিক বাধা প্রদানে নাট্যশালার অপমান ভয়ে ভীত হইয়া সত্বর পুত্রকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কার্ণোর বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন তিনি গুর্ন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। তথায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ঐ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন।

ঐ বিদ্যালয়ের একটী বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে শেষ পরীক্ষায় যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতেন তাঁহাকে কোন দার্শনিক বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহা সাধারণের সমক্ষে পাঠ করিতে হইত। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই প্রবন্ধলেখককে উক্ত বিষয়ে যদিচ্ছা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার ছিল, এবং বালক তাহার উত্তর দানে অসমর্থ হইলে তাহা বিদ্যালয়ের পক্ষে অতিশয় নিন্দার কারণ হইত। দুই এক স্থলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার পর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই নিয়ম করেন যে, বালকের সমভিব্যাহারে সর্ব্বক্ষণ একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহাকে 'মেণ্টর'* বলা হইত। তিনি সঙ্গে থাকিয়া বালককে দুরূহ প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দানে সহায়তা করিবেন। সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এত জটিল হইয়া উঠিত যে বালকগণ তাহার উত্তর দানে সক্ষম হইবে ইহা কিছুতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত না, এই হেতু মেণ্টরের উপস্থিতি একপ্রকার অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বালক কার্ণো যখন স্বীয় প্রবন্ধ হস্তে করিয়া জন কোলাহলের মধ্যে একাকী উচ্চমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সকলে চমকিত হইয়া দেখিল যে, বহু বৎসরের পর এবার মেণ্টর আপন কার্য্যস্থলে অনুপস্থিত হইয়াছেন! কিন্তু পরে জানা গেল যে বালক কার্ণো স্বীয় ঔদ্ধত্য বশতঃ মেণ্টরের অধীন হইয়া সভাসমক্ষে উপস্থিত হইতে কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতেই এইবার মেণ্টরের পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন সে দিবস বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কিরূপ উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার্থ কার্ণোকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার ভয় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ণো কিছুতেই মেণ্টরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। কার্ণোর প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে পর জনৈক মহিলা গাত্রোত্থান করিয়া লাটিন ভাষাতে নানাবিধ কূট দার্শনিক প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। একে দার্শনিক প্রশ্ন, তাহাতে আবার লাটিন ভাষায়,

* পাঠকগণ 'টেলিমেকস' স্মরণ করুন।

কেমনে বুঝিবে ?

কেমনে বুঝিবে সে গো পরাণ আমার ?
নাহি যার হাসি-পাশ, চতুর রচনা-ভাষ,
মধুর লহরীময় মদির উল্লাস,
কে করে আদর তারে সংসার মাঝার !
যা কিছু আছিল মোর দিয়েছি সকলি,
পরিপূর্ণ প্রেম আর নীরব ব্যাকুলি।
কি করে মানব যেথা বিরোধী দেবতা,
দরিদ্র কাঙ্গাল আর কি পাইবে কোথা?
শুকান হিয়াটি এই শুধু যে সম্বল,
তাই নিয়ে সাধ তার করিবে অর্চ্চন ;
ইচ্ছা হয় দলে যেও চরণের তল,
পবিত্র পরশে তব লভিবে যৌবন।
বারেকের দৃষ্টিখানি গাঁথা রবে তায় ;
সংসার ভুলিয়া রবে আপন মায়ায় !

৯

মালা।

কি যেন পড়েছে মনে তাই চেয়ে আছি !
কি যেন পুরাণো কথা পড়িতেছে মনে ;
কার তরে গাঁথিয়াছি ফুল মালা গাছি,
চরণ-শবদ কার শুনেছি স্বপনে ;
গৃহ ছেড়ে যাওয়া পথে আসিয়াছি তাই
হাতে লয়ে শুধু এই কুসুমের মালা ;
কি যে তারে দিব হেন কিছু হেথা নাই—
বুঝি সে শুকায়ে গেছে যৌবনের ডালা !
কত না প্রাণের আশা, সুখের কাহিনী,
প্রণয়ের অভিমান, বিরহ বিলাপ,
গাঁথিয়া ফুলের সাথে কেটেছে যামিনী,
সহিয়াছি বিরহের ঘোর অভিশাপ।
গেঁথেছি জীবন মোর বসি তরুতলে,
দেখা পেলে পরাইয়ে দেব তার গলে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন।

বৈদান্তিকের কথার পর আমার কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হলেও অতি সকালেই আমি জেগে উঠেছিলুম। কোন স্থানে উপস্থিত হলে অনেক সময়ই রাত্রে ঘুম তত গভীর হয় না, এবং সকালে সহজে নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অভাব অনুভব হয়। মনে পড়ে ছেলে বেলায় যে দিন প্রথম বিদেশে যাই, তার পরদিন নিদ্রাহীন প্রভাত কেমন অপ্রসন্ন এবং স্নিগ্ধতাহীন ব'লে বোধ হয়েছিল, তার পর আরও কত বিদেশ বেড়ালুম, এই শেষের কয় বৎসর ত নিত্য নূতন বিদেশ, যত্র সায়ংগৃহ সন্ন্যাস। প্রভাতে উঠেই প্রাণের মধ্যে একটা অভাব অনুভূত হলো কেন? একি মায়া। মায়াবাদের ঊর্দ্ধে যাঁহার অবস্থান, তাঁহার পুণ্যমন্দির দ্বারেও মায়ার প্রভাব !

যাহোক সে জন্য দেবতার প্রতি আমার অভক্তি হয় নি। শঙ্করাচার্য্যের সমুজ্জ্বল প্রতিভা মানব মস্তিষ্ককে বিস্মিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাঁর ধর্ম্মানুরাগ, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শৃঙ্খলা সাধনের জন্য যত্ন, মানবজাতির প্রতি অপক্ষপাত সহানুভূতির পরিচয়, এই

নিরীক্ষণ করছে, তার বুকে এমন উজ্জ্বল অপূর্ব [illegible], [illegible] প্রসন্ন [illegible], [illegible] দৃষ্টি এবং [illegible] একাগ্রতা যে বোধহলো শারীরিক যন্ত্রণার কথা একটুও তার মনে নেই, [illegible] যেন মনের ভাব, সব কষ্ট দুঃখ এবার সার্থক হয়েছে। বৃদ্ধার সঙ্গে একটি বালক পুত্র ও একটি [illegible] কন্যা। আমরা যে দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, এরাও সে দিন এখানে এসেছিল। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নারায়ণ দর্শন করে শেষে ভক্তি ভরে প্রণাম করে, তার পর পুত্রটির দিকে চেয়ে বল্লে "বেটা, জনম সফল কর লিয়ে"—সেই কথা—সেই কথা কয়টির মধ্যে যে কত আনন্দ তা বর্ণনাতীত। ছেলেটি মার এই কথায় প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে নতজানু হয়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ কল্লে, মাও আস্তে ব্যস্তে জীবনের অবলম্বন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। এ দৃশ্য স্বর্গীয়, আমাদের সকলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। পুত্র মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যের এক অংশ সম্পন্ন করে অতুল আনন্দ বোধ করলে, এবং মায়ের স্নেহপূর্ণ বুকের মধুর প্রশান্তির মধ্যে স্থান পেয়ে হয়ত সে মনে করে তার অপার্থিব পুরস্কার হয়ে গেল। হায়, মাতৃহীন আমি—আজ মর্ম্মে মর্ম্মে মাতার অভাব অনুভব কল্লুম।

তার পর আমরা ধীরে ধীরে মন্দির হতে বের হয়ে "তপ্তকুণ্ড" দেখ্তে চল্লুম। মন্দিরের বাহিরে একটু নীচেই একস্থলে ছোট পাথর দিয়ে বাঁধান জল রাখবার একটা অনতিবৃহৎ চৌবাচ্চা নির্ম্মিত আছে, তার গভীরতা বেশী নয়, নারায়ণমন্দিরের নীচে দিয়ে তার এক পাশে একটা ঝরণা এসে পড়েছে, এই ঝরণার জল ভারি গরম; এত গরম যে তাতে স্নান চলে না। তাই পাণ্ডারা উক্ত চৌবাচ্চায় সেই ঝরণার জল এনে ফেলেছে, আর একদিক দিয়ে একটা ঠাণ্ডা জলের ঝরণাও তার মধ্যে এসে মিশেছে, এবং দুই জল একত্র মিলে স্নানের উপযুক্ত ঈষদুষ্ণ জলে পরিণত হয়েছে। এই স্থানটির চারিপাশে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে উপরে ছাদ তৈয়ারী করা হয়েছে; অনেকেই এখানে স্নান কচ্ছেন দেখলুম, আমারও [illegible] স্নান করবার ইচ্ছা হলো, গায়ের কাপড় চোপড় খুলছি, স্বামীজি তাড়াতাড়ি আমাকে নিষেধ করলেন, আমি তাঁকে বল্লুম এ গরম জলে স্নান করায় এমন কি আপত্তি হতে পারে—তিনি বল্লেন স্নান করায় ক্ষতি না হতে পারে, কিন্তু গায়ের কাপড় খুলে শরীর অনাবৃত [illegible] বুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগ্তে পারে, তাঁর কঠোর শাসনে অগত্যা আমাকে [illegible] বন্ধ করতে হলো; কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া নিরঙ্কুশ, তিনি গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিব্য স্নান [illegible], তাহার সেই সজোরে গাত্র মার্জ্জন এবং মৃদু হাস্যের অর্থ আমি এই বুঝলাম যে [illegible] কোন কাজের লোক নও, অতি সাবধান হয়ে সর্ব্বত্র নিজে [illegible] [illegible] সুখ ভোগ হতে বঞ্চিত থাক্‌তে হয়।

[illegible] স্নান প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় মোহন্ত মহারাজ আমাকে ডাকিয়ে [illegible]। [illegible] বেশী কঠোর মোহান্ত, [illegible] সেবার ভার [illegible] উপর [illegible]। [illegible] বলতে ভুলে গিয়েছি? এই মন্দির [illegible] চাবি মোহান্তের [illegible]; [illegible] রাজার (এখন টিহরীর রাজা [illegible]) [illegible]

কর্মচারীগণ [illegible] খুলে জিনিস পত্র খুব পড়ে দিয়ে যান [illegible] এসে সবই খুলে দিয়ে [illegible] বন্ধ করে চলে যায় ; অবশ্য জিনিস পত্র যে তাঁরা [illegible] করেন তা নয়, [illegible] মধ্যে থাকে, তবে তাঁরা একবার পরীক্ষা করে দেখেন [illegible] এরূপ [illegible] বৎসর [illegible] যে লাভ হয় তা মোহান্তেরই প্রাপ্য। মোহান্ত আমাকে কেন ডাকলেন তা বুঝতে পাল্লুম না ; স্বামীজিকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেম, কিন্তু তিনি কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং আমি একা চল্লুম। একটা বড় ঘরের ভিতরে একটা উঁচু গদীর উপর কতকগুলি তাকিয়ার মধ্যে স্থূল দেহ, মধ্য বয়সী মোহান্ত মহারাজ বসে আছেন; চারিদিকে ফরাসের উপর অন্যান্য লোক আছে ; কেহ বাক্স সম্মুখে নিয়ে বসে আছে, কারও কাছে কতকগুলি খাতা পত্র, কেহ নিস্পরোয়া ভাবে ধূমপান কচ্ছে, দুই চার জন লোক এক পাশে বসে খোসগল্প আরম্ভ করে দিয়েছে। মনে করেছিলুম বুঝি বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, কমণ্ডলুধারী, রুদ্রাক্ষ শোভিত যোগীবরকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখ্‌বো। চারিদিকে পূজার্চ্চনার দ্রব্য এবং সংযত ধর্ম্মালোচনাতৎপর বিনীত শিষ্য মণ্ডলীকে দেখা যাবে। কিম্বা এ নারায়ণের সেবাইৎ, বিভূতি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, রুদ্রাক্ষ পরিবেষ্টিত যোগী না দেখি, বৈষ্ণবের মত একটা কিছু নিশ্চয়ই দেখতে পাবো ; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্চে, সে আশায় ভারি নিরাশ হলুম, মোহান্তের আফিসে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখ্‌লুম বড়-বাজারের কুঠীয়াল কি মাড়োয়ারী মহাজনের গদীর সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে। একটু সম্ভ্রম, একটু বিনয়—কোন ভাব এখানে নেই, যেন ধর্ম্ম কর্ম্ম শুধু ভান মাত্র, ব্যবসা করাই এসমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দেবতার দ্বারেও অর্থের খ্যাতি, অর্থের সম্মান, প্রেম ভক্তি বিনয় প্রভৃতি হৃদয়ের দেবভাব অপেক্ষা অধিক। যেখানে অপার্থিব দেব মাহাত্ম্যের উপর তুচ্ছ সংসারের কোলাহল এবং হীনতা প্রতিষ্ঠিত সেখানে দেবমর্য্যাদা বিড়ম্বিত।

আমি মোহান্তের সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র "আইয়ে বাবু সাব" বলে মোহান্ত অভিবাদন কল্লেন; সকলেই সরে সরে আমার জন্য একটা যায়গা করে দিলে, আমি মোহান্তের অনুরোধক্রমে এক পাশে উপবেশন কল্লুম। মোহান্ত মহারাজ গল্প কর্ত্তে লাগলেন, তাঁর গল্পে বাজে-কথাই বেশী, ধর্ম্ম প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখ্‌লুম না, বরং সে সম্বন্ধে কিছু বল্লে তিনি কৌশল ক্রমে কথাটা উল্‌টে দিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং সচরাচর মোহন্তরা যে শ্রেণীর লোক ইনিও যে সে শ্রেণীর বেশী উপরে তা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ দেখ্‌লুম না। যোশীমঠ সম্বন্ধে কথা হ'লে তিনি এই বল্লেন উক্ত মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামীরই প্রতিষ্ঠিত, যোশীমঠে দুচারি খানি পুস্তক আছে, তার কোন কোন খানি পাঠোপযুক্ত এবং তা হতে অনেক [illegible] তত্ত্ব সংগ্রহ করা যেতে পারে কিন্তু সে জন্য কষ্ট স্বীকার করে এমন লোক আর দেখা যায় না ; সুতরাং পুস্তক-গুলিতে যে তত্ত্ব সংগুপ্ত আছে, তা [illegible] চিরবিলীন হয়ে যাবে। মোহান্তের কাছে যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা নাই, তা [illegible] তাঁরেই [illegible] [illegible]

দেওঘর।

মধুপুর হইতে আমরা একদিন বৈদ্যনাথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথের মন্দির অনেকটা কালিঘাটের কালীর মন্দিরের মত। মাঝখানে বৈদ্যনাথের মন্দির, চারদিকে আর চার পাঁচটী দেবালয় আছে, মন্দিরের দালানে একখণ্ড প্রস্তর বসাইয়া তাহার "কষ্ট হরণ" নাম দিয়া পাণ্ডারা বিলক্ষণ দু পয়সা রোজগার করিতেছে। পার্ব্বতীর মন্দিরের সহিত শিবের মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে একটী লম্বা সূতা বাঁধা দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, সেটী গাঁটছড়া। নব-দম্পতীর মধ্যে গাঁটছড়ার নিয়ম আট দিন মাত্র, কিন্তু দেব-দম্পতীর —চিরদিন। তীর্থস্থানমাত্রেই পাণ্ডার উপদ্রব যথেষ্ট থাকিলেও পাণ্ডাদের আচার ব্যবহার মোটের উপর আমার ভালই লাগে, ইহারা যাত্রীদের আত্মীয়ের মত যথেষ্ট যত্ন আতিথ্য করে, বাস্তবিক নবাগত দেশে ইহারা বিশ্বস্ত অনুচরের মত, সামান্য অর্থ দিয়া অনেকটা সুবিধা পাওয়া যায়। যাহোক্ পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, "মায়ি, একটি ধ্বজা দিয়া যাও।" কিসের ধ্বজা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, সুতরাং তাহাতে নিরস্ত থাকিয়া, সেই দিবা দ্বিপ্রহরে অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দীপালোকে বৈদ্যনাথ দর্শন ও পূজা করিয়া শিবিকারোহণে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতলে শিবিকা রাখিয়া সঙ্গীরা নিকটে একটী বাসার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পাল্কীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম। কাছে একটী কোঠা এবং কিয়দ্দূরে একখানি খড়ো বাঙ্গলা পাওয়া গেল, আমার সেই খড়ো বাঙ্গালটী মনোনীত হওয়ায় সেইখানে যাওয়া স্থির হইল। মাঠের মধ্য দিয়া, তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া, উটের পিঠের মত উঁচু নীচু পাষাণস্তূপ অতিক্রম করিয়া পাল্কী চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক একখানি পর্ণ-কুটীর দেখা যাইতেছিল। জানিনা কেন, আমি চিরদিনই এই কুঁড়েগুলির বড়ই পক্ষপাতী। সুরম্য অট্টালিকা-শ্রেণী দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা অধিক দিন টিকিবে না; কিন্তু এই কুটিরগুলি যেন চির দিন হইতে আছে ও থাকিবে। মনে হয় ঐ ছায়া-ঘেরা কুঁড়েগুলির মধ্যে যদি থাকিতে পাই, তবে বুঝি বেশ থাকি। হায়, মানব নিজের অবস্থায় কখন সন্তুষ্ট থকিতে পারে না! বলিতে পার, এ অভিসম্পাৎ কার? যাহাই হোক এক্ষণে আমরা গন্তব্য স্থানে নামিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। বলিতে পারি না সেই নারিকেল কুঞ্জ, কি সেই পর্ণকুটীর, কি গাভী-গল-ঘণ্টা ধ্বনি, কি সেই শস্পবীথিকা, কে সেখানে আমার মন হরণ করিয়াছিল? আমি ত সে দিন সেইখানে নিশা যাপনে মনস্থ করিয়া ফেলি-লাম, কিন্তু সঙ্গীরা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সুতরাং ক্ষুন্নমনে দেওঘর পরিত্যাগ করিতে হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, আমাদের সেই অস্থির অবস্থানে একটী মহারাষ্ট্রললনা অযাচিত চাকরাণী জুটিয়াছিল। সে অল্প মুহূর্তে তাহার জীবনের কাহিনী অনেকটা আমাদের বলিয়া

হইতে হইতেই সেই মতে চিকিৎসারম্ভ হয় এবং তাই ককের আবিষ্কৃত পন্থায় এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক, যদিও ককের আবিষ্কৃত lymph ক্ষয়কাশ সম্বন্ধে সেরূপ উপকারজনক হয় নাই, তাহা হইলেও Lupus নামক চর্ম্ম-যক্ষ্মার পক্ষে বিশেষ উপকারজনক হইয়াছে। সম্প্রতি ডিপথিরিয়া রোগের চিকিৎসাও উদ্ভিজ্জাণুমূলীয় অনুগ্র বীজ (Virus) দ্বারা সম্পাদিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সে দিন আমরা কোন সংবাদ পত্রে দেখিতেছিলাম লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে ডিপথিরিয়া রোগগ্রস্ত বালক বালিকা-দিগের এই নূতন প্রণালী মতে চিকিৎসা আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রোগের খুব বাল্যাবস্থায় অর্থাৎ রোগ দুই এক দিবসের হইলে ডিপথিরিয়া ব্যাসিলির অনুগ্র বীজ দ্বারা উক্ত রোগ নিবারিত হইতে পারে। ডিপথিরিয়া ২।৪ দিনের হইলেই সঙ্গে নানা জটিল উপসর্গ আনয়ন করে। এইজন্য ইহার চিকিৎসা বড় কঠিন। ডিপথিরিয়ার গতিরোধ করিতে পারিলেও অন্য উপসর্গ কর্ত্তৃক (যেমন Capillary Bronchitis কিম্বা অন্য আর কিছু) রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে যাহা হউক ইহাতে উদ্ভিজ্জাণু-বিজ্ঞানের প্রকৃত মূল্যের কিছুই ব্যত্যয় হয় না। আশা করা যায়, যখন আমরা এক্ষণে অনেক সংক্রামক ও বিষাক্ত রোগের মূল কারণ উদ্ভিজ্জাণু বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং তাহা জানিয়াই যখন কতকগুলি রোগ নিবারণের উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে উদ্ভিজ্জাণু-বিজ্ঞান যতই চর্চ্চিত হইবে, যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই নানা ভীষণ প্রাণনাশক ব্যাধি নিরাকরণের অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে। আর সেই সঙ্গে নানা বিষম রোগ-যন্ত্রণাভিভূত মানব ও অন্যান্য জন্তু পরিবার দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অকালে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে।

এখানে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ আবশ্যক। আমরা আজকাল অস্ত্র-চিকিৎসার মধ্যে Anti-septic অর্থাৎ পচন-প্রতিরোধী প্রণালীর সফলতার কথা শুনি। পচন-প্রতিরোধী প্রণালী আর কিছুই নহে কেবল যাহাতে ক্ষতস্থানে কোন প্রকারে উদ্ভিজ্জাণু প্রবেশ করিতে না পারে সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা। অস্ত্র-চিকিৎসকেরা তাই germ বা উদ্ভিজ্জাণু-বিনাশী কার্ব্বলিক য়্যাসিড, আইওডিন প্রভৃতি পদার্থ সংযোগে সাধ্যমত চেষ্টা করেন, যাহাতে ক্ষতস্থানে কোনরূপে germ প্রবেশ করিতে না পারে। উদ্ভিজ্জাণু বায়ু অবলম্বিত থাকে বলিয়া অতি সহজেই ক্ষতস্থানে সংলগ্ন হইতে পারে এবং তথায় পচন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া একপ্রকার বিষ উৎপাদন করে। সেই বিষ দেহের শোণিতসহ মিশ্রিত হইয়া বিষম অনিষ্টোৎপাদন করে। বায়ুরাশিতে অনিষ্টকারী উদ্ভিজ্জাণুর বিদ্যমানতা আবিষ্কার ও উহাদিগকে বিনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন দ্বারা বর্ত্তমানে অস্ত্র-চিকিৎসার অনেক বিঘ্ন [illegible] হইয়াছে। আর সেইজন্য য়্যাণ্টি-সেপ্‌টিক্ প্রণালী অবলম্বনে কত [illegible] [illegible] অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান 'Suffering humanity'র [illegible] সমর্থ হইয়াছেন।

হয়ত আমরা এতক্ষণ উদ্ভিজ্জাণুদিগের বীজাণু-নাশাত্মক প্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া পাঠক সাধারণের মনে ইহাদের বিরুদ্ধে এক বিজাতীয় ঘৃণা এবং এক ভয়ানক আতঙ্কের উদ্রেক করিয়াছি। অবশ্য নানা দুশ্চিকিৎস্য ও অনারোগ্য ব্যাধির নিদান হইয়া ইহারা যে লোক সাধারণের স্বাভাবিক ঘৃণা ও আতঙ্কের বিষয় হইবে, সকলেই যে স্বভাবতঃ ইহাদিগকে ভীষণ অতি ভীষণ, এবং অপরাজেয় শত্রুরূপে পরিগণনা করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি উদ্ভিজ্জাণু নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের নিদান নহে। উহাদের সকলেই আমাদের শত্রু নহে। কতকগুলি আবার আমাদের পরম বন্ধু, নিতান্ত উপকারী মিত্র। উদ্ভিজ্জাণু উদ্ভিদ হইলেও ইহার জীবন-ধারণ প্রণালী অপর সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় নহে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহারা জন্তু শরীর বা উদ্ভিদ শরীরে পরগাছার ন্যায় জন্মিয়া, তাহা হইতে আপনাদের আহার সংগ্রহ করে। মৃত জান্তব পদার্থ হইতে আহার সংগ্রহ করিতে গিয়া উদ্ভিজ্জাণু উক্ত পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলে। ইহাকেই আমরা মৃত জন্তুর পচন বলি। আমাদের সাধারণ ধারণা ফল পাকিলে আপনি পচিয়া যায়। জীব জন্তু মরিলে জল হাওয়া লাগিয়া উহা আপনাপনিই পচে। পচনশক্তি যেন জীবের অন্তর্নিহিত এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উদ্ভিজ্জাণুরা আপনাদের আহার সংগ্রহ করিতে গিয়াই মৃত পদার্থকে উহার আদিম মৌলিক উপাদানে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। আর সেই মৌলিক পদার্থ সকল ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুরাশির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় ভাবী জীবের জীবনোপাদানরূপে অবস্থান করে। এইরূপেই আজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অবিনাশী মৌলিক উপাদান নিচয় হইতে অগণিত জীব জন্তুর আবির্ভাব হইতেছে। শুনিতে নিতান্তই আশ্চর্য্যের কথা, অথচ ইহাপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই যে, যদি অসংখ্য অসংখ্য এই উপকারী উদ্ভিজ্জাণু বায়ুরাশিতে অবলম্বিত না থাকিত, আর যদি সেই সকল উদ্ভিজ্জাণু মৃত জীব শরীরের উপর পতিত হইয়া আপনাদিগের আহার সংগ্রহ করিতে গিয়া সেই মৃত দেহকে পচিত, গলিত অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট না করিত, তবে আজ এ বিশাল পৃথিবী, ফল ফুলে সুশোভিত এবং জীব জন্তু পরিপূরিত এ রমণীয় ধরাধাম, ভীষণদর্শন শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণতর দৃশ্যস্থল হইয়া থাকিত। কারণ, অগণ্য অবিকৃত মৃত জীবদেহ জন্তুদেহ উদ্ভিদ-দেহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পড়িয়া থাকিত। হয়ত, নূতন জীব জন্তুর উত্থান জন্য সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও অবশিষ্ট থাকিত না। রাশি রাশি মনুষ্য, গো, পশু পক্ষীদেহ, রাশি রাশি মৃত ঔষধি বনস্পতি তরু গুল্ম স্তূপাকারে পর্ব্বতপ্রমাণ [illegible] ধরাপৃষ্ঠদেশকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সমুদ্র, নদ, নদী, হ্রদ, তড়াগ প্রভৃতি নানা জলাশয় জলজ জীব জন্তুর মৃতদেহে [illegible] হয়ত এত দিনে একবারেই পূর্ণ হইয়া যাইত। [illegible] সে দৃশ্য কি ভীষণ ও বীভৎস দর্শন!! শ্মশান অপেক্ষাও ভয়ানক শ্মশান হইয়া এ পৃথিবী পড়িয়া থাকিত। কেবল তাহাই নহে। প্রথমতঃ স্থানাভাব, দ্বিতীয়তঃ [illegible] খাদ্যাভাবে, পৃথিবী [illegible] শস্য শূন্য হইত; [illegible] জীব জন্তুও বাঁচিত না। [illegible]

পারিত না। জন্তুমৃত, উদ্ভিদমৃত, এক নিরবচ্ছিন্ন শবের স্তূপ; পাশাপাশি, উপরি উপরি, মনুষ্য গো মেষ ছাগ, অসংখ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ, উদ্ভিদ তৃণ লতা বৃক্ষ,—মৃতাবস্থায় এই ধরণীর পৃথিবীর উপর বিকট শোভায় কবিকল্পিত প্রেতলোকের সাক্ষাৎ জীবন্ত ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যস্থল হইয়া থাকিত। সে প্রেতপুরীর চিত্র কল্পনা করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু আমাদের সকলের সৌভাগ্যক্রমে এই এককোষী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণু যেন প্রকৃতির অমিত অগণ্য আবর্জ্জনা-পরিষ্কারক, গঙ্গাপুত্র সদৃশ অহর্নিশি অনবসাদে স্বকার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা সহস্র সহস্র মৃতদেহকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে মৌলিক উপাদানে পরিণত করিতেছে। মৃতদেহ সকল পচিয়া মৌলিক উপাদানে পরিণত হইয়া বায়ু, জল, ও মৃত্তিকার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় ভাবী জীবের আহারীয়রূপে অবস্থান করিতেছে। ভূপৃষ্ঠ তাই চিরদিন সারবান্; তাই সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অপর্য্যাপ্ত ফল শস্য, তৃণগুল্ম, বৃক্ষলতা প্রসব করিয়াও ধরা অনুর্ব্বর বা সারবিহীন হয় না। আবার ফল, মূল, শস্য হইতেছে বলিয়া অগণ্য জন্তু জীবন ধারণে সমর্থ। আমরা মানবপরিবার তাই আজও ভূপৃষ্ঠে জীবিত। বাস্তবিক, সেই উদ্ভিজ্জাণু পরিবারান্তর্গত—যে উদ্ভিজ্জাণুর কতকগুলি স্বতন্ত্র বংশের মারাত্মক কার্য্যের জন্য আমরা নানা দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া অপরিণত কালে জীবন ত্যাগ করিতে বাধ্য হই—সেই উদ্ভিজ্জাণু পরিবারের অপর কতকগুলি বংশের স্বতঃ প্রবৃত্ত কার্য্য দ্বারা, যদিও নিতান্ত নিঃস্বার্থতা মূলক নহে, আমরা এত বহুপ্রকারে উপকৃত হই যে, এমন কি আমাদের অস্তিত্ব ও প্রাণধারণ পর্য্যন্ত তজ্জন্য সম্ভাবিত হইতেছে।

অতি নিন্দনীয় উদ্ভিজ্জাণুগণ যদি আর কোন উপকার সাধন না করিয়া কেবল পূর্ব্ব বর্ণিত বিশ্লেষণ কার্য্যদ্বারা ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার রাখিয়া, এবং জটিল জীব শরীরস্থ উপাদানকে মৌলিক উপাদানে পরিণত করিয়া ভবিষ্য জীবের আবির্ভাব জন্য অনুকূল অবস্থার সৃজন করিত, তাহা হইলেও নিশ্চয় সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, ইহারা এই মহৎ কার্য্যদ্বারা নিজ পরিবারের অন্য কতকগুলি বংশের নিষ্ঠুর সাংঘাতিক কার্য্যের জন্য মানব সমাজে যে একটা অপরিহার্য্য ও অমোচনীয় দুর্নাম অর্জ্জন করিয়াছে, সেই দুর্নাম ঘুচাইবার পক্ষে যথেষ্ট করিয়াছে। কিন্তু সুজন পাঠক, ধরাবাসী অগণিত উদ্ভিদ ও জন্তুর সাধারণ-হিতার্থে উদ্ভিজ্জাণুর বিশ্ব-সেবাব্রত এই এক মহদনুষ্ঠানেই আবদ্ধ বা পর্য্যবসিত নহে। উদ্ভিজ্জাণু সমগ্র উদ্ভিদ রাজ্যের আর একটি অতি মহৎ উপকার সাধন করে। আমরা জানি অঙ্গারক, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক, ফস্ফরস্, পটাশ, সোডা প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় ও [illegible] পদার্থ উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য-উপাদান। অঙ্গারক ও অক্সিজেন বায়ু হইতে এবং অবশিষ্ট উপাদান সকল মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে। যদিও আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন বাষ্প বিদ্যমান, তথাপি উদ্ভিদগণ বায়ু হইতে উহাদের আবশ্যকীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে না; মৃত্তিকা [illegible]। কত

জীবজন্তুদেহ হইতে নির্গত হইয়া নাইট্রোজেন, নাইট্রিক য়্যাসিড বা নাইট্রেটরূপে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত থাকে, উদ্ভিজ্জগণ মূলদ্বারা এই নাইট্রেট শোষণ করিয়া আপনাদের দেহ পোষণ করিয়া থাকে। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের এক অত্যাবশ্যক খাদ্য-উপাদান। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, নাইট্রিক য়্যাসিড মৃত্তিকার মধ্যে কিরূপে প্রস্তুত হয়? প্রকৃতির সে এজেন্ট কে, যে বিশ্বের এ প্রকাণ্ড লাবরেটরীতে বসিয়া সমুদয় ভূপৃষ্ঠ পরিব্যাপিয়া ক্রমাগত নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুতদ্বারা সমস্ত উদ্ভিদরাজ্যের অশেষ অভাব পূরণ করিতেছে? অন্য আর কেহই নহে; এই উদ্ভিজ্জাণু পরিবারান্তর্গত অন্য কতকগুলি উপকারী উদ্ভিজ্জাণু। ইহারা দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় (Species)। এক জাতি য়্যামোনিয়া হইতে নাইট্রস য়্যাসিড, অপর জাতি নাইট্রস য়্যাসিড হইতে নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুত করে। নাইট্রস য়্যাসিড য়্যামোনিয়া ও নাইট্রিক য়্যাসিড এতদুভয়ের এক মধ্যবর্ত্তী পদার্থ। বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়দ্বারা আমাদের লাবরেটরীতে নাইট্রস য়্যাসিড প্রস্তুত করণ বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অথচ প্রকৃতির মধ্যে ইহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে। আবার, এই নাইট্রস য়্যাসিড অন্য এক বংশের উদ্ভিজ্জাণুদ্বারা অনায়াসে নাইট্রিক য়্যাসিডরূপে পরিণত হইতেছে। আমরা তাই দেখি, মৃত জান্তব পদার্থ বিশ্লেষণের ন্যায় মৃত্তিকার মধ্যে নাইট্রোজেন বা নাইট্রিক য়্যাসিড মিশ্রণ আমাদের প্রবন্ধ শীর্ষক উদ্ভিজ্জাণুদের আর একটি অতি মহৎ ও বিশেষ উপকারমূলক কার্য্য।

উদ্ভিজ্জাণুদিগের সম্বন্ধে সম্প্রতি আবিষ্কৃত আর দুই একটি তথ্যের কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহা সাধারণতঃ বিদিত যে উদ্ভিদ দেহের অন্য সকল অংশের মধ্যে কেবল সবুজ পত্রই জীবন্ত প্রটোপ্লাজম পদার্থ সংগঠন করিতে পারে। প্রটোপ্লাজম প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জন্তু দেহ গঠনের মূল উপাদান। উহা আদৌ অঙ্গারক, যবক্ষারজান, অম্লজান, হাইড্রোজেন, সলফার ও ফস্‌ফরস এই ছয়টি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরিমাণ সংমিশ্রণে সম্ভূত এক যৌগিক পদার্থ। এখন আমরা উদ্ভিজ্জাণু-তত্ত্বানুশীলনকারীদিগের নিকট হইতে জানিয়াছি যে এমন কতকগুলি উদ্ভিজ্জাণু আছে (যেমন নাইট্রস ও নাইট্রিক য়্যাসিড প্রস্তুতকারী উদ্ভিজ্জাণু) যাহারা বিশুদ্ধ খনিজ পদার্থ মধ্যে জন্মিয়া স্বচ্ছন্দে আপন বংশ পরিবর্দ্ধন করে এবং আপনাদের দেহ পরিপোষণের জন্য জীবন্ত প্রটোপ্লাজম পদার্থ পরিগঠন করিতে পারে। এই নূতন তথ্য উদ্ভিদ-শরীর বিজ্ঞানের একটি প্রধান নিয়মের ব্যত্যয় প্রদর্শন করিতেছে। কেন না, এতাবৎকালে জানা ছিল যে উদ্ভিদের সবুজ পত্রই প্রটোপ্লাজম পরিগঠন করে। সবুজ-অংশ-বিহীন বলিয়াই ভাবনা ও উদ্ভিজ্জাণু পরিবার পরগাছার ন্যায় কোন জান্তব পদার্থের উপর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এখন দেখিলাম অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণুদিগের কেহ কেহ আপনাদের জন্য খনিজ পদার্থ মধ্য হইতেই জীবন্ত প্রটোপ্লাজম পদার্থ গঠন করিতে পারে।

উদ্ভিজ্জাণুদিগের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ তথ্য এই। কৃষি-বৈজ্ঞানিকেরা [illegible] শিম, মটর প্রভৃতি শুঁটিবিশিষ্ট (Leguminous plants) উদ্ভিদের মধ্যে মৃত্তিকা [illegible]

[illegible] নানা সার হইতে যে পরিমাণে যবক্ষারজান পদার্থ পাওয়া যাউক, তাহাপেক্ষাও অনেক অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান পদার্থ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য পূর্ব্বে কেহ ইহার কোনই সন্তোষজনক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের স্থানে স্থানে ছোট গাঁটও থাকে। এই গাঁট গুলির ভিতরে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে এবং এক এক সময়ে উহাদের চতুস্পার্শ্বে অভ্যন্তর দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক্‌টিরিয়াতে পরিপূর্ণ থাকে। এই ব্যাক্‌টিরিয়া মুক্ত বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই নাইট্রোজেনই উক্ত গাঁট সকলের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। কোন উদ্ভিদই বায়ু হইতে সাক্ষাৎ ভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণে সক্ষম নহে। কিন্তু এই ব্যাক্‌টিরিয়াগুলি তাহা পারে। সুতরাং উদ্ভিদ-শরীর-বিজ্ঞানের মধ্যে এই শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়ার এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম আর একটি নূতন তথ্য।

এই শ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়াদিগের বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া সিম মটর প্রভৃতি গাছের শিকড়ের গ্রন্থি মধ্যে উহা সঞ্চিত করণ এবং তদ্দ্বারা মৃত্তিকাকে সারবান্ করণ জনিত এই আবিষ্কার ফল দ্বারা কৃষি-বিজ্ঞান বিশেষ ফলবান হইয়াছে। জমির সারবত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃষককে সকল জমিতেই সময়ে-সময়ে নানারূপ সার প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যাক্‌টিরিয়াদিগের নাইট্রোজেন সঞ্চয় করণ জন্য জমিতে নূতন সার দিবার আবশ্যক করে না। সারহীন জমিতে সিম বা মটরের একবার চাষ করিলে কৃষক দুই প্রকারে লাভ করিয়া থাকে। কৃষককে ফসলও পায়, আবার সিম ও মটরের শিকড়ের গ্রন্থিমধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মিয়া নাইট্রোজেন সঞ্চয় করে বলিয়া সেই নাইট্রোজেনে জমি সারবান্ হইয়া যায়। উদ্ভিজ্জাণু হইতে ইহাও আমাদের অল্প উপকার নহে।

আমরা বারান্তরে অন্যান্য উপকারী অণুজীবগণ যাহাদের দ্বারা সুরা সিরকা দধি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

স্বরলিপি*

কথা—গোবিন্দ দাস। সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরূপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিনী, অঙ্গ তরঙ্গিনী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে।
কুঞ্জরগামিনী, মোতিম দশনী,
দামিনী চমক নেহারিনী রে।
আভরণধারিণী, নব অভিসারিণী,
শ্যামর হৃদয় বিহারিণী রে।
নব অনুরাগিনী, অখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিনী মোহিনী রে।
রাস বিলাসিনী, হাস বিকাশিনী,
গোবিন্দ দাস-চিত সোহিনী রে।

মপম১ গ১

[মগ২ ম১ প১ । মপগ১ গো১ র২ । রগোর১ স১ র১ গো১ । র৩ ।] র১ ধ১ ধ১
[সুন্ দ রী রা — ধে আ ও য়ে ব নি] ব্র জ র

শেষ।

ধ১ । ধ২ ধ১ ধ১ । ধ১ নোধ১ প১ ধ১ । নো৩ নোগ১ । র১ গ১ ম১ প১ । ধ২ ধ১
ম ণী গ ণ মু কু ট ম ণি — কু — ঞ্চি ত কে শি

(আ-প্র)

নোধ১ । প১ ধ১ নো১ র্স১ । নোর্সর্র২ র্র১ র্র১ । ধ১ নো১ র্স১ র্র১ । গো২ র্র১ গোর্র১ ।
নী নি রূ প ম বে শি নী র স আ — বে শি নী

---

* শ্রীমতী [illegible] অনুরোধে এই গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।

আভু মানমন্দির।

সাধারণতঃ জনসাধারণের নিকট ইহাই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে যে মানমন্দিরে কেবল জ্যোতিষ্কদর্শন জ্যোতিষ শ্রবণ ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান মনন প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিষয়ক কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু রজনীর ঘনান্ধকারে মানমন্দিরের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ভূতের উৎপাত সচরাচর সম্ভাবনীয় হইলেও শ্রুতিগোচর হয় না; হিংস্র জন্তুর উৎপাত আরও অতিবিরল। সম্প্রতি বোর্ণিও দ্বীপের অন্তঃপাতী আভু নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশে একটী মানমন্দিরে যে একটী নৈশচরিক উৎপাত সংঘটিত হইয়াছে তাহা বিলাতী Pall Mall Budget হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

আভু মানমন্দির একটী অত্যোন্নত শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে শৈলশৃঙ্গের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া ঘননিবিড়-বনরাজি ক্রমশঃ নিম্নদিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে; তাহা নিয়ত হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ থাকে। বহুদূর হইতে আভু শৈলশৃঙ্গকে একটী ঘোরকৃষ্ণ বিপুলকায় রজতমুকুট-ধারী দৈত্যরাজের মতন দেখায়। ধবলকায় মানমন্দির তাহার মুকুট, এবং ঘনকৃষ্ণ বনরাজি তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছে।

এই মানমন্দিরে একজন পরিদর্শক এবং তাঁহার একজন সহকারী বাস করেন। তাঁহাদের বাসগৃহ মানমন্দিরগৃহ হইতে প্রায় শতহস্ত দূরে অবস্থিত। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে কয়েকটী তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে মানমন্দিরের ভৃত্যগণ সপরিবারে বাস করিয়া থাকে। মানমন্দিরের পরিদর্শক ও সহকারী উভয়েই ইংরাজ। তাঁহাদের একের নাম Thaddy এবং অপরের নাম Woodhouse। একদা থ্যাডি জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যায় শায়িত ছিলেন, এ কারণ উডহাউসকে একাকী রাত্রিতে পরিদর্শন করিতে যাইতে হইয়াছিল। আভু মানমন্দিরে একটী বৃহৎকায় বৈষুব দূরবীক্ষণ এবং তদানুসঙ্গিক যন্ত্রাদি-দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। মানমন্দিরগৃহ বৈষুবের ব্যবহারোপযোগী; তাহার প্রাচীর গোলাকার ঢাকের মতন এবং ছাদ বর্ত্তুলাকার গুম্বজের ন্যায়। ঐ ছাদ প্রাচীরের উপরি স্থাপিত রেলের উপর দিয়া আবর্ত্তন করিয়া থাকে। গুম্বজের একপ্রান্তে শীর্ষ হইতে প্রাচীর সংলগ্নাংশ পর্য্যন্ত একটী গবাক্ষ আছে তাহার দিকে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া গগনের নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর করা হইয়া থাকে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন আভুতে, কতকগুলি নক্ষত্রের বর্ণন পর্য্যবেক্ষণ হইতেছিল। ঐ পর্য্যবেক্ষণের জন্য কেবলমাত্র বৈষুবকে নির্দিষ্ট নক্ষত্রে উপস্থাপিত করিয়া [illegible] অন্তর্নিহিত করিয়া দিতে হয় অতঃপর পর্য্যবেক্ষণকারী স্বীয় আসন গ্রহণ [illegible]

দূরবীক্ষণ আপনা আপনি চলিতে থাকে ; তজ্জন্য অন্য কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এই হেতু উডহাউস কোন ভৃত্যের সাহায্য কামনা না করিয়া একাকী একটী লণ্ঠন হস্তে মানমন্দির গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রজনী ঘনতমসাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না ; অদূরে ভৃত্যবর্গ আহারান্তে বসিয়া নানারূপ গান বাদ্যে প্রমোদিত হইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ-বনরাজি চতুর্দ্দিকে ছায়াবিস্তার করিয়া রজনীর অন্ধকার দ্বিগুণিত করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ঐ অরণ্যগর্ভ হইতে অন্ধকার ভেদ করিয়া বন্যপশুর গভীর গর্জ্জন এবং নিশাচর পক্ষীদিগের কর্কশ কূজন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। উডহাউসের হস্তস্থিত আলোক দৃষ্টে পুলকিত হইয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের [illegible] গন্ধর্ব্বস্বরূপ বন্য মশকজাতি পালে পালে তাহার চতুর্দ্দিকে তানলয় [illegible] সঙ্গীতারম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ বিভিন্নজাতীয় গায়ক ও বাদ্যকর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহাদের গীত বাদ্যে অভিনন্দিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উডহাউস মানমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নক্ষত্রালোকে যাহাতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে পারে এমত গৃহাভ্যন্তরে সম্যক্ অন্ধকার অত্যাবশ্যকীয় হওয়াতে তিনি লণ্ঠনকে নির্ব্বাণোন্মুখ করিয়া একটী টেবিলের উপর স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণার্থ উপবেশন করিলেন। তিনি ছায়াপথের একটী নক্ষত্রস্তূপের দিকে মনোনিবেশ করিয়া [illegible] মধ্যে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ও সেই সঙ্গে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বজনিত অনিচ্ছা ভুলিয়া গেলেন। গৃহমধ্যস্থ আলোক ক্রমশঃ অবত্ন-পালিত শিশুর ন্যায় গৃহের অন্ধকার দ্বিগুণিত করিয়া অসীমে মিলাইয়া গেল। তিনি নিঃশব্দে দূরবীক্ষণে নেত্র সংযোগ এবং নক্ষত্রস্তূপে চিত্তাভিযোগ করিয়া আপনার অস্তিত্বের পরিচায়ক নিশ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ করিয়া নিরালাপনে তৎপর হইলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল যেন সমস্ত নক্ষত্র জগতে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাপ্রলয় হইয়া গেল—নিঃশব্দে সমস্ত নক্ষত্র-জগৎ মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। তাহা মুহূর্ত্তমাত্র—পরক্ষণেই আবার নক্ষত্রমালা সেইরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আবার প্রলয়, আবার [illegible]। এইরূপ ২।৩ বার হইলে পর উডহাউসের মন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহা কোন নিশাচর পক্ষীর গগন-বিহারজনিত ; কিন্তু ২।৩ বার এইরূপ ঘটনাতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে পক্ষী মানমন্দিরের দিকে আসিতেছে। [illegible] স্থির চিন্তা করিতে মুহূর্ত্তমাত্র ব্যয়িত হইলে, পর মুহূর্ত্তেই বজ্রনির্ঘোষে কি যেন [illegible] মুহুর্মুহু আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার নেত্রে সমস্তই অন্ধকার হইয়া গেল, দূরবীক্ষণ আহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে [illegible] (পক্ষীই হউক আর যাহাই হউক) [illegible] গবাক্ষ রোধ করিয়া বসিয়াছে। [illegible] মুহূর্ত্ত [illegible] নক্ষত্রমালা দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে আবির্ভূত [illegible] যেন [illegible] দূরবীক্ষণ একেবারে [illegible]

গিয়াছে। উডহাউস্ "বাপ্‌রে!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কি যেন একটা প্রকাণ্ডকায় পক্ষধারী কৃষ্ণ পদার্থ তাহা হইতে সরিয়া গেল; "ছায়াপথ" পুনর্ব্বার নক্ষত্রালোক বিস্তার করিতে লাগিল। তিনি ইহা স্থির করিলেন যে, নিশাচর পক্ষীজাতীয়; কিন্তু তাহা মানমন্দিরের ভিতরে কি বাহিরে রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহাও মুহূর্ত্তমাত্র! আবার দূরবীক্ষণ ভীষণবেগে দুলিতে লাগিল। উডহাউস্ বুঝিলেন নিশাচর গৃহাভ্যন্তরেই আছে; দূরবীক্ষণে আরোহণ করিয়া বসিয়াছে। তিনি কম্পিত কলেবরে ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং স্থিরনেত্রে নিশাচরের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঘনান্ধকারে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। অকস্মাৎ যেন পাখার ন্যায় কি একটা বৃহৎ দোদুল্যমান পদার্থ তাঁহার মুখের নিকট দিয়া সঞ্চালিত হইয়া গেল, তিনি তাহাতে নক্ষত্রালোক প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেন। ইহা হইতে তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে নিশাচর পক্ষবিশিষ্ট হইলেও তাহা পক্ষীজাতীয় (অর্থাৎ পালকবিশিষ্ট) নহে। সে যাহা হউক তাহা যে ভীষণকায় তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না। নিশাচর গুম্বজের অভ্যন্তর-ভাগে কাষ্ঠে নখর সংলগ্ন করিয়া দুলিতে ও পক্ষসঞ্চালন করিতে লাগিল। উডহাউসের পার্শ্বে একটী টেবিলের উপর তাঁহার পানোপযোগী জল এবং এক বোতল মদ্য ছিল; পক্ষাঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া বোতলটী ভগ্ন হইয়া গেল।

একটী ভীষণকায় নিশাচরের সহিত এক গৃহে আবদ্ধ থাকা ও অন্ধকারে মুখের কাছে তাহার পক্ষসঞ্চালন অনুভব করা, অসমসাহসিক মনুষ্যের পক্ষেও প্রীতিকর হয় না— তাহাতে নিজের অলক্ষিতে নিশাচর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আরও অপ্রীতিকর। কিন্তু উডহাউস্ আর নিষ্ক্রিয় হইয়া দণ্ডায়মান থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় এবং কাহার সহবাসে তিনি নিশাযাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা নিরাকরণার্থ কৌতূহলী হইয়া আলোক প্রজ্জ্বলনার্থ উৎসুক হইলেন। অনেক অনুসন্ধানে একটী দীপশলাকা মিলিল, এবং দূরবীক্ষণের দণ্ডে সংঘর্ষণ দ্বারা আলোক প্রজ্জ্বলন করিতে উদ্যত হইলেন। দীপশলাকা চট চট শব্দে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক সধূম আলোক প্রদান করিল; উডহাউস্ সেই ক্ষণিক আলোকে দেখিতে পাইলেন যে নৌকার পালের ন্যায় একটি সুবিস্তৃত পক্ষ তাঁহার মুখের দিকে আসিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে দীপশলাকা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল এবং তাঁহার মুখের উপর সবলে উপর্য্যুপরি পক্ষাঘাত হইতে লাগিল। তিনি আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, তাঁহার গণ্ডের একাংশ নখাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া আঘাত করা হইতেছে; অতএব প্রত্যুৎপন্নমতি বলে সত্বর দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, এবং গুঁড়ি মারিয়া দূরবীক্ষণের নীচে গিয়া শয়ন করিলেন। তিনি ইহাও অনুভব করিলেন যে নিশাচরের পক্ষে নখর আছে। এদিকে তাঁহার পর্য্যায়ক্রমে পুনরায় আঘাত হইতে লাগিল ও তাঁহার পরিচ্ছদ [illegible]

[illegible] হইয়া গেল। অতঃপর তিনি দূরবীক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠাসনের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সমস্ত শরীর বাঁচাইতে পারিলেন না, পদদ্বয় বাহিরে রহিয়া গেল। এমত সময় রোমাবৃত কোন পদার্থ তাঁহার পদসংলগ্ন হওয়াতে তিনি তাহা নিশাচরের শির মনে করিয়া তাহাতে সবলে পদাঘাত করিলেন; তৎক্ষণাৎ ইহা অনুভূত হইল যে অতি তীক্ষ্ণ দুইপাটি দন্তদ্বারা তাঁহার একটী পা সবলে দংশিত হইতেছে। তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া অপর পদদ্বারা সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে কোনই ফল দর্শিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে ভগ্ন বোতলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলেন; তদ্দ্বারা তিনি নিশাচরের দন্তপাটি লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার আঘাত করাতে তাহা দংশন ছাড়িয়া দূরবীক্ষণে অধিরোহণ করিল। তাহার ভারে দূরবীক্ষণ এমত বেগে দুলিতে লাগিল যে উডহাউসের মনে হইল যেন কোন বন্য হস্তী দূরবীক্ষণ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে গুম্বজের গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে দূরস্থিত নক্ষত্রাম্বরে নিশাচরের মস্তকের কালছায়া পড়িয়াছে; তাহাতে বোধ হইল যেন মস্তকটী একটী বৃহৎ কুকুরের মস্তকের ন্যায়; কিন্তু তাহার কর্ণদ্বয় শশকের কর্ণের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে খাড়া হইয়া রহিয়াছে।

উডহাউস্ এইরূপ বীভৎস জাতীয় নিশাচরের সহবাস আর কিছুতেই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না, অতএব বহিঃস্থ ভৃত্যবর্গকে বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঐ চীৎকারে ভীত বা রুষ্ট হইয়া নিশাচর পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহার বাহুতে সবলে দংশন করিল। তিনি উপরোক্ত বোতলের ভগ্নাংশ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। এবার মনে হইল যেন একটী পশমের বস্তার গায়ে আঘাত করিতেছেন; যাহা হউক এবার এক আঘাতেই নিশাচর তাঁহাকে ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিল। তিনি হস্ত, পদ ও গণ্ড হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ নিজেকে উত্থানশক্তি রহিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সমস্তই যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এবং অল্পে অল্পে তিনি চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে তাঁহার নিকট ইহা বোধ হইয়াছিল যেন তিনি একটী অপ্রশস্ত এবং অপরিসীম গভীর গহ্বরে পতিত হইতেছেন।

হঠাৎ তাঁহার গলায় জ্বালা বোধ হওয়াতে তিনি বহুকষ্টে নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে দিবালোক প্রকাশিত হইয়াছে, ক্যাডি তাঁহার দিকে মুখ [illegible] করিয়া রহিয়াছেন। উডহাউসের মনে হইল যেন ক্যাডি দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমশঃ যতই [illegible] হইতে লাগিল ততই বুঝিলেন যে ক্যাডি তাঁহাকে [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহার মুখে [illegible] [illegible] দিতেছেন। তখন আস্তে আস্তে চতুর্দ্দিকের [illegible] [illegible] [illegible] লাগিলেন, এবং [illegible] পরে কিঞ্চিৎ [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিলে পর রজনীর সমস্ত ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল, এবং ইহাও বুঝিলেন যে রজনীর অবশিষ্টাংশ তিনি অজ্ঞানাবস্থাতেই যাপন করিয়াছেন।

দিবাভাগে দেখা গেল যে সমস্ত দূরবীক্ষণ রক্ত মাখা হইয়া রহিয়াছে; মানমন্দিরের এক প্রান্তে ভিত্তির উপর এত রক্ত জমিয়া রহিয়াছে যে একটী মেষের দেহেও এত রক্ত থাকা সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত রক্তপাত সত্ত্বেও নিশাচরের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না; তাহা রজনীযোগেই পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে আলোচ্য বিষয় এই যে—"নিশাচর কি জাতীয়, কি তাহার নাম, এবং কোথায় তাহার বাস?" এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে বোর্ণিওর জঙ্গলে "ক্লাঙ্গুটাঙ্গ" বা "কলুগো" নামে একটী অতিবৃহৎ জন্তু বাস করে, তাহারা রজনীতে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। কেহ কেহ বলেন যে বোর্ণিওতে পক্ষবিশিষ্ট শৃগাল কুকুরও আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এরূপ শুনা যায় নাই। উডহাউস এবং থাডি উভয়ে অনেক বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই মীমাংসিত হইল না। অবশেষে উডহাউস্ এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে—

"There are more things in heaven and earth, and more particularly in the forests of Borneo, than are dreamt of in our philosophies!"

অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণ।

(সমালোচনা)

গত বৎসরের ভারতীতে দেখিলাম শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষাল মহাশয় প্রাচীন কয়েক জন জ্যোতিষীর অভ্যুদয় কাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্য-ভটের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাদ প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে। সমালোচনা ব্যতীত সত্য নির্দ্ধারিত হয় না—এই কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের মত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

আর্য্য-ভট কবে জন্মিয়াছিলেন? দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন (মৃণ্ময়ী সমালোচনা, ভারতীর ১৫ পৃঃ) "আর্য্যাষ্টশতক গ্রন্থের হস্তলিপিতে দৃষ্ট হইয়াছে যে আর্য্য-ভট [illegible]

[illegible]র আবির্ভাব কাল যুধিষ্ঠিরের শকের ষোড়শ শতাব্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] দিন পঞ্জিকা সমূহে অদ্যাপিও কলিগত বর্ষাদিকে যুধিষ্ঠির শক নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।" এতদ্ভিন্ন তিনি লিখিয়াছেন যে, কোলব্রুকের মতে আর্য্য-ভট কোন মতে খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সম্প্রতি কলির পঞ্চাশৎ শতাব্দী চলিতেছে। যদি আর্য্য-ভট কলির ষোড়শ শতাব্দীতে ছিলেন এরূপ হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে তিনি এখন হইতে প্রায় ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শকারম্ভের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব বাবু আর্য্য-ভটকে এত প্রাচীন বলিতে চাহেন।

আর্য্য-ভটের আবির্ভাব কাল বিষয়ে মৃণ্ময়ী নামক পুস্তকে নাকি আর্য্য-সিদ্ধান্ত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি মৃণ্ময়ী কিম্বা আর্য্য-সিদ্ধান্ত দেখি নাই। তবে আর্য্য-সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত আর্য্য-ভটের নহে, তাহা অনেকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেণ্টলী বলেন যে, আর্য্য-সিদ্ধান্ত খৃঃ ১০২২ অব্দের পূর্ব্বের নহে। সেই মতে ডাঃ ভাউদাজীও সায় দিয়াছেন।* যাহা হউক ইহাতে বড় একটা আসে যায় না। আর্য্য-ভটীয় গ্রন্থের কালক্রিয়াপাদে ঐরূপ একটা শ্লোক দেখা যায়— হয়ত তাহাই বিকৃতাকারে আর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

শ্লোকটি এই—

> ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
> ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥১০॥

আর্য্য-ভটীয়ের টীকাকার পরমাদীশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান যুগচতুর্থ পাদস্য ষট্‌ত্রিংশদধিক সহস্র ত্রয় সম্মিতেষু সূর্য্যাব্দেষু গতেষু সৎসু ত্রয়োবিংশতি বর্ষেণ ময়া শাস্ত্রমিদং প্রণীতম্।" আর্য্য-ভটীয়ের আর একজন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা তাঁহার ভট-প্রকাশিকায় বলিয়াছেন, "অত্র বরাহ কল্পস্থাস্ত সপ্তমে মন্বন্তরে বর্ত্তমানাষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ কল্যাব্দেঃ [illegible] বর্ষমিতে সৌরাব্দে গতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে আচার্য্যার্য্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়া-[illegible]-প্রতিপাদকানি-শাস্ত্রাণি ইত্যাদি।" ইহা হইতে আমরা জানিতেছি যে, আর্য্য-ভট (আর্য্য-ভট্ট নহে) কলির ৩৬০০ অব্দে অর্থাৎ শকের ৪২১ অব্দে গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল। অতএব তিনি ৩৯৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মাচার্য্য রচিত শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্রন্থেও আর্য্য-ভটের উক্ত আবির্ভাব কাল সমর্থিত হইয়াছে। আর্য্য-ভটকে অবলম্বন করিয়া লল্ল [illegible] বা তন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তিনি [illegible] করণাব্দ ধরিয়াছেন। তাঁহার গুরু আর্য্য-ভটের গ্রন্থ রচনা [illegible] সম্ভবতঃ [illegible] করণাব্দ ধরিয়াছিলেন।

* See Weber's History of Indian Literature Page 257—Note 284.

বরাহমিহির কবে জন্মিয়াছিলেন? যে প্রণালীতে ঘোষাল মহাশয় বরাহ-মিহির, পরাশর, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লেখকের কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইল না। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমতঃ ঘোষাল মহাশয়ের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। (১)—বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন যে ধনিষ্ঠার আদিতে রবির উত্তরায়ণ এবং অশ্লেষার অর্দ্ধে দক্ষিণায়ন কখন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। কেন না পূর্ব্ব শাস্ত্র সকলে তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সময়ে রবির দক্ষিণায়ন কর্কটের আদিতে এবং উত্তরায়ণ মকরের আদিতে হইতেছে। বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল, পূর্ব্ব শাস্ত্র অর্থে পরাশরী সংহিতা বলিয়াছেন। পরাশরী সংহিতা এবং বৃহৎসংহিতাদ্বয়ের রচনা কালের অন্তর (ইংরাজী মতে বার্ষিক অয়ন-চলন ৫০·১ বিকলা ধরিলে) ১৬৭৬ বর্ষ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বরাহমিহিরের অত বর্ষ পূর্ব্বে পরাশর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(২)—পরে ঘোষালমহাশয় বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, "বরাহের সময় সকল ঋতুই রাশির আদিতে আরম্ভ হইত। * * * এখন দেখিতে হইবে বরাহের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অয়ন কত অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে ১৮১৫ শকাব্দার আরম্ভে অয়ন ২০।৫৪। ৩৬ বিকলা পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে।" বৎসরে অয়ন-চলন ৫৪ বিকলা ধরিলে তিনি বলেন, বরাহমিহির ৪২১ শকাব্দে,[১] প্রাদুর্ভূত হয়েন। বাপুদেব শাস্ত্রীর পঞ্জিকামতে গত বৎসর অয়নাংশাদি ২২।৯।২৬ ছিল। বার্ষিক অয়ন-বেগ ৫০·১ বিকলা ধরিলে এতদ্বারা ১৫৯২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২২৩ শকাব্দে[২] বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল পাওয়া যায়।

(৩)—পুনশ্চ, চিত্রানক্ষত্র হিপার্কসের সময় ১৭৪ অংশে ছিল, সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখকের ও বরাহের সময় ১৮০ অংশে। বার্ষিক অয়নচলন ৫০·১ বিকলা ধরিলে হিপার্কসের ৪৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৪ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহির প্রাদুর্ভূত হয়েন। অর্থাৎ ঘোষাল মহাশয় এই প্রণালীতে বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল ২০৬ শকাব্দা[৩] দেখাইতেছেন।

উপরে দেখা গেল যে, ঘোষালমহাশয় বরাহমিহিরের তিন প্রকার কাল পাইয়াছেন। যথা, শকাব্দা ৪২১, ২২৩, এবং ২০৬। শেষোক্ত দুইটী প্রায় একই। কিন্তু ৪২১ ও ২২১ এ দুইশত বৎসরের প্রভেদ! ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাঁহার গণনা ঠিক নহে। পরে দেখিলাম যে তিনি শেষোক্ত শকাব্দাকেই ঠিক বলিয়াছেন।

বরাহমিহিরের সময় কর্কট রাশিতে যে রবির দক্ষিণায়ন হইত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকান্তর্গত পৌলিশ সিদ্ধান্তেও অয়ন সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে; তাহা এই,—

আশ্লেষার্দ্ধাদাসীদ্যদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণ কিরণস্য
যুক্তমযনং তদাসীৎ সাম্প্রতময়নং পুনর্বসুতঃ ॥

এখানে বলা হইয়াছে যে "আশ্লেষার্দ্ধাৎ দক্ষিণমুত্তরময়নং রবের্ধনিষ্ঠাদ্যং। নূনং কদাচিদাসীদ্যেনোক্তং পূর্ব্বশাস্ত্রেষু। সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ।" [illegible] পুনর্ব্বসুতঃ।" ইহার দ্বারা বৃহৎসংহিতার শ্লোক মিলাইলে কর্কটের আদি স্থির হইল বটে, কিন্তু কর্কটের যে ঠিক আদি কিরূপ বুঝিতে হইবে তাহা বুঝা যায় না। মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও তাহাই বলেন। তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকের উপপত্তি বুঝাইবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে, "বস্তুগত্যা পুনর্ব্বসুস্থিতি-স্থানেন তজ্জ্ঞানং ন ভবতি তথাপি আচার্য্য প্রতিপাদিত সংহিতা বচনেন পুনর্ব্বসুপদেন পুনর্ব্বসোঃ পাদত্রয়মেব গ্রাহ্যম্।" তাহাই যদি ঠিক হয়, দেখা যাউক ইহা হইতে ঘোষাল মহাশয়ের প্রণালী অনুসারে বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল কখন পাওয়া যায়। সম্প্রতি (শক ১৮১৬) রবির দক্ষিণায়ন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রায় ৬৯ কলায় ঘটিয়াছিল। ঐ স্থান হইতে পুনর্ব্বসুর ত্রিপাদের অন্ত পর্য্যন্ত ১৩৩১ কলা। বৎসরে অয়ন-চলন ৫৪ বিকলা ধরিলে এতদ্বারা ১৪৭৯ বৎসর, এবং ৫০.২ বিকলা ধরিলে ১৫৯০ বৎসর পাওয়া যায়। অর্থাৎ এতদ্বারা জানা যায় যে শকের ৩৩৭ কিম্বা ২২৬ অব্দে বরাহমিহির ছিলেন। ঘোষাল মহাশয় যাহা স্থূলভাবে লইয়াছেন, তাহাই এখানে সূক্ষ্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার গণিত কালদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আর একটা কাল (শক ৩৩৭) পাওয়া গেল। যাহা হউক, এখন কথা এই যে এই তিনটি কালের মধ্যে কোনটিকে ঠিক বলিয়া ধরা যাইবে? এইরূপে কেবল স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে শকের তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে বরাহমিহির প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন উপায়ান্তর দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহমিহির আর্য্যভটের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর্য্যভটের তাদৃশ সমাদর করেন নাই। লাটাচার্য্য, সিংহাচার্য্য, যবনাচার্য্য, এবং আর্য্যভটকে সমান আসন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ পরে বলা যাইবে। যাহা হউক বরাহমিহির যে আর্য্যভটের পরবর্ত্তী, এ কথা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে আর্য্যভট ৩৯৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪২১ শকাব্দে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বরাহমিহির ৪২১ শকাব্দের পর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন।

আবার দেখা যায় যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ ধরা হইয়াছে। সুতরাং বরাহমিহির ৪২৭ শকাব্দায় কিম্বা ইহার কয়েক বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবতঃ ঐ [illegible] পরে। এই অনুমানের দুইটি কারণ আছে। (১)—আর্য্যভট শক ৪২১ অব্দে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার ছয় বৎসর অতীত হইতে না হইতে যে দূরদেশবাসী বরাহমিহির তাহার [illegible] সমালোচনা করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা অতি বিরল। আর্য্যভটের বাসস্থান কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র এবং বরাহমিহিরের অবন্তীনগর বা উজ্জয়িনী। (২)—জ্যোতিষীদিগের [illegible] এই যে তাঁহারা গ্রন্থ রচনা কালের অন্ততঃ ২।৪।৫ বৎসর পূর্ব্বের [illegible] করিয়া থাকেন। গণনার [illegible] না [illegible] অবশ্যই [illegible] করিতে হইলেই [illegible]

জানা যায় যে, বরাহমিহির শকের ৪২৭ অব্দের অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। সম্ভবতঃ ৪২৭ শকাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টার উজ্জয়িনীর জ্যোতিষীগণের নিকট জানিয়াছিলেন যে, বরাহমিহির (২য়) ৪২৭ শকে ছিলেন। বিখ্যাত আলবেরুণী পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ঐ কাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ কার্ণের মতে শক ৪২৭ অব্দে বরাহমিহিরের জন্ম, এবং শক ৫০৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেবল ডাঃ ভাউদাজী বলেন যে ৪২৭ শকাব্দে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। তাহাই বরাহমিহির গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ থিব অনুমান করেন যে ৪২৭ শকাব্দে লাটদেব রোমকসিদ্ধান্ত সংস্করণ করেন, এবং সেই শকাব্দকেই বরাহমিহির নিজের করণাব্দ করিয়াছেন। যাহা হউক বরাহমিহির যে শকের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত।

ঘোষালমহাশয় লিখিয়াছেন যে, "চিত্রানক্ষত্র হিপার্কসের সময়ে রাশিচক্রের ১৭৪ অংশে অবস্থিত ছিল, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লেখক এবং বরাহের সময়ে উহা ৬ অংশ পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে, অর্থাৎ ক্রান্তিপাত ও চিত্রানক্ষত্র রাশিচক্রের এক স্থানে অথবা ১৮০ অংশে অবস্থিত ছিল।"

যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত আমরা আজকাল দেখিতেছি তাহাতে চিত্রা যোগতারার ধ্রুবক ১৮০ অংশ দেওয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত আধুনিক হউক বা প্রাচীন হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্তের তারা-ধ্রুবক হইতে বরাহমিহিরের কাল অবধারিত হইবে কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ, আমরা একণে যে আকারে সূর্য্যসিদ্ধান্ত দেখিতেছি পূর্ব্বে তাহার সে আকার ছিল না। বরাহমিহির যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকার স্থান বিশেষ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান কালের সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা প্রণালীর ঐক্য দৃষ্ট হইলেও গ্রহভগণ-ধ্রুবাদির প্রভেদ দেখা যায়। বাস্তবিক, সমুদায় বিচার করিলে জানা যায় যে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের নূতন সংস্করণ। যাহা হউক, বরাহমিহিরোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তে চিত্রার ধ্রুবক ১৮০ অংশ ৫০ কলা দেখা যায়, আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তে তাহা ১৮০ অংশ।

নক্ষত্রধ্রুবক সাহায্যে ঘোষাল মহাশয় ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লেখকের অভ্যুদয় কাল নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ স্থলে তিনি একটা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক আমার নিকট নাই। ঘোষাল মহাশয় ব্রহ্মগুপ্ত হইতে যোগতারার-ধ্রুবক দিয়াছেন। যোগতারার-ধ্রুবক নির্ণয় [illegible] চারিশত [illegible] লেখা যাউক। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকোক্ত সৌরসিদ্ধান্তে [illegible] যোগতারার ধ্রুবক পাওয়া যায়। যে যে শ্লোকে তারাগুলির ধ্রুবক ছিল, তৎসমুদায় [illegible] হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, [illegible] ধ্রুবক লইলেই [illegible] প্রভেদের মীমাংসা হইতে পারিবে।

তারা-ধ্রুবকাংশাদি।

যোগতারার নাম	বরাহমিহিরের সৌরসিদ্ধান্ত	আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত	ব্রহ্মগুপ্ত	[illegible]	[illegible]
কৃত্তিকা	৩২।৪০	৩৭।৩০	৩৭।২৮	৩৭।২৮	৩৮।০
রোহিণী	৪৮।০	৪৯।৩০	৪৯।২৮	৪৯।২৮	৪৯।০
পুনর্ব্বসু	৮৮।০	৯৩।০	৯৩।০	৯৩।০	৯৪।০
পুষ্যা	৯৭।২০	১০৬।০	১০৬।০	১০৬।০	১০৬।০
অশ্লেষা	১০৭।৪০	১০৯।০	১০৮।০	১০৮।০	১০৭।০
মঘা	১২৬।০	১২৯।০	১২৯।০	১২৯।০	১২৯।০
চিত্রা	১৮০।৫০	১৮[illegible]।০	১৮৩।০	১৮৩।০	১৮৩।০
রেবতী	[illegible]	[illegible]	৩৬০।০	৩৬০।০	৩৬০।০

উপরে যে সকল সিদ্ধান্তের নামোল্লেখ করা গেল, তৎসমুদায় কখন এক সময়ে রচিত হয় নাই। অথচ চিত্রা বা মঘার ধ্রুবক সম্বন্ধে ঐক্য হইল কেন? ফলতঃ সময়ের প্রভেদে যে ধ্রুবকের প্রভেদ কিরূপে ঘটিবে তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। ধ্রুবকের প্রভেদ ঘটিলে যে তারাগণের অচলত্ব ঘুচিয়া যায়! পাশ্চাত্য মতের ক্রান্তিপাত হইতে ধ্রুবাদি পরিমিত হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত মতে রেবতী তারা হইতে ধ্রুব স্ফুট প্রভৃতি সমুদায় পরিমিত হয়।

যখন ব্রহ্মগুপ্তের সময় নির্দ্ধারণের প্রধান উপজীব্যে গোলযোগ দৃষ্ট হইল, তখন ঘোষাল মহাশয়ের গণিত ব্রহ্মগুপ্তের অভ্যুদয় কালের আলোচনা করা অনাবশ্যক।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লেখক কে? শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত লেখকের নাম আদিত্য দাস এবং এই আদিত্য দাস বরাহমিহিরের পিতা ছিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এই। (১)—বৃহজ্জাতকের উপসংহারে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, তিনি আদিত্যদাসের পুত্র; (২)—তিনি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন; (৩)—সূর্য্যমুনি তাঁহার রচিত শাস্ত্রের মুখ্য কারণ; (৪)—সূর্য্যসিদ্ধান্তে অশ্বিন্যাদি যোগতারার যে স্থিতি দেওয়া আছে, বরাহমিহিরের সময় তাহাদের ঐরূপ স্থিতি ছিল; (৫)—পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় সৌরসিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখা যায়।

এই সকল কথা হইতে সৌরসিদ্ধান্তের লেখক যে বরাহমিহিরের পিতা আদিত্যদাস, তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। সূর্য্যসিদ্ধান্তে অশ্বিনী প্রভৃতির যে অবস্থান দেওয়া আছে, বরাহমিহিরের সময়ে তাহাদের ঐরূপ অবস্থান ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। [illegible] একই স্থিতি থাকিলেও যে তদ্দ্বারা সময় [illegible] করা যায় না, তাহা উপরে [illegible] হইয়াছে। স্বীকার করা গেল যেন সূর্য্যাদি [illegible]

করিয়াছেন। তাই বলিয়া সূর্য্যমুনি ও আদিত্যদাস যে একই ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইল কিরূপে?

আর্য্যভটের গ্রন্থে কোন প্রাচীন সিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থের উপসংহারে আর্য্যভট লিখিয়াছেন যে—

আর্যাভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদা সদ্বৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য॥

এতদ্দ্বারা এই জানা যায় যে স্বায়ম্ভুব বা পৈতামহ সিদ্ধান্তকে তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহিরোক্ত সৌরসিদ্ধান্তের গ্রহগণনাদি অনেক বিষয়ে আর্য্যভটের সমান। বোধ হয় এই জন্যই বরাহমিহির আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত হইতে কোন নিয়মাদি গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবতঃ প্রাচীন সৌরসিদ্ধান্ত-লেখক আর্য্যভটের সমসাময়িক ছিলেন। আলবেরুণী লিখিয়াছেন, লাট সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। বস্তুতঃ প্রাচীন বা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তের লেখক বা রচনার কাল সম্বন্ধে এখনও কিছুই স্থির বলা যায় না।

পরাশর-সংহিতা কখন রচিত হয়? ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে বরাহমিহিরের "পূর্ব্ব শাস্ত্রেষু" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন যে বরাহমিহির পরাশরী সংহিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভট্টোৎপল পরাশর সংহিতা হইতে রবির উত্তর দক্ষিণায়ন বিষয়ক কথাগুলিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহা হউক "পূর্ব্বশাস্ত্রেষু" অর্থে পরাশর-সংহিতা হউক বা নাই হউক এক সময়ে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিতে যে রবির উত্তরায়ণ ঘটিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন, জ্যোতিষ বেদাঙ্গে উহা লিখিত হইয়াছে। বরাহমিহিরোক্ত পৈতামহ সিদ্ধান্তেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। পরাশরী সংহিতা-লেখক তাহা স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়াছেন অথবা তিনিও পূর্ব্বশাস্ত্রেষু করিয়াছেন, তাহা স্থির করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই। বোধ হয়, বরাহমিহিরও যে শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরাশরী সংহিতাকারও তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বার্ষিক অয়ন-চলন কত? যদিও উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত অয়নাংশের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, তথাপি একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ঘোষাল-মহাশয় সূর্য্য-সিদ্ধান্তোক্ত "ত্রিংশৎকৃত্যো যুগে ভানাং" ইত্যাদি শ্লোকের এক নূতন অর্থ করিয়াছেন। রঙ্গনাথের টীকা ও বাপুদেব শাস্ত্রীর অর্থ ঘোষাল মহাশয় কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে [illegible] গেল না। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, কোন সময়ের অয়নাংশ নিরূপণ করিতে হইলে অহর্গণকে ৬০০ দ্বারা গুণিত করিয়া মহাযুগের কুদিন সংখ্যা দ্বারা হরণ [illegible] [illegible] পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্টের অংশাদির ভুজ বাহির করিবে। সেই ভুজকে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] তাৎকালিক অয়নাংশাদি পাইবে। এই অর্থ [illegible]

ইহাকেই [illegible] বলিয়াছেন); এবং [illegible] সংহিতা নামক প্রচলিত [illegible] রায় বটিক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫৪ বিকলা। পাশ্চাত্য মতে উহা ৫০.২ বিকলা। ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে সূর্য্য-সিদ্ধান্তে ক্রান্তিপাত গতি অধিক ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সূর্য্যসিদ্ধান্তে অল্প গতি ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত মহাশয় মৃণ্ময়ী নামক পুস্তকের সমালোচনায় (১৩০০ সালের ভারতীর ১০৬ পৃঃ) লিখিয়া ছিলেন যে, "ইউরোপীয় মতে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫০.২ বিকলা, ইহা বিষুবদ্বৃত্তে পরিমাপ হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ঐ গতি পরিমাণ ৫৪ বিকলা, কিন্তু তাহা ক্রান্তিবৃত্তে পরিমাপ হয়। একণে দৃষ্ট হইবে যে ক্রান্তিবৃত্ত হইতে ইহাকে বিষুবদ্বৃত্তে সম্পাতিত করিলে তাহার পরিমাণ ৫০.১ বিকলা হইয়া থাকে; অতএব ইহার সহিত ইউরোপীয় মতের অনৈক্য অতি সামান্য। গ্রন্থকার (মৃণ্ময়ী লেখক) ঐ গতি প্রমাণ ৫৫ বিকলা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত নহি।"

মৃণ্ময়ী পুস্তক লইয়া বাদ প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষাল মহাশয় ক্রান্তিপাত গতি বিষয়ক দত্ত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে কোন কিছুই বলেন নাই, তাহা বলিতে পারি না। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন যে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি (৫০.২ বিকলা) বিষুবদ্বৃত্তে পরিমাপ হইয়া থাকে। পরিমাপ কার্য্যটা বিষুবদ্বৃত্তেই হউক আর ক্রান্তিবৃত্তেই হউক, আমরা ত বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে তারাগণের স্ফুটে (longitude) বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। সকল তারারই স্ফুটে যখন প্রায় একই রূপ বৃদ্ধি দেখা যায়, তখন মনে করিতে হয় যে ক্রান্তিপাত বিন্দুরই ক্রান্তিবৃত্তে একটা বিলোম গতি আছে। এক বর্ষে ইহার গতি প্রায় ৫০ বিকলা। ইহাইত আমরা বুঝি। আমাদের সিদ্ধান্ত মতে ক্রান্তিবৃত্ত দিয়াই ক্রান্তিপাতের বিলোম গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। তদনুসারে সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে তাহা ৫৪ বিকলা। সুতরাং দেখিতে গেলে ইউরোপীয় মত অপেক্ষা সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গতি প্রায় ৪ বিকলা অধিক। আর দত্ত মহাশয়ের মতই যদি ঠিক হয়, তবে মৃণ্ময়ী লেখক বলিতেছেন সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক ক্রান্তিপাত-গতি ৫৪ বিকলা এবং ইহা ক্রান্তিবৃত্তের ৫৪ বিকলা পরিমিত অংশ। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন ইউরোপীয় মতে ইহা ৫০.২ বিকলা এবং ইহা বিষুবদ্বৃত্তের ৫০.২ বিকলা পরিমিত অংশ। বিষুবদ্বৃত্ত হইতে ক্রান্তিবৃত্তে আনয়ন করিলে উহা প্রায় ৫৫ বিকলা হয়। মৃণ্ময়ী লেখকও তাহাই লিখিয়াছেন।*

উপরে উক্ত হইয়াছে যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে বার্ষিক ক্রান্তিপাত গতি ৫৪ বিকলা, পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতের গতি অপেক্ষা বস্তুতঃ কিছু কম। কেন কম বলিলাম, তাহা বুঝা [illegible]

---

* দত্ত মহাশয়ের ক্রান্তিপাতগতি বিষয়ক মতটি প্রথমে লিপিদোষজ মনে হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] ৫৫ বিকলাকে বিষুবদ্বৃত্তে আনয়ন করিতে দেখিয়া সে ধারণা দূর হয়। আর সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে রবির [illegible] ২৪ অংশ। অতএব ক্রান্তিবৃত্তের ৫৫ বিকলা বিষুবদ্বৃত্তের ৫০.৩ বিকলা না হইয়া ৫০.১ বিকলা [illegible] ক্রান্তিপাতের গতি [illegible] আমাদেরও ভ্রম থাকা [illegible]।

সূর্যসিদ্ধান্ত মতে রবি বর্ষমান ৩৬৫·২৫৮৭৫৬ সাবন দিবস। পাশ্চাত্য মতে তাহা ৩৬৫·২৫৬৩৭ মধ্যম সাবন দিবস। অর্থাৎ সূর্যসিদ্ধান্তে রবি বর্ষমান ·০০২৩৮ দিবস অধিক ধরা হইয়াছে। এই সময় রবির প্রায় ৮·৩ বিকলা পূর্বদিকে গতি হয়। আর সূর্যসিদ্ধান্তানুসারে ক্রান্তিপাতের ৫৪ বিকলা পরিমিত পশ্চিমদিকে গতি হয়। অতএব বাস্তবিক বলিতে গেলে সূর্যসিদ্ধান্ত মতে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৪৫·৪ বিকলা মাত্র। এই জন্যই সূর্যসিদ্ধান্তানুসারে বর্তমান অয়নাংশাদি গণনা করিলে তাহা প্রায় ২০।৫৪ হয়। অথবা বাস্তবিক উহা প্রায় ২২।১১। সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে লিখিত আছে যে মুঞ্জালাদির মতে বার্ষিক অয়নচলন ৫৯·৯ বিকলা। সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে রবি বর্ষমান ৩৬৫·২৫৮৪৩ মধ্যম সাবন দিবস অর্থাৎ পাশ্চাত্য পরিমাণ অপেক্ষা উহা ·০০২০৬ দিবস অধিক। এজন্য ভাস্করের রবিবর্ষমান রাখিতে হইলে বার্ষিক অয়নচলন ৫৭·৫ বিকলা বলা উচিত। গ্রহলাঘব মতে বার্ষিক অয়নচলন ৬০ বিকলা। গণেশ দৈবজ্ঞ নলিকাবন্ধাদি দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র বেধ করিয়াছিলেন। অথচ তিনি বার্ষিক অয়ন বেগ ৫০·২ বিকলা না ধরিয়া তদপেক্ষা প্রায় ৮ বিকলা বেশী ধরিলেন কেন? গ্রহলাঘব মতে রবিবর্ষমান ৩৬৫·২৫৮৬ মধ্যম সাবন দিবস। সুতরাং বার্ষিক ক্রান্তিপাত গতি ৫৮·৩ বিকলা হইলে অয়নাংশ ঠিক আসিবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয় একজন সর্বোত্তম ব্যবহারিক সিদ্ধান্তবেত্তা। তাঁহার মতে রবিবর্ষমান আর্যসিদ্ধান্তের তুল্য। কিন্তু ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫৭·৬২ বিকলা। আশ্চর্যের বিষয়, যিনিই সূর্যসিদ্ধান্তের রবিবর্ষমান গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বার্ষিক অয়নচলন ৫৪ বিকলা অপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন।

পরিশেষে ক্রান্তিপাতের এই স্ফুট গতি লইয়া একবার বরাহমিহিরের অভ্যুদয় কাল গণনা করা উচিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার সময়াবধি আজ পর্যন্ত ক্রান্তিপাত ১৩৩১ কলা সরিয়া গিয়াছে। বার্ষিক ক্রান্তিপাত গতি ৫৮·৬ বিকলা ধরিলে জানা যায় যে বরাহমিহিরের সময় অবধি আজ পর্যন্ত প্রায় ১৩৬৩ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আজ শকাব্দা ১৮১৬। সুতরাং ৪৫৩ শকে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই রূপে গণিত কাল ঘোষালমহাশয়ের কত দূর অনুমোদনীয় হইবে, বলিতে পারি না।

ভাস্বতী গ্রন্থে অয়নাংশ সাধনের এই নিয়মটি আছে। যথা,

শকেন্দ্রকালাৎ খশরাব্ধি ৪৫০ হীনাৎ
ষষ্ঠ্যাপ্ত সংখ্যা অয়নাংশকাঃ স্যুঃ।

অর্থাৎ শকাব্দ হইতে ৪৫০ হীন করিবে। অবশেষকে ৬০ দ্বারা বিভাগ করিলে অয়নাংশাদি পাওয়া যাইবে। এখানে দেখা যায় যে ৪৫০ শকে অয়নাংশ শূন্য ছিল। বরাহমিহিরের মতানুসারে তাঁহার সময়ে অয়নাংশ শূন্য ছিল। অন্যান্য পুস্তকের অয়নাংশ সাধন বিধির নিয়ম দেখিলেও জানা যায় যে ৪৫০ শকাব্দার কিছু অগ্র পশ্চাৎ সময়ে অয়নাংশ শূন্য ছিল। অতএব বরাহমিহির ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণাদি কবে রচিত হইয়াছিল? বিষ্ণুপুরাণাদির রচনা কাল নির্ণয় এ প্রবন্ধের অন্তর্গত বিষয় নহে। তবে ঘোষাল মহাশয় প্রাচীন জ্যোতিষীগণের কাল নির্ণয় করিতে করিতে পুরাণে আসিয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "এই পুরাণ ত্রয় (ভাগবত, বিষ্ণু, ও বায়ু) প্রদত্ত রাজগণের রাজ্যকাল একত্রিত করিলে ৪১৪৪ বৎসর হয়। পুরাণগুলি কলির আরম্ভে ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত আছে, সুতরাং উক্ত বৎসর সংখ্যা দৃষ্টে অবগত হইতেছি যে উক্ত অব্দই পুরাণগুলির রচনার নিকটবর্ত্তী সময়।" "সুতরাং" শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা বুঝিতে পারা গেল না, এবং ঐ হেতুর দ্বারা কলির ৪১৪৪ বর্ষে বিষ্ণুপুরাণাদির রচনাকাল কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহাও বুঝি আমাদের ধারণা হইল না। যাহা হউক ঘোষাল মহাশয় বলেন যে বিষ্ণুপুরাণ ৯৮০, বায়ুপুরাণ ১০১৫, এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১০৮০ শকাব্দে রচিত।

আলবেরুণীর গ্রন্থে (ইংরাজি অনুবাদে) দেখা যায় যে তিনি পণ্ডিতগণের নিকট নিম্ন লিখিত পুরাণগুলির নাম পাইয়াছিলেন। যথা—আদি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, বায়ু, নন্দ, স্কন্দ, আদিত্য, সোম, শাম্ব, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয়, তার্ক্ষ্য, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ও ভবিষ্য। তিনি লিখিয়াছেন যে এই সকলের মধ্যে তিনি কেবল মৎস্য, আদিত্য ও বায়ুপুরাণের কিয়দংশ মাত্র স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য কয়েকটি পুরাণ হইতে নানাবিধ মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কোন পণ্ডিত নিম্নলিখিত পুরাণগুলির নাম দিয়াছিলেন—যথা, ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। যাহা হউক এতদ্দ্বারা বেশ জানা যায় যে ৯৫৩ শকাব্দার পূর্ব্বে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছিল। তবে এখন আপত্তি হইতে পারে যে আজ কাল আমরা যে সকল পুরাণ দেখিতেছি বর্ত্তমান আকারে তৎসমুদায় ছিল না। এ আপত্তি খণ্ডনে আমি অপারগ।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

বউ কথা কও।

জীবন রহস্যটুকু বুঝেছে পাখীটি ওই,
রমণীর নীরবতা বাজে তার প্রাণে;
[illegible] করুণ স্বরে তাই গাহে দিবানিশি,
ঢালে উপদেশবাণী অবোধের কানে।
এখনো সময় আছে, শোন বউ কথা কও
নহিলে হবে না বলা আর এর পরে,
[illegible] আসে একটি মুহূর্ত শুভ
[illegible] দিয়ে চলে যায় চিরদিন তরে।
বউ ভবে কথা কও, থেকোনা মানের ভরে,
বউ ওগো কথা কও ত্যজিয়া সরমে;
[illegible] রুধিয়া রেখোনা আর
[illegible] কথাগুলি বিজন মরমে।
[illegible] রয়েছে, বলিতে যা সাধ মনে
[illegible] বউ এইবেলা ছাড়ি লাজ ভয়,
[illegible] ফিরে কি পাইবে শেষে
[illegible] নীরবেতে দুইটি হৃদয়।
[illegible] ছুটে আসে মেঘ পাশে
[illegible] চেয়ে থাকে তারকার পানে;
[illegible] হতে আসি দুইটি সে সমীরণ
[illegible] মিশিয়া যায় পরাণে পরাণে।
[illegible] আকুলি উঠিছে ওই
[illegible] কুসুমটি করিতে চুম্বন।
[illegible] কাণে কাণে ধীরে ধীরে
[illegible] ঢালিতেছে মধুকরগণ।

ফুল বলে সব লও আমার যা কিছু আছে
লও রূপ, লও মধু, লও বাস-ভার;
তটিনী বেড়ায় ছুটি সাগরের হৃদিমাঝে
মিশাইতে প্রেমাকুল হৃদয় তাহার।
সাঁঝের আঁধার প্রাণ ব্যাকুল চাঁদের তরে
প্রভাত কাতর অতি অরুণ লাগিয়া;
চঞ্চল প্রকৃতি মেয়ে ভুলাতে বিশ্বের মন
সারাক্ষণ সাজিয়া, নব ভূষণ পরিয়া।
জগতের মাঝে যত স্বভাবের বধূগণ
মানমুক্ত লাজমুক্ত স্বচ্ছ হৃদিময়;
তাই এত শোভা সেথা তাই এত সুখ সেথা
তাই এত আনন্দের ধারা সেথা বয়।
মানবের ঘরে শুধু কমনীয় কথা বধূ
মরমের কথা তার বাজেরে মরমে;
তারি তরে মানবের এই মহাআকুলতা
এই চিরব্যথা তার বাজেরে মরমে।
শুধু মান অভিমান শুধু লুকোচুরি খেলা
যতক্ষণ দুজনাতে রহে কাছে কাছে;
তারপর অশ্রুধার তারপর হাহাকার
অনন্ত পিপাসা জ্বালা দু মুহূর্ত পাছে।
পাখী সে বুঝিতে নারে সরল এ বিশ্ব মাঝে
মানুষ আপনি কেন রচে হেন ফাঁদ,
তাই সে কাতরকণ্ঠে আকুলি ব্যাকুলি বলে
"কথা কও বউ ওগো, পুরাইয়ে সাধ।"

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

দুটি তারা।

অতি ক্ষীণ ক্ষীণতর পাপিয়ার স্বর,
কোথা কোন দূর হতে আসিছে ভাসিয়া;
তরল বারিদ-পুঞ্জ ধূমের বরণ,
নীলিম শৈলের শিরে জমিছে আসিয়া।

রবির বিদায় দৃষ্টি স্বর্ণ-জ্যোতির্ময়,
চমকিছে শুভ্র নভ দিবসের শেষে;
দুইটি হারান তারা সহসা মিলিয়া,
চাহিছে দোঁহার পানে বিবশ আবেশে।

সন্ধ্যায় ঊষার খেলা সব যেন মোহ,
স্বপনেতে জাগরণ গিয়াছে মিশিয়া;
স্মৃতি উথলিছে চির বিস্মরণ মাঝে,
প্রীতির কাহিনী জাগে অপ্রীতি নাশিয়া।

মরমে মরম কথা প্রথম প্রকাশ,
সবে ফোটা হৃদয়ের প্রথম আকুলি;
তরঙ্গ তুলিছে বেগে নিরাশার প্রাণে,
আদরের স্মৃতিমাঝে অনাদর ভুলি।

সুখ বা যন্ত্রণা ইহা—শূন্য, মায়া, মোহ?
হৃদণ্ডের মরীচিকা অবসান ভ্রান্তি?
এখনি সরিয়া যাবে যে যাহার দূরে?
কে কাহার আঁখিতারা, কে কাহার সাথী!

তা নহে তা নহে, ইহা নহে অভিশাপ,
দেবতার আশীর্ব্বাদ মঙ্গল সূচন!
জীবন আরম্ভ পুন নূতন করিয়া,
পরিপূর্ণ প্রেমে তাই বিশ্বাস মিলন!

এই ঊষাময়ী সন্ধ্যা হইবে বিলীন,
নূতন মধুর দৃশ্য শুধু আনিবারে;
নূতন-পুলক-ভরা জোছনা রজনী,
অবসান হবে নব প্রভাত মাঝারে।

আসে যদি সুগভীর রজনী আঁধার,
ঝটিকার ভয়াবহ তরঙ্গ লইয়া;
এ দুটি তারকা হৃদি আলোকি উভয়ে,
উজ্জ্বল হইবে আরো অধিক করিয়া।

দুজনের অপূর্ণতা পূর্ণ করি দোঁহে
চিরপ্রেম চিরকান্তি চিরশান্তি ধরি;
প্রণয়ি অনন্তপথে, বেড়াবে ভাসিয়া,
জীবনের কক্ষপথ আলোকিত করি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

একা [illegible] করা [illegible] নহে। আমি যদি তোমার [illegible] একটী লোক তোমার সঙ্গে দিতে পারি ত হইবে ?"

শ্রীপতি কহিল, "তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়।"

রুদ্রসনাতন স্বামী কহিলেন, "তবে এখন রাজধানীতে ফিরিয়া যাও। সে ব্যক্তির সহিত তোমার সেই স্থানেই সাক্ষাৎ হইবে। সে আমার নিয়োগ মত তোমায় যাহা বলিবে শুনিও।"

শ্রীপতি স্বীকৃত হইয়া দুই এক দিবস পরে রাজধানীতে ফিরিয়া গেল, শুনিল কাশীনাথ গৃহে ফিরিয়া আইসে নাই।

নির্জনে বসিয়া রাত্রিকালে অথবা বৈকালে নদীতীরে রুদ্রসনাতন স্বামী অদ্বৈতপ্রসাদের সহিত ধর্মবিষয়ক নানা কথা কহিতেন। আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রসঙ্গও উঠিত। এইরূপ প্রসঙ্গক্রমে রুদ্রসনাতন স্বামী এক সময় কহিলেন, "তোমাকে কর্মে বিরত দেখিতেছি। সংসার চিন্তা হইতে বিরত হইলে কি কর্মেরও নিবৃত্তি হয় ?"

অদ্বৈতপ্রসাদ কহিলেন, "আমাকে দিয়া এখন আর কোন কর্ম হইবে ? জীবনের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। এখন আপনার কৃপায় এই স্থানে শান্তি অন্বেষণ করিতেছি। আর কি করিব ?"

রুদ্রসনাতন স্বামী কহিলেন, "কর্মের কি বিরতি আছে ? তন্মে আসক্তিবশতঃ কর্ম আর নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম, এই প্রভেদ। তুমি কি এখন কর্ম হইতে বিরত হইয়াছ ? যোগাসনে যোগীকে দেখিলে অল্পমতি ব্যক্তিগণ তাহাকে নিষ্কর্মা, বায়ুগ্রস্ত অথবা উন্মাদ বলে। কর্মের এবং কর্মফলের গতি অতি সূক্ষ্ম। কোলাহল, আস্ফালন কর্মের স্থূল আকার। কর্মের সূক্ষ্ম তরঙ্গ কে দেখিতে পায় ? সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে সহজে দেখিতে পাওয়া যায়, বায়ু-তরঙ্গ দৃষ্টির অগোচর। কিন্তু প্রভঞ্জনের বল কি সমুদ্র তরঙ্গের তুল্য নহে ? সূক্ষ্ম হইলে দুর্বল বুঝায় না। বায়ু সূক্ষ্ম কিন্তু বায়ুর বলে মহীরুহ উৎপাটিত হয়। বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম কিন্তু বিদ্যুতে প্রাণ বিনাশ করে। তুমি স্বয়ং পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত সাধনা করিতেছ, তোমার আত্মা হইতে শান্তিতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া চতুর্দিকে আহত হইতেছে, সেই কারণ এই উপবন শান্তিরসাস্পদ। এই স্থান দস্যুর অথবা দুষ্টের বাস স্থান হইলে ইহাই আবার ভয়ানক কিম্বা বীভৎস হইয়া উঠিবে। নিশ্চেষ্ট যোগীর দেহ হইতে সেইরূপ যোগতাড়িত প্রবাহিত হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, আশু হউক গৌণ হউক, তাহার ফল ফলিবেই। কর্ম যেরূপ অনিবার্য্য কর্মফলও সেইরূপ অনতিক্রমণীয়। [illegible] যেরূপ [illegible] অপর দিকে সেইরূপ সক্রিয় হইয়ে থাকে কেন ? তুমি যে কর্মে [illegible] [illegible] আমি তোমাকে [illegible] কর্মে লিপ্ত হইতে বলি। সর্বত্রই দেখিতে পাইবে [illegible] শ্রেষ্ঠকর্মী। শাস্ত্রের এই শিক্ষা, প্রত্যক্ষ এই [illegible] [illegible] কুশল চেষ্টা করে, যিনি রাজসিংহাসন [illegible]

[illegible] যে [illegible] তাহা এই দেশে, [illegible] এই পাপতাপসংহারিণী, শান্তিপ্রদায়িনী, মৃতসঞ্জীবনী সুধা এবং সেই সুধাভাণ্ড [illegible] করি। এই কর্ম্মে তুমি আমার সহায় হও।"

[illegible]প্রসাদ কহিলেন, "আমি আপনার আজ্ঞাধীন, যেরূপ আজ্ঞা করিবেন সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার ন্যায় জরাজীর্ণ, অক্ষম ব্যক্তি এই মহৎ কর্ম্মে কি করিতে পারে?"

[illegible]নাতনবাসী কহিলেন, "তোমার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কয়জন পাইব? নিষ্ঠা কখন নিষ্ফল হয় না। তোমার অশক্য কোন কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে না। এই স্থানে আমাদিগের যাতায়াত থাকিবে। তুমি নানাবিষয়ে সৎপরামর্শ দিতে পারিবে। আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য—আত্মরক্ষা। আত্মগৌরব, আত্মধর্ম্ম রক্ষা করিব, যাহা হারাইয়াছি তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিব। ইহাতে লোভের লেশমাত্র নাই। যে মালিন্য স্পর্শে [illegible] মলিন হইতেছে তাহা দূর করিতে প্রয়াস পাইব। যে খর স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে সেই স্রোতের বেগ ধারণ করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

কোন কবি কহিয়াছেন, উচ্চ [illegible] অথবা তুঙ্গ পর্ব্বতের উপরে রক্ষিত অণ্ড ভেদ করিয়া নির্গত হইলে উরগ যেরূপ সে স্থানে বাস করিতে পারে না, তির্য্যক গতিতে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিলেও নীচে নামিয়া আইসে ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি সেইরূপ মহৎ হইতে পারে না। [illegible] প্রকৃতি সে সেইরূপ স্থান প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখ, উন্নতি অথবা অধঃপতন তাহার স্বেচ্ছাকৃত সাক্ষাৎ কর্ম্মের সহিত এরূপ সম্বন্ধশূন্য যে আকস্মিক অথবা [illegible] বিশ্বাস ব্যতীত আর কোনরূপে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে জীবনের গতি কিয়ৎপরিমাণে পুরুষকারের আয়ত্ত। জীবনের পথে কোন না কোন স্থানে [illegible] উপস্থিত হয় যেখানে মনুষ্যকে গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে হয়, তাহার পর [illegible] কিম্বা অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে সেই পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাহার [illegible] হয় সে প্রথমে স্বয়ং নিম্নে পদক্ষেপ [illegible], কিন্তু পতন আরম্ভ হইলে আর গতি [illegible] পারে না। যে ঊর্দ্ধে আরোহণ করে তাহার [illegible] এবং [illegible] নির্ভরতা ও [illegible] সে ইচ্ছা [illegible]।

[illegible] পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তি [illegible]

[illegible]

হইবে। কাশীনাথ [illegible] অকারণে, বিনা [illegible] বিবেচনাশূন্য হইয়া, [illegible] পরিত্যাগ করিয়া গেল। [illegible] অতিক্রান্ত হইল। কোন পথে যাইতেছে বিবেচনা করিল না, ফিরিয়া চাহিল না। শ্রীপতির সদ [illegible] বোধ হইতে লাগিল, [illegible] দুঃখের মূল স্থির করিল।

কাশীনাথ একেবারে গৌরীশঙ্করের গৃহে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে কহিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম আপনার নিকট কখন কিছু যাচ্ঞা করিব না, কিন্তু সে কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন আমার দুইটী প্রার্থনা আছে।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সে জন্য এত কুণ্ঠিত কেন? তোমার কি আবশ্যক, বল।"

"আমাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দান করুন। আমার ইচ্ছা যে কর্ম্মে আমায় দীক্ষিত করিয়াছেন সেই কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকি। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে আমাকে একটী বিষয়কর্ম্ম করিয়া দিন যাহাতে আমি উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারি।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এ কথা ত আমি তোমাকে বলিয়া আসিতেছি, ইহা আর নূতন কি! আর কিছু বলিবার আছে?"

"আর কিছু না।"

গৌরীশঙ্করও আর কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু কাশীনাথের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কাশীনাথ গৌরীশঙ্করের গৃহে বাস করিতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর এক দিবস কথায় কথায় বলিলেন, "অস্ত্র কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে ব্যায়াম শিক্ষা কর।"

কাশীনাথ কহিল, "ব্যায়াম যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছি।"

"তবে আইস, তোমার শিক্ষা কৌশল দর্শন করি।"

গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া ব্যায়াম গৃহে লইয়া গেলেন। এ গৃহও কাশীনাথ পূর্ব্বে দেখে নাই।

গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে বলিলেন, "বিপ্রদাসের সহিত ব্যায়াম কর, দেখি।"

কাশীনাথ বলবান, মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। হাসিয়া বিপ্রদাসের সহিত ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপ্রদাস তাহাকে পরাভূত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। কাশীনাথ লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরীশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরবারি চালনা করিতে জান?"

কাশীনাথের আত্মগৌরব জন্মিতেছিল, কহিল, "কিছু কিছু জানি—ভাল জানি না [illegible]"

গৌরীশঙ্কর ইঙ্গিত করিলেন, "বিপ্রদাস!"

বিপ্রদাস তরবারি গ্রহণ করিল। কাশীনাথ কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া [illegible] অসিযুদ্ধে কাশীনাথ কিয়ৎক্ষণ অত্যন্ত কৌশল প্রদর্শন করিল, অবশেষে বিপ্রদাস [illegible] আঘাতে কাশীনাথের মুষ্টি হইতে অসি বিচ্যুত করিল। কাশীনাথের তরবারি [illegible]

এ দিকে আইস [illegible] কাশীনাথকে পথ দেখাইয়া রমণী এক বৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে অন্ধকার, আর কোন ব্যক্তি নিকটে না আসিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না।

অন্ধকার গাঢ় নহে। তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না। চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী, রূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। দেহ অতিক্রম করিয়া রূপের তরঙ্গ যেন বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই তরঙ্গমালা উপর্য্যুপরি কাশীনাথকে আঘাত করিতে লাগিল। বীচিবিক্ষেপে পতিত হইলে সন্তরণকারীর চক্ষে মুখে যেমন জল প্রবেশ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, কাশীনাথের সেই অবস্থা হইল। রূপতরঙ্গে আহত হইয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, বাক্য রহিত হইল। পলকশূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। গঠনের কি ললিত, সুগোল, পূর্ণ মাধুর্য্য, যৌবনের কেমন স্থিরচঞ্চল ছটা! কিবা চক্ষের তরল, লোল কটাক্ষ, চূর্ণকুন্তল-শোভিত দর্পণোপম ললাট! সে মুখ, সে চিবুক, সে গ্রীবাভঙ্গী, সে দাঁড়াইবার ঠাম—কাশীনাথ কি লক্ষ্য করিবে? সেই স্থিরতরঙ্গবিক্ষেপশালী রূপরাশিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

রমণী অল্প হাসিয়া, বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে, কুন্দকুট্মল দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া কহিল, "চিনিতে পার?"

কাশীনাথ নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ দেখিতে দেখিতে, ধীরে ধীরে কহিল, "বিদ্যুৎ যেমন চিনিতে পারা যায় সেইরূপ চিনিতেছি।"

রমণী আবার হাসিল। "তোমার সহিত এমন স্থানে, এমন সময়ে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছি তাহাতে তুমি কি মনে করিতেছ?"

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার সহিত কেন সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছ?"

"পূর্ব্বে তোমায় একবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, মনে আছে?"

"আছে। কিন্তু আশঙ্কা কি স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কেমন করিয়া বুঝিব?"

"যদি বলি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে কি আমার কথা শুনিবে? যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ তাহা যদি প্রতারণা হয় তাহা হইলে কি এ গৃহ পরিত্যাগ করিবে?"

"যদি স্পষ্ট করিয়া বল ত বুঝিতে পারি। অনর্থক ভয় দেখাইলে ভয় পাইব না।"

"তাহা জানি। কিন্তু ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া আমি বলিতে পারিব না। আর একবার তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি। কল্য যখন গৃহকর্ত্তা তোমাকে [illegible] করিবে, [illegible]"

"আমরা কোথায় যাইব, তুমি জান?"

"সে কথার উত্তর দিব না। কিন্তু ইহার পর তুমি আমার কথা স্মরণ করিবে, [illegible] রক্ষা করিতেছি।"

[illegible]

[illegible] বলিয়া কহিলেন, "তোমার বল এবং কৌশল [illegible] আছে। [illegible] শিক্ষা পাইলে [illegible] তোমার সঙ্গে পারিবে না। কিন্তু এখন উঁহার নিকট অভ্যাস কর। বিপ্রদাসের তুল্য বল হইলে আমি তোমায় শিখাইব।"

কাশীনাথ গৌরীশঙ্করকে প্রাচীন, বীতবল বিবেচনা করিত, তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। অস্ত্রচালনায়, ব্যায়ামে এই বয়সেও তাঁহার এমন অনুরাগ কেন?

সেই দিন হইতে কাশীনাথ নিত্য অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক ব্যায়াম এবং অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে কহিলেন, "তোমাকে এইবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিব।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কর্ম্মে?"

"এখন বলিব না। আমি তোমাকে স্বয়ং সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। কল্য যাত্রা করিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও।"

প্রাতঃকালে এই কথা হয়। দিবাভাগে কাশীনাথ একাকী বসিয়াছিল, গৌরীশঙ্কর এবং বিপ্রদাস কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। যে স্থানে কাশীনাথ উপবেশন করিয়াছিল সে স্থান হইতে অন্দর মহলের দ্বিতলের গবাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গবাক্ষ সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত।

একটা গবাক্ষ অল্প মুক্ত হইল। গবাক্ষের অন্তরালে কাশীনাথ রমণীর উজ্জ্বল চক্ষু দেখিল—দেখিল রমণী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাশীনাথ ব্যতীত আর কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, গবাক্ষ পথে হস্ত বাহির করিয়া ক্ষুদ্র লিপিখণ্ড নিক্ষেপ করিল। অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ সঙ্কেতপূর্ব্বক কাশীনাথকে সেই পত্র গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিল। হস্ত সুন্দর, অঙ্গুলি সুন্দর, চম্পকতুল্য, হস্তের ভঙ্গী সুন্দর—কাশীনাথ দেখিল। আর কিছু দেখিতে পাইল না, গবাক্ষ পুনরায় রুদ্ধ হইল। কাশীনাথ পত্র তুলিয়া লইল।

প্রথম পত্র কাশীনাথের স্মরণ ছিল। পত্রপ্রেরিকাকে আবার কখন না কখন দেখিতে পাইবে এ আশা সর্ব্বদাই ছিল।

পত্রে লিখিত ছিল, "বাটীর পশ্চাতে পুষ্করিণীতীরে উদ্যানে সন্ধ্যার পর একাকী [illegible] আসিবে। যে কথা বলিবার আছে অদ্য নহিলে বলা হইবে না।"

নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে কাশীনাথ উপস্থিত হইল। সে দিক [illegible] একটা [illegible] বাহিরের [illegible] ছিল না। [illegible] উদ্যানের এক এক স্থান অন্ধকার, মধ্যস্থলে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে [illegible] রহিয়াছে। কাশীনাথ কাহাকে কোথাও দেখিতে [illegible] [illegible]।

[illegible] রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। [illegible]

দিকে আইস।” কাশীনাথকে পথ দেখাইয়া [illegible] বৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে অন্ধকার, আর কোন ব্যক্তি নিকটে না আসিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না।

অন্ধকার গাঢ় নহে। তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না। চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী, রূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। দেহ অতিক্রম করিয়া রূপের তরঙ্গ যেন বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই তরঙ্গমালা উপর্যুপরি কাশীনাথকে আঘাত করিতে লাগিল। বীচিবিক্ষেপে পতিত হইলে সন্তরণকারীর চক্ষে মুখে যেমন জল প্রবেশ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, কাশীনাথের সেই অবস্থা হইল। রূপতরঙ্গে আহত হইয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, বাক্য রহিত হইল। পলকশূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। গঠনের কি ললিত, সুগোল, পূর্ণ মাধুর্য্য, যৌবনের কেমন স্থিরচঞ্চল ছটা! কিবা চক্ষের তরল, লোল কটাক্ষ, চূর্ণকুন্তলশোভিত দর্পণোপম ললাট! সে মুখ, সে চিবুক, সে গ্রীবাভঙ্গী, সে দাঁড়াইবার ঠাম—কাশীনাথ কি লক্ষ্য করিবে? সেই স্থিরতরঙ্গবিক্ষেপশালী রূপরাশিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

রমণী অল্প হাসিয়া, বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে, কুন্দকুট্মল দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া কহিল, “চিনিতে পার?”

কাশীনাথ নির্ণিমেষ লোচনে রমণীর মুখ দেখিতে দেখিতে, ধীরে ধীরে কহিল, “বিদ্যুৎ যেমন চিনিতে পারা যায় সেইরূপ চিনিতেছি।”

রমণী আবার হাসিল। “তোমার সহিত এমন স্থানে, এমন সময়ে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছি তাহাতে তুমি কি মনে করিতেছ?”

“সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার সহিত কেন সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছ?”

“পূর্ব্বে তোমায় একবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, মনে আছে?”

“আছে। কিন্তু আশঙ্কা কি স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কেমন করিয়া বুঝিব?”

“যদি বলি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে কি আমার কথা শুনিবে? যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ তাহা যদি প্রতারণা হয় তাহা হইলে কি এ গৃহ পরিত্যাগ করিবে?”

“যদি স্পষ্ট করিয়া বল ত বুঝিতে পারি। অনর্থক ভয় দেখাইলে ভয় পাইব না।”

“তাহা জানি। কিন্তু ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া আমি বলিতে পারিব না। আর একবার তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি। [illegible] যখন গৃহকর্ত্তা তোমাকে [illegible] করিয়া [illegible] বাহিরে [illegible] যাইও না।”

“আমরা কোথায় যাইব, তুমি জান?”

“সে কথার উত্তর দিব না। কিন্তু ইহার পর তুমি আমার কথা স্মরণ করিবে, [illegible] বুঝিতে পারিবে যে আমি সত্য বলিতেছি।”

[illegible] ব্যায়াম [illegible]

গৌরীশঙ্কর কাশীনাথের [illegible] কহিলেন, "তোমার বল এবং [illegible]। বিশ্বরাজের মত শিক্ষা থাকিলে [illegible] তোমার সঙ্গে পারিবে না। কিন্তু এখন উঁহার নিকট অভ্যাস কর। বিশ্বরাজের তুল্য বল হইলে আমি তোমায় শিখাইব।"

কাশীনাথ গৌরীশঙ্করকে প্রাচীন, বীতবল বিবেচনা করিত, তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। অস্ত্রচালনায়, ব্যায়ামে এই বয়সেও তাঁহার এমন অনুরাগ কেন?

সেই দিন হইতে কাশীনাথ নিত্য অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক ব্যায়াম এবং অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে কহিলেন, "তোমাকে এইবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিব।"

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কর্ম্মে?"

"এখন বলিব না। আমি তোমাকে [illegible] করিয়া লইয়া যাইব। [illegible] করিবে। তুমি প্রস্তুত থাকিও।"

প্রাতঃকালে এই কথা হয়। দিবাভাগে কাশীনাথ একাকী বসিয়াছিল, গৌরীশঙ্কর এবং বিশ্বরাজ কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। যে স্থানে কাশীনাথ উপবেশন করিয়াছিল সে স্থান হইতে অন্দর মহলের দ্বিতলের গবাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গবাক্ষগুলি সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত।

একটা গবাক্ষ অল্প মুক্ত হইল। গবাক্ষের অন্তরালে কাশীনাথ রমণীর উজ্জ্বল চক্ষু দেখিল—দেখিল রমণী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাশীনাথ ব্যতীত আর কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, গবাক্ষ পথে হস্ত বাহির করিয়া ক্ষুদ্র লিপিখণ্ড নিক্ষেপ করিল। অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ সঙ্কেতপূর্ব্বক কাশীনাথকে সেই পত্র গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিল। হস্ত সুন্দর, অঙ্গুলি সুন্দর, চম্পকতুল্য, হস্তের ভঙ্গী সুন্দর—কাশীনাথ দেখিল। আর কিছু দেখিতে পাইল না, গবাক্ষ পুনরায় রুদ্ধ হইল। কাশীনাথ পত্র তুলিয়া লইল।

প্রথম পত্র কাশীনাথের স্মরণ ছিল। পত্রলেখিকাকে আবার কখন না কখন দেখিতে পাইবে এ আশা সর্ব্বদাই ছিল।

পত্রে লিখিত ছিল, "বাটীর পশ্চাতে পুষ্করিণীতীরে উদ্যানে সন্ধ্যার পর একাকী গোপনে আসিবে। যে কথা বলিবার আছে অদ্য নহিলে বলা হইবে না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাশীনাথ উপস্থিত হইল। সে দিকে [illegible] একটা [illegible] বাহিরের [illegible] ছিল না। [illegible] উদ্যানের এক এক স্থান অন্ধকার, মধ্যস্থলে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিদিকে [illegible] রহিয়াছে। কাশীনাথ কাহাকেও কোথাও [illegible]।

[illegible]

এ দিকে [illegible] কাশীনাথকে পথ দেখাইয়া [illegible] বৃক্ষতলে [illegible]
অন্ধকার, আর কোন ব্যক্তি নিকটে না আসিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইত না। [illegible]
অন্ধকার গাঢ় নহে। তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না। চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী, রূপ উথলিয়া পড়িতেছিল। দেহ অতিক্রম করিয়া রূপের তরঙ্গ যেন বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই তরঙ্গমালা উপর্য্যুপরি কাশীনাথকে আঘাত করিতে লাগিল। বীচিবিক্ষেপে পতিত হইলে সন্তরণকারীর চক্ষে মুখে যেমন জল প্রবেশ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তাহার যেরূপ কষ্ট হয়, কাশীনাথের সেই অবস্থা হইল। রূপতরঙ্গে আহত হইয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, বাক্যরহিত হইল। পলকশূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। গঠনের কি ললিত, সুগোল, পূর্ণ মাধুর্য্য, যৌবনের কেমন স্থিরচঞ্চল ছটা! কিবা চক্ষের তরল, লোল কটাক্ষ, চূর্ণকুন্তলশোভিত দর্পণোপম ললাট! সে মুখ, সে চিবুক, সে গ্রীবাভঙ্গী, সে দাঁড়াইবার ঠাম—কাশীনাথ কি লক্ষ্য করিবে? সেই স্থিরতরঙ্গবিক্ষেপশালী রূপরাশিতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

রমণী অল্প হাসিয়া, বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বরে, কুন্দকুট্মল দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করিয়া কহিল, "চিনিতে পার?"

কাশীনাথ নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ দেখিতে দেখিতে, ধীরে ধীরে কহিল, "বিদ্যুৎ যেমন চিনিতে পারা যায় সেইরূপ চিনিতেছি।"

রমণী আবার হাসিল। "তোমার সহিত এমন স্থানে, এমন সময়ে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছি তাহাতে তুমি কি মনে করিতেছ?"

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার সহিত কেন সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছ?"

"পূর্ব্বে তোমায় একবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, মনে আছে?"

"আছে। কিন্তু আশঙ্কা কি স্পষ্ট করিয়া না বলিলে কেমন করিয়া বুঝিব?"

"যদি বলি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে কি আমার কথা শুনিবে? যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ তাহা যদি প্রতারণা হয় তাহা হইলে কি এ গৃহ পরিত্যাগ করিবে?"

"যদি স্পষ্ট করিয়া বল ত বুঝিতে পারি। অনর্থক ভয় দেখাইলে ভয় পাইব না।"

"তাহা জানি। কিন্তু ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া আমি বলিতে পারিব না। আর একবার তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি। কাল যখন গৃহকর্তা তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহিরে [illegible] চাহিবেন, যাইও না।"

"আমরা কোথায় যাইব, তুমি জান?"

"সে কথার উত্তর দিব না। কিন্তু ইহার পর তুমি আমার কথা স্মরণ করিও, [illegible] বুঝিতে পারিবে যে আমি সত্য বলিতেছি।"

[illegible] তাহার [illegible]
[illegible] তুমি কে ?”

“তোমার জানিয়া কি হইবে ?”

“যখন তুমি আমার সহিত একত্রে সাক্ষাৎ করিয়াছ তখন তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার জন্মিয়াছে।”

“অধিকার থাকুক বা না থাকুক, আত্মপরিচয় গোপন করিয়া আমার কোন ফল নাই। তুমি যদি মনে করিয়া থাক আমি এই গৃহের পরিবারভুক্ত তাহা হইলে তোমার ভ্রম। এ [illegible] কাহারও সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।”

“তবে তুমি এখানে কেন ?”

“আমি ইহাদের কুটুম্ব কিম্বা জ্ঞাতিকন্যাও নই। স্বজাতি, এই পর্য্যন্ত জানি। দক্ষিণ দেশে দুর্ভিক্ষের সময় কর্ত্তা আমাকে পিতৃমাতৃ কর্ত্তৃক ত্যক্ত অসহায়াবস্থায় দেখিয়া আপনার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি তখন নিতান্ত বালিকা, আমার কিছু স্মরণ নাই। সেই অবধি আমি এখানে আছি।”

“তোমার বিবাহ হয় নাই ?

“অজ্ঞাতকুলশীলাকে কে বিবাহ করিবে ?”

কাশীনাথ পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। যুবতী ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া বলিল, “আর কি জিজ্ঞাসা করিবে ?”

কাশীনাথ বলিল, “তোমার নাম ?”

“ইহারা রাখিয়াছেন বিরজা। বাপ মা কি নাম রাখিয়াছিলেন জানি না। আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা হয় ?”

“জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছু নাই। কিন্তু মনে যে কথা হইতেছে বলিব কি না ভাবিতেছি।”

বিরজা কাশীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, “সে কথা আমার শুনিতে নাই ?”
“সে কথা আর কাহারও মুখে শুনিয়াছ কি না ভাবিতেছি।”
“নির্ভয়ে বলিতে পারি।”

“তবে শুন,” কাশীনাথ অধর চাপিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিল। “শুন, তোমার মত সুন্দরী [illegible] দেখি নাই, তোমার মত সুন্দরী বোধ হয় জগতে নাই।”

বিরজা [illegible] কাশীনাথের করে করস্পর্শ করিল। কহিল, “আমিও [illegible] বলিতেছি। তোমার মুখে যাহা শুনিলাম তাহা আর কাহারও মুখে শুনিতে ইচ্ছা করে না।” [illegible] কাশীনাথের হস্ত ত্যাগ করিয়া, কাশীনাথের মোহ ভঙ্গ না হইতেই, [illegible] বিরজা নিমেষে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

[illegible] দিন [illegible] পর আহারাদি করিয়া [illegible] কাশীনাথ [illegible]
[illegible]

বীরভূমের বাক্য কাশীনাথের অন্তরে লাগিল। [illegible]

গৌরীশঙ্কর হাস্যমুখে কহিলেন, "তোমার শিক্ষা ভাল হইতেছে না। [illegible] জিজ্ঞাসা না করিয়াই যাইতে হইবে।"

কাশীনাথ মৌনাবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত যাত্রা করিল।

গৌরীশঙ্কর, বিপ্রদাস এবং কাশীনাথ। আর কেহ সঙ্গে ছিল না। কাশীনাথ দেখিল গৌরীশঙ্কর রাজপথে না গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে মাঠ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাম পশ্চাতে পড়িল। আরও কিছুদূর গিয়া কাশীনাথ দেখিল একটা বৃক্ষের তলায় চারিটা অশ্ব রহিয়াছে। এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে, আর তিনটা অশ্বের আরোহী নাই। কিন্তু অশ্ব সজ্জিত, অশ্বারোহী অপর অশ্ব কয়েকটার বল্গা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৌরীশঙ্কর একটা অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিলেন; বিপ্রদাস দ্বিতীয় অশ্বের রশ্মি ধারণ করিল। গৌরীশঙ্কর কাশীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বে আরোহণ করিতে শিখিয়াছ?" উত্তরে কাশীনাথ তৃতীয় অশ্বের রশ্মি হস্তে লইয়া, অশ্বের স্কন্ধে হস্ত দিয়া লম্ফপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। আর কোন কথা হইল না। চতুর্থ অশ্বারোহী পথ দেখাইয়া অশ্বকে বেগে চালনা করিল। নবাগত ব্যক্তিত্রয় তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

রাত্রি হইতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, আকাশে চন্দ্র উঠিল না। বৃক্ষপত্রে অথবা দূর্ব্বায় ঝিল্লীরব, কোথাও জলাশয়ের নিকট খদ্যোতিকা, কোথাও বনান্ধকারে কিছু লক্ষ্য হয় না। যে স্থানে মৃত্তিকা কঠিন সে স্থানে অশ্বের পদশব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট, ভূমি আর্দ্র হইলে সে শব্দও অস্পষ্ট। অশ্বারোহীগণ অবিশ্রান্ত বেগে গমন করিতে লাগিল। অনেক দূর এইরূপে গমন করিয়া প্রথম অশ্বারোহী অশ্বের বেগ সংযম করিলে তাহার সঙ্গীগণও সেইরূপ করিল। কাশীনাথ দেখিল, গভীর অটবীর মধ্যে উপনীত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে এক ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে অশ্বারোহীগণ অবতরণ করিয়া বৃক্ষশাখায় রশ্মি সংবদ্ধ করিয়া রাখিল।

মন্দিরের ভিতরে আলোক জ্বলিতেছিল। কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিল কয়েক জন সশস্ত্র পুরুষ তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদিগের সংখ্যা ষোড়শ। গৌরীশঙ্করকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া অভিবাদন করিল। মন্দিরের এক পার্শ্বে কয়েকটা তরবারি ছিল। গৌরীশঙ্কর একটা তরবারি কাশীনাথের হস্তে দিলেন। স্বয়ং একটা লইলেন। বিপ্রদাস এবং চতুর্থ ব্যক্তিও তরবারি গ্রহণ করিল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বন্দুক কিম্বা [illegible] কেহ লইও না।"

[illegible] ব্যক্তি কহিল, "তরবারি ছাড়া আমরা কিছুই লই নাই।"

অশ্বারোহণে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল তাহাকে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "তুমি [illegible]?"

সে ব্যক্তি [illegible] আলোক নির্ব্বাণ করিয়া সকলে মন্দির হইতে [illegible]

পরে কাশীনাথ [illegible] মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিল, "দূরে যাইতে হইবে?"

বিশ্বনাথ সংক্ষেপে কহিল, "কোথায় যাইতেছ এখনি দেখিতে পাইবে।"

সমস্ত বিংশতি পুরুষ দীর্ঘ, দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিল। তখন সম্মুখে রাজপথ দেখা দিল। গৌরীশঙ্করের নির্দ্দেশানুসারে অস্ত্রধারীগণ রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উর্দ্ধাকাশে সমুজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল। পথে জনমানব নাই।

সহসা দূর হইতে শকটের চক্রশব্দ হইল। শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল। ক্রমে শকটবাহী মনুষ্যদিগের পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত পুরুষেরা সাবধানে তরবারি কোষমুক্ত করিল। শুদ্ধ কাশীনাথ তরবারি মুক্ত করিতে বিস্মৃত হইল।

বলীবর্দ্দযুগলবাহিত শকট শব্দায়মান হইতে হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। শকটের অগ্রে এবং পশ্চাতে বিংশতির অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ছিল। কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে অসি। গৌরীশঙ্করের লোকেরা পূর্ব্ব সঙ্কেত মত দুই দলে বিভক্ত হইয়া শকটের পূর্ব্বস্থিত এবং পশ্চাৎস্থিত লোকদিগকে এককালীন বিকট চীৎকার করিয়া হুঙ্কার রবে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সঙ্গে কাশীনাথও রাজপথে আসিয়া পড়িল।

শকটরক্ষকগণ অকস্মাৎ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরীশঙ্করের অনুচরবর্গ কৌশলে শ্রেষ্ঠ। গৌরীশঙ্কর স্বয়ং দীর্ঘকাল-ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত শকটরক্ষকদিগের মধ্যে পড়িলেন। কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, নিমেষে নিমেষে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে অসি নক্ষত্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। কাশীনাথ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

কাশীনাথকে সেইরূপ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তাহার অজ্ঞাতে তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আঘাত করিবার উদ্দেশে এক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করিল। গৌরীশঙ্কর দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্তে তাহাকে নিরস্ত্র করিলেন। চক্ষে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ জ্বলিতেছিল। কাশীনাথকে কহিলেন, "মূঢ়! আত্মরক্ষা করিবারও ক্ষমতা নাই?" কাশীনাথ তখন তরবারি টানিয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল, কিন্তু কাহাকেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আক্রমণ করিল না।

অতি অল্পকালের মধ্যে শকটরক্ষকগণ পরাজিত হইয়া, অনেকে আহত হইয়া পলায়ন করিল। শকটে কয়েক তোড়া মুদ্রা ছিল, গৌরীশঙ্করের অনুচরগণ তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। লুণ্ঠিত অর্থ কয়েক ব্যক্তি গৌরীশঙ্করের গৃহে গোপনে রাখিয়া গেল।

গৌরীশঙ্কর শয়ন করিতে যাইতেছেন এমন সময় কাশীনাথ কহিল, "আপনাকে কিছু [illegible] আছে।" বিশ্বনাথ শয়নাগারে গমন করিয়াছিল।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যাহা বলিবার আছে সংক্ষেপে বল। [illegible], [illegible] হইবে।"

কাশীনাথ কহিল, "আপনি কি আমায় এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন ?"

গৌরীশঙ্করের পূর্ব্বের সে শান্ত, গম্ভীর, ধীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "আজ ত তোমায় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য দেখিলাম। তোমাকে দিয়া পুরুষের কর্ম্ম হইবে কি না সন্দেহ হইতেছে।"

কাশীনাথ কহিল, "দস্যুবৃত্তি করিবার আমার ইচ্ছা নাই। আপনার যে এই ব্যবসা তাহা আমি জানিতাম না। ইহাতে যে দেশের মঙ্গল হইতেছে তাহার কোন সংশয় নাই, কিন্তু সে মঙ্গল আপনার দ্বারাই সাধিত হউক, আমি কোন সহায়তা করিব না।"

গৌরীশঙ্কর পরুষস্বরে কহিলেন, "আদেশ পালন করাই তোমার কর্ম্ম, ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার তোমার অধিকার নাই। তোমাকে যখন যাহা বলিব করিতে হইবে।"

ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীনাথ কহিল, "এখনও আমাকে বালক বিবেচনা করিতেছেন ? এখনই যদি আপনাকে ধরাইয়া দিই তাহা হইলে কে রক্ষা করে ?"

গৌরীশঙ্কর অট্টহাস্য করিলেন—হাস্য বিকট, ব্যঙ্গপূর্ণ। হাস্য করিয়া কহিলেন, "মূর্খ ! বালক ! ভয় দেখাইতেছ ? তোমার ন্যায় দাম্ভিক বালকের অপেক্ষাও কি আমি অধিক বুদ্ধি রাখি না ? এইবার মার্জ্জনা করিতেছি, দ্বিতীয় বার কখন এরূপ ধৃষ্টতা দেখিলে শাস্তি দিব। প্রথমতঃ, ইচ্ছা করিলে এখনি তোমাকে হত্যা করিতে পারি—কেহ কখন জানিবে না। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি গিয়া স্বচ্ছন্দে সংবাদ দাও—আমি দশ জন সাক্ষী দিয়া প্রমাণ করাইব তুমি নিজে দস্যু। আমার বিপক্ষে তুমি একজনও সাক্ষী পাইবে না। তোমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ? আমার মত রাজভক্তি কাহার, রাজপুরুষ আমার তুল্য সম্মানিত কে ? আমি ধনী—দস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করিব কেন ? যদি সংবাদ না দিয়া তুমি পলায়ন কর তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। যেখানেই যাও আমার দলের কোন ব্যক্তি যেমন করিয়াই হউক তোমায় হত্যা করিবে। তোমার হাতে যে চিহ্ন আছে তাহা দ্বারা দলের লোক সর্ব্বদাই তোমায় চিনিতে পারিবে। যতক্ষণ আমার অনুগত থাকিবে ততক্ষণ তোমার মঙ্গল। মূর্খ ! আমাকে ভয় দেখাইতেছ ?"

কাশীনাথ গৌরীশঙ্করের মুখ দেখিয়া এই সকল কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কহিল, "আমি আপনার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম তাহারই কি এই প্রতিদান ?"

তখন গৌরীশঙ্করের স্বর কোমল হইল। "আমি তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছি, তুমি আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিতেছ। আমি বলিয়াছি যে কর্ম্ম আমি স্বয়ং করিতে পারি তাহা তোমাকে করিতে বলিব না। আর কি বলিয়াছি ? দস্যুবৃত্তি কাহাকে বল ? গ্রাম লুটিলে দস্যু, রাজ্য লুটিলে সম্রাট। কাল আমি দস্যুপতি, কাল আমি [illegible] [illegible] হইতে পারি। আমরা যে কর্ম্মে ব্যাপৃত তাহাতে বিপুল অর্থ ব্যয় হইবে। সেই জন্য এই আয়োজন। নহিলে কি আমার [illegible] কোন অভাব আছে ? [illegible]

[illegible] মতালোচনা ও বিজাতীয় [illegible] পরীক্ষাদি করিয়া সম্প্রতি [illegible] একটি চিত্তাকর্ষক সারগর্ভ বিবরণ প্রচার করিয়াছেন।* নানা তর্কবিতর্কের পর [illegible] প্রচারিত মতটি আজকাল সত্যমূলক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে।

পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন পরিষ্কার ও অকলুষিত তরল পদার্থে প্রায়ই বুদ্বুদ লক্ষিত হয় না। পরিষ্কৃত জল ঘন ঘন আলোড়িত করিয়া বহু চেষ্টা করিলেও, ইহাতে স্থায়ী বুদ্বুদ উৎপন্ন হয় না এবং অবিমিশ্র আলকোহল বা ঈথরেও বিম্ব দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত পরিষ্কার জল ও আলকোহল যে কোন পরিমাণে মিশ্রিত হইলে আলোড়িত করিলে বহুল পরিমাণে স্থায়ী বুদ্বুদ উঠিতে থাকে—কর্পূর যুক্ত জলেও [illegible] এই প্রকার অনেক বিম্ব উত্থিত হইতে দেখা যায়। বুদ্বুদ সম্বন্ধে এই সকল [illegible] পরীক্ষা এবং আরও অনেক উদাহরণাদি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—বিজাতীয় অথবা পদার্থের সংমিশ্রণ ব্যতীত, কোনও তরল পদার্থের বিম্বোৎপত্তি হইতে পারে না। পানীয় জলাদি বিজাতীয় পদার্থ সংমিশ্রণে কলুষিত কি না, তাহা পূর্ব্বোক্ত রূপে বুদ্বুদ পরীক্ষা দ্বারা সহজে মোটামুটি স্থির করা যাইতে পারে। মৃদু সঞ্চালনে জল হইতে স্থায়ী বুদ্বুদ উত্থিত হওয়া ইহার কলুষতার একটি প্রধান লক্ষণ। আমরা সমুদ্র ও নদীজলে যে সকল স্থায়ী বিম্ব ভাসমান দেখি, তাহাও ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাবানের [illegible] বিম্বোৎপাদক এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ নদীজলে সর্ব্বদাই মিশ্রিত থাকে, ইহারই [illegible] ফেনিল দেখায়। সমুদ্র জলে লবণ মিশ্রিত আছে জানিয়া লবণের অস্তিত্বই বুদ্বুদোৎপত্তির কারণ বলিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, বুদ্বুদোৎপত্তি বিষয়ে লবণের কিছুই সহায়তা নাই, সমুদ্রজ শৈবাল জাতীয় উদ্ভিজ্জের গলিতাংশ হইতে বিম্বোৎপত্তি হয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

তরল পদার্থে বিজাতীয় পদার্থের অস্তিত্বই যদি বিম্বোৎপত্তির কারণ হইল,—কি প্রকারে এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহা এখন আলোচ্য। সকলেই দেখিয়াছেন, বিম্বমাত্রেই সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; পরিষ্কার জল ও ঈথরের নিমেষকাল স্থায়ী বিম্ব এবং সাবানের স্থায়ী বুদ্বুদেও উক্ত আবরণ দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম আবরণ যতই দৃঢ় ও চাপসহনশীল হইবে, বিম্বের স্থায়ীত্বও তত অধিক হইবে, কাযেই দেখা যাইতেছে তরল পদার্থের সূক্ষ্মাবরণের প্রকৃতিগত বৈষম্যই, বিম্বোৎপত্তি ও তাহার স্থায়ীত্বের একমাত্র কারণ।

[illegible] পদার্থ মাত্রেরই [illegible] উপরিভাগ পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাবরণ দ্বারা [illegible] থাকে। এই আবরণের একটি বিশেষ গুণ আছে, এক খণ্ড রবার টানিয়া [illegible] [illegible] সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে—তরল পদার্থের সূক্ষ্মাবরণেরও এই প্রকার [illegible] [illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট তরল পদার্থে, এই গুণ [illegible] পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহার অস্তিত্ব [illegible] উপায়ে দেখ [illegible]

* [illegible] Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, March 189[illegible]

যায়, [illegible] একটি [illegible] মধ্যে, [illegible] কাচের নল প্রবিষ্ট করিয়া [illegible] বায়ুর বুদ্বুদ [illegible] বেগে বহির্গত হইতে দেখিলে, জলাবরণের যে একটি আকুঞ্চনগুণ আছে, এবং ইহা দ্বারাই যে বিন্দুর বায়ু সবেগে নিষ্কাশিত হইল তাহা সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ বিন্দাবরণের বহিঃস্থ ও মধ্যস্থ উভয় অংশেরই সমাধিক আকুঞ্চন ক্ষমতা আছে—জলবিন্দু বা পাত্রস্থ স্থির তরল পদার্থাদিতে, আবরণের কেবল মাত্র বহিরাংশেই আকুঞ্চন ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট তরল পদার্থে সকল সময়ে যে কেবল একটি মাত্র আবরণ থাকে তাহা নয়, অপর পদার্থ সংমিশ্রণে, পৃথক আকুঞ্চনগুণ সম্পন্ন একাধিক আবরণও থাকিতে পারে। জলে ভাসমান তৈল বিন্দুতে ইহার একটি বেশ উদাহরণ পাওয়া যায়। তৈল জল ও বায়ু এই পদার্থত্রয় সম্মিলনে, ভাসমান তৈলবিন্দুর বহির্ভাগে, তৈল ও বায়ু মধ্যে, ইহার নিম্নে জল ও তৈল মধ্যে এবং বাহিরে জল ও বায়ু মধ্যে, পৃথক গুণ সম্পন্ন তিনটি আবরণ দৃষ্ট হয়। এই আবরণ ত্রয়ের আকুঞ্চন ক্ষমতার উপরই তৈল বিন্দুর আকার নির্ভর করে। জল ও বায়ু মধ্যস্থিত আবরণের আকুঞ্চন ক্ষমতা, যখন তৈল বায়ু ও তৈলজলের মধ্যস্থ আবরণদ্বয়ের আকুঞ্চন শক্তি সমষ্টির সহিত সমান বা তদপেক্ষা অধিক হয়, তখন ইহা ক্ষুদ্র লেন্সের আকারে জলে ভাসিতে থাকিবে। কিন্তু সাধারণতঃ পরিষ্কার জল ও বায়ু মধ্যস্থ আবরণের আকুঞ্চনশক্তি অপর দুই আবরণের সমবেত শক্তি অপেক্ষা প্রায়ই অধিক দেখা যায়, এ জন্য জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে প্রথমোক্ত আবরণ [illegible]বশতঃ তৈলবিন্দুকে টানিয়া, সমগ্র জলময় ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, কাযেই ইহা একস্থানে স্থির থাকিয়া ভাসিতে পারে না। তবে আমরা যে কখন কখন ক্ষুদ্র তৈল বিন্দু [illegible] [illegible] অধিকার করিয়া ভাসিতে দেখি তাহার অপর কারণ আছে। সমগ্র জল তৈলাচ্ছাদিত না হইয়া, কেবল একস্থানে তৈল ভাসিতে দেখা, পরিষ্কার জলে [illegible] সম্ভব নয়। যে জল পূর্ব্বে বিজাতীয় পদার্থ বা তৈল সংমিশ্রিত হইয়া, ইহার [illegible] আবরণের আকুঞ্চন ক্ষমতা কমাইয়া, তৈল বিন্দুস্থ আবরণদ্বয়ের সমবেত শক্তির [illegible] সমান করিয়াছে, তাহাতেই কেবল তৈলবিন্দু ব্যাপ্ত না হইয়া ভাসিতে পারে। [illegible] পাঠক পাঠিকাগণ একটি ক্ষুদ্র পাত্রে জল রাখিয়া অনায়াসে ইহার পরীক্ষা করিয়া [illegible]।

এখন পূর্ব্ব বর্ণিত সহজ পরীক্ষা এবং আরো অনেক উদাহরণ দ্বারা দেখা যায় যে,—বিজাতীয় পদার্থের দ্বারা কলুষিত হইলে, তরল পদার্থের আবরণের স্বাভাবিক আকুঞ্চন শক্তি অনেক হ্রাস হয় এবং ইহারই ফলে বিম্বোৎপত্তির অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে। [illegible] আকুঞ্চন শক্তি হ্রাস হওয়ায়, বিম্বাবরণে অধিক টান থাকে না, কাজেই [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] সহজে ছিন্ন হয় না। বিজাতীয় পদার্থ সংযোগে, জলাদির [illegible] আকুঞ্চন শক্তি [illegible] আরো দুই একটি [illegible] উদাহরণ দেওয়া [illegible]। [illegible] হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন [illegible] পাত্রস্থ [illegible] [illegible] [illegible]

কর্পূর সকল জীবন্ত কীটের ন্যায়, নানা গতিতে সবেগে, জলের উপরে বিচরণ করিতে থাকে,—অনুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহা কর্পূর সংযোগে জলাবরণের আকুঞ্চন শক্তি হ্রাসজনিত ফল মাত্র। প্রশস্ত পাত্রের সর্ব্বাংশে কর্পূর পরিব্যাপ্ত হইতে না পাইয়া, ইহা কেবল নিকটস্থ জলভাগের আকুঞ্চন শক্তি হ্রাস করে, কাজেই দূরস্থ জলাবরণের শক্তির আধিক্য প্রযুক্ত টান পড়িয়া ইতস্ততঃ-বিচরণ করিতে থাকে। জল কোন প্রকারে কলুষিত বা তৈলাক্ত করিয়া ইহার আকুঞ্চন শক্তির হ্রাস করিলে, কর্পূরের গতি এক কালীন বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ঝটিকা কালে সমুদ্রজলে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা স্রোতের প্রকোপ প্রশমিত করিয়া, ঝটিকার অনিষ্টকারিতার হস্তহইতে উদ্ধার পাইবার আজকাল যে একটা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাও জলাবরণের উপর, তৈলের প্রভাবের ফল বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন।* মহা ঝটিকা কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রজলে তৈল নিক্ষেপ করিলে ইহা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া, আবরণের আকুঞ্চন শক্তিদ্বারা, তৈলব্যাপ্ত জলে একপ্রকার টান উৎপাদন করে, এবং ইহারই ফলে জল সম্পূর্ণ স্থির হইয়া এক সমতলে থাকিবার জন্য চেষ্টা করে। কাযেই এই টানের বিরুদ্ধে প্রবল বায়ুবেগে, সহসা স্রোত উৎপন্ন করিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কলুষিত তরল পদার্থে, আবরণের আকুঞ্চন শক্তি হ্রাস হওয়ায়, বিম্বাবরণে টান থাকে না, এইজন্য সহজে বিম্বোৎপত্তি হয়;—ইহা বিম্বোৎপত্তি ও ইহার স্থায়িত্বের কারণ বটে, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, এতদ্ব্যতীত আরো কারণ আছে। কলুষিত তরল পদার্থ বা সাবানজলাদি জাত বিম্বাবরণের সর্ব্বাংশের আকুঞ্চন শক্তি সমান থাকে না এজন্যই বিম্ব অধিক কাল স্থায়ী হয়। আবরণের আকুঞ্চন শক্তি সর্ব্বাংশে সমান থাকিলে, ইহা বিম্বাকারে কিছুতেই শূন্যে দাঁড়াইতে পারিত না, স্বীয় ভারে আপনিই জলে লীন হইয়া যাইত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তরলপদার্থে বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ ভেদে, ইহার আবরণের আকুঞ্চন শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে; একই পদার্থের যে অংশ বিজাতীয় পদার্থ যোগে অধিক কলুষিত, তাহার সেই অংশের আকুঞ্চন শক্তি অপরাংশ অপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়। বিম্বাবরণে ইহাই ঘটিতে দেখা যায়—ইহার ঊর্দ্ধাংশ অপেক্ষা, অধোভাগে বিজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। এ জন্য বিম্বাবরণের নিম্নাংশ অপেক্ষা, অল্প কলুষিত ঊর্দ্ধাংশের আকুঞ্চন শক্তি অধিক হইয়া পড়ে এবং ইহারই ফলে বিম্বও অধিক কাল স্থায়ী হয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ [illegible] বৈশাখ সংখ্যার "[illegible]" [illegible] লিখিত "বৈজ্ঞানিক [illegible] [illegible] শক্তি" শীর্ষক [illegible]। [illegible]

এখনও চখে ধাঁধাঁ লেগে আছে। মনে করেছিলাম বিবাহ করব না। একদিনে একবার দেখাতে সে পণ বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল। নরেন্দ্র বাবু, আমাকে এখন জামাই বল আর চাকর বল যা বল আমি তাই। (প্রকাশ্যে) প্রণাম।

নরেন্দ্র বাবুকে নমস্কার ও উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নরেন্দ্র বাবুর আফিসের কেসিয়ার দীননাথ বাবুর গৃহে চেয়ারে বসিয়া লিখন, একজন ঘটকীর প্রবেশ।

ঘ। নরেন্দ্র বাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

দী। কে নরেন্দ্র বাবু ? (পত্র লিখন)

ঘ। বামুন পাড়ার নরেন্দ্র বাবু। আমি তাঁর বাড়ীর ঘটক।

দী। এখানে কিজন্য ! (পত্র উত্তোলন)

ঘ। ওগো বাবু এইটে বুঝতে পারলে না ? তোমার হাতে সুতো বাঁধবার জন্য।

দী। অমন কথা মুখে এন না। আমি কেসিয়ারি করি আমাদের পায় পায় শত্রু। হাতে দড়ি পড়তে কতক্ষণ ?

ঘ। তা নয় গো। এত লেখাপড়া শিখেছ আর এইটেতে গোল বাঁধাচ্ছ কেন ! বলি আপনি নাকি বিয়ে করবেন তাই আপনার কাছে এসেছি।

দী। (অন্যমনস্ক ভাবে) বিয়ে ? বিএ পাশত বছর চারেক করেছি সে সব গোল চুকে গেছে। এখন দিব্য ভাল মানুষের মত দুবেলা আফিসে যাই আসি। সে সব ভয়ঙ্কর ব্যাপারের নাম আর কেন। (প্রথম পত্র খাম শেষ পুনরায় আর একখানা পত্র লিখন)।

ঘ। বড় মুস্কিলেই পড়লেম যে গা। (স্বগত) এ কিরকম মানুষ রে বাবু। যে হয়ত হয়ে গেছে আমাকে কেবল বকিয়ে মারছে। নরেন্দ্র বাবুর যেমন বুদ্ধি। আমরা ঘটক ঘরের খবর জানি না আর আমরা লোকে জানে। যা হক একে দেখতে হবে। (প্রকাশ্যে) বিএ পাশের কথা নয়। একটী তের বছরের পরিষ্কার সুন্দরী মেয়ে।

দী। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন অন্যমনস্ক ভাবে) কি বলছ কার সুন্দরী মেয়ে রয়েছে। তা আমার কি বাছা তাদের আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী খবর দাওগে বিদায় পাবে।

ঘ। বলি আপনাদের বাড়ী মেয়ে ছেলে দেখছি নে কেন ?

দী। টাকার কেসিয়ারি করি স্ত্রীলোকের ধার ধারি না। তোমার দরকার থাকে অন্যত্র সন্ধান নিতে পার।

ঘ। (সজল চক্ষে) আমরা মুখ্যু মানুষ আপনারা বড়লোক, আমাদের কথা সোজা-ভাবে না ধরে যদি ঘুরিয়ে মারেন, তা হলে গরীব মারা যায়।

দী। (ফিরিয়া বসিয়া) কি বলছ বাপু বলত শুনি। তুমি কেঁদে ফেলে দেখছি যে। এইবার দুটো কান উঁচু করে মাথাটা ঠিক করে রেখেছি। যা বলবে সব শুনে যাব।

ঘ। (চক্ষু মুছিয়া) শুনলেম আপনি এখনও বিবাহ করেন নি। তাই তাই একটী বেশ ভাল মেয়ের সম্বন্ধ এনেছি। আপনার কি মত?

দী। তার পর, তোমার সব কথাগুলো বলে যাও শেষে উত্তর দেব।

ঘ। আপনি শোনেন ত বলি।

দী। আমার সময় বড় অল্প। শীঘ্র শীঘ্র বলতে পার জবাব দেব নইলে কেন আর কষ্ট পাও।

ঘ। তার পর বলছি। বামুন পাড়ার নরেন্দ্র বাবুর বেশ একটী মেয়ে আছে দেখতে চান দেখাতে পারি।

দী। রোস, একটী মেয়ে আছে দেখতে বেশ। দেখতে চান দেখাতে পারি। এত কথা কেন? একটু ছোট খাট সোজা কথায় বললে হয়, "তুমি একজন চাকুরে তোমার পাটা বাড়িয়ে দাও। একটী লোক অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্চে সেই পাটা ধরে উদ্ধার হতে পারেন। না বাছা আমার কর্ম্ম নয়। মানুষ উদ্ধার দূরের কথা। কাগজ উদ্ধার করতে আমার জিভ বেরিয়ে পড়ে। আর কিছু কথা আছে?

ঘ। না বাপু তোমাকে পারলেম না।

দী। যা যা বলেছ সব বুঝেছি। আমার তাতে বড় আপত্তি নাই। তবে আমার মাথাওয়ালা আছেন যাঁরা আমার মাথাটার দর দিয়ে রেখেছেন। আগে দেশে যাই। বাবা মাকে জানালে তাঁরা যা বলবেন হবে। তোমার কথায় হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হতে পারে না।

ঘ। আচ্ছা বাবু তবে সেই কথাই ভাল। আজ শুক্রবার। সোমবারে আমি আবার আসব। দোহাই তোমার আর আমাকে ঘুরিও না।

দী। (হাসিয়া) তোমাকে আমি ঘোরালেম কখন? তোমরা আমাকেই ঘোরে ফেলবার চেষ্টায় বেড়াও। এবার লক্ষ্মী ছেলেটীর মত, তুমি যেমন আসবে অমনি উত্তর দিয়ে দেব। যদি সেটা তোমার মনোগত না হয় আমি নাচার। ঘটকীর প্রস্থান।

আঃ ঘটকী মাগীটে মাথা ধরিয়ে দিয়ে গেল। এখন আর কাজ কর্ম্ম কিছুই হবে না। একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈঠকখানায় জমীদার গদাধর বাবু।

ঘটকের প্রবেশ।

জ। কি চাটুয্যে যে! প্রণাম হই পথ ভুলে নাকি?

চা। আর কিছু নয়। বলছিলেম বহুদিন আপনার পরিবার বিয়োগ হয়েছে। বিবাহাদি করলেন না। এত বড় বংশ এত মান সম্ভ্রম সকলি যে একেবারে লোপ পাবে। (নাকীসুরে) আমার একমাত্র আশ্রয়বৃক্ষ কাঠুরে কোন দিন ভূমিসাৎ করবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়েছি।

জ। তোমরাত আর এদিকে এস না। আমার দুঃখের দিন একরকমে চলে যাচ্চে। আমি নিজে গিয়ে ত লোকের পায়ে ধরতে পারি নে। বড় গিন্নির মেয়ে ঘটক ঘটকী বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না।

চা। বটে—এমন!!! আমাকে কেন টুঁ করে খবর দেন নি? আমি চাটুর্য্যে থাকতে আপনি গৃহশূন্য, মনক্ষুন্ন, ছিন্ন ভিন্ন, ধিক ধীগ্ন! (ভূমিতে মুষ্ট্যাঘাত) এখনি হুকুম দেন, জোড়া অপ্সরী আপনার বাড়ী ঘুরে বেড়াবে।

জ। না হে না, সে প্রবৃত্তি নেই। তবে নির্ব্বংশ হবার ভয়টা কিছু বেশী হয়েছে। বলব কি—

চা। (বক্ষে সশব্দে করাঘাত করিয়া) হামি আছে হামি আছে কুচ পরোয়া নেই। কোন মতেই হবে না। ঠিক সাড়ে দশমাস পরে ধাইকিড়ি করে আপনার বিছানার পাশে "ওয়া-ওয়াল্যা-" শুনতে পাবেন। চলুন এখনি যাওয়া যাক।

জ। কোথায় হে?

চা। নরেন মুখুয্যের যে এক তের বছরের মেয়ে আছে। সে আপনার জন্য তপস্যা করছে।

জ। (সহাস্যে) সত্য নাকি? আমার সঙ্গে বে দিতে নরেন মুখুয্যে রাজী হবে?

চা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ রাজী হবে! বলে সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা? এমন ধনে মানে কুলে শীলে শ্রীবিষ্ণু ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারে মূর্ত্তিমন্ত জামাই তার বংশে কোন কালে হয়েছে? আমাকে কাল নরেন মুখুয্যে জোড়হাত করে বল্লে মশাই আমার জাত রক্ষা করুন। তাই আপনার কাছে এসেছি। যদি তার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ে তবে সে উদ্ধার হয়ে যায়।

জ। বল কি হে? মেয়েটা কেমন?

চা। তাইত বলছি চলুন না চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন।

জ। এখন না। হঠাৎ যাওয়াটা নিতান্ত বেআক্কেলমানষি হবে। তুমি বলে এস আমি সন্ধ্যাবেলা যাব।

চা। তা আমি যদি সেটাকে মরতে বলি তাতেও রাজী আছে। কিন্তু (মাথা চুলকাইয়া) আমার বেলা ?

জ। (হাসিমুখে) যদি আমার মন মত পাই, তবে তোমার মনোমত খরচ লেখা থাকবে।

চা। বেশ বেশ। দীর্ঘায়ুরস্তু। প্রস্থান।

জ। চুলে কলপ টলপ বেশ করে লাগাতে হবে। এই বেলা যাই। প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

গৃহের ভিতর এণ্টিক্লার্ক বুককিপার ও নবকিশোর।

দীননাথ কেসিয়ারের প্রবেশ।

দী। কি হে তোমরা সবাই এখানে, আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়েছি।

ধী। আপনার কোন প্রয়োজন আছে ?

দী। আর কিছু নয় আমি বাড়ী যাব। তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ যেন আমার কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা না হয়। সাহেবটা ভারী রাগী কি জানি পাছে সামান্য দোষে অপমান করে।

ভূ। আপনার একজন বড়লোক সহায় আছেন ভাবনা কি ?

নব। মহাশয় আপনার বাড়ী কোথা জানতে পারি কি ?

দী। জানায় লাভ ? (সহাস্যে) আমার বিবাহের ত বন্দোবস্ত হচ্ছে না (গাত্রোত্থান ও জানালার নিকট আসিয়া প্রভাবতীকে দর্শন)।

ভূ। আপনি বসুন না। সাহেবের ভয় আপনাকে এত অন্যমনস্ক করে তুলেছে !

দী। (কষ্টে মুখ ফিরাইয়া) না তার জন্য আর ভাবনা নেই। তোমরা আছ আমি নিশ্চিন্ত। আমরা এক আফিসের, তোমাদের বিপদে আমার বিপদ, আর আমার বিপদে তোমাদের বিপদ। (পুনরায় সাগ্রহে জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ)

নব। (জানালার দিকে চাহিয়া জনান্তিকে বুককিপারের প্রতি) আপনি যা দেখতে চেয়েছিলেন দেখুন। বোধ হয় কেসিয়ার বাবু, তাতেই মগ্ন।

ভূ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানালার নিকট গমন) বড় গরম পড়েছে। ফাল্গুন মাসে এত, এর পর পূরো সময় পড়ে রয়েছে। এ জানালাটা দিয়ে কিন্তু বেশ বাতাস আসে।

দী। চল বসি গিয়ে। অন্যান্য অনেক কথা আছে। (স্বগত) ঐটি কি নরেন্দ্র বাবুর কন্যা ? কেন যে ঘটকীকে সেদিন অত কষ্ট দিয়েছিলেম ? কি জানি আমার ভাগ্যে যে অমন স্ত্রী আছে তা বিশ্বাসই হয় না। কেনই বা না হবে। আমার ভাবী স্ত্রী মনে করতেও আহ্লাদ হচ্ছে।

ধী। (স্বগত) তাইত হলো কি ! প্রভা কি বাগানে এসেছে ? আমার বড় হিংসা হচ্ছে। (চিন্তাপূর্ব্বক) ওরা দেখ্‌ছে দেখুক না। চক্ষের দেখায় দোষ কি ? ভাল জিনিষ সকলেরই দেখতে ইচ্ছা করে।

ভূ। (স্বগত) আমার মনের কথা যা কেসিয়ারেরও কি তাই? না না উনি বড় লোক কবে বিবাহ হয়েছে।

ধী। মশাই আপনারা দুজনেই যে দাঁড়িয়ে রইলেন বসুন।

দী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে উপবেশন করিয়া মস্তকে হস্ত প্রদান) রৌদ্রের সময় হেঁটে হেঁটে মাথাটা যেন ঘুরছে। (অন্যমনস্ক ভাবে অবস্থিতি)

নব। (জনান্তিকে, বুককিপারের প্রতি) আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করেছি এখন আমার একটা অনুরোধ আছে।

ভূ। (জনান্তিকে) কি বল।

নব। এরা গেলে হবে।

ভূ। বেশ। (উপবেশন)

নব। (স্বগত) তোমরা ভাব আমি ছেলেমানুষ আমি কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু হুঁ আমি থাকতে আমার প্রাণ থাকতে আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমার নিজস্ব যে তোমরা কেউ পাবে তা হবে না। ভাবতে গেলে চাকরী তালপাতার ছায়া। এখনকার লোকে বিষয়ের পরিমাণ দেখে কন্যার বিবাহ দেয়। বাবার চিঠি আনিয়েছি কেবল পাঠাবার অপেক্ষা। ওদের কথা ফেলবার আগে আমাদের বিবাহ হয়ে যাবে।

দী। তবে ভাই তোমাদের সঙ্গে কথা রইল আমি চল্লেম।

সকলের সহিত সেকহ্যাণ্ড করিয়া প্রস্থান।

ধী। (স্বগত) আঃ বাঁচলেম। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল। (প্রকাশ্যে) ভাই ভূপতি দীন বাবু কি অহঙ্কারী! এলেন আপনার গরজের কথা বলে চলে গেলেন। অন্য সময় ওঁরে দেখা পাওয়া ভার।

ভূ। আর ও কি রকম স্বভাব! ভদ্রলোকের অন্দরমহলের বাগান, সেখানে দৃষ্টি কেন! আমার ত দীন বাবুকে সচ্চরিত্র বলে বোধ হয় না।

ধী। (স্বগত) আমার সম্মতি জানিয়ে আজই একখানা চিঠি লিখে নরেন্দ্র বাবুর কাছে পাঠাই। আর বিলম্ব করা ভাল নয়। বোধ হচ্ছে দীননাথ তন্ময় হয়ে গেছে। ভূপতির ভাবভঙ্গিও কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। যাই হোক, যখন নরেন্দ্র বাবু নিজে আমাকে অনুরোধ করেছেন তখন সকলকেই হতাশ হতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমরা বেড়াতে যাবে না। আমি এখনি যাব!

ভূ। যান। আমার আজ বেড়ান হবে না। শরীরটা খারাপ আছে। (ধীরেন্দ্রের প্রস্থান।) (স্বগত) ঘরটা শীতল হলো। আমার মনটাও জুড়াল। ওদের উপর কেমন একটা বিদ্বেষভাব এসে পড়েছে! কিন্তু (চিন্তাপূর্ব্বক) আমি ওদের মনের কথা জানি না অথচ কত কি মনে করছি আশ্চর্য্য।

নব। আপনি দেখছি মহা ভাবনায় পড়লেন। কেনই বা দেখতে গেছিলেন? আর সেই মেয়েটার এমন কি মোহিনী শক্তি আছে যে আপনাদের মত বুদ্ধিমানকে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দেয়।

ভূ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে) তুমি তার কি বুঝবে? শুধু আজ এই প্রথম দর্শন নয় আরো দুই একবার দেখেছি। এমন নবকাঞ্চনমী মনোহারিণী—

নব। মশাই, আপনি এমন একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছেন যা পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হতে পারে। কারণ শুনেছি নরেন্দ্রবাবু কন্যার বিবাহের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন।

ভূ। কি করব বল। মন ফিরান আমার অসাধ্য। ঘটনাচক্রে সম্ভব অসম্ভব ও অসম্ভব সম্ভব হয়। যাক ওসব কথা। তুমি তখন কি বলতে চাচ্ছিলে বল।

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে স্বগত) তোমার আশার মূলচ্ছেদ শীঘ্র করতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আপনারা এক আফিসের। আমার পিতার একখানি অনুরোধপত্র যদি নরেন্দ্রবাবুকে দেন। আপনার হাতে গেলে অনেকটা বেশী কাজ হবে।

ভূ। কিসের অনুরোধ?

নব। আমার বিষয়ে কোন—

ভূ। (অন্যমনস্ক ভাবে) বোধ হয় তোমার চাকরির জন্য? তার ভাবনা কি? তোমার পাশের খবরটা বেরোলেই—

নব। খবর আমি পেয়েছি। এই দেখুন (পত্র প্রদর্শন) আপনি যদি নিতান্ত না যেতে পারেন বিশ্বাসী লোকের দ্বারা যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন। (পত্র প্রদান)

ভূ। তা দেব। তোমাকে অত অনুনয় করতে হবে না। এর সঙ্গে আমার একখানি অনুরোধপত্র দেব। ঠিক করে রাখি গে। প্রস্থান।

নব। আমার বড় রাগ হয়েছিল। বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়বে এ অসহ্য। বুড়োদের রকম দেখলে হাসি পায়। মনটা বড় অস্থির হয়েছে। যতদিন না বিবাহ হয়ে যায় ততদিন বুককিপার কি কেসিয়ার কারোর সঙ্গে দেখা করবো না। ওদের দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে। প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

নরেন্দ্রবাবুর গৃহ। চাটুয্যে ঘটক ও নরেন্দ্রবাবু।

ঘ। নরেন্দ্রবাবু, আজ আর আহ্লাদ রাখতে পারচি নে।

ন। কেন হয়েছে কি?

ঘ। আপনার কন্যার বিবাহ একপ্রকার ঠিক করে এসেছি।

ন। (ব্যস্তভাবে) কোথায়? কেমন পাত্র?

ঘ। পাত্রের কথা বলব কি? দক্ষিণ মহল্লার জমীদার। বছরে দু লাখ আয়।

ন। (সানন্দে) তাঁরা আমার মেয়ে দেখলেন না, কি করে—

ঘ। এখনি পাত্র নিজে আসবেন।

ন। আমাকে একটু আগে খবর দিতে হয়। বাড়ী সাজিয়ে রাখতেম মেয়েটাকে পরিষ্কার করে রাখা যেত।

ঘ। তোমার সে সব ভাবনা করতে হবে না। কন্যা সুন্দরী আর বাড়ী সাজাবার দরকার কি? একটু গরিবানা চাল ভাল বুঝলে না?

নব। বুঝেছি তবু—

ঘ। ওকথা যাক। পাত্রের বয়স কিছু বেশী হয়েছে কিন্তু—

ন। (চিন্তিতভাবে) কি বুড়ো না কি?

ঘ। বালাই বুড়ো কেন হবে? বড় জোর চল্লিশ। তোমার মেয়ে ১৪।১৫ বছরের হল অমানান হবে না।

ন। (মস্তকে হস্ত প্রদানে) তাইত !!

ঘ। তাইত কি? অমন বর তুমি পাবে না? কন্যার বিবাহ দিয়ে চাই কি তুমিশুদ্ধ রাজার হালে থাকবে। আর কন্যার কথা, হীরা মুক্তায় ভূষিত হয়ে রাজরাজেশ্বরীর মত সোণার খাটে মাথা, রূপার সিংহাসনে পা দিয়ে বসে থাকবে। কত দাস দাসী কেবল হুকুম তামিল করবে।

ন। কি জান ভাই আমার বড় অমত নেই তবে বাড়ীর মেয়ে ছেলেরা বুড়ো বরে নারাজ। ঘেনঘেনানি আরম্ভ করবে।

ঘ। সে ভয় কোরো না। আমি এমন সাজিয়ে আনব যে স্ত্রীলোক ছেড়ে পুরুষরাও মোহিত হবে। বেশ সম্বন্ধ তুমি মনে কোন দ্বিধা রেখ না।

ন। (নিশ্বাস ত্যাগে) আর ভাই দ্বিধা করেই বা কি করব? মনের মত সম্বন্ধ ত এ পর্য্যন্ত যোগাড় করতে পারলেম না।

ঘ। (কর্ণপাতে) ঐ বুঝি একখানা জুড়ী এসে লাগল না?

ন। ঘরে বসে থাকা আর ভাল দেখায় না। তাঁকে আগিয়ে নিয়ে আসি চলুন।

ঘ। না তুমি থাক আমি দেখছি। প্রস্থান।

জমীদারকে লইয়া প্রবেশ।

ন। (গাত্রোত্থানে সসম্ভ্রমে) আসতে আজ্ঞা হয়। (চেয়ার প্রদান) বসুন।

জ। (উপবেশন) আপনি বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ঘ। দেখুন গঙ্গাধরবাবু, নরেন্দ্রবাবু অতি সৎ, বিনয়ী, মিষ্টভাষী।

জ। আপনার নাম নরেন্দ্র বাবু?

ন। (উপবেশন) আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাম গুণাদি পূর্ব্বে শুনেছিলাম আজ চক্ষু সার্থক হল। আপনার পিতাঠাকুর কি বর্ত্তমান?

জ। নাঃ অনেকদিন তাঁকে হারিয়েছি। তিনি থাকলে আমাকে এত হাঙ্গামা সহ্য করতে হত না। বিষয় কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট আর ভাল লাগে না।

ঘ। তার সাক্ষ্য দেখ না। অমন যে সোণার মূর্ত্তি যেন কালী হয়ে গেছে। ওঁর বয়স বা কি? পূর্ব্বে ঠিক ২২ বৎসরের যুবা দেখাত এই কয় বৎসরে স্ত্রীবিয়োগে শোকে দুঃখে ২০ বছর বয়স বেশী করে দিয়েছে। নরেন্দ্র বাবুর কন্যাটীকে একবার দেখবেন কি?

জ। সে নরেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা। আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেম। এক নগরে বাস পরস্পর প্রীতিবন্ধন থাকা আমার একান্ত ইচ্ছা।

ঘ। আর সেই বন্ধনের সঙ্গে যদি মধুর বন্ধন হয় তাহলে ঠিক "ঘনদুগ্ধে শর্করাবৎ হবে। কি বলেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ন। তাহলে আমার সৌভাগ্য। উনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন মনে করতেও পারি না। তবে—

জ। আপনার সৌজন্যতা যথেষ্ট। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যাবেন।

ঘ। সব হবে। আগে আসল কাজ হোক না। (নরেন্দ্রের প্রতি) আমি যাব? না আপনি যান।

(নরেন্দ্র বাবুর প্রস্থান। ঘটকের কানে কানে কথা)

গঙ্গাধর বাবু দেখবেন আমার কথা সত্য কি না?

জ। (সহাস্যে) আমাটা পরে নিই কি বল। তাতে কি আমার চোখ খারাপ মনে করবে?

ঘ। এখন ষোল বছরের ছেলেরা চসমা চোখে দেয়। আপনার ভারী মুখে চসমা সাজবে ভাল। পোষাকটাও বেশ হয়েছে। বরের মত মানিয়েছে।

জ। হাঃ হাঃ হাঃ না হতেই ?

খ। বোধ হয় আসছে। (নেপথ্যে অলঙ্কারের শব্দ)

নরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ। পশ্চাতে প্রভার রৌপ্যপাত্রে জলখাবার হস্তে প্রবেশ।

ন। প্রভা উঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম কর।

জ। থাক আর প্রণাম করতে হবে না।

প্রভার অধোমুখে স্থিতি জমীদারের একদৃষ্টে নিরীক্ষণ, দর দর ঘর্ম্মপতন।

ঘ। দেখুন নরেন্দ্র বাবু "নব হরধ্যান ভঙ্গ।" সাক্ষাৎ গৌরী পুষ্পফল পাত্র হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আমি মদন (পশ্চাতে গিয়া হস্ত দ্বারা ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপের ভঙ্গি করিয়া) তাপস গঙ্গাধরের ধ্যানভঙ্গে নিয়োজিত। (নরেন্দ্র বাবুর ঈষৎ হাস্য) উঃ ধ্যানভঙ্গ প্রায়, আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে (করযোড়ে গঙ্গাধর বাবুর প্রতি)

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গির খে মরুতাং চরন্তি
তাবৎ সবহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষ মদনং চকার॥

ন। (মুখে রুমাল দিয়া হাস্য) ওরে রামা পাখা নিয়ে বাতাস কর।

ঘ। আর আপনি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ইষ্টসিদ্ধি দর্শনে আনন্দে অধীর। (গঙ্গাধরের প্রতি) দোহাই তোমার একেবারে ভস্ম কোর না। আমার কৃষ্ণবর্ণা রতি এখানে ঝাঁটা হাতে বিলাপ করতে আসতে পারবে না। ঘরে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। তাহলে আমি যে পথের ভিখারী হব। অন্তত গালাগাল দেবার লোক থাকবে না। (গাত্রোত্থান)

সকলের হাস্য ভৃত্যের ব্যজনকরণ।

জ। চাটুয্যে মশাই একেবারে কালিদাস হয়ে উঠেছ যে।

ঘ। ঘটক হতে গেলে কালিদাস হতে হয় বড় রামও সাজতে হয়, সব বিদ্যা চাই। কি বল নরেন বাবু!

ন। (হাসিয়া) তা বৈকি। প্রভাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না ?

ঘ। হাবা কি না দেখে নিতে হয়।

জ। তুমি জিজ্ঞাসা কর না হে।

ঘ। হাঃ হাঃ হাঃ। অমি বলব ? আপনি কনে দেখতে এলেন প্রধান ভার আমার উপর ?

জ। না না তা বলচি না। মেয়েটি দেখছি বড় লজ্জাশীলা। সেইজন্য। আচ্ছা আমিই বলছি। তোমার নাম কি ?

প্র। প্রভাময়ী।

জ। তুমি পড়তে জান ? কি বই পড় ?

প্র। বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

জ। ইংরাজী জান ?

প্র। আইভ্যান হো পড়ি।

জ। দেখুন নরেন্দ্র বাবু, আমার মতে স্ত্রীলোকদিগের ইংরাজী শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। তবে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে আপনি পিতার কার্য্য করেছেন।

ঘ। আর কেন ? এঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যান।

নরেন্দ্র বাবুর প্রভাকে লইয়া প্রস্থান।

ঘ। বরের নামগুলো আপনার মনে থাকবে ?

জ। তুমি কি মনে কর আমি মূর্খ ? যদিও কখন কোন পাশ করিনি কিন্তু নবেল দুচার খানা পড়া আছে।

ঘ। তাই ভাল। আমার ভয় হয়েছিল পাছে আপনাকে কনের কাছে হার মানতে হয়। এখন পছন্দ হল কি না বলুন।

জ। সে আর কি বলব ? ইচ্ছা হচ্ছিল এখনি বুকে করে নিয়ে বাড়ি যাই।

ঘ। হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তবেত আমার পাথরে পাঁচ কিল।

জ। দেখ চাটুর্য্যে আর তোমার হাসি আমার ভাল লাগে না। যত শীঘ্র পার একটা বিবাহের দিন দেখ। আমার এক লহনা একবৎসর মনে হচ্চে। (নরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

ঘ। নরেন্দ্র বাবুও তাই চান।

ন। আপনি কিসের কথা বলচেন ? (জমীদারের প্রতি) আমার কন্যা আপনার পছন্দ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

ঘ। উনি কি নিজমুখে বলবেন ! আমি বলি শুনুন। প্রভার প্রভা গঙ্গাধর বাবুর অস্থিমালা জটা পর্য্যন্ত আলোকিত করেছে।

ন। তবু উনি নিজমুখে একবার—

জ। আমি চাটুর্য্যে মশাইকে সব বলেছি।

ন। (সাহ্লাদে) আমি এতদিনে নিশ্চিন্ত। কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে হবে।

জ। আহার করেই আসা হয়েছে।

ঘ। সে কি হয় ? আপনার ইংরাজী পড়া ভাবী পত্নীর আনীত দ্রব্য, তার পর আমার অনুরোধ, ব্রাহ্মণ বাক্য অলঙ্ঘনীয়।

জ। (সহাস্যে) আচ্ছা। (সন্দেশের অংশ মুখে প্রদান)

ঘ। নরেন্দ্র বাবু এইখানেই কেন দিনটা স্থির করে ফেলা যাক না।

ন। আমার মত তাই। (উঠিয়া একখানা পঞ্জিকা প্রদান)

ঘ। দেখি। (পাঠ) এই যে বেশ দিন আছে। ২২শে ফাল্গুন সোম বার অর্থাৎ তরস্যু দিন। অতি উত্তম লগ্ন। রোস একটা বচন মনে পড়ে গেল।

তিথিংবারং স্বনক্ষত্রং মাসেরং যতং দিনং
একত্রং করিয়াং তারেং সাতেং করং হীনং
একেং লাভং, অর্থাৎ অদ্য কন্যাদর্শনং, দুয়েং সুখং,
অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তার নিশ্চিন্ততাং, তিনেং শত্রু ক্ষয়ং,
অর্থাৎ অর্থাৎ অর্থাতাং। চতুর্থেতেং কার্য্যসিদ্ধিং অর্থাৎ
আজ হইতে সোমবার চতুর্থ দিবস পড়েছে। পঞ্চমে সংশয়ং
বিলম্ব উচিত নয়ং।

নরেন্দ্রবাবু বিদায়টা ঠিক রাখবেন। রাজা জামাতা পেলেন আর অধিক কি বলব। (গাত্রোত্থান)

ন। (সহাস্যে) হবে হবে।

জ। এখন যাওয়া যাক। সকলের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

প্রহসন।

অষ্টম দৃশ্য।

নরেন্দ্র বাবুর অন্দরস্থ গৃহ। জ্যেঠাইমা সন্ধ্যায় প্রবৃত্তা।

উড়ে ঝি। বড় দিদি ঠাকুরাণ, ভ্যা ভ্যা এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা ই ই ই ই ই রে।

জে। কি হয়েছে বুড়ী কাঁদচিস কেন?

উ। হঃ-হঃ-হঃ-হঃ-হঃ-অঃ-অ-অ-অ-অ আঁ আঁ আঁ আঁ।

জে। আরে মোলো কেঁদে কেঁদে গেলি যে। কি হয়েছে বল না?

উ। মু কাঁদিমি না কাই করি মি? হিঁ ই ই ই ই ই ই।

জে। কেউ কি তোকে কিছু বলেছে? কি করে বুঝব কেন কাঁদচিস। বুড়ো মাগী এক সং।

উ। (সরোদনে) তিমিত দেখিমি না। চক্ষে দেখিকিড়ি আইলা তাই আঁখি ফাটিকিড়ি জড় বাহিড়িলা।

জে। প্রভা কোথায়?

উ। বালাই মোড় পিড়ভা ভাত খাইকিড়ি খেড় কড়িতে লাগিলা।

জে। তবে কি ভাল করে বল এইখানে বোস স্থির হ।

উ। (উপবেশন) কড়তা বাবু পিড়ভার যে বড় ঠিক কড়িলা মু দেখিকিড়ি আইলা।

জে। (সোৎসুকে) কেমন বরটি রে?

উ। কেম-ড়-বড়-টী-রে? ভ্যাঁ ভ্যা এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ উঁ।

জে। মরণ আর কি!

উ। মোড় মড়ন নাই। (চক্ষু মুছিয়া) সোনার পিড়ভার বুড়া বড় হইলা।

জে। (বিস্ময়ে) বুড়ো—বর! বলিস কি রে?

উ। মু কাঁই মিছা কথা কহিমি?

জে। হ্যাঁরে ঝি তার চুলগুলো কি সব সাদা? ঠাকুরপো বল্লে একটু বয়স হয়েছে বটে কিন্তু দেখতে বেশ। তাই আমি রাজী হয়েছি।

উ। মু যে টিকে দিন ঐ বাবুর বাড়ী কাম কড়িথিলা মু যে জানি লা পঁচাশ ষাট পাক্ক হই গেলা।

জে। ও বাবা! হীরের গুড়ো প্রভা আমার বুড়োর হাতে! আমি বেঁচে থাকতে? ঠাকুরপো এদিকে আমি যা বলি শোনে আর প্রভার বিয়ের কথা শুনবে না। আজ যদি এখানে প্রভার মা থাকত তা হলে আছড়ে পড়ত। আমি মানুষ করেছি প্রভা আমার। ঠাকুরপো আমার কথা অবিশ্যি শুনবে।

উ। পিড়ভা তোড় ঝিয়ারি মোড় কলজেড় ঝিয়ারি। বাবু যদি ঐ বুড়োটার সাথে পিড়ভার বিয়ে দিবে, মু মাথা ফাটায়ে কিড়ি কাঁদিবা। আঁখিড় রকত বাড় করিবা।

জে। আর কাঁদিস নি। চল আমরা দুজনে ঠাকুরপোর কাছে যাই। দেখি কি হয়।

উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

নরেন্দ্র বাবুর বহির্দ্দিকস্থ গৃহ।

দুই ভ্রাতায় উপবিষ্ট।

ন। ভাই আজ তুমি এসেছ ভাল হয়েছে। তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে।

একজন চাকরের প্রবেশ।

চা। বাবু একজন চাপরাশী এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

ন। টেবিলে রেখে যা।

হ। আপনি নাকি প্রভার বিবাহের সমস্ত স্থির করেছেন।

ন। ঠিক—হ্যাঁ—একরকম—বটে।

পুনরায় ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। বাবু ডাকপিয়ন এই বড় পত্রখানা এনেছে।

ন। দেখি। বড় জরুরি পত্র।

ভৃত্যের প্রদান ও প্রস্থান।

হ। দাদা, আজ যে চিঠিতে চিঠিতে স্তূপাকার হয়ে উঠল।

ন। বড় মুস্কিলেই পড়েছি।

হ। কেন আবার কি হল?

ন। এই দেখ না কতগুলো চিঠি জড় হয়েছে। আমি পারিনে তুমি পড় ত ভাই। সকালে কতগুলো এসেছে আবার এখন।

কেসিয়ারের প্রবেশ।

হ। আপনি বসুন। আপনারা সকলে এসেছেন দেখলে দাদা মহাশয় কত আহ্লাদিত হবেন। (স্বগত) সকলকেই আনন্দিত দেখছি, কিন্তু— হরেন্দ্রের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

হরেন্দ্রের গৃহ।

হরেন্দ্র ও তাহার বন্ধু বরেন্দ্র।

হ। চলনা দালানে একধার বসবে।

ব। না ভাই কেন আমাকে বৃথা অনুরোধ করছ ?

হ। কেন ভাই এতে দোষ কিছু দেখি না। ভদ্রলোক বসবে—

ব। (হাসিয়া) ওরা হয়ত মনে করবেন আমি ওদের একজন প্রতিদ্বন্দী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

হ। (স্বগত) তুমি আমাকে ঠকাবে ? আমি তোমাকে ঠিক ধরেছি। আজ দুদিন ধরে তোমার পরীক্ষা করছি যদি না তুমিও পড়ে থাক তা হলে তা হলে আমি যে এম ডি এক-জামিন দিয়েছি সে সব মিথ্যে। (প্রকাশ্যে) ওরা তা কখনই মনে করবেন না। আর যদিই বা তাই হয় তা হলেই বা কি ?

ব। কেন ভাই এত জেদ ? এলেম ষ্টুডেনসিপের টাকা আদায় করতে, ধরে রাখলে আচ্ছা তাই। আবার অন্য কথা এখন কেন ভাই ?

হ। আমি দাদাকে ডেকে আনি। তিনি বলেন নি বলে বুঝি তোমার মন উঠছে না।

প্রস্থান।

ব। হরেন শোন শোন—চলে গেল। আমি যে কেন যেতে চাচ্ছি নে তার তুমি কি বুঝবে ? আমি যে কি জন্য তোমাদের বাড়ী এসেছি তার তুমি কি জান ? থাকতে বললে অমনি চোরটীর মত আজ্ঞা পালন করলেম মানে কি নেই ? হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু এখনও ঘরের ভিতর স্থির হয়ে রয়েছি এটা তুমি ত তুমি স্বয়ং বিধাতা ভিন্ন আর কেহ জানেন না জানবেনও না। আজ সে এক বছরের কথা একটীবার এখানে এসেছিলেম, একবার মাত্র দেখেছিলেম। সেই অবধি সে দেবীমূর্ত্তি এ পাষাণে খোদিত হয়ে গেছে। কাল পুনর্ব্বার বহুদিনের পর সেই প্রিয়দর্শন। প্রাণ আকুলিত হয়েছে। যখন প্রভা সভায় যাবে তখন অন্তরাল থেকে প্রাণভরে একবার দেখে নেব এইমাত্র বাসনা। তাতে তুমি আর বঞ্চিত করো না। ভাই হরেন, জানি প্রভা আমার হবে না। বড় বড় মহারথী যে জন্য লালায়িত আমি কোন পুণ্যফলে সে আশা রাখব তবু মন বুঝচে না। (বরেন্দ্র চিন্তামগ্ন)

নরেন্দ্রবাবুর প্রবেশ।

ন। (হস্তধারণে) এস বরেন দালানে বসবে চল। এখানে একা কেন? উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

হরেন্দ্রের গৃহ হরেন্দ্র ও প্রভা।

হ। প্রভা, আমার কথা শুনবিনে?

প্র। কাকা বাবু—

হ। কাকাবাবুকে এত ভালবাসিস এত মান্য করিস আর আজ একটা কথা রাখবিনে?

প্র। কাকাবাবু, আপনি কি বলছেন? আমি সে প্গারব না আর যা বলবেন সব শুনব।

হ। আচ্ছা তোমাকে কিছু করতে হবে না। শোভাকে দিয়ে যে কাগজ গুলো দিয়েছিলেম সব পড়া হয়েছে।

প্র। (অধোমুখে) হয়েছে।

হ। তবে সকলিত জেনেছ। তাতে ছজনের রূপ গুণ বিদ্যা ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয় আশয় যা কিছু সব লেখা আছে। অবশ্যই তার মধ্যে কোনটী না কোনটী তোমার বরণীয়। তবে আমাদের মতে বরেন্দ্রই যোগ্যপাত্র।

প্র। (নীরব)

হ। দেখ প্রভা। আর কিছুর জন্য নয়। আমি লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করে জেনেছি, দাদা যাকে বঞ্চিত করবেন সেই তাঁর পরম শত্রু হবে। গঙ্গাধর রায়ের বংশ দেশে আমাদের কত শত্রুতা করেছিল জানত। তোমাকে বিবাহ করতে না পেলে সে শত্রুতা ভয়ানক বৃদ্ধি হবে। আর দেখছ দাদার এক আফিসের চারজন। যেন সকলে ষড়যন্ত্র করে তোমার হস্তপ্রার্থী হয়েছে। এরাও যে কম তা মনে কোর না। তবে সামান্য ইতর-বিশেষ আছে মাত্র। দাদাও ভেবে অস্থির। তাই আমি এই উপায় করেছি। যদি তোর মনোনীত নয় বলা যায় তা হলে আমাদের অপরাধ হয় না।

প্র। (অধোমুখে নিম্নস্বরে) আমি একটীবার মাত্র দু মিনিটের মত যাব। কিন্তু আমার সঙ্গে শোভা আর বিভা থাকবে। তারা যা করবে তাই হবে।

হ। সেই ভাল আমি তাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই। প্রস্থান।

উড়েণী ঝির প্রবেশ।

উ। বড় দিদি ঠাকরাণ কাঁই গেলা? হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। পিড়ভায় কড বড় আসিথিলা টিকে দেখিলা না। হঃ হঃ হঃ হঃ হঃ।

জ্যেঠাইমার প্রবেশ।

জ্যে। ও বুড়ী শীঘ্র শীঘ্র আয় আয়।

উ। মোড় বড় হাসি পাইলা মু কাম কড়িতে পারিমি না। হা হা হা হা হা।

জ্যে। (সহাস্যে) এর পর হাসিস। খাবারের জায়গাগুলো করে রাখবি চল।

উ। মোড় হাসিকিড়ি নাড়ী ফাটি গেলা। টিকে সবুড় কর। এখন মোড় মাথা ফাটিয়ে কিড়ি ফেলিলে মু ঘিমি না। হি হি হি হি হি হিঃ।

জ্যে। আরে প্রভা ডাকছে।

উ। পিড়ভা! বটে চল। উভয়ের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

সভা প্রাঙ্গন।

সকলে উপস্থিত। নরেন্দ্র বাবু ও প্রভার প্রবেশ।

ন। প্রভা, ইহারা সকলেই তোমার বিবাহ করিতে অভিলাষী সকলেই প্রায় রূপে গুণে সমতুল্য। (হস্ত দ্বারা মুখোত্তলন) একবার দেখ মা জননী কোনটি তোমার মনোনীত।

প্র। (অধোবদনে স্থিতি)

শো। (জনান্তিকে) বাবা, দিদিমণি লজ্জা করচে আপনি একবার ঐ দিকে যান।

নরেন্দ্র বাবুর প্রস্থান।

নব। (স্বগত) এ পাপগুলো কোথা হতে জড় হলো? আমি এর পূর্ব্বে কিছু জানতে পারিনি।

ভূ। (স্বগত) বড় বড় নক্ষত্রের কাছে আমি ক্ষুদ্র আলো মিটমিটে হয়ে গেলাম। তবে আমার একটী আশা প্রভার মাতামহের অনুরোধ অবশ্য পালনীয়।

ধী। (স্বগত) দেখছি আমার নিতান্ত দুরাশা। শুনেছিলেম কোন সম্বন্ধ হয় নাই আর আজ একেবারে ছজন কি আশ্চর্য্য! কিন্তু ছজনের মধ্যে সেই যে ভাগ্যবান সে কে আমি? ঈশ্বরের ইচ্ছায় গরীব ধনী হয় ধনীও গরিব হতে পারে। আমি তাঁরি স্মরণ করি।

কে। (স্বগত) চক্ষে দেখেও সুখ। এত রূপ! এত নম্রতা! যেন লজ্জামাখান মাধুরী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী। প্রতিদন্দ্বীদের মধ্যে আমি কি সকলের অপেক্ষা অমনোনীত কিসে? স্ত্রীলোক বৃদ্ধ ও বালক অপেক্ষা যুবাকে মনোনীত করে। বোধ হয় আমার যুক্তি বিফল হবে না।

জ। (স্বগত) এস প্রিয়তমে, আর কেন দূরে দাঁড়াইয়া, এস প্রাণে প্রাণে মিশে যাই। এই কন্টকগুলো কি তোমার পায়ে বিধছে? তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হয়ে বোস, [illegible]

কোন ছার, গ্রামকে গ্রাম নগরকে নগর উৎসন্ন করে দেব। শুধু তুমি একবার আমার বামে দাঁড়াও তোমার মোহিনী চক্ষু দুটী হৃদয়ের ছাঁচে তুলে নিই। মালা ছড়াটা গাঁথতে তোমার কচি চম্পকাঙ্গুলিতে কত লেগেছে। না না আনন্দেই গেঁথেচ। কারণ সে যে আমার জন্য। যখন তুমি আমায় পরাবে তখন এই অর্ব্বাচীনগুলো জানবে কি দুঃসাহসে এখানে এসেছে। গঙ্গাধর রায়ের নয়নের মণি হৃদয়ের প্রাণ আঁধারের আলো চক্ষে দেখ্‌লি এই তোদের পরম ভাগ্য।

ব। (ম্লানভাবে স্বগত) আমি কি প্রভার যোগ্য? না না এ যে স্বর্গের জিনিষ।

শো। (মৃদুস্বরে) দিদিমণি এস না। এখনও কি তোমার দেখা হয়নি?

প্র। (মৃদুস্বরে) ভাই শোভা, আমার হয়ে তুই মালাটা নে।

শো। (মৃদুস্বরে) দূর, তোমার বে আমি মালা দেব বাঃ!

প্র। না ভাই আমি পারবো না। আমার হাত কাঁপচে।

শো। আচ্ছা তোমার হাতটা ধরে দেব, কোনটী?

প্র। (মুখ ঈষৎ উন্নত করিয়া বরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত)

শো। (মৃদুস্বরে) ওই সর্ব্বের ধারেরটী? (মালা নিক্ষেপ)

উড়েনী ঝিয়ের প্রবেশ।

উ। হঃ হঃ হঃ হঃ হঃ হঃ হঃ। শোভা আর পিড়ভাকে দিদি ঠাকুরাণী ডাকিলা। (গমন করিতে করিতে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ পিড়ভা আমাড় চন্দড়মুখী। পিড়ভা আমার লাভণনিধি। পিড়ভা আমার ফুলকুমারী।

তিনজনের প্রস্থান।

ন। (বরেন্দ্রের প্রতি রাগতভাবে) তুমি কোথা থেকে হে? বিনা নিমন্ত্রণে এসেছ দেখছি।

ব। (সহাস্যে) আজ্ঞে না।

ভু। (রাগতভাবে) তুমিত বড় বেয়াদপ দেখতে পাচ্ছি। নরেন্দ্রবাবুর পরিবার সমস্যায় তুমি অপরিচিত হঠাৎ এখানে কেন?

ধী। (সক্রোধে) হরেন্দ্রবাবু, যদি অপমানিত করবার ইচ্ছা হয়েছিল নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি?

ধী। (ক্রোধবিদ্বেষে) আমি জানি এ বাটীর কেহ ভদ্রলোকের সম্মান জানে না সে জন্য প্রথমে ঘটককে দূর করেই দিয়েছিলেম। কি গ্রহের ফের তাই আজ এখানে আসতে ইচ্ছা হয়েছিল।

জ। (দৃঢ়স্বরে) নরেন্দ্রবাবু কোথায় আমি তাকে দেখতে চাই। সে ত আমার প্রজা আমার দাসানুদাস তার কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেম এই তার দেবতার বর। তাতে আবার এত জুয়োচুরি।

ব। (ক্ষুণ্ণভাবে) কেন একটী নিরপরাধ ব্যক্তিকে গালাগালি দিচ্ছেন ? তাঁর দোষ কি ?

ন। (পূর্ব্ববৎ) দোষ কি ? তুমি চুপ কর খোসামুদে। আর জায়গা পাও নি এখানে এসেছ চালাকি করতে।

ভূ। নবকিশোর ঠিক বলেছে। যদি এইরূপ মনের ভাব স্পষ্ট বলে পাঠালেই হত। নরেন্দ্রবাবুকে অতি ভদ্রলোক বলে জানতেম কিন্তু এখন দেখছি বিড়াল তপস্বী।

ব। আপনারা যে অতি ভদ্র তা ত কথাবার্ত্তায় দেখছি।

ধী। তোমার ফোড়ন দেবার দরকার ? স্ত্রীলাভ করেছ চুপ করে থাক বেশী কথা কইলে ভাল হবে না।

দী। জানি আমি সব জানি। সেইজন্য এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নি। যেখানে সম্বন্ধ আসে ভেঙ্গে যায়।

ব। বড় বেশী দূর গড়াচ্ছে। রাগে অন্ধ হয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছেন যে।

ন। বেশী দূর গড়িয়ে দিই এসনা। নিতান্ত দুর্ব্বল নই।

ভূ। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছ দেখা যাক ওঠ বিলম্ব কেন ? (পিরানের অগ্রভাগ গুটান)

ধী। তাই ভাল। তোমাকে কি গুণে যে নরেন্দ্রবাবু জামাতা করলেন একবার পরীক্ষা করা মন্দ নয়।

দী। আমার কাছে এমন জিনিষ আছে একেবারে নিকেশ করতে পারি। দুঃখের বিষয় পরের বাড়ী (সক্রোধে) যাই হোক আমার আর সহ্য হচ্ছে না। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করণ)

জ। (ক্রন্দনের সুরে) ওগো কি হবে গো আমার প্রভাকে এনে দাও গো !!!

ন। (ক্রুদ্ধভাবে) কি এত লোককে কাঁদিয়ে তুমি সুখী। (কীল উত্তোলন) চল রাস্তায়।

ধী। ষ্টুপিড ড্যাম চুপ করে রয়েছে যেন কিছুই জানে না। চড়ের বহরটা দেখে রাখ। যেমন এখান থেকে রাস্তায় বেরবে যা হয় একটা শেষ করব। (চড় প্রদর্শন)

দী। আজ তোরি একদিন কি আমারি একদিন। (পিস্তল ছুড়িবার উপক্রম)

ভূ। (ক্রোধে কেশ উৎপাটনে) এখানে মিছে গোল করলে কি হবে ? বেরিয়ে পড়া যাক।

জ। ওহে ঐ বুঝি প্রভা আমার কাঁদচে। আমায় চিনতে না পেরে আর কার গলায় মালা দেছে। (রোদন করিতে করিতে চেয়ার শুদ্ধ পতন)

সকলের হুড়মুড় করন হরেন্দ্রের বরেন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান।

(সকলের ক্রন্দন)

শোভার গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।

শো। বাহবা কেমন মজা বাহবা কেমন মজা।
নতুন জামাইবাবুর হয়েছে মতন সাজা॥
কেউ তোলে কীল, কেউ তোলে চড়
কারো বা মাথায় বেঁধেছে রগড়
পিস্তল ছোটে কড় কড় কড়
আমোদখানা দেখে যা॥
আয় সহচরী, আয় ত্বরা করি
একা হেসে মরি, সঙ্গে বাজা॥

(বিভার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

বি। আহা দেখ দেখ, না পরে পলক,
বিঁধেছে মরম নিরাশা বাণে।
কেহ আত্মহারা, কেহ মত্তপারা
বহে অশ্রুধারা, বিষণ্ণ বয়ানে॥

শো। হেথা দেখ ভাই, একিরে বালাই
প্রকাণ্ড হাঁ করা, বিষম বুড়ো।

বি। আহা, বিবাহের আশে, এসেছিল সে,
নববর বেশে, কুপোকাত শেষে,

উভয়ে। (হাস্যের সহিত)
মরি দেখে হাসি পায় খেদে গড়া গড়ি যায়
বুঝি হয়েছে বা হায় চেয়ার সমেত হাড়টি গুঁড়ো!
প্রভা পেলেছ গো বেশ, প্রাণের আদেশ,
সেজেছেও বেশ যেন ফুলরাণী সনে ফুলের রাজা॥

সম্পূর্ণ।

মুসলমানের অবরোধ।

বঙ্গদেশে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে। যত দক্ষিণে আসা যায় তত দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্রমে ক্রমে অবরোধের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। এমন কি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলের হিন্দু মহিলারা অবরোধ কাহাকে বলে জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলে বোধ হয় এ কথা স্বীকার করেন যে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা মুসলমানদের হইতে আসিয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এ দেশে যে অবরোধ প্রথা ছিল না তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে দাক্ষিণাত্যে কখনই স্ত্রী-স্বাধীনতা লোপ পায় নাই,—কারণ, মুসলমানেরা কখনই এ প্রদেশ ভাল করিয়া হস্তগত করিতে পারেন নাই।

অনেকেরই ধারণা যে স্ত্রীলোককে "পর্দ্দায়" রাখা মহম্মদের আদেশ, এবং ইহা মুসলমানগণের ধর্ম্মাদেশ! আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইব যে এই সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আমরা প্রসিদ্ধ আর্বী গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ করিব যে স্বয়ং মহম্মদ "পর্দ্দার" পক্ষপাতী ছিলেন না। মহম্মদের সময়ে ভদ্র স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া অসঙ্কোচে ভ্রমণ করিতেন, সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ একত্রিত হইয়া গল্প করিতেন, ভদ্র মহিলারা পুরুষের সহিত শেক হাণ্ড করিতেন, অধিক কি, মহিলারা পুরুষের সম্মুখে গীত বাদ্যাদিও করিতেন। "পর্দ্দা" কিম্বা "জনানা" কাহাকে কহে, মহম্মদের সময়ে তাহা কেহ জানিত না।

মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বিচার করিতে হইলে প্রথমে কোরাণ এবং তৎপরে হদিসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন দেখা যাক "পর্দ্দার" বিষয়ে কোরাণে কি আছে:—ঈশ্বর কহিতেছেন:—

(কোরাণ সুরাতুন্ নুর রুকু ৪)

ওলায়ুব্দিনা জিন্নত হুন্না ইল্লা মা জহরা মিন্হা ইত্যাদি।

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উচিত নহে তাহাদের জিনত (রূপ) কাহাকেও দেখান, অনাবৃত অংশ ব্যতীত। কিন্তু স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতষ্পুত্র, ভাগিনেয়, মুসলমান স্ত্রীলোক, দাস দাসী (মম্লুক্ অর্থাৎ গোলাম) এবং বালক বালিকার সম্মুখে জিনত লুকাইবার আবশ্যক নাই।

কেবল আবৃত জিনত দেখাইতে বারণ করা হইয়াছে, অনাবৃত জিনত কেহ দেখিলে আপত্তি নাই।

জিনত দুই প্রকার। জিনত বাতিনা অর্থাৎ আবৃত সৌন্দর্য্য, এবং জিনত জাহিরা অর্থাৎ অনাবৃত সৌন্দর্য্য।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে অনাবৃত জিনত দেখাইতে নিষেধ নাই। এখন দেখা যাউক জিনত জাহিরা (অনাবৃত সৌন্দর্য্য) বলিলে কোন কোন অঙ্গ বুঝায়।

প্যাগম্বরের জামাতা আলির মতে জিনত অর্থে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক রূপ এবং গহনাদির সৌন্দর্য্য সমষ্টি।

কিন্তু কেবল জিনত শব্দের অর্থে গোলমাল মিটিবে না। জিনত্ জাহিরা এই বাক্যটির ব্যাখ্যার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

প্রসিদ্ধ ইব্‌ন্-ই জরির এবং হুব্‌র্-ই-মন্‌সুরের মতে জিনত্ জাহিরা অর্থে মুখ এবং হস্তের মেহ্‌দি বুঝায়।

মেহ্‌দি আলতার ন্যায় এক প্রকার রং। মুসলমান মহিলারা হাতে পায়ে এবং অন্যান্য অঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত দুই গ্রন্থকার বলেন যে, স্ত্রীলোকে তাহার জিনত্ জাহিরা যে কেহ বাটীতে আইসে তাহাকেই দেখাইতে পারেন, অর্থাৎ মুখ এবং হাত লুকাইবার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয় খলিফের পত্র আবদুল্লাও বলিয়াছেন যে, জিনত্ জাহিরা অর্থে মুখ এবং হাত বুঝায়। ইব্‌ন্-ই-অবিশেবা এবং অব্‌দ্ বিন্ হুমেদ প্রভৃতিও ইহাই বলেন। অন্যান্য অনেক গ্রন্থেও "জিনত্ জাহিরার" এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, স্থানাভাবে এখানে উল্লেখ করা গেল না।

এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কোরাণের উল্লিখিত বচনটি হইতে কোন ক্রমেই প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বর স্ত্রীলোককে "পর্দ্দায়" রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। যখন মুখ হাত দেখাইতে বারণ নাই, তখন আর "পর্দ্দা" কোথায়?

কেহ কেহ বলেন যে যদি ঈশ্বরের আজ্ঞার "পর্দ্দার" অর্থ না হইত তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষের নিকট একেবারেই জিনত না লুকাইতে বলিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। সকল সমাজেই ব্যক্তিবিশেষের সহিত ব্যবহারের তারতম্য আছে। কাহাকেও বা অধিক বিশ্বাস করা হয়, কাহাকেও বা অল্প, কাহারও সম্মুখে অধিক সাবধানতা, কাহারও নিকট বা অল্প, ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। এই নিয়মটি যে আপেক্ষিক বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ মুসলমান মহিলা কেবল মুসলমান স্ত্রীলোকের সম্মুখে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারেন, কাফের স্ত্রীলোকের নিকটেও নহে।

কোরাণে আর একটি বচন আছে তাহার উপর "গোঁড়া" মৌলবীরা অবরোধ প্রথার ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঈশ্বর আদেশ দিতেছেন :—

(কোরাণ, সুরাতুল্ আহ্‌জাব্, রুকু ৭)

য়া আইয়ু হল লজিনা * * * * * অবদা। অর্থাৎ, যখন তুমি পেগম্বরের স্ত্রীর নিকট হইতে কোন দ্রব্য চাহিতে যাও, পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে চাহিও।

মৌলবী বলিবেন যে, রূপের কথা শুনিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে কি হইত? ইহার উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে গণক ডাকাইয়া খড়ি পাতিয়া রূপ গণিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছার কথা আমরা কখনও শুনি নাই এবং বুঝিতেও পারি না।

এই ত গেল কোরাণে অবরোধের কথা। এখন দেখা যাঁক হদিসে কি আছে। হদিস্ অর্থে মহম্মদ কি বলিয়াছেন এবং কি করিয়াছেন উভয়ই বুঝায়। বলা বাহুল্য যে প্যাগম্বরের কথা অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাই বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে মহম্মদের আদেশ হইতে "পর্দ্দা নাই', এ কথা প্রমাণ করিতে আমরা অক্ষম। প্রথমে দেখা যাক্ মহম্মদ কি বলিয়াছেন।

সইদ ইবন্-ই-মনসুর, ইবন্-ই-জরির এবং দুরস্-ই-মন্সুর লেখক বলেন যে; প্যাগম্বর-পত্নী আয়েশা বলিয়াছেন যে, একবার তাঁহার নিকট তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসিয়াছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ মহম্মদ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই যুবতীকে উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত না দেখিয়া মহম্মদ বলিলেন, যুবতীর উচিত নহে, মুখ এবং হাত ব্যতীত অন্য অঙ্গ পুরুষকে দেখান।"

আবুদাউদ বলেন যে, একবার মহম্মদের শ্যালীকা অস্মা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া মহম্মদের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহম্মদ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "যুবতী স্ত্রীলোকের মুখ এবং হাত ব্যতীত অন্য অঙ্গ পুরুষকে দেখান অন্যায়।"

হদিসে মহম্মদের এ প্রকার অনেক আদেশ আছে, স্থানাভাবে অধিক উল্লেখ করা গেল না। উপরোক্ত দুইটি হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে মহম্মদ স্ত্রীলোককে মুখ এবং হাত অনাচ্ছাদিত রাখিতে বলিয়াছেন। সুতরাং পেগম্বরের আজ্ঞাই "পর্দ্দার" মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে!

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে মহম্মদের সময়ে (১) স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে ভ্রমণ করিতেন, (২) সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া গল্প করিতেন, (৩) ভদ্র মহিলারা পুরুষের সহিত কর-মর্দ্দন (shake hands) করিতেন, অধিক কি, (৪) মহিলারা পুরুষের সম্মুখে গীত বাদ্যাদিও করিতেন। আমরা এই পরম্পরা ক্রমে হদিসের সাহায্যে চারিটি কথা সপ্রমাণ করিব।

স্ত্রী ও পুরুষের একত্রে ভ্রমণ।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আবুদাউদ ও ইমাম আহ্মদে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৈবর যুদ্ধের সময়ে একটি ঘিফার যুবতী মহম্মদের নিকট আসিয়া যুদ্ধে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। পেগম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেখানে কি করিবে?" ঘিফার যুবতী উত্তর করিল, "আমি রোগী ও আহতদিগের সেবা করিতে ইচ্ছা করি।" মহম্মদ ইহা শুনিয়া ঐ যুবতীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। যুবতী যুদ্ধক্ষেত্রে সহযাত্রী হইল। সেকালে কোন প্রকার শকট

ইহা হইতে "বিজ্ঞ" মহাশয়েরা কি প্রকারে যে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি করিলেন তাহা ত' আমরা বুঝিতে অক্ষম। যদি আহ্‌জাব্ (পর্দ্দা) শব্দ আছে বলিয়াই "পর্দ্দার" ভিত্তি হয়, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার আবশ্যক থাকে না।

পেগম্বরের স্ত্রীর কাছে কোন দ্রব্য চাহিতে গেলে হুট করিয়া ঘরে ঢুকিও না, এইমাত্র ঈশ্বর আদেশ দিয়াছেন। ইহা হইতে যিনি পেগম্বর পত্নীর এবং সমস্ত স্ত্রীজাতির অবরোধের ব্যবস্থা দিলেন, তিনি অবশ্যই একজন বিচক্ষণ লোক। ইংরাজ মহিলাদের ভিতর অবরোধ প্রথা নাই, কিন্তু তাঁহাদের কক্ষে কাহারও প্রবেশাধিকার আছে কি? ইংরাজ মহিলার কথা দূরে থাক, পুরুষেরও ঘরে কার্ড না পাঠাইয়া প্রবেশ করিলে অর্দ্ধচন্দ্র খাইতে হয়। দুই শতাব্দীর পরে হয়ত এমন কোনও "বিজ্ঞ" ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে যিনি বলিবেন যে, সে কালে ইংরাজ পুরুষেরা "জেনানায়" আবদ্ধ থাকিতেন।

বলা বাহুল্য যে সভ্য সমাজে এমন লোক অতি অল্প যাঁহার গৃহে দিবারাত্রি অপরিচিত লোক প্রবেশ করিলে, বিরক্ত না হন। পেগম্বর-পত্নীর বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? মহম্মদ-পত্নীকে অথবা বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যে ঐ আদেশটি হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন।

কোরাণে "পর্দ্দার" কথা আর কোথাও উল্লেখ নাই। উপরোল্লিখিত দুইটি বচন হইতে কোন ক্রমেই ইহা প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বর স্ত্রীলোককে অবরোধে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। বরং কোরাণের আর একটি বচন হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে পুরুষে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলে কোনই দোষ হয় না।

ঈশ্বর মহম্মদকে বলিতেছেন ঃ—

লা ইয়াহিল্লো লকন্নিসাও মিম্‌বাদো ওলা অন্ তবদ্দলা বিহিন্না মিন্ অজওয়াজিন্ ওয়াল ও আজবকা হুসনু হুন্না।"

অর্থাৎ—মহম্মদ, তোমার আর বিবাহ করা উচিত নহে, অন্য স্ত্রীলোকের রূপ তোমার পছন্দ হইলেও—ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের মুখ না দেখিলে রূপ পছন্দ হইবে কি প্রকারে? কেবল কটা রং হইলেই আরব দেশের সুন্দরী হয় না। আরবদের পছন্দটা কিছু মাড়োয়ারি ধরণের। স্থূলাঙ্গী হওয়া চাই, হস্ত ও পদ মেহ্‌দি রঞ্জিত এবং (বোধ করি) দাঁতে মিসি দেওয়ারও প্রয়োজন করে। মুখ না দেখিয়াই যে মহম্মদের অনুরাগ জন্মিবে এ কথা, বোধ হয়, আদেশ দিবার সময়ে ঈশ্বরেরও মনে হয় নাই, নতুবা তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইত। অধিক কি, যদি মহম্মদের সময়ে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা না থাকিত, তাহা হইলে "পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করিও না" বলিলেই ত' সব মিটিয়া যাইত। মুখ না দেখিলে ত আর অনুরাগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। হয় ত কোন যুক্তি (নৈয়ায়িক) ছিল না। আরব দেশে উষ্ট্রই গতিবিধির একমাত্র উপায়। পেগম্বর স্বয়ং যে উষ্ট্রে আরোহণ

করিলেন, ঐ ঘিফার যুবতীকেও সেই উষ্ট্রোপরি নিজের পশ্চাতে বসাইয়া সংগ্রামস্থলে লইয়া গেলেন। খৈবর যুদ্ধ শেষ হইলে পুরস্কার স্বরূপ মহম্মদ স্বহস্তে ঐ যুবতীর গলায় হার পরাইয়া বিদায় দিলেন।

উষ্ট্রপৃষ্ঠে যুবতী লইয়া স্বয়ং পেগম্বর যখন ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন আর "পর্দ্দা" কোথায় ? ইহা ফিটনে চড়িয়া গড়ের মাঠে বায়ু সেবন করা নহে। উষ্ট্রোপরি দুইজন বসিলে গাত্র সংঘর্ষণ হইবেই, বিশেষতঃ আরবের ন্যায় পার্ব্বতীয় প্রদেশে যে সেইরূপ ঘটিবে তাহাতে আর সংশয় কি। এ স্থলে এ বিষয়ে আমাদের নিজের মত না লিখিয়া পেগম্বরের সর্ব্বপ্রধান পত্নী আয়েশা যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাউক।

ইবন্-ই-সাদ্ বলেন যে, আয়েশা তাঁহার ভ্রাতার সহিত উষ্ট্রারোহণে ভ্রমণান্তে বলিলেন—

"ফতোসিবো ওয়াজহি জহরা অখি"—অর্থাৎ আমার মুখ আমার ভাইয়ের পৃষ্ঠদেশে লাগিতে লাগিল।

এখন বোধ হয় কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না যে উষ্ট্র পৃষ্ঠে ঘিফার যুবতীর জন্য Reserved Ladies' compartmentএর ব্যবস্থা বোধ হয় স্বয়ং পেগম্বরও করিতে পারেন নাই। যদি তাহা সম্ভব হইত, প্রিয়তমা আয়েশার জন্য তিনি অবশ্যই তাহা করিতেন।

কেহ হয়ত বলিবেন যে ঘিফার যুবতী ত আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে যাইতেছিল, তাহার আবার "পর্দ্দা" কি ? সেই জন্য আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের আর এক স্থানে আছে যে নোমানকন্দি নামক একজন কাফের মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পেগম্বরের সমীপে আসিয়া তাহার সুন্দরী বিধবা কন্যার সহিত মহম্মদের বিবাহের প্রস্তাব করিল। মহম্মদ বলিলেন "তথাস্তু"। উকিলদ্বারা বিবাহ সমাধা হইল।

বোধ হয় সকলে অবগত নহেন যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম মতে বিবাহের সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ একত্রিত হইবার আবশ্যক নাই—উকিল দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। মহম্মদ এই প্রকার উকিল দ্বারা তিনটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ নব পরিণীতা পত্নীকে আনিবার জন্য আবু উসৈদ অন্সারি নামক একজন লোককে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তির সহিত মহম্মদের অথবা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কোনও সম্পর্ক ছিল না। পেগম্বরপত্নী ঐ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত এক উষ্ট্রে একটি অনাবৃত "হাউদায়" পতি সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইহা মহম্মদের মৃত্যুর এক বৎসরের মাত্র পূর্ব্বের কথা।

প্রসিদ্ধ তিব্রাখি এবং তব্রি নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহম্মদের কন্যা জৈনব কানানা নামক একজন অপরিচিত কাফেরের সঙ্গে মক্কা হইতে মেদিনার পথে কতক দূর উষ্ট্রে চড়িয়া গিয়াছিলেন।

মহম্মদের ভ্রমণের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে

যে পেগম্বর নিজে পর্দ্দা মানিতেন না, এবং তৎকালে ভদ্র মহিলাদিগের ভিতর অবরোধ প্রথার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না।

মহম্মদের প্রধানা পত্নী আয়েশার ভগ্নীর নাম অস্‌মা। পেগম্বরপত্নীর ভগ্নী বলিয়াই যে অস্‌মাকে সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিতেছি এমন নহে! অস্‌মা প্রথম খলিফার কন্যা, এবং ইহারই পুত্র আবদুল্লা বিন জবৈর পরে আরব পারস্য প্রভৃতির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইহার স্বামী একজন প্রসিদ্ধ জায়গিরদার ছিলেন।

সহি বুখারি এবং সহি মুসলিম্ গ্রন্থে আছে যে একদিন মহম্মদ উষ্ট্রারোহণে বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন যে তাঁহার শালী অস্‌মা পদব্রজে তাঁহার দুই ক্রোশ দূরস্থিত জায়গির হইতে আসিতেছেন। মহম্মদ নিজের উটকে বসাইয়া সর্ব্বসমক্ষে অস্‌মাকে আপন উষ্ট্রে আরোহণ করিতে আহ্বান করিলেন।

এই ঘটনাটি হইতে অন্ততঃ দুই প্রকারে প্রমাণ হইতেছে যে মহম্মদের সময়ে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। কারণ, ১—তাহা হইলে কখনই অস্‌মার ন্যায় মহিলা পদব্রজে জায়গিরে যাইতেন না, এবং ২—মহম্মদ কখনই তাঁহাকে নিজ অনুচরবর্গের সম্মুখে উষ্ট্রে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিতেন না।

কোন কোন "গোঁড়া" মৌলবী বলিয়া থাকেন যে পেগম্বর যাহা করিয়াছেন তাহা সকলের করা উচিত নহে। কারণ, পেগম্বর "মাসুম্" ছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেন। ইহার উত্তরে অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, যে যুবতীরা তাঁহার সঙ্গে উষ্ট্রারোহণে ভ্রমণ করিতেন তাঁহারা ত "মাসুম্" ছিলেন না।

হিদায়ার টীকা আইনিতে আছে যে, দ্বিতীয় খলিফার পুত্র আবদুল্লা একটি অপরিচিত স্ত্রীলোকের সহিত এক উষ্ট্রে কয়েকবার মক্কা হইতে মেদিনা গিয়াছিলেন।

হাকিম তাঁহার ইকলিল্ নামক প্রসিদ্ধ-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে সফওয়ান্ নামক এক যুবার সহিত মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশা একবার মক্কার পথে কতকদূর গমন করিয়াছিলেন। উষ্ট্রোপরি আয়েশার পশ্চাতে যুবা বসিয়াছিলেন।

বোধ করি আর অধিক উদাহরণ দিবার আবশ্যক নাই। উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহম্মদের সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ অসঙ্কোচে একত্র ভ্রমণ করিতেন, তখন "পর্দ্দার" নাম গন্ধ পর্য্যন্ত ছিল না।

স্ত্রী ও পুরুষের কথাবার্ত্তা।

মুসলমান মহিলারা প্রায় সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বালকের মত বালিকারও কোরাণ পাঠ করিতে হয়। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করেন না, মৌলবীর নিকট ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করা ইহাদের এক প্রকার নিত্য কর্ম্ম

বলিলেই হয়। মৌলবীর নিকট যখন সম্ভ্রান্ত মহিলারা বিদ্যানুশীলন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই কোন প্রকার পর্দ্দার ব্যবধান থাকে না।

ইসলাম-ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে মহম্মদের ভার্য্যাদিগের নিকট হইতেই লোকে অধিকাংশ "রিওয়ায়েত" (হদিস) শিক্ষা করিয়াছিল। তৎকালে অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিলে পেগম্বরের সহধর্ম্মিণীগণ কখনই রিওয়ায়েত শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

বিখ্যাত গ্রন্থ অত্‌তবরিতে আছে যে মহম্মদের পৌত্রের প্রপৌত্রী প্রসিদ্ধ ফাতিমা পুরুষদিগের সহিত গল্প করিতেন।

আবুল ফরজ ইস্‌ফাহানি প্রসিদ্ধ লেখক। মুসলমান সমাজে ইঁহার সমধিক আদর। ইনি একজন সত্যপ্রিয় লেখক, সেই জন্য ইঁহাকে মুসলমানেরা সতুক্ (সত্যবাদী) বলেন। ইনি লিখিয়াছেন যে, ইমাম হুসেনের কন্যা সুকেনা কুরেশবাসীদিগের সহিত একত্রে বসিয়া গল্প করিতেন। কেবল তাহাই নহে ইনি একজন খ্যাতনামা মসকরা (জরিফা) ছিলেন এবং পুরুষ কবিদিগের সহিত ছড়া কাটাইতেন!

উল্লিখিত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে একবার সুকেনার আয়েশা (বিন্ত তল্‌হা) নাম্নী কোন সম্ভ্রান্ত যুবতীর সহিত, কে অধিক সুন্দরী বলিয়া বাজি হয়। সে সময়ে অমর্ (ইবনি রবিয়া) নামক একজন কবি ছিলেন। ইনি যুবা এবং ইঁহার চরিত্রও যে নিতান্ত নির্দ্দোষ ছিল তাহা নহে।

দুই যুবতীতে স্থির করিলেন যে, অমর যাহাকে অধিক রূপসী বলিবেন তাঁহারই জিৎ। যুবা কবি একজন সন্ধিকুশলী (diplomatic) ব্যক্তি ছিলেন। দুই যুবতীকেই সন্তুষ্ট করা তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি তৃষিত নেত্রে উভয় যুবতীরই রূপরাশি যতক্ষণ পারিলেন ভাল করিয়া দেখিলেন এবং পরিশেষে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন যে, আয়েশার রং অতি চমৎকার এবং সুকেনার গঠন অতি মনোহর!

সহি মুসলিম নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যমনের সুবাদারের ভগ্নী মহম্মদের নিকট আসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। গ্রন্থকার বলেন যে, ঐ যুবতীর গণ্ডদেশে ছুলির দাগ ছিল। যদি সুবাদারের ভগ্নী অবগুণ্ঠনবতী হইতেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার কখনই তাঁহার কচ্ছুরোগের উল্লেখ করিতে পারিতেন না। এই ঘটনা হইতে কিয়াফা লেখকও স্থির করিয়াছেন যে সেকালে অবরোধ প্রথা ছিল না।

স্ত্রী ও পুরুষের কর[illegible]দন।

অনেকগুলি হদিস হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে মহম্মদের সময়ে পুরুষকে স্পর্শ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে এখনকার মত মহাপাতক স্বরূপে দৃষ্ট হইত না।

সহি বুখারিতে আছে যে, একবার মহম্মদ একজন স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সুনিদ্রায় শান্তি দূর করিয়াছিলেন। যখন প্যাগম্বর নিদ্রিত, ঐ স্ত্রীলোক মহম্মদের ইক্লুন

(তুকলি) বাছিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছিল। হাফিজ, আইনি এবং মিস্রাতি বলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকের সহিত মহম্মদের কোনও সম্পর্কের নাম গন্ধও ছিল না।

কাজি অইয়াজ বলেন যে, প্যাগম্বর বলিয়া এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কোন অধিকার ছিল না।

সহি বুখারি এবং সহি মুস্লিমের মতে, বনি কৈস্ জাতীয় একজন স্ত্রীলোক আবুমুসা অশরির কেশকীট বাছিয়া মস্তক ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। অশরির সহিত ঐ স্ত্রীলোকের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

ইসাবা নামক গ্রন্থে আছে যে, লয়লা নাম্নী এক যুবতী হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মহম্মদের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বিবাহ বাঞ্ছা ব্যক্ত করিলেন। প্যাগম্বর "তথাস্তু" বলিলেন।

"জমিউল্ জামেহ নামক পুস্তকে আছে যে, উম্মেবিশর নাম্নী একজন স্ত্রীলোক মহম্মদের গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল যে প্যাগম্বরের জ্বর হইয়াছে।"

ইসাবার এক স্থানে আছে যে, মারিয়া নাম্নী একজন মহিলা মহম্মদের সহিত করমর্দ্দন (মুসাফা) করিয়া বলিলেন প্যাগম্বরের হস্তের ন্যায় কোমল হস্ত তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই।

আরবী ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহম্মদ মক্কা জয় করিলে প্রসিদ্ধ সরদার আবু সুফিয়ানের পত্নী স্বয়ং আসিয়া মহম্মদের করমর্দ্দন (মুসাফা) করিলেন। কোন কোন গোঁড়া মৌলবী বলেন যে; প্যাগম্বর নিজ হস্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সেকহ্যাণ্ড করিতেন। কিন্তু তিবরানি এবং সেয়ুতির মতে অনেকবার মহম্মদ অনাবৃত হস্তে ভদ্র মহিলার করমর্দ্দন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

পুরুষের সম্মুখে মহিলার গীত বাদ্য।

তিবরানি বলেন যে, মহম্মদ-জায়া আয়েশা তাঁহার পালিতা অন্সার বালিকার বিবাহ দিয়া আসিলে মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেখানে কি করিলে?" আয়েশা উত্তর করিলেন, "সেলাম এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলাম।" প্যাগম্বর বলিলেন "অন্সার্ জাতি গীত-বাদ্য-প্রিয়, তাহারা গজল্ (টপ্পা) বড় ভালবাসে, তুমি তাহাদের সখের "আতৈনা আতৈনাকুম" গান কর নাই?"

স্থানাভাবে আর অধিক উদাহরণ দেওয়া গেল না। উপরোক্ত ঘটনাবলি হইতে বোধ হয় সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে অবরোধ প্রথার সহিত ইসলাম ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। অবরোধ প্রথার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, অথবা উহার দোষ ও গুণ ইত্যাদি বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।*

শ্রীমিহিরমোহন মিত্র।

* বৈশাখের ভারতীতে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে ইনি এই বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিতেছেন। এই প্রবন্ধ সেই পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। পুস্তকখানি শীঘ্রই বোধ হয় ইংলণ্ডে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইবে। ভাঃ সম্পাদিকা।

আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

রাজা রায়-সিংহ।—বিকার প্রতিষ্ঠিত বিকানিয়ার রাজবংশের রাজা কল্যাণ সিংহ (যবন ইতিহাসে ইনি রায় কল্যাণ মল্ল বলিয়া বিখ্যাত) তিন পুত্র রাখিয়া ১৬৩০ সম্বতে পরলোক গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে রায় সিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মধ্যম রাম সিংহ ও কনিষ্ঠ পৃথ্বী সিংহ। জ্যেষ্ঠ বলিয়া রায় সিংহ সিংহাসনাধিকারী হয়েন। রায় সিংহের আমলে বিকানিয়ার রাজ্যের সীমা ও ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া ইহাকে মারবার মহা প্রান্তরে এক বিশিষ্ঠ রাজ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

কল্যাণ মল্লের আমলে রায় সিংহ একবার দিল্লীশ্বরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে আলাপে বিশেষ ফললাভ হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সম্রাটের সহিত পূর্ব্ব পরিচয় আরও দৃঢ়মূল করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার কতকগুলি কারণও ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ—বিকানিয়ারে সম্যকরূপে রাঠোরদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ—জাঠগণ সম্যকরূপে হীনবল না হইলে রাঠোর-প্রভুত্ব চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে না, এবং তৎসাধন সংকল্পে বাদসাহের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ রাজস্থানের কয়েক জন নরপতি সেই সময়ে মোগল বাদশাহের সহিত সখ্যতা ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতিশয় বর্দ্ধিত প্রতাপ হইয়াছিলেন। মোগল রাজত্বের বিরুদ্ধাচরণ করা বা সম্রাটের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান—রাঠোর সাম্রাজ্যের সমূহ অনিষ্টকারক এই সকল ভাবিয়া বিকানিয়ারেশ্বর রায়-সিংহ আকবর সাহের সহিত সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

রায়-সিংহ যশলমীয়ার রাজবংশের যে নরপতির কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন আকবর সাহও সেই রাজার অপর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সম্পর্ক ধরিলে আকবরের সহিত তাঁহার বিশেষ নিকট কুটুম্ব সম্বন্ধ দাঁড়ায়। মহারাজ মানসিংহ এই সময়ে বাদসাহের সভায় বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিই রায়-সিংহকে বাদসাহের সহিত পুনঃ পরিচিত করিয়া দেন। কিন্তু মুসলমান ইতিবৃত্তকারেরা বলেন রায় সিংহ তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক সম্রাটের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন।

সম্পর্ক-গুণেই হউক বা কূট-রাজনীতিবশেই হউক, বা স্বভাবসিদ্ধ হিন্দুপ্রীতি বশতই হউক আকবরসাহ বিকানিয়ারেশ্বর রায়সিংহের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। বাদসাহ সেই সময়ে নব-বিজিত "নাগর" প্রদেশ রায়সিংহকে প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত

তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি—"হিসার" প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বভার, এবং চারি-হাজারী মন্সবদারের পদ প্রদান করিয়া মারবারের মধ্যে তাঁহার নাম বিঘোষিত করিয়া দেন।

রাঠোর জাতি স্বভাবতই দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধকুশল, তাহাতে আবার দিল্লীশ্বরের সহায়তা পাওয়াতে মণিকাঞ্চন সম্মিলন হইল। রায়সিংহ—নিজ অনুজ রামসিংহের দ্বারা "জোহয়" "কুনিয়া" প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী জাঠদিগকে দমন করাইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎসল রামসিংহ ভ্রাতার কার্য্যে এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রায়সিংহ তেজস্বী রাঠোরকুল সম্ভূত মহাবীর হইয়াও কেন যে যবন সম্রাটের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করেন, তাহা উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে বিশেষরূপ প্রমাণিত হয়। জাঠদিগকে দমন করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। যদিও তিনি "সময়-সেবক" রাজনীতিজ্ঞদের ঘৃণার্হ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তত্রাচ, বিক্রমে ও শৌর্য্য বীর্য্যে তিনি গৌরবের জলন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। বিকার-বংশধরগণ স্বল্প সীমাবদ্ধ মরুক্ষেত্র মারবারের মধ্যেই স্ব স্ব নাম বিস্তার করেন, কিন্তু বীরপ্রবর রায়সিংহ ভারতের অনেক মহাযুদ্ধে সম্রাটের সেনাপতিত্ব করিয়া আপনার নাম চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিয়াছিলেন। আহম্মদাবাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধই তাঁহার বীরত্ব প্রকাশের মূল সূত্র। উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা মীরজা মহম্মদ হোসেন সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী হইলে রায়সিংহ কেবলমাত্র রাঠোর সৈন্যবলের সহায়তায় তাহাকে নিহত ও আহম্মদাবাদ অধিকৃত করেন। এই ঘটনা হইতেই আকবরসাহ তাঁহার বীরত্বের প্রকৃত পরিচয় পান।

ইহার পর মোগল সম্রাট, মালদেব পুত্র চন্দ্রসেনকে দমন করিবার জন্য সাহ-কোয়ালি মহরম ও রায়সিংহকে যোধপুরে প্রেরণ করেন। আকবরের ভ্রাতা মির্জ্জা মহম্মদ হাকিম পঞ্জাব-আক্রমণের উদ্যোগ করিলে রায়সিংহ কুমার মুরাদের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। আকবরের রাজত্বের অষ্টবিংশতি বৎসরে তিনি বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া আসেন।

রায়সিংহের সহিত আকবর যদিও পূর্ব্ব হইতেই সাংসারিক সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন তথাপি সেই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কুমার সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সহিত তাঁহার এক কন্যার পরিণয় প্রস্তাব করেন। অন্যান্য অনেক রাজপুত নরপতি ইতিপূর্ব্বেই মোগলের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং রায়সিংহ মহানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। পরিণয় কার্য্য মহোৎসবে সমাধা হইয়া গেল। বিকানিয়ারেশ্বরের কন্যা সম্রাটের পুত্রবধূ হইলেন। এই পরিণয়ের ফলস্বরূপ হতভাগ্য কুমার পারভিজ জন্মগ্রহণ করেন।

রায়সিংহের আর একটী কন্যা ছিল। তাঁহার সহিত বান্দুর (বুঁদী) রাজপুত্রের বিবাহ হয়। জামাতার অকালমৃত্যুতে ও কন্যার বৈধব্যে রায়সিংহ অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়া পড়েন। বাদসাহ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানোদ্দেশে বিকানিয়ারে

আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রথামতে বিধবাগণ স্বামীর শবদেহের সহিত চিতায় আরোহণ করিতেন। আকবর রায়সিংহের কন্যার "সতী" হওয়ার সম্বন্ধে অনেক আপত্তি ও যুক্তিবাদ প্রদর্শন করিয়া, রাজপুতের চির প্রথা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করান।

মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মতে—রায়সিংহ আকবরের পরমাত্মীয় ও পরমপ্রিয় হইলেও তাঁহার জীবনের শেষ দশায় সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েন। এমন কি সম্রাট পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি বিকানিয়ার পরিত্যাগ করিয়া আগরায় যান নাই। আকবর তাঁহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু সে মনোমালিন্য আবার অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ্যে পরিণত হয়।

কার্য্য-জীবনের শেষভাগে রাঠোর-বীর মহারাজ রায়সিংহ আবুলফজলের সহিত নাসিক যাত্রা করেন। ইহার পরে উদয়পুরের মহারাণার বিরুদ্ধেও তিনি প্রেরিত হন। আকবরের মৃত্যুর পরও তিনি জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক "পাঁচহাজারী মন্সবদারী" পদে উন্নীত হন। খসরু বিদ্রোহী হইলে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর পঞ্জাবে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন রায়সিংহ সম্রাটের মহিলা-শিবিরের রক্ষকরূপে সঙ্গে গিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে রাঠোররাজ—জাহাঙ্গীরেরও বিরাগভাজন হন। ইহা হইতে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, শেষ অবস্থায় তিনি মোগল বাদসাহদের প্রতি নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৬৩২ খৃঃ অব্দে, ১৬৮৮ সম্বতে; রায়সিংহ প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী রাজভাণ্ডার ও বহুদূর বিস্তৃত রাঠোর রাজ্য ও নাম রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শেষে আমরা রায়সিংহের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের এক বংশাবলী প্রদান করিলাম।

উদয়সিংহ (মোটারাজা)—উদয়সিংহের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে আমা-দিগকে মারবারের ইতিহাসের আর একটী পরিচ্ছেদে পিছাইয়া যাইতে হইবে। মালদেব মারবারের শেষ স্বাধীন রাজা, উদয়সিংহ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। কি প্রকারে উদয়সিংহের সহিত আকবরের প্রথম সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহা না বুঝাইলে উদয়সিংহের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অতএব সে কথা প্রথমেই কিছু বলা আবশ্যক।

ভাগ্য পরিবর্ত্তনে শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া—পরিজনত্যক্ত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া, হুমায়ুন যখন মারবারে প্রবেশ করেন; মালদেব তাঁহার সেই দুর্দ্দশার সময়ে কোন প্রকারে সাহায্য প্রদান না করিয়া বরঞ্চ তদ্বিপরীত ব্যবহার করেন। পরে সৌভাগ্য-রবির পুনরুদয়ে হুমায়ুন যখন দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন, তখন মালদেব হুমায়ুনের নিকট হইতে সম্যক অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে হুমায়ুনকে অধিককাল এই রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার অপঘাত মৃত্যু ঘটিলে আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

আকবরের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র, তখন তিনি মাতার নিকট হইতে মালদেবের সেই পূর্ব্বকার অত্যাচার কাহিনী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন। একদিকে মাতার উত্তেজনা

ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি; অপরদিকে রাজ্যবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা, উভয়দিক হইতেই পোষিত হইয়া মারবার আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ১৪৬১ খৃঃ অব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক আকবরসাহ সৈন্যদল সহ রাঠোর রাজধানী আক্রমণ করিলেন।

রাঠোর সেনাদল বাদসাহের আগমন সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই "মৈরথা" নামক এক দৃঢ় দুর্গে একত্রীকৃত হইয়া ছিল। আকবর সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গ বেষ্টন করিলেন। একদিকে "মৈরথা" দুর্গে রাঠোর সেনাদল—তৎপরে সম্রাটের অগণ্যবাহিনী এবং মালদেবও ঘটনাক্রমে এই সেনাদল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। কয়েকদিন যুদ্ধের পর দুর্গ মধ্যস্থ রাঠোর সেনাদলের কিয়দংশ সম্রাট শিবির ভেদ করিয়া মালদেবের সহিত মিলিত হইল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না। রাঠোর-রাজের ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্তই অপ্রসন্ন ছিলেন—তিনি সেই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। "মৈরথা" দুর্গপ্রাকারে মোগল রাজপতাকা উড্ডীয়মান হইল।

"মৈরথা" অধিকারের পর, আকবর "নাগর" নামক আর একটী দুর্গ মালদেবের হস্তবিচ্যুত করিয়া লইলেন। রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা অপেক্ষা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই যে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল তাহার কারণ স্বরূপ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি উল্লিখিত দুর্গাধিকৃত প্রদেশদ্বয় বিকানিয়ারপতি রায়সিংহকে অর্পণ করিলেন।*

মানবভাগ্য স্বভাবতই পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষতঃ একবার পতনের দিকে মুখ ফিরাইলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহার গতির পরিবর্ত্তন হয় না। মালদেবেরও তাহাই ঘটিল। বহিঃশত্রুর ও প্রতিবেশী সমস্ত রাজগণের ক্রমাগত আক্রমণে মালদেব এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে আকবরের অধীনতা স্বীকারই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প হইল।

আকবর এই সময়ে রাজপুতানার ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্তগণের অনেককেই স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সম্রাট আজমীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া—বিজিত রাজন্যবর্গের আনুগত্য উপহার লইবার জন্য এক ক্ষুদ্র দরবার করেন। এই দরবারে অনেক রাজপুত রাজাই উপস্থিত হন। মালদেব যবনের বশ্যতা স্বীকারে কৃতসংকল্প হইয়াও স্বয়ং সম্রাটের দরবারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার অন্যতম পুত্র চন্দ্রসেন উপঢৌকনাদি লইয়া আজমীরে সম্রাট সদনে উপস্থিত হন। মালদেব নিজে না আসিয়া প্রতিনিধি স্বরূপ পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই ব্যাপারে আকবর মহা রুষ্ট হইলেন। ইহার দণ্ডস্বরূপ তিনি সমগ্র যোধপুর রাজ্যের সনন্দ বিকানিয়ার-পতি তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন রায়সিংহকে অর্পণ করিলেন।

"উদয়সিংহ" নামেই যেন কি একটী কুলক্ষণ আছে। মিবারপতি মহারাণা উদয়সিংহ যবনকরে শিশোদিয় রাজকুলের স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছিলেন। মারবারেশ্বর উদয়সিংহও সেইরূপ আকবরের সামন্ত-রাজরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে উগ্র রক্তক্ষেত্রের

---

* পূর্ব্বে দেখুন।

স্বাভাবিক উগ্রতা বিনষ্ট করেন। যে মারবারে মিবারের মত প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষতা নাই—যে মারবার কেবল ইক্ষু-ঝোপ ও কণ্টক বৃক্ষে,* ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অসীম মরুক্ষেত্রে পরিপূর্ণ,—যে মারবারে অগণ্য সৌধ অসংখ্য রাজপথ, ঐশ্বর্য্যের কোলাহল কিছুই ছিল না সেই মারবারে একটী পদার্থ ছিল—তাহা রাঠোরদিগের প্রকৃতিগত তেজ ও স্বাধীনতা। উদয়সিংহ সেই তেজ—সেই স্বাধীনতা যবন সম্রাটের নিকট বিক্রয় করিয়া অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কেবল মারবারের স্বাধীনতা বিক্রয় নয়, উদয়সিংহ যবন সম্রাটের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধও স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি নিজ ভগিনী যোধবাইকে আকবরের করে সমর্পণ করেন। এই যোধবাই আকবরের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। আজও আগরা দুর্গ মধ্যে মহারাজ্ঞী রাঠোর কুল সম্ভবা যোধবায়ের নামে একটী আলাহিদা রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত মহল বর্ত্তমান আছে। অনেকে অনুমান করেন এই যোধবাই জাহাঙ্গীরের জননী।+

---

* "আখ্‌রা ঝোপ্‌রা,
ফোখ্‌রা বার্,
বাজরা কা রোটি,
মথ্‌রা কা ডাল,
দেখহো! রাজা, তেরি মারবার।"

অর্থাৎ—আঁখের ঝোপরা (ঝোপ), কণ্টকের বেড়া, বাজরা'র রোটি, ও মথ্‌রা'র দাইল, মরুক্ষেত্র মারবারের পরিচায়ক চিহ্নস্বরূপ।

+ মোগল সম্রাটগণ রাজপুত রাজকুমারীগণের পাণিপীড়ন করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে তাঁহাদিগকে যাবনিক নামে বিভূষিত করিয়াছিলেন। "আকবর নামা" যোধবাই সম্বন্ধে একটু গোলমাল করিয়া গিয়াছেন। সেই গোলযোগ টুকু যাবনিক নাম লইয়া। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিয়া যান নাই। জাহাঙ্গীরের দশটী প্রধানা মহিষী ছিলেন।

(১) রাজা ভগবান দাসের কন্যা, মানসিংহের ভগিনী, ৯৯৩ হিজরায় জাহাঙ্গীরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৯৯৪ হিজরায় ইহার "সুলতান উন্নিসা বেগম" নামে এক কন্যা জন্মে। (কাফি খাঁ ইহাকে "সুলতান বেগম" বলিয়া গিয়াছেন।) ৯৯৫ হিজরায় জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ইতিহাসে স্বনামখ্যাত কুমার খসরু জন্মগ্রহণ করেন। ১০১১ সনে মানসিংহের ভগিনী অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ গর্ভজ সন্তানগণের অবাধ্যতা।

(২) বিকানিয়ারেশ্বর কল্যাণ মল্লের পৌত্রী—বর্ত্তমান প্রস্তাবে পূর্ব্বোল্লিখিত রায় সিংহের কন্যা। বদৌনি ইহার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু "তুজুকই জাহাঙ্গীরি"তে ইহার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই।

(৩) মালদেব পুত্র "মোটারাজা" উদয় সিংহের কন্যা—৯৯৪ হিজিরায় ইহার বিবাহ হয়। "তুজুকে"র লিখন মতে তিনি "জগৎ গোঁসাইণী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। সম্রাট সাহজাহান ইহার গর্ভসম্ভূত। ১০২৮ হিজিরায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

(৪) খাজা হোসেনের কন্যা—ইনি কুমার পারভিজের জননী।

এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত উদয়সিংহ তত দোষী নহেন। কেন না, তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক রাজপুত নৃপতি যবন-সম্রাটের করে স্ব স্ব ভগিনী ও কন্যাকে অর্পণ করিয়া পবিত্র সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় শোণিতের সহিত চাঘ্‌টাই শোণিত মিশ্রিত করাইয়াছিলেন।

অপমানিত ও ভগ্নমনোরথ হইয়া, চন্দ্রসেন পিতৃসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। বিপদের উপর নূতন বিপদ উপস্থিত হইল, তাঁহার প্রতিবেশী শত্রু সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাহারা এই অবসরে মারবার রাজ্যের উপর যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। মল্লদেব ইহাদের উৎপাতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া উদয়সিংহকে সম্রাট সন্নিধানে অধীনতা স্বীকারের পরিচয় স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। উদয়সিংহ রাঠোর সৈন্যদল লইয়া দিল্লীতে ও আগরায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাট তাঁহাকে এক হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করিয়া সম্মানিত করিলেন।

মারবার রাজবংশে এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে যবনের অধীনতা স্বীকার ঘটিল। উদয় সিংহ ক্রমে বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। দিনে দিনে তাঁহার সহিত উদয়সিংহের

---

(৫) রাঠোরের অন্যতম সামন্ত-রাজ রাজা কেশু দাসের কন্যা—ইহার এক কন্যা সন্তান হয় নাম "বাহার বানু বেগম।"

(৬) কুমার জাহান্দারের মাতা (ইহার নাম জানা যায় নাই)

(৭) ,, সাহরিয়ারের মাতা ,, ,, ,, ,, ,,

(৮) ক্ষুদ্র তিব্বতেশ্বর (?) আলিয়ারের এক কন্যা।

(৯) মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহের এক কন্যা।

(১০) মেহেরউন্নিসা খাঁনাম—ইনি জগৎপ্রসিদ্ধা নুরজাহান। নুরজাহানের জাহাঙ্গীরের ঔরসে সন্তানাদি হয় নাই।

উল্লিখিত তালিকায় মধ্যে আমরা যোধবাইএর নাম দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি উদয়সিংহের কন্যা বলিয়া উল্লিখিতা হইয়াছেন। আকবরের মহিষীগণের মধ্যেও আমরা এক "যোধবাইএর" উল্লেখ দেখিতে পাই। এই যোধবাই সম্ভবতঃ উদয় সিংহের ভগিনী হইতে পারেন। আকবর জননী "হামিদাবানু" অন্তঃপুর মধ্যে "মরায়াম্ মাখানী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। যোধবাইও "মরায়াম্ উজ্জামানি" এই যাবনিক সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। এই "উজ্জামানি"ই জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী বলিয়া কথিত। "তুজুকে"—একস্থলে লিখিত আছে—"আমাদের সম্পূর্ণ আশা আছে ঈশ্বর "মরায়ামকে" কৃপা করিবেন।" ইহাতেই যেন একটু সন্দেহ হয় তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু ছিলেন বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরও নিজ জীবনবৃত্তান্তে সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া কেবল মাত্র নিজ গর্ভধারিণী সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; তাহারও কি ইহা একটী প্রতিপোষক কারণ নহে? কিন্তু সন্দেহের উপর আরও সন্দেহ। প্রসিদ্ধ ইতিহাসজ্ঞ ব্লকমান সাহেব একস্থলে যোধবাইকে আকবর মহিষী বলিয়া—আবার অপর স্থলে তাঁহাকে জাহাঙ্গীর মহিষী বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "উজ্জামনি" রাজা বিহারী মল্লের কন্যা ও ভগবান দাসের ভগিনী। এ বিষয়ে ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ কোন পাঠক কিছু লিখিয়া পাঠাইলে ইহা লইয়া একটু আলোচনা হইতে পারে। অনেকে আকবরের মহিষীকে যোধবাই ও তাঁহার পুত্রবধূকে যোধাবাই বলিয়া বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রীতি ও বন্ধুত্ব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই উদয়সিংহই মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের “মোটারাজা।” আকবর সাহ তাঁহার শারীরিক স্থূলতার জন্য তাঁহাকে এই অদ্ভুত আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্রাটের আচরণে ও সদ্ব্যবহারে বশীভূত হইয়া উদয়সিংহ রাজধানীতেই বাস করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মালদেব, এরূপ চিরস্থায়ী অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য পুত্রকে দিল্লীতে পাঠান নাই। বিশেষতঃ যখন তিনি শুনিলেন, মারবারের প্রকৃত যুবরাজকে উপেক্ষা করিয়া সম্রাট উদয়সিংহকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন তখন কেবল তিনি নহেন সমগ্র রাঠোর সামন্ত-সম্প্রদায়ই উদয়সিংহের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

জাতীয়সম্মান যে এতদূর আহত হইবে রাঠোররাজ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। রাজস্থানের জ্বলন্ত গৌরব মহারাণাকে গোপনে সাহায্য করিয়া বীরপ্রসূ রাজপুত্নানায় যিনি মুসলমান অধিকারের মূলোচ্ছেদ কল্পনা করিতেছিলেন, তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে এই ঘৃণিত উপায়ে যবনের ক্রীতদাস হইতে দেখিয়া সেই হতভাগ্য পিতার আর দুঃখের ইয়ত্তা রহিল না। ঘোরতর নিরাশায় ও মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া মনে মনে প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া মারবারগৌরব মালদেব ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

মালদেবের মৃত্যুর পর যোধপুরের রাজসিংহাসন শূন্য হইল—উদয়সিংহ তখন আকবরের নিকটে। সমগ্র রাঠোর-প্রধানেরা তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত ও সংক্ষুব্ধ; কাজেই তাঁহারা আপনা আপনি সঙ্কল্প করিয়া উদয়সিংহের কনিষ্ঠ চন্দ্রসেনকে মারবার-সিংহাসন প্রদান করিলেন।

উদয়সিংহের রাজ্যাভিষেক মালদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল, এ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই ভ্রান্তিময় মতের সমর্থন করিতে পারি না। যখন মালদেবের মৃত্যু হয়, তখন উদয়সিংহ মোগল রাজধানীতে। রাজ্যের সামন্তেরা চন্দ্রসেনকেই গদি দিয়াছিলেন। উদয়সিংহের স্বত্ব রক্ষণার্থে—বাদসাহকে রাঠোরদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর বীরপ্রবর রাঠোরকুলগৌরব চন্দ্রসেন সমরক্ষেত্রে মহাশয়ন করিলে, উদয়সিংহ সম্রাটের সহায়তায় মারবারে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিলেন।

উদয়সিংহ সমসাময়িক রাজপুত নৃপতিগণের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষ হইয়া অনেক স্থলে সংমিশ্রিত মোগল ও রাঠোর সৈন্য পরিচালিত করিয়া বিজয় শ্রী লাভ করেন। অশীতি সহস্র অশ্বারোহী রাঠোরী সৈন্য তাঁহার নিজ আয়ত্তাধীন ছিল। সমসাময়িক রাজপুত নৃপতিগণের মধ্যে সে সময়ে অন্য কাহারও এরূপ সেনাবল ছিল না।

রাঠোর-রাজ উদয়সিংহ মহা প্রতাপশালী যোদ্ধা হইলেও তিনি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। একটী শোচনীয় কাহিনী তাঁহার রাজপুত নামের উপর গভীর কালিমা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছে। সে লোমহর্ষণ ঘটনা কল্পনার চক্ষে আনিতেও শরীর

শিহরিয়া উঠে। উদয়সিংহ যখন আকবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মারবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে তিনি অস্ফুট-যৌবনা, মুকুলিতাঙ্গী, এক কুমারী মূর্ত্তি অবলোকন করেন। এই সুন্দরীর রূপরাশি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয়।

রাজপুত রাজগণের মধ্যে একটী প্রাচীন প্রথা ছিল—তাঁহারা জীবনের প্রথম বিংশতি বৎসর রমণীর মুখ দর্শন করিতে পাইতেন না, এমন কি তাঁহাদের বিবাহ পর্য্যন্ত হইত না। কেবল শাস্ত্র ও শস্ত্র চর্য্যায় তাঁহাদের দিনাতিপাত করিতে হইত। ইহা একটী মহা মূল্যবান নিয়ম; ইহাতে যে কেবল রাজোচিত ও বীরোচিত শিক্ষা সমাধা হইত এরূপ নহে, রাজকুমারগণের দৈহিক বল ও ইন্দ্রিয় সংযম ক্ষমতা বিশেষরূপে পরিপুষ্ট করিত।

উদয়সিংহ অবশ্য এই নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ, যে সময়ে ইন্দ্রিয় শক্তি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্দ্দমণীয়তায় বিশেষ অবাধ্য হইয়া উঠে, সে সময়ে তিনি মহা-সংযমী ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে এই অতুল রূপবতী কুমারীকে দেখিয়া তিনি পূর্ব্বশিক্ষা, সংযম, সমস্তই প্রবৃত্তির মন্দিরে বলিদান দিলেন।

অনুসন্ধানে উদয়সিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে কুমারী ক্ষত্রিয়াণী নহেন, বাইভীলারার এক আর্য্যপন্থী ব্রাহ্মণকন্যা তখনও তিনি পূর্ব্ব সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি রাজা দেশাধিপতি, তাঁহার ইচ্ছার কে বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতে পারে? কিন্তু সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কন্যার কুমারীধর্ম্ম নিরাপদ নহে, ন্যায়ান্যায়ের বিচারকর্ত্তা স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং মারবারেশ্বর তাহার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এক দিন এক সুগভীর হোমকুণ্ড খনন করিয়া তিনি তাহাতে মন্ত্রপুত অগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন। তৎপরে সেই প্রভাতকমলবৎ নিরুপমেয় সৌন্দর্য্যশালিনী কুমারীকে স্বহস্তে নিধন করিয়া তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বীভৎস যজ্ঞ-কাণ্ড দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত ও মৃতকল্প হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণ নিজে সেই জলন্ত মহা প্রজ্জলিত অনলে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন কঠোর অভিশাপ উদয়সিংহের প্রাণে মহা বিভীষিকা উৎপাদন করিল। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে উদয়সিংহ ঘোরতর মানসিক অশান্তি উপভোগের পর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা মরুক্ষেত্রের স্থানে স্থানে পৃথক পৃথক রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার সপ্তদশটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সমূহের মধ্যে আজও অনেক গুলি বর্ত্তমান আছে। কৃষ্ণগড়, রূপনগর, রত্নলাম প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যগণের দেহে আজও উদয়সিংহের শোণিত প্রবহমান। অন্য পৃষ্ঠায় উদয়সিংহের বংশধরগণের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

(আকবরের | সমকালবর্ত্তী)
রামসিংহ
রায়মল্ল
উদয় সিংহ
(আকবরের সমকালবর্ত্তী)
চন্দ্রসেন
অহীশকর্ণ
গোপাল
পৃথ্বীরাজ
রতনসিংহ
ভাইরাজ
বিক্রমজিত
ভানসিংহ
সুরসিংহ
অক্ষিরাজ
ভগবান দাস
নরহরদাস
শক্তসিংহ
ভূপাল
দলপৎ
জয়ৎ
কৃষ্ণ
(কৃষ্ণগড়-স্থাপয়িতা)
যশোবন্ত
(মানপুরা-প্রতিষ্ঠাতা)
কেশব
(পাষাণগড়-নির্ম্মাতা)
রামদাস
পূর্ণমল্ল
মাধু
মোহন
ক্ষীরোদ
বল্লদাস
গোপালদাস
গোবিন্দদাস
(গোবিন্দগড় নির্ম্মাতা)
মহেশদাস
রত্ন
(রত্লাম স্থাপয়িতা)
বিকানিয়ার রাজবংশাবলীর তালিকা।
বিকা।
(রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা—সংবৎ ১৫৪৫)
লুনকরন
রত্নসিংহ
জয়ৎসিংহ
কল্লাণ মল্ল বা কল্যাণ সিংহ
(আকবরের সভাসদ্)
শিবজী
অশ্বপাল
রামসিংহ
রায় সিংহ
পৃথ্বীসিংহ
করুণসিংহ

মহানদী বক্ষে।
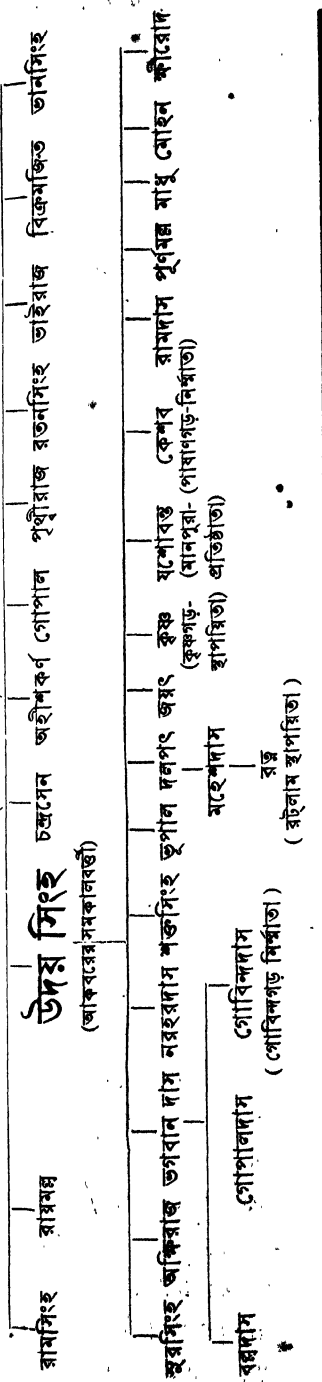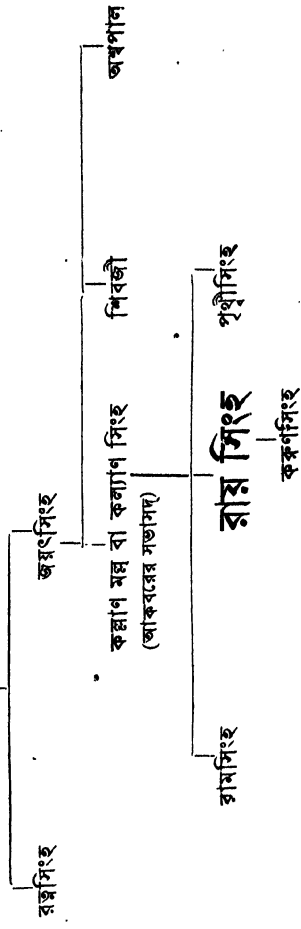
৯ই অগ্রহায়ণ ১৩০১ সাল অপরাহ্ণে নৌকাযাত্রা করা গেল। আমরা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নদীর স্রোত আমাদের প্রতিকূল। বর্ষা আগমনে মহানদী দুর্দ্দান্ত প্রতাপ লইয়া বহিয়া যাইত, তাহার উন্মত্ততা, যৌবন-দর্প কূলে কূলে উছলিয়া উঠিত, কত জনপদ, কত পল্লীগ্রাম, কত মনুষ্য ও পশু আপনার পঙ্কিল-বক্ষে ধরিয়া উল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া পর্ব্বত-দুহিতা চলিয়া যাইত, আজ কালপ্রভাবে তাহার দর্প চূর্ণ, এখন আর তাহার সে তেজ, সে গর্ব্ব নাই, এখন সে ধীর ক্ষীণ ও বিষণ্ণভাবে কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে মাত্র। তাহার এই হীনদশা দেখিলে বস্তুতঃ দুঃখ হয়। সেই মহাপরাক্রম-শালিনী খরস্রোতা মহানদীর আজ যে দিকে চাও, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে, স্থানে স্থানে সুদূর বিস্তৃত অনন্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। সর্ব্বস্থানে জলের গভীরতা সমান নয়। কোথাও তিন চারি ফুট, কোথাও বা পনর ষোল ফুটেরও অধিক। নদী এখন স্থির শান্ত সুনির্ম্মল। অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর ন্যায় ইহার স্রোত একটানা। নদীর মধ্যে স্থানে স্থানে দ্বীপসমূহ বিরাজিত। এই সকল দ্বীপে গ্রাম্য গো মহিষাদি চরিয়া বেড়ায়। তিন বৎসর হইল হঠাৎ ভীষণ বন্যা আসিয়া বিস্তর গো মহিষ স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার এই প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনা যায়। এজন্য অনেক ব্যক্তিকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কটকবাসীদিগকেও সেই সময় সশঙ্কিত-চিত্তে কিছু-দিন বাস করিতে হইয়াছিল। কারণ বন্যার জলসীমা হইতে কটক সহরের অধিকাংশ স্থান নিম্ন। প্রস্তর ও মৃণ্ময় বাঁধ দ্বারা কটক সহর রক্ষিত। সেই বন্যার জল আর আধ ফুট উচ্চ হইলেই বাঁধ উলঙ্ঘন করিয়া জল সহরে প্রবেশ করিত এবং অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইত। সেই সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদিগকেও অত্যন্ত শশব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগণে রবি ঢলিয়া পড়িলেন, পশ্চিমাকাশ হিঙ্গুল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পরিশোভিত হইল। মহানদীর স্বচ্ছ-সুনির্ম্মল-সলিলরাশির উপর তাহার প্রদীপ্ত প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় স্তরে স্তরে রং ফলাইয়া সৌন্দর্য্য অধিকতর ফুটিয়া উঠিল। সান্ধ্য-গগণে দুই একটি তারকা ফুটিয়া উঠিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমরা ধবলেশ্বর নামক স্থানে পৌঁছিলাম। কটক হইতে ইহা চারি পাঁচ মাইল দূরে। আমাদের সম্মুখে কতকগুলি বড় বড় আমগাছ আড়াল পড়ায় ধবলেশ্বরের মন্দির স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল না। ইহার পূর্ব্বে আর একবার এই মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। এই মন্দির মহানদীর একটি দ্বীপে সংস্থাপিত। এই দ্বীপটির পশ্চিম দিক প্রস্তরময়। এজন্য মহানদীর স্রোতে টিকিয়া আছে; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহানদীর স্রোত একটানা। এ দিক প্রস্তরময় না হইলে ধবলেশ্বরের

এই মন্দির কোন্ কালে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইত। মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন; কতদিন ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গই বা কতদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে স্থানীয় লোক ইহার সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম। বোধ হয় চারি পাঁচ শত বর্ষের পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এই মহাদেবের বিশেষ কোন নাম ছিল না। ধবলেশ্বর নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে। একব্যক্তি অপর একব্যক্তির একটি কৃষ্ণকায় গরু চুরি করিয়া পলাইতেছিল। যাহার গরু চুরি হইয়াছিল সে এবং তাহার গ্রামস্থ অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া চোরের অনুসরণ করিল। চোর অনন্যোপায় হইয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া মন্দির মধ্যে গরুসহ আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এ দিকে পশ্চাদনুসরণকারী ব্যক্তিগণ মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া চোরকে গালি দিতে এবং নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। চোর এ দিকে নিরুপায় হইয়া গললগ্নীকৃত-বাসে মহাদেবকে এই বলিয়া আরাধনা করিতে লাগিল যে "হে মহাদেব, আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। এখন চোর হইলেও তোমার আশ্রিত। যিনি মহৎ তিনি আশ্রিত জনের উপকার করেন। এখন আমার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন। তুমি দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি এই নীচ অধমের প্রতি সদয় হও এবং আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। এই কৃষ্ণকায় গরুকে ধবলকায় করিয়া দাও। ধবলেশ্বর নামে তুমি সম্মানিত এবং সকলে তোমাকে অসীম ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিবে।" মহাদেবের অন্তঃকরণ দীনের কাতরোক্তিতে দ্রব হইল, তিনি সদয় হইলেন। গরুর চর্ম্ম প্রার্থিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। এ দিকে অন্য ব্যক্তিগণ অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং দ্বার খুলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। চোর স্বীয় বাসনা-পূর্ণ দেখিয়া ভিতর হইতে উচ্চস্বরে কহিল "তোমরা কেন আমায় বিরক্ত করিতেছ, কি হইয়াছে?" তাহারা উত্তরে বলিল "আমাদের গরু চুরি করিয়া আবার কি হইয়াছে, যেন কিছুই জান না। শীঘ্র দ্বার খোল, গরুর সহিত এখনই তোমাকে রাজদ্বারে ধরিয়া লইয়া যাইব।"

চোর বলিল "এ গরু আমার নিজের, তোমরা কেন আমায় ভর্ৎসনা করিতেছ, তোমাদের কি বর্ণের গরু ছিল?" তাহারা বলিল "আমাদের গরু কৃষ্ণবর্ণের। দ্বার খোল, তাহা হইলেই দেখা যাইবে"। চোর বলিল "এ আমার শাদা গরু, তোমাদের নয়।" তাহারা সকলে একবাক্যে বলিল "যদি শাদা হয় তোমারই হইবে। এখন দ্বার খোল।" চোর নির্ভয়ে দ্বার খুলিল, সকলে বিস্ময়পূর্ণ-নেত্রে দেখিল, প্রকৃতই শাদা গরু। তাহারা কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য তাহাদের নিকট ভেল্কিবাজির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বুঝিল ইহা মহাদেবের মহত্ব এবং সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া চোরকে অব্যাহতি দিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। সেই অবধি ধবলেশ্বর নাম বিখ্যাত হইল। কটকবাসীরা ধবলেশ্বরকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। ধবলেশ্বরের শপথের তুল্য কটকবাসীর নিকট প্রধান

শপথ আর নাই, এমন কি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধবলেশ্বরের শপথ দ্বারা অনেক বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এই তীর্থস্থানে অনেক অপুত্রক পুত্র কামনায় এবং অনেক রোগী দুশ্চিকিৎস্য রোগ দূরীকরণের আশায় মধ্যে মধ্যে "হত্যা" দিয়া থাকে, এবং শুনা যায় তাহাতে সুফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের সমভূমি হইতে মন্দিরের অভ্যন্তর কিছু নিম্নাভিমুখে। আলোক প্রবেশ করিবার আদৌ উপায় নাই সুতরাং মহাদেব দর্শন করিতে হইলে প্রদীপের সাহায্য ব্যতীত যাওয়া একেবারে অসম্ভব। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে প্রায় ৩০ ফুট দূরে এবং ৫।৬ ফুট নিম্নে মহাদেব স্থাপিত। একজন পাণ্ডা আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া প্রদীপ হস্তে অগ্রসর হইতেছিল—আমরা তাহার হস্তস্থিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলাম। পাণ্ডা মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে "উঁচু নীচু" বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল—কারণ সেই আলোকের সাহায্যে দুই তিন হাত পরিমিত স্থান মাত্র অস্পষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সেই সময় মন্দির মধ্যে দেখিলাম একটি নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তি মহাদেবের পাদ্যর্ঘ ও নির্ম্মাল্য পাইবার জন্য পাণ্ডাকে কাকুতি মিনতি করিতেছে, কিন্তু স্বার্থপর কঠিন প্রাণ পাণ্ডা তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, পরে আমাদের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে সেই ব্যক্তিকে নির্ম্মাল্য দিল। সে তাহা অতিশয় ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করিতে করিতে তাহা মস্তকে ও বক্ষে স্পর্শ করাইয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মন্দির অতি জীর্ণ ও পুরাতন বলিয়া তন্মধ্যে অসংখ্য চর্ম্মচটিকা বাস করিতেছে। তাহাদের দুর্গন্ধে মন্দির মধ্যে ক্ষণকালও তিষ্ঠান দুরূহ। পাণ্ডা মহাশয়কে এই ক্ষুদ্র জীব গুলিকে অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু জীবগুলিকে বহিষ্কৃত করিতে তিনি বড় অনিচ্ছুক। কারণ যদি মহাদেবের কোপাগ্নিতে তাঁহার দক্ষিণার ব্যবস্থা ন্যূন হইয়া পড়ে। এখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার রাত্রিতে এবং পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তির দিনে দুটি মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয়। কার্ত্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার অপেক্ষা মকর সংক্রান্তির যোগে বিস্তর জনতা হয়। উড়িষ্যার অন্যান্য তীর্থ স্থানের ন্যায় এখানেও পরে অপর দুইটি মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। একটি এই দ্বীপের উপরে, মহাদেবের নাম বিরিঞ্চীশ্বর এবং অপরটি নদীর অপর পারে নাম যক্ষেশ্বর। ধবলেশ্বরের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহাদের আর পৃথক মন্দির হইয়া উঠে নাই। কোনটি বা নিপতিত কোনটি বা অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় রহিয়াছে। বোধ হয় ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি পরে নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে সকল গুলিই নাসিকা এবং কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হীন। লোকে বলে ইহা কালা পাহাড়ের কীর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখে উৎকল ভাষায় লিখিত আছে যে "মন্দির সংস্কারের জন্য অন্ততঃ একটি পয়সা দান না করিলে কাহারও ধবলেশ্বর

দর্শনের ফল হইবে না”। সকলে বলে ইহা আট্গড় রাজার হুকুম অনুসারে লিখিত হইয়াছে। মন্দিরের সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে যাজকগণ প্রতিপালিত হয়। মন্দিরের অধিকাংশ আয় রাজা নিজে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আয়ও নিতান্ত কম হয় না। তবু এইরূপ হুকুম জারি করা কিরূপ সঙ্গত তাহা পাঠক পাঠিকা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাজার ভক্তি-ন্যূনতা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

সেই দিন রাত্রিতে ধবলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাহার পর দিবস ১০ই অগ্রহায়ণ অতি প্রত্যূষে আমাদের নৌকা ছাড়িল। মহানদীর উভয়পার্শ্বে স্তর বিন্যস্ত গিরিশৃঙ্গ, স্থানে স্থানে পল্লি, সমতল ভূমি, শ্যামল শস্য ক্ষেত্র এবং অসংখ্য আম্র কানন। কেহ কেহ বা প্রাবৃটের ভীষণ প্রকোপ ভয়ে পাহাড়ের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে, দূর হইতে তাহাদের সেই তৃণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটির গুলি চিত্রের ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পীতবর্ণ সর্ষপ ফুল বাঁশ বনের অন্ধকার স্থানকে আলোকিত করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, পাহাড় গুলি ততই নিকটবর্ত্তী বোধ হইতে লাগিল। কোন কোন পাহাড় একেবারে নদীর জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ শৈল খণ্ডে ক্ষুদ্র তরঙ্গের অবিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাত এবং সূর্য্যকিরণ পতনবশতঃ অতি সুন্দর দৃশ্য প্রতিফলিত হইতেছিল। যে দিকেই নিরীক্ষণ করি সে দিকেই প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যে মন•প্রাণ বিমোহিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা নরাজ নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম ; তখন বেলা প্রায় ১১টা। নদীর সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে নরাজের ডাক বাঙ্গলা। পাহাড়ের পশ্চিম দিক বর্ষার প্রবল স্রোতে ধৌত হওয়ায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ডাক বাঙ্গলা হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দৃশ্য অতীব মনোহর। এইখান হইতে কাঠযুড়ী নামক মহানদীর একটি শাখা নির্গত হইয়াছে। পূর্ব্বে সম্বলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে এই পথে বাণিজ্য দ্রব্য সকল কটকে নীত হইত। এখন ইষ্টক এবং প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধ দ্বারা ওই শাখা নদীকে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং নদীর অধিকাংশ জলরাশি মহানদী দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে এবং পণ্য দ্রব্য সকল মহানদী দিয়া কটকে নীত হইয়া থাকে। ওই স্থানে বহু পরিমাণে “বেলে” পাথর পাওয়া যায়। কটকের আবশ্যক মত এই জাতীয় প্রস্তর এই স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। প্রস্তর খনি নদীর অতি সন্নিকট। নৌকায় প্রস্তর তুলিবার জন্য একটি ক্রেন (Crane) আছে। এই খনি হইতে এক মাইল দূরে দুইটি পাহাড়। তন্মধ্যে উচ্চতর পাহাড়টিতে আমরা অপরাহ্ণে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের উচ্চতা ৩০০। ৩৫০ ফুট হইবে। পাহাড়ে উঠিবার পথের বাম পার্শ্বে একটি অর্দ্ধ প্রোথিত অবস্থায় বৈরাগীর আশ্রম আছে। দেওয়ালে কৃষ্ণের কয়েকটি অবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। চিত্র গুলি নিতান্ত মন্দ নয়। পাহাড়ের উপর সিদ্ধনাথ দেবের মন্দির। জনৈক ভক্ত পথিকের কষ্ট লাঘব উদ্দেশ্যে মন্দিরে

উঠিবার জন্য অশীতি সংখ্যক প্রস্তর সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব পক্ষে হিতে বিপরীত হইয়াছে। সোপান শ্রেণীর জন্য উঠিবার সুবিধা দূরে থাকুক অসুবিধাই বিস্তর। উঠিবার কষ্ট চার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত স্মৃতি পটে জাগরূক ছিল। মন্দিরটি অনুমানিক ৬০ ফুট উচ্চ। ইহার নিম্ন অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরটি বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি ইহার জীর্ণ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ধবলেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় ইহার অভ্যন্তর তত অন্ধকার নয়। কতক গুলি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরের গাত্রে সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু সকলগুলিই নাসিকাহীন এবং ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটি মনুষ্য খোদিত গুহা আছে। বোধ হয় ইহা পুরাকালে কোন যোগীর আশ্রম ছিল। গুহায় দুইটি প্রকোষ্ঠ, বোধ হয় একটি শয়ন গৃহ এবং অপরটি রন্ধন শালা রূপে ব্যবহৃত হইত। যে প্রস্তর খণ্ডে এই গুহা খোদিত তাহা ৩০ ফুট উচ্চ ৪০ ফুট দীর্ঘ। পাহাড় কাটিয়া গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ মহাদেবের পূজা করিয়া যায়। কিন্তু স্থান জঙ্গল পূর্ণ বলিয়া রাত্রিতে এখানে থাকিতে কেহ সাহস করে না। মন্দির ও গুহা দেখিয়া পাহাড়ের আরও উচ্চ স্থানে উঠিলাম। তথা হইতে কটক সহরের শুভ্র অট্টালিকা শ্রেণীর কিয়দংশ, ধবলেশ্বরের মন্দির, মহানদী এবং কাঠযুড়ীর প্রবাহ অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। অসমান অপ্রশস্ত দীর্ঘ বক্র পথরেখার দুই পার্শ্বে ছোট বড় অগণ্য বৃক্ষ শ্রেণী, অতি সুসজ্জিত দেখাইতে ছিল। পাহাড়ের পাদদেশের অনতিদূরে হরিত ও পীত বর্ণের শস্য ক্ষেত্র, কোথাও শস্য পক্ক হওয়ায় ক্ষেত্রটি উজ্জল গাঢ় পীতবর্ণে শোভা পাইতেছিল। স্থানে স্থানে সমতল ভূমির উপরে এই শস্য ক্ষেত্রগুলি নানা কারুকার্য্য সম্বলিত গালিচা বিস্তৃত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। আশে পাশে কুটিরগুলি অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল। এই অপরূপ মন মুগ্ধকর দৃশ্যাবলী যেন চিত্রপটে অঙ্কিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরটির নিম্নার্দ্ধ পাহাড়ে খোদিত এবং উর্দ্ধাংশ পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখ হইতে উর্দ্ধাংশই দেখা যায়। মন্দিরটি দেবতাশূন্য। এখন তাহা চর্ম্মচটিকার আবাস এবং দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। এই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে তালগড় নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। কুটীরগুলির মৃণ্ময় প্রাচীর গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত। উপর হইতে তাহার শোভা অতি রমণীয়। এরূপ পরিষ্কার পল্লী কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এক একজনের দুই একখানি কুটীর, সম্মুখে অনতিবৃহৎ প্রাঙ্গন—প্রাঙ্গনে দুই চারিটি গাঁদা ফুলের গাছ, লাউ কুমড়ার মাচা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণের আনন্দ কোলাহলে প্রাঙ্গন পূর্ণ। রমণীগণ গৃহকার্য্যে ব্যস্ত, সে অতি সুন্দর মধুর দৃশ্য—কেমন নিরিবিলি ভাবে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া যাইতেছে, সেই চিন্তাই মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। কি পবিত্র শান্তি ও প্রফুল্লতার ভাব এখানে বিরাজিত। এই অল্পতুষ্ট দরিদ্র-দিগকে ঐশ্বর্য্যের দাম্ভিকতা ধনের গৌরবতা স্পর্শ করে নাই—তাই তাহাদের জীবন অতি সুখের—সংসার শান্তিময়।

১১ই অগ্রহায়ণ। নরাজের অপর তীরে দাভাকোট বা দেবীকোট নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা গেল। এখানেও একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে একটি স্বাভাবিক গুহা আছে, কিন্তু সময়াভাব বশতঃ তাহা দেখা হইয়া উঠিল না।

১২ই অগ্রহায়ণ। দাভাকোট হইতে আমরা কন্দরপুর বা কন্দর্পপুর নামক স্থানে পৌছিলাম। ইহার অনতিদুরে একটি দ্বীপের উপরে মহাদেবের একটি পুরাতন জীর্ণ মন্দির আছে। ইনি "পশ্চিমেশ্বর" নামে খ্যাত। পূজা পদ্ধতিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। একজন মালী ইহার পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যহ পুষ্প বিল্বপত্রদ্বারা মহাদেবের পূজা হয়। বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর লোককে মহাদেবের পূজা করিতে দেখা যায় না—এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন মহাদেবের পূজা করিতে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই। পূজারি ব্রাহ্মণগণ প্রাণভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া থাকিবে। সেই অবধি মন্দিরের মালীর দ্বারাই শিবের পূজার কার্য্য হইয়া থাকে। শিবের ধ্যান মন্ত্র ইহাদের কণ্ঠস্থ এবং উচ্চারণও পরিষ্কার। পুষ্প বিল্বপত্র হস্তে লইয়া মন্ত্র উচ্চারণান্তে অঞ্জলি প্রদান করে। এইরূপেই শিবপূজা সমাপ্ত হয়।

কন্দরপুরের সন্নিকটে একটি বিস্তৃত অরণ্য এবং ইহা নানাবিধ বিহঙ্গের আবাসভূমি। ঊষা আগমনে দোয়েল, পাপিয়া, ভৃঙ্গরাজের সুমধুর কাকলি বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া শূন্য মুক্ত বায়ুতে ছড়াইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পরে আবার তাহাদের সুমধুর সঙ্গীতের সহিত ঘুঘু এবং ছোট বড় নানাবিধ বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কণ্ঠ মিলাইতে লাগিল। সেই স্বর মিশ্রিত হওয়ায় অরণ্যে এক মহা কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। এরূপ সুমধুর রব দ্বারা কদাচিৎ আগন্তুক নগর ও পল্লীবাসীদিগের শ্রবণ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে কিন্তু অসভ্য অরণ্যবাসীর নিকট ইহার মধুরত্ব কোথায়! ঐ স্থান জঙ্গলশূন্য হইয়া চাষ আবাদ হইলে তাহারা কত সুখী হইত!

গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে আটগড়ের রাজা সম্প্রতি ইহাকে রক্ষিতারণ্য (Reserved forest) করিয়াছেন। জঙ্গলটিতে বৃহৎ বৃক্ষ অতি বিরল এবং চতুষ্পার্শেই পল্লী আছে। রক্ষিতারণ্য করায় এই সকল পল্লীর প্রজাদিগের অশেষ কষ্ট হইয়াছে। অনুকরণে সচরাচর বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ সামান্য জঙ্গলকে গবর্ণমেণ্ট কখন রক্ষিতারণ্য করিতেন না। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই অরণ্যের পার্শ্বস্থ যে সকল শস্যক্ষেত্র ছিল তাহা মৃগ ও বন্য বরাহ প্রভৃতির উৎপীড়ন জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও পাঁচ সাত বৎসরের পরে বৃহৎ হিংস্র জন্তুর সমাগম হইলে এই পল্লী সমূহের প্রজাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। রক্ষিতারণ্য না করিয়া ইহার আবাদ হইলে প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত হইবার এবং রাজারও আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন সে আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা।

এই জঙ্গলে কয়েক প্রকার সুন্দর সুন্দর পর্ণবৃক্ষ (ferns) পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বুধোপগ্রহণ।

সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহের নাম বুধ। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের ধারণা আছে যে, বুধ ও সূর্য্যের মধ্যভাগে অপর এক কিম্বা একাধিক ক্ষুদ্র গ্রহ বিচরণ করিতেছে; কেহ বা মনে করেন যে, ঐ স্থলে একরাশি উল্কা বিচরণ করিতেছে; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা স্থিররূপে জানা না যায় সে পর্য্যন্ত বুধকেই আমরা সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহ বলিব। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিতে এই গ্রহের, ৮৭ দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড সময় লাগে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ইহার আবর্ত্তনকাল ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ১০ পল ৪৬ বিপল। ইহার কক্ষ বৃত্তাভাসাকার,*—ঐ বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণকালে বুধ কখনও সূর্য্যের কিছু নিকটে এবং কখনও বা অপেক্ষাকৃত দূরে গমন করিয়া থাকে। যখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসে তখন সূর্য্যকেন্দ্র হইতে তাহার দূরত্ব ২,৮৫,৬৯০০০ মাইল, এবং যখন অত্যধিক দূরে যায় তখন তাহার দূরত্ব ৪,৩৩,৪৭০০০ মাইল হইয়া থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে ইহার দূরত্ব পরিমাণ গড়ে সাড়ে তিন কোটি মাইলের অধিক বলা যায়। বুধের আকার গোল, এবং তাহার ব্যাসপরিমাণ প্রায় তিন হাজার মাইল। পৃথিবী হইতে তাহাকে অতি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে—এ কারণ তাহার দেহ সম্পূর্ণ গোলাকার কিম্বা পৃথিবীর মতন চাপা তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষী বিশেষ অবধানতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে বুধের দেহ অপেক্ষাকৃত চাপা তাহার স্থূল-ভাগের ব্যাস হইতে চাপা অংশের ব্যাস প্রায় ত্রিশ ভাগের এক ভাগ ন্যূন। পৃথিবীর দেহের উভয়বিধ ব্যাসের অনুপাত প্রায় তিনশত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা বুধকে কলা পরিবর্ত্তনশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে। চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে অমাবস্যা হইতে ক্রমে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা হইতে ক্রমে অমাবস্যা স্থানীয় হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই রহিয়াছে যে পূর্ণিমাস্থানীয় বুধ সূর্য্যের অন্তরালে গমন করাতে তাহাকে একেবারেই দেখা যায় না; অমাবস্যাস্থানীয় অবস্থায় তাহা পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে সময়ে সময়ে তাহাকে তেজোময় সৌরদেহে কালিমার আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতির্ম্ময় সৌরদেহে বুধ কর্ত্তৃক এবম্বিধ কালিমা সম্পাতকে "বুধোপগ্রহণ" কহে।†

---

* Ellipse শব্দের বাঙ্গলা 'বৃত্তাভাস' অনেক কাল চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে ভবিষ্যতে ইহার ব্যবহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। গ্রীঅং—

† ভারতী (চৈত্র, ১৩০০) ৭১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রের কক্ষের ন্যায় বুধের কক্ষও ধরাকক্ষের সহিত ঈষৎ তীর্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; এ কারণ বুধ যতবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হয় ততবারই বুধোপগ্রহণ লক্ষিত হয় না। ঐরূপ মধ্যবর্ত্তী হওয়ার সময় বুধ যদি ধরাকক্ষ সমতলে কিম্বা তাহার অতি নিকটে অবস্থিতি করে তাহা হইলে বুধোপগ্রহণ দৃষ্ট হইবার কথা। এই হেতু সচরাচর কয়েক বৎসরান্তে একবার করিয়া বুধোপগ্রহণ ঘটিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বুধের একবার স্বীয় কক্ষে আবর্ত্তন করিতে প্রায় ৮৮ দিন লাগে। এই ৮৮ দিনে পৃথিবীও স্বীয় কক্ষের কিয়দংশ পরিক্রমণ করে। অতএব একবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হওয়ার পর বুধ ৮৮ দিবসান্তে ঐ স্থানে উপনীত হইলে পৃথিবীকে আর নিকটে দেখিতে পায় না; ততদিনে পৃথিবী যে স্থলে চলিয়া গিয়াছে বুধ অপেক্ষাকৃত দ্রুত-গতি বশতঃ সেই স্থান অতিক্রম করিয়া গেলে পৃথিবীর সহিত পুনরায় মধ্যবর্ত্তীত্বে উপস্থাপিত হইবে। পৃথিবী ৮৮ দিবসে প্রায় ৮৬½ অংশমিত বৃত্তাংশ গমন করে; এ দিকে আবার বুধ প্রতিদিন পৃথিবী হইতে প্রায় ৩১/১০ অংশ অগ্রে গমন করে। অতএব বুধ স্বীয় কক্ষে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিলে পৃথিবী তাহা হইতে ৮৬½ অংশ অগ্রে অবস্থিতি করিবে এবং বুধের ঐ দূরত্ব অতিক্রম করিতে প্রায় ২৮ দিন লাগিবে। এইরূপে দেখা যায় যে বুধ একবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইলে পুনরায় ঐরূপ হইতে প্রায় ১১৬ দিবস লাগে।

কোন গ্রহ কক্ষ যে দুই বিন্দুতে ধরাকক্ষ সমতলকে ছেদ করে তাহাদিগকে ঐ গ্রহের 'পাত' বলা যায়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, বুধ যখন স্বীয় কক্ষের 'পাত' বিন্দুতে কিম্বা তাহার অতি সন্নিকটে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হয় তখনই বুধোপগ্রহণ ঘটে। মনে করা যাউক একবার 'পাত' সান্নিধ্যে অবস্থিতি কালে ঐরূপ উপগ্রহণ ঘটিয়াছে; পুনরায় যখন বুধ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হইবে তখন তাহা স্বীয় কক্ষপথের 'পাত' হইতে প্রায় ৬৬ অংশ পশ্চাতে থাকিবে, অতএব কোন পাতেই উপগ্রহণ ঘটিতে পারিবে না। তৃতীয় বার যখন বুধ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হইবে তখন তাহা দ্বিতীয় পাত হইতে ৪৮ অংশ অগ্রে থাকিবে, অতএব সে স্থলেও উপগ্রহণ ঘটা অসম্ভব।

গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় যে বুধ যথাক্রমে প্রতি তিন বৎসরান্তে একবার মে মাসে ও একবার নবেম্বর মাসে পাত-সন্নিধানে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি মনে করা যায় যে একবার মে মাসেতে উপগ্রহণ ঘটিল, তবে সাধারণতঃ তাহার তিন বৎসরান্তে যে মে মাস আসিবে তাহার পরবর্ত্তী নবেম্বরেতে অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসরান্তে পুনরায় উপগ্রহণ ঘটিবার সম্ভাব্যতা দেখা যায়। কিন্তু ইহা জানিতে হইবে যে ঠিক সাড়ে তিন বৎসরান্তে বুধ মধ্যগত হইলেও পাতস্থানীয় হয় না; আবার স্থল ও সময় বিশেষে তিন বৎসরান্তে সূর্য্যের বিপরীত দিকে এবং ছয় বৎসরান্তে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হইয়া পাতস্থানীয় হইয়া থাকে। এইরূপে জানা যাইতেছে যে একবার ছয় বৎসরান্তে ও পুনরায়

৭ বৎসরান্তে নবেম্বর মাসে উক্ত নিয়মে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মে মাসে যথাক্রমে উপগ্রহণ ঘটিবার লক্ষণ দেখা যায়।

পূর্ব্বে কথিত হইল যে, ঐ সকল সময়ে গ্রহ ঠিক পাতে সমাবিষ্ট হয় না। সূর্য্যের স্ফুটব্যাস পৃথিবী হইতে কলামানে মে মাসে ৩১ কলা ৪৪ বিকলা এবং নবেম্বরে ৩২ কলা ২৪ বিকলা হইয়া থাকে। উপরোক্ত কালে যদি গ্রহবিম্ব মধ্যগত হওয়ার সময় সূর্য্যের কেন্দ্র হইতে সৌরবিম্বের ব্যাসার্দ্ধ হইতে অধিক দূরে অবস্থিতি করে তবে আর উপগ্রহণ ঘটিতে পারিবে না।

একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক ;—বিগত ১৮৯১ খৃঃঅঃ ৯ই মে যে বুধোপগ্রহণ ঘটে তাহাতে গ্রহ সৌরকেন্দ্রের দক্ষিণ ভাগে ১২ কলা ৩৪ বিকলা দূর দিয়া গমন করিয়াছিল। বিগত ১০ই নবেম্বর পুনরায় উপগ্রহণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে গ্রহ সৌরকেন্দ্রের ৪ কলা ২৬ বিকলা মাত্র উত্তরভাগ দিয়া গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে ১৮৯৮ খৃঃ অঃ মে মাসে এক উপগ্রহণ ঘটিবার কথা, কিন্তু তাহাতে গ্রহ সৌরকেন্দ্র হইতে ৩৪ কলা, ৪৭ বিকলা উত্তরে থাকিবে ; অতএব ঐ স্থলে তাহা সৌরবিম্বের বহির্ভাগে থাকাতে উপগ্রহণ ঘটিবে না। আবার ১৯০১ খৃঃঅঃ নবেম্বরে উপগ্রহণ ঘটিবার কথা, কিন্তু তখন গ্রহ সৌরকেন্দ্র হইতে ১৮ কলা ৫০ বিকলা দক্ষিণে থাকিবে। নবেম্বরে সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ ১৬ কলা ১২ বিকলা মাত্র, অতএব এ স্থলেও উপগ্রহণ অসম্ভব হইবে।

আমেরিকার সুবিখ্যাত জ্যোতিষী নিউকুম বুধের এই স্থিতিবৈচিত্র্য গণনা করিয়া যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে নবেম্বর মাসের উপগ্রহণকালে ধরা-কক্ষের সহিত তুলনায় নিম্নলিখিত স্থিতি বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে ;—

৬	বৎসরান্তে	গ্রহ	৩১	কলা	৩৫	বিকলা	উত্তরে
ও ৭	„	„	২৩	„	১৬	„	দক্ষিণে

অপসরণ করতঃ সৌরবিম্ব অতিক্রমণ করে। সেইরূপ মে মাসের উপগ্রহণ কালে—

৬	বৎসরান্তে	৬৫	কলা	৩৭	বিকলা	দক্ষিণে
ও ৭	„	৪৮	„	২১	„	উত্তরে

অপসরণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে এই বিধান প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ বর্ষে উপগ্রহণ ঘটিবে। পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ১৮৯৮ খৃঃঅঃ মে মাসে সৌরকেন্দ্র হইতে গ্রহের দূরত্ব ৩৫ কলা, ৪৭ বিকলা উত্তরে, এবং ১৯০১ খৃঃঅঃ মে মাসে ১৮ কলা ৫০ বিকলা দক্ষিণে থাকিবে ; অতএব সৌরকেন্দ্র হইতে গ্রহের দূরত্ব—

১৯০৪	খৃষ্টাব্দে	মে মাসে	২৯ কলা,	৫০	বিকলা	(দক্ষিণে)
১৯০৭	„	নবেম্বরে	১২ „	৪৫	„	(উত্তরে)
১৯১১	„	মে মাসে	১৮ „	৩১	„	(উত্তরে)

১৯১৪	খৃষ্টাব্দে	নবেম্বর	১০ কলা	৩১ বিকলা	(দক্ষিণে)
১৯১৭	„	মে মাসে	৪৭ „	৬ „	(দক্ষিণে)
১৯২০	„	নবেম্বর	২১ „	৪ „	(উত্তরে)
১৯২৪	„	মে মাসে	১ „	১৫ „	(উত্তরে)
১৯২৭	„	নবেম্বর	২ „	১২ „	(দক্ষিণে)

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে যেহেতু মে ও নবেম্বরে সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ যথাক্রমে ১৫ কলা ৫২ বিকলা, ও ১৬ কলা ১২ বিকলা থাকে অতএব বিগত উপগ্রহণের পর ১৮৯৮, ১৯০১, ১৯০৪, ১৯১১, ১৯১৭ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উপগ্রহণ লক্ষিত হইবে না। পরন্তু ১৯০৭, ১৯১৪, ১৯২৪ এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উপগ্রহণ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে পর পর হিসাব করিয়া দেখিলে যে সকল বর্ষে উপগ্রহণ সম্ভাবনীয় তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই গণনারও "বিকল্প" আছে; যথা,—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যদি গণনা করা যায় তবে দেখা যাইবে ঐ বৎসর নবেম্বরে বুধ সৌরকেন্দ্র হইতে ১৭ কলা ৯ বিকলা (দক্ষিণে) দূরে থাকিবে। অতএব ঐ স্থলে সৌরদেহ হইতে গ্রহের দূরত্ব ৫৭ বিকলা মাত্র দৃষ্ট হইবে। কিন্তু যদি তথায় বুধ অন্য গ্রহ কিম্বা অপর কোন জাতীয় পদার্থ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কিছুমাত্র বিচলিত হয় তবে তাহার সৌরবিম্বোপরি সম্পাতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেইরূপ ১৯৩৭ খৃঃঅঃ মে মাসে গ্রহ সৌরকেন্দ্র হইতে ১৬ কলা ১ বিকলা দূরে থাকিবে; অতএব তথায় সৌরবিম্ব হইতে ৯ বিকলা মাত্র দূরে থাকাতে ঐ সময় উপগ্রহণ দৃষ্ট হওয়ার আরও অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এ স্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে বুধ ৩½ বৎসরে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইলেও পাত-স্থানীয় না হওয়াতে সর্ব্বত্র ৩½ বৎসরান্তে উপগ্রহণ ঘটিতে পারিতেছে না। আবার ৬ বৎসরান্তে উপগ্রহণের সংখ্যাও অতি বিরল, এবং মে মাসে তাহা ঘটা অসম্ভব। কারণ, পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে নবেম্বরের উপগ্রহণে ৬ বৎসরান্তে বুধ ধরাকক্ষের সহিত তুলনায় ৩১ কলা, ৩৫ বিকলা (উত্তরে) অপসরণ করিয়া থাকে, এই অপসরণের পরিমাণ প্রায় সৌরব্যাসের সমান হওয়াতে, (উভয়ের অন্তর ৪৯ বিকলা মাত্র) প্রথম উপগ্রহণ প্রায় সৌরব্যাসই পরিমিত দক্ষিণাংশে অর্থাৎ সৌরবিম্বের প্রায় প্রান্তপ্রদেশে না ঘটিলে তাহার ছয় বৎসরান্তে পুনরায় উপগ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ কারণে ইহা দৃষ্ট হইবে যে মে মাসের উপগ্রহণে ছয় বৎসরান্তে উপগ্রহণ ঘটিতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কত বৎসরান্তে উপগ্রহণ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নবেম্বরের উপগ্রহণে বুধ ৬ বৎসরান্তে ৩১ কলা ৩৫ বিকলা (উত্তরে)

ও ৭ „ ২৩ „ ৩৬ „ (দক্ষিণে) সরিয়া যায়।

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে—

	১৩ বৎসরান্তে	৮	কলা	১৯	বিকলা	(উত্তরে)
	২০	,,	১৪	,,	৫৭	,,	(দক্ষিণে)
	৩৩	,,	৬	,,	৩৮	,,	(দক্ষিণে)
	৪৬	,,	১	,,	৪১	,,	(উত্তরে)
এবং	২১৭	,,	০	,,	১৪	,,	(উত্তরে)

বুধ সৌরদেহাতিক্রম করিবে। অতএব ঐ সকল সংখ্যক বৎসরান্তে উপগ্রহণ সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। আবার ইহা দেখা যাইতেছে যে ২১৭ বৎসরান্তে গ্রহ আবার প্রায় স্বস্থানে উপনীত হইয়া সৌরদেহাতিক্রম করিয়া থাকে; অতএব ২১৭ বৎসরান্তে পুনরায় ৬ বৎসরান্তরীয় উপগ্রহণ সংঘটনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত ১৭৭৬ ও ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরে দুইটি উপগ্রহণ ঘটিয়া গিয়াছে; আবার ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা, গণনাদ্বারাও ইহা সপ্রমাণিত হয়। ঐ দুই বৎসরে সৌরকেন্দ্র হইতে গ্রহের দূরত্ব যথাক্রমে ১৫ কলা ২৯ বিকলা (দক্ষিণে) এবং ১৬ কলা ৬ বিকলা (উত্তরে) থাকিবে। আবার তাহার ২১৭ বৎসরান্তে এইরূপ হইবেঃ—

২২১০ খৃষ্টাব্দে গ্রহের সৌরকেন্দ্রান্তর ১৫ কলা, ১৫ বিকলা (দক্ষিণে)

ও ২২১৬ „ „ ১৬ „ ২০ বিকলা (উত্তরে)

এ স্থলে দৃষ্ট হইবে যে ২২১৬ খৃষ্টাব্দে উপগ্রহণ না ঘটিবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, তথায় সৌরব্যাসার্দ্ধ ১৬ কলা ১২ বিকলা মাত্র। এক্ষণে যে উপগ্রহণের পর্য্যায় গণনা করা যাউক :—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে উপগ্রহণ কালে গ্রহের অপসরণ পরিমাণ

	৬ বৎসরান্তে	৬৫	কলা	৩৭	বিকলা	(দক্ষিণে)
	৭	„	৪৮	„	২১	„	(উত্তরে);
অতএব	১৩	„	১৭	„	১৬	„	(দক্ষিণে)
	২০	„	৩১	„	৫	„	(উত্তরে)
	৩৩	„	১৩	„	৪৯	„	(উত্তরে)
	৪৬	„	৩	„	২৭	„	(দক্ষিণে)
	২১৭	„	০	„	১৭	„	(উত্তরে)

এ স্থলে প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে যেহেতু ছয় বৎসরান্তে বুধ সৌরব্যাসের দ্বিগুণেরও অধিক সরিয়া যায় অতএব একবার উপগ্রণের ছয় বৎসর পরে গ্রহ পুনরায় সৌরদেহ অতিক্রম করিতে পারে না। সেইরূপ ৭ বৎসরান্তেও উপগ্রহণ ঘটিতে পারে না। ইহাও লক্ষিত হইবে যে নবেম্বরের উপগ্রহণে যেরূপ ছয় বৎসরান্তরীয় উপগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে মে উপগ্রহণেও সেইরূপ ২০ বৎসরান্তে উপগ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু এক উপগ্রহণ

সৌরবিম্বের দক্ষিণাংশের প্রায় প্রান্তভাগে না ঘটিলে ২০ বৎসরান্তে আবার উপগ্রহণ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। নবেম্বরের উপগ্রহণের ন্যায় মে উপগ্রহণেও দেখা যায় যে ২১৭ বৎসরান্তে বুধ পুনরায় প্রায় স্বস্থানে আগমন করিয়া থাকে।

এক্ষণে একটা প্রশ্ন এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বুধোপগ্রহণ কেবল মে মাসে ও নবেম্বর মাসেই ঘটিবার কারণ কি?—তাহার কারণ এই যে, বুধের কক্ষের পাতদ্বয় ক্রান্তিবৃত্তের যে প্রদেশের সহিত এক সমসূত্রে অবস্থিত পৃথিবী উপরোক্ত মাসে সেই প্রদেশ পরিক্রমণ করিয়া থাকে। বুধ এবং পৃথিবী উভয়ে উক্ত প্রদেশে একত্র সমাবিষ্ট না হইলে উপগ্রহণ ঘটিতে পারে না। এ কারণ ঐ দুই মাস ভিন্ন বুধের উপগ্রহণ ঘটা অসম্ভব।

বুধোপগ্রহণের উপযোগিতা বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্ সমাজে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। মানুষ স্বার্থপর জাতি, কেবল নিজের কিসে উপকার হইতে পারে তাহাই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে। পৃথিবীর দূরতা নির্ণয়ার্থ "শুক্রোপগ্রহণ" অতি উপাদেয়; তাই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াও "শুক্রোপগ্রহণ" পর্য্যবেক্ষণার্থ দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। কিন্তু বুধোপগ্রহণ দ্বারা কেবল মাত্র বুধতত্ত্ব আর কিছুই জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং বুধতত্ত্ব এত জটিল যে তাহার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা অতীব দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুধ অতি ক্ষুদ্র গ্রহ, এবং সূর্য্যের অত্যধিক নিকটবর্ত্তী; এ কারণ সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে সূর্য্যের আকর্ষণ তাহাতে অতিশয় প্রবল হওয়াতে তাহার গতি পর্য্যালোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বুধের গতি পর্য্যালোচনার ন্যায় অপর সকল গ্রহেরই গতি পর্য্যালোচনা এত জটিল ভাব ধারণ করে নাই। ইহার কারণ এই যে, বুধের গতিতে নিয়তই কোন অজ্ঞাতকুলশীল পদার্থের আধিপত্য লক্ষিত হইতেছে। এই আধিপত্যের কারণাবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বুধতত্ত্ব সুসাধিত হইতে পারিতেছে না। এ দিকে আবার বুধ এত দ্রুত গমন করে এবং সর্ব্বদা সূর্য্যের এত নিকটে থাকে যে তাহাকে, মুক্তনেত্রে দূরে থাকুক, দূরবীক্ষণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোপর্ণিকসের জীবনের একটী মহৎ দুঃখ এই ছিল যে তিনি বুধ গ্রহকে কখনও জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন নাই। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্ব গগনে অথবা সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরে পশ্চিম গগনে ভিন্ন আর কুত্রাপি বুধকে দেখা যায় না। একজন ইংরাজ জ্যোতিষী বহুকাল চেষ্টা করিয়াও বুধকে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "বুধ সূর্য্যরাজার ভৃত্যবিশেষ,—বহুলোকের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে স্বীয় প্রভুর অন্তরালে থাকিয়া চলা ফিরা করিতেছে, যেন প্রভুর ভয়ে কেহ তাহাকে কিছু বলিতে না পারে।"

যদিও সাধারণতঃ বুধকে নেত্রগোচর করা সাধ্যায়ত্ত নহে কিন্তু তথাপি বুধ লাভেরিয়ের গণিত সমস্যার হাত এড়াইতে কিছুতেই সক্ষম হয় নাই। লাভেরিয়ে যে কেবল বুধকে কবলিত করিয়াছেন তাহা নহে, বুধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক গুপ্ত প্রণয়িনীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আবিষ্কার

করিয়াছেন। লাভেরিয়ের বুধতত্ত্ব * নামক গ্রন্থই এক্ষণে বুধ বিষয়ে একমাত্র আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে অজ্ঞাতকুলশীল পদার্থ গোপনে থাকিয়া বুধকে বিচলিত করিতেছে তাহার পরিচয় না পাওয়াতে ঐ বিচলনের স্বরূপ সুস্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে না। লাভেরিয়ের মৃত্যুর পর আমেরিকান জ্যোতিষী অধ্যাপক নিউকুম্ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের সম্যক্ মীমাংসা না হইবে সে পর্য্যন্ত বুধের গতিবিচলন জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত বুধোপগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। গণনা দ্বারা যে সময়ে বুধের সৌরদেহোপরি সম্পাত কাল সাধিত হয়, পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দলের সহিত তাহার বৈষম্য জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, এবং সেই বৈষম্যানুসারে তাহার জনয়িতা পদার্থের স্থিতি ও স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া সম্ভাবনীয়। কিন্তু তাহারও একটী বিশেষ অন্তরায় এই রহিয়াছে যে সূর্য্যকিরণের প্রাখর্য্য ও উপরোক্ত পদার্থের (বা পদার্থ নিচয়ের) ক্ষুদ্রতানুসারে তাহার দর্শনীয়তার অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই সকল নানা উৎকট কারণে বুধ এক প্রকার অসম্পাদ্য সমস্যারূপে জ্যোতির্ব্বিদ সমাজের পরিহার্য্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ সমাজের নিকট বুধোপগ্রহণের আদরও হ্রাস হইয়াছে। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বুধোপগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণকে পণ্ডশ্রম বিবেচনা করেন। কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বুধ একটী অতি জটিল সমস্যা, এবং ইহার সম্পূরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই সমস্যার সম্পূরণ জন্য জগতে দ্বিতীয় লাভেরিয়ের অবতারণ প্রয়োজন হইবে!

শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

রাজা রামমোহন রায়ের ডাকাইতি।

অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত "রামমোহন ও রামজয় বটব্যাল" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই একটী বলিবার কথা আছে। নানা কারণে ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধটি দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল।

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে। * * * তাঁহার জীবন-চরিত লেখক (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) মহাশয় যদি অনর্থক ৺রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে, এই প্রতিবাদ আবশ্যক হইত না।" প্রতিবাদের বিষয় এই:—নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া ৺রামজয় বটব্যাল তাঁহার

* *Theorie du Mercure*, par V-J.J. Le Verrier.

প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করেন। লেখক মহাশয় বলেন, "প্রকৃত পক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচার করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।"

প্রমাণ স্থলে লেখক হুগলীর জজ-আদালতের নথি হইতে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ৺রামজয় বটব্যাল মহাশয় একটী মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহার আরজি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরজিতে বর্ণিত আছে যে রামমোহন রায় ও তাঁহার নায়েব শতাধিক লাটিয়াল লইয়া "দলাদলীর আখেজে দাঙ্গা হাঙ্গামার দ্বারায়" বাদী ৺ রামজয় বটব্যালকে কতক জমী হইতে বেদখল ও ধান্য ফশল লুট তরাজ করিয়াছিলেন এবং বৃক্ষাদি কাটিয়াছিলেন। এ কারণ ২০৯২ টাকার দাবীতে বাদীর নালিশ।

লেখক বলেন, "এই মকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন।"

আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যাইতেছে :—

(১) লেখকের প্রতিবাদের কারণ—নগেন্দ্রবাবুর "অনর্থক ৺ রামজয় বটব্যালের উপর কলঙ্ক দিয়া" রামমোহনকে "বাড়াইবার চেষ্টা।"

রামমোহন রায় যে ক্ষমাশীল সহিষ্ণুতার সহিত মতের জন্য পীড়ন স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার অপর অনেক প্রমাণ আছে। অতএব নগেন্দ্রবাবু ৺ রামজয়-বটব্যালের অত্যাচারের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও রামমোহন রায়ের কোন বৃদ্ধি নাই। তবে ৺ বটব্যাল মহাশয়ের বংশধরগণ কৃতী ও বর্ত্তমান। এজন্য লেখকের প্রতিবাদ অনাবশ্যক হয় নহে; ইহার দ্বারা উদ্দেশ্যান্তর সাধিত হইয়াছে।

(২) লেখকের প্রতিজ্ঞা—"রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।"

আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রতিজ্ঞাটী দুই অংশে বিভক্ত হইতে পারে :— (ক) ৺ বটব্যাল মহাশয় রামমোহনের উপর উৎপাত করেন নাই; (খ) রামমোহন তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।

(৩) প্রতিজ্ঞার সাধন—"রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচার আদালত-সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে, তাহার কতক কতক নিদর্শন আজও পাওয়া যাইবে।" "রামজয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বটব্যাল" ঐ নথি-সমুদ্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আরজি উদ্ধার করিয়াছেন। উহা হইতে পাওয়া যায় যে, ৺ রামজয় বটব্যাল মহাশয় রামমোহন রায়কে ডাকাইতি প্রভৃতি বহুবিধ ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া প্রতিকারের জন্য দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইয়াছিলেন, যেখানে ওরূপ অপরাধের বিচার অসম্ভব।

মকদ্দমার ফলে ৺ বটব্যাল মহাশয় ডিক্রিলাভ করেন। কিরূপ ডিক্রি তাহার উল্লেখ

নাই। তবে আরজির ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় টাকার ডিক্রি। সাধ্যের (খ) অংশের সিদ্ধির জন্ত শুধু ডিক্রি যথেষ্ট নহে*। কেননা ডিক্রির বলে রামমোহন রায় খেসারতের দায়ী হইয়াছিলেন বলিয়া যে "দলাদলির আখেজে লুট তরাজ" করিয়াছিলেন এরূপ স্থায় যুক্তি দেখা যায় না। লেখক মহাশয় রামমোহনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া থাকিতে পারেন কিন্তু নিজ প্রবন্ধে তাহা প্রকটিত করেন নাই। কেন বলা কঠিন। প্রমাণের অভাবই কি ইহার কারণ নহে? লেখক মহাশয় নিঃসংশয়ে বলিয়াছেন যে, "কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল" তাহার প্রমাণ ৺ রামজয় বটব্যাল মহাশয়ের আরজি। উক্ত আরজি লেখক মহোদয় আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই কেন? তাহা হইলেই ত সকল আপদের শান্তি হইত এবং ৺ বটব্যাল মহাশয়ের যশঃজ্যোতি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আসিয়া পহুঁছিত। কিন্তু তাহা হইলেও একটী সাধ্যের সাধনের অভাব থাকিয়া যাইত যে ৺ রামজয় বটব্যাল মহাশয় রামমোহনের উপর উৎপাত করেন নাই। এ সাধ্যের প্রতি লেখক মহাশয় এত বিমুখ কেন যে ইহাকে একটা "হেলা ফেলা" গোছ প্রমাণ হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন? অথবা তাঁহার বিচারে একজন বিধর্ম্মীর সম্বন্ধে স্থানীয় কামরূপী জনশ্রুতির ৭৯ বৎসরের পরবর্ত্তী ক্ষীণীভূত প্রতিধ্বনিই যথেষ্ট প্রমাণ আর ৺ বটব্যাল মহাশয় যে রামমোহন রায়ের উপর মিথ্যা দোষারোপ করেন নাই ইহাত স্বতঃসিদ্ধ।

উপসংহারে বক্তব্য যে, বটব্যাল বংশের পূর্ব্বকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া লেখক মহোদয় সাধারণকে ঋণী করিয়াছেন। তবে রামমোহন রায়ের কর্ত্তৃক দলাদলীর আখেজে ডাকাইতি আচরিত হইয়াছিল কি না তৎ সম্বন্ধে তিনি যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অসামর্থ্য নির্ম্মৎসর পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন এবং লেখককে সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ দিবেন—এরূপ বিশ্বাস হয়।

শ্রীমোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

* লেখক মহোদয়ের নিকট বিনীতভাবে একটি জিজ্ঞাস্য আছে:—উক্ত মকদ্দামায় রামমোহন কি কোন জবাব দিয়াছিলেন? যদি দিয়া থাকেন লেখক কি তাহা দেখিয়াছেন? রামমোহন দলাদলির আখেজে লুট তরাজ করিয়াছিলেন কি না এ বিষয়ে কি কোন "ইস্থু" ধার্য্য হইয়াছিল। বাদী ডিক্রী পাইলেই যে তাহার আরজির প্রতি কথা বেদবাক্য ইতিপূর্ব্বে ইহা শুনা যায় নাই। লেখক মহাশয় কি শুনিয়াছেন?

ব্রীটিশ রাজনীতি।

বিলাতীয় রাজনীতির বিশেষত্ব কি তাহা বুঝাইতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাঁহারা ইহার ফলাফল ভোগ করিবেন ইহার গঠন তাঁহাদেরই হস্তে। এই জন্য এই রাজনীতি ইংরাজ জাতীয় জীবনের সহিত বিশিষ্ট ভাবে সংলগ্ন হইলেও ইহা হইতে সকল জাতিই শিক্ষালাভ করিতে পারেন, ইহা মানব বিজ্ঞানের এক বিশেষ অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় স্থানের অধিকারী। আমরা ইংরাজ রাজনীতির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি,না। সে প্রসঙ্গ দুরূহ ও বহুল সময় সাপেক্ষ। ইহার যে ভাব লইয়া এক্ষণে বিলাতের লোকসমূহ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইতেছেন, আগ্রহ ও দুরাশা প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই কথঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক বিলাতীয় আধুনিক রাজনীতির বিষয়ে শুধু ইহার দার্শনিক অর্থের কথা বলিলে ইহার অতীব অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইবে। যে চিন্তা, ব্যাকুলতা, আগ্রহ ও আশার কথা বলা হইল, এই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ইহার জীবন্ত ভাব সম্পূর্ণ প্রতীত হইবে না। আমাদের সে বর্ণনা-কৌশল নাই, থাকিলেও সে ভাব ব্যক্ত করা সহজ নহে। যিনি হাইড্‌পার্কে সভাসমিতিতে কখনও উপস্থিত হন নাই, রাজনৈতিক সমিতিতে বিপরীত পক্ষীয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না দেখিয়াছেন, পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচনের সময় নিজে ভোট দিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে যোগ না দিয়াছেন, সভ্য নির্ব্বাচনের পর সহরের সাধারণ গম্য স্থানে জনতার মধ্যে ঊর্দ্ধমুখে তাহার ফলের জন্য অপেক্ষা না করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইলে হর্ষজনক চীৎকারে যোগ না দিয়াছেন, কিম্বা যিনি পার্লামেণ্ট সভায় কখনও প্রবেশাধিকার পান নাই, তাঁহাকে বর্ণনাদ্বারা ইংরাজ রাজনীতির জীবন্ত ভাব বুঝাইতে যাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। বাস্তবিক এই সকলে যোগ না দিলে বুঝিতে পারা যায় না ইংরেজের জাতীয় দম্ভের কারণ কি? তাহার মধ্যে থাকিয়া অনেক সময়ে ভুলিয়া যাইতে হয় আমাদিগের এ সকলের সহিত সংশ্রব খুব অল্পই। সেরূপ ভুলিয়া যাইবার কারণও অনেক আছে। স্বাধীনতার রাজ্যে ভারতীয় ও আফ্রিকান সূর্য্যে তাপিত মনুষ্যও স্বাধীনতা লাভ করে। গত সাধারণ সভ্যনির্ব্বাচনে আমার দুইটি ভোট ছিল। জীবনে আর হয়ত কখনও তাহা হইবে না, পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যনির্ব্বাচনে মত নিবদ্ধ করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লইয়াছি।

এই রাজনীতির বর্ত্তমান লক্ষণ প্রণিধান করিবার জন্য গত বৎসর যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। গত বৎসর দুইবার লর্ড রোজবেরী-প্রমুখ

মন্ত্রীদল আত্মপক্ষীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হন। পার্লামেণ্টে সমাদৃত হইবার পরেই মিঃ ল্যাবুসিয়ার প্রস্তাব করেন লর্ড সভার আইন পাস সম্বন্ধে যে ক্ষমতা আছে তাহা আর থাকা সঙ্গত নহে। মন্ত্রীদলের অমতেও সে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। যাঁহারা ইহার পক্ষ সমর্থন করেন না তাঁহারা অবশ্য জানিতেন না যে মন্ত্রীদল ইহাতে পরাভব লাভ করিবেন, কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইতেছে উন্নতিশীল দলের অগ্রগামী সভ্যগণের এ বিষয়ে মতামত কি? কিন্তু তাই বলিয়া এই বিষয়টি যে আধুনিক রাজনীতির মূলমন্ত্র ইহা মনে করিলে ভ্রমে পড়িতে হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার অগ্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী দল সকলের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

স্থূলতঃ ধরিতে গেলে পার্লামেণ্ট মহাসভায় চারটি প্রধান প্রধান দল আছে। কিন্তু স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল দলের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ পার্থক্য ছিল এখন আর তাহা নাই। প্রথম রিফর্ম্ম বিল পাস হইবার পর হইতে স্থিতিশীলতা ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্ব্বে দুই সভাতেই লর্ডদিগের একপ্রকার একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল। নিজেরা বড় সভায় বসিতেন, এবং ছোট সভায় আপনাদের পেটাওয়া লোকেদের অধিবেশন হইত। সে বিল পাসের বিবরণ ইতিহাস মাত্রেই পাওয়া যায়। তৎসংক্রান্ত একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। মিঃ গ্লাডষ্টোন তখন ইটন ছাত্রসভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, সে সভায় এই বিলের বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ গ্লাডষ্টোনের দোষ গুণ সমস্তেরই অস্ফুট আভাস পাওয়া যায় তাঁহার দীর্ঘ জীবনে রাজনৈতিক মতের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেমন একটা রহস্যময় রাজনৈতিক idealism তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপেই লক্ষিত হয়। যাহা হউক প্রথম পার্লামেণ্ট সংস্করণের আইন পাস হইবার পর শাসনভার ক্রমশঃই সাধারণ লোকের হস্তে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে স্থিতিশীলদলেরও উন্নতিশীলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাদের যাহাও বা কিছু স্থিতিশীলতা ছিল ১৮৬৬ সালে প্রত্যেক গৃহস্থকে সাধারণ সভার সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিয়া তাহাও তাঁহারা এক প্রকার ছাড়িয়া দিলেন। এ বিল মিঃ গ্লাডষ্টোন প্রথমতঃ প্রস্তাব করেন, তাহাতে পরাভূত হইয়া মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন, কিন্তু মিঃ ডিজ্‌রেলি ও লর্ড ডার্বি মন্ত্রীত্ব পাইয়া সেই আইনই পাশ করিলেন। এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে এক নূতন নীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার নাম Opportunism, অর্থাৎ যাহা সুবিধা তাহাই কর্ত্তব্য কোন বিশ্বাসের দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়ে চালিত হইতে যাওয়া ভ্রমাত্মক। এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্থিতিশীলদিগের অন্যতম নেতা মিঃ বালফোর। তিনি একদিকে সাধারণতন্ত্র শাসন বিধির পক্ষপাতী, অপরদিকে স্থিতিশীলদিগের একজন নেতা। তাঁহাদের প্রধান নেতা লর্ড সল্‌সবারি এরূপ সুস্পষ্টভাবে তাঁহার মতের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু তাঁহারও বিশ্বাসের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। উন্নতিশীলদিগের মধ্যে যাহারা আয়ার্লণ্ডকে স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের স্থিতিশীলদিগের সহিত

সমবেত কার্য্যকলাপে এই পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে ঘটিয়াছে। লর্ড সল্সবারি ডিজ্‌রেলির পূর্ব্বোল্লিখিত আইনের বিরোধী ছিলেন; এক্ষণে শেষোক্ত দলের অন্যতম নেতা মিঃ চেম্বারলেন তাঁহার সহকারী। ইনি বয়স্ক অধিবাসী মাত্রেরই নির্ব্বাচন ক্ষমতার পক্ষপাতী। সুতরাং আশ্চর্য্য কি যে বিভিন্ন দলের পার্থক্য এক্ষণে সাধারণ মত ও বিশ্বাস গত নহে, বিশেষ মত ও বিশ্বাস গত! ব্রীটিশ রাজনীতির এই আধুনিক বিশেষত্ব পরে আরও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এই তিন দল ব্যতীত আয়ার্লণ্ডের একটি দল আছে। আয়ার্লণ্ডের যাহাতে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট ও স্বতন্ত্র শাসন ভার লাভ হয় তাহার চেষ্টা করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় নেতার অভাবে এই দলের কার্য্যকলাপ অতীব বিস্ময়জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দলের গঠন মিঃ পার্ণেলের মেধা ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আইরিস নেতাগণ কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়া, কেহ ডাইনামাইটাদির দ্বারা, কেহ বা নিষ্ফল বক্তৃতার দ্বারা আয়ার্লণ্ডের হিত সাধনের চেষ্টা করিতেন। মিঃ পার্ণেলই প্রথম সকল দলের সামঞ্জস্য করিয়া পার্লমেণ্টের সাহায্যে নিজকার্য্য সাধনের সম্ভাবনা দেখিলেন, ও তদনুসারে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজে ইংরাজ ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও রোমান ক্যাথলিক আইরিসদিগের বশ করিয়া লইলেন। যখন তাঁহার যশঃসৌরভে সমগ্র ব্রীটিশ দ্বীপপুঞ্জ আমোদিত, যখন নিজ ক্ষমতাবলে গ্লাডষ্টোন-প্রমুখ উন্নতিশীল দলকে তিনি স্বীয় মতাবলম্বী করিতে সক্ষম হইলেন, আয়র্লণ্ডের অভিলাষ সফল হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল, এমন সময়ে তাঁহার চরিত্রে এক বিশেষ দোষ আরোপিত হইল। আয়ার্লণ্ডের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই ইহা অবিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িল। মিঃ গ্লাডষ্টোনের অনুরোধে আয়ার্লণ্ডীয় সভ্যগণের অধিকাংশই মিঃ পার্ণেলের নেতৃত্ব অস্বীকার করিলেন। তিনিও আর পূর্ব্বের সুবুদ্ধির ন্যায় কার্য্য করিলেন না। তিনি যদি তখন কিছু দিনের জন্য অবসর লইয়া সাধারণের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, যদি তাহার পর বিবাহাদি করিয়া পার্লামেণ্টে ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে আইরিস দল তাঁহার পূর্ব্বতন কার্য্যকলাপ ও অসামান্য ক্ষমতার গুণে তৎসত্ত্বেও পুনরায় যে তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিত সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই; এবং তাহা হইলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত হোমরূল (আইরিস স্বায়ত্ব শাসন) আজ এরূপ অবস্থাপন্ন হইত না। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই আইরিস দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। দলাদলিতে যেরূপ হয় তাহাই দাঁড়াইল, পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণেই তাঁহাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল। মিঃ পার্ণেলের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুসঙ্গীগণ অন্য দলের সহিত যোগ দিবেন এরূপ যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের আশা বিফল হইল। পার্ণেলের মৃত্যুর পরেও তাঁহার নেতৃত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব করা আয়র্লণ্ডবাসীদের পক্ষেই সম্ভবপর। আমাদের দেশের লোকের মত সেখানেও দার্শনিক বাক্ চতুর তার্কিকের দলই বেশী, সেই জন্য

তাঁহারা কাজ ভুলিয়া সাধারণ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সযত্ন না হইয়া পরস্পরের শত্রুতা করিতেছেন, এবং আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্ব শাসনে অনুপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। অন্যতম দলের কোন কোন নেতাকে ইংরাজ নিয়োজিত পুলিসের শরণাপন্ন হইয়া নিজের দলের শত্রুদিগের হস্ত হইতে শরীর রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বিপক্ষীয়দিগের বিদ্রূপজনক কার্য্য আর কি হইতে পারে? সুধু তাহাই নহে—যে সকল সভ্য পার্ণেলের পদচ্যুতির সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলি চলিতেছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অনেকেই পরস্পর ঈর্ষাপরবশ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী। আইরিষ দলের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আমাদের অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

আইরিস দলের দল-বিভাগ সুধু ব্যক্তিগত নহে। হঠাৎ আইরিষ জাতির তাঁহাদের মনোনীত নেতা পার্ণেলকে ত্যাগ করিতে হইল; আশ্চর্য্য কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না? বিশেষতঃ ইংরাজ উন্নতিশীল দলের সহিত সখ্যতাতে কাহারই প্রায় প্রগাঢ় বিশ্বাস নাই। তদ্ব্যতীত আইরিষ দলের মধ্যেও উন্নতিশীল স্থিতিশীল দুই বিভাগ আছে। এই সকল আনুসঙ্গিক কারণ পার্ণেলের মৃত্যুর পরেও তাঁহার দলকে বিভক্ত রাখিয়াছে। তাঁহার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই শিক্ষাপ্রদ। সমস্ত জীবনের আশা ও চেষ্টাকে একটী দুষ্কার্য্যে প্রায় নিরর্থক করিয়া তাহার অল্পদিন পরেই মানবলীলা সম্বরণ মানব তত্ত্বের অনেক গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত করে।

এই কয়টী প্রধান দল ব্যতীতও উন্নতিশীল দলের মধ্যে অনেক বিভাগ আছে। ফ্রান্সে যেরূপ রাজনীতি বিষয়ে বহুল উপ-বিভাগ আছে, সে অবস্থা ইংলণ্ডে এখনো আসে নাই, আশা করা যায় কখন আসিবেও না। কিন্তু উন্নতিশীলতা ও মত বিভাগ কতক পরিমাণে সমগামী—এবং তদনুসারে উন্নতিশীল দলের মধ্যে অগ্রগামী (Radical) ও পশ্চাৎগামী দুইটি দল ভাগ হইয়াছে। উপরোক্ত দলের সহিত আইরিষদিগের অগ্রগামী দলের বিভিন্নতা এই, ইঁহারা শেষোক্ত লোক সমূহের মত কাজ ভোলেন না। ইহা হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় আইরিষদের রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহার উপর কেল্টিক চরিত্রে —ভারতবাসীর চরিত্রের ন্যায়—বাকপটুতার সমাধিক্য, কার্য্যকারিতার অভাব। একটী উদাহরণ দিলেই সম্যক প্রতীয়মান হইবে। আজকাল ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক বিভাগের রাজসচিব মিঃ অ্যাস্‌কুয়িথ্ মন্ত্রীত্ব লাভের পূর্ব্বে অগ্রগামী দলভুক্ত ছিলেন। তখন স্বাধীনতার উপর বক্তৃতাচ্ছলে এমন অনেক মত প্রকাশ করিতেন যাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সুকঠিন; এক্ষণে নিজে কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন কিন্তু কার্য্য কলাপে সেরূপ আধিক্য কিছুই লক্ষিত হয় না। এইরূপ বিভিন্নতার একটি কারণ, এতদিন ইংরাজবংশজাত আয়র্লাণ্ডবাসী ব্যতীত অপর দেশের শাসন কার্য্যে অতি সামান্য অধিকার ছিল। দেশের কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রধান কার্য্যে প্রটেষ্টান্ট ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। তদ্ব্যতীত স্থানীয় শাসনকার্য্য যে সকল বোর্ডসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে সে সকল বোর্ডেও উপরোক্ত দলের লোক অতীব অল্প। তাহা

বলিয়া ইহাই একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে না। তবে এই কারণে জাতীয়চরিত্র ঊর্দ্ধগামী না হইয়া বরং নিম্নগামী হইয়া পড়িয়াছে।

অল্পদিন হইল কমন্স সভায় একটী নূতন দল হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যতের সহিত এক প্রকারে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ—ইয়ুরোপের ভবিষ্যৎ জড়িত। ইহা শ্রমজীবিদিগের দল। উন্নতিশীলদলের অগ্রগামী সভাগণ শ্রমজীবিদিগের বরাবরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই নূতন দলের মতে—অন্ততঃ এই নূতন দলের কাহারও কাহারও মতে—এইরূপ পক্ষপাতিত্বই যথেষ্ট নহে। এক্ষণে ইহাদের দল অতি ক্ষুদ্র। তিনজন কি চারিজন সভ্য মাত্র এই দলভুক্ত। তাঁহাদেরও মধ্যে মত বিভেদ দেখা যায়। কিন্তু সেজন্য ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। কি স্থিতিশীল কি উন্নতিশীল উভয় দলই শ্রমজীবিদিগের অনুগ্রহ-প্রার্থী। মিঃ গ্লাডষ্টোন সাধারণের শিক্ষার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ও যাঁহারা ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকেন তাহাদের সভ্যনির্ব্বাচনে ক্ষমতা দিয়া, শ্রমজীবিদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। তাহার সহিত শুধু ইংলণ্ডে কেন সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান হইতেছে যে এতদিন ব্যবসা শিল্পাদি কার্য্যে যে অর্থনীতি প্রচলিত ছিল তাহা ভ্রমাত্মক। যে নীতি অনুসারে অর্থশালী ও শ্রমজীবীর মধ্যে, ধনবান ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য প্রবল হইতে থাকে সে নীতি সম্যক্‌প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। মানবসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত সুসভ্য সমাজে আর একটী ভাব জড়িত—দয়া। অক্ষম ব্যক্তির ক্ষমবানের নিকট পরাজিত হওয়া যেমন স্বাভাবিক, ক্ষমবানের অক্ষম ব্যক্তির প্রতি কৃপা করাও তেমনি স্বাভাবিক। এই দুইটীর সামঞ্জস্য করিলেই মানব সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়; একটীর অপেক্ষা আর একটীর আধিক্য তাহার বিপরীত ফলপ্রদ। এই দয়া যে কেবল নীতিশাস্ত্র সঙ্গত তাহা নহে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গত। কারণ, এক সমাজের মধ্যে যদি এমন দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইয়া দাঁড়ায় যে তাহাদের একদল সুখস্বচ্ছন্দশালী আর একটি দল কষ্টে দিনপাত করিতেছে তাহা হইলে সে সমাজের মঙ্গল নাই। দ্বিতীয় দল সুবিধা পাইলে, প্রথম দলের বৈরসাধনা করিবে। তাহার ফলে সকল কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে; সেইরূপ অর্থশালী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। পরস্পরের কলহে শ্রমজীবীদিগের অধিক কষ্ট; কিন্তু সকলেরই ক্ষতি। যতদিন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা কিছুই ছিল না, যতদিন শ্রমজীবিগণ শিক্ষা পায় নাই, ততদিন কিছুই গোলমাল ঘটে নাই। এখন সে সকল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কি উন্নতিশীল কি স্থিতিশীল সকলেই সাধারণ প্রজাবর্গের হিতকর আইন বিধিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত।

গতবৎসর যে দুই তিনটি প্রধান প্রধান বিল কমন্স সভায় অনুমোদিত হয় সেই কয়টিরই উদ্দেশ্য এই। প্রথমটি, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকাল ধার্য্য করিয়াছে। কিছু দিন হইল ইহা প্রকাশ হয় যে ইহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও দিন ২০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয়। ইহা যে নিবারিত হওয়া কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আর কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না।

কিন্তু পূর্ব্বানুমোদিত অর্থনীতি অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে তদনুসারে ইহা অসঙ্গত। কারণ, যদি কেহ অর্থের জন্য ২০ ঘণ্টা খাটিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আর কাহারও তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার কি ক্ষমতা আছে? এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বিলাতীয় রাজনীতিতে এরূপ অর্থ নীতি গ্রাহ্য হইবে না।

দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক পল্লিগ্রামে এক প্রকার পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে হয়ত জ্ঞাত নহেন বিলাতে এখনও এক প্রকার দাসত্বের প্রচলন রহিয়াছে। এখানে যেমন গবর্ণমেণ্ট জমীদার, বিলাতে সেরূপ নহে। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই জমীদার। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রজারা জমী জমা করিয়া লয়, কিন্তু অল্প জমী লইবার যো নাই, অন্ততঃ ৮০।৯০ বিঘার কম জমা পাওয়া যায় না। এই জন্য সে দেশে চাষীরা বর্দ্ধিষ্ণু লোক। জমীর চাষ যাহারা করে তাহাদের বাসের জন্য জমীর নিকট কয়েকটি কুটীর নির্ম্মিত আছে। তাহারা ভিন্ন আর কাহারও এই কুটীরে বাস করিবার অধিকার নাই, কাজেই মজুরদিগকে বরাবরই মজুরী করিতে হয়, অন্য কার্য্য করিতে গেলে সে গ্রামে (অধিকাংশ স্থলেই) থাকিবার যো নাই। কিছুদিন হইল একটি বিল পাস হয়, তাহাতে মজুরেরা ইচ্ছা করিলেও গ্রামের সুবিধা অনুসারে তিন 'একার' (প্রায় ৯ বিঘা) জমী জমা লইতে পারিবে। কিন্তু মজুরেরা এরূপ জমা লইতে পারে ইহা বড় বড় প্রজাদিগের অভিলষিত নহে, কাজেই এ বিলে তত বিশেষ ফল হয় নাই। এই পঞ্চায়েতের উপর এই বিল অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিবার ভার হইয়াছে এবং ইহাতে মজুরেরা ও তাহাদের প্রতিনিধিরা থাকিবেন, সুতরাং এতদিনে পল্লিগ্রামস্থ মজুরদিগের দাসত্ব মোচন হইল।

আজকাল শ্রমজীবিদিগের দলবন্ধন গাঢ় হইয়া আসিতেছে, সেই জন্য তাহাদের মনিবদিগের সহিত কলহও পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে। এরূপ কলহ উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকারক, এই কারণে, এরূপ কলহ যাহাতে আপোষে নিষ্পত্তি হয় তদনুযায়ী একটি আইন এই বৎসর বিধিবদ্ধ হইবে। এইরূপ প্রয়োজন মত আইন বিধিবদ্ধ করিতে জানেন বলিয়াই ইংরাজ আজ এত জাতীয় উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

এই প্রকার আইনের সহিত আর এক প্রকার আইন সংশ্লিষ্ট। পঞ্চায়েৎ নিয়োগ হওয়াতে ইংলণ্ডে স্বায়ত্ত শাসন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্কটলণ্ডেও স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা হোমরুলের বিরোধী অর্থাৎ আয়র্লণ্ডে আর একটি পার্লামেণ্ট হয় ইহাতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও সেখানে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলন ইচ্ছা করেন। কিন্তু এরূপ স্বায়ত্ত শাসন (আমাদের দেশে যেরূপ প্রচলিত) যথেষ্ট নহে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়ার্লণ্ডের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে; তদনুসারে বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রচলিত আছে। এ সকল বিষয়ে অন্যতম প্রদেশের সভ্যদিগের মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে, আজকাল এইরূপ রাজনীতিই অধিকাংশ লোকের মনোনীত। সকল প্রদেশে স্বতন্ত্র

পার্লামেন্ট স্থাপন ও এক পার্লামেন্টে সাধারণ বিষয়ের ব্যবস্থা এই মতই অনেকের। কেহ কেহ এই সাধারণ পার্লামেন্টে উপনিবেশের প্রতিনিধিগণকেও দেখিতে চান। ইহা বেশ বিশ্বাস হয়, অল্পদিনের মধ্যেই এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইবে। আয়ার্লণ্ডের কথা লইয়াই এই প্রশ্নের প্রথম উত্থাপনা হয়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আয়ার্লণ্ডের বিষয়টি স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিয়া পড়িয়াছে। মিঃ গ্লাডষ্টোন অবসর লইলে যখন লর্ড রোজবেরী প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন, তখনই তদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাৎ ঘটে। লর্ড রোজবেরীর মতে ইংলণ্ড এ বিষয়ে মত না দিলে কিছুই হইবে না—তিনি যদিও পরে ইহার অন্য অর্থ আছে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সহকারীদের কাহারও কাহারও এইরূপ অভিলাষ; তাহা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে অনেক দিন লাগিবে। কারণ, অনেকের মতে ইহাতেই ইংলণ্ডের প্রাধান্য—ইংলণ্ড যে সর্ব্বেসর্ব্বা ও আয়ার্লণ্ড তাহার অধীন এ কথা তাঁহারা সাহস করিয়া স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন না বটে, কিন্তু এরূপ ভাব যে এখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

আয়ার্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ড হীন চক্ষে দেখে। এই ভাব ইংরাজ মনে বিশেষ প্রবল। সমস্ত পৃথিবীতে ইংলণ্ড অগ্রগণ্য হইবে, যতদুর সম্ভব রাজ্য বিস্তৃত হইবে এই ভাব (imperial instincts) ঠিক বুঝিতে না পারিলে ইংরাজের অন্যান্য জাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। এই ভাবটি মধ্যবিৎ ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত। গরীব লোকে ও সাধারণ লোকের মনে এখনও এ ভাব সম্পূর্ণরূপে জাগরূক হয় নাই, কিন্তু তাহাদেরও ইংলণ্ড যে সর্ব্বাগ্রগণ্য এটি অনেকটা ধারণা আছে। ইহা নিতান্ত মিথ্যাও নহে, কোন জাতিরই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা যায় না। ইহাদেরও জাতিগত দোষ অনেক আছে, কিন্তু মনুষ্য স্বভাবে সম্পূর্ণতার আশা করা বৃথা। যাহা হউক, এই জন্যই, অন্যান্য জাতির সম্বন্ধে ইংরাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ অল্পই। লর্ড সল্‌সবেরি এবং লর্ড রোজবেরি দুই জনেই এ বিষয়ে একমত। যাঁহারা ভারত কি অন্য কোন বিষয়ে বিলাতীয় দলবিভাগানুসারে ভিন্ন মত অনুসন্ধান করেন তাঁহারা বিফল প্রযত্ন হইবেন।

লর্ড সভা লইয়া এক্ষণে স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল দলে সত্য সত্যই গোল বাধিয়াছে। লর্ড সভার সভ্য-সংখ্যা চারি শতের অধিক। তাহার মধ্যে কুড়িজন কি পঁচিশজন মাত্র রোজবেরির দলস্থ। অবশ্য এই চারিশতের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই সাধারণতঃ অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু যখনই লর্ড সল্‌সবেরি হুকুম দেন তখনি আসিয়া স্বীয় মত নিবদ্ধ করিয়া চলিয়া যান। এইরূপে উন্নতিশীল দলের রাজত্বকালে লর্ড সভার সহিত কমন্স সভার কেবলই কলহ বিবাদ হয়। ইহা হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে, একজন লোকের (সল্‌সবেরির) হস্তে এত অধিক ক্ষমতা থাকা ভাল নহে। দুই দলে ইহা লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিতেছে

তাহার বিবরণ দেওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। একটি কথা বলিলেই এ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। লর্ড সভার প্রতি কি করা উচিত স্থির করা বড়ই দুরূহ। সকল দেশেই দুটি সভা আছে, ইংলণ্ড হইতে হঠাৎ একটি উঠাইয়া দিতে জনসাধারণ স্বীকৃত হইবে? বেশ বলিতে পারা যায়, হইবে না। আমেরিকাতে সেনেটের যে সাধারণ সভা অপেক্ষা এত বেশী ক্ষমতা তাহার একটি কারণ, এখানে যত বড় বড় রাজপুরুষ প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে কোন বিশেষ আইন দ্বারা শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে গেলে কুফল ফলিতে পারে। ইংরাজসমূহ ইহাতে কখনই যোগ দিবেন মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস লর্ড রোজবেরিপ্রমুখ উন্নতিশীল দল ইহা লইয়া অধিক সময় নষ্ট করিবেন না।

ঘুঘু।

কেবল প্রভাত যবে, উঠিছে অরুণ,
জাগিয়া শুনিতে পাই ও স্বর করুণ।
বিজন মধ্যাহ্ন কাল চমকে উত্তাপে,
ঐ মৃদু এক তান ঘন ঘন কাঁপে।
তপন ডুবিয়া গেলে শান্ত সন্ধ্যা মাঝে,
তখনো ও দীন স্বর ধীরে ধীরে বাজে।
কি গান গাহিস তুই সারাদিন ধরে?
কি কথা বুঝাতে চায় বল দেখি মোরে?
তুই কি রে ধরণীর কোমল সান্ত্বনা?
থাকিস সেথায় শুধু যেথায় যাতনা?
কুসুমিত উপবনে সুনীল আকাশে,
আনন্দের উৎসগুলি যেথায় বিকাশে;
সেথায় তোমার ঐ সকরুণ গীত—
শুনিতে পাই না কভু হতে উথলিত।
সকলি হারায়ে যারা একা আছে প'ড়ে
তুমি যাও তার কাছে সান্ত্বনার তরে।
বসন্তের পাখী যত কোকিল পাপিয়া,
আনন্দ সুদিনে গায় আকাশ ছাপিয়া।
বসন্ত চলিয়া গেলে তারা চলে যায়,
হৃদয়ের তরে শুধু থাকে হায় হায়।
তখন আসিয়া তুমি ধীরে তার পাশে,
সান্ত্বনা ঢালিয়া দাও তব শান্তি ভাষে।

এসে দু দিনের পরে চলে যায় সুখ,
চিরকাল আজীবন থাকে সাথে দুখ।
চিরকাল বারমাস তাই সারাদিন,
ঢালিস সান্ত্বনা তুই শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।
ভাঙ্গা বাড়ী, পোড়ো ঘাট, শুষ্ক উপবন,
সেই তোর আপনার সাধের ভবন।
একদিন তাহাদের ছিল কত ধন,
ছিল কত আপনার প্রিয় পরিজন।
সোপানে সোপানে ঢালি নূপুরের ধ্বনি,
আসিত এ ঘাটে কত রূপসী রমণী।
ভাঙ্গাচোরা এ আলয়, বিশুষ্ক কানন,
একদিন পেয়েছিল কত যে যতন।
ওর কোলে একদিন করেছিল মেলা
কত হাসি কত বাঁশি কত সুখ খেলা।
সে সকল কথা আজ কেবল রে স্মৃতি!
শুধু আজ আছে তোর সকরুণ গীতি!
তটিনীর কোলে শুয়ে এ ভাঙ্গা হৃদয়,
সারাদিন ঐ গানে মগ্ন হয়ে রয়!
অবিরাম মৃদু মৃদু কুল কুল কুল,
তরঙ্গের অতি ধীর বিলাপ আকুল!
থেকে থেকে ঘুঘুধ্বনি করুণ মধুর,
সান্ত্বনা ঢালিয়া প্রাণে ব্যথা করে দূর।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

নূতন বিজ্ঞান।

জমিকা।

মাষ্টার দাস ওর্ফে গুরুদাস একজন বেয়াড়া বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার প্রতিভারও বিলক্ষণ ছিট আছে। সুতরাং কার্য্যকলাপ কতকটা থাপছাড়া। Genius is akin to madness; এই সমীচীন বচনের তিনি কতকটা সার্থকতা করিয়া থাকেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন চালচলন একটু কি-জানি-কেমন বাঁকা করিয়া রাখেন। ফলে আজীবন বিকট অধ্যবসায় সহকারে ভারতীর নৈবেদ্য বহিয়া আসিতেছেন। পুস্তক তাঁহার জীবন মরণের সাথী। কি আহারে, কি বিহারে, কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি ধ্যানে, কি স্বপনে, তাঁহার করকমলে একখানি সুন্দর চক্‌চকে পুস্তক কৃতসংলগ্ন হইয়া থাকা চাই। বরং তাঁহার স্কন্ধদেশে কেহ কখন মস্তক না দেখিলেও দেখিতে পারেন, কিন্তু হাতে পুস্তক নাই, এমন কেহ কখন দেখিয়াছেন বলিবার যোটুকু নাই। শ্যামের হাতে বাঁশী, শিবের হাতে শিঙ্গা, রামের হাতে ধনুর্ব্বাণ, সধবার হাতে লোহা যেমন অপরিহার্য্য ব্যাপার, মাষ্টার দাসের হাতে পুস্তকও সেইরূপ। বোধ হয় তাঁহার বিবেচনায় পড়াশুনা অপেক্ষা পুস্তকের সহবাস অধিক ফলদায়ক। কেহ তাঁহাকে book-worm বলিলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন।

আঁচা-আঁচি।

কেহ অনুমান করেন মাষ্টার দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী মহার্হ রত্ন। বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত এম-এ পাশ করিয়া থাকিবেন। অগাধ বিদ্যা অগাধ বুদ্ধির সংযোগে বিষম বিরাট ভাব ধারণ করিয়াছে। আর কেহ বা বলেন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভগ্ন-উরু; তবে কিছুকাল দিনরাত হোমষ্টডি করিয়া নিদারুণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এ দেশে হোমষ্টডির তাৎপর্য্য ঘরে নির্ব্বিকার বেকার বসিয়া থাকা মাত্র। তবে মাঝে মাঝে কোনরূপ ফাজিল আড়ম্বরের আবশ্যক।

ফলে তাঁহার চেহারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভা বেজায় চমকাইয়া থাকে। নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব; নাতি গৌর নাতি কৃষ্ণ; কটিতট নাতি বক্র নাতি সোজা; অস্থিপঞ্জর সার; চক্ষের চারিধারে কালি ঢালা; হস্তপদ জীর্ণশীর্ণ এবং ধনুকের মত বাঁকা; চালচলন গম্ভীর, Mathematical পরিমাণযুক্ত, নীরব, নিঝুম, ঘুমন্ত স্বপনের মত তাঁহাকে সতত গতায়াত করিতে দেখা যায়। তাঁহার সমস্ত বিপুল বিদ্যা যেন দেহে সুস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে।

অপটিক্‌সে যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন চক্ষের ঠুলি তাহার সাক্ষী। অ্যানাটমির দক্ষতার আর কি পরিচয় দিব? লোকে বিনা সাহায্যে তাঁহার দেহখানি দেখিলেই তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। তাঁহার সমস্ত শরীর সতত উষ্ট্রের ন্যায় দোদুল্যমান দেখা যায়; যেন আপাদমস্তক নিয়ত centre of gravity খুঁজিতেছে। ষ্ট্যাটিক্‌স্ ও ডাইনামিক্‌সের সার মর্ম্ম যেন সে বরবপু ফাটিয়া যুগলভাবে লোকের নয়নপথে পতিত হয়। Mental philosophyর আলোচনায় কায়া যেন সাংসারিক মায়া কাটাইয়া ক্রমে ছায়ার ন্যায় spiritual হইয়া আসিতেছে। অধিক কি বলিব, তাঁহার সমস্ত ফিজিক্যাল entity যেন মেণ্ট্যাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। অজীর্ণ ও শিরঃপীড়ার ব্যবস্থার জন্য চিকিৎসকের কাছে যাওয়ায় তিনি নাকি বলিয়াছেন, "আপনার এরোগ উপশমের হাত মানুষের নাই। আপনার পাকস্থলী সমুদায়ই প্রায় মস্তিষ্কে পরিণত হইয়াছে।" মাষ্টার দাস যার তার কাছে এই কথা বলিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তাঁহাকে দেখিবামাত্র লিটারারী ক্যার্‌য়াক্টরের আধ্যাত্মিক ভাব হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া যায়। মুখরূপ র‍্যাম্পার্টের উপর নাসাতোপদ্বয় সতত বারুদে ঠাসা; এক হাতে পুস্তক, আর হাতে ইণ্ডিয়া ক্লব; কথা স্বল্প, বাঁধুনিযুক্ত, তীব্র, কাটাকাটা, ছেঁড়াছেঁড়া, syllogismএর তেহাইবিশিষ্ট; হস্তপদ বুদ্ধির ন্যায় সূক্ষ্ম; মাষ্টার দাস সর্ব্বত্র সম্মানিত ও আদৃত হইয়া থাকেন।

বাতিক।

বিজ্ঞান মাষ্টার দাসের বিষম বাতিক। নূতন আবিষ্কার বা রচনা সান্নিপাতিক পিপাসা। এপিপাসার সহিত প্রলাপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নিজে যাহা লিখেন বা বলেন, তাহাই তাঁহার নূতন প্রসঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তিনি আশৈশবই নূতনের ভক্ত। তাঁহার বেশবিন্যাস নূতন; কথাবার্ত্তা নূতন; ভাবভঙ্গি নূতন। চোগার পৃষ্ঠদেশ ভারতবর্ষের মানচিত্রের অনুকরণে ত্রিকোণ ফাঁক; পেণ্টুলেন একটু ছোট ও ঢলঢলে; পাদুকা বিলাতী ছাঁচে দেশী ভাব ঢালা। কেশবিন্যাসে তিনি বড়ই বিরক্ত। Beauty is most adorned when unadorned; এই আর্ষবাক্যে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস; সুতরাং যাহাতে পারিপাট্য না দেখায় তাহাই করেন। চুলগুলা বরং টানাটুনি করিয়া উল্‌টা বুনিয়া থাকেন। শিরঃপীড়ার জন্য একটী তামার পয়সা লাল ফিতায় গাঁথিয়া সতত গলায় ঝুলাইয়া রাখেন।

মাষ্টার দাসকে লোকে মিটিং পাগ্‌লা বলে। এমন মিটিং কখন হয় নাই, যেখানে তিনি বক্তা বা শ্রোতা হইয়া উপস্থিত ছিলেন না। অল্প স্বল্প সংবাদপত্রেও লিখেন। তবে বৈজ্ঞানিকের মত কম কথায় অনেক ভাব ঠাসিয়া দেন। রেঙ্কার গাঁথুনী অপেক্ষাও তাঁহার লেখা পাকা। বহুদিনের কথা, ঠিক মনে নাই, মনুষ্যভোজী বৃক্ষের কথা লইয়া সভ্যজগতে যে এককালে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা নাকি মাষ্টার দাসের গবেষণার একমাত্র

প্রবন্ধ-ফল। স্পেন্সর সাহেব যখন বেলুনে উঠিয়া দিন-দুয়েক নিরুদ্দেশ হন, তখন তিনিই নাকি ইংলিশম্যান পত্রে মহা বৈজ্ঞানিক আন্দোলন করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ contribute করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পাবলিক একদম স্তম্ভিত হইয়াছিল। "হাইড্রজন গ্যাসের বেলুনে চড়িয়া স্পেন্সর বেচারা বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। বেলুন বেগে ইথিরিয়াল রিজন ভেদ করিয়া মাধ্যাকর্ষণের হাত একবারে এড়াইয়া বৃহস্পতির কেন্দ্রের সন্নিকট পৌঁছিয়াছে; সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের মত সাহেবকে মধ্য আকাশে ঘুরিতে হইবে।" অমনি চারিদিকে হা হা পড়িয়া গেল। লোকে কয়েক দিবস হতাশ হইয়া হাঁ করিয়া আকাশমুখ তাকাইয়া বসিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম ইংলিশম্যান সম্পাদক নাকি এ গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণাটীর সহিত স্বীয় মত পত্রস্থ করিয়া বেলজিয়মের জ্যোতিষ-পরিশদে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাহার কোন কনগ্র্যাচুলেটরী উত্তর অদ্যাবধি আসিল না। হয়তো এনূতন ব্যাপার কোন মহাপুরুষ আত্মসাৎ করিয়াছেন। যাহা হউক, এখনতো তাহার আর কোন দাদ-ফরিদই নাই। তঁবাদি হইয়া গিয়াছে।

ধূনার গন্ধ।

চকমকি না ঠুকিলে আগুন বাহির হয় না। প্রতিভাও সেইরূপ ঠুকন সাপেক্ষ। সামান্য উত্তেজনায় হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠে। একদা কোন বিজ্ঞান সমিতিতে জনৈক দেশহিতৈষী বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতায় মাষ্টার দাস একবারে বেসামাল হইয়া পড়েন। বক্তা হার্শেলের নূতন আবিষ্কার লইয়া হতভাগ্য বাঙ্গালিকে উত্তেজনা করিবার মানসে স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতা পরবশ হইয়া দরবিগলিত চক্ষে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অন্য বিষয় হইলে লোকে এশোকানলকে হিংসা বলিত। বৈজ্ঞানিক ঔদার্য্যে ইহাকে স্বদেশবাৎসল্য বলিয়া থাকে। মাষ্টার দাস তদ্দর্শনে ফোঁপাইয়া, কোকাইয়া, মাটি আঁচড়াইয়া, বুক চাপড়াইয়া, দুপুরে মাতন আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, সভাভঙ্গের পর পথ হারাইয়া একদম বাগবাজারের পোলে উপস্থিত। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কাপড় ঝাড়িয়া পরিয়া, রাত্র প্রভাতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছিলেন। বিবাগী হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। বঙ্গমাতার কপালগুণে দিক্‌পালগণ তাঁহাকে এযাত্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, "বিজ্ঞান ব্যতীত আমার দ্বিতীয় উপাস্য নাই। নূতন আবিষ্কারের জন্য আজ প্রাণ বলি দিলাম। এ বৈজ্ঞানিক ব্রত উদযাপন না করিয়া সংসারে আর কোন সুখই অন্বেষণ করিব না।"

পাটঝাঁট।

মাষ্টার দাসের অবস্থা সচ্ছল নহে। তবে পলিটিক্যাল একনোমির সাহায্যে বাহিরে কেহ সহসা টের পায় না। এ অবস্থায় একনোমিতে দৃষ্টি থাকাই কর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁহাকে সুলভ পরীক্ষার উপায় দেখিতে হয়। গায়ের মাপে জামা না করিয়া তাঁহাকে জামার মাপে গা করিতে হইল। সুতরাং তিনি আধ্যাত্মিক পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করিতে বাধিত হইলেন। খান দুই ভাঙা চেয়ার, স্লেট এবং স্বহস্তরচিত এক প্ল্যান্‌চেট্ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। নখ চুল রাখায় খরচ বরং বাঁচিয়াই থাকে; এ-পরীক্ষায় তাই তাঁহার আরও সুবিধা হইল। তবে ইংরাজী আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে ইংরাজী ধরণের ভূতেরই সমাগম হইয়া থাকে; তাহারা কিছু দেশী চণ্ডুর মত পিঁড়ায় বসিতে বা তালপত্রে লিখিতে পারে না। তাই যা একটু নটখটি। এইরূপ কয়েক বৎসর পরীক্ষায় তাঁহার অগাধ ফললাভ হইয়াছিল। সে সময় টেলিফোঁ, মাইক্রফোঁ প্রভৃতির এদেশে নূতন আমদানী। তাঁহার কর্ম্মফল সমস্ত একত্রিত করিয়া ইংরাজীতে এক বিপুল মাষ্টার দাস গ্রন্থ রচনা করেন। The Esoteric Principles and practices of Gujumotophon নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আমেরিকার Lunar Telephonic Societyতে প্রেরণ করেন। এক্স্চেঞ্জ বিভ্রাটে টাকায় তবু কমবেশ আট আনাও পাওয়া যায়; বিস্মামুদ্রায় মাষ্টার দাস বেচারা কিছুই ফেরৎ পান নাই। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতা বাঙ্গালার গৌরব করিতে বড়ই নারাজ। ম্লেচ্ছ আমাদের শ্রীকাতর না হইবে কেন?

একদা মাষ্টার দাসের একটী দূরবীক্ষণের আবশ্যক হইল। অভিপ্রায় Astral bodyর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা। সামর্থ্য নাই ক্রয় করেন; প্রতিবাসীর নাই যে একবার চাহিয়া লন, দেশে কাহারও আছে কি না তা জানেন না, যে গিয়া একবার দেখিয়া আসেন। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন নিজের যন্ত্র নিজে রচনা করিবেন। গ্যালিলি কি করিয়াছিলেন? তিনি যা না পারেন কেন? What man has done man can do। নিজের দূরবীক্ষণ নিজে প্রস্তুত করিতে বসিলেন। Lives of great men all remind us &c., এই মহাবাক্য তাঁহার একমাত্র ভরসা। মন্ত্রের-সাধন-কিম্বা-শরীর-পতন করিয়া কায়মনোবাক্যে লাগিয়া গেলেন। বিজাতীয় ব্যয়সাধ্য দ্রব্য লন, আদৌ এমন ইচ্ছা নাই। সুতরাং দেশী তল্‌তার চোঙা ও অভ্রমাত্র সম্বল। Truth is stranger than fiction। পরিশেষে পরীক্ষায় পূর্ণমনোরথ হইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতের পূজ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। সোণাখালি Gold Mining Company নাকি সমস্ত Stock in trade বিক্রয় করিয়া উক্ত মহালভ্য-জনক রচনার পেটেণ্ট লইয়া একচেটে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহার shareও তাই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

তাড়িৎ সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক নূতন কারখানা আছে। "দাসঘট" তাঁহার জলন্ত কীর্ত্তি। সামান্য মৃত্তিকার ঘট "খড়িমাটি-রে-বাসদেব" অলঙ্কারে তাঁহার চক্ষে Leyden jar অনুভূত হয়। বৃষ্টির সময় একটি কাকের পালক লইয়া উহাতে নানা পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষার ফলে আজ তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য। এভিন্ন মাদুলী ধারণ, দক্ষিণমুখে ভোজন, উত্তর শিয়রে শয়ন, পূর্ব্বমুখে আহ্নিক প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা বড় বড় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারায়

জগতে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। "গাত্রে তিলক রচনা" নামক এক সুদূরপরাহত প্রবন্ধ এমেরিকার Light of the World পত্রিকায় প্রকাশিত করায় নূতন জগতও তাঁহার যশসৌরভে আমোদিত হইয়াছে। উহার স্থূল মর্ম্ম এই যে গাত্রে তিলক রচনা করিলে শরীর প্রকৃত লেডন্‌জার হইয়া পড়ে, সুতরাং তাড়িৎ প্রবাহ দেহবাসে কারাবাস করে। লতাগুণ্ডে রঙ্কফ্‌স্ কয়েল করিবার চেষ্টায় বিফল হন। But even failure in scientific experiment is a sort of success। তাঁহার বিশ্বোদরে সকল বিজ্ঞানই আছে। নূতন বিজ্ঞানের নাম শুনিলে দৌড়াদৌড়ি তাহার শ্রীবর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হন। পরিণতিবাদ আধুনিক নূতন মহাব্যাপার। তাহাতেও তাঁহার হস্তচিহ্ন আছে। তাঁহার মতে পরিণতিবাদ অতি সত্য—অতি ন্যায্য—স্বতঃসিদ্ধ। তবে ডার্ব্বিণ কাল সহকারে, অবস্থা সহকারে জাতীয় জীবনের নানারূপ বিকাশ বলেন। মাষ্টার দাসের মতে ব্যক্তিগত জীবনই জন্মজন্মান্তরে ঐরূপ বিভাসমান হইয়া থাকুক। বানর হইতে মানুষ মহা ভুল কথা। তাঁহার মতে মনুষ্যত্ব পাইবার জন্যই ভেকগণ শীতকালে যোগাসনে বসিয়া থাকে। আফ্রিকার প্রাচীন পরিণতিবাদে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এভিন্ন Botanyতেও তাঁহার পদ চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁহার মতে Palmaci, Plantainaci, Kochuaci প্রভৃতি এক জাতীয় লতা।

ফিলাটেলি আজকালের নূতন বিজ্ঞান। মাষ্টার দাস তাহারও ভয়ঙ্কর পক্ষ। তিনি আমড়াতলার ফিলাটেলি সভার একজন জীবন্ত সভ্য (Live member)। লর্ড হারিস, ইণ্ডিয়্যান ডেলি নিউস সম্পাদক প্রভৃতি বড় বড় সাহেব বিবির নাম দেখিয়া তাঁহার নূতন প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি, নিজের বাটীতে নিজের ব্যয়ে তিনি ফিলাটেলিষ্টস্ ইউনিয়ন নামক মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনেক বড় বড় মোটা মোটা জমকাল নাম সভ্যশ্রেণিভুক্ত দেখা যায়। ফলে হোমরা চোমরা সকলেই প্রায় দূরদেশস্থ লোক। প্রফেসর টনীরও মনুমেণ্ট্যাল নাম এক পাশে পড়িয়া আছে। সভার অধিবেশনে নানা কার্য্যবশতঃ বড় একটা কেহ যাওয়া আসা করেন না। তবে পাঁচ সাত জন বেকার বেটাছেলে মাঝে মাঝে তথায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে।

ফিলাটেলি মাষ্টার দাসের এখন একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, অর্থও আছে। সুতরাং ইহা তাঁহার প্রাণে কথা কহিয়া থাকে। তবে তাঁহার একবারে বাঁধা পথে চলিবার যো নাই। তিনি সদাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া থাকেন, "বাঁধা পথ কাণায় চলিতে পারে"। মস্তিকের বিশালতা প্রযুক্ত সামান্য সামগ্রী তাঁহার হাতে পড়িবামাত্র দশানন হইয়া দাঁড়ায়। জাগতিক দাগী ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করিয়া সাদৃশ্য ও সাধারণ্য সংস্থাপন করাই ফিলাটেলির উদ্দেশ্য। এই সুবিশাল তত্ত্ব হইতে সহসা তাঁহার মসৃণ মস্তিষ্কে চিন্তা পিছলাইয়া বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞানে হুড়ুত করিয়া আসিয়া পড়িল। তিনি তদবধি জাগতিক বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্য সংস্থাপন দ্বারা নিয়মাদি নিরাকরণে জীবন বিসর্জ্জন করি-

লেন। এই নব বিধানে তাঁহার চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ ক্রমশঃ সমুচ্চ হইয়া অচলভাবে দাঁড়াইয়া জগজ্জনকে ইহকাল পরকাল স্তম্ভিত করিয়া রাখিবে।

আসর।

গোরস্থান গলি। একতলা ১২ ফুট আন্দাজ লম্বা একটী অতি প্রাচীন কুটারি। মাষ্টার দাসের বৈটকখানা। ঘরের চারিদিকে ভাঙ্গা প্রাচীর, ঢিপি ঢাপা, রাবিস মাটি, কচুবন, ঘাস, ঘেঁটু, গাব ভেরেণ্ডা প্রভৃতি আত্মনির্ভর প্রকাশ করিতেছে। গৃহের ছাদ মাজা-ভাঙ্গা—অষ্টবক্র। কড়ি বরগা—জরাসিন্ধু। প্রলয় যেন অনন্ত দন্ত বাহির করিয়া গৃহাভিমুখে হাত বাড়াইয়া পৈশাচিক নৃত্যের তরঙ্গ দেখাইতেছে। গৃহের মধ্যে কয়েকখানি ভাঙ্গা বেঞ্চ এবং দুইখানি হাড়গোড়ভাঙ্গা দয়ের মত নজগজে চেয়ার; মধ্যে একটী বুচারশপের কাউণ্টারের মত অতি প্রাচীন মোটা ময়লা টেবিল; তদুপরি একটী ত্রিভঙ্গ মুরারী ভাঙ্গা-চিম্‌নি কেরোসাইন ল্যাম্প; ছাদ এত নীচু যে কড়িতে কাটে কাটে বাঁধা গুটী কয়েক chinese lantern লোকের মাথায় ঠেকিতেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরকার জরাজীর্ণ বেশ চাতুরীর সহিত ঢাকা। দেওয়াল, সিলিং, দরজা, চৌকাট প্রভৃতি নানা বর্ণের বিজ্ঞাপনে মোড়া। গৃহের গায়ে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বত্থ গাছ আছে, তাহাতে নানা রঙের বিজ্ঞাপনের নিশান উড়িতেছে। সেই বিবিধ রঙ্গচঙ্গে সভাগৃহের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। অধিকন্তু টানাপাখা খানি সমুদায়ই বিজ্ঞাপনে প্রস্তুত। এইরূপে গৃহটী যেন ক্ষুদ্র সাজান রথের মত নয়নাভিরাম হইয়াছে।

কাগজে অনেক বড় বড় ধামপাল্ বক্তার নাম দেখিয়া ছেলের দল ছুটিল। আজ সব থিয়েটর একদম মাটি। বিনা ব্যয়ে থিয়েটরের সুখ কেই বা ছাড়ে? তবে কুড়ি দুই মাত্র লোকে সভাগৃহ “ন স্থানং পোস্ত ধারয়েৎ” হইয়া পড়িল। বাকি শ্রোতার দল উঠানে ও রাস্তায় গজ গজ করিতে লাগিল। স্থানাভাবে মহা গোল উঠিল। কলরবে লোকের আরও ভিড় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে কলরব কোলাহলে এবং কোলাহল কলহে পরিণত হইতে লাগিল। হাততালি, ইষ্টকবৃষ্টি প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যাপার আর কিছুই বাকি রহিল না।

এই তুফানে নিয়মিত সময়ে, অর্থাৎ, অবধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা বাদে সভা আরম্ভ হইল। নবাব ফাজিলরাম on the bench. In the chair বলায় সত্যের ব্যত্যয় জন্মে। নবাব সাহেব কিছু বেজায় জমকাল। চৌকি মধ্যে তাঁহার কোন রকমেই সামঞ্জস্য হইল না। অগত্যা শ্রোতা কয়েকজনকে উঠাইয়া দিয়া একখানি বেঞ্চ খালি করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, বেঞ্চখানি সভাপতি মহাশয়ের বিশাল কলেবর, আলবোলা, তাম্বুলকরঙ্ক, জলের গেলাস, হেনা আতরের সিসি, গোলাপ জলের বোতল প্রভৃতিতে ভরিয়া গেল। সুখের বিষয় শীতকাল, নচেৎ সে ক্ষুদ্র গৃহে সেদিন ব্ল্যাক হোলের পুনরাভিনয়ের ভয় ছিল। নবাব সাহেবকে সভাপতি করিবার কারণ নাম ডাক। অধিকন্তু পারিষদের প্রতি মাষ্টার

দাসের বিশেষ অনাস্থা। Familiarity breeds contempt। যে সকল উদারচেতা বড়লোক কায়িক সভাস্থ হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের দুই চারিজন পত্রদ্বারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা গোলেমালে সকল কথা শুনিতে পাই নাই। বোধ হয় লর্ড হারিসের এই মর্ম্মে একখানি পত্র পঠিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস ভক্ত, কলিকাতা গোরস্থানের ফিলটেলিষ্টস্ ইউনিয়নের পার্মেনেণ্ট সেক্রেটারী, সোণাখালি গোল্ড কোম্পানীর অনাহারী ডিরেক্টর, লাইভ মেম্বর, এভারলাষ্টিং পাইরোটেক্‌নিক্‌হল, কলিকাতা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মহাশয়, মহারাষ্ট্রীয়-গণ ইতিহাসের কয়েক পংক্তি মাত্র অধিকার করিয়াছে; আপনাদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালি ত্বরায় সমুদায় ইতিহাস একচেটিয়া করিবেন। আমার সভায় উপস্থিত হইবার বড় সাধ ছিল। রাজকার্য্যে মহা ব্যস্ত। বিশেষতঃ অজ্ঞানঘন গোহত্যা-বিরোধী হিন্দুদের জ্বালায় আজকাল কোথাও একপা বাড়াইবার যো নাই। আর যখন নবাব ফাজ্বিলরাম স্বয়ং উপস্থিত আছেন, তখন আমার উপস্থিতি অতিরিক্ত মাত্র। সহানুভূতি সহকারে রহিলাম, মহাশয়, আপনার সত্যি সত্যি আমি।" (বজ্রনাদে প্রশংসা)।

বক্তৃতা।

পরে নানা প্রকার ক্লেশকর দুর্ব্বোধ পত্র পঠনান্তে সভাপতি মহাশয় আধ আধ সামান্য দুইচারি কথায় মাষ্টার দাসকে তাঁহার প্রগাঢ়চিন্তাপ্রসূত বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তা মহাপ্রভু অল্প জল টানিয়া প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ কয়েক মিনিট দাঁড়াইলেন। পরে চারিদিক্ অবলোকন করিয়া যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ অবিকল পর পর উদ্ধৃত করা গেল।

মুখব্যাদান।

নবাব সাহেব, বিজ্ঞানবুবুক্ষু শ্রীমান ও শ্রীমতিগণ, পুস্তকের প্রারম্ভে অনেকে "মুখবন্ধ" লিখিয়া থাকেন। একথাটীর এরকম প্রয়োগ বড়ই বিপর্য্যয় ব্যাপার। মুখ-খুলাকে কোন্ সঙ্গতিতে "বন্ধ" বলা যায়? আমরা বৈজ্ঞানিক। ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, রস, তাল, লয়, মানের জন্য লালায়িত নহি। কোন রূপে মনের কথা প্রকাশ হইলেই হইল। অলঙ্কার-শাস্ত্র এক প্রকার বিজ্ঞান-বিরোধী বিষয়। আমরা কথার প্রতি অক্ষর, মাত্রা, দাঁড়ি, বিন্দু পর্য্যন্তও ওজন না করিয়া ব্যবহার করি না। কাণের সুখ—সুখ নয়; চিন্তাসুখই—সুখ। বিজ্ঞান-বিহীন লোকে প্রায়ই কথার বিপরীত ব্যবহার করিয়া ফেলেন। আসি্=যাই, বৈরাগী =গৃহী, কুটির=অট্টালিকা, রক্ষক=ভক্ষক, খাঁটি=মাটি, বাবু=চাকর, বাড়ন্ত=কমন্ত, কোন্ শাস্ত্রে আছে? "তবে আমি আসি," জাত বৈরাগী," "কোমল কুটির," "শান্তি রক্ষক, "খাঁটি টানা", "আফিস বাবু," "চাল বাড়ন্ত," প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অপলাপের দৃষ্টান্ত। আমি এসকল আর্ষপ্রয়োগ অবজ্ঞা করি। কেহ নাস্তিক বলে—বলুক। আমি আজ অবধি প্রচলিত

"মুখরক্ষকে" দূর করিলাম। যাহা হউক, মুখব্যাদানে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে আপনারা একটু স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে এ বহুক্লেশসাধ্য বিষয়ে কর্ণপাত করিলে কৃতার্থ হই (Hear, hear.)। নিরবধি কঠোর গবেষণায় যে অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, তাহা আজ আপনাদের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। (এই সময় ক্ষণেক বিশ্রাম, জলপান, উজ্জৃম্ভণ প্রভৃতি তুকতাক্ হইল। পুনশ্চ টেবিলে উপুড় হইয়া পড়িলেন। কারণ একে চক্ষের দৃষ্টি কম, তাহাতে আলোক মিট্‌মিটে।)

ফিলাটেলি।

অতি সামান্য ঘটনায় বিজ্ঞানের জন্ম। আর্কিমিডিসের স্নানের টব, নিউটনের আতা, গেলিলির লণ্ঠন, ওয়াটের সরা, ইহার সাক্ষ্যস্থল। ছেলেখেলার টেলেফোঁ গত কল্যের কথা মাত্র। সেইরূপ একটু বয়স্থ বালকের খেলায় আজ ফিলাটেলি। (বজ্রনাদে হুড়মুড় দুদ্দাড়।) ইহার আবির্ভাব যত সহজ, বিষয় তত নহে। নানাদেশীয় দাগী ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তথাচ এই বিশাল বিজ্ঞান অজানিত ভাবে জগতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ জানে না, শুনে না, শনৈঃ শনৈঃ ইহার পুষ্টি হইতেছে। বিলাতী জ্ঞান তরঙ্গ আজ নাচিতে নাচিতে ভারতে অভ্যাগত। লর্ড হারিস বম্বে ফিলাটেলি মণ্ডলীর সভাপতি (Hear, hear.)। সেই উত্তাল তরঙ্গ ক্রমে কলিকাতায় গড়াইয়া আসিয়াছে। যেমন বিলেতী মেল বোম্বাই টচ্ করিয়া আইসে, পাশ্চমিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতাও সেইরূপ ভায়া বোম্বাই আমদানি। সেই জন্য বোম্বাই ভগিনী কলিকাতার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। (দিগন্তব্যাপী করতালি।)

বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞান।

আমি বহুদিন সযত্নে ফিলাটেলির সাধনা করি। এইরূপ তন্ময় থাকা প্রযুক্ত গতমাসে একদা সহসা আমার চক্ষে তীব্র জ্যোতিঃ পড়িল। যেন অন্ধের চক্ষু দান হইল। চারিদিকে বিজলী খেলিতে লাগিল। জগৎ নূতন শোভা ধারণ করিল। পৃথিবী স্বর্গের মত বোধ হইল। মনে আশাবায়ু ছুটিল। জীবন সন্দেশের ন্যায় মিষ্ট বোধ হইল। শোণিত তড়িৎবেগে ধমনীতে ছুটিতে লাগিল। আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সম্মুখে ধুতুরার ফুলের ন্যায় বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞান খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে যেন কাণে কাণে বলিল, "এতদিনে রে বৎস! তোর পুণ্যবলে অমি তোরই হাতে ধরা দিলাম। যা! জগতের বিজ্ঞাপন-সমুদ্র আলোড়ন কর! দুর্ল্লভ রত্ন পাইবি।" (এবার মাষ্টার দাস কয়েক মিনিট্ অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে আকাশমুখে তাকাইয়া স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান; শ্রোতৃবর্গের শ্বাসরোধ; সভাপতি নিদ্রিত, স্বপন দেখিতেছেন যেন তাঁহার মাথার খুলির মধ্যে "ইন্দ্রসভার" অভিনয় হইতেছে। কিঞ্চিৎ পরে সকলের মোহ ঘুচিল। মাষ্টার দাস আবার প্রায় টেবিলের সহিত অঙ্গ মিলাইয়া জলদগম্ভীরে আরম্ভ করিলেন।)

আমি তদবধি জাগতিক সমগ্র বিজ্ঞাপন সংগ্রহ আরম্ভ করিলাম। সুখের পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই—অবসাদ নাই। দিন দিন বরং স্ফূর্ত্তি বাড়িল। পরে একমনে একপ্রাণে তাহাদের সাধারণ্যপাত আরম্ভ করিলাম। এইরূপ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ, ভাঙ্গা, গড়া প্রভৃতি সহকারে আরোহ প্রণালীতে নিয়মাদি নিরাকরণে সমর্থ হইলাম। প্রতিভা অর্থে পরিশ্রম। কোন বিষয়ে শ্রম বিফল হইবার যো নাই। শ্রমের ফল স্বতঃসিদ্ধ। আজ সেই নিজের ক্ষুদ্র আবিষ্কৃত নিয়মাদি মহাশয়দিগের সম্মুখে বিবৃত্ত করিব। বিজ্ঞান একটু কর্কশ ও কুটুচে ব্যাপার। সুতরাং কিছু সময় লাগিবে। বিব্রত হইবেন না। (Go on, go on, Bravo ! Bravo !) তবে ফিলাটেলির মত এ গবেষণায় আপাততঃ পরিশ্রমের মূল্য নাই। আমার মতে বিদ্যা বিদ্যার জন্য অর্জ্জন করাই উচিত। বিজ্ঞানের মূল্য বিজ্ঞান। অমূল্য রত্নের আবার মূল্য কি? যাহার অর্থকরী বিদ্যার আবশ্যক, সে রেল্‌ওয়ে করুক, টেলিগ্রাফ করুক, ময়দার কল করুক, ডাক্তারি শিখুক, ওকালতী করুক। আমার নিষ্কাম ব্রত। সুতরাং ও সকল স্বার্থপর বিষয় ভাল লাগে না। (বেশ! বেশ! সাবাস! সাবাস!)

(ক্রমশঃ)

সদারঙের খেয়াল।

মরণ সোহাগ।

ও কি আর ফুল আছে ?
    ও যে শুধু ঝরাদল !
কেন আর সমীরণ
    উহারে ছুঁইবি বল !

মধুর সোহাগে তোর
    ওত আর গাহিবে না !
নয়নে ঢালিয়া সুধা
    ওত আর চাহিবে না ?

সুখের পরশে শুধু
    শুকাইবে দলগুলি,
সমীর ফিরিয়া যারে
    মরণ সোহাগ ভুলি !

গত অগ্রহায়ণ মাসে হিন্দুজ্যোতিষীগণের বিবরণ নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬০	১৬	ষষ্ঠ্যাব্দানাং ষষ্ঠির্যদা	ষষ্ট্যাব্দানং যষ্টির্যদা
ঐ	১৭	এহধিকা	ত্র্যহধিকা
ঐ	২৩	গুণিক প্রতিপাদকালি	গণিত প্রতিপাদকানি
৪৬৪	১৪	পাশ্চাত্য মতের	পাশ্চাত্য মতে
ঐ	২৭	কিরূপে সিদ্ধান্ত	কিরূপে সিদ্ধ
৪৬৫	১৯	লিখিত হইতেছে	লিখিত হইয়াছে
৪৬৫	২৭	বাসুদেব শাস্ত্রীর	বাপুদেব শাস্ত্রীর
৪৬৬	৭	দশ গীতিকার	দশ গীতিকায়
ঐ	৮	অর্থ-ভটীযে	আর্য্য-ভটীয়ে
ঐ	২৪	বাশিষ্টসিদ্ধান্তিকার	বাশিষ্টসিদ্ধান্তকার
৪৬৭	১৩	কোন কিছুই	কেন কিছুই
৪৬৮	১৬	কার্য্যসিদ্ধান্তের	সূর্য্যসিদ্ধান্তের
৪৬৯	৮	তাহাও বুঝি	তাহাও
ঐ	২০	তৎসমুদায় ছিল না	তৎসমুদায় পূর্ব্বে ছিল না।

বীণাপাণি।

আঁখি মুদে ভাবিতে ভাবিতে,
আধ তন্দ্রা আধ জাগরণে,
ছিন্ন ভিন্ন চিন্তার মাঝারে,
এ কাহার ছবি এল মনে ?

এলো থেলো কেশদাম গুলি,
এলো মেলো বায়ুর পরশে,
উড়ে পড়ে ফনিনীর সম,
হংসী নিভ গ্রীবাতে উরসে।

একা বসে তমালের তলে,
বীণা লয়ে গাহে আনমনে,
নিকটেতে হরিণী দাঁড়ায়ে,
এক দিঠে নেহারে আননে!
এ কাহার ছবি এল মনে ?

এত নহে সে দেবী আমার ?
কোথা সেই পঙ্কজ কানন ?
হিল্লোলেতে হেলিছে কমল ?
মরাল করিছে সন্তরণ ?

এ স্বপনেতে গাহে যেন বীণ্!
ঘুমায়ে পড়িছে বার বার!
কই প্রাণের সে পুলক রোমাঞ্চ ?
কোথা সেই গম্ভীর ঝঙ্কার ?
এ ত নহে সে দেবী আমার ?

কই জাগাইতে মুমূর্ষু প্রকৃতি
বিহঙ্গের গীত বনে বনে ?
মাতোয়ারা দক্ষিণ সমীর,
বিকাশিতে কলিকা কাননে ?

ফুটাইতে বধূর বয়ান
দিবানিশি সাধিয়া সাধিয়া
কই ফেরে "বউ কথা কও"
অবিরাম গাহিয়া গাহিয়া ?

আঁখি মুদে ভাবিতে ভাবিতে
আধ তন্দ্রা আধ জাগরণে,
ছিন্ন ভিন্ন চিন্তার মাঝারে
এ কাহার ছবি এল মনে ?

মধুর এ বিষণ্ণ মূরতি !
ছল ছল নলিনী নয়ান,
মৃদু মৃদু অস্ফুট ভাষায়
না জানি গাহিছে কোন গান ?

কেন আকুলিত হতেছে অন্তর
রুদ্ধ অশ্রু উথলে নয়নে,
ও প্রেম ভরে সঁপিতে পরাণ
কারে চায় জানিব কেমনে ?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বর্ণচ্ছত্র।

শুভ্রালোক বিশ্লেষণজাত বর্ণবৈচিত্র্য আমরা জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। রামধনুর অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসে ও পত্রপ্রান্তসংলগ্ন শিশির-বিন্দুতে বালসৌরকিরণের অদ্ভুত বর্ণচ্ছত্র-সকলই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এত গেল স্বভাবের কথা,—কৃত্রিম উপায়েও আমরা সহজে আলোক বিশ্লেষণ দেখিতে পারি। ত্রিকোণ কাচ ফলকের মধ্য দিয়া, সাধারণ শুভ্রালোক আসিতে দিলে, ইহা মৌলিক বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া উজ্জ্বল লোহিত পীতাদি বর্ণযুক্ত একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করে,—বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকেই Spectrum, বর্ণচ্ছত্র * বলিয়া থাকেন। ঝাড় দেয়ালগিরি-লম্বিত বহুকোণ যুক্ত কাচফলকগুলি দ্বারা কোন পদার্থ দেখিলে, এই জন্যই ইহা নানা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়। ত্রিকোণ কাচফলকের এই বর্ণ বিশ্লেষণী-শক্তির কথা বালকবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন, বাল্যকালে উৎসবের সময় দেয়ালগিরিচ্যুত দুই এক খানি কাচ সংগ্রহ ইচ্ছায়, তৈল গন্ধামোদিত ক্ষুদ্র ফরাস গৃহে ভৃত্যগণের সহিত কিছু অধিক বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় নানা মিষ্টান্ন ঘুষ দিয়া পরে একখানি ভগ্নকাচ লাভের কথা আজও স্মরণ আছে। এই কাচ দ্বারা অপূর্ব্ব বর্ণ-ময় একটা নূতন সংসার দেখিয়া, বোধ হয় তখনকার জন্য অকৃতজ্ঞ ভৃত্যের উৎকোচ লিপ্সা ও উৎসবের সকল আমোদের কথা একবারে ভুলিয়াছিলাম। প্রবীন বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও এই ক্ষুদ্র কাচ খণ্ডের কম আদর নয়। বালক ইহাদ্বারা পার্থিব পদার্থের বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া আহ্লাদিত হয়,—বৈজ্ঞানিক কোটি যোজন স্থিত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের গঠনোপাদান ও গতিবৈচিত্র্য নির্দ্ধারণ করিয়া ও অতীন্দ্রিয় নক্ষত্র মালার নিখুঁৎ ছবি তুলিয়া দৃষ্টির অনন্ত প্রসারতায় বিমুগ্ধ হন। অল্পায়াসেই ত্রিকোণ কাচ সংগ্রহ করিয়া যথেষ্ট আলোক বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়, এজন্য অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ন্যায়, বর্ণচ্ছত্র দেখিবার জন্য জটীল যন্ত্র নির্ম্মাণের কোনই আবশ্যক হয় না। কেবল এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ডের সাহায্যে আজকাল যে সকল অভাবনীয় আবিষ্কার হইতেছে, তাহার হিসাবে, আধুনিক বিজ্ঞানে এই সামান্য যন্ত্রটি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবলমাত্র আলোক-বিজ্ঞানে নয়, বর্ণচ্ছত্র দ্বারা বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই নানা অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। আধুনিক রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ বর্ণচ্ছত্রের পরীক্ষাদ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যে এই উপায়ে কয়েকটি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পদার্থ বিশ্লেষণের পরিজ্ঞাত উপায় গুলির মধ্যে, বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা প্রথাই (Spectrum Analysis), অতি সূক্ষ্ম ও সরল উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

* পূজনীয়া "ভারতী" সম্পাদিকা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে "বর্ণচ্ছত্র", ইংরাজি Spectrum শব্দের বঙ্গানুবাদ রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই অনুসৃত হইল। শ্রীজঃ—

জড় বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখার পূর্ণতার জন্য অনেক পণ্ডিতের বহুকাল ব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার আবশ্যক। একজনের আজীবন পরিশ্রম দ্বারা কোন বিজ্ঞানই উন্নতির উর্দ্ধ সোপানে পৌছে নাই। আলোক-বিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের ইতিহাসে এ নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য্যের অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে আলোক-বিজ্ঞানের আজ এই উন্নতি হইয়াছে,—তবে তাড়িৎ-বিজ্ঞানাদির পরিণতি হইতে যেমন অধিক সময় লাগিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে বর্ণচ্ছত্রের উন্নতির জন্য তত সময়ের আবশ্যক হয় নাই। আলোক-বিশ্লেষণ দ্বারা জটিল যৌগিক পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন রসায়নবিদ-পণ্ডিত কল্পনাই করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ কেবল বর্ণচ্ছত্রের সাহায্যে পার্থিব পদার্থ ত দূরের কথা, সূর্য্য ও বহুদূরস্থিত নক্ষত্রাদির গঠন-উপাদান এবং চির রহস্যময় ছায়াপথের প্রকৃত তথ্য স্থিরীকৃত হইতেছে।

বর্ণচ্ছত্রের আদিম ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, সার্ আইসাক্ নিউটনের কথা প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণ শুভ্রালোক যে রামধনুস্থ কয়টি মূলবর্ণের সমষ্টি তাহা নিউটনই খৃঃ পূঃ ১৬৭৫ অব্দে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। একটি অন্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট করাইয়া পরে পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রিকোণ কাচ সাহায্যে আলোক বিশ্লিষ্ট করিয়া, লোহিত পীত বেগুনিয়া ইত্যাদি কয়েকটি বর্ণচ্ছত্র অর্থাৎ বর্ণশ্রেণী ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞানের আয়ত্তীভূত করিয়াছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণচ্ছত্র পাতকৌশল এবং রশ্মি সকলের বাঁকিবার পরিমাণ, সে সময় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল, এজন্য নিউটনের পাতিত বর্ণচ্ছত্রে সমগ্র মৌলিক বর্ণ দেখা যায় নাই। ইহাদ্বারা কেবল দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন ও মিশ্র বর্ণচ্ছত্র রচিত হইয়াছিল মাত্র। যাহাহউক, শুভ্রালোক যে, কয়েকটি মৌলিক বর্ণের সমষ্টি তাহা নিউটনই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন, এবং বর্ণচ্ছত্রের বর্ণগুলি একখানি স্থূলমধ্য কাচের (Double convex lens) সাহায্যে একত্রিত করিয়া পুনরায় শ্বেতালোক উৎপাদন দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন অবলম্বিত উপায়ে অবিমিশ্র বর্ণচ্ছত্র রচনা অসম্ভব বলিয়া, সৌর বর্ণছত্রের প্রধান লক্ষণ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ রেখা গুলি সে সময় আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা আজ কাল যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে আলোক কি প্রকারে বিশ্লিষ্ট হয় তাহা মোটামুটি জানা আবশ্যক। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, শুভ্রালোকের উপাদান মূল বর্ণগুলির প্রকৃতি সমান নয়। প্রত্যেক বর্ণ, বিশ্বব্যাপী ঈথর নামক পদার্থের কম্পনজাত এক একটি নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গদ্বারা উৎপন্ন হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বর্ণচ্ছত্রের লোহিতাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং লোহিত হইতে বর্ণানুক্রমে কমিতে কমিতে ভায়লেট অংশে ইহা অত্যন্ত অল্প হইতে দেখা যায়; গণনা করিলে লোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ভায়লেট তরঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়ে! যদিও মৌলিক বর্ণগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের

এই প্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ মধ্যে ইহাদের গতি একই থাকে, এজন্য তরঙ্গের দৈর্ঘ্যহিসাবে ঈথর কণার কম্পন পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং দীর্ঘ তরঙ্গযুক্ত বর্ণের কম্পন সংখ্যা ক্ষুদ্র তরঙ্গযুক্ত বর্ণের কম্পন পরিমাণ অপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে ! এই কারণে লোহিতাদি বর্ণ অপেক্ষা ভায়লেট দ্বারাই ঈথরকণা সকল অতি শীঘ্র কম্পিত হয়। বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক পাঠিকা গণ জানেন আলোক রশ্মি কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থ দিয়া গমনকালীন, সকল সময়েই সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। একটি অন্ধকার গৃহের জানালার ছিদ্র দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করাইয়া, বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা দ্বারা রশ্মিপথ সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ত্যাগ করিয়া, গাঢ় বা তরলতর আর একটি নূতন পদার্থে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে রশ্মিসকল পূর্ব্ব অবলম্বিত সরল পথানুক্রমে চলিতে পারে না, এই দুই পদার্থের সন্ধিস্থলে আসিয়া ইহাদের পথ পরিবর্ত্তন হয় এবং পদার্থের গাঢ়তা হিসাবে বাঁকিয়া নূতন পথানুক্রমে চলিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত আলোকপথ বাঁকিবার আরো কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল গুলির বিবরণ অনাবশ্যক।

আলোকপথ পরিবর্ত্তনের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই, একই রশ্মি অবস্থাভেদে নানা পথে চলিতে পারে। আলোক বাহক (Medium) পদার্থ গুলি সমান থাকিলে, রশ্মি সকল কোন পদার্থ হইতে গাঢ়তর পদার্থে বক্রভাবে প্রবেশ করিয়া যে নূতন পথ অনুসরণ করে, তাহা পরীক্ষা করিলে আলোক বাহক পদার্থ দ্বয়ের সন্ধিতলস্থ লম্বের সহিত প্রায় এক সরল রেখায় দেখা যায়, কিন্তু গাঢ় পদার্থ হইতে তরলতর পদার্থে প্রবেশ করিলে ইহার ঠিক বিপরীত ফল লক্ষিত হয়,—এস্থলে নূতন আলোকপথ উক্ত লম্ব হইতে দূরে গিয়া সন্ধিভূমির সহিত এক সমতলস্থ হইবার চেষ্টা করে। সকল আলোক-পথ পরিবর্ত্তনই এই দুইটি স্থূল নিয়ম দ্বারা সাধিত হয়। যদি কোন দুইটি স্বচ্ছ পদার্থের সন্ধিভূমিদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, আলোক-পথ ভূমিদ্বয়ে দুইবার বাঁকিয়া, ইহার পূর্ব্ব পথের সহিত ঠিক্ সমান্তরাল হইয়া বাহির হইয়া আইসে। কিন্তু ত্রিকোণ কাচফলকের মধ্যে সমান্তরাল ভূমি নাই, এজন্য আলোক-পথ ভূমিদ্বয়ে দুইবার বাঁকিয়া গিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেই চেষ্টা করে, সমান্তরাল হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। ত্রিকোণ কাচফলকের গঠনে এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া ইহাদ্বারা আলোক-বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। নিউটন প্রমুখ পণ্ডিতগণ রশ্মিপথের এই জটিল পরিবর্ত্তনের নানা কারণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং গাঢ় পদার্থ অপেক্ষা তরল স্বচ্ছ পদার্থে আলোকের গতি দ্রুত হওয়াই রশ্মিপথ বাঁকিবার একমাত্র কারণ বলিয়া আজ কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আলোক-পথ পরিবর্ত্তনে আরো দুই একটি ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঝুমঝুমি।

থাক্ থাক্ রেখে দাও
ছুঁয়োনা ও ঝুমঝুমি,
কি যে ও অমূল্য ধন
কেমনে বুঝিবে তুমি?

তোরা তুচ্ছ ভেবে ওরে
পাশ দিয়ে চলে যাস,
আঁখিতে আসে না জল
পড়ে না একটি শ্বাস!

আমার হৃদয়ে পশি
ঐ রুণু ঝুনু তান,
শিরে শিরে বেজে ওঠে
আলোড়িত করি প্রাণ!

নিভৃত অন্তর তলে
মৃদু মৃদু ও রাগিনী,
অতীতের রাজ্য হতে
জাগায় সে কি কাহিনী!

একটি শিশুর নব
অতুল মধুর মুখ,
কেশের পল্লব মাঝে
ফুলটি সে টুক টুক!

চঞ্চল দুইটি সেই
উজ্জ্বল নয়ন তারা,
বরষিত প্রাণে কি যে
আনন্দ কিরণ ধারা!

ছোট সেই হাত দুটি
আমার হৃদয় মাঝে,
আজিও আজিও তার
কোমল পরশ বাজে!

ঝুমঝুমি ধরি হাতে
ধীরে সে বাজাত যবে,
কি সুধা ঝরিত তাহে
আমার পরাণে তবে!

ছন্দহীন অর্থহীন
রুণুঝু রুণুঝু শুধু,
তোমরা ত বুঝিবে না,
বুঝিবে মা কত মধু!

আজিকে সংসার মাঝে
শিশুটি সে নেই আর,
শুধু পড়ে আছে হোথা
ঝুমঝুমি খানি তার!

আর শুধু আছে পড়ে
হৃদি মাঝে ভালবাসা,
আজিকে বুঝাতে যাহা
নাহি আর কোন ভাষা!

কত সুখ কত আশা
এনে ছিল সাথে করে,
সকলি তাহার সাথে
সমূলে গিয়াছে ম'রে।

কেবল জাগিছে মনে
ওই ওর মৃদু তানে,
দিন রাত ধরে সেই
মরণের ভার প্রাণে।

সেই ভিক্ষা বিভু কাছে,
সেই তার মুখ পরে,
অনিমেষ চেয়ে থাকা,
সারা দিন রাত ধ'রে।

তার পরে সেই ছবি
শ্রান্তদেহ হিমময়,
ক্লান্তিভরে নিমীলিত
নিস্পন্দ নয়নদ্বয়!

থাক্ তবে থাক্ থাক্
উহারে ছুঁয়ো না আর,
সব গেছে আছে শুধু
ওই ঝুমঝুমি তার!

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন।

(সমালোচনা)

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন অনুমান ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ১৭৩ বৎসর হইল তিনি ধরা ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শুনা যায় তিনি কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন; তাঁহার ইষ্টদেবী অন্তিম কালে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন—তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভিন্ন হইয়া মৃত্যু হয়। তাঁহার লুপ্তাবশিষ্ট কাব্য বিদ্যাসুন্দর দ্বারা তাঁহাকে ধর্ম্মভীরু ও তেজস্বী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পদাবলী দৃষ্টে জানা যায় যে তিনি নম্রতা ও ভক্তির অবতার ছিলেন। তাঁহার সকলি লোপ হইতে পারে কিন্তু তাঁহার ভক্তিভাবের যে প্রসাদী সুর ইহা কখনই লুপ্ত হইবার নহে—ইহাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাজারে তাঁহার যে পদাবলী দৃষ্ট হয় তাহার সকল গুলি তাঁহার রচিত বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত সংগৃহীত পুস্তকে "প্রসাদ" "রামপ্রসাদ" "দ্বিজ রামপ্রসাদ" "রামপ্রসাদ দাস" "প্রসাদ দাস" "কবিরঞ্জন" ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদগুলি দৃষ্ট হয়। সিদ্ধ রামপ্রসাদ তাঁহার কাব্যে অধিকাংশ স্থলে প্রসাদ ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন তবে কোন কোন স্থলে রামপ্রসাদ ও কবিরঞ্জন উপাধিও ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক "প্রসাদ" ভণিতাযুক্ত পদের রচনায় যেমন প্রগাঢ় ভক্তিরসযুক্ত আধ্যাত্মিকভাবের গভীরতা ও রচনালালিত্য দেখা যায় অন্য ভণিতাযুক্ত পদে সেরূপ দেখা যায় না। প্রসাদ কালীর প্রতি তীব্র ও রুক্ষ ভাষায় কখন আব্দার করেন নাই। যাঁহারা তীব্র উক্তিদ্বারা ভক্তি প্রকাশ করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের ভক্তি কত প্রকাশ হইয়াছে জানি না রচনা ও ভাবের সমূহ হানি হইয়াছে। সংগৃহীত পুস্তকে অনেকগুলি গীতের ভাব প্রায় একই, কিন্তু পরস্পরে তুলনা করিলে "প্রসাদ" ভণিতাযুক্ত পদের রচনা-কৌশল ও আভ্যন্তরিক গভীরতার সহিত অন্য পদের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে বেশ বোধ হইতেছে যে ক্ষুদ্র কবিগণ স্বীয় রচনার বহুল প্রচার আশায় প্রসাদের পদাবলীর মধ্যে প্রক্ষেপ এবং তাহার অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ভক্তের যেমন ইষ্টদেবে তন্ময়ত্ব উপস্থিত হয় সুতরাং ভক্তি ও ভাবের উৎস যেমন স্বাভাবিক গতি অবলম্বন করে অনুকারীদিগের তেমন হয় না। অনুকৃত হয় বটে কিন্তু তাহাতে সে নৈসর্গিক সজীবতা থাকে না।

কোন কোন পদে "দ্বিজ-রামপ্রসাদ" বলিয়া ভণিতা দৃষ্ট হয় ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, যে সময় রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীতরূপ দ্বিতীয় সংস্কার লইয়া আন্দোলন

করিতেছিলেন সে সময় রামপ্রসাদও সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়া "দ্বিজ উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ইহা যে প্রকার কষ্টকল্পনা সেই প্রকার প্রসাদের দৃঢ় চরিত্রের বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ আমরা দেখিতেছি যে কবিওয়ালার দলে একজন রামপ্রসাদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে রামপ্রসাদ ঠাকুর বলিত। তিনি কবির দলের গুরু হারুঠাকুরের পৌত্র ও নীলু (নীলমণি) ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্র।

১২৩৮ সালে শান্তিপুরের রামবাবু শ্যামবাবুর বাটীতে একবার "কবির লড়াই" হয়। একদলের দলপতি ছিলেন রামপ্রসাদ ঠাকুর অন্য দলের অধিকারী ছিল বিখ্যাত চিন্তে ময়রা। সে সময় চিন্তের অল্প বয়স ছিল বলিয়া বাবুরা বলিয়াছিলেন—"এ সং কেন আনা হইয়াছে।"

যখন আসর বসিল, চিন্তের গাঁথনদার শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নের কবিতা রচনা করিয়া চিন্তেকে গাহিতে বলেন—

আস্‌ছে যত সং, বাজিছে মৃদঙ্, জয়ঢাক ইংরাজি বাদ্য।
আবার বাজে ঘণ্টা ঠঠং ঠং।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁওয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেমনি ঐ নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন্॥
মরি হায় কি সুরত, ঠিকযেন বজরার মূরত,
দেখ্‌তে শোভার্থ, এতে নাই কোন পদার্থ
যেমন নবাব মরে নবাব হলো উজীর আলি আড়াই দিন॥
রামপ্রসাদ শর্ম্মা, কাজেতে অকর্ম্মা
দাঁড়িয়ে ঠিক যেন ধোপার বিশ্‌কর্ম্মা
সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন লবেদার আস্তীন॥

রামপ্রসাদের গাঁথনদার গদাধর মুখোপাধ্যায় নিম্নরূপ উত্তর রচনা করিয়া গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ স্বয়ং কিছু বলিতেন না শুদ্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতেন তাঁহার পরিবর্ত্তে আর একজন গান করিত, এই কারণেই "চাপানে" তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

যেমন কালীঘাটের দক্ষিণে এক্ষণে দিব্যি পরিচয় হয়ে রয়েছে।
চোৎমাসে জল থাকে না তবু আদ্যগঙ্গা বলে লোকে মানতেছে।

যেমন সরোবরের মান্য কিছু
জল শুকোয় পাড় তবু তার থাকে উচু
যদি মাঝখানে হয় শোলা কচু
নাম তবু তার তাল পুকুর,
তেমনি দলপতি ইনি আমাদের রামপ্রসাদ ঠাকুর।
যেমন সোনা নাই তার সোনাবেড়ে নাম রয়েছে দেশ মাশুর।
তেমনি দলপতি ইনি আমাদের রামপ্রসাদ ঠাকুর।
গেল মানীজনের মান, হচ্চে অপমান যত অমানুষের কাছে।
মহতের মর্য্যাদা আছে মহতের কাছে।

চিন্তে পাল্টা ধরিল—

আর এক কথা কই এরা চুণকে বলে দই;
পাকা ধানেতে দেই মই।
আবার বেটো ঘোড়ায় জীন কসেছে লেজেতে দিয়ে লাগাম।
কর্ত্তা করেছেন শিষ্য ভেবা গঙ্গারাম॥

শ্যামাচরণ মাতুল গদাধরের বিপক্ষ দলেই গাঁথনদার হইতেন সেই জন্য তাঁহাকে বেটো ঘোড়া বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। যাহা হউক ইহাদ্বারা বেশ জানা গেল যে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে পদ গুলি আছে তাহা সম্ভবতঃ এই রামপ্রসাদের রচনা হইবে। ইনি অনেক গুলি গীতের ভাব প্রসাদ ও কমলাকান্তের রচনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি নিম্নে অনেকগুলি সমান ভাবাত্মক পদ লিখিতেছি যাহার রচনা ও ভাব দেখিলে পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে সে গুলি একজনের রচিত নহে।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি কোথায় পাব টাকার তোড়া।
চাকী কেবল ফাঁকি মাত্র শ্যামা মোর হেমের বোড়া।

নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বলে চলে যাব যথা তথা,
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা।
তুমি গো পাষাণের সুতা আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে হৃদি স্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা ॥ ২।

এই উভয় গানের ভাব সুর সমান তত্রাপি প্রথম গানটি কত ভাল।

মলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
মিছে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে
আমি দিন মজুরি নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খায়গো বেঁটে।
পঞ্চ ভূত ছয়টা রিপু দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে
তারা কারো কথা কেউ শুনে না দিনতো আমার গেল ঘেটে।
যেমন অন্ধজনে হারাদণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাইমা কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্ম ডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥ ১।

কালী পদ মরকত আলানে মন কুঞ্চরে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্ম পাশ ভেল কেটে।
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার আবার বেগার মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা পরমায়ু যায় ঘেটে॥

নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুলনারে দুঃখ চেটে।
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয় মিছে মলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে। ২।

প্রথম গানের ভাব ও রচনা কেমন চমৎকার! ভক্তের মন করুণ ও শান্তিরসে আপ্লুত করে। কিন্তু দ্বিতীয় গানে তেমন কিছু নাই। যেন বোধ হইতেছে রচনাটি অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হইয়াছে।

প্রসাদের অনুকরণকারী যত কবি তীর্থগমনের আবশ্যকতার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে পরমারাধনাতেই মুক্তিলাভ।

মন ভেবেছো তীর্থে যাবে।
কালিপাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে।
ভবজ্বরা পাপরোগ নীলাচলে নানা ভোগ
জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্থানে রোগ বাড়াবে।
কালীনাম মহৌষধি ভক্তি ভাবে পান বিধি
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে।
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত সেবায় হবে আশুমুক্ত
ওরে সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্মায় মিশাইবে।
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া
ওরে কাঁটা গাছের তলে গিয়ে মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে॥

তাঁহার "কাজ কি আমার কাশী" ও "মন ছাড় না দ্বেষাদেষী" এবং কমলাকান্তের "তাই কালরূপ ভালবাসি" গানে কালীর পদ সেবাই রাশি রাশি তীর্থ দর্শন ফলের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রসাদের মতে কালিভক্তের গঙ্গা কাশী করা নিষ্প্রয়োজন।

"কালী কালী বল রসনারে" এই গানেও তীর্থ ভ্রমণ মিথ্যা বলিয়াছেন। তাহাতে মন উচাটন বই আর কিছু হয় না, অতএব নিবৃত্ত হইয়া কালী সাধন করা উচিত।

"কাজ কি ওরে মন যেয়ে কাশি
কালির চরণে কৈবল্য রাশি।"
"কাজ কি আমার কাশি
যার কৃত কাশি তদুরসি বিগলিত কেশী।" ইত্যাদি

এ গুলি যে অন্য কবির রচিত তাহাতে কোন ভুল নাই যে হেতু এ গুলিতে প্রসাদ রচিত ভাবের সজীবতা নাই।

গানের বহি

বা

মনস্তত্ব।

আমার জন্মভূমি পল্লীগ্রাম মজিলপুর, সেখান হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে স্থল এবং জল উভয় পথেই আসা যায়, এখন রেলপথ হইয়াছে। তখন আসিতে হইলে ঘোড়ার গাড়ীতে বা শাল্‌তীতে আসিতে হইত। পৌছিতে প্রায় সমস্ত দিনই লাগিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমি আট বৎসরের বালিকা মাত্র। একবার আমরা দুইখানি গাড়ীতে করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলাম। এখন কলিকাতা হাড়ে হাড়ে মিশিয়া গিয়াছে। গিয়াছে কি? কিন্তু তখন (সহরবাসীরা মাপ করিবেন) কলিকাতাকে ভোজের দেশ বা জনপূর্ণ অরণ্য বলিয়া বোধ হইত। যাক্, আমরা দুইখানি গাড়ীতে আগ্রিতেছিলাম, এক-খানিতে গুরুজনেরা ছিলেন, একখানিতে আমাদের মানুষ-করা ঝি, ও আমরা দুই ভগ্নীতে ছিলাম। তখন সব জায়গায় পাকা রাস্তা ছিল না, গাড়ী উচ্চ নীচ সরু মেঠো রাস্তার উপর দিয়া উছট খাইতে খাইতে ধূলা উড়াইয়া মাঠের পর মাঠ গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। আমরা গাড়ীর দরজা খুলিয়া নির্ণিমেষ নেত্রে সেই বিস্তীর্ণ হরিৎ-প্রান্তরে কোথাও একদল গাভী চরিতেছে, কোথাও তরুমূলে রাখাল ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, কোথাও বা পথি-পার্শ্বস্থ জলাশয়ে কমল ফুটিয়াছে, হংস খঞ্জন প্রভৃতি চরিতেছে, ইত্যাদি শোভা দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। স্থলে স্থলে ধান্যক্ষেত্র বাতাসে হিল্লোল তুলিতেছিল। স্থলে স্থলে গাছপালার ছায়ার মাঝে মাঝে এক একখানি কুঁড়ে ঘর, কুটীর

প্রাঙ্গনে ধূলি ধূসর দেহে কৃষকের ছোট ছোট ছেলেরা ছায়ায় বসিয়া খেলা করিতেছিল, কৃষক-বধূ মাটীর কলস কক্ষে করিয়া আধ ঘোমটা টানিয়া গাড়ীর প্রতি চাহিয়াছিল, সেই ছায়াঘেরা কুটীরখানি দেখিয়া কি জানি না,—আমার গাড়ী হইতে দৌড়িয়া নামিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিছু পরে আমাদের গাড়ী একটি বিস্তীর্ণ শ্মশানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল, কোথাও একটা ভাঙ্গা মাটীর কলসী পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও শবদাহ হইতেছে, এই সব দেখিয়া মনে একটু একটু ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্ধকার ছায়া পূর্ব্বের সে আনন্দ-উৎফুল্লতাকে ঢাকিয়া ফেলিল। গাড়ীর মধ্যে আমরা তিনজন হইয়াও দুইজন, কারণ ঝি ঢুলিতেছিল, সে বিষম ঢুলুনি, তাহাকে সারা পথ কিছুই দেখিতে দেয় নাই। এতক্ষণ আমরা নীরবে দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম, একঘেয়ে দৃশ্য আর ভাল লাগিল না, ছটফটানি ধরিয়াছে, আমি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বলিলাম, "ভাই সুরো, এখন আমার কি ইচ্ছা করচে বল্ দেখি ?"

সে বলিল—

"শীগ্‌গীর করে বাড়ী যেতে ?"।

আমি। "না"

"তবে মজিলপুরে যেতে ?"

"তাও না"

"তবে মাঠে বেড়াতে"

"দূর্ বল্‌তে পার্‌লিনি ? এখন ভাই একখানি গানের বই পেতে ইচ্ছা করচে, তাহলে বেশ পড়তে পড়তে যাই"।

সঙ্গীতপ্রিয় কে নয় ? কিন্তু আমার কাছে ইহার যেন ইতর বিশেষ কিছু ছিল না, সুরযুক্ত কথা শুনিলেই স্বরমুগ্ধ হরিণীর মত অভিভূত হইতাম, তা সে কেন যেমনই গান হোক না। আজিও যে হই না এ কথা বলিতে পারিলাম না। কি মাঝির গান, কি বাউলের গান, কি প্রেম সঙ্গীত সকলই আমার কর্ণে মধুর।

সে বলিল "তা গানের বই কোথা পাবে ?"

আমি বলিলাম "কি জানি ভাই আমার কেমন মনে হচ্চে পাব"।

বাস্তবিক আমার তখন মনে হইতেছিল, একখানি বই পাইব।

আমরা খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম, এটা সেটা নাড়িয়া খুঁজিতেছি, এইবার ঝি ধমকাইল— "কি উস্ খুস্ কচ্চিস্ পড়ে যাবি ?" আবার ঢুলুনি! আমরা নিবৃত্ত হইলাম না, কিন্তু কোথায় ? গাড়ীতে আমাদের প্রয়োজনীয় দু একটি জিনিষপত্র ব্যতীত আর কিছু ছিল না। তাহা হইলে কি হয়, মনে হইতেছে পাইব, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গাড়ীর পকেটের মধ্যে হাত দিলাম, হাতে একটি দ্রব্য ঠেকিল, কাগজ ? বাহির করিয়া দেখি

কাগজ নহে বই। কি বই? গানের বই। প্রথমকার তিন পৃষ্ঠা নাই একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত! সুরো মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিল। পরে হাত জোড় করিয়া উভয়ে প্রণাম করিলাম।

হে নাথ! সেই অজ্ঞান বালিকাহৃদয় সেদিন যে ভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা তোমার অবিদিত নাই, আজ আরাধনাতেও সে ভাব আসে না। সেই প্রশস্ত প্রান্তর-মধ্যে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। এমন কতবার দেখিয়াছি। আজ সেই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বাল্যকাল বিদূরিত হইয়াছে, প্রখর জ্ঞানালোকে চক্ষু ঝলসিত। আজি আর তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি কোথায়? সেদিন যাহা তোমার প্রত্যক্ষ দান ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজি তাহা হঠাৎ মিলিত মনস্তত্ত্বজাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বসিয়াছি। তোমার দান ফুরায় নাই, এমন কত না দিয়াছ, আজও এমন কত না দিতেছ? কিন্তু আমার বিশ্বাস বা সারল্য ফুরাইয়াছে। হে নাথ! তুমি সর্ব্বত্রে বিরাজমান, আমি অন্ধ হইয়া বেদ বেদান্ত দর্শনের মধ্যে হাতড়াইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি!

স্বীয় নাভি গন্ধে অন্ধ মৃগ ভ্রমে যথা বনালয়ে।
ওগো তোমারি অঙ্গেতে থাকি থাকি তোমা পাশরিয়ে।

মনস্তত্ত্বই বল, আর যাই বল এমন ঘটনা আমার জীবনের মধ্যে অনেক ঘটিয়াছে। আর একদিনের বাল্য ঘটনা একটি উল্লেখ করিতেছি।

আজ রথযাত্রা। সারাদিন ধরিয়া স্বহস্ত রচিত নিশানে, পুষ্পমাল্যে ক্ষুদ্র একখানি রথ সাজাইয়াছি। কত কোলাহল, কত মতভেদের মধ্য দিয়া এতক্ষণে রথসজ্জা শেষ করিয়াছি। এইবার সকলে মিলিয়া টানিতে আরম্ভ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা নিনাদ করিয়া আমাদের রথখানি চলিতেছে, কিন্তু একি! রথের মধ্য হইতে সহসা কি পড়িয়া গেল? জগন্নাথ! সর্ব্বনাশ! ঠাকুর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বিবাহ রাত্রে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে যে কষ্ট হয়, অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া মাঝি ডুবিয়া গেলে যেরূপ কষ্ট হয় বুঝি তখন আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে সেইরূপ কষ্ট সেইরূপ তোড়পাড় হইয়াছিল, "অবশ্য ঠাকুরের কাছে কোন অপরাধ করিয়াছি তাই ঠাকুর ভাঙ্গিয়া গেল!" এখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঠাকুর আর মিলিবে না! তখন একজন বলিল "এসো কাদার ঠাকুর গড়িয়া দিই।"

দলের মধ্যে আমি বড়, আমার অনুমতি ব্যতীত কিছু হয় না, অন্য বালকবালিকারা আমাদের সম্মুখ দিয়া রথ টানিয়া যাইতেছে, সঙ্গীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল; আমি নিস্তব্ধে ভাবিতেছিলাম, কি দোষ করিয়াছি? অবশ্যই কিছু করিয়া থাকিব, নহিলে যাবে কেন? এমন সময় হঠাৎ আমার মনের ভিতর কে যেন বলিয়া দিল "খুঁজলেই পাবে"। তখন আমার সে ম্রিয়মান ভাব দূর হইয়া গেল, পূর্ব্বের আনন্দ আবার ফুটিয়া উঠিল, "চল না ঠাকুর পাওয়া যাবে।" বলিয়া সকলে মিলিয়া চারিদিকে ছাদে সিঁড়ির কোণে গাছের তলায় ঠাকুর খুঁজিতে

লাগিলাম। কিন্তু কই শ্যামসুন্দর ত মিলিল না। একজন বালক বলিল "এতক্ষণে কাদার ঠাকুর গড়া হয়ে যেত"।

আমি বলিয়া উঠিলাম "তোমার ইচ্ছা হয় গড় গে, আমি ঠাকুর না পেলে রথ চালাব না।"

তখন আবার আনাচে কানাচে রান্নাঘর ঢেঁকশাল চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এখনো রথের আটদিন আছে, আটদিন খুঁজিব, যদি না পাই আর রথ করিব না, ঠাকুরও কিনিব না, গড়িবও না, আপনি যদি আসেন, তবেই রথ চালাব।

প্রেম কি যাচলে মেলে খুঁজলে মেলে,
সে যে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে!

আমাদের শুভযোগ এখনও উপস্থিত হয় নাই কাজেই মিলিতেছিল না। অবশেষে একটি মাটীর ঘরের কোণে কতক গুলি ইঁদুর মাটী রাশ করা ছিল, তাহার মধ্যে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া আমরা অঙ্গুলি অঙ্গুলি করিয়া মাটী সরাইতে লাগিলাম। একখানা মাটীর খুরি, একটা প্রদীপ বাহির হইল, অবশেষে একি? পোড়ামাটীর একটি ক্ষুদ্র জগন্নাথ! সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া ঠাকুর লইয়া চলিলাম, পুকুরে স্নান করাইয়া অঙ্গার ঘসিয়া খড়ি গুলিয়া সিন্দুর লেপিয়া ঠাকুরের অঙ্গরাগ করা হইল, তবু সে কত সুন্দর! রথ আবার চলিল, অন্যান্য বালকেরা দেখিতে আসিল। বালকেরা শত মুখে সেই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিতে লাগিল। একটি বালক বলিল "ওর উপরে ঠাকুরের ভর হয় নইলে যা মনে করে তা কেমন করে পায়!"

বিমল হৃদয়-নন্দনে আর কি পাইব তোমারে?
চাহি না চাহি না যৌবনে, সে সুখ-শৈশব কোথা রে?
সারল্য বিশ্বাসে গঠিত, যে ডাকে নিকটে তাহারি,
নাহিক সন্দেহ-অনৃত জ্ঞান-অভিমান চাতুরী!

আমার জীবনে অনেক স্বপ্নও সত্য হইয়াছে। কোনরূপ বিশেষ ঘটনা ঘটিবার সময়ে প্রায়ই আমি তাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু একটি এখানে উল্লেখ করিব।

আমি আমার পুত্রবধূ করিবার নিমিত্ত একটি তন্বী কন্যাকে মনোনীত করিয়াছিলাম। বিবাহ শীঘ্রই হইবে সম্বন্ধ স্থির। এই সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম কোন কর্ম্মোপলক্ষে আমি আমার একজন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, এবং সেখান হইতে যখন ফিরিয়া আসিতেছি, তখন সেই বাটী হইতে একটি বালিকা আসিয়া আমার পাল্কীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ও অতি মৃদুস্বরে সলজ্জভাবে বলিল, "আপনি যাহাকে মনোনীত করিয়াছেন সে ত আপনার বধূ হইবে না, আমিই আপনার পুত্রবধূ হইব।" স্বপ্ন দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম, কারণ যেখানে সম্বন্ধ হইতেছিল সেখানে উভয় পক্ষ হইতেই একরকম পাকা কথা হইয়াছে তবে সেখানে বিবাহ কেন না হইবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হঠাৎ সেই পূর্ব্বদৃষ্টা কন্যাটির এমন একটি উৎকট

রোগ প্রকাশ পাইল যাহাতে সে বিবাহ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল এবং অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া শেষে সেই স্বপ্নদৃষ্টা কন্যাটিই আমার বধূ হইলেন। এখন এখানে আমার বক্তব্য এই যে, এ লেখা পড়িয়া আমার উপস্থিত বধূমাতাদের কিছু ক্ষুণ্ণ হইবার প্রয়োজন দেখি না, কারণ পূর্ব্বদৃষ্টা কন্যাটি আমার বধূ না হইলেও বধূ সম্বন্ধে আমি নিরাশ হই নাই।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার নিকট আমার ভগিনীপতির কঠিন পীড়া হয় এবং তাহাতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। আমি তখন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া দূরে থাক পীড়ার সম্বাদও কেহ আমাকে দেয় নাই। আমি সন্ধ্যার সময় একাকী ঘরে শুইয়াছিলাম, শরীর সে দিন কিছু অসুস্থ ছিল, তখন আমি না নিদ্রিত, না জাগরিত, কেমন এক প্রকার অবসন্ন আচ্ছন্নভাবে যেন চাহিয়াছিলাম। এই অবস্থায় দেখি আমার ভগিনীপতি একটি কালো জামা গায়ে, এবং মাথা প্রায় এক রকম নেড়া বলিলেই হয়, খুব ছোট ছোট চুল, তিনি মৃদুস্বরে আমাকে বলিতেছেন, "আপনি ভাবচেন কেন? এইবার আমি 'তাহার' কেমন ভাল করিয়া আসিয়াছি!" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। হঠাৎ ভয়েই বোধ হয়, আমার সে অবসন্ন ভাব দূর হইয়া গেল, আমি ত্রস্তে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেলাম, যেখানে আর সকলে ছিলেন সেইখানে গিয়া বসিলাম, তাঁহারা আমাকে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া বলিলেন "কি হয়েচে?"

আমি বলিলাম "আমার কেমন ভয় কচ্চে, আমি এইরূপ দেখিলাম"।

তাঁহারা বলিলেন, "ও স্বপ্ন বইত নয়।"

এরূপ সান্ত্বনা বাক্যে আমার মন অবশ্য সুস্থ হইল না। কেননা পূর্ব্বে যতবার এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি সত্য হইয়াছে। এবারই যে হইবে না তাহা কি করিয়া মনে করি। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। কলিকাতায় আসিয়াই শুনিলাম আমার ছোট ভগ্নী বিধবা হইয়াছে, এবং যে রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখি ঠিক সেই দিন এখানে সেইরূপ বেশে, সেইরূপ পরিচ্ছদে সেই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাপেক্ষাও দুএকটি পরমাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি আপাততঃ তাহা বলিবার ইচ্ছা নাই।

আমার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্বপ্নে নহে। একদিন বৈকালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কয়েকখানি "সোফা" প্রভৃতি নীলাম হইতে কিনিয়া আনেন। আমার পিতাঠাকুর সেগুলি দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিলেন। তখন আমি সেখানে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হঠাৎ আমার মনে হইল তাঁহার পক্ষাঘাত হইবে। ঐ কথা কে যেন আমাকে বলিয়া গেল। তাঁহার সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর হইলেও আমি ঐ চিন্তাতে কিছু বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম। সেদিন সন্ধ্যার সময় পিতৃদেবের চরণ বন্দনা করিয়া ম্লানচিত্তে শ্বশুরালয়ে গমন করিলাম সেই রাত্রি প্রভাতে শুনিলাম তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়াছে। আমি দেখিতে আসিলাম তিনি আমার চিবুক ধরিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "মা! আমি চলিলাম"। তিনি যে আর বাঁচিবেন না তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম।

আমার জীবনে আর একটি যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে অদ্যাপি তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা পাঁচজনে আমাদের বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলাম। গল্প গুজব সাহিত্য আলোচনা ইত্যাদি হইতেছিল, আমি দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম, ঘরে দুইটি বাতী জ্বলিতেছিল, আমার একজন আত্মীয় বঙ্কিম বাবুর "বুড়াবয়সের কথা" পাঠ করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, আমরা সকলেই তন্মনা ছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ একটি বৃদ্ধা রমণী দ্বার দিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল এবং বিড় বিড় করিয়া কি বলিল, ভাল বুঝিতে পারা গেল না। অন্য সকলে দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া বসিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা তাহাকে দেখিতে পান নাই। তাহার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, বুড়ীটাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি এবং সে কি বলে ও কেন আসিয়াছে জানিবার জন্য মৃদুস্বরে ছেলেদের বলিলাম "দেখ ও আবার কে ?" ছেলেরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যিনি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন তাঁহার সঙ্গেই কথা কহিতে লাগিল। বুড়ীটা দাঁড়াইয়া থাকায় আমার কেমন অশোয়াস্তি বোধ হইতেছিল, আমি পুনর্ব্বার বলিলাম,

"কেও জিজ্ঞাসা কর না"। তখন যিনি পড়িতেছিলেন তিনি বলিলেন "কি ?"

আমি মৃদুস্বরে কহিলাম "একটা বুড়ী"।

তিনি তখন তর্কে মাতিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "আপনি শুনুন"।

এতক্ষণের পর বুড়ী নড়িল। কিন্তু দ্বার দিয়া ত বাহির হইল না, দেয়ালের নিকট গিয়া অন্তর্হিত হইল। তখন আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম "তোমরা শীঘ্র বাহিরে আইস" বলিয়া বারান্দায় আসিয়া দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটা বুড়ী আসিয়াছিল কি না এবং এই মাত্র তাহাকে যাইতে দেখিয়াছ কি না ?"

তখন ছেলেরা কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। আমার কথা শুনিয়া সকলে নীচে নামিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ, অন্বেষণ করিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলাম বলিয়া পাছে অপর লোক কেহ আসে তাই দরওয়ান সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, আর খিড়কীর দরজায় চাবি বন্ধ। বুড়ীটাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, এখন মনে পড়িল আমাদের বাটীর পার্শ্বে এক সদ্‌গোপ বাস করে সে বুড়ী তাহার মা, কিন্তু সে যে একমাস হইল মরিয়াছে!

পার্সি সম্প্রদায়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

জোরোস্তারের ধর্ম্ম পারস্য দেশ হইতে বিদূরিত হইয়া কিরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; ভারতীয় পার্সিগণের দ্বারা এই ধর্ম্মের কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা সেই কথারই আলোচনা করিব।

একথা বলা বাহুল্য, যে, স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমিতে বহুজাতি, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, এবং বিভিন্ন সংস্কারাপন্ন সম্প্রদায় সমূহ বহুদিন হইতে বাস করিয়া আসিতেছে; পারস্যবাসীগণের যে পরিমাণেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা থাক, ঐ সমস্ত লোকের সংস্রবে তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন সংঘটন অবশ্যম্ভাবী।

পারস্য হইতে জোরোস্ত্রিয় ধর্ম্ম বিদূরিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। তখন হইতেই শতশত অন্ধসংস্কার ও বহুবিধ বিরোধী নিয়ম জালে আবদ্ধ হওয়াতে ইহার পবিত্রতা, জীবনীশক্তি, এবং কর্ম্মশীলতা শিথিল হইয়া আসিতেছিল; বহুবিধ শাস্ত্র প্রণেতা আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব মত প্রচলন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় এই ধর্ম্মের মধ্যে ধীরে ধীরে সাকার উপাসনার প্রবর্ত্তনার সহিত ধর্ম্মের প্রাথমিক সরলতা ও একেশ্বরবাদের সুস্পষ্ট সত্য ক্রমে জটীলতা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ইহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ জোরেস্তা এবং ভেন্দিদাদে একেশ্বর বাদের পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইরাণী আর্য্য ও ইন্দু আর্য্যগণ প্রবর্ত্তিত অগ্নি উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন প্রথা ভারতীয় পার্সিগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের পার্সি ঔপনিবেশিক জাতি ভিন্ন প্রায় সমস্ত ইন্দু-আর্য্য জাতির মধ্যে হইতে অগ্নি উপাসনা লুপ্ত হইয়াছে।

পার্সি দিগের সমস্ত বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা সহজ নহে; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা স্থূল স্থূল বিবরণ বিবৃত করিব।

পার্সিদিগের সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত পুরুষের নাম অহুর মজ্‌দা; তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিখিল বিশ্বের প্রাণ, ক্ষমতা, জ্ঞান ও সত্যের মূল স্বরূপ। তাহাদিগের বিশ্বাস সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, তাঁহার স্বপ্রকাশ নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা চির পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে, কারণ জগৎ রচনার সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন এবং ক্রমানুবর্ত্তিতা অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুর ন্যায় ইহারা বিশ্বাস করে, যে, পৃথিবীর কোন পদার্থই নূতন নহে, যাহা আছে সমস্তই পুরাতনের পুনঃসংস্করণ; পুরাতন উপাদান লইয়া নূতন গঠিত হইতেছে। বিশ্বেশ্বর যে শক্তিতে সৃষ্টি করেন, তাহার নাম স্পেন্তোমৈনিয়স্‌, এবং যে

শক্তিতে বিনাশ করেন, তাঁহার নাম এংগ্রোমৈনিয়স্ বা অর্হিমান। এই শেষোক্ত শক্তির কোন প্রকার অনিষ্টকারিতা নাই, ইহা প্রথমোক্তের সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহারা বলে মনুষ্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, তাহারা ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনেক সময় প্রাকৃতিক নিয়ম, এমন্ কি, সৃষ্টিশক্তি ও বিনাশ শক্তিকেও ব্যাহত করিতে পারে; অতএব মনুষ্যের বিনাশের জন্য তাহাদের অজ্ঞতা ও দৌর্ব্বল্যই অধিক পরিমাণে দায়ী, এবং গ্রোমৈনিয়স্‌কে দোষী করা অবিধেয়।

জোরোস্ত্রিয় শাস্ত্রের মতে বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে মনুষ্য যেরূপেই সাহায্য করুক, তাহাই সৎ, এবং তজ্জন্য তাহারা স্বর্গে যাইবার অধিকারী; কিন্তু বিনাশের পথে অগ্রসর করিবার জন্য তাহারা যে কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা অসৎ,—সে জন্য তাহাদিগকে নরকে যাইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, অর্ম্মজের সহিত অর্হিমানের কোন বিরোধ না থাকিলেও পার্সি সাধারণের বিশ্বাস অর্হিমানের অর্থ অপদেবতা' এবং অর্ম্মজের সহিত তাহার চির বিরোধ বর্ত্তমান।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য বহুদিন পূর্ব্বে একখানি পার্সি ধর্ম্ম-পুস্তক প্রচলিত ছিল, আমরা তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি; পার্সি ছাত্রগণ কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ লাভ করে, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে। ইহাতে লিখিত আছে;—

"আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি,—তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী, দেবদূত সমূহ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও অগ্নি, জল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই পূজার্চ্চনা করি, এবং তাঁহারই নিকট আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করি। আমাদের ঈশ্বরের মুখ নাই, তিনি নিরাকার এবং অদ্বিতীয়; তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন না। আমরা তাঁহার গৌরব বর্ণনা করিতে অক্ষম, আমাদের মন তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। তিনি একাধিক সহস্র নামে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার প্রধান নাম হর্ম্মজ্ (সর্ব্বজ্ঞ আত্মা), পাক (পবিত্রস্বরূপ), দাদার (সুবিচারক) এবং পারওয়ার্দ্দিগার (পালন কর্ত্তা)। পবিত্রস্বরূপ হর্ম্মজের উপাসনার জন্য কোন কোন সজীব ও গৌরব পূর্ণ সৃষ্ট পদার্থের এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়। আমাদের মহাপুরুষ জোরোস্তার বলিয়াছেন, পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এবং তিনি তাঁহার সুপরিজ্ঞাত মহাপুরুষ। জোরোস্তারের আদেশ এই, যে, আবেস্তায়, ঈশ্বরের সাধু ইচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার আদেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা উচিত, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকা, এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যহ পাঁচবার উপাসনা করিতে হইবে। মৃত্যুর পর চতুর্থদিন প্রভাতে ন্যায়-বিচার হইবে এবং পুনরুত্থান দিন আসিবে, একথা একান্ত বিশ্বাস্য; স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা এবং নরকের ভয় রাখিতে হইবে।"

এই বর্ণনা যদিও অসম্পূর্ণ তথাপি ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্ধভাবে অগ্নি উপাসনাই পার্সিধর্ম্মের সারমত নহে। অগ্নি ইহাদের নিকট পবিত্রতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার চিহ্ন স্বরূপ; ইহাই অবলম্বন করিয়া তাহারা ঈশ্বরের সম্মুখীন হয় এবং সেই জন্যই ইহারা অগ্নিমন্দির সযত্নে রক্ষা করে। কাহারও কাহারও মতে ইহারা জড়োপাসক, কিন্তু ইহারা বলে ইহারা কখনই অগ্নিকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে না। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ হিরোডোটাস্ সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, যে, ইহাদের কোন মন্দির ছিল না; কিন্তু আবেস্তায় পবিত্র অগ্নি সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মঠের উল্লেখ আছে। ইহাদের পবিত্র অগ্নি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, আতসবেরাম্, অদ্রান্ এবং দাদগা। ভারতবর্ষে আতস্‌বেরাম চারিস্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে; যথা, উদয়ারা, নৌসেরা সুরাট এবং বম্বে। ইহাদের অগ্নিমন্দিরের পার্সি নাম "আগিয়ারী" বা আতস্‌খানা"। "মৌনী মন্দির" অর্থাৎ যেখানে পার্সিদিগের শব দেহ ন্যস্ত হয়, তাহার নিকটে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য যে মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম "সাগ্রি"।

পার্সি দিগের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, এক সম্প্রদায়ের নাম "কদমী," অন্য সম্প্রদায়ের নাম "সাহান সাহী"। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন কোন নিয়ম পালন লইয়াই এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে কিছু পার্থক্য। উপাসনা স্থল যে যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তাহার মধ্যে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র পথে ইহারা অপরকে পবিত্র অগ্নি দেখিতে দেয়। পার্সি পুরোহিত গণের নাম "মোবেদ্," ইহাদিগকে সর্ব্বদা মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকিতে হয়; মন্দির মধ্যে দিবারাত্রি অগ্নি জ্বলে, এবং অগ্নিতে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়। অগ্নিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য কখন কখন অগ্নিতে ছাগমেদ প্রদত্ত হয়। পুরোহিতেরা মন্ত্রোচ্চারণের সময় বস্ত্রদ্বারা মুখ মণ্ডল আচ্ছাদিত করে, কারণ, নিষ্ঠীবন বা নিশ্বাসে সেই পূত অগ্নি অপবিত্র হইতে পারে।

আবেস্তায় পাঁচ প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর অগ্নির উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা অতি বিজ্ঞ পারসিক পুরোহিতও অবগত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। কথিত আছে, তাহারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিবাচক। "আতস বেরাম্" নামক অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র, ইহার একাধিক সহস্র উৎপত্তিস্থান আছে; ভেন্দিদাদ্ লিখিয়াছেন, বিভিন্ন প্রকার অগ্নির সংশ্রবেই ইহার উৎপত্তি! (১)

হিন্দু ব্রাহ্মণের ন্যায় পার্সি পুরোহিত গণ জন সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের শাস্ত্রোপদেষ্টাগণের সাধারণ নাম "হারবাদ্"! কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী "মোবেদ্" নামেই অভিহিত হয়; ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত সংশ্রববিহীন ব্যক্তিগণ "বেহদিন্" নামে প্রসিদ্ধ। পুরোহিতবংশে জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহই পৌরহিত্য গ্রহণ করিতে পায় না। পুরোহিতগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; দস্তুর ও মোবেদ্। দস্তুরগণ পুরোহিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

(১) Vide westergaard's Edition, Viii. pp 81-96.

কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। পুরোহিতবর্গের পরিচ্ছদ সর্ব্বসাধারণের হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ইহাদের আর এক বিশেষত্ব ইহারা কখন মস্তক মুণ্ডন করেন না।

পৌরোহিত্য সম্বন্ধীয় তাবৎ কার্য্যই, কি মন্ত্রোচ্চারণ, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সাধন, সমস্তই মোবেদ্‌দিগকে সম্পন্ন করিতে হয়। মোবেদ্‌দিগের বংশধরগণই হারবাদ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহারা শাস্ত্র ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য নহে। অনেক হিন্দু পুরোহিতের স্থায় বহুসংখ্যক মোবেদ্ শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য; ক্রিয়াকাণ্ডে তাহারা জেন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ আবিষ্কার করিতে হইলেই তাহাদের চক্ষু স্থির! অধ্যাপক হগ্ একবার ইহাদের পরসণা, ইয়ান্‌সি, দারুন্ প্রভৃতি ক্রিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে এই সকল ক্রিয়ার সবিশেষ উল্লেখ আছে।(২)

পার্সিদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম্ম অনেকটা হিন্দুদিগের অনুরূপ। ইহারা প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া "সাদর" নামক পবিত্র গাত্রাবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে। তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য, পবিত্র যজ্ঞসূত্র দ্বারা (কুষ্টি) কোটীদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করা; এই গাত্রাবরণ ও যজ্ঞসূত্র বর্ত্তমান জোরোস্ত্রিয়গণের প্রধান পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন।

সপ্তমবর্ষ বয়সের সময় পার্সি বালকদিগকে অগ্নিমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়; অন্যান্য ক্রিয়া শেষ হইলে মোবেদ্ বালকের মস্তকে জল সিঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার দীক্ষা শেষ করেন। অনন্তর তাহাকে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আনিয়া দুই একটী দাড়িম্বপত্র চর্ব্বণ করিতে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট তুলসীপত্র ও শাক্ত মতাবলম্বীগণের নিকট বিল্বপত্র যেমন, পার্সিসম্প্রদায়ের নিকট দাড়িম্বপত্র সেইরূপ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত; প্রত্যেক অগ্নিমন্দিরের নিকটেই দুই একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে। দাড়িম্বপত্র চর্ব্বণের পর পঞ্চগব্য দ্বারা বালককে স্নান করান হয়; অনন্তর কিঞ্চিৎ গোমূত্র পান বিধি। শ্বেতবর্ণ বৃষের মূত্র অতি পবিত্র।

আমরা উপরে পার্সিদিগের উপবীত অর্থাৎ কুষ্টির কথা বলিয়াছি; এই পবিত্র সূত্র পশম হইতে নির্ম্মিত। কিন্তু আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ইহাও পার্সি পুরোহিত শ্রেণীর অন্তঃপুরিকাগণের দ্বারা প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক উপবীত দ্বিসপ্ততি সূত্রে বিভক্ত। এই আধ্যাত্মিক বর্ম্ম পরিধান বিষয়ে ইহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গোমূত্র দ্বারা হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক উপাসনা করা ইহাদের প্রাত্যহিক তৃতীয় কর্ম্ম; এই উপাসনার শেষ ভাগ এইরূপ :—"হে প্রভু, সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা, কুকথা এবং কুকার্য্য, যাহা আমার মনে উদয় হইয়াছে, মুখে বহির্গত হইয়াছে এবং মৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমার প্রকৃতিগত সেই সকল শারীরিক, মানসিক, ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।

(২) See at the end of West's edition of Hang's essays.

এইরূপে প্রত্যহ দন্ত প্রক্ষালন হইতে নৈশ শয়ন পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই ইহারা যথারীতি উপাসনাদি করিয়া থাকে।

যে সকল পার্সি ধর্ম্মসম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, তাহাদিগকেও সময়ে সময়ে অগ্নিমন্দিরে সমাগত হইতে হয়। দিবারাত্রি মন্দির দ্বার উন্মুক্ত থাকে। "অদ্রিবাহিৎ" এবং "আদর" এই দুই অগ্নিরক্ষক দেবদূতের নামে যে দুইমাস উৎসর্গীকৃত, সেই দুইমাসেই অধিক সংখ্যক উপাসক মন্দিরদ্বারে সমাগত হয়। এই দুই মাসের মধ্যে তৃতীয় ও নবম দিবস অধিক উৎসবপূর্ণ। প্রত্যেক মাসের সপ্তদশ দিবসের নাম 'শ্রোস্' এবং বিংশতি দিবসের নাম 'বেরাম'। মন্দির দর্শনপক্ষে এই উভয় দিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। গৃহেই হউক আর মুক্ত প্রান্তরেই হউক উপাসনাকালে পার্সিগণ সূর্য্য কিম্বা সমুদ্রের দিকে লক্ষ করিয়া উপাসনা করে। ইহাদের প্রাত্যহিক উপাসনার নাম "ন্যায়ী"। ইহাদ্বারা সূর্য্য (মিত্র) অগ্নি (বেরাম) চন্দ্র (মা) কিম্বা বরুণ (আদ্রিসুর) ইহাদেরই উপাসনা সূচিত হয়।

পুরুষের ন্যায় পার্সি রমণীগণেরও অগ্নিমন্দিরে উপস্থিত হইবার এবং উপাসনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু রমণীগণ পুত্রকন্যাদিগের জন্মদিন, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায়ই অগ্নিমন্দিরে গমন করেন না। ইহাদের মন্দির গমনের সময় মধ্যাহ্নকাল, কারণ এই সময়ে মন্দিরে পুরুষ সংখ্যার অল্পতা লক্ষিত হয়। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও উপবীত ধারণ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন।

অতি বাল্যকালেই পার্সি বালক বালিকাদিগের বিবাহের বাগ্দান হয়; সাত আট বৎসর বয়সই তন্মধ্যে উপযুক্তকাল। ইহাদের বিবাহক্রিয়া অনেক পরিমাণে হিন্দুদিগের ন্যায়। বালকের বয়স বার বৎসর হইলেই তাহার বিবাহের দিন স্থির হয়। বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয়। অল্পদিন হইতে পার্সি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে এবং বাল্যবিবাহ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইতেছে।

হিন্দু বিবাহের ন্যায় ইহাদের বিবাহেও বর কন্যার হস্তদ্বয় রেশমীসূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর পুরোহিত যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহা এই :—"তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রীতি-ভাজন, সেই নিমিত্ত তোমরা এখন সম্মিলিত হইতেছ। অন্যের প্রতি কলুষিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিও না, পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং পরস্পরের কথা চিন্তা করিতে শিক্ষা কর। বিবাদ পরিত্যাগ কর, সত্যে রত হও, এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা কর। অন্য লোকের অর্থে লোভ করিও না, নিজের অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, সৎ বন্ধু লাভ করিতে যত্ন করিবে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করিবে। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে বিরত হইবে না।"

বিবাহের পর অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ হইলে বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি ধান্য নিক্ষেপ করে। সাধারণের বিশ্বাস, যাহার নিক্ষিপ্ত ধান্য অগ্রে অপরের গাত্র স্পর্শ করিবে, দম্পতির মধ্যে সেই অপরকে চিরজীবন বশীভূত করিয়া রাখিবে।

ইউরোপীয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া, এবং পাশ্চাত্য ভাব সমাজ মধ্যে প্রবেশ করায়, সর্ব্ববিধ সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। আধুনিক কালের হিন্দু বিবাহের ন্যায় পার্শী বিবাহেও কন্যার পিতাকে কন্যা বিদায়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়; পার্সী পিতা কন্যার বিবাহ দিয়াই অব্যাহতি পান না, নবজামাতাকে সংসার যাত্রার উপযুক্ত সংস্থান পর্য্যন্ত তাঁহাকে যোগাইতে হয়। আমাদের অপেক্ষা ইহাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল সেই জন্য ইহারা কোন প্রকারে এই ব্যয়ভার বহন করে, নতুবা হয় ত ইহারা শিশুকন্যা বধ করিতে বাধ্য হইত। পার্সী সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কিন্তু স্ত্রী দুশ্চরিত্রা কিম্বা বন্ধ্যা হইলে পুরুষেরা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কাহারও অধিকার ছিল না, পঞ্চাইতের মতামতের উপর এইরূপ বিবাহ নির্ভর করিত।

বর্ত্তমান সময়ে পার্শীদিগের মধ্যে পঞ্চাইতের ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। তথাপি এখনও ইহাদিগের দ্বারা সমাজের বহু উপকার সাধিত হয়।

গর্ভবতী রমণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহের নিকৃষ্টতম অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে সেখানে থাকিতে হয়, সেই কালে কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সন্তান জন্মের পঞ্চদিনে গ্রহ পুরোহিত বালকের কোষ্ঠীপত্র প্রস্তুত এবং তাহার জন্য গণনা করে। যে লগ্নে বালকের জন্ম, তদনুসারে তাহার নাম করণ হয়; এই সকল বিশেষত্ব অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের অনুষ্ঠানের অনুকরণ বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু এই প্রথা অনুকরণ না হওয়াও অসম্ভব নহে, কারণ এই প্রথা পার্সীদিগের অতি প্রাচীন, এবং বহু পূর্ব্ব হইতেই পার্সীগণের জ্যোতিষের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে; কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে ক্রমে বীতরাগ লক্ষিত হইতেছে।

পার্সীদিগের মধ্যে মৃতদেহের সৎকার কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এই বিষয়ে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান কোন ধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিতেই ইহাদের মিল দেখা যায় না। শবভুক পক্ষীর আহারের জন্য মৃতদেহ "মৌনী মন্দিরে" রক্ষা করা হয়! পৃথিবীর সভ্য অসভ্য কোন দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। (৩)

সাধারণের বিশ্বাস মৃত্যুর পর তিন দিন পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা মৌনীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত থাকে; চতুর্থ দিনে তাহা মিত্রের বিচারাসন তলে গৃহীত হয়। ইহলোকে অনুষ্ঠিত কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য অনুসারে আত্মার বিচার হইয়া থাকে। বিচার শেষ হইলে আত্মাকে চিত্তাবত্ত পিন্নীতম্ "(বিচার সেতু) নামক এক সংকীর্ণ সেতু অতিক্রম করিতে

(৩) Modern India and Indians. (Tribner and Co.) Third Edition, p. 80. By Monier Williams.

হয়। এই সেতুর প্রবেশ পথ এক ভীষণ কুক্কুর দ্বারা সুরক্ষিত। পাপাত্মা এই ক্ষুরধার সেতু অতিক্রম করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে কণ্টকপূর্ণ, সর্পাদি সরীসৃপ সঙ্কুল হ্রদে পতিত হয় এবং অতি দারুণ যন্ত্রনা ভোগ করে; পার্সিগণের বিশ্বাস এই সংকীর্ণ পথ নরকের প্রান্ত হইতে স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ধার্ম্মিকগণই এই পথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম। স্বর্গ পথ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণার জন্য পার্সীগণ মুসলমানদিগের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষে সমস্ত জাতির ভিতর পার্সীদিগের মধ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপে একদিকে দিন দিন নানাবিধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাদিগকে ছিন্ন করিয়া অন্যদিকে এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত আপনাদিগের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্মের মূল শিক্ষা ও সংস্কার কি, মূল আবেস্তার বিশুদ্ধ উপদেশ কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জাগ্রত উৎসাহ জন্মিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্ম জীবনের উপর বর্দ্ধিত এবং স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা রাশিও ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে; শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ইহা একটি সুফল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গসাহিত্য কতদূর ঋণী।

প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। এমন দীনবন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়, এমন দয়ার্দ্রচেতা মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহার সে সকল গুণের আলোচনা করিতেছি না। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট কতদূর ঋণী তাহাই মাত্র আপাততঃ আমাদিগের বলিবার ইচ্ছা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যাগারে প্রবেশের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা এই প্রকার ছিল। সে সময় পুস্তকাদি অতি দুরূহ সংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত হইত এবং কথিত ভাষা প্রায় বর্ত্তমানকালের গ্রাম্যভাষাপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল, সুতরাং তৎকালে বঙ্গসাহিত্য অতি নীরস ও শ্রীহীন ছিল। বঙ্গসাহিত্যের এই প্রকার দুর্ব্বোধ্যতা প্রযুক্ত ইহা অনেকেরই আয়ত্তগম্য ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দুরূহ সংস্কৃতভাষা হইতে অতি সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গভাষাকে এইরূপ গঠন করাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি।

সাধারণতঃ,বঙ্গসাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, নদীয়ার শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল; দ্বিতীয়,ভারতচন্দ্রের কাল; তৃতীয় আধুনিক বা ইউরোপীয় কাল। এই আধুনিক কালকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম সংস্কৃত-বাঙ্গালার কাল। ২য়, রামমোহন রায় প্রভৃতির কাল। ৩য়, বিদ্যাসাগর প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতির কাল; ৪র্থ বঙ্কিম ও মাইকেলের কাল। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে শেষোক্ত অর্থাৎ আধুনিককালের বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা, তাহা বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত বাঙ্গালা কালের লোকের এই ধারণা ছিল যে, সংস্কৃতকথা বাঙ্গালা লিখিত ভাষায় অধিক ব্যবহার করিলে বিশুদ্ধবাঙ্গলা হইবে, এবং তাহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিও হইবে। কিন্তু, এই প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ, সাধারণ লোকদিগের সাহিত্য জ্ঞানেচ্ছার দিকে দৃক্‌পাত না করাতে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই প্রকার সংস্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত একখানি পুস্তকের নাম ও লিখন প্রণালী উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতেপারে; যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রবোধচন্দ্রিকা"। ইহার ভাষা এত দুরূহ ছিল যে তাহা সংস্কৃত কি বাঙ্গালা তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পুস্তকখানির আংশিক সমালোচনা কালে, ইহার ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য ইহা হইতে যে একটি মাত্র লাইন গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" ইহাকে কখনই প্রকৃত রূপে বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষা বলা যাইতে পারে না। পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কথিত ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। সংস্কৃত-বাঙ্গালা কালে কথিত ভাষা সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন কঠোরতা না থাকিলেও, লিখিত ভাষায় যে অনেকটা সেই প্রকার ছিল, তাহা প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। এই প্রকার নীরসতার জন্য বঙ্গদেশের লোকেরা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন ছিল, কতিপয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিই তৎকালে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন; সুতরাং, বঙ্গসাহিত্য তৎকালে ভস্মাচ্ছাদিত হীরকখণ্ডের ন্যায় সকলের দ্বারা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল।

ইহার কিছুকাল পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের দুরবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন; এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দশোপনিষদ বাঙ্গালার গদ্যভূমিকার সহিত প্রকাশিত হয়; এবং কেহ কেহ রামমোহনকেই বঙ্গ গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পরেই কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে

"তত্ত্বোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয় সম্বলিত সুন্দর পত্রিকা নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং তৎকালে বঙ্গের অনেক কৃতবিদ্য লেখক ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত ও স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইতে পারে।

কিন্তু রামমোহন রায়ের পথপ্রদর্শন বা তত্ত্বোধিনী পত্রিকার পরিশ্রম সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের সাধারণ লোকদিগের হৃদয় বঙ্গসাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তখনও লোকে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল, সুতরাং রামমোহনের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে নাই, কিম্বা তত্ত্বোধিনী সভার পরিশ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের এই প্রকার ঔদাসীন্যকালে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ফলহীন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র অরণ্য ও কণ্টকে আবৃত ; চতুর্দ্দিকে নীরসতা ও অনুর্ব্বরতার লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিয়া অরণ্যগুল্মাদি পরিস্কৃত করিয়া তথায় ফলবান বৃক্ষাদি বপন করিয়া, সেই মরুসদৃশ কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশকে একটি সুন্দর উদ্যানে পরিণত করিলেন। তিনি অমূল্য সংস্কৃত কোষাগার হইতে অতি মূল্যবান সুন্দর ভাবরত্নমালা সংগ্রহ করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহার করিলেন। এই অপূর্ব্ব অলঙ্কার নির্ম্মাণে, তাঁহার কারুকার্য্য ও দক্ষতা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইল। তিনি হৃদয়গ্রাহী নূতন বঙ্গগদ্য সৃষ্টি করিলেন।*

বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যসেবায় ব্রতী হইয়া যে সকল সারবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে ক্রমিক ভাবে বিবৃত হইবে। তাহাদ্বারা তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার গুরুতর পরিশ্রম ও তদ্বিষয়ে সফলতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ পাইতে পারা যাইবে।

সিবিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষার কোন বিশেষ নিয়মানুযায়ী ইংরাজ সিবিলিয়ান্ ছাত্রদিগের বাঙ্গালা পুস্তক অবশ্য পাঠ্য ছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালে কোনও সহজ বাঙ্গলা পুস্তক ছিল না, এ নিমিত্ত "প্রবোধচন্দ্রিকা," "জ্ঞানপ্রদীপ" প্রভৃতি কয়েকখানি দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় লিখিত পুস্তক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ইংরাজছাত্রদিগকে পাঠ করিতে হইত। ইহা পাঠ করিতে একপক্ষে তাহাদিগকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, অপরপক্ষে তদ্রূপ সময়েরও অপব্যয় হইত। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড্ রাইটার এবং মার্শাল সাহেব তথাকার সেক্রেটারি ছিলেন। বাঙ্গালা পুস্তক পাঠসম্বন্ধে ইংরাজযুবকদিগের এই প্রকার অসুবিধা দেখিয়া, মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই

* রাজনারায়ণ বাবুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

একখানি সরল পাঠপুস্তক প্রণয়নের ভার দিলেন। প্রথমতঃ, তিনি "বাসুদেব চরিত" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা গভর্মেণ্টের অনুমোদিত না হওয়াতে মুদ্রিত হয় নাই।

কিছুদিন পরে, তিনি গভর্মেণ্টের পুনরনুমতি ক্রমে, হিন্দি বৈতালপঞ্চিশির বঙ্গানুবাদ করিয়া, বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকরূপে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই একমাত্র "বেতালপঞ্চবিংশতির" দ্বারাই ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের সুদৃঢ় উন্নতিমূল স্থাপিত হইল। তখনও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল; তখনও লোকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পারিত না, সুতরাং ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, বেতালের তাললয় সংযুক্ত প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষার দ্বারাই সুন্দর বঙ্গগদ্যের আদর ও উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ হইল। বেতালে একদিকে যেমন শব্দবৈচিত্র্য অপর দিকে তদ্রূপ প্রাঞ্জলতা ও সুললিতভাবমালার সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বেতাল প্রকাশের সহিতই বঙ্গগদ্যসাহিত্য সম্পূর্ণ এক নূতন দিকে ধাবিত হইল। লোকে "বেতাল" পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া, বারম্বার তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, বেতালে ভাবের আদিত্ব নাই, অর্থাৎ ইহা অন্য গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু ইহাতে যে লালিত্য, যে বর্ণনাবৈচিত্র্য এবং সুমধুরতা আছে, তাহা তাঁহার স্বরচিত এবং তজ্জন্যই বেতাল সাধারণ লোক কর্ত্তৃক এতদূর আদৃত হইয়াছিল।

বেতালের অনুবাদের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শমান্ সাহেবের History of Bengal হইতে বাঙ্গালার ইতিহাস অনুবাদ করেন। বলিতে গেলে ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন ভাল ইতিহাস ছিল না; বিদ্যাসাগরের "বাঙ্গালার ইতিহাস" বঙ্গবাসীর ইতিহাস জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে সমধিক সাহায্য করিয়াছিল; ইহার ভাষা অতি সুন্দর ও স্থানে স্থানে তেজোময়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Chamber's Biography অবলম্বনে, "জীবনচরিত" নামক একখানি বালক বালিকার পাঠোপযোগী পুস্তক অনুবাদ করেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেথুনকলেজের পাঠ্যস্বরূপে Chamber's Rudiments of knowledge পুস্তকাবলম্বে "বোধোদয়" রচিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকাল স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আজ যে বেথুনকলেজ কলিকাতার এক শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; যাহার কৃপায় আজকাল শতশত বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই বেথুনকলেজের একজন প্রধান উদ্যোগী ও স্থাপয়িতা বিদ্যাসাগর মহাশয়। যাহা হউক, বোধোদয়ের ভাষা সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে; এবং কেহ কেহ বলেন যে এ পুস্তক খানি বালক বালিকার পাঠ্যরূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ, ইহাতে অতি দুরূহ ভাব সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার ভাষা মোটের উপর যে অতি বিশুদ্ধ তাহা সকলেই প্রায় স্বীকার করিয়া থাকেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল অবলম্বনে বাঙ্গলা "শকুন্তলা" রচিত ও

প্রকাশিত হয়। যে মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত পুস্তকাবলী আজকাল কেবল মাত্র ভারতবর্ষে নহে পরন্তু সমগ্র ইউরোপে আদৃত হইতেছে, তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ অভিজ্ঞান শকুন্তল—যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণদেশে নাটকাকারে রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হওয়াতে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন, সেই শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ করা যে অতি দুরূহ ব্যাপার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিনী লেখনী তাহা সরল বঙ্গগদ্যে অনুবাদ করিয়া নবরত্নাগ্রগণ্য কালিদাসের গুণপনা যদি স্বদেশবাসীদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই যে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে সকলেই স্বীকার করিবেন।

সেই বৎসরেই বিদ্যাসাগরের অক্ষয়কীর্ত্তি "বিধবাবিবাহ উচিত কি না" সম্বন্ধে ১ম ও ২য় ভাগ পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক দুখানি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজমূলে একটি ভয়ঙ্কর কুঠারঘাত স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজীবন দীন দুঃখীর দুঃখদূরকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিধবা বালিকাদিগের মর্ম্মভেদী গভীর নিশ্বাস, তাহাদিগের ভয়ঙ্কর অসহ্য যাতনা, তাহাদিগের নীরব অশ্রুধারা, তাহাদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচারের বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, বহুকাল হইতেই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইল। হিন্দুসমাজ অন্যান্য সমাজের ন্যায় কেবল সামাজিক নিয়মাবলীর দ্বারাই বদ্ধ নহে; শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ও ধর্ম্ম পালনের সহিত ইহার অভেদ্য সম্বন্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছেন যে বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতে কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে; কিন্তু, তথাপি, তিনি অধ্যবসায় হইতে বিরত হইলেন না। তিনি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রমের সহিত শাস্ত্রগ্রন্থাদির পৃষ্ঠা দেখিতেন—যদি তিনি কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্যের সহায়তার নিমিত্ত কোন শ্লোক প্রাপ্ত হয়েন। অনেক পরিশ্রমের পর তিনি হঠাৎ একদিন পরাশরসংহিতায় দেখিতে পাইলেন এই শ্লোকটি লিখিত রহিয়াছে :—

"নষ্টেমৃতে প্রব্রাজিতে ক্লীবে পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

ইতিহাসে যেমন পাঠ করা যায়, প্রসিদ্ধ আর্কিমিডিস্ পরাক্রান্ত হাউরো কর্ত্তৃক, কোন একটি সুন্দর মুকুটের স্বর্ণের ভাগ অবধারণ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনবরত পরিশ্রম করিয়াও তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়াও তথাপি অধ্যবসায় হইতে বিরত হয়েন নাই, এবং অবশেষে ঘটনাক্রমে একদিন স্নান করিতে করিতে জলাধার হইতে তাঁহার দেহাতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাওয়াতে কোন প্রকারে এই ঘটনা হইতে মুকুটের স্বর্ণের পরিমাণ নির্দ্ধারণোপায় উদ্ঘাটন করিতে পারিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইয়া "Eureka! Eureka" !! অর্থাৎ পাইয়াছি, পাইয়াছি, বলিয়া চীৎকার করিতে

করিতে রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন বিদ্যাসাগরমহাশয় উপরোক্ত শ্লোকটি দেখিতে পাইয়া আনন্দে "পেয়েছি! পেয়েছি!!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবাবিবাহ" সম্বন্ধে শাস্ত্রমত পাইয়া যেন সামাজিক ব্যক্তিবর্গের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "স্বার্থপর স্বদেশবাসিগণ! তোমরা স্বার্থের নিমিত্ত জরাবস্থাতেও বৃদ্ধাস্ত্রীর মৃত্যুর পরদিবসই বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হওনা, আর অপরিণত বয়স্কা বালিকাবিধবার পুনর্বিবাহ দিবার সময়ই অন্ধের ন্যায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা কর বটে, কিন্তু আমি শাস্ত্রের নিয়ম—ঋষির উচ্চারিত বাক্য পুনরুচ্চারণ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতেছি 'বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্র সঙ্গত অতএব সমাজিক নিয়মানুগত'।" এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরেই যেন সমাজে একটা বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেক গোঁড়া হিন্দু তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার প্রাণ বিনাশেরও নাকি ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

যাহা হউক, বিধবাবিবাহ প্রকাশে প্রকারান্তরে বঙ্গ ভাষার অনেকটা উন্নতি হইল। প্রথমতঃ, লোকে সামাজিক নিয়ম বহির্ভূত এই প্রকার মতসমন্বিত পুস্তক কৌতূহল বশতঃ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, লোকে তাঁহার ভাষাচাতুর্য্য ও কূটতর্কাদি পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া অজ্ঞাতরূপে তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, বহুসংখ্যক সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিতবর্গ বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিবাদ লিখিতে গিয়া বিদ্যাসাগরের "বিধবাবিবাহ" পাঠে তাহার ভাষাপরিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞাতসারে (কোন কোন স্থলে জ্ঞাতসারেও) তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং দেখা গেল যে, বিধবাবিবাহ প্রচারের সহিত লোকের মন, অলক্ষিত-রূপে সাহিত্য চর্চ্চার দিকে ধাবিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে লোকে বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুকরণে পুস্তকাদি রচনা করিতে লাগিল; আরও, এই সামাজিক বিপ্লবের সহিতই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকিরিত হইয়া পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে লোকের নিকট তাঁহার অন্যান্য পুস্তকাদির আদরও সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১৮৫৫ সালের এপ্রিল ও জুনমাসে "বর্ণ পরিচয়" প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ প্রচারিত হয়। এই বর্ণপরিচয়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবনী কৌশলের উত্তম পরিচায়ক। বর্ণ-পরিচয়ের দ্বারা অলক্ষিতরূপে বঙ্গসাহিত্যের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, তাহা কল্পনা করা যায় না। বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে, এমন কি বিধবাবিবাহ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ লোকের বঙ্গভাষার উন্নতি চেষ্টা ছিল না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃত-বাঙ্গালার বৈকট্য নিবন্ধন লোকের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল এবং যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং যদিও সেই সময় অপর কয়েক জন বঙ্গ লেখক অন্যান্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাহার তেমন চর্চ্চা

হয় নাই। কারণ, ইতিপূর্ব্বে শিশুদিগের শিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তকই ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় প্রকাশ করাতে লোকের সে অভাবের মোচন হইল। ব্রাহ্মণবালক হইতে কৃষকবালক পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট বর্ণপরিচয় আদৃত হইল। বস্তুতঃ, কোন একটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষায় কতকগুলি সহজ প্রাথমিক (Elementary) পুস্তক না থাকিলে তাহা আয়ত্তগত করা অতি দুরূহ হইয়া পড়ে। এখন যদি বাঙ্গালায় এই প্রকার কোন পুস্তক প্রণীত না হইত তাহা হইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা এবং ইহার আদর কতদূর হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" সম্বন্ধে একটি সুললিত প্রবন্ধ বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে পাঠ করেন। তৎকালে বঙ্গের অনেক খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যসেবক তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার সেই তেজস্বিতা-পরিপূর্ণ গভীরভাবময় প্রবন্ধপাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধপাঠ করিবার এক বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ; সুতরাং লোকে সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করে এবং সংস্কৃত পুস্তকাদি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে বা কোন প্রকারে তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির আশা অনেক। তাঁহার এই উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছিল।

সেই খৃষ্টাব্দেই "কথামালা" ও "চরিতাবলী" প্রকাশিত হয়। এ দুইখানি বালকদিগের পাঠ্যগ্রন্থ এবং ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ। কথামালায় বালকদিগের শিক্ষোপযোগী অনেক গুলি নৈতিক গল্প আছে এবং চরিতাবলী একখানি আদর্শ গ্রন্থ; বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনচরিত লইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই দুইখানি পুস্তকের ভাষা সরল ও সুমিষ্ট।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের গৌরবনিশান "সীতার বনবাস" উড্ডীয়মান হইল। এই পুস্তকখানি ভবভূতির উত্তরচরিত অবলম্বনে লিখিত। সীতার বনবাসের ভাষা এমনি সুললিত, এমনি মাধুরীময়, যে, যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা এমনি শোকরসপূর্ণ, যে, পড়িতে পড়িতে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। সাধ্বী সীতাদেবী সমগ্র ভারতবাসীর চক্ষে একটি আদর্শ রমণী, তাঁহার পতিভক্তি, গুরুভক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা জগতে অতুল্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই প্রাতঃস্মরণীয়া, কীর্ত্তিমতী, সীতাদেবীর বনবাস প্রসঙ্গ এরূপ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মূল উত্তরচরিত হইতে বাঙ্গালা সীতার বনবাস কোন অংশেই ন্যূন নহে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "আখ্যানমঞ্জরী" ১ম ভাগ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের ভাষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকরূপে বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তৎপরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্সপীয়রের Comedy of Errors অবলম্বনে "ভ্রান্তিবিলাস"

প্রণয়ন করেন। সেক্সপীয়রের কমেডি অফ্ এরর্স অতি কৌতূহলাবহ নাটক। ভ্রান্তিবিলাসেও সেই কুতূহলতা ও হাস্যরসের অবতারণায় ক্রটি হয় নাই। ভ্রান্তিবিলাসের ঘটনাবৈচিত্র্য সেক্সপীয়রের বটে কিন্তু সরলগদ্যে তাহার বর্ণনাকৌশল বিদ্যাসাগরের। ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা সরস এবং প্রীতিপদ। এখানিও বঙ্গসাহিত্যে একখানি সুন্দর গ্রন্থ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "বহুবিবাহ উচিত কি না" নামক একখানি পুস্তক রচিত হয়। বিধবা-বিবাহ প্রচার হওয়াতে সমাজে যেমন হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, "বহুবিবাহে" ততদূর না হইলেও সমাজ যে তদ্দ্বারা কতকটা সঞ্চালিত হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে। কৌলীন্য প্রথা (বহুবিবাহ) বল্লাল সেন প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই বহুবিবাহ প্রথাপ্রবর্ত্তনে তাঁহার যে সদুদ্দেশ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কালক্রমে তাহার ফল হইল বিপরীত ও ভয়ানক। বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকাল সহায়হীনা নারীজাতির সহায় স্বরূপ ছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা "বিধবাবিবাহে" পাইয়াছি এবং বহুবিবাহ রহিত করিবার চেষ্টাও এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উদাহরণ। তিনি তাঁহার পুস্তকদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন, যে, বর্ত্তমানকালে আমাদিগের সমাজে বহুবিবাহ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তিনি এ সম্বন্ধে যে সমস্ত ন্যায়ানুগত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা এ স্থলে বিশদরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, তাঁহার "বহুবিবাহ" এই কুপ্রথা রহিত করিতে অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিল; এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি পক্ষেও ইহা সাহায্য করিয়াছিল। এই পুস্তকখানিতে তাঁহার সাহিত্য লেখা প্রায় শেষ হয়।

উপরি উক্ত এই কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও যে কত অপ্রকাশিত পুস্তক আছে, তাহার নির্ণয় নাই। "বেতালপঞ্চবিংশতি" হইতে "বহুবিবাহ" পর্য্যন্ত এই প্রায় ত্রিশখানি সুন্দর গ্রন্থের দ্বারা বিদ্যাসাগরের নাম সাহিত্যজগতে চিরস্মরণীয় থাকিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারা নিজেকে যশস্বী নাও করিতেন, তথাপি কেবল মাত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তিনি মৌলিকভাব পরিপূর্ণ পুস্তক অধিক প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু কেবল মাত্র অনুবাদ ও ভাব সংগ্রহের দ্বারা তিনি বঙ্গভাষাকে এমন পরিমার্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন; যে, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেরূপ পারেন নাই, ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে।

কোন একজন স্বচ্ দার্শনিক বলেন, যে, কোন ব্যক্তি যদিও কোন মৌলিক-ভাববিশিষ্ট পুস্তক না লেখেন, কিন্তু সামাজিক কুরীতি ও ভ্রমাদি দূরীকরণ মানসে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া সামাজিক লোকদিগের প্রমাদাদি দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে প্রকৃত সাহিত্য-সেবক ও স্বদেশহিতৈষী বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও বেশী মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কেবল স্বদেশীয় সংস্কৃতভাষা হইতে নহে পরন্তু বিদেশীয় ইংরাজিসাহিত্য হইতেও ভাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষাকে

সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় সামাজিক কুরীতির বিনাশ মানসে বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

আরও তিনি যে সময় সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন, সে সময় বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সময়। তখন বিদ্যাপতি চৈতন্য ও কবিকঙ্কনের কাল হইতে, ইংরাজিসাহিত্য-সংশ্রবে, বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইতেছিল। সাধারণ লোকে—এমন কি বিদ্বান লোকেও ইংরাজি শিক্ষার দিকে এতদূর আকৃষ্ট ও সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি তন্নিবন্ধন এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল, যে, তৎকালে তাহাদিগকে পুরাতন সংস্কৃতভাষা বা মৌলিক বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের সময়, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের এই প্রকার পতনাবস্থাকালে বিদ্যাসাগর যে অদ্ভুত অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বনে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রভূত বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত এক মধ্য পথ অবলম্বন করিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা লইয়া তিনি শকুন্তলা, সীতারবনবাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিলেন; হিন্দি হইতে বেতালপঞ্চবিংশতি ও ইংরাজি হইতে বঙ্গের ইতিহাস, বোধোদয়, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা ইত্যাদি রচিত হইল। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতভাষা বা সংস্কৃতবাঙ্গালা বা গ্রাম্যবাঙ্গালা বা ইংরাজিবাঙ্গালা হইল না; তিনি এক নূতন উপাদানে নূতন নিয়মে সকলের আয়ত্তগম্য ও সরল এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলেন। হইতে পারে, স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বঙ্গগদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু বর্ত্তমান কালের "বিদ্যাসাগরী ভাষার" সৃষ্টিকর্ত্তা; স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগরের রচিত ভাষার একদিকে যেমন উত্থান অপর দিকে তেমনি পতন ছিল, একদিকে যেমন বীর ও করুণরসাত্মক অপর দিকে তদ্রূপ হাস্য ও বীভৎস-রসাত্মক ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের "ঠিক পিতৃ সদৃশ না বলিলেও তাঁহাকে ইহার পরিপোষণ-কর্ত্রী মাতা বলা যাইতে পারে।"* তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল অবস্থা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল মাত্র ভাষাকে সজ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, লোকে যাহাতে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে আরও উন্নত করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন, সাধারণ লোকে সহজে স্বদেশীয় অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারে না; কারণ তাহা সংস্কৃতভাষায় লিখিত হওয়াতে, তাহাদের সহজলভ্য নহে। এই জন্য বালক বালিকাগণ যাহাতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আরও উন্নতি করিতে পারে, তজ্জন্য চারিভাগ "ব্যাকরণকৌমুদী" প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সুকুমারমতি বালকদিগকে দুরূহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইত; কিন্তু তাহা সকল ছাত্রের আয়ত্তগত

* রজনীকান্ত গুপ্তের "বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত"

করিতে পারিত না। ব্যাকরণ কৌমুদী প্রচারিত হইবামাত্র সাধারণ লোকের সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ বালকগণ যাহাতে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ইংরাজিসাহিত্যভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সজ্জিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহার সুবিধার জন্য বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিলেন। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গসাহিত্যকে কোন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা, কিন্তু তৎকালে বঙ্গসাহিত্যের শৈশবতাপ্রযুক্ত ইহার ভবিষ্যদবস্থা অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল ছিল; সুতরাং তিনি প্রগাঢ় চিন্তার পর বঙ্গসাহিত্যকে সংস্কৃত ও ইংরাজিসাহিত্যের উপর দণ্ডায়মান করাইলেন। তাহার সুফল আজ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বঙ্গীয়যুবকগণ ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজিসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া, সেক্সপীয়র, মিল্টন, সেলি, প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাদি হইতে, স্কট্ কলিন্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকারদিগের পুস্তকাবলী হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেছেন এবং অপরদিকে ভারবি কালীদাস ইত্যাদি স্বদেশীয় মহাকবিগণের সদ্গ্রন্থাবলী হইলে সুগন্ধ পুষ্পাদি চয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যবালাকে ফুলাভরণে সজ্জিত করিতেছেন। আরও তাঁহার জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তিনি প্রথমে ইংরাজি জানিতেন না, তৎপরে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পেই ইংরাজিসাহিত্যে অভিজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বহুপরিশ্রমের সহিত ইংরাজিসাহিত্যে পারদর্শী হইলেন। স্বার্থশূন্য হইয়া স্বদেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া বিদেশীয়ভাষা শিক্ষা করিতে কয়জন লোককে দেখা যায়? কোন প্রকার ঈর্ষাপরতন্ত্র না হইয়া বা তাঁহার মহৎ চরিত্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আমরা একবার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনচরিত পর্য্যবেক্ষণ করিব। স্বীকার করি, তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি চেষ্টায় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তিনি প্রায় দ্বাবিংশতি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এতগুলি ভাষাভিজ্ঞ হইয়াও মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাহা করিতে পারেন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবলমাত্র দুইটি ভাষাতে অভিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অপেক্ষা যে অনেক গুণ অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন; তাহা একবাক্যে সকলে স্বীকার করিবেন। আরও ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের সাহিত্যদ্বারা আদানপ্রদান, পরস্পরের সৌহার্দ্দ্যপরিপুষ্টি এবং স্ব স্ব সাহিত্যের উন্নতিরও এক প্রধান উপায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই উপায়টি নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের সহায়তা স্বরূপ এই উপায় অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে, কি প্রকারে বাঙ্গলাপত্রিকাদি পরিচালনা করিতে হয়, তাহা তিনি তাঁহার বহুকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা ও সোম প্রকাশের তত্ত্বাবধানকালে দেখাইয়াছেন।

এখন পর্য্যন্ত বঙ্কিম ও মাইকেলের কাল সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু ইঁহাদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালার নীতিগুরু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ইংরাজি অনুকরণে প্রথম উপন্যাস লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিলে বোধ করি প্রসঙ্গভঙ্গ হইবে না।

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। উভয়েই এক সালে জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনেককাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নহে বঙ্গ সাহিত্যেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহার মূলকারণ স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। অক্ষয়কুমারের ভাষা পরে দোষশূন্য ও বিশুদ্ধ হইলেও সর্ব্বপ্রথম তদ্রূপ ছিল না; প্রথম প্রথম, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন এবং অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের নিকট হইতেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে শিক্ষা করেন। বঙ্গ সাহিত্য সমাজে প্যারীচাঁদ মিত্রের আসনও কম উচ্চ নহে। কথিত ভাষায় উপন্যাসাদি রচনা করিয়া ইনিই সর্ব্ব প্রথমে জন সাধারণ্যে এরূপ সাহিত্যের গৌরব সূচনা করেন।

এখন, স্বর্গীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট কতদূর ঋণী তাহা দেখাইব। কবি মাইকেল বাঙ্গালার মিলটন্। তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্যের ন্যায় এপর্য্যন্ত কোন কাব্যই সৃষ্ট হয় নাই। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা এবং বাঙ্গালার কাব্য জগতে তাঁহার খ্যাতি অতুল্য। কিন্তু এমন অনেক সময়ে হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর যদি মাইকেলকে আর্থিক সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিত্ব শক্তির সমধিক বিকাশ হইত কিনা সন্দেহ; সুতরাং, বঙ্গসাহিত্যে আজকাল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এত আদর তাহা প্রকাশিত হইত না। এক সময়ে বিদ্যাসাগর পুত্রোপম মাইকেলকে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়া ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

তৎপরে, বঙ্গের সুপুত্র বাঙ্গালার স্কট্, প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিপিচাতুর্য্যের বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র। তিনি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের ন্যায় বঙ্গবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত। আজকাল বঙ্গভাষায় যে এত উপন্যাস দেখা যাইতেছে, তাহার মূলীভূত কারণ বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহারই রচনাপদ্ধতি অনুসরণে আজকাল এত অধিক পুস্তক রচিত হইতেছে এবং বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য তিনি কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর সফলকাম হইয়াছেন, তাহা তাঁহার এক একখানি উপাদেয় উপন্যাসই বর্ণনা করিয়া থাকে। যদিও বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা নহে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্ম্মিত ভিত্তির উপর তাহার গাঁথনি সহজ সাধ্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগরের মার্জ্জিত এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রাম্য এতদুভয়ের সংমিশ্রণে একটি নূতন ভাষায় তাঁহার পুস্তকাদি রচিত।

* রাজনারায়ণ বসুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

বর্ত্তমানকালের বঙ্গসাহিত্যকে একটি শস্যক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত-বাঙ্গালারূপ লতা গুল্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ প্রান্তরের ন্যায় ছিল। রামমোহন সেই কণ্টকপরিপূর্ণ প্রান্তর হইতে লতা গুল্মাদি উৎপাটন করিয়া, পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলেন অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই বঙ্গগদ্য সাহিত্যের ভিত্তি সৃষ্টি হইল। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অনুর্ব্বরভূমিকে পরিশ্রমের সহিত কর্ষণ করিলেন, বিদেশজাত ফলফুলের বীজাদি সংগ্রহ করিয়া সুন্দররূপে বপন করিলেন, ভূমিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যরূপ সার দিতে ভুলিলেন না এবং সেই বঙ্গসাহিত্য বীজগুলি, যাহাতে 'অত্যা'দির দ্বারা না নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তাঁহার পর অক্ষয়কুমার নীতিরূপ জল লইয়া, সেই সুকুমার বঙ্গসাহিত্য চারা বৃক্ষগুলির মূলদেশে সেচন করিতে লাগিলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য বৃক্ষগুলি বড় হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়িল; সেই বৃক্ষগুলিতে দুই প্রকার সুমিষ্ট ফল ফলিল। এক প্রকার ফল লইয়া মাইকেল হেমচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণ লোকদিগকে কবিত্বের আস্বাদ দিলেন, অপরদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ অন্য প্রকার ফল লইয়া লোকদিগকে উপন্যাসের আস্বাদ দিলেন। লোকে এই দুই প্রকার ফল খাইয়া, পরিতৃপ্ত হইয়া, ইহাদিগের বৃক্ষের বপনকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং যাহাতে সাহিত্য বৃক্ষে তদ্রূপ আরও উপন্যাস ও কবিতাফল জন্মায় সেইরূপ পরিশ্রম করিতে লাগিল।

উপরোক্ত উপমা দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে, যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে বহু পরিশ্রমের সহিত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে পর, আধুনিক বঙ্গলেখকগণ তাহার উন্নতি চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, মাইকেল, বঙ্কিম, ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্য সেবকগণ বঙ্গসাহিত্যের শোভা বিস্তার করাইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উদ্ধার সাধন না করিলে, তাহাকে নূতন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে না ধরিলে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইত কি না সন্দেহ; এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনের পর হইতেই এত কৃতবিদ্য বঙ্গলেখক দৃষ্ট হইতেছে; উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত উপাধিধারী বঙ্গবাসীগণ এবং সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, বিদ্যাসাগরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন; অর্থাৎ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ইংরাজি সাহিত্য পুস্তকসমূহ হইতে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতেছেন; এবং শেষোক্ত দল স্বদেশীয় মনীষাসম্পন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদি হইতে লুপ্তপ্রায় রত্নাদি উদ্ধার করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। আর একটি কথা এই, যে, বর্ত্তমান কালে যে কোন ব্যক্তি জীবনচরিত, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি বা নীতিগ্রন্থাদি বা অন্য কোন প্রকার ভাব পরিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করুন না কেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগরী ভাষার অনুকরণ করিতে হইবেই। অবশ্য প্রহসনাদি লিখিতে হইলে টেকচাঁদীভাষার সাহায্য লইতে হইবে।

সেই জন্য ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে, যে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন কালে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নতি তাহার আদিকারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। আজকাল যে এমন সুশ্রাব্য ও সুমিষ্ট বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল। তাঁহার এক এক খানি অনুবাদ গ্রন্থ এক এক খানি মূল গ্রন্থাপেক্ষাও মূল্যবান। সংস্কৃত ও ইংরাজিভাষা হইতে কি প্রকার সরল বঙ্গানুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার পথ প্রদর্শক; তিনি মাসিক পত্রিকাদির লিখন প্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্য চর্চ্চা প্রবল করাইয়া গিয়াছেন ও ব্যাকরণাদি প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার উপায় দেখাইয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। সেই জন্য ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে, যতকাল বাঙ্গালাভাষা আদৃত হইবে, যতকাল লোকে বঙ্গগদ্যের প্রশংসা করিবে, ততকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম সমগ্র সাহিত্য জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

আজ পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশ কাঁদাইয়া, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে অনাথা করিয়া, জগৎকে শোকসাগরে ডুবাইয়া অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বর্ণপরিচয় হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থগুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে; যতকাল লোকে বাঙ্গালা কথা কহিবে বা বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিবে, ততকাল লোকে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সম্প্রীতিসাধনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে জগৎপাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে ভবিষ্যৎ কালে বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃত বা ইংরাজিসাহিত্যের সমকক্ষ হইয়া, তাহাদিগের ন্যায় জগৎ প্রসিদ্ধ খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনও বঙ্গসাহিত্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, অবনতমস্তকে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র আত্মাকে অভিবাদন করিয়া বলিবে "আমি আপনার নিকট চিরজীবন ঋণী, আপনি আমার বিপদে রক্ষাকর্ত্তা ও পিতৃসদৃশ পালনকর্ত্তা"।

৺ঈশ্বরচন্দ্র এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, বঙ্গসাহিত্য-জগতে চিরকাল অবিনশ্বর রহিবেন।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু।

হেন্‌রী মারে।

সিপালোগা নদীর তীর রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে; যুদ্ধও শেষ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বড় ভীষণ হইয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দক্ষিণ প্রদেশীয় সেনাদলের একতৃতীয়াংশ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিয়াছিল। যে যুদ্ধে আমেরিকাখণ্ডের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং যে যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীর মানবগণের ইতিহাসে একটি আবশ্যকীয় ঘটনা, এই যুদ্ধ সেই মহাসমরের একটি সামান্য অঙ্কমাত্র; তাহা হইলেও এই যুদ্ধ অনেক সাহসী সৈনিককে মরণের শান্তি দান করিয়াছিল এবং অনেক রমণী এবং শিশুকে পতি ও পিতার মৃত্যুশোক দান করিয়াছিল।

আকাশের ইতস্ততঃ মসীবর্ণ মেঘখণ্ড ভাসমান। কুয়াসা-পূর্ণ আকাশের বুকে তারকাগুলি তাহাদের ক্ষীণ স্নিগ্ধ জ্যোতি বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু আশঙ্কা হইতেছিল, যে শীঘ্রই তারকাদিগের জ্যোতি নির্ব্বাপিত হইবে এবং চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত তুষারস্তূপ আরও উচ্চ হইয়া উঠিবে। শ্বেতবর্ণ তটের মধ্য দিয়া নদী একটি কৃষ্ণ সর্পের মত বহিয়া যাইতেছিল।

কিছুদূরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির চতুর্দ্দিকে সৈনিকগণ পরিশ্রমের পর নিদ্রামগ্ন। রোলাণ্ড পিয়ার্স সেই তুষারমণ্ডিত ভূমির উপর পদচারণ করিয়া পাহারা দিতেছিল; তাহার বোধ হইতেছিল যেন প্রভাত আর আসিবে না! একবৎসর এইরূপ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যুদ্ধের সমস্ত কার্য্য তাহার অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ বা পথ অতিবাহনের পরেও শীতকালের রাত্রে এইরূপ পাহারা দেওয়া আর তাহার নিকট তেমন কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু আপাততঃ যুদ্ধে আহত হওয়ায় রক্তপাতবশতঃ রাত্রির শীতে সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা এবং অদূরবর্ত্তী স্রোতস্বতীর অবিরাম কলগীতি তাহার হৃদয়ে কেমন এক নির্জীবতা আনয়ন করিতেছিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অর্দ্ধজ্ঞান-শূন্য প্রায় হইয়া তুষারের উপর আপনার পদচিহ্নের অনুসরণ করিতেছিল এবং কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া উঠিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু আবার পদচারণ করিতে আরম্ভ করিতে করিতেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। পরিশেষে সে আর না পারিয়া, নিদ্রাকাতর হইয়া সেই শীতল তুষারমণ্ডিত ভূমির উপর শয়ন করিল—শীতে অবসন্ন আড়ষ্ট অঙ্গ আবার বলপূর্ব্বক টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আবার অল্প অল্প খোঁড়াইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার শরীর শীতল হইয়া আসিয়াছিল; ছিন্ন পরিচ্ছদের ছিন্নস্থান দিয়া তাহার গাত্রে তুষার প্রবেশ করিতেছিল এবং ত্বক স্পর্শে তাহা ধীরে ধীরে গলিয়া যাইতেছিল; সেই শীতল সংস্পর্শে তাহাকে জাগ্রত করিয়া রাখিল। রোলাণ্ড মনে মনে সেই তুষারকে গালি দিতে দিতে পকেট হইতে

সম্পূর্ণ একটি বোতল বাহির করিল। তাহাতে মদ্য বড় অধিক ছিল না, সে তাহার দ্বিগুণ মদ্য পান করিতে পারিত। কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতায় সে আত্মসুখ ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছিল এবং কেবল এক ঢোক মাত্র পান করিয়া অবশিষ্টটুকু পরে পান করিবে বলিয়া রাখিয়া দিল। ইহাতে তাহার শীতল শোণিত একটু উত্তপ্ত হইল এবং তুষারও অধিক মাত্রায় গলিয়া তাহার নিদ্রাকর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিল।

তাহার বোধ হইল যে আর এক নূতন পথে পদচারণ করিলে পাহারার এই একঘেয়ে ভাব কতকটা দুর হইবার সম্ভাবনা। সে পূর্ব্বে যে পথে ভ্রমণ করিতেছিল, সেই পথের সহিত সমকোণ করিয়া আর এক পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তুষারের উপর তাহার দুইবারকার পদচিহ্নগুলি যেন একটি বৃহৎ ক্রস প্রস্তুত করিল। তাহার শরীর আবার পূর্ব্বের মত অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় সেই নিস্তব্ধতা-ভঙ্গকারী মানবকণ্ঠস্বরে সহসা তাহার অবসন্নতা দুর হইয়া গেল।

"যদি তোমার হৃদয় মানবের হৃদয় হয় তবে আমাকে সাহায্য কর।"

রোলাণ্ড দেখিতে পাইল যে সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে স্থান হইতে প্রায় ২০ ফিট দূরে তুষারমণ্ডিত মৃত্তিকার উপর একজন মানব একহস্তের উপর ভর দিয়া অল্প উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সে যেখানে ছিল সেখানকার বস্তু দেখা যায় এরূপ আলোক ছিল। রোলাণ্ড আপনার বন্দুক সম্মুখে ধরিয়া সাবধান হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং যেখানে যেখানে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ বা তুষারমণ্ডিত ঝোপের পশ্চাতে শত্রুসৈন্য লুকাইয়া থাকিতে পারে, সেখানে সেখানে সতর্কভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ভূপতিত মানব বলিল, "আমি একাকী আছি।"

বড় দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক করুণ ক্রন্দনের সহিত প্রতি বাক্য উচ্চারিত করিতে লাগিল। তাহার পরিধানে দক্ষিণ প্রদেশীয় সৈনিকের পরিচ্ছদ। রোলাণ্ড দেখিতে পাইল, যে তাহার একটি বাহু ও একখানি পদ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহার গণ্ডস্থল হইতে কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি তরবারির ক্ষতচিহ্ন।

সে রোলাণ্ডের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি মরিতেছি!"

যুবক তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল এবং প্রায় অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে আপনার ঘাড় নাড়িল।

দক্ষিণ প্রদেশীয় সৈনিক বলিল, "তাহা আমি জানি, সেজন্য আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। যখন আমার সামর্থ্য ছিল তখন আমি তোমাদিগের দলের কয়েকজনকে নিহত করিয়াছি এবং শক্তি থাকিলে এখনও তাহা করিতাম। এখন আমার মরিবার পালা পড়িয়াছে, এবং আমি প্রশান্তভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমার পত্নী চার্লস টাউনে আছেন। আমি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিতে ইচ্ছা করি। তুমি কি আমার জন্য সে কার্য্যটুকু করিবে? বোধ হয় একজন মানবের পক্ষে অপর মানবের নিকট এ যাচ্ঞা

খুব বেশী নহে। তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া আমি এই ভীষণ কান্তারে পড়িতে ইচ্ছা করি না।"

তাহার পার্শ্বে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া রোলাণ্ড বলিল "তুমি শীঘ্র কার্য্য সমাপন কর; আর অল্পক্ষণ পরেই আমাকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে"।

তাহার হাত অসাড় হইয়া আসিয়াছিল তথাপি সে পকেট হইতে একখানি পুরাতন পত্র বাহির করিল এবং তাহারই অলিখিত পৃষ্ঠায় আহত ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহা লিখিয়া লইতে লাগিল।

আহত ব্যক্তি বলিল "প্রিয়তমে রোজ,"

রোলাণ্ড সহসা যেন সর্পদংশিতের মত চমকিয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া রহিল। দক্ষিণ প্রদেশীয় সৈনিকও আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিল। ক্রমে তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

রোলাণ্ড ডাকিল "জীম্ ভিকার্স!"

আহত বক্তি ডাকিল "রোলাণ্ড পিয়ার্স!"

এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহারা উভয়েই নীরব রহিল।

রোলাণ্ড ধীরে ধীরে বলিল "শেষবার যখন আমি তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম; তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমাকে দেখিতে পাইলেই গুলি করিব"।

ভিকার্স বলিল "আর বোধ হয় তোমার আমাকে গুলি করিবার আবশ্যক হইবে না। আমি দুইবার গুলি খাইয়াছি আরও একবার খাইতে আমার বড় আপত্তি নাই; সে যাহা হউক তুমি পত্রখানা শেষ করিয়া লও। পিয়ার্স! আমি তোমাকে যে সংবাদ লিখিতে বলিতেছি সে সংবাদ না পাইলে সে একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িবে, তাহার আর এক পয়সাও থাকিবে না এবং সে ও তাহার শিশু অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি জানি আমি নীচ ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইয়াছিলাম এবং ইহাও নিশ্চয় যে আমি তাহাকে পাইবার জন্য নরহত্যা করিতেও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ইহা সত্বেও যদি আমি কখনও কোন স্ত্রীলোকের জন্য ভাবিয়া থাকি তবে সে রোজের জন্য, আর সেও আমাকে ভালবাসে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে গুলি কর; কিন্তু আগে পত্রখানা শেষ করিয়া লও।"

রোলাণ্ড আবার দৃষ্টি নত করিয়া সেই কাগজে লিখিতে লাগিল।

ভগ্নস্বরে সে বলিল "বলিয়া যাও"। ভিকার্স বলিতে লাগিল—প্রত্যেক কথা এমন আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল যে তাহাতেই তাহার ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রে অর্থের কথাই অধিক; ঐ অর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত দলিলাদি দুই দিবস পূর্ব্বে ফিলিপ্‌ভিলের অবরোধের সময় পুড়িয়া গিয়াছিল। পত্র যখন শেষ হইল তখনই দূরে শিবির হইতে ভেরীধ্বনি শ্রুত হইল।

রোলাণ্ড বলিল “এই ভেরীধ্বনি শুনিয়া প্রহরীদিগকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে হইবে আমাকেও এখনি ফিরিতে হইবে। সুবিধা পাইলেই আমি পত্রখানি পাঠাইয়া দিব”।

সে উঠিল; ভিকার্স নীরবে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে বাম হাতখানি উত্তোলন করিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া রোলাণ্ড তাহার সহিত কর মর্দ্দন করিল। এবং “এই লও” বলিয়া সে তাহার পার্শ্বে আপনার মদ্যের বোতলটী রাখিয়া বলিল “সাহসহীন হইয়ো না; হয়ত তোমার অবস্থা তুমি যত মন্দ ভাবিতেছ বাস্তবিক তত মন্দ নহে। যদি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি দেখিব”।

হতভাগ্য আহত সৈনিকের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। হতভাগা বলিল “আমার বোধ হয় রোজ্ তোমাকে বিবাহ করিলে ভালই করিত”। রোলাণ্ড সত্বর ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রোলাণ্ড বলিল “আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব”। তাহার পরে সে আর একবারও পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া শিবিরে ফিরিয়া গেল। শিবিরে যে বৃহৎ তাম্বুতে হাঁসপাতাল প্রস্তুত হইয়াছিল সে সেই তাম্বুতে প্রবেশ করিল। উভয়পার্শ্বে দুইসারি সৈন্য দল পড়িয়া আছে; কেহ বা অবসন্ন হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেছে; কেহ বা যন্ত্রণায় শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে। একজন লোক চুরুটের পাইপ মুখে দিয়া একটী রোগীর নিকট ঝুঁকিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে সেনাদলের চিকিৎসকের বেশ। রোলাণ্ড তাঁহাকে বলিল “নেড! তোমার কার্য্য শেষ হইলে আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই”।

চিকিৎসক দৃষ্টি না তুলিয়াই সম্মতি সূচকভাবে ঘাড় নাড়িলেন। কার্য্য সমাপ্তি হইলে আপনার রক্ত রঞ্জিত অঙ্গুলিগুলি মস্তকে কেশের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, হাঁটু তুলিয়া রোলাণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিলেন :—

“এই শেষ রোগী! সন্ধ্যা হইতে আমি কেবল এই কার্য্যই করিতেছি। পরিশ্রমে একেবারে কাতর হইয়া পড়িয়াছি; যাহা বলিবার আছে সংক্ষেপে বল। আর এক ঘণ্টা পরেই আবার যাত্রা করিতে হইবে; আমি ইহার মধ্যে একটু ঘুমাইয়া লইব”।

রোলাণ্ড বলিল “আমার আশঙ্কা হইতেছে আজ তুমি ঘুমাইতে পাইবে না। জীম ভিকার্সকে তোমার মনে আছে”?

চিকিৎসক বলিলেন “জীম ভিকার্স! হাঁ, যে রোজ বিসপ্‌কে বিবাহ করিয়াছিল!”

রোলাণ্ড সম্মতি সূচক ভাবে ঘাড় নাড়িল। তাহার পর বলিল “সে বাহিরে পড়িয়া আছে; তাহার বাহুতে ও পদে গুলি লাগিয়াছে। সে বলিতেছে যে সে এখনই মরিবে! তুমি একবার চল; তাহাকে দেখিয়া আসিতে হইবে”।

আলস্যবিজড়িত ভাবে হাই তুলিয়া চিকিৎসক বলিলেন “বোধ হয় সে বিপক্ষ দলের সেনা। আমি তাহাকে আমাদিগের সেনাদলে দেখিতে পাই নাই”।

রোলাণ্ড বলিল "হাঁ! কিন্তু আমার বোধ হয় তোমার নিকট একজন মনুষ্যের জীবন যেমন মূল্যবান আর এক জনেরও সেইরূপ—আর তুমি রোজকে জান। হয় ত তুমি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে"।

নেড টেবিলের উপরিস্থিত একটী ব্যাগে কতকগুলি অস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য পুরিয়া লইল। তাহার পর উভয়ে একত্রে যাত্রা করিল। তাহারা আসিয়া দেখিল ভিকার্স নিদ্রিত। শূন্য মদের বোতল তাহার পার্শ্বে তুষারের উপর পড়িয়া আছে।

প্রায় ১০০ গজ দূরে একটী ভগ্ন ঘর ছিল। তাহারা আহত ব্যক্তিকে সেই ঘরে লইয়া গেল। সে জাগরিত হইয়া যন্ত্রণায় কাতরভাবে চীৎকার করিতে লাগিল। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া নেড নীরবে ভিকার্সের ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিল; হস্ত ও পদ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং পাঁজরার তিনখানি অস্থি অশ্বের পদাঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। রোলাণ্ড তাহার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু রোগীকে পরীক্ষা করিবার সময় চিকিৎসকের বদনে যে ভাব দৃষ্ট হয় তাহা হইতে কিছুই অনুমান করা যায় না। কার্য্য শেষ করিয়া চিকিৎসক অস্ত্রাদি ব্যাগে পুরিয়া সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। রোলাণ্ড দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিল।

সে বলিল "তুমি কি বোধ কর? রোগী কি বাঁচিয়া উঠিবে?"

"ভালরূপ শুশ্রূষা ও খাদ্য পাইলে বাঁচিতেও পারে।"

"আমরা কি উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব?"

"না। তাহা হইলে কর্ণেল আর রক্ষা রাখিবেন না। দুই দিবসের মধ্যেই আমাদিগকে পিটার্সবরোতে মিডের সহিত দেখা করিতে হইবে—এখন আমরা একজন খঞ্জ বন্দীকে লইয়া বিব্রত হইতে পারি না। আমাদের যথাসাধ্য আমরা তাহা করিয়াছি"।

রোলাণ্ড বলিল "আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না"।

নেড ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে হাস্য করিয়া বলিল "তুমি যে দেখিতেছি সহসা রোগীর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছ!"

রোলাণ্ড বলিল "আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম এখনও ঠিক সেইরূপ আছি। এ কেবল রোজের জন্য—"

চিকিৎসক ক্ষণকালের জন্য নীরব রহিলেন, আপনার সন্তানের গাত্রে চিকিৎসার জন্য অস্ত্র বিঁধাইতে যে ভাব হয় তাঁহার বদনে সেইভাব দৃষ্ট হইল; তিনি বলিলেন "আচ্ছা তুমি যদি আমার মতামত চাও তবে তাহা দিতেছি। তুমি যদি তাহাকে মরিতে দাও তবে তুমি বোধ হয় রোজের জন্য ভাল কাজই করিবে। তুমি উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হাঁসপাতালে যত্ন ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও সে একমাসেও সারিয়া উঠিতে পারিবে না।"

রোলাণ্ড অস্পষ্ট অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল "হয় ত কেহ আসিয়া আমাকে সাহায্য করিলে আমি ইহাকে নিকটবর্ত্তী নগরে লইয়া যাইতে পারিব।

"নিকটবর্ত্তী নগর এ স্থান হইতে ৩০ মাইল দূরে! তুমি ইহাকে কেমন করিয়া সেখানে লইয়া যাইবে? তাহা ভিন্ন চাহিয়া দেখ।" তিনি আকাশের দিকে দেখাইলেন। আকাশ ঘন ধূম্রবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। "আর এক ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। তুমি তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। আর তাহার পরে—দূর হউক ছাই—তোমার সহিত এখানে তর্ক করা বাতুলের কার্য্য,—বিপক্ষ দলের একটা সেনাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য যে ছুটী পাইবে তাহা বোধ হয় না।"

রোলাণ্ড বলিল "আমি ছুটী করিতে পারিব।"

"তাহা হইলে সেনাদল পরিত্যাগের অপরাধে তোমাকে গুলি করিবে।"

"সে যাহা হইবার হইবে। তখন তোমরা আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তখন তোমরা বহুদূর চলিয়া যাইবে, সেখান হইতে আর কেহ আমাকে খুঁজিতে আসিবে না। আমি নাম ডাকের সময় উপস্থিত থাকিব, তাহার পরে পিছাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিব।"

নেড হাত দিয়া আপনার মাথা চাপিয়া ধরিল যেন তাহা না হইলে তাহার সঙ্গীর এই অদ্ভুত কল্পনায় তাহার মস্তক ফাটিয়া যাইবে!

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "আমি অনর্থক এইরূপ বাক্যব্যয় করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইতে পারি না। আমি শিবিরে চলিলাম।"

সে ফিরিয়া চলিল, রোলাণ্ড তাহার অনুসরণ করিল। সে জানিত যে সে মূর্খের মত কার্য্য করিতেছিল। সে তাহা ভালরূপই জানিত কিন্তু একখানি নারীবদনের চিন্তা তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল। যাহাকে রোজ ভালবাসে সে তাহাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইবে! হয় ত সে চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঁচাইতেও পারে।"

সেনাদল যখন যাত্রা করিল, তখন তুষার পতন আরম্ভ হইয়াছে। সেনাগণ নিতান্ত শিথিলভাবে চলিতে লাগিল; সে পথ বড়ই বন্ধুর তাহারাও সকলে আহত বা শ্রমে কাতর। ইহা ভিন্ন তাহারা সকলেই জানিত যে ৬০ মাইলের মধ্যে কোথাও শত্রু-সৈন্য নাই। রোলাণ্ড ক্রমে ক্রমে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। সেনাদলের শেষভাগে আহতদিগের বহনকারী শকটগুলি নেডের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। রোলাণ্ড সেখানে যাইয়া আস্তে আস্তে নেডকে বলিল :—

"এই পত্রখানির যাহা করিতে হয় করিও!" নেডের হাতে পত্রখানি গুঁজিয়া দিল, এবং তাহার পর বলিল "বিদায়! যদি পারিয়া উঠি তবে ইহার পরের সেনাদলের সহিত যাইব, আর যদি না পারি"—

এই সময় তাহারা যে স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থানে রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে; সেখানে অনেকগুলি বৃক্ষও ছিল, রোলাণ্ড সহসা সেই বৃক্ষগুলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সৈন্যদল চলিয়া গেল—রোলাণ্ড তাহাদিগের অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইল। সেই তুষারভার-কাতর পবনে শীঘ্রই সে শব্দ মিশাইয়া গেল। তাহার পর সে কতকগুলি শুষ্ক পত্র ও

বৃক্ষশাখা লইয়া সেই গৃহে ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহার অবশিষ্ট টোটাগুলির একটির সাহায্যে শীঘ্রই অগ্নি প্রজ্জলিত করিল। ভিকার্স নীরবে তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিল।

তাহার পর বলিল "রোলাণ্ড! ইহার অর্থ কি?"

রোলাণ্ড সন্তোষের ভাব দেখাইয়া বলিল "দেখিতেছি যদি তোমাকে বাঁচাইতে পারি।"

ভিকার্স বলিল "তাহা পারিবে না! নেড যাহা বলিয়াছে তাহা আমি শুনিয়াছি। আমি মরণের যাত্রী, বুদ্ধিহীনের মত কার্য্য করিও না; আমাকে রাখিয়া সেনাদলের অনুসরণ কর। মানবের সাধ্য নাই যে আমাকে বাঁচায়। তথাপি কি তুমি যাইবে না? আমি জানি তুমি চিরদিনই এইরূপ একগুঁয়ে। কোন চিন্তা একবার তোমার হৃদয় অধিকার করিলে তুমি আর তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহ না। কিন্তু ইহা যে উন্মাদের কার্য্য! ইহা বাতুলতা! তুষারের দিকে চাহিয়া দেখ আর এক কিম্বা দুই ঘণ্টা কালের মধ্যেই আমরা তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইব। আমি জানি তুমি আমার জন্য ইহা করিতেছ না রোজের জন্যই করিতেছ। যদি ইহাতে কোন ফল হইত তবে আমি তোমাকে যাইতে বলিতাম না, কিন্তু কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি আর এক দিবসের অধিক বাঁচিব না। কিছুতেই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

রোলাণ্ড তাহার বন্দুক তুলিয়া লইয়া বলিল "আমি জঙ্গলে যাইতেছি। যদি সেখানে কোন শীকার থাকে তবে এই শীতল বাতাসের সময় তাহার আশ্রয় স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।"

সে ভগ্নকুটীরের কতকগুলি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই তুষার-সমাচ্ছন্ন পথে ছয়পদ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সে স্থানের নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া ভিকার্সের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সে বলিল "রোলাণ্ড! বিদায়!" তাহার পর একটি বন্দুকের আওয়াজে সে ভগ্নগৃহ কাঁপিয়া উঠিল।

রোলাণ্ড ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল, দেখিল ভিকার্সের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার বাম করে একটি পিস্তল। গৃহে প্রজ্জলিত অগ্নির আলোক পিস্তলের নলের উপর পড়িয়াছে।

ইহার দশ মিনিট পরে ভিকার্স তুষারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল, আর রোলাণ্ড সেই তুষার বৃষ্টির মধ্যে সেনাদলের পদচিহ্ন অনুসরণ করিা গমন করিতে লাগিল।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

বসন্ত সঙ্গীত।

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি!
নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,
মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,
ফুল তুলে চুলে পরাইয়ে দেওয়া,
থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!

গাছের তলায় খেলার ভাণ,
প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,
কথায় কথায় মান অভিমান,
ভাল বাসে কি না এই আকুলি!
হায়! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি!

ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,
নয়নের নীরে প্রেম আকুলতা,
পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা—
আবেগে দেখান হৃদয় খুলি।
হায়! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি!

স্বপনেতে যেন আত্ম বিনিময়,
সুখের সাগরে মগন হৃদয়,
মুহূর্ত্তের মাঝে অনন্ত বিলয়
স্বর্গে পরিণত মরত ধূলি!
ওগো! সে কি ভোলা যায়! কেমনে ভুলি!

নূতন বিজ্ঞান।

(বক্তৃতা।)

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন পাশ্চাত্য সভ্যতার মেরুদণ্ড। বিজ্ঞাপনবলে ইংরাজ—আজ ইংরাজ; ইংলণ্ড সভ্যজগতের কেন্দ্র। বলিতে কি, বিলাতি এবং বিলাতের সকলই বিজ্ঞাপন। ইহা জন্ বুলের ভিত্তি, স্তম্ভ, খিলান, ছাদ, হর্ম্ম্য, দুর্গ, কেতন এবং কিরীট। নেপলিয়নের বীরচক্ষে ইংরাজ The nation of Shopkeepers মাত্র। আজ ক্ষুদ্র বাঙ্গালী বিলাতযাত্রী বাক্স-লীর নিষ্প্রভ নয়ন বিজ্ঞাপনের তাড়িদালোকে ঝলসিয়া গিয়াছে। তিনি ইংরাজকে The nation of advertizers বলিয়া হাঁপ ছাড়িলেন। বস্তুতঃ জন্ বুলের বসায় বিজ্ঞাপন, শোয়ায় বিজ্ঞাপন, আহারে বিজ্ঞাপন, বিহারে বিজ্ঞাপন, ধর্ম্মে বিজ্ঞাপন, কর্ম্মে বিজ্ঞাপন, জন্মমৃত্যু-বিবাহে বিজ্ঞাপন; বিজ্ঞাপন তাহার অস্থিমজ্জাগত; জীবন—বিজ্ঞাপনময়। বিজ্ঞাপন তাহার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, সিদ্ধি, তপ, যপ, যোগ, যাগ, সমাধি। ভারত সেই পুণ্যফলে দিন দিন সুজলা, সুফলা, শ্যামলা, কমলা, বিমলা হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ড যে আমাদিগকে বিজ্ঞাপন ও মদের বোতল মুক্তহস্তে দিয়াছে, ইহা শত্রুপক্ষেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। ফলে বিজ্ঞাপনের আলোচনায় নিখিল সংসারের আলোচনা হইয়া থাকে। ইহাতে মনুষ্য-মনের যতদূর সংশ্লেষ বিশ্লেষ জ্ঞান জন্মে, বৃদ্ধ মিলের এ্যানালিসিস্ দূরের কথা, সমগ্র বিজ্ঞান-দর্শনের অনুশীলনে তাহার এক কপর্দ্দকও হয় না। যিনি সভ্যজগতের বিজ্ঞাপন-বারিধি মন্থন করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যচরিত্র সংগঠন করিলেও করিতে পারেন। সভ্যতার ভবিতব্যতা প্রকৃত তাঁহারই হস্তগত হইয়াছে।

পাঁচভূত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাঁচ ভূতের খেলা মাত্র। যেদিকে দেখ, সেই পাঁচভূত বই আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। বিজ্ঞাপন প্রপঞ্চও পাঁচভূতের লীলাময় তরঙ্গ। তবে ভূতের প্রকৃতিগত আছে।* বিজ্ঞাপন বিশ্লেষ করিলে যে পঞ্চগব্য পাওয়া যায়, তাহাদিগকে সাঁটে বৈজ্ঞানিক ভাষায় লপ, লেপ, টিপ, টাপ, চপ বলায় দোষাবহ হয় না। লপ, অর্থাৎ লপন, অর্থাৎ মুখ; তাহে কথন, অর্থাৎ মুখপাত, অর্থাৎ নাম। সুতরাং ইহাতে নামের লালিত্য, সৌন্দর্য্য, চাতুর্য্য, মাধুর্য্য, অনুপ্রাস, ভাব, হাব, হাহুতাশ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। লেপ, অর্থাৎ আলেপ, অর্থাৎ আলেপনা। আলেপনায় যেমন ঘর, দ্বার, সিন্দুক, পাঁয়টরা, পিঁড়ে, জলচৌকি প্রভৃতি বিশেষ শোভা পায়, প্রশংসাপত্রে সেইরূপ বিজ্ঞাপনের সর্ব্বথা সাত্ত্বিক

শোভা বাড়িয়া থাকে। টিপ, অর্থে ছিট, ছাট, তিলক, ফোঁটা, নিশান, হোদিস, মার্কা, ছাবাছুবি, থাবাথুবি, আঁকা বোঁকা, এ্যাঁকা ব্যাঁকা, সিলমোহর, চাপড়াস ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। টাপ, এস্থলে ঢাকাঢুকি, চাপাচুপি, ছাঁদবাদ, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, ফুঁকফাঁক, ফাঁকিঝুঁকি, গণ্ডিমণ্ডি প্রভৃতি তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, জানিতে হইবে। টাপ; অর্থে আদব, কায়দা, কসরৎ, কেরামৎ, চালচলন, ডৌল ডাল, ভাবভঙ্গি, ওড়ন পাড়ন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। আমি এই কয়েকটি ভৌতিক তত্ত্বের পর পর সংক্ষেপ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। তবে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্টাধীন কার্য্য ; তাহাতে আমার কোনও সুহাত নাই। পরিণতিবাদ প্রচারের প্রারম্ভেই উহাদের পার্মিউটেসন্ কম্বিনেসন্ এত ভয়ানক জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে এক একটী পৃথক ভাবে নিরাকরণ করায় বিস্তর কাঠ খড়ের আবশ্যক। অধিকন্তু ভূতগুলি ভয়ানক চঞ্চল ; উহাদের ফটো লওয়া উড়া পাখী অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। আর জানেনই তো ভূত মাত্রই ভয়ঙ্কর অস্থির। নির্জ্জল, অকৃত্রিম, খাটি, স্বরূপ রূপ জানা ভার।

লপ।

লপই বিজ্ঞাপনের প্রধান অঙ্গ। আর শুদ্ধ বিজ্ঞাপনে কেন, সকল বিষয়েই লপ মূলাধার। যাঁহারা সুলভ কলের জাহাজে ৺কালনাধামে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই নামব্রহ্মের প্রতিমা সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ নামই ব্রহ্ম। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নাম দমে ভারি। ইহা সেই প্রেমের তুলটে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত ব্যাপার। তাই নামের ভরণে পদার্থের ভরণ একটী দৈনিক সমস্যা। কথায় বলে, খাঁদাপুতের নাম পদ্মলোচন। ইহা সেই অসীম রহস্যভেদী কথা মাত্র। অধিক কি বলিব, যিনি অপার নামশুঁড়া-সমুদ্র তলাইয়াছেন, তিনি স্বর্গও হাতে পাইয়াছেন। ইহাতে অন্ধ বিশ্বাস দূর হয়, কুসংস্কার ছুটিয়া পলায়, ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না ; লোকে সচ্চিদানন্দ হইয়া কোথায় তিব্বতের জঙ্গলে বা সাইবিরিয়ার বরফ মরুর মধ্যে বসিয়া হাস্য করিতে থাকে। কুৎহুমিলাল ইহার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত। তাই মানুষ নামের জন্য এত লালায়িত। জগতে নামই সার ও সারাৎসার। নামই ধেয়, আরাধ্য ও পূজ্য। আবার মনুষ্যজগতেও যেকথা, জড়জগতেও সেই। মাটির নাম ধরিত্রী, শূন্যের নাম স্বর্গ, জলের নাম জীবন, পুকুরের নাম শিবগঙ্গা, জন্মান্ধের নাম নজর মহম্মদ, কাঙ্গালের নাম আমির খাঁ, মদের নাম সুধা, উৎপীড়নের নাম স্যানিটেসন্, অপব্যয়ের নাম ফ্যামিন্ ফণ্ড, ভল্লুক নাচের নাম আত্মশাসন, টাকাঘণ্টের নাম মকর্দ্দমা, ঘুষুর নাম ইকুইটি, জবরদস্তের নাম শান্তিরক্ষক, চোঙ্গার বাঁদরের নাম দিক্‌পাল। মহাকবি সেক্সপীয়র বলেন **What's in a name ?** অথচ নায়ক নায়িকার যতদূর পারিয়াছেন সুমিষ্ট নাম রাখিয়াছেন। কবি নহিলে এমন দুষ্টামো কার ? আমি বলি What's in a thing ? জগতে নাম বই আর কি আছে ? "হরিনাম বই আর কি ধন আছে সংসারে ?" এ মহাবাক্য যিনি বুঝেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। তাঁহারই প্রকৃত পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে। সভ্যতার ইতিহাস

Nominalism মাত্র। ইহাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান—বিজ্ঞানের চরম কারখানা; ন্যায়দর্শনের আদি, অন্ত ও মধ্য।

বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞানেও নাম একটি ভূত—প্রকাণ্ড ভূত। মিষ্ট নাম বিজ্ঞাপনে মহা উপাদেয়। তাই বিজ্ঞাপনে অনুপ্রাসের এত আদর—এত ছড়াছড়ি। নামের অনুপ্রাসে মধু সত্তত গড়াইয়া পড়ে। লোকে দুই হাতে লুটিয়া খায়। নিম্ন সংগৃহিত নামগুলিতে কার না জিহ্বায় জল সরিয়া থাকে? মলিনী মালিনী, আমেলা ঝামেলা, বিজয়া বাজনা, উম্নো ঝুম্নো, (গ্রন্থ); ফটিকা বটিকা, সুধা সাত সমুদ্র, কবিকঙ্কন কুইনাইন, দক্রদমন, যকৃৎ বকৃৎ, অর্শ বিমর্শ, বাত নিপাত, সমন-ভবন-না-হয় গমন, হাঁপ বিলাপ, যক্ষ্মারি কেশরী, বিকার শিকার, জ্বর-নিবারে-মধুকৈটভারে, (ঔষধাদি); হাসিখুসি তৈল, পঞ্চকূটের তাম্রকূট, গোলকের নোলোক, মোহিনী মেলা, কটকটে বিস্কুট, গিল্‌টীর গহনা, অনারারী সেক্রেটারী, বোম্বাই চারপাই, বিলাতী ধুতী, ইত্যাদি। (বক্তা এই স্থলে এক দীর্ঘ লাঠি লইয়া পৃথিবীর মানচিত্র দেখাইবার মত নানাবিধ আকারের ও বর্ণের বিজ্ঞাপন দেখাইতে লাগিলেন।) লোকে বলে রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য; একথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনগুলিই প্রকৃত কাব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। সামান্য দুইচারি কথায় তাঁহাদের যত রস থাকে, তাহা সমস্ত পয়ার, তোটক, অমৃতাক্ষর প্রভৃতিতেও পাওয়া যায় না। আমার মতে Exchange gazette, সংবাদপত্রের মলাট প্রভৃতি সমস্তই অচিরাৎ মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আমি উপরে সামান্য কয়েকটি অনুপ্রাস-সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছি মাত্র। এক্ষণে আর কয়েকটি নূতন এবং উচ্চধরণের অনুপ্রাসবিশিষ্ট নামের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। তবে সেগুলি সামান্য লোকদের বড় একটা মিষ্ট লাগিবে না। ফলে সেরূপ অনুপ্রাস আপামর সাধারণের জন্যও মনস্থ হয় নাই। আজকাল কবিরা স্বরের মিলই রুচিসঙ্গত বলেন। তাঁহাদের মতে ব্যঞ্জনের মিল ঘণ্ট বিশেষ। অধিকন্তু অনুপ্রাস সংসারে কবিই রাজা; তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ বিজ্ঞাপনেও উহার ভূরি ভূরি পৃষ্ঠপোষক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, সাহা নামা, সারসা প্যারিলা, বিলাতী সাড়ী, মাথাঘসা, নন্দী ফিরিঙ্গী, গিরগিট্ সাহেবকী গোলী, ম্যালেরিয়া নাশা পুরিয়া, নাসা আদমনী হজমী, ব্রহ্মাণ্ড বিভ্রাট, খুজুরা বা খরচা, হাকিমী ঔষধী, নবাবী কাপি, ঈশ্বরী মৃগনাভি, কাশমেরী কলসি ইত্যাদি।

ফলে বালক ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকেই অনুপ্রাসের রুণ রুণ ঝুন ঝুম ভয়ানক ভালবাসে। অপেক্ষাকৃত বয়স্থ ও বুদ্ধিমান লোকে ভাবেই ভোর। তাঁহারা কাব্যের মিল দেখেন না, বন্ধন চাহেন না, কাটা কাটা স্পষ্ট স্পষ্ট বোল খোঁজেন না। ভাব তাঁহাদের ঘোর পিপাসা—ঝিম ঝিমে, টিপ টিপে, নধর, নিটোল, ঢল ঢলে, ধূমাকার—ভাব। তাই এখনকার কবিরাও পাঠকের পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিয়াছেন। তাঁহারাও আর পুরাতন ধরণের কাব্য-প্রণালীর "তিন তিন দুই তিন তিন" প্রভৃতি গণ্ডির মধ্যে থাকিতে চাহেন না।

তাঁহারা "কেমন আছেন সখি, মদনমোহন" রূপ দাসত্ব বন্ধন হইতে নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এপ্রকার ভাব মনে আসিলে বরং তাঁহারা স্বাধীন-ইচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া থাকেন, "প্রাণাসরণ, সখি, আছেন তো কুশলে ?" যখন লোকে এরূপ ভাবভক্ত ; যখন এতদূর ভাবের উদয়, তখন বিজ্ঞাপন ভাবপূর্ণ না হইবে কেন ? তাহাও তো সেই মানসিক বিকারাবস্থাবশে প্রণীত হইবে। তাই বিজ্ঞাপন প্রায়ই দিশাহারার ন্যায় ভাবের ঢেউ তুলিয়া ছন্দবন্ধ ছিঁড়িয়া রূপটিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া ফিরিতে থাকে। বস্তুতঃ ভাবাত্মক নাম বড়ই পরিপাটি। আর বিজ্ঞাপনেও তাহার বিপর্য্যয় আদর। পত্রপাঠমাত্র লোকের নাকে, মুখে, চক্ষে বেশ একটু কাব্যলেশ ঢুকিয়া যায়। তাই জ্বরের ঔষধকে এপ্রণালীতে জ্বরের ঔষধ বলা নিষেধ। সুতরাং স্বর্গের সুধা, মর্ত্তের মাধুরিমা, ইহকালের সম্বল, পরকালের কম্বল, সকলই তাহাদের অন্নপ্রাশনে নিঃশেষিত হইয়াছে। যথা, চন্দ্রচূড়, পারিজাত মধু, মার্ত্তণ্ডচূর্ণ, চন্দ্রবিন্দু, সুখসাগর, বিজয় পতাকা, ব্রজলীলা, চতুর্ব্বেদ, পঞ্চবাণ, সুধাসমুদ্র, অষ্টবজ্র, নবগ্রহ, হরগৌরী রস, ইন্দ্রধনু, বসন্তমঞ্জরি, ইত্যাদি। (নাটির মাথা দর্শান)। জ্বরের ঔষধের বীর ও রৌদ্ররসাশ্রিত নাম ; যথা, কোদণ্ড টঙ্কার, বিষম বজ্রনাদ, করাল কালেশ্বর, মদন ভস্ম, হিরণ্যকশিপু, ভীমভীম মহাদ্রাবক, কালান্তক কজ্জলী, নৃসিংহ জনার্দ্দন, দুর্দ্দম প্রভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র শঙ্খনাদ, পঞ্চাশি পাবক, ইত্যাদি।

ঔষধ ব্যতীত ভাবমার্গের অপর কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত না দিয়া স্থির হইতে পারিলাম না। যথা, সাতভাই চম্পক, কেন বোন পারুল, আলেয়া, কাণামণি বিহঙ্গিনী, কালমাণিক দীপিকা, আষাঢ় অষ্টক, (খোস গল্প) ; নরকের দ্বার, খুবড়ো, টেঁপেশ্বরী, একানেড়ে (মহাকাব্য) ; যমের ভুল, যমের অরুচি, চুনমুখ, কালাপানি, হরিণবাড়ী, ঘাটের মড়া, কলার পেত্নী, ষোল কড়াই কাণা, (Tragedy) ; ফাঁসী, গলায় দড়ী, ব্রহ্মহত্যা, বিলাপ-আনন্দ, লহরী, (প্রহসন) ; Sree Gourango Esq. শ্রীএকাদশী ভক্ত প্রণীত, পঞ্চানন্দ, দামাপোড়া রেডাক মহম্মদ নাম (জীবনচরিত) ; ভট্টিরাম, নাছোড়বন্দা, অকাল কুষ্মাণ্ড, দিশাহারা, নিশি, (সংবাদপত্র) ; মক্কেলের বদলে মোক্তারের ফাঁসী, বেগুন চোরের কান্নাখালি, ফাঁসীর পর আপিল, (নব্যদায়ভাগের নবীননজির) ; পরার পাপ, সপীণ্ড করণ, কলির পাণ্ডা, কালীঘাটের কাহানী, হাড় হাবাতে, অলপ্পেয়ে, (ইতিহাস)। এসমস্তই আইনমত নূতন রেজিষ্টারী করা গ্রন্থ। পণ্যদ্রব্যের ভাবাত্মক নাম ; যথা, অব্যয় দোয়াত, নির্ঝর কলম, চারি আনার ফাউন্টেন, চিরপ্রজ্বলিত বাতি, চণ্ডীরগড়ের গুড়ুক তামাক, সোণার পাথর বাটি, গন্ধে প্রাণ জোড় বড়ি, সুতলার সরাপ, সধবা নিঁথি, ফকিরচাঁদ হারু, পদ্মমাল্য থালা, কাঞ্চন নগরী বাদি, বিধুমুখী বাটা, মতিহারীর মিসি, প্যারেডাইস সোপ, এলিসিয়ম প্রোমেড, এলিম্পিয়েন চিরুণী, ইত্যাদি।

ভাবমার্গে কখন বা একজন কবি, কখন বা সমস্ত একখানি পূর্ণ প্রাচীন কাব্য বিজ্ঞাপিত নামে পাওয়া যায়। যথা, বেণিসংহার তৈল শকুন্তলা হোটেল, মিলন ব্যাপার,

সেক্সপীয়র লাল, কালিদাসপেড়ে কাপড়, রঘুবংশ ব্রিক্, ভারবি পাউরুটি, বাইবল ঘুনি, বিদ্যাশক্তিবাণী, কীর্ত্তিবাসী কাপি হাউস, রামায়ণ কলপ, মহাভারতী পটপটি, মালতী মাধব চাউল, শ্রীহর্ষ ছাতা, কাউপার রুমাল, বার্ণস্ গলাবন্ধ, ভারতচন্দ্র নূপুর, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ চৌকি, মাইকেলী আটতাজা, ইত্যাদি।

ধর্ম্মভাব নামের পরম উপাদান। এটী আমাদের নিজস্ব। লোক জন, হাট ঘাট, মাঠ ময়দান, রাস্তা গলা, ছেলে পিলে, উঠান চক, ডোবা ডাবা, ঘটি বাটি, পুঁথি পাটা, ঔষধ মাদুলী, প্রভৃতির নাম প্রায়ই দেবতা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এদেশে দেবতা বিজ্ঞাপনের একটী প্রকৃত গরম মসালা। এমন কি, তারকনাথ, বৈদ্যনাথ, বিশ্বেশ্বর, কানাই, বলাই, রাম, লক্ষণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবেরাদি, তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও অনাটন; সুতরাং ফকির, ব্রহ্মচারী, সন্যাসী, পরম হংস, বাবাজী, বৈরাগী, অবধূত, যোগী, ঋষি, পীর, প্যাগম্বর, অবধি টান ধরিয়াছে। যথা, শ্যামসুন্দর রেজাই, চক্রপাণি ছিট, পঞ্চানন; গদাধর সালসা, জনার্দ্দন কন্‌ফোজোন, অরচিন্তামণি, রামরাজা তাস, হাঁপ নীলকণ্ঠ, বিকার বৈশ্বানর, আল্লা মালিক নবি মালিক গোলাপ জল, বৈজন্ত বাসন, বৈদিক পাঠশালা, ষড়দার্শনিক ঔষধালয়, পৌরাণিক পঞ্চরং, আর্য্য চসমা, ব্যোমকেশ তৈল, পীলা ধূর্য্যটি, সদাশিব পাচন, সন্যাসীদত্ত মহাব্যাধির মহৌষধ, স্বপ্নাদি জয়মঙ্গল রস, ভোলামহেশ্বরের তুকতাক, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাশা, সীতা সাবিত্রী কণ্ঠমালা, আবা আবা ধবলী উড়ানী, বলদেব রেকাব, জগন্নাথ জামা, দিগম্বরী সাড়ী ইত্যাদি। অধিক কি বলিব, পেটেণ্ট ঔষধাদির নাম করিতে গেলে ঘরে বসিয়া সকল তীর্থেরই ফললাভ হইতে পরে। ঔষধগুলির ঐহিক অপেক্ষা পারত্রিক দৃষ্টি ভয়ানক প্রবল। বিশেষতঃ আজকাল যে ধর্ম্মের একটা বিষম রিএ্যাক্‌সনারী ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মের ধূয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। তাই মুদী, পকালী, ময়রা, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি ধর্ম্মপথে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এঘোর বিপ্লবে কাহারও নিস্তার নাই। সুতরাং এ নূতন ভরঙের দ্রব্যাদির বড়ই আদর বাড়িয়াছে। যথা যাও, যথা চাও, ধর্ম্মেরই ছড়াছড়ি দেখিতে পাইবে। নূতন ধরণের ধর্ম্মভীত সাইন্‌বোর্ড, প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখায় চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষা-করা রস-করা, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী চিনি, সদ্ধর্ম্মের ঝুড়ি মুড়ি, ব্রজের বড়াই ক্লুটকড়াই, নীলাচলের বরফ, নিত্যানন্দ মালপো, পরম হাঁসের ডিম, ইত্যাদি না বলিলে আর দোকানপাট চলে না। যদি সহায় সম্পদ চাও, মালা লও; নতুবা হাঁ করিয়া বসিয়া মাছি তাড়াইতে হইবে। ধর্ম্মের দ্বারে এখন আর আগের মত ভালমন্দের বিচার নাই। সব সমান, মুড়ি মিছরির একদর অরভাজার মজোরে কাটি যাও, উন্নতির পথ আপনি খুলিয়া যাইবে। তাই বোধ হয় লোকে কথায় বলিয়া থাকে, ধর্ম্মের ঘরে কুটের অভাব নাই।

ধর্ম্মের আর দুই একটি অভিনব চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠানপত্র দেখাইয়া সংক্ষেপে নিরস্ত হইব। (এবার বাজার আর একটি Chinese অর্গান মারা, হাড়গিলা-মার্কা, রক্তবর্ণ, আলোক

অক্ষরে মুদ্রিত ক্ষুদ্র বিজ্ঞান লাঠির দ্বারা দর্শাইলেন।)। ইহা একটি হবুকুবন্দের ব্যাপার। "ট্যাংরা মিউনিসিপাল কালীঘাট; বিনা ব্যয়ে দর্শন; সুলভ সুন্দর স্বাস্থ্যকর মাংস; হোমরা চোমরা কমিস্নরদের নামে প্রতিষ্ঠিত; মহামহোপাধ্যায়গণের ব্যবস্থিত; বার্মিংহাম হইতে নূতন লোহার মা সর্ব্বমঙ্গলা স্বয়ং আসিয়াছেন; উন্নতিশীল ব্যাঙ্গ্লো-এঙ্গ্লিক্যান্ হিন্দুগণ এতদ্দ্বারা নিমন্ত্রণ জানিবেন।"

আর ঐ যে লাল কাল নানা বর্ণবিশিষ্ট বিজ্ঞাপনখানি পাথায় মারা রহিয়াছে; আক্ষেপের বিষয় উদ্যোগী মহাপুরুষেরা এ পোড়া দেশে সহানুভূতি পাইলেন না। "শিবরাম কানাই পার্ভেস্লিং কোম্পানী। আর ধর্ম্মের ভয় নাই! স্বধর্ম্মে থাকিয়া হু-শ মজা!! আমাদের গুরুজী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; সদাচারী, শিখাধারী, ত্রিসন্ধ্যাকারী, ধর্ম্মের জন্য দয়া করিয়া অবৈতনিক পাচকব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা বিজাতীয় কোন জিনিষ, ব্যবহার কিম্বা দূরের কথা, নাম গন্ধ পর্য্যন্ত রাখি না। বন্য-কুক্কুটের ব্যান্নন্, বন্যবরাহের ফুলুরি, ছিন্নদন্ত অজের জিবেগজা, গোময়ের ডাল্না প্রভৃতি পবিত্র আহারীয় সকল সময়ে অত্র প্রস্তুত থাকে। Prevention of cruelty to animalsএর সভাপতি-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমস্ত বিনা পিন্যালকোডের মধ্যস্থে মাননা করিয়া থাকি। প্রাণিগণকে পশুজন্ম হইতে মোচন করিবার পূর্ব্বে সপ্তাহকাল তুলসী কাননে রক্ষা করা যায়। অধিকন্তু উহাদিগকে প্রত্যহ তুলসীপত্র ভোজন, গঙ্গাস্নান, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন প্রভৃতিও করান হইয়া থাকে। দেশী চাউল ও গুড়ে গুরুজী স্বয়ং পরম উপাদেয় দশ গুণ ডেলাইট্ সোমরস প্রস্তুত করেন। ইহাদ্বারা বিজাতীয় ধর্ম্মনাশা কর্ম্মনাশা ধননাশা বিয়ার, ব্রাণ্ডি, লিমনেড, সোডা প্রভৃতি অপেয় পান বহুল পরিমাণে নিবারিত হইবে। ইহাতে মর্ত্ত্যে বসিয়া পূর্ণ মাত্রায় স্বর্গের সুখ পাওয়া যায়। আর গন্ধের, পীলার, যকৃতের, যক্ষার, ক্যান্সারের ভয় নাই! মা জাহ্নবী বোতলে!! ইহা শুদ্ধ পুরুত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, সাধু সজ্জন, গোঁসাই, গোবিন্দের সেব্য!!! ফলেন পরিচীয়তে! শুদ্ধ কথার কথা নহে! রৌদ্রে, গরমবাতাসে প্রাণ তর!! জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, স্বপ্নাতীত আবিষ্কার আর অধিক কি লিখিব!!! সামান্য ব্যয়ে উপবন বিহারোপযোগী তৌর্য্যত্রিক উপভোগের জন্য সতত ষ্টক মজুত রাখা যায়।" শুনিতে পাই আমাদের কপাল গুণে এ সুবিশাল ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাকি অকালমৃত্যু হইয়াছে। দেশহিতৈষী মাত্রই অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন!

লেপ।

জগতে "জয় আমি" বড়ই কার্য্যকর। তবে তাহারও কায়দা আছে। সাদাসিদা লোকের কাছে সাদাসিদা "জয় আমি" খাটে ভাল; কিন্তু সংসার মহা কুটিল, সভ্যতা ভয়ঙ্কর জটিল, উন্নতির পথ ভীষণ কণ্টকময়। তাই "জয় আমি" অনেক সুরু ভয়ানক কারিকুরি সাপেক্ষ। আপনার জয় আপনি গাও, ক্ষতি নাই। তবে একটু আবডালে হইলে

ভাল দেখায়। পরমুখে "অর আমি" দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে, চিন্তিতে বড়ই মিষ্ট লাগে। ঠিক সুর লয়ে বসিলে মন ভরিয়া যায়। তাই লেপ, অর্থাৎ আত্মপ্রশংসা স্মায়শাস্ত্রের খুরল-পাক সদৃশ ঘুরিয়া করা উচিত। "জগদ্বিখ্যাত কে, এম, দাস, ভুবনবিখ্যাত শ্রীহার্ড়ি খাঁ বিশ্ববিজয়ী রাধা কলু বেচারারা সাদাসিদা লোক। কারচুপি জানেন না। পাদুকা-ব্যবসায়ী গোলকধাঁধার ঘোরফেরে কখন ফেরেন নাই। সরলতা সহকারে কেবল কালের মাত্র Abreastএ চলিতে শিখিয়াছেন। বিদ্যাবুদ্ধি ব্যতীত কারচুপী কোথায়? গ্রন্থকার ভায়ারা কৃতবিদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বজা; অনেক ন্যায়দর্শনের ফাঁকি কণ্ঠস্থ; তাঁহারা আত্মগরিমার ঢাক রগড়ের সহিত বাজাইতে জানেন। অনেক ভঙ্গি সহকারে তালমানলয়ে কাটি দিয়া থাকেন। সে কৃতবিদ্য চাতুরী অন্যে কোথায় পাইবে? ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে; গ্রন্থকারের ঢাক অপর দিয়া বাজাইতে হয়। তবে লেখকের মাথা চালার সঙ্গে কাটি পড়া চাই। বেনামা ঢাক রণবাদ্য বিশেষ। "মঞ্জু-কুঞ্জ-বঙ্গ-বন বিহারিণী"; কাব্যের সুমধুর কিঙ্কিণী সদৃশ রুণু ঝুনু নাম একে মনোহারিণী; তাহাতে প্রকাশক শ্রীদীননাথ দাসদের দশকুসী বাজনায় বিশ্বজন বিমোহিত—অবাক নয়নে তাকায়িতবান্। "মহাকবি গদাধর রক্ষিত প্রণীত। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে বঙ্গীয় সেক্সপীয়র গদাধর বাবু অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাদিগকে এ পুস্তক প্রকাশের অনুমতি দিয়া সাধারণকে বদান্যতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এপুস্তকের দ্বিতীয় নাস্তি। দশ হাজার কাপি দশদিনে নিঃশেষিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাভাগগণ ত্বরায় আবেদন করুন; নচেৎ যে দশ বিশ খানি বাকি আছে তাহাও আর থাকে না।"

উপন্যাসের নাম "অম্বালিকা" রাখিয়া গ্রন্থকার চিন্তিত। উপন্যাসের একটু মিটেকড়া নাম চাই; নতুবা বীরমধুররস থাকে না। কিছুতেই আর কড়া হইতেছে না, সহসা "হর্য্যক্ষ যেমতি" Inspirationএর ন্যায় মনে পড়িল। অমনি "ঝেণ্ড-অম্বালিকা" মিটে কড়া নাম মস্তিষ্কে আবির্ভাব। পরে দোকানদারের টিপ্পনীতে ভারত ভূমি মাতিয়া উঠিল। "শ্রীযুক্ত কাঙ্গালিচরণ সোম প্রণীত। গ্রন্থকার একাধারে বঙ্গীয় স্কট্ ও হুগো। অতি উচ্চদরের ছবি! মনোহর ভাব! বিস্ময়কর ব্যাপার! হৃদয়বিদারক ঘটনা! জলন্ত বীরতা! নিবন্ত মৃত্যু!! ভস্মীভূত পিপাসা!!!

বিজ্ঞানের একটু ভজকট অর্থদুর্ব্বোধ নাম হওয়াই সঙ্গত। "বৃহস্পতি-বৈবর্ত্ত-কেন্দ্র-ঝিল্লি। সিদ্ধান্তবিনোদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামনিধি জ্যোতিষ্কক্রম প্রণীত। "ইনি বঙ্গীয় লাপলেস্। গ্রন্থকারের ফলিত জ্যোতিষ যন্ত্রস্থ; ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। একচেটিয়া বিক্রেতা শ্রীকেবলরাম ঘটক। পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা, সুঁড়ীপাড়া।"

"সনাতন ধর্ম্ম বিবৃতি। গোবিন্দভাষ্যানুমোদিত শ্রীমন্ ভগবন্ চিরকুমার নারায়ণ স্বামী প্রণীত। ইনি সাক্ষাৎ শুকদেব গোস্বামী। হিন্দুসন্তান আর্য্যনামধারী মাত্রেরই এপুস্তক গলায় হার করিয়া রাখা উচিত।"

এই একখানি থিয়েটারের হাণ্ডবিল দেখুন (বটীর দ্বারা দর্শান)। ইহাতে লেপের বিশেষ উদাহরণ পাইবেন। "অবাক কারখানা! তাজ্জব ব্যাপার! অপূর্ব্ব পর্ব্ব! বিরাট আনন্দ! সুবিশাল সুখ! অতলস্পর্শ হর্ষ! অস্ত্র! অস্ত্র! অস্ত্র! সটীক মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ! বঙ্গীয় প্যারিক আকন্দজী কর্ত্তৃক নাটকাকারে প্রণীত! ইহাতে রস আছে! কস আছে! শিক্ষা আছে! দীক্ষা আছে! ভিক্ষা নাই! শীঘ্র চলে আসুন! আবালবৃদ্ধবনিতা, বন্ধু, বান্ধব, দেশী, বিদেশী, আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবাসী! এ সুযোগ ছাড়িলে আর বরাতে লাগিবে না! চির নবীন থাকিবে! মনের বাল্যকাল ফিরিয়া পাইবে! সংসার অভিনব দেখিবে! জীবনের বসন্তহিল্লোল নবানুরাগে পুনশ্চ দোদুল্যমান হইবে! প্রবেশ মূল্য চারি আনা মাত্র।"

ফলে লেপের এসকল দৃষ্টান্ত একচেলে খেলা। সহজে বুঝা যায়। ইহাতে বিলক্ষণ সংস্পর্শ দোষ আছে। গ্রন্থকার, প্রকাশক এবং বিক্রেতায় ছোঁয়ালেপা আছে বলিয়া অনেক সময় জানা যায়। যদিও বৃহদ্ কাষ্ঠে দোষ নাই বটে; তথাপি অনেক থিটখিটে পিটপিটে লোকের কাছে প্লেরাইট্, থিয়েটারের ম্যানেজর ও অধ্যক্ষে ছোঁচ পড়িয়া থাকে। তাই বলি লেপের নির্দ্দোষ পবিত্র পদ্ধতি নির্লিপ্ত প্রশংসাপত্র। ইহা অপদার্থকে শিরোমণি করিয়া তুলে। লোক ভ্রান্ত পথিকের মত মরীচিকাভিমুখে বিনা জলে ধাবমান হয়। অথবা পতঙ্গের ন্যায় আঁধার হইতে আলোকে দৌড়িয়া যায়। Out of darkness it createth light. ফলে যদি কখন কেহ নিজ ভ্রম টের পান তখন অনুষ্ঠাতা আর তাঁহার সহায়তা বাঞ্ছা করেন না। তখন তাঁহার কার্য্যকুশল রেলের গাড়ী শুদ্ধ Velocityতেই চলিয়া যায়। লেপের কয়েকটী মনোহর দৃষ্টান্ত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

"মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিস্থানের সাবান দশ বাক্স পাঠাইয়া চিরবাধিত করিবেন। আমি আগে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছিলাম। আপনার আবিষ্কৃত সাবান এক বাক্স ব্যবহার করিয়াই ফুট গৌরবর্ণ হইয়াছি। অধিক কি বলিব, প্রতিবাসিনিগণ হিংসায় দশ বাক্স আনাইয়া দিতে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। দাম অগ্রপশ্চে। ভুলিবেন না; মাথার দিব্য!

শ্রীমতী ইকাইজা ক্যাকবাস ছিটেন।
প্রধান অভিনেত্রী, থিয়েটার রোড,
কলিকাতা।

"SANITARY POWDER"

কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিসনারগণ এবং ডাক্তারী কন্‌গ্রেস্ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

মহাশয়,

আপনার পাউডারের মহা গুণ। বাটীর চারিধারে নজের টিপের বাঁড় ছড়াইয়া দিলে কোন দুর্গন্ধ থাকে না; অর্থাৎ সকল দুর্গন্ধকে ঢাকিয়া সুগন্ধময় করিয়া তুলে। জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ কাছে আসিতে পারে না; কেননা পক্ষির

মধ্যে গ্রেপ্তার হইয়া যায়। আবার যদি দৈবাৎ মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীদের চক্ষে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বসংসার পূত দেখেন; জরিমানা করিবার আদৌ চেষ্টা থাকে না। এক টাকায় আপনার এক প্যাকেট পাউডার খরিদ করিবার পরেই বিনা আবেদনে শতকরা তিন টাকা হারে আমার মিউনিসিপ্যাল টেক্স মকুপ হইয়াছে।

রায় কাণমল্ল বাহাদুর।
এভারলাষ্টিং পাইরোটেক্নক্ হল,
কলিকাতা।"

"ইংরাজী অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিনিবারণং।
ডাক্তার টিনভাই কক্স ডুবুৎ কর্ত্তৃক প্রণীত।
বাইবলের পর ইহার মত পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই।

মহাশয়,

আপনার নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া সাধন দ্বারা আমি নির্ব্বিবাদে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছি। বলা বাহুল্য, যেরূপ স্বাস্থ্য ও শক্তি আছে, তাহাতে আর তিন শত বৎসর নিশ্চয়ই চলিবার সম্ভাবনা। আমার আবার নূতন দাঁত বাহির হইতেছে।

খোদাবক্স আশারাম বাগ্‌লা।
ডিপুটীকণ্ঠাবল, পাঁইবাগ, ফল্‌সপয়েণ্ট।"

"মহাশয়,

আপনার Protein Salve ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়াছি। হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেও মাসাবধি ক্ষুধাতৃষ্ণার নামগন্ধ থাকে না। মূল্যও যৎসামান্য মাত্র। জগতে আর দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না। আপনার এই অলোকসামান্য আবিষ্কার ত্বরায় গবর্মেণ্টের ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কায কি Famine fund?

শ্রীষড়ানন যোগবাশিষ্ট,
সিদ্ধাশ্রম, কেওয়াটা রোড়,
হুগলী।

টিপ।

আজ কাল সভ্যজগৎ মার্কার দাস। মার্কা বই আর কোন কথাই নাই। বিদ্যা বল, ব্যবসা বল, দান বল, ধ্যান বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, সকলেরই মার্কাগত প্রাণ। যে দিকে তাকাও, সব মার্কাময়। বড়ত্বের বা ভালত্বের বোধ হয় মার্কাই মূল। তাই ইংরাজীতে বড় বা ভাল লোককে The man of mark বলে। রাজার মার্কা আছে, আদালতের মার্কা আছে, মিউনিসিপ্যালিটীর মার্কা আছে, পুলীসের মার্কা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা আছে, কাপড়ের মার্কা আছে, সাবানের মার্কা আছে, টাকার মার্কা আছে, চর্ম্মের মার্কা

আছে, মর্দ্দের মার্কা আছে ; এমন কিছুই দেখা যায় না যাহার মার্কা নাই। তাই বলি, কি জড়, কি অজড়, কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেরই অস্তিত্ব এখন মার্কায় আবদ্ধ।

আগে শুদ্ধ সধবারই মার্কা ছিল। ক্রমে টিপ হইতে কালসহকারে উলকী, কাঁচপোকার সিন্দুর প্রভৃতিতে পরিণত হয়। আজ কাল দেখি সকল সামগ্রীই সধবা। এখন নিখিল সংসার নিখিল সংসারের মার্কা বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজার মার্কা ইউনিকরণ, মিউনি-সিপালটীর মার্কা হাড়গিল্লা, পুলীসের মার্কা ল্যাল পাগড়ী, ডেপুটীর মার্কা শামলা, ব্রাহ্মের মার্কা দাড়ি চসমা, সফিষ্টের মার্কা লম্বা চুল, রাজস্বের মার্কা কুম্ভীর, ধনীর মার্কা হাতী, মকর্দ্দমার মার্কা গাধা, ব্রাণ্ডির মার্কা বানর, কুক্কুর, শিয়াল, বিড়াল, ইত্যাদি। এইরূপে কাক চিল, ইঁদুর বাঁদর, কীট পতঙ্গ, প্রভৃতি, সকলই মার্কায় নিঃশেষিত হইল। পরে তরু মেরু, লতাপাতা, ফুল ফল, ছাল চামড়ায় টান পড়িল। শেষে জীবজন্তু হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতায়ও সংকুলান হয় না। মনুষ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা কোথায় তলাইয়া গেল। পরে অনাটন প্রযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইল। কোথাও মাথা, কোথাও মুখ, কোথাও দাড়ি, কোথাও গোঁফ চলিয়া গেল। অনন্তর হাত পা, কেশ বেশ, নাক চোক, নখ দাঁত, প্রভৃতি আর কিছুই বাকি রহিল না। দিন দিন আর্টের বৃদ্ধি, আবিষ্কারেরও বৃদ্ধি ; পরস্পর পরস্পরের মার্কার সহায়। সুতরাং ক্রমে শিশা মার্কা বোতল, বোতল মার্কা পিপা, গেলাস, মার্কা জালা, জালা মার্কা গেলাস, করাত মার্কা খুর, খুর মার্কা করাত, ঝাঁটা মার্কা জুতা, জুতা মার্কা ঝাঁটা, প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারের স্থায় The law of receive and bestow এর মার্কা পাকাইয়া তুলিল। ক্রমে তাহাতেও আর সংকুলান হয় না—এবার নূতন গবেষণা—নূতন পত্তন—নূতন অনুষ্ঠান। যে যার রচনা কৌশলের উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

দুঃখীরাম অনেক পরিশ্রম, বিদ্যা ও বুদ্ধি খরচ করিয়া অমোঘ জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিলেন। মার্কাভাবে প্রচার করিতে না পারিয়া মুমূর্ষুর স্থায় চিন্তিত। যাহা ভাবেন তাহাই রেজিষ্টরি হইয়া গিয়াছে। পরে বিস্তর মাথা কুটিয়া শ্মশানেশ্বরে দৃষ্টি পড়িল, সে সৌম্যমূর্ত্তি অদ্যাবধি কাহারও হস্তগত হয় নাই। এই দেখুন কেমন সুন্দর ট্রেড মার্ক হইয়াছে। যেন অনাথনাথ এতদিনে লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে স্বয়ং শ্মশানভূমি পরি-ত্যাগ করিয়া বোতলের বক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উক্ত ঔষধের বিপর্য্যয় কাটতি দেখিয়া এককড়ি বাবু তাঁহার স্বপ্নধ্যায় জ্বরের ঔষধে নিমতলার ঘাটে ট্রেড মার্কা করিয়া জ্বরো রোগী সব একচেটিয়া করিবার চেষ্টায় সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন বিতরণ করিলেন।

খুদীরাম গ্রন্থকার। দশ বার বৎসর পরিশ্রম করিয়া সটীক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। মনে বড় ভয় পাছে কেহ লুকাইয়া ছাপাইয়া লয়। জগতে প্রতিভা-চোরই বিস্তর, আবিষ্কার আত্মসাৎ না করিতে পারিলেও আবিষ্কার-ফল বেমালুম উপভোগ করে। তিনি তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজ মুখমণ্ডল ট্রেড মার্ক স্বরূপ

পুস্তকের মলাটে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে যশেরও প্রত্যাশা আছে। পাঠকেরা ঘরে বসিয়া চাক্ষুষ জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। আর গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ পরিচয়ে সৌহার্দ্দেরও সম্ভাবনা। গুণজ্যোতির সঙ্গে রূপজ্যোতি ঝলসিলে জগৎ বাঁধিয়া যায়। জোজেফ ক্যাবলা ভুবুৎ কোণে—অপার সংসারের এক কোণে বসিয়া হাস্য করিতেছেন। তিনি দেখিলেন খুদীরামের মুখখানা একে বিকৃত, তাহাতে ছাপার দোষে আরও ভয়ঙ্কর বিকৃত হইয়াছে। তাঁহার তীব্র বুদ্ধিতে তৎক্ষণাৎ পাকা নকলের সন্ধান উপস্থিত। তিনি বাঙ্গালা-পাঁচ-মার্কা "পাঁচখানি টীকায় একখানি গীতা; হিন্দুর বাইবেল; বঙ্গানুবাদ সমেত; মূল্য দুই পয়সা মাত্র; ট্র্যাক্ট সোসাইটিতে প্রাপ্তব্য" বলিয়া যাবতীয় খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বলিতে কি, নকল এত পরিপাটি হইল, যে লোকে তাড়াতাড়ি নকলকে আসল বলিয়া কিনিতে লাগিল, ভয় পাছে নকলে ঠকিতে হয়। সেই দিন অবধি আসল মুখস-মার্কা গীতা অচল হইয়া পড়িল। পরিশেষে নকলের এত কাটতি হইল যে ফিরি-ওয়ালারা দ্বারে দ্বারে "চাই পাঁচমার্কা গীতা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে দিনরাত ফিরিতে লাগিল। অনন্তর আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, রিপুকর্ম্ম প্রভৃতির "পাঁচ-মার্কা গীতা" না রাখিলে আর ব্যবসা চলা ভয়ানক ভার হইয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আসল মুখস্ মার্কায় হাস্য, করুণ, বীভৎসাদি রস মূর্ত্তিমান থাকাতেও কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল।

বোধ হয় আপনাদের আর অধিক প্র্যাক্টিক্যাল ইলাষ্ট্রেসনের আবশ্যক নাই। আপনারা সকলেই এবিষয়ে বিশেষ বিদিত ব্যুৎপন্ন আছেন। বক্তৃতা বহুল ভয়ে আর অধিক উল্লেখও করা গেল না। তবে এই পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে কখন কখন ঘরের পয়সা দিয়া শুদ্ধ মার্কা লইয়া কাঁদিয়া ঘরে ফিরিতে হয়; আবার কখন বা দাম দিয়া বিশুদ্ধ মার্কা কিনিয়া ফেলিয়া দিবার জন্যও কড়ি লাগে।*

ক্রমশঃ

সদারঙের খেয়াল।

সম্পাদকের চিত্রচয়ন।

চূড়ান্ত অভিনিবেশের জাজ্বল্যমান ছবি দেখিতে চাও ত মাসিকপত্রে স্বলিখিত প্রবন্ধপাঠে নিবিষ্টচিত্ত লেখকের প্রতি চাহিয়া দেখিও।

জনৈক সরফরাজ, মিউনিসিপ্যালিটির বেবন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করিয়া একটু মুরুব্বিয়ানা চালে হাসিয়া একজন কমিশনরকে বলিলেন "আমি হলে ত মিউনিসিপ্যালিটির

কমিশনর পদের জন্ত দরখাস্ত না করে বরক পাগলা গারদের অধিবাসী হবার জন্তে দরখাস্ত করুন"।

উপস্থিত কমিশনার বাবু নীরস স্বরে বলিলেন "তাহলেই আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া অধিকতর সম্ভবপর হত।"

গঙ্গারাম বাবু একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন। আহারে বসিবার কিছু পরেই ভারি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই দুর্য্যোগে গঙ্গারাম বাবুকে সে রাত্রি গৃহে ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া বন্ধুবর সেদিন তাঁহার বাটীতেই গঙ্গারামের শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। গঙ্গারাম বাবুও তাহাতে রাজী হইলেন। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন আর কোন ঠিকানা করা গেল না। ঘণ্টা খানেক বাদে আবার ভিজিতে ভিজিতে গঙ্গারামের পুনরাবির্ভাব হইল। বন্ধুবর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে কোথায় গিয়েছিলে!"

"গৃহিণীকে বলিয়া আসিলাম যে আজ বাড়ী যাইব না।"

বালিকা বিদ্যালয়ঃ—প্রোফেসরঃ—"গেলবারে আমি তোমাদের বলিয়াছি যে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের মস্তিষ্ক বৃহত্তর, এখন সুবোধিনি! বল দেখি ইহা হইতে তুমি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে?"

সুবোধিনীঃ—"মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠত্ব তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, তার গুণবত্তার উপর নির্ভর করে"।

অনেক বৎসর আগে সুইজারল্যাণ্ডের কোন নগরে একটী নরহত্যাকারীর ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু সেই রাজ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট জল্লাদ না থাকাতে রাজপুরুষেরা তাহার নিকট-বর্ত্তী রাজ্যের জল্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—একজনকে ফাঁসী দিতে সে কত পারিশ্রমিক চায়। সে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা চাহিল। রাজপুরুষেরা ইহা অত্যন্ত অধিক বিবেচনা করিয়া তাহাকে দুইশত রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাহিলেন। জল্লাদ কোন মতেই স্বীকৃত হইল না। তখন বিচারকেরা একটী সভা ডাকিয়া এই স্থির করিলেন যে "অপরাধীকে একশত টাকা দিয়া তাহাকে এ রাজ্য হইতে বিদায় করা যাক্, তাহার পর উহার যেখানে খুসি সেখানে গিয়া ও ফাঁসি যাউক।"

"হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণ।"

(মন্তব্য)

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় আমার লিখিত হিন্দু জ্যোতিষীগণের বিবরণের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং পৌষ মাসের নব্যভারতে যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয় কালশীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

আমরা বরাবর জানিতাম যে একজন আর্য্যভট্ট আছেন, এবং তিনি যে আর্য্যাষ্টশতিকা ও দশ গীতিকা নামক দুই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাও শ্রুত হইয়াছি। তাঁহার পুস্তক লুপ্ত হইয়াছে, তবে টীকাকার মহাশয়গণ তাঁহার পুস্তক হইতে অনেকগুলি বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করায় আমরা জানিতে পারি যে ঐ ধীশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত ভূমিকে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। আর্য্যভট নামে কোন জ্যোতিষী অর্য্যভটীয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি ঐ গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন।

ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকাবিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ ॥ ১০

এই শ্লোকটী অবিকল আর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা আমরা মৃণ্ময়ী সমালোচনায় অবগত হইয়াছি। আবার আমরা ৺ অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকায় দেখিতেছি যে তিনি উক্ত শ্লোকটী আর্য্যাষ্টশতিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিন স্থানে দৃষ্ট হইল বলিয়া যে ইহা তিন জনের সম্পত্তি ইহা কথনই হইতে পারে না। যদি এ শ্লোকটী আর্য্যাষ্টশতিকার হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে আর্য্যভট্ট ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২১ শকে গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করেন। কিন্তু দৃঢ় প্রমাণ অভাবে এ বিষয়ে আমরা স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। তবে বেণ্টিলি সাহেবের জ্যোতিষিক গণনা অনুসারে ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রহ্মগুপ্ত দ্বারা যথার্থ গণনার বীজ রোপিত হয়; এবং বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত ৯২৮ খৃষ্টাব্দে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহ কর্ত্তৃক ১০০০ খৃষ্টাব্দে, আর্য্যসিদ্ধান্ত ১৩২২ খৃষ্টাব্দে ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। অপর সিদ্ধান্তগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কার্দ্দানি মাত্র।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু নক্ষত্রধ্রুবক দ্বারা সময় নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত বলেন না। কিন্তু আমাদের মতে নক্ষত্রধ্রুবকের ক্রান্তিপাতের সহিত সম্বন্ধ দ্বারাই যথার্থরূপে সময় নিরূপিত

হইতে পারে। পুরাতন সিদ্ধান্ত লিখিত ধ্রুবকগুলি সকলই নিরয়ণ-রূপে লিখিত, অতএব আমরা অয়নাংশ কিছুই পাইতেছি না ; সুতরাং সে গুলির যথার্থ সময় নিরূপণ করাও দুষ্কর। পুরাতন সিদ্ধান্তগুলির রচনার সময় কোনটীতে সত্যযুগের শেষ, কোনটীতে ত্রেতার শেষ, আবার কোনটীতে দ্বাপরের শেষ, বলিয়া লিখিত আছে। ইহা দ্বারা কেবল যে আপন আপন সিদ্ধান্তের অসম্ভব প্রাচীনতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা অত প্রাচীন যে জ্যোতিষ গ্রন্থ আছে ইহা আমাদের বিশ্বাসের বহির্ভূত। বিশেষতঃ যখন এই গ্রন্থগুলিতে কলার যাবনিক সংজ্ঞা "লিপ্ত" লিখিত আছে তখন বোধ হইতেছে উক্ত সকল সিদ্ধান্তগুলিই যবনেশ্বরের পরবর্ত্তী রচনা। কাহারও কাহারও মতে রাশিচক্রের ব্যবহারও মিশর দেশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই ; যেহেতু বেদাঙ্গ জ্যোতিষে রাশিচক্রের কোন বর্ণনা নাই। রামের জন্ম সময়ে বাল্মীকি কর্ত্তৃক ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে আবার মহাভারতেও ইহার বর্ণনা নাই। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকের এই মত যে মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ক্রমশঃ আমরা এতদ্‌বিভাগে অবতরণ করিব।

সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষ গ্রন্থে অয়নাংশ সাধনের যে নিয়ম দেওয়া আছে তাহাতে জানা যায় যে অয়নচক্র ৭২০০ বৎসরে একবার আন্দোলিত হয়। এ আন্দোলন অনেকাংশে ঘড়ীর পেণ্ডুলমের ন্যায়। তবে প্রভেদ এই মাত্র যে ঘড়ীর পেণ্ডুলম এক সেকেণ্ডে একবার আন্দোলিত হয় আর ইহার সেই আন্দোলন শেষ করিতে ৭২০০ বৎসর লাগে, সুতরাং অয়নচক্রের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে, অথবা মধ্যস্থান অর্থাৎ যে স্থানে অয়নাংশ শূন্য রহিয়াছে সে স্থান হইতে একপ্রান্তে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিতেও ইহার ৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। যখন দেখিতেছি যে নিরংশ স্থান অর্থাৎ মেষের আদি হইতে এক প্রান্ত অর্থাৎ ২৭ অংশে গমন করিয়া পুনরায় মেষের আদিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অয়নচক্রের ৩৬০০ অতিবাহিত হয় তখন এই সংখ্যার অনায়াস ভাজ্য বা গুণ পূরক (multiple) যুগসংখ্যাগুলিতে নিরংশ স্থান থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং সিদ্ধান্তকারগণ আপনাপন প্রাচীনতা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ কেন পরিত্যাগ করিতে যাইবেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত শাকল্যসংহিতা বা ব্রহ্মসিদ্ধান্তের এই উদ্ধৃত অংশ "তৎপশ্চাৎ-চলিতং চক্রং" দ্বারা জানা যাইতেছে যে গ্রন্থকারের পূর্ব্বে অয়নচক্র মেষের পশ্চিমে ছিল, অতএব ইনি যে অয়নের নিরংশ সময়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে প্রকার গভীর চিন্তা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দৃষ্ট হয় তাহাতে বেশ বোধ হয় যে ইহার লেখক অনেকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের সাহায্য পাইয়াছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত লিখিত নক্ষত্র ধ্রুবক ঠিক কিনা তাহার প্রমাণ স্বরূপ টীকাকার ব্রহ্মসিদ্ধান্তোক্ত ধ্রুবকগুলিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাছে কেহ মনে করে যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুকরণ করিয়াছেন সে জন্য তিনি ধ্রুবক সাধনের একটি পৃথক নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই—

প্রোচ্যন্তে লিপ্তিকা ভানাং স্বভোগোঽথদশাহতঃ।
ভবন্ত্যতীত ধিষ্ট্যানাং ভোগলিপ্তাযুতাধ্রুবাঃ॥ ৮ম অধ্যায় ১।

ভোগের দশম ভাগ ধরিয়া নক্ষত্রগণের লিপ্ত লিখিত হইল, অতএব পূর্ব্বনক্ষত্রের ভোগ-লিপ্তে তাহা যোগ করিলে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক প্রাপ্ত হইবে। একটি উদাহরণ দিলে এ নিয়মটি সহজ বোধ্য হইবে। আর্দ্রার লিপ্ত সংখ্যায় "অব্দয়ঃ" লিখিত আছে। প্রতি নক্ষত্রের ভোগ ৮০০ লিপ্ত। আর্দ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫টি নক্ষত্র আছে, সুতরাং সেগুলির ভোগ ৪০০০ লিপ্ত হইল। এখন ইহাতে ৪ × ১০ = ৪০ যোগ কর; ৪০৪০ লিপ্ত বা ৬৭ অংশ ২০ কলা হইল, সুতরাং ইহাই আর্দ্রার ধ্রুবক। টীকাকার "অব্দয়" শব্দের অন্য পাঠ "গোঽব্দয়" (৪৯) "গোঽগ্নয়" (৩৯) গুলিকে শাকল্যসংহিতার প্রমাণ মতে অশুদ্ধ বলেন।

"সৌরোক্তরুদ্রভস্যাং শস্ত্রাদ্রিয়োঽগাব্দয়ঃ কলা" ইতি নর্ম্মদোক্তোধ্রুবকঃ দশকলোনপঞ্চদশভাগ মিথুনে ইতি সর্ব্বজনাভিমতো ধ্রুবকঃ দশ কলাযুত ত্রয়োদশভাগাঃ পর্ব্বতাভিমতো ধ্রুবকশ্চ নিরস্তঃ।" টীকাকার এই প্রকার লিখিয়া অন্য টীকাকারগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে যাহা হউক ব্রহ্মসিদ্ধান্তেও আর্দ্রার ধ্রুবক "সত্রিভাগাদ্রিরসা" অর্থাৎ ৬৭°-২০′ লিখিত আছে। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিখিত ধ্রুবকের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত ধ্রুবকের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত লেখক ধ্রুবক-সাধনের নিয়ম দিয়াছেন সুতরাং পাঠকের ঘাড়ে একটি বোঝা চাপাইয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মসিদ্ধান্ত লেখক তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। উভয় গ্রন্থ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে পাঠকবর্গের ইহা সম্যক্ বোধ্য হইবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে চিত্রা হইতে অনুরাধা এই চারিটি নক্ষত্র বুঝাইতে নিম্নলিখিত চরণ দৃষ্ট হয়—

খবেদা সাগরনগা গজাগাসাগর্ত্তবঃ

আবার ব্রহ্মসিদ্ধান্তে হস্তা হইতে বিশাখা এই চারিটি বুঝাইতে এই শ্লোকাংশ লিখিত আছে—

খত্যষ্টিঃ খধৃতি র্গোঽতিধৃতি বিশ্বাশ্বিনস্তথা

অতএব সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ভোগের দশম অংশের গণনায় ধরিলে চিত্রার ৪০, স্বাতির ৭৪, বিশাখার ৭৮ অনুরাধার ৬৪ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অঙ্কপাত দ্বারা ধ্রুবক সাধিত হইলে উক্ত নক্ষত্রগুলির ধ্রুবক ক্রমান্বয়ে ১৮০°, ১৯৯°, ২১৪° ও ২২৪° হয়। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত মতে হস্তাদির ধ্রুবক ১৭০° ১৮০° ১৯৯ ও ২১৪ হয়, সুতরাং উভয় গ্রন্থের মিল পদে পদে রহিয়াছে। ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত মতেও রেবতীর ধ্রুবক ৩৫৯° ৫০′ (ষড়ংশোনাঃ খষড়্‌ গুণাঃ)। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বেশ ধারণা হইয়াছে যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী রচনা। ইহা কখনই অমরের

নিরংশ সময়ে লিখিত হয় নাই। ইহা বরাহ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া বোধ হয়। উজ্জয়িনীর জ্যোতিষীগণ যে তাঁহার ৪২১ শকাব্দ জন্মাব্দ দিয়াছেন তাহা এক্ষণে যথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তিনি যে প্রকার বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লিখন প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া তাঁহার সময় হইতেই অয়নাংশ গণনা করা হইতেছে। এই জন্যই আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে গণিত অয়নাংশ বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ২১ অংশ দেখিতে পাই, কিন্তু বাস্তবিক ইউরোপীয় মতে তাহা প্রায় ২২ অংশ ২১ কলা। সূর্য্যসিদ্ধান্তে অয়নাংশ সাধন করিবার যে নিয়ম তাহার সাধারণ অর্থ ছাড়িয়া দিয়া আমি কু-অর্থ করিয়াছি, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন। মূলে যে প্রকার আছে আমি সেই প্রকার অর্থ করিয়াছি। অঙ্কপাত দ্বারা স্বীয় অর্থ বিস্তারিত করিয়া দেখাইতেছি। মনে করুন ১৮১৬ শকের অয়নাংশ জানিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ৩৬০০ কল্যাব্দে বা ৪২১ শকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে অয়নাংশ শূন্য ছিল—অতএব

$$\frac{(১৮১৬-৪২১)\times৬০০\times৩৬০\times৩}{৪৩২০০০০\quad\times১০} = \text{অয়নাংশ (বর্ত্তমান বৎসরের)}$$

$$\frac{৪১৮৫}{২০০} = \text{২০ অংশ ৫৫ কলা ৩০ বিকলা।}$$

"ভূদিন"টি দিনে না রাখিয়া বৎসরেই রাখা হইয়াছে, যেহেতু উহাতে "গুণে"র বৃথা কষ্টভোগ করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষীগণের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি তারার ধ্রুবকাংশাদির একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সকল জ্যোতিষীরই গ্রন্থে যখন ধ্রুবকাদি প্রায় তুল্য রহিয়াছে অথচ তাঁহাদের সময়ের পরস্পর বহুকাল অন্তর আছে তখন নক্ষত্র ধ্রুবক দ্বারা সময় নিরূপণ করিতে যাওয়া এক প্রকার নিষ্ফল হইয়াছে। নক্ষত্রগুলি স্থির রহিয়াছে ইহাতে দ্বিরুক্তি নাই, তবে ক্রান্তিপাত বিন্দুরই অগ্রসরণ হইতেছে; তাহাতেই ঋতুরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং ক্রান্তিপাত সম্বন্ধে যে স্থানে চিত্রা ও রেবতী ছিল এবং অয়ন সম্বন্ধে যে স্থানে "পুনর্বসু"র পাদত্রয় ছিল বা কর্কটের আদি ছিল; বর্ত্তমান সময়ে সে স্থানে তাহা না হইয়া প্রায় ২২ অংশ ২১ কলা পূর্ব্বে হইতেছে—অর্থাৎ ক্রান্তিপাত ও অয়ন সম্বন্ধে নক্ষত্রগুলি বিচলিত হইয়াছে, সুতরাং সহজ দৃষ্টে ইহাই বোধ হইবে যে নক্ষত্রগুলি অগ্রসর হইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে যখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভাস্বতী ও গ্রহলাঘব অয়নাংশ শূন্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় দিয়াছেন তখন বরাহমিহিরের সময়েরও বিভিন্নতা হইতেছে। কিন্তু তিনি একস্থানে (ভারতী ৪৬২ পৃঃ) ইহাও লিখিয়াছেন যে "জ্যোতিষীগণের নিয়মই এই যে তাঁহারা গ্রন্থ রচনাকালে অন্ততঃ ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের কোন সময়কে করণাব্দ করিয়া থাকেন। গণনায় অপর কাহারও সুবিধা হউক বা না হউক স্বয়ং অহর্গণাদি সাধন করিতে হইলেই

এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ঘটে।" সুতরাং রায় মহাশয়ের নিজের কথা মতেই প্রতিপন্ন হইল অয়নাংশ শূন্যের অথবা বরাহমিহিরের এক বই দুই সময় হইতে পারে না। ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডখাদের আমরাজ-কৃত টীকায় লিখিত আছে যে "নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবংগতঃ"—অর্থাৎ ৫০৯ শকে বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়। অতএব উজ্জয়িনীর জ্যোতিষীগণ যে তাঁহার ৪২১ বা ২৭ শক জন্মাব্দ বলিয়াছেন তাহা অযথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। তবে অয়নের শূন্যাংশতা যে ২০৬ শকে ঘটিয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই, সুতরাং বরাহের সময় অয়নাংশ ৩ ও ব্রহ্মগুপ্তের সময় তাহা প্রায় ৪ ছিল। তাঁহারা সকলেই নিরয়ণ রাশির গণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং আমরাও তাহাই করিতেছি। ইহাতে আমাদের লাভ বই অনিষ্ট নাই। আমাদের অয়নাংশগুলি সঞ্চিত হইতেছে এবং প্রাচীন গণনাগুলির সময় অবধারণ করিতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। ইহার নিদর্শন রামায়ণ ও মহাভারত হইতে প্রদর্শন করিব। ইংরাজদের বৎসর কতক পরিমাণে সায়ণ মতে গণিত হয়, এই জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট মাসের প্রায় এক সময়েই ক্রান্তিপাত ও অয়ন হইয়া থাকে। জুলিয়ান বৎসর ও সৌর বৎসরের অল্প অন্তর প্রযুক্ত ১৫০০ বৎসরে সূক্ষ্ম গণনার সহিত প্রায় ১০।১২ দিনের অন্তর দাঁড়াইয়া যায়, এই জন্য মহাত্মা যীশুখৃষ্টের জন্মোৎ-সব জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী নিউটন সাহেবের কৃপায় ইউরোপ অবগত হইয়াছে যে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট উত্তরায়ণ আরম্ভে বা ২৫শে ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং সে অবধিই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যথার্থ দিনে জন্মোৎসব করিতে শিখিয়াছেন। অয়নাংশের অপ্রচলনই যে এ প্রকার গোলযোগের প্রধান কারণ তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় আর একটি সন্দেহ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশ বিষয়ক শ্লোকদ্বয় প্রক্ষিপ্ত, এবং অনুমান করেন যে প্রাচীন কোন সিদ্ধান্তই অবিকৃত ভাবে দৃষ্ট হয় না; আর যাহা দৃষ্ট হয় সেগুলি প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের নূতন সংস্করণ মাত্র। তিনি যে বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন তাহা ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, তবে তিনি "কৃত্যো" শব্দের স্থানে "কৃত্বা" এই পাঠ দেখিয়া সে বচনের ৩০০০০ অর্থ করিয়াছেন। রঙ্গনাথ দ্বিতীয় পাঠটী অযুক্ত বলিয়া-ছেন যেহেতু ইহা দ্বারা অয়নের রাশিচক্র ভ্রমণ স্বীকার করিতে হয়। পাঠান্তর প্রযুক্ত যদি রায় মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলেন তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়, যেহেতু এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সিদ্ধান্তে যে ঐ টুকু উল্লিখিত হইবে না ইহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বিশ্বাস হয় না। প্রাচীন জ্যোতিষীগণ সম্যক্ আদৃত হইবার জন্য সিদ্ধান্তগুলিতে মুনি ঋষির নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু আধুনিক জ্যোতিষীগণ বোধ করি সে প্রকার যত্ন পান নাই। যিনিই তাহা করিতে গিয়াছেন তাঁহার সে আয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা "জ্যোতির্বিদাভরণ"-এর নাম উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের লিখিত অন্য বিষয় রায় মহাশয় কোলব্রুক সাহেবের Essay on Hindu Astronomy-তে দেখিতে পাইবেন।

পুরাণগুলি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত এ প্রকার প্রবাদ আছে বটে; কিন্তু পুরাণগুলিতে পরস্পর বিরোধী অনেকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকায় বোধ হইতেছে সেগুলি কখনই এক মস্তিকের উদ্ভাবনা নহে। আমাদের মতে ব্যাস অর্থে বহুদর্শী বিদ্বান ব্যক্তি স্বীকার করিলে সকল গোলযোগের অবসান হয়। ভবিষ্যৎবাণীস্বরূপ রাজগণের রাজত্বকাল যখন দ্বাপরের শেষ হইতে ৪১৪১ (ভ্রম ক্রমে ৪১৪৪ হইয়াছিল) বৎসর লিখিত হইয়াছে তখন লেখক যে উক্ত কালের পরভুবিক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ দেখা যায় নাই। তবে ৯৫৩ শকের পূর্ব্বে যে পুরাণগুলি ছিল না তাহা আমরা বলি না, যেহেতু অমরকোষে পুরাণ কথার উল্লেখ আছে। আবার বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। ভগবান্ পাণিণি "পুরাণ" বিষয়ে একটি ব্যাকরণ সূত্র দিয়াছেন। তাহাদ্বারাও পুরাণ কথার প্রাচীনতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীকানাইলাল ঘোষাল।

ব্যাসগুহা।

৩০ যে শনিবার—মন্দির মেরামতের জন্য পাঁচটাকা দান ক'রে এবং সেই দানের কথা ইংরাজী অক্ষরে নাম সহি দ্বারা খাতাভুক্ত ক'রে, বদরীনাথের প্রধান পাণ্ডা—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধির নিকট হতে বিদায় গ্রহণ কল্লুম। সে সময় মনে একটা বড় আক্ষেপ জেগে উঠেছিল, কোথায় সেই জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অবতার, মহাপণ্ডিত, নরদেবতা শঙ্করাচার্য্য; আর কোথায় ঘোর সংসারী, বিষয়াসক্ত, পাণ্ডিত্যবিহীন, ব্যসননিরত এই সর্দ্দার পাণ্ডা। মহান হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতা হতেও সমুচ্চ মহত্ব ও জ্ঞান একদিকে, আর একদিকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা হতেও ক্ষুদ্রতর এই পাণ্ডাপুত্রটির আত্মাভিমান এবং ক্ষমতাগর্ব্ব; এ দুয়ের মধ্যে তুলনা হয় না, কিন্তু তবু উভয়ের অবস্থান তুলনায় উপযোগী। বাস্তবিক যাঁর উৎসাহ ও তেজে পৃথিবীপ্লাবিত কর্ম্মময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হতে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে বদ্ধপরিকর হয়ে যিনি সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে গেছেন, এবং সকলের অশান্ত আকুল-হৃদয় গভীর আশাভরে যাঁর উপর নির্ভর ক'রে শান্তিলাভ করেছিল, সেই শঙ্কর ও তাঁর এই পাণ্ডা, এ উভয়ে যে একজাতীয় জীব, তা বিশ্বাসই হয় না। শঙ্করাচার্য্যের দুর্ভাগ্য—এরা সকলে তাঁর আসন কলঙ্কিত করছে। এই পাণ্ডার সম্বন্ধে পরে যে সকল কথা শুনেছি, তা আর কাগজে কলমে লেখা যায় না; এমনি বীভৎস আচরণ। তীর্থস্থানের অধিনায়কগণের কথা অনেকেই শুনেছেন; দেবতার মন্দিরে উৎসর্গীকৃত অর্থ কিরূপে অবথা ব্যয়িত হয় তার নূতন যুক্তি প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। তারকেশ্বরে

আজও কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে অকারণে রাশি রাশি অর্থ জলস্রোতের মত ভেসে যাচ্ছে। দুঃখপাপতাপক্লিষ্ট শত শত নরনারী তাহাদের বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের দুই একটি পয়সা বাঁচিয়ে তাই নিয়ে তীর্থদর্শন কর্ত্তে যায়, দেবচরণে সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে; আর মঠের অধিকারী মহাশয়েরা বিলাস-লালসা তৃপ্তির জন্যে সে অর্থ ব্যয় করে।

বাইরে এসে দেখি স্বামীজি ও অচ্যুত বাবাজি আমার জন্যে অপেক্ষা কুরছেন; এইবার আমাদের মধ্যে প্রথম কথা উঠ্‌লো "এখন কোথায় যাওয়া যায়?" বাস্তবিকই এবার আমাদের নিরুদ্দেশ-যাত্রা। যেখানে ও যে পথে লোক যায়, এতদিনে আমরা তা শেষ কল্লুম; এইবার হতে এক নূতন পথে যেতে হবে, সে পথে কখন লোকে চলে না, এবং তীর্থযাত্রীর দলও সে পথে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এই নূতন পথ দিয়ে আমাদের ব্যাসগুহা দেখ্‌তে যেতে হবে। এই নূতন পথে চল্‌তে একজন পাণ্ডার সাহায্য লওয়া ভাল স্থির ক'রে একবার লছমীনারায়ণ পাণ্ডার খোঁজ করা গেল। সে পূর্ব্বদিন রাত্রেই বদরিকাশ্রমে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে; লছমীনারায়ণ দেবপ্রয়াগে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই নারায়ণ মন্দিরে এসে পৌছবে, কিন্তু এত শীঘ্র আস্‌বে তা একদিনও আমাদের মনে হয় নি, তার এত তাড়াতাড়ি আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পাল্লুম, নারায়ণ দর্শন করবার জন্যে যে ব্যাকুল হয়ে সে এখানে এসেছে তা নয়, কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় তার একজন সম্ভ্রান্ত যজমান তাঁর কাছে বিলক্ষণ দশটাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা, কিন্তু "রামনাথকি চাচীর" দ্বারা সে কাজটা যথাবিহিত সম্পন্ন হবে, লছমীনারায়ণের সে আশা ছিল না, তাই সে প্রাণপণে হেঁটে এসেছে। জ্যোতিষী মহাশয় সেই রাত্রেই বদরীনাথ পৌছিয়েছেন; আমরা তাঁকে পাণ্ডুকেশ্বর রেখে এসেছিলুম, তার পর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আসছি, তিনি বাহকস্কন্ধে নির্ভাবনায় আসছিলেন; সুতরাং আমাদের আগেই তাঁর এখানে পৌছবার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

আমাদের সঙ্গে ব্যাসগুহা পর্য্যন্ত যাবার জন্য লছমীনারায়ণকে বলা গেল; কিন্তু এ প্রস্তাবে সে অস্বীকার কল্লে, বল্লে, তার অনেক যাত্রী রাত্রে এসেছে, পরদিন সকালেও অনেকে এসে পৌছবে, এরকম অবস্থায় তাদের নারায়ণ দর্শনের বন্দোবস্ত না ক'রে আমাদের সঙ্গে কি রকম ক'রে অতদূর যায়! এ ছাড়া ব্যাসগুহার পথও তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এবং এ পর্য্যন্ত কোন যাত্রী সে পথে অগ্রসর হয় নি, বিশেষ সে একটা তীর্থ বলেই গণ্য নয়। তার কথায় মনটা কেমন দমে গেল। কিন্তু এখান হতে ফিরে যাওয়া হচ্ছে না, আর খানিকটা যেতেই হবে, সুতরাং এ পথেই যাওয়া ভাল; স্বামীজি ও আমি এই রকম সিদ্ধান্ত করে ফেল্লুম। বৈদান্তিক ভায়ার সাংসারিক আকর্ষণ কিছু ছিল ব'লে বোধ হয় না, কিন্তু আর এ পথে অগ্রসর হতে তিনি বিষম নারাজ; আমার ও স্বামীজির মতলব শুনে ভারি চটে উঠলেন, বল্লেন, পাণ্ডারা যে পথ চেনে না, তীর্থযাত্রীরা যে স্থানকে তীর্থের

হিসাবে নগণ্য মনে করে, সেখানে এত কষ্ট করে দৌড়নর কি দরকার, শরীরকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে তার ত অনেক উপায় আছে। আমি তাহার উপর রাগ করে বল্লুম "তুমি বৃথা তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতকাল অতিবাহিত কল্লে, শুধু যাত্রী-নির্দিষ্ট তীর্থে ঘুরে মন্দির এবং ঠাকুর দেখেই কি তুমি তোমার জীবনকে ধন্য এবং হৃদয়কে পরিতৃপ্ত বোধ কর? এই হিমালয়ের মহান গম্ভীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ের মধ্যে কি এমন কোন তীর্থ নেই যাত্রীদের দেবতা এবং দেবমন্দির যাকে পবিত্র ও বিখ্যাত না কল্লেও প্রকৃতির বিচিত্র শোভা এবং শান্তির কোমলউৎসে তা সমলঙ্কৃত?" বক্তৃতাদ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ বাধ্য করা যেত, সুতরাং অবিলম্বেই তিনি তাঁর আপত্তি ত্যাগ কল্লেন।

আমাদের যখন এই রকম তর্ক বিতর্ক চলছিল সেই সময় সেখানে দু-চারজন প্রৌঢ় পাণ্ডা উপস্থিত ছিল, আমরা ব্যাসগুহা দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছি শুনে তারা সকলেই ভারি বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে সেখানে যাবার কোন রকম বন্দোবস্ত নেই, অলকনন্দা পার হতে হবে, কিন্তু কোথাও সাঁকো নেই, নদী জ'মে শক্ত হয়ে গিয়েছে তারই উপরদিয়ে অতি সন্তর্পণে কোন রকমে পার হতে হবে, হঠাৎ একটা চাপ ব'সে গিয়ে সব শুদ্ধ ডুবে যাওয়ার কিছুমাত্র আটক নেই! একজন পাণ্ডা বল্লে কিছুদিন আগে একজন অলকনন্দা পার হতে গিয়ে বরফ ভেঙ্গে ডুবে গিয়েছিল, অতএব সেখানে যখন দেখবার যোগ্য কিছু নেই তখন এত কষ্ট করে যাবার কি এত আবশ্যক? আমরা কিন্তু এ যুক্তিতে কর্ণপাত কল্লুম না; এবং বলা বাহুল্য এই রকম যুক্তি অনুসারে চল্লে আর এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবার সম্ভাবনা থাকতো না।

বরাবর এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে আসা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ করতে আসে তারা শুধু দেবমন্দির ও দেবতা ছাড়া আর কিছুতে মনোনিবেশ করে না, হয়তো তারা সেটা বাহুল্য জ্ঞান করে, না হয় একমনে একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্তাতেই তারা তন্ময় হয়ে থাকে, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্তে পথ চলে, যে চতুর্দ্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপের অবসর পায় না; এ পর্য্যন্ত কত তীর্থ-যাত্রীর সঙ্গে দেখা হল, তারা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য, চতুর্দ্দিকের অভিনব দৃশ্যরাজির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না।

যাহোক আপাততঃ ব্যাসগুহার উদ্দেশেই রওনা হওয়া গেল।

বদরিকাশ্রম ত্যাগ ক'রে চল্‌তে আরম্ভ কল্লুম; তিনটি প্রাণী পূর্ব্ববৎ চলছি বটে কিন্তু পথ অনির্দিষ্ট, অধিকতর দুর্গম এবং একান্ত নির্জ্জন। চল্‌তে চল্‌তে কচিৎ যদি কোন সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয় ত পথের কথা জিজ্ঞাসা কল্লে একটু অবাক্‌ হয়ে আমাদের দিকে তারা চেয়ে থাকে, তার পর বলে "ইস্‌তরফ কৈ যারণা গড় হোগা মালুম নেহি," সুতরাং অন্য লোকের কাছে পথের সন্ধান জানবার আশায় বিদায় হয়ে আমরা নির্দ্দিষ্টতার প্রকৃত কতকটা সন্দিগ্ধচিত্তে অলকনন্দার ধারে ধারে চল্‌তে লাগলুম। আগে সামনে সেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী

তুষারাচ্ছন্ন, বন্ধুর, তরুতৃণহীন পর্ব্বতের আর অন্ত নেই; মধ্যে শুধু সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম অধিত্যকা ভেদ করে অলকনন্দা অস্ফুটশব্দে ছুটে চলেছে এবং তার কম্পিত জলপ্রবাহ কঠিন প্রস্তর ভিত্তিতে এসে ধীরে ধীরে আঘাত করচে। ক্রমে বরফের স্তূপ আবার দৃশ্যমান হয়ে পড়লো অলকনন্দার জলধারা অদৃশ্য হয়ে এলো, অবশেষে বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কঠিন জমাট বরফ রাশিতে নদীগর্ত্ত সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা তুষারাচ্ছন্ন নদীতীরে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিকে শুধু বরফ ধূ ধূ করছে, নিম্নে ঊর্দ্ধে যেদিকে চাই কেবল বরফ, পথের চিহ্ন নেই, নদীর চিহ্ন নেই, গন্তব্য স্থান কোনদিকে ঠিক নেই, এমন কি দিক্‌নির্ণয়ের পর্য্যন্ত উপায় নেই, আমরা তিনজনেই দিকভ্রান্ত হয়ে বরফ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম। যেদিক হতে আমরা এসেছি সেদিক ঠিক আছে—এখনও ফিরে যেতে পারি। অনির্দ্দিষ্ট বিপদের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আর একবার ভেবে দেখলুম, তার পর ভগবানের নাম স্মরণ করে নদী পার হওয়াই স্থির কল্লুম।

ব্যাসগুহা যে কোথায় তা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নি। স্বামীজির বিশ্বাস আমাদের সম্মুখের পর্ব্বতের গায়েই নিশ্চয় ব্যাসগুহা দেখতে পাওয়া যাবে। স্বামীজির অনুমানের উপর নির্ভর করেই আমরা নদী পার হতে প্রবৃত্ত হলুম। এখানে নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ; আগেই বলেছি নদীর উপর কোন সাঁকো নেই তার উপর কোন স্থানে বরফ কি অবস্থায় আছে তা নির্ণয় করা দুরূহ, আমরা যে বরফরাশির উপর দাঁড়িয়ে আছি তার নীচেই যে নদী নেই তারই বা ঠিক কি? অতএব আর বেশী চিন্তা না ক'রে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলুম। বৈদান্তিক তাঁর দীর্ঘ পার্ব্বত্য যষ্টি হস্তে পথ প্রদর্শক হলেন, এক এক পা অগ্রসর হন আর সেই যষ্টিগাছটি বরফে বসিয়ে দিয়ে জমাট বরফের পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন; আমিও বৈদান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে প্রস্তুত হলুম কিন্তু স্বামীজি আমাকে ভারি ধমক দিয়ে পিছে হটিয়ে দিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে অনুমতি কল্লেন; আরো বল্লেন যদি আমি তাঁর কথার অবাধ্য হই তবে তিনি তখনই সেখান হতে ফিরে যাবেন, আমার মত উচ্ছৃঙ্খলমতি বালকের সঙ্গে তাঁর চলা পুষিয়ে উঠবে না। আমি হাস্যমুখে তাঁকে নির্ভয় হতে বল্লুম, কিন্তু তিনি পুনশ্চ ভয় দেখিয়ে বল্লেন, হঠাৎ আমার পা-দুটো আমার অজ্ঞাতসারেই বরফের মধ্যে পুঁতে যেতে পারে তখন আমাকে টেনে তোলা তাঁদের দুজনের সাধ্যায়ত্ত হবে না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম; বুঝলুম স্বাধীনতা না থাকলে স্বর্গেও সুখ নেই, কিন্তু স্বামীজির স্নেহ কোমল ভর্ৎসনায় মনে অধীনতার সন্তাপ স্থান পায় না।

সেই তুষারাচ্ছন্ন নদীর পরিসর কতখানি তা জানা নেই সুতরাং আমাদের সকলকে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ কর্‌তে হলো। অনেকক্ষণ হতে চলছি, এতক্ষণ হয়তো নদী পার হয়ে পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তরের উপর দিয়ে চলছি, কিন্তু তবু সতর্ক হয়ে যেতে হচ্ছে। আমি

লক্ষ্য করে দেখলুম, বৈদান্তিক এবং স্বামীজি দুজনেই বেশ সচ্ছন্দভাবে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের আকার প্রকার এবং গতিতে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা নেই আমার মনে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল। সংসারের বন্ধন কাটিয়েছি, সন্ন্যাস অবলম্বন করা গেছে, পৃথিবীতে সুখ নেই, এবং বেঁচে থাকবার যে কিছু প্রলোভন তাও দূর হয়েছে, কিন্তু তবু জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারিনি। যার কোন কাজ নেই সেও জীবনটাকে মূল্যবান মনে করে। জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ ব'লে মুখে কতই আস্ফালন করি না কেন, যখন বিপদের মেঘ চারিদিকে ঘন হয়ে আসে এবং সংসারের উন্মত্ত তরঙ্গ ফেণিল হয়ে উঠে, তখন আমরা নিরাশ্রয় হাতদুটি কৃতাঞ্জলী বদ্ধ ক'রে ভগবানের করুণা প্রার্থনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা শুধু কাপুরুষ নই ভগবানের চির-মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর কর্ত্তেও আমরা অশক্ত; আমরা দুর্ব্বল এবং বিশ্বাসহীন।

অনেকক্ষণ পরে একটা চড়াইয়ের উপর উঠা গেল, তখন নির্ভয় হলুম, কারণ সেটা আর নদীগর্ত্ত হ'তে পারে না। পাহাড়ের উপর উঠে অনেক অনুসন্ধানেও ব্যাসগুহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম কিন্তু কোথাও গুহার নাম নেই, ছোট ছোট দু-একটা গুহা থাকলেও তা বরফে ঢাকা। পাহাড়ের পর পাহাড়, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ এই রকম বহুদূর চলে গেছে; অনেক অনুসন্ধানের পর একটা উঁচু যায়গা দেখা গেল, পাহাড়ের অনেকখানি যায়গা ঘুরে বহুকষ্টে সেই উঁচু যায়গাটাতে উঠলুম। স্বামীজি শুনেছিলেন বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্যে ব্যাসগুহার সম্মুখে কিছুমাত্র বরফ নেই, সে যায়গাটা শৈবালদলে সমাচ্ছন্ন। এই স্থানে উপস্থিত হবামাত্র সেই দৃশ্য আমাদের চোখে প'ড়ে গেল, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পাল্লুম এ যায়গাটাই ব্যাসগুহার সম্মুখভাগ। এত ভয় উদ্বেগ এবং পরিশ্রমের পর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আবিষ্কৃত হলো দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ কল্লুম। বাঙ্গালীর ছেলে লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লীর মত কখন বিপদসঙ্কুল অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিনি এবং জীবনে সে আশাও নেই, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অন্ধভাবে রাস্তা হাতড়ে ব্যাসগুহায় উপস্থিত হওয়াতে আমার মনে ভারি অহঙ্কারের সঞ্চার হলো, মনে কর্ত্তে লাগলুম দায়ে পড়লে আমরাও লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলির মত এক একটা বৃহৎ কাজ করে ফেলতে পারি; সমস্ত বিশ্বসংসারের লোক তখন বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে এই বঙ্গবীরের দিকে চেয়ে কি ভাবে তা কল্পনা কর্ত্তে বেশ আরাম বোধ হ'ল এবং অনেকখানি আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল।

ব্যাসগুহার সম্মুখের সেই প্রাঙ্গনটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা ছোট অনাবৃত উঠানের মত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানে বিন্দুমাত্র বরফ নেই, অথচ আশে পাশে স্তূপাকার বরফ; সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের কোন মায়া মন্ত্র বলে চিরদিনের জন্য এখান হতে বরফ-রাশি তিরোহিত হয়েছে তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগম্য; আমরা অবাক্‌ হয়ে তার কারণ খুঁজতে লাগলুম কিন্তু কোন কারণই নির্দেশ কর্ত্তে পাল্লুম না। এই বরফহীন

গুহা-প্রাঙ্গণটি যে কেবল কালোপাথর মাত্র তাও নয়, পাথরের উপর ক্রমাগত জল পড়লে যেমন এক রকম সবুজ পাতলা শেওলা জন্মে, এখানেও তেমনি শেওলা জন্মিয়ে আছে; কিন্তু এই শৈবালদল পাতলা নয়, গালিচার আসনের মত পুরু, তার রং বড়ই চক্ষুতৃপ্তিকর, বিশেষতঃ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত সেই আসনখানিকে আরও সুন্দর এবং প্রীতিকর ক'রে তুলেছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেই মনোহর আসনখানির দিকে চেয়ে রইলুম। সেই পুরু শৈবালরাশির উপরে খুব ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে রয়েছে, তাতে আসনখানিকে মণি মুক্তাখচিত ব'লে বোধ হচ্ছে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আর কখন দেখেছি ব'লে মনে হলো না, এরকম জিনিষ আমার কাছে এই নূতন, আমার সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত থাকলে হয়ত এই বরফরাজ্যে এরকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ অবগত হবার জন্যে চেষ্টা করতেন এবং হয় ত কৃতকার্য্যও হতে পারতেন। কিন্তু আমরা কেহই বৈজ্ঞানিক নই, কোন একটা সুন্দর জিনিষ দেখলে তাকে বিশ্লেষণ না ক'রে তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেই কেবল আমরা আনন্দিত হই। জ্যোৎস্নাপুলকিত শুভ্র শারদ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে ক্ষুদ্র শিশু হতে প্রেমিক কবি পর্য্যন্ত সকলেই সুখ এবং তৃপ্তি অনুভব করে; চন্দ্র কি বস্তু, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পর্য্যবেক্ষণ কল্লে তার মধ্যে কতগুলি পর্ব্বত সাগর, এবং মরুভূমি আবিষ্কার করা যায়, তা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু তাঁর এই গবেষণাজনিত আনন্দ শিশু ও কবির আনন্দ অপেক্ষা অধিক কি না তা কে বলবে? এদানী বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করচেন যে মঙ্গলগ্রহে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণী জীবের বাস আছে, সেই সকল অপার্থিব প্রাণী ক্রমাগত লাল আলো দেখিয়ে আমাদের পৃথিবীর মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা করচে; আর একজন কবি হয় ত সেই মঙ্গল গ্রহকে অনন্ত গগনোদ্যানের একটি লোহিত কুসুম ব'লে বিশ্বাস ক'রেই সন্তুষ্ট। হয়ত এ ভ্রম—কিন্তু কত সময় আমরা ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকি; আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাটাই কি ভ্রম! কিন্তু এ ভ্রম বিদূরিত করবার জন্য আমরা কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, বরং যখন একটা ভ্রম দূর হয়ে যায়, আমরা স্বপ্ন হতে হঠাৎ জেগে উঠি এবং কঠোর সত্যের অতি পরিস্ফুট কঠিন শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হই, তখন শান্তির আশায় আর একটা অভিনব ভ্রমের কুহক রচনার জন্য আমাদের প্রাণ আকুল হয়ে হঠে।

যাহোক এ দার্শনিক তত্ত্ব এখন থাক। ব্যাসদেবের আসন দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে এতখানি দার্শনিক ভাব গজিয়ে তোলা অনেকের নিকটই বাহুল্য বোধ হবে। আসন দর্শন ত্যাগ করে আমরা তিনজনেই গুহার মধ্যে প্রবেশ কল্লুম। ব্যাসগুহার নাম শুনে ভেবেছিলুম এ বুঝি একটা ছোট গুহা, তার মধ্যে ব্যাসদেব এবং বড় জোর তাঁর লোটা কম্বল ধরতে পারে, কিন্তু গুহায় প্রবেশ ক'রে দেখতে পেলুম সে এক প্রকাণ্ড গহ্বর, তার মধ্যে এক-শ দেড়-শ লোক অনায়াসে বসতে পারে, তার মধ্যে বিস্তীর্ণ দেওয়াল, তাতে যুগান্তরের

কালী ও ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে। ব্যাসদেবের গুহা, কাজেই এখানে যাগ যজ্ঞের অভাব ছিল না, এ হয়ত তারই ধোঁয়ার চিহ্ন। আমি কল্পনাচক্ষে মহাভারতীয় যুগের হোম যজ্ঞসমাকীর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ আশ্রম, একটি শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনের চিত্র দেখতে পেলুম। শুনেছি থিয়োজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন এক একটা যায়গার বৈদ্যুতিক হাওয়া খুব ভাল, সেই সেই যায়গা হিন্দুদের তীর্থস্থান। এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানি নে এবং এ যায়গাটা যদিও তীর্থের লিষ্ট হতে নিজের নাম খারিজ করেছে, তবু যে শান্তি পবিত্রতা ও স্বর্গীয়ভাব এই গিরি-অন্তরালে সংগুপ্ত আছে, অনেক তীর্থে তা একান্ত দুর্লভ। আমরা গুহার মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম, পৌরাণিক স্মৃতির তরঙ্গ আমাদের প্লাবিত করতে লাগলো। এমন স্থানে এসে কি গান না ক'রে থাকা যায়? স্বামীজি আমাকে গান করতে অনুরোধ কল্লেন, এবং নিজেই আরম্ভ কল্লেন :—

"মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহারই প্রেমসুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।"

পথশ্রমের এই দারুণ ক্লান্তির পর ভাঙ্গা গলাতে গুহা প্রতিধ্বনিত ক'রে এই গানটি বার বার গাওয়া গেল; এমন মিষ্টি লাগলো যে নিজেরাই মোহিত হয়ে পড়লুম। যাঁরা ভাল গায়ক তাঁরা এখানে গান আরম্ভ কল্লে বুঝি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যায়! আমি দুই এক পালটা গেয়ে ছেড়ে দিতে চাই স্বামীজি আবার আর একটা আরম্ভ করেন, আমাকে আবার গাইতে হয়, তাঁর ক্ষুধা যেন আর মেটে না, শেষটা তাঁকে দেখে বোধ হ'ল তাঁর যেন "সুধা-পান অভিলাষ অভিলাষই থেকে গেল।"

আমরা এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলুম। বেলা ১ টা বেজে গেল, আর বেশী দেরী করলে পথে কোন বিপদে পড়তে হবে মনে করে আবার উঠে পড়লুম। তবু কি সেখান হতে উঠতে ইচ্ছে করে? আর এখানে আসবো সে আশা নেই, ভেবে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে স্থান হতে বিদায় নিলুম; এমন কতস্থান হতে বিদায় নিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব এই আশাতেই এমন সকল স্থানের প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি, নতুবা হয়তো চিরজীবন এই রকম পুণ্যকুঞ্জের কাছে পড়ে থাকতুম।

গুহাত্যাগ করে তিন জনে নদী তীরে এলুম। যে রাস্তা দিয়ে নদী পার হয়েছিলুম তার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, সুতরাং আবার পূর্ব্ববৎ সন্তর্পণে নদী পার হতে হলো, কিন্তু নদী পার হয়ে দেখি আমাদের পথ ভুল হয়ে গেছে, তখন ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজতে লাগলুম, এবং তিনমাইলের যায়গায় সাত মাইল ঘুরে বেলা তিনটের পর বদরিকাশ্রমে পুনঃ প্রবেশ কল্লুম। আমাদের বিলম্ব দেখে পাণ্ডা বাবাজিরা আমাদের নামে খরচ লিখে রেখেছিল, আমাদের সশরীরে এবং সুস্থ ভাবে ফিরতে দেখে তারা খুব খুসী হলো এবং আমরা কি দেখলুম তা বলবার জন্য আমাদের অনুরোধ কল্লে; লোকগুলো বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, আমাদের এত কষ্টের অভিজ্ঞতা দুটো বাহবা দিয়ে আয়ত্ব করে নিলে। শ্রীজলধর সেন।

রাজা রসালু।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রদেশে সর্ব্বজাতিরই মধ্যে উপকথার প্রচলন আছে। ভারতবর্ষের ত কথাই নাই। বাল্যকালে স্থবির পিতামহ ও বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট গল্প শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই এ দেশে এমন কেহ আছেন কিনা জানি না। যেমন বাল্যকালে রাজা-রাণীর, রাক্ষস রাক্ষসীর, ভূত প্রেতিনীর গল্প শুনিতে সুকুমার মতি বালক বালিকার অভিলাষ, তদ্রূপ বয়োপ্রাপ্ত হইলে প্রবীন মানবের ও উপন্যাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা শিশুমনোরঞ্জনকারী উপকথা বা পরিণতবুদ্ধি প্রাপ্ত বয়স্কের উপন্যাস নবেল একই জিনিষ। উভয়ই কল্পনা প্রসূত। সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তদ্দেশ নিবাসীদের মধ্যে মহাপরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহাবীরের জনশ্রুতি আছে। জনৈক মহাপুরুষ অসংখ্য নরনারীকে উৎপীড়নকারী দৈত্যদানবের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, অলৌকিক কার্য্য কলাপ দেখাইয়া, প্রতিদ্বন্দী রাজন্যবর্গকে রণে পরাজিত করিয়া আপনার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন এরূপ বীরের কীর্ত্তিকলাপ সম্বলিত উপন্যাস ও রাক্ষস নিহন্তা Jack the Giant killer সদৃশ বীরের উপকথা সকল জাতিরই মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ভারত-বর্ষের পঞ্জাব অঞ্চলে এইরূপ অর্দ্ধ ঐতিহাসিক অর্দ্ধ কাল্পনিক রসালু নাম খ্যাত এক মহাবীর নরপতির প্রবাদ এখনও আছে। পঞ্জাবী কথকেরা এখনও রাজা রসালুর কীর্ত্তিকলাপ, অলৌকিক অধ্যবসায় ও শৌর্য্য কীর্ত্তিত করিয়া আপনাপন উপজীবিকা লাভ করিয়া থাকে। এখনও নিশীথভাগে গ্রাম্যলোক অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া কথকাখ্যাত রসালু কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দবিহ্বল হয়। রাজা রসালুর উপন্যাস কত শত বৎসর হইতে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে কে বলিতে পারে। পঞ্জাবী কথকেরা বলিয়া থাকে যে এই উপাখ্যানটি বহু প্রাচীনকাল হইতে বংশাবলী ক্রমে তাহাদের বংশে চলিয়া আসিতেছে।

রাজা রসালুর উপাখ্যান, সর্ব্বপ্রথমে জেনারল আবট নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করেন। তৎকৃত অনুবাদ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রিকাতে কাপ্তেন আর, সি, টেম্পল নামক আর একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী রাজা রসালুর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে রেভারেণ্ড চার্লস্ সুইনার্টন নামা একজন ইংরাজ পাদরী ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া Folklore Journal নামক ইংরাজী পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। সেই বৎসরের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে চাঁদা করিয়া রাজা রসালুর উপাখ্যানের রূপান্তর প্রকাশিত হয়। তৎপরে সুইনার্টন সাহেব এই উপাখ্যানের তিন প্রকার অপভ্রংশ সংগ্রহ করিয়া উপন্যাস-

রূপে গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করেন। উপাখ্যানের প্রথম ভাষ্য তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত ঘাজী নামক গ্রামে একজন পত্রপ্রদর্শকের নিকট হইতে শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ভাষ্য রাওলপিণ্ডী নিবাসী জুমা নামক জনৈক প্রাচীন কথকের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তৃতীয় ভাষ্য কাশ্মীর প্রদেশ নিবাসী সরধা নামা আর একজন কথক তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিল। রাজা রসালুর উপাখ্যানের উক্ত তিন ভাষ্যের পরস্পরের মধ্যে অনেক অংশে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের এক একটিতে এমন বিবরণ আছে যাহা অপর ভাষ্যটিতে নাই। রাজা রসালুর উপাখ্যানের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উজ্জয়িনী রাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় শূলবানাখ্য এক নরপতি শীয়ালকোট নগরে রাজ্য করিতেন। তিনি দুই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর নাম ইচ্ছ্রান ও কনিষ্ঠার নাম লূনা। লূনা নীচবংশোদ্ভবা ছিল। তাহার পিতা চর্ম্মকারের ব্যবসায় করিত। জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে রাজা শূলবানের এক পুত্র হইয়াছিল। তাহার নাম পূরণ। জ্যোতির্ব্বেত্তাদের পরামর্শানুসারে রাজা পূরণকে জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়াছিলেন—যাহাতে তাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি কোনরূপে না পড়িতে পারে। যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই রাজাজ্ঞায় পূরণ আপনার নিভৃত নিবাস ত্যাগ করিয়া পিতৃসমীপে আসিয়া পিতার চরণ বন্দন করিল। রাজা শূলবান পুত্রকে বিমাতা রাজ্ঞী লূনাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। দুষ্টচারিনী লূনা সপত্নী তনয়ের যৌবন সুলভ রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া তাহার প্রেমাসক্ত হইল ও পূরণের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিল। রাজকুমার পূরণ বিমাতার এইরূপ নীচপ্রবৃত্তি দেখিয়া ঘৃণার সহিত তিরস্কার করিয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। লূনা এই প্রকারে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া নরপতি শূলবানের নিকট সপত্নীতনয়ের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল। সত্য মিথ্যা বিচার না করিয়াই দুর্ব্বল-নরপতি স্বীয় আত্মজকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ঘাতকেরা রাজকুমার পূরণকে বনমধ্যে লইয়া যাইয়া তাহার হস্তপদাদি ছিন্ন করিয়া একটি ভগ্নকূপ মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাজকুমারকে কূপমধ্যে কিয়ৎকাল যাপন করিতে হইয়াছিল। পরে টিল্লানিবাসী বিখ্যাত যোগীবর গুরু গোরক্ষনাথ কূপমধ্য হইতে তাহাকে উত্তোলিত করিয়া আপনার অলৌকিক যোগবলে তাহার ছিন্নহস্তপদ যথাসংলগ্ন করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার পূরণ যোগীবেশ ধারণ করিয়া শীয়ালকোটের নিকটবর্ত্তী একস্থানে তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক তপোবলের কথা শুনিয়া, রাজা শূলবান্ ও রাজ্ঞী লূনা পুত্রলাভ কামনায় তৎসমীপে সমাগত হইলেন। রাজকুমার তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। রাজ্ঞী লূনা যোগীবেশধারী সপত্নীতনয়ের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে অচিরে যেন তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া হয়। যোগী বলিলেন আপনার শীঘ্রই একপুত্র হইবে কিন্তু আপনার সপত্নী যেমন পুত্রশোকে অহরহঃ ক্রন্দন করিতেছে তদ্রূপ আপনাকেও পুত্রশোকে

জরজর হইতে হইবে। আপনার ষড়যন্ত্রণায় পড়িয়া রাজ্ঞী ইচ্ছ্রানের পুত্রের যেমন দুর্দ্দশা হইয়াছে, তদ্রূপ আপনার তনয়ও রমণীর ষড়যন্ত্রণায় পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করিবেন।

সময়ক্রমে রাজ্ঞী লুনা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজা শূলবান্ তনয়ের নাম রসালু রাখিলেন। পাছে পুত্রমুখ সন্দর্শন করেন এই ভয়ে রাজা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই রাজকুমার রসালুকে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ নিভৃত নিবাসে প্রেরণ করিলেন। দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে রাজকুমার রসালু রাজধানীতে আগমন করিয়া পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। যত ক্রীড়া ছিল তন্মধ্যে ধনুকের দ্বারায় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করাই রাজকুমার রসালুর বড়ই প্রিয়জনক বোধ হইত। পুরনারীগণকে নদী হইতে কলস করিয়া জল আনিতে দেখিলেই রসালু ধনুকদ্বারায় প্রস্তরময় গুলি নিক্ষেপ করত তাহাদের কলস ভাঙ্গিয়া দিতেন। পুরনারীগণ মন্ত্রীসমীপে রাজকুমারের বিপক্ষে অভিযোগ করিল। মন্ত্রীও নরপতি সমীপে যাইয়া বলিলেন যে রাজকুমারকে বারম্বার নিষেধ করা সত্বেও তিনি রাজাজ্ঞা অবহেলা করিয়াছেন, অতএব রাজকুমারকে নির্ব্বাসিত করা উচিত। নরপতি শুনিয়া বলিলেন "মন্ত্রীবর, আমি একপুত্র নির্ব্বাসিত করিয়া শোকাক্রান্ত হইয়া আছি। আপনি পুনর্ব্বার আর একপুত্রের নির্ব্বাসনের কথা বলিতেছেন। যতই মুদ্রা লাগে তাহা দিয়া মৃণ্ময় কলসের বিনিময়ে পুরনারীগণকে কাংস্যময় কলস ক্রয় করিয়া দিন।" এই আদেশ দিয়া আত্মজ রসালুকে আহ্বান করিয়া নরপতি আজ্ঞা দিলেন যে পুনরায় যেন পুরনারীগণের কলস ভাঙ্গিয়া না দেয়। কিন্তু পুরনারীগণকে কাংস্যময় কলসে জল আনিতে দেখিয়া, রাজকুমার রসালুও এক লৌহময় ধনুক নির্ম্মাণ করাইলেন ও তদ্বারায় লৌহময় গুলি নিক্ষেপ করতঃ উহাদের কাংস্যনির্ম্মিত কলসও ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রীর নিকট পুরনারীগণ পুনরায় অভিযোগ করাতে রাজকুমারকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য তিনি নরপতি শূলবানের নিকট পুনরায় আবেদন করিলেন। নরপতি বলিলেন "মন্ত্রীবর, রসালু আমার একমাত্র বংশধর উহাকে আমি নির্ব্বাসিত করিতে পারি না। অতএব প্রত্যেক বাটীতে এক একটি কূপ খনন করাইয়া দিন যাহাতে পুরনারীগণ অবাধে জল তুলিতে পারে। কিন্তু শিয়ালকোট নগরে যে সর্ব্বোচ্চ তোরণ ছিল যাহার উপর হইতে নগরস্থ সমস্ত বাটী দেখা যাইত, তদুপরি আরোহণ করিয়া গুলি নিক্ষেপ করতঃ রাজকুমার পূর্ব্বের ন্যায় পুরনারীগণের কাংস্যনির্ম্মিত কলস ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ পুনর্ব্বার রাজকুমারের বিপক্ষে অভিযোগ করিল। মানুষের ধৈর্য্য আর কতদিন থাকিতে পারে। নরপতি এইবার আদেশ করিলেন রাজকুমার যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া অপরত্র চলিয়া যায়। রাজ্ঞী লুনা পুত্রের জন্য রাজার নিকট কতই অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু নরপতি সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুত্রের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। শীয়ালকোট নগরে যে সমস্ত যুবক বলবীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিল, তাহাদিগকে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া রাজকুমার রসালু রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার রসালু গুজরাট রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য নরপতি রসালুর যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি রাজকুমার হইয়া কেন পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন ?"

রসালু বলিলেন "ঝীলামের সন্নিকটে এক রাজ্য আছে যেখানে রাক্ষসেরা বাস করে। কিন্তু রাক্ষসগণকে প্রস্তরীভূত করিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতি ঐ রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছেন। ঐ রাজ্যের চতুর্থাংশে আমার পিতার স্বত্ব আছে যেহেতু পূর্ব্বতন রাজগণের সহিত আমার আমার পিতা সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু অধুনাতন নরপতি আমার পিতার স্বত্ব দিতে অস্বীকার করিতেছেন। সেই জন্য আমি আমার পৈতৃকসম্পত্তি যাহাতে পাই সেই চেষ্টায় যাইতেছি।" গুজরাটাধিপতি বলিলেন "আমার যে সমস্ত রণনিপুণ বীর আছে, তাহাদিগকে আপনার সহিত প্রেরণ করিতেছি। আপনাকে সাহায্য করিবে।"

রসালু সসৈন্যে প্রস্তরীভূত রাক্ষসের দেশে যাইয়া তথাকার নরপতিকে রণে পরাজয় করিয়া রাজ্যের শাসনভার এক দক্ষ প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ঝীলাম নগরে অবস্থানকালে রাজা রসালু শুনিলেন যে টিল্লা নামক গ্রামে এক বিখ্যাত ফকির বাস করেন। শুনিয়াই তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে এই ফকিরের নিকট একবার যাইতে হইবে। এদিকে ফকিরও তপোবলে জানিতে পারিলেন যে রাজা রসালু তাঁহার তপোবল পরীক্ষা করিতে আসিতেছেন। ইহা জানিয়া ফকির মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনিও রাজা রসালুর পরাক্রম পরীক্ষা করিবেন। এই বলিয়া তিনি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ রাজা রসালুর আবাসের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রসালুর অনুচরবর্গ তাঁহাকে সংবাদ দিল যে এক বৃহৎকায় ব্যাঘ্র তাহার আবাসের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। শুনিবামাত্র রসালু ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন। ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবার মানসে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। রসালু তৎক্ষণাৎ স্বীয় অমোঘ তীর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার ধনুর্ব্বাণের অব্যর্থ সন্ধান দেখিয়াই ব্যাঘ্র ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তৎপরে রসালু ফকিরসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাজাকে দেখিয়া ফকির বলিলেন "নরপতি, এই স্থান নির্ব্বিরোধী ফকিরগণের আবাসস্থল। গণ্ডগড় নামক নগরে রাক্ষস বাস করে। আপনি যদি সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে পরাজিত করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার যশোরাশি ভূমণ্ডলের সর্ব্বপ্রদেশে বিকীর্ণ হইবে। নির্ব্বিরোধী ফকিরগণকে পরাজিত করিলে ত আর আপনি যশস্বী হইতে পারেন না।"

ফকিরের এই কথা শুনিয়া রসালু বলিলেন "যোগীবর, আপনি আমায় কৌতুক করিতেছেন। আমি শপথ করিতেছি যে যতদিন পর্য্যন্ত না আমি রাক্ষসগণকে পরাজিত করিতে পারিব ততদিন পর্য্যন্ত আমি গৃহে বাস করিব না।"

ফকির বলিলেন "নরনাথ আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে রাক্ষসগণের সহিত রণে আপনি জয়লাভ করুন। আর আমি স্বীয় যোগবলে জানিতে পারিতেছি যে যদি আমার

দুটি আদেশ পালন করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি রাক্ষসগণকে বলে পরাজিত করিতে পারিবেন।"

রসালু বলিলেন "বলুন, আপনার আদেশ দুটি কি।"

ফকির বলিলেন, "প্রথমতঃ নিরাপরাধী ব্যক্তিকে কখনই হত্যা করিবেন না; দ্বিতীয়তঃ কখনই নারীবধ করিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিবেন না।" শুনিয়া রাজা রসালু টিল্লানগর পরিত্যাগ করিয়া মক্কানগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মক্কানগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রসালু অত্রত্য অধিপতি হজরৎ ইমাম আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মক্কাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনি একজন অদ্বিতীয় বীর! কি মানসে আপনি এখানে আসিয়াছেন ও আমার দ্বারায় আপনার কোন উপকার হইতে পারে কি না বলুন।"

রসালু বলিলেন "মহাশয় আপনার নিকট দুই বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর এমন কেহ নাই যে ঐ দুই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারে।" হজরৎ আলী বলিলেন "মহাশয়, কিসে আপনার উপকার করিতে পারি বলিতে আজ্ঞা হউক।"

রসালু বলিলেন "আপনার নিকট আমার প্রথম নিবেদন হইতেছে যে আপনি স্বয়ং আমাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। দ্বিতীয়তঃ যখন আমি শিয়ালকোটাধিপতির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব তখন সেই রণে আপনাকে আমায় সাহায্য করিতে হইবে।" হজরৎ আলি সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও বলিলেন যে অচিরে তাঁহার পিতাও রণে পরাভূত হইয়া মহম্মদীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। ইতিমধ্যে এক জ্যোতির্ব্বেত্তা আসিয়া হজরৎআলিকে বলিল "শিয়ালকোট নগরের এক প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে ও তথায় অরাজকতা উপস্থিত।" ইহা শুনিয়া হজরৎ আলি বলিলেন "দেখা যাউক কি হয়।"

রাজা রসালু হজরৎআলির আদেশ অপেক্ষায় মক্কা নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিয়ালকোট নগরস্থ দুর্গের প্রাচীর ও তোরণ সকল ভূমিসাৎ হইতে দেখিয়া রাজা শূলবান ঐ সমস্ত ভগ্নপ্রাচীর প্রভৃতি পুনর্নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিলেন। সুনিপুণ কারীকরগণ তিনবার ভগ্নসংশোধন করিল কিন্তু তিনবারই সংশোধিত প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া রাজা শূলবান শিয়ালকোট নগরের খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—কি করিলে প্রাচীর প্রভৃতি স্থায়ী হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিলেন "নরনাথ, আপনার পুত্র রসালুকে অথবা জাবেরো নাম্নী জনৈক বিধবার পুত্রকে বলি দিয়া উহার ছিন্ন মস্তকের উপর যদ্যপি ভিত্তি নির্ম্মাণ করেন তাহা হইলেই প্রাচীর স্থায়ী হইবে।"

রাজকুমার রসালু নির্ব্বাসিত—তাহাকে আর কোথায় পাইবেন; নরপতি শূলবান জাবেরো

নাম্নী বিধবার পুত্রকে নিহত করিতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞানুযায়ী ঘাতকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিল এবং কারীগরগণ ভিত্তিমূলে জাবেরো তনয়ের মস্তক প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। প্রাচীর প্রস্তরবৎ দৃঢ় ও স্থায়ী হইল।

জাবেরো ঘাতকহস্তে আপনার পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া রোদন ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে শিয়ালকোট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মক্কাভিমুখে গমন করিল। মক্কায় উপস্থিত হইয়াই জাবেরো হজরৎআলির নিকট আপন পুত্রের হত্যাকাহিনী বিবৃত করিল। পুত্র-শোককাতর বিধবাকে সান্ত্বনা করিয়া হজরৎআলি তাহাকে বলিলেন "এক সপ্তাহের পরে তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া শিয়ালকোট নগরাভিমুখে গমন করিবেন ও রাজা রসালুর সহিত সংযোগ করিয়া রাজা শূলবানের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। সপ্তমদিনে হজরৎ আলি ও রসালু সেনাসমভিব্যাহারে শিয়ালকোটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরের সন্নিকটে পৌঁছিয়া হজরৎ আলি রাজা শূলবানের নিকট দূত মারফৎ এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহাকে স্বীয় পুত্র রসালুকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইতে হইবে ও তাঁহাকে স্বয়ং মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

পত্রপাঠ করিয়াই রাজা শূলবান পত্রখানিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হজরৎ আলি প্রেরিত দূতকে তরবারী আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে দুইপক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে হজরৎ আলি স্বীয় মস্তক দেহ হইতে তরবারীর দ্বারায় ছিন্ন করিয়া শিয়ালকোট নগরের প্রবেশদ্বারের উপর নিক্ষিপ্ত করিলেন। রক্তাক্ত মস্তক দ্বার স্পর্শ করিবা-মাত্রই উহা বিদীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নমস্তক বীর হজরৎ আলি সৈন্য-সহিত নগরে প্রবেশ করিয়া রাজা শূলবান ও তদীয় সেনানীবর্গকে হত্যা করিলেন। এইরূপে শিয়ালকোট নগর জয় করিয়া রসালুকে রাজ্যের অধিপতি অভিষিক্ত করিলেন। পুত্রশোক বিধুরা জাবেরোকে শিয়ালকোট নগরের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া ও স্বীয় অনুপস্থিতিকালে রাজ্যশাসন করিবার ভার এক প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাজা রসালু দিগ্বিজয় করিবার মানসে নগর পরি-ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে কেবল ভোঁরা ঈরাণি নামক ঘোটক ও সাদী নামক শুককে লইলেন।

খ্যাতনামা ব্যাধরাজ মীর শিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে রাজা রসালু দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। ব্যাধরাজ রাজা রসালুকে দেখিয়াই বলিল "মহাশয়, যেহেতু আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিয়াছেন, আপনি আমাকে আপনার শিষ্য করুন।"

রসালু বলিলেন "যদ্যপি আপনি আমার তিনটি আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আপনাকে আমার শিষ্য করিব"।

মীরশিকারী বলিল "মহাশয় আপনি যে আদেশ করিবেন, তাহা আমি যথাসাধ্য পালন করিব"।

রসালু বলিলেন "মহাশয় শ্রবণ করুন, আমার প্রথম আদেশ এই যে, আমি এখানে আসিয়াছি ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে ও আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে

এই কথা কাহাকেও বলিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আপনি অরণ্যের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে শিকার করিতে পারিবেন না। তৃতীয়তঃ, অরণ্যের দক্ষিণভাগে একটি হরিণ ও হরিণী আছে, উহাদিগকে কখনই বধ করিতে পারিবেন না।”

মীরশিকারী এই সমস্ত আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে পর রাজা রসালু স্বীয় অস্ত্র ব্যবহার কৌশলে ব্যাধরাজকে দীক্ষিত করিলেন, ও তথা হইতে দূরে অরণ্যের আর এক ভাগে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা রসালুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এই কথা ব্যাধরাজ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট সেই রাত্রিতে বলিয়া রসালুর প্রথম আদেশ ভঙ্গ করিলেন। পর দিবস প্রাতে অরণ্যের দক্ষিণভাগে শিকার করিতে আরম্ভ করিয়া শিয়ালকোটাধিপতির দ্বিতীয় আদেশ ভঙ্গ করিলেন। তথায় শিকার করিতে করিতে মীরশিকারী দেখিলেন যে একটি হরিণ ও হরিণী বিচরণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে বধ করিয়া রাজা রসালুর তৃতীয় আদেশ ভঙ্গ করিলেন। স্বীয় হস্ত হইতে শোণিত-চিহ্ন প্রক্ষালন করিবার মানসে ব্যাধরাজ জলাভাবে ঘাসের উপরিস্থ শিশির বিন্দুর উপর হস্ত সঞ্চালনকালে একটি সর্প ঘাসমধ্য হইতে তাঁহার হস্তে দংশন করিল, ও তৎক্ষণাৎ ব্যাধরাজ মীরশিকারী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে রাজা রসালু বনাভ্যন্তর হইতে এই সকল ঘটনা দেখিতেছিলেন। তাহার মৃত্যু হইতে দেখিয়া রসালু ব্যাধরাজের পাগড়ী, তূণীর, ধনুক, বীণা ও ঘোটক লইয়া মীরশিকারীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। শিকারী-পত্নী মৃত পতির সেই সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন ও রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে রাজা রসালু তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু বিচারপতির নিকট যথাযথ ঘটনা বিবরণ করিয়া রাজা রসালু মিথ্যা অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৎপরে ভোজরাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। ভোজ নগরে উপস্থিত হইলে ভোজরাজ্যাধিপতিও তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর করিলেন ও দুই নরপতি পরম বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তৎপরে গণ্ডগড় নগরে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন যে নগর জনশূন্য কেবলমাত্র একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রুটী ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা বিস্ময়ান্বিত হইয়া বৃদ্ধা সমীপে গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতঃ, এই বিজন স্থানে আপনি এত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন কিন্তু ভক্ষণ করিবার ত লোক দেখিতে পাইতেছি না? আর আপনিই বা এত রোদন করিতেছেন কেন? আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে। আপনার দুঃখের কারণই বা কি জানিতে বড় উৎসুক হইয়াছি।”

তখন বৃদ্ধা বলিল, “বৎস, এই নগরের নরপতির নাম কাশুদেব। রাজার আজ্ঞা এই যে প্রত্যহ রাক্ষসগণের ভোজনের নিমিত্ত একটি মনুষ্য, একটি মহিষ ও পাঁচ মণ রুটি দেওয়া

চাই। এককালে আমার সাত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন রাক্ষসগণের উদরসাৎ হইয়াছে। আজ আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের পালা এবং কল্য আমাকেই উহাঁদের ভক্ষ্য হইতে হইবে। এই দুঃখেই, বৎস, আমি এত রোদন করিতেছি"। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা রসালু বলিলেন "মাতঃ, ধৈর্য্য ধরুন, আমিই এই দেশকে উৎপীড়নকারী রাক্ষসগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসিয়াছি। আমিই শিয়ালকোটাধিপতি শূলবানের পুত্র রসালু"। তৎপরে রাজা রসালু যুদ্ধে রাক্ষসগণকে পরাজিত করিলেন এবং একজনকে মাত্র পর্ব্বতগহ্বরে বন্দী করিয়া অন্য সকলকে বধ করিলেন। তদবধি গণ্ডগড় রাক্ষসগণের উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইল।

গণ্ডগড় হইতে রাজা রসালু শ্রীকোট নগরে গমন করিলেন। সেই নগরের রাজার নাম শ্রীকাপ্। রাজা শ্রীকাপ ইন্দ্রজাল বলে আপন ভ্রাতা শ্রীসুখের প্রাণবধ করিয়া তাঁহার মৃতদেহ শ্রীকোট নগরের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শ্রীসুখের মৃতদেহ দেখিবামাত্র রাজা রসালু তাঁহাকে ইন্দ্রজাল প্রকটিত মোহ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্জীবন প্রদান করিলেন। নবজীবন লাভ করিয়া শ্রীসুখ রাজা রসালুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনার নাম কি ও আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

রসালু বলিলেন "মহাশয়, আমার নাম রসালু, আমি রাজা শ্রীকাপের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে শ্রীকোটনগরে যাইতেছি"। এই কথা শুনিয়া শ্রীসুখ ঈষৎ হাস্য করিলেন। রাজা রসালু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি হাস্য করিলেন কেন"। শ্রীসুখ বলিলেন "মহাশয়, রাজা শ্রীকাপ আমার সহোদর। তিনিই আমাকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া আমার মৃতদেহ সহরের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনিও কি তাঁহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন। আপনার সেরূপ সৈন্যসামন্ত নাই দেখিতেছি, আপনি তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবেন?"

রসালু বলিলেন "আমার এইরূপ বিশ্বাস যে যদ্যপি আপনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি রাজা শ্রীকাপকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব"। শ্রীসুখ বলিলেন "মহাশয় তবে শ্রবণ করুন। আপনি যখন শ্রীকোট নগরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, দেখিবেন যে মদীয় ভ্রাতা ইন্দ্রজালবলে এক তুমুল ঝটিকা উত্থিত করিয়া আপনাকে এক দূরদেশে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনি যদি ঝটিকা হইতে কোনরূপে অব্যাহতি পান, তৎপরে তিনি ইন্দ্রজালবলে তুষারপাত আরম্ভ করিবেন ও চেষ্টা করিবেন যে যাহাতে আপনি তুষাররাশিতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহা হইতেও যদ্যপি অব্যাহতি পাইয়া সহরের তোরণ-সম্মুখে যে ঘণ্টাটি আছে সেইটি বাজান, তাহা হইলে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র আপনি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবেন ও সেই অবস্থায় আপনাকে সহর হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে। তাহা হইতেও যদ্যপি অব্যাহতি পান, তাহা হইলে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী সুচালের যে দোলনা আছে তাহার নিম্নে গমন করিয়াই আপনি উন্মাদপ্রায় হইয়া যাইবেন। এই বিপদ হইতেও যদ্যপি আপনি অব্যাহতি পান, তাহা হইলে রাজা

শ্রীকাপ্ আপনার সহিত চৌপাট খেলিবেন। সেই সময়ে আমার ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতষ্পুত্রী আপনার সন্নিকটে বসিয়া আপনার মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাদের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া যগুপি আপনি খেলিতে খেলিতে ভুল করেন ও ক্রীড়াতে বিজিত হন, আমার ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ আপনার প্রাণবধ করিবেন। এ উপায়ে যগুপি আপনার উপর জয়লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রাজা শ্রীকাপ প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিবার মানসে হরবংশ নামা ও হরবংশী নাম্নী স্বীয় পালিত মূষিকদ্বয়কে ডাকিবেন। গৃহ অন্ধকার হইলে আপনি ক্রীড়াতে বিজিত হইবেন ও মদীয় ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ আপনার প্রাণবধ করিবেন। সেইজন্য বলিতেছি যে, মহাশয়, আপনার শ্রীকোটনগরে গমন করা উচিত নয়"।

ইহা শুনিয়া রাজা রসালু বলিলেন, "মহাশয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমি তথায় যাইব। অতএব আপনি আমাকে বাধা দিবেন না?" শ্রীসুখ বলিলেন "মহাশয়, যগুপি তথায় যাইতে আপনার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে আপনি মদুক্ত বিপদসমূহ হইতে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবেন। আমার পঞ্জরস্থ দুইখানি অস্থি আপনার সঙ্গে লইয়া যান। পথিমধ্যে আপনি একটি বিড়াল দেখিতে পাইবেন। উহাকে সঙ্গে লইবেন ও উহাকে আমার অস্থি দুইখানি মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করিতে দিবেন। তৎপরে যখন রাজা শ্রীকাপের সহিত চৌপাট খেলিতে বসিবেন ও যখন তিনি "হরবংশ" বলিয়া স্বীয় পালিত মূষিককে ডাকিবেন, আপনিও ঐ বিড়ালটিকে ছাড়িয়া দিবেন। বিড়ালটী মূষিককে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে ও আপনিও ক্রীড়াতে জয়লাভ করিবেন"। এই বলিয়া শ্রীসুখ স্বীয় পঞ্জরস্থ দুইখানি অস্থি রাজা রসালুকে দিলেন। রাজা রসালুও সেই দুইখানি লইয়া শ্রীকোটনগরাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপরে একাদিক্রমে শ্রীসুখোল্লিখিত বিপদসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া চৌপাটক্রীড়ায় রাজা শ্রীকাপকে পরাজিত করিলেন। রাজ্যলাভ করিয়া রাজা রসালু শ্রীকোটনগর শাসনের ভার একজন প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করিয়া, রাজা শ্রীকাপের নবজাতা কোক্লান নাম্নী দুহিতাটিকে সঙ্গে লইয়া আর এক রাজ্যে গমন করিলেন।

তৎপরে রাজা রসালু খিরীমূর্ত্তি নামক শৈলময়প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজদুহিতা কোক্লান বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার সহিত রাজা রসালুর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল তাঁহারা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আটক নগরের রাজা হোদি তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী কোক্লান নরপতি হোদির রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইলেন। রাজা রসালু রাজ্ঞী কোক্লানের এই অভিসারিকাবৃত্তির কথা শুনিতে পাইয়া রাজা হোদীকে বধ করিবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হোদীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, রাজা রসালু তাঁহাকে অস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বধ করিলেন। রাজ্ঞী কোক্লান যখন জানিতে পারিলেন যে রাজা রসালু তাঁহার দুশ্চরিত্রের কথা জানিতে পারিয়াছেন ও যখন শুনিলেন

যে তিনি তাঁহার উপনায়ক রাজা হোদীকে স্বহস্তে বধ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদের উচ্চ তোরণ হইতে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

ইত্যবসরে রসালু স্বহস্তে আটকাধিপতি হোদীর প্রাণবধ করিয়াছেন এই কথা রাজা হোদীর ভ্রাতৃস্বজনবর্গের কর্ণগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা রাজা রসালুর বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া খিরীমূর্ত্তি নগর ঘেরাও করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রাজা রসালুর সেরূপ সৈন্যসামন্ত ছিল না। রাজা রসালু এত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া এরূপ পরাক্রমশালী প্রতি-দ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার আশা পরিত্যাগ করতঃ একদিন নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া শত্রুবর্গকে আক্রমণ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রাজা রসালুর কলেবর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। অবশেষে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা রসালুর উপাখ্যানের যে সংক্ষিপ্তসার উপরে লিখিত হইল, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলী রাজা রসালুর সম্বন্ধে সচরাচর কথক-গণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহা ষোলআনাই কল্পনামূলক। কিন্তু বাস্তবিক যে রসালু নামা একজন মহাপরাক্রমশালী নরপতি পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বীর সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ রচিত করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কাল্পনিক করিয়া ফেলার উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের 'ইউলিসেস', স্কান্দিনাভিয়ায় 'ওদিন', ইংলণ্ডে রাজা 'আর্থর', ফ্রান্সদেশে 'রোলণ্ড,' স্পেনদেশে 'সিদ' প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। রাজা রসালু যে রাজপুতবংশোদ্ভব ও রাজা শালিবাহনের পুত্র ছিলেন, এবং পিতার মৃত্যু হইলে পৈতৃকসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন এতদ্সম্বন্ধে সকল ইতিহাস-বেত্তারই একমত দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই জানেন যে রাজা শালিবাহন একজন মহাপরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি যে সন জারী করিয়া যান তাহার প্রারম্ভ ৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে। রাজা শালিবাহন যে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরে রাজ্য করিতেন ও পঞ্জাব প্রদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিলেন—এতদ্সম্বন্ধে ভূয়ো ভূয়ো প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনি যে শিয়ালকোট নগরেও রাজ্য করিতেন—ইহার উল্লেখ কেবলমাত্র রসালু কাহিনীতে পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে রাজা শালিবাহনের রাজ্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কথকেরা বলে ও রসালুর উপাখ্যানেতেও উল্লেখ পাওয়া যায় যে পিতৃবিয়োগ হইলে রাজা রসালু শিয়ালকোট নগরের শাসনভার এক প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় নীরশিকারী নামক জনৈক ব্যাধরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহা হইতে কতক পরিমাণে প্রমাণীত হয় যে, ঐতিহাসিক শালিবাহন ও পাঞ্জাবী কথকগণের শালিবাহন অথবা সুলবান্ একই ব্যক্তি। যদ্যপি ৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা শালিবাহনের জন্ম হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা

হইলে ১৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। ফল কথা, মোটামুটি রূপে গণনা করিলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য অথবা শেষ ভাগে রাজা রসালুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রাজা রসালুর রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদ ছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও রাজা রসালু জীবনের অধিকাংশ ভাগই রাক্ষসবধ ও অপরাপর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করিবার মানসে একাকী নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তত্রাপি সিন্ধুনদের সন্নিকটে রাজা শ্রীকাপের রাজ্যের অন্তর্ভূত কোন স্থানে তিনি সচরাচর বাস করিতেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা রসালুর মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করার সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে উহা ষোলআনাই অসম্ভব, কেন না যে সময়ে রাজা রসালুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় সে সময় মুসলমানধর্ম্মের উদ্ভাবনই হয় নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ পঞ্জাব প্রদেশ জয় করিয়া "হয় মুসলমান হও না হয় প্রাণদণ্ড করিব" এই ভয় দেখাইয়া তদ্দেশ নিবাসী বহুজনকে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অনেক পাঞ্জাবী কথকগণকেও এই সঙ্গে মুসলমান হইতে হইয়াছিল। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তাহারা বোধ হয় জাতীয় বীর রসালুকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আখ্যাত করিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রসালুর সহিত অনেক প্রাচীন বীরগণের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা রসালুর উপাখ্যানে এমন অনেক ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে, যাহার সহিত গ্রীকদের অনেকানেক প্রাচীন কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রসালু উপাখ্যানের প্রারম্ভেই স্বীয় সপত্নী তনয় পূরণের প্রতি রাজ্ঞী লূনার প্রেমাসক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও ফিড্রা ও হিপোলাইটস্ সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ একটি জনশ্রুতি ছিল। ফিড্রা সপত্নীতনয় বীরশ্রেষ্ঠ হিপোলাইটসের প্রতি প্রেমানুরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট প্রেম ভিক্ষা করেন। কিন্তু হিপোলাইটস্ বিমাতার কুৎসিত প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, ফিড্রা স্বীয় পতি থিসিঅসের নিকট সপত্নীতনয়ের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিলেন। দুষ্টচারিণী ফিড্রার প্রেমমুগ্ধ থিসিঅস্ পুত্র হিপোলাইটসকে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু ডায়েনাদেবী হিপোলাইটস্কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন ও দুষ্টা ফিড্রাও আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজকুমার পূরণেরও অনেকটা এইরূপ ঘটিয়াছিল। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে সুবিখ্যাত নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া পূর্ণচন্দ্র নাটক রচনা করিয়াছেন। ব্যাধরাজ মীর শিকারীর সহিত প্রাচীন গ্রীকদের অরণ্যদেব অরফিউস্, প্যান্ ও আক্‌টিয়নের সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রসালুও যেমন গণ্ডগড়ের একটী ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিয়া জীবিত রাক্ষসটিকে গণ্ডগড়ের পর্ব্বত গহ্বরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রীক বীর হার্কিউলিস্ও জাইগণ্টিস্ নামক রাক্ষসগণকে বধ করিলে যে কে রাক্ষস কয়েকটি পলায়ন করিয়াছিল তাহাদিগকে এট্‌না পর্ব্বতের মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।

ব্রীটিশ রাজনীতি।

গত পৌষ সংখ্যার "ভারতীতে" "ব্রীটিশ রাজনীতি" সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার নাম "বিলাতীয় রাজনীতি" হওয়া উচিত ছিল। "ব্রীটিশ" ও "বিলাতীয়" এই দুইয়ের পার্থক্য আমি এইরূপ বুঝি। প্রথমটি বিলাতীয় লোকের সমগ্র রাজনীতির পক্ষে নিয়োগ করা যাইতে পারে, দ্বিতীয়টী আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতিই বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য। যে দল বিভাগের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত ইংরাজের বহির্জাতিক রাজনীতির (Foreign policy) সম্বন্ধ যে অল্পই তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজ রাজনীতি যত্ন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিতে চান তাঁহাদের এই বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

অল্পদিন হইল লর্ড রোজবেরি এই বহির্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর নানা স্থানে ইংরাজের স্বত্ব সাব্যস্তকরা, বা জমি দখল করা ("Pegging away our claims in different parts of the world") এই নীতির মূল মন্ত্র।* স্থিতিশীল দলের নেতা লর্ড সল্‌সবেরি ও উন্নতিশীল দলের নেতা রোজবেরি দুই জনেই এই মতের পৃষ্ঠপোষক। উন্নতিশীল দলের কেহ কেহ এনীতির বিরোধী। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল মিঃ ল্যাবুসিয়ারই এই বিরুদ্ধ ভাব সকল সময়ে পার্লমেণ্টের বাহিরে ও ভিতরে প্রকাশ করেন। উন্নতিশীল দলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অপর দলের রাজত্বকালে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন বটে কিন্তু আপনাদিগের রাজত্ব কালে সেই নীতিরই অনুসরণে কার্য্য করেন। তাঁহাদের মতে এ বিষয়ে নীতি পরিবর্ত্তন করিলে গ্রেট বিটনকে অপদস্থ করা হয়, তাহাকে অস্থিত-নীতি বলিয়া প্রমাণ করা হয়। ইহা অনেকটা সত্য বটে কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে বহির্জাতিক নীতি বিষয়ে অল্পই মতভেদ লক্ষিত হয়।

এই নীতি এক্ষণে স্থানভেদে তিনটি বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছে। ইউরোপে ইহার ভাব এক প্রকার, আসিয়া ও আফ্রিকাতে অন্য প্রকার। ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব রক্ষণ, ইজিপ্টের রাজকার্য্যে তত্ত্বাবধারণ, বহুল অর্ণবপোত নির্ম্মাণ, এই নীতির অঙ্গ। ইউরোপীয় জাতিসকলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহার সহিত জড়িত। যতদিন জর্ম্মনি ফ্রান্সের অন্তর্গত আল্‌সেস্ লোরেণ দখল রাখিবেন, ও ইংলণ্ড ইজিপ্টের শাসনকার্য্য স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিবেন, ততদিন ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মনির ও ইংলণ্ডের বিবাদের কারণ থাকিবে। ততদিন ইংলণ্ডকে ভূমধ্যসাগর অধিকার করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু আসিয়ার সহিত বাণিজ্য অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত, যতদিন এই বাণিজ্যের গতিবিধি সুয়েজখাল দিয়া হইতে থাকিবে, যতদিন

* Pegging away কথাটির এক বিশেষ অর্থ আছে। অষ্ট্রেলিয়াতে কোন খনির আবিষ্কার হইলে দলে দলে লোকে সেখানে উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে যে যেখানে সর্ব্বাগ্রে খোঁটা পুঁতিতে পারে (Peg) সেই সেখানকার সমস্ত খনিজদ্রব্যের অধিকারী হয়।

ভারতবর্ষের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে, এবং ইজিপ্টের দেশীয় শাসনকর্ত্তারা সুসভ্যজগতের অনুমোদিত ভাবে আপনারা রাজকার্য্য চালাইতে না পারিবেন, ততদিন ইজিপ্ট ছাড়িয়া দেওয়াও ইংরাজের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এদিকে আবার যতদিন রুসিয়ার ভারতের প্রতি নজর থাকিবে ততদিন ইহার সহিতও ইংরাজের গোল বাধিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যতদিন না ফ্রান্স ও রুসিয়ার মতি গতি ফিরিবে, ততদিন ইউরোপীয় যুদ্ধের ভয় যাইবে না। কেহ কেহ মনে করিবেন, আমরা ইংলণ্ডের দিকে টানিয়া বলিতেছি ইংলণ্ড নিজে সমস্ত উত্তম উত্তম স্থান অধিকার করিয়া—যাহারা তাহার স্থান চ্যুতির ইচ্ছা করিতেছে, তাঁহাদের দোষ দিবেন, তাঁহাদের হয়ত ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে হইবে না। কিন্তু দেখিতে হইবে ইংলণ্ডের এই সর্ব্বাগ্রগণ্যতার কারণ কি? ইহা অন্যজাতি সকলের দোষ মূলক না হইলেও ইংলণ্ডের বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক তাহার সন্দেহ নাই। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন; ফ্রান্সই প্রথম ভারত জয়ের চেষ্টা করেন। সেইরূপ, ইজিপ্টে গমন করিবার অগ্রেও ইংলণ্ড ফ্রান্সকে যোগ দিতে আহ্বান করেন, তখন সে আহ্বান অবহেলা করিয়া এক্ষণে তাহা লইয়া কলহ বিবাদ করা সকল নীতির বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। ফ্রান্সের সংবাদ পত্রেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। দুই মন্ত্রীদলের মধ্যে এখনও কোন মনোবিবাদের আভাস পাওয়া যায় নাই। কতদিন ইহা অপ্রকাশিত থাকিবে বলা যায় না। ইয়ুরোপের সকল দেশের মধ্যেই পরস্পর বাহিরে বন্ধুতা ভিতরে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব লক্ষিত হয়। কেহই হঠাৎ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন না, কিন্তু সকলেই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। এই নীতি আজকাল সভ্যজগতের অতীব অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সকলেই বুঝিতে পারিবেন অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতে, তাহা রক্ষা করিতে ও যোদ্ধাদিগকে বসাইয়া বেতন দিতে যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা পোতাটাকার মত কোন কার্য্যেই আসে না, ইহার সুদও পাওয়া যায় না এবং ইহা দেশের কোন শ্রীবৃদ্ধিকল্পেও ব্যয়িত হয় না। এই ব্যয় ভার ইউরোপের সকল প্রধান প্রধান দেশেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। ইটালী ত এক প্রকার নির্ধন। ফ্রান্সে তাহা হইতে অনেক কুফল জন্মিয়াছে। এমন কি ইংলণ্ডকেও এই সমরসজ্জার ব্যয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তাহার সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত, ব্যবসা বাণিজ্য এত অধিক, যে সকল দিক রক্ষা করিতে বহুল সামরিক অর্ণবপোতের প্রয়োজন। তাহার উপর ইংলণ্ডের অনেক খাদ্যদ্রব্য এক্ষণে অন্য দেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। যদি সে আমদানী বন্ধ হইয়া যায় বিলাতে দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা (ফ্রান্স ও রুসিয়া) ইহার রসদ বন্ধের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহাতে তাহারা তাহাতে সফলপ্রযত্ন না হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। তদনুসারে গত বৎসর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রণতরী নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে। টাইমস্ তাহাতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁহার মতে দশলক্ষ ২ ক্রোর পাউণ্ড খরচ করিতে হইবে। এর পর আরও প্রয়োজন

হইতে পারে। টাইমস্ বলেন ইহা এক অর্থে অনেক টাকা বলিয়া মনে হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদের বাণিজ্যের মূল্য ইহার একশত গুণ! সুতরাং শুধু যদি বাণিজ্যের কথা ধরা যায় তাহার তুলনায় এ ব্যয় অধিক নহে।” যাহা হউক ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিগ্রহে যে ইংরাজেরই বিশেষ ক্ষতি তাহার সন্দেহ নাই। সেই যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিত করিবার জন্য যে অগাধ অর্থ ব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তত, তাহার কারণ উপলব্ধি করা শক্ত নহে। তাহা হইলেও এরূপ অর্থনাশ জগতের বিশেষ অপকারক ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মনুষ্য স্বভাবে যতদিন হীনতা থাকিবে ততদিন ইহা অপরিহার্য্য।

ভারতবর্ষ লইয়াই আসিয়ার সহিত ইংরাজের বিশেষ সম্বন্ধ। মধ্যভারতে রুস ভয়, আফগান যুদ্ধ, আমিরের সহিত সন্ধি ও তাহাকে কর বা উপঢৌকন দান, ভারতের সীমান্তে অনন্তকালব্যাপী যুদ্ধ, সিমলাশৈলস্থ যোদ্ধাদলের এ বিষয়ে মতামত, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমার দুর্গ বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে আর বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই সকলের সহিত ভারতীয় সামরিক ব্যয়ের অত্যাধিক্য ও তাহার সহিত ভারতের অর্থাভাব কি প্রকারে জড়িত তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ওদিকে যেরূপ এদিকে ব্রহ্মদেশ লইয়াও সেইরূপ। আবার শ্যাম দেশে ফরাসী আসিয়া ঐ দেশটি দুইজাতির মধ্যে বিভক্ত হইবার পন্থা হইয়াছে, এবং তাহার উপর চীন ও জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে। ভারতের সীমান্তবর্ত্তী চীন পরাস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতেছে। সুতরাং ভারতরাজ্যের এ যুদ্ধে বিশেষ লাভালাভের সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত কোরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে, এদিকে রুসিয়া উহার একটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইংলণ্ড যে সহজে তাহাতে সম্মতি দিবেন তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ইহা স্থির, এ বিষয়ে ইংরাজের দলভেদে মতভেদ লক্ষিত হইবে না।

পূর্ব্বে যাহাকে খোঁটা পোতা নীতি” (Peggnig away policy) বলিয়াছি,—যদ্বিষয়ে উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল উভয় দলই একমত, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে হইলে আফ্রিকার বিষয় আলোচনা করিতে হয়। ইজিপ্টের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অধিকার মিষ্টার গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রীত্বের সময় ঘটে। ইহা তাঁহার কম উদারতার কথা নহে, যে ইংরাজ হইয়াও তিনি ইজিপ্টে পদার্পণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মতের বিপরীত কার্য্য করিতে হইল। সেই জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও চাঞ্চল্য দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারই সময়ে সুদানে গর্ডনের মৃত্যু ও ইংরাজসৈন্যের বিপর্য্যয় ঘটে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অস্থিরচিত্ততা ভ্রমাত্মক, ও তাহাতে ইংরাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষতঃ অনুপম চরিত্র গর্ডনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তজ্জন্য অনেক ইংরাজ গ্লাডষ্টোনকে বিরূপ চক্ষে দেখেন।

ইজিপ্টের কথা নূতন নহে। কিন্তু অনেকে হয় ত জ্ঞাত নহেন, আজ চারিবৎসর হইল, জর্ম্মণি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সমস্ত আফ্রিকা ভাগ করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য ইহা গোলাও

ভাগের ন্যায় নয়। এখনও আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে শ্বেতকায় পুরুষ প্রবেশাধিকার পান নাই। সুতরাং এ ভাগের অর্থ এই, ইহাদের মধ্যে কেহ অন্যের অংশে বাণিজ্য বিস্তার কিম্বা সন্ধিবিগ্রহ করিতে পাইবেন না। জার্ম্মনি ফ্রান্সের অংশে কিছুই বিশেষ হইতেছে না। ইংরাজের অংশে কিন্তু অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। গত কয়েকবৎসরের মধ্যে দুইটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইউগাণ্ডা ও মাটাবিল্যাণ্ড শীঘ্রই ইংলণ্ডের নূতন উপনিবেশ হইয়া দাঁড়াইবে। কি করিয়া এই দুইটি হস্তগত হইল তাহার বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে ইউগাণ্ডার ইতিহাস বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

কিছুদিন হইল "পূর্ব্ব আফ্রিকার ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়" বলিয়া এক কোম্পানি স্থাপিত হয়। তাঁহারা ইউগাণ্ডায় ব্যবসা করিতে যান, এবং ক্রমশঃ তাহা হস্তগত করেন। কি করিয়া হস্তগত করেন, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেন। যাহাহউক, এদিকে যখন ইউগাণ্ডা হস্তগত হইল, তাঁহাদেরও মূলধন শেষ হইয়া গেল, সুতরাং তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। লর্ড সলসবারি ইহাতে সম্মত হইয়া সেখানে রেল করিবার টাকার জন্য পার্লমেণ্টে আবেদন করেন। তখন উন্নতিশীলদল সে প্রস্তাবের বিপক্ষ হওয়াতে সে আবেদন বিফল হইল। উন্নতিশীল দল ইহারই কিছু দিন পরে রাজ্য পান। মিঃ লাবুসিয়ার উন্নতিশীল দলের পূর্ব্বাচরিত বিপক্ষতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তখন ইউগাণ্ডা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। মিঃ গ্লাডষ্টোন দুইদিক বজায় রাখিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবার জন্য সেখানে দূত প্রেরণ করেন। দূতপ্রেরণের ফল এই মাত্র হইল যে, স্যর জেরাল্ড পোর্টাল সেখানকার জলবায়ুর দোষে এখানে প্রত্যাগমন করিয়াই মারা পড়িলেন। অন্য ফল যে কিছু হইবে না অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যে কখনও ইউগাণ্ডা ছাড়িয়া দিবেন না ইহা সকলেই জানিত। ফলেও তাহাই হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে ইংরাজের বহির্জাতিক রাজনীতির রহস্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই রহস্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। কোন দলবিশেষের সহিত আমাদের যদি বিশেষ ভাবে যোগ দিতে হয় তাহাতে আমাদের হানি হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি যেসকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া আমার এক ইংরাজ বন্ধু বলেন, ভারতীয় শাসনকার্য্য লর্ডসভার হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। উন্নতিশীল দলের উপর বিশ্বাস করা ভ্রম। ইহার উত্তর সহজ। সাধারণ ইংরাজ লর্ডসভার উপর এতদূর বিশ্বাস কখনই স্থাপন করিবেন না। লর্ডসভা স্থিতিশীলদলের দুর্গস্বরূপ বেশ বলা যাইতে পারে, স্থিতিশীল দলের উপর শাসনভার থাকিলে তাঁহারাও ঠিক এই নীতি অবলম্বন করিতেন—টাইম্‌সের 'রা' তখন অন্য প্রকার হইত।

আর এক কথা। বিলাতের অন্তর্জাতিক রাজনীতির সহিত ভারতীয় রাজনীতির সম্বন্ধ অল্পই ইহা আমাদের বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। লর্ড ল্যান্স ডৌউনের গমনকালে

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী হইতে তাঁহাকে অভিবাদনপত্র দিবার যখন প্রস্তাব হয় তখন তাহার কোন প্রধান সভ্য ইহার বিরুদ্ধে এই এক আশ্চর্য্য তর্ক উপস্থিত করেন—ডবলিন মিউনিসিপ্যালিটি লর্ড হোটনকে অভিনন্দনপত্র দেন নাই। ডবলিনে যাহা শোভা পায় কলিকাতায় তাহা শোভা পায় কি না বিবেচনা করিবার দরকার নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ডবলিন মিউনিসিপ্যালিটি লর্ড হোটনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিবার জন্য অভিনন্দন পত্র দিতে অস্বীকৃত হন তাহা নহে, লর্ড হাউটন যে শাসনপ্রণালীর প্রতিনিধি সেই শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করাই এই অস্বীকারের কারণ। তাঁহারা ইহা দ্বারা "Castle Government" ডবলিন দুর্গ হইতে ইংরাজ দ্বারা আয়র্লাণ্ড শাসনের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইংরাজ রাজনীতির গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পারাই এরূপ ভ্রমপ্রমাদের কারণ।

এক্ষণে এই বহির্জাতিক নীতির উপসংহার কি? দুই একবার মিঃ ল্যাবুসিয়ারের নাম করিয়াছি। তিনি এই নীতির বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তাঁহাকে সেই জন্য "Litle Englander" বলিয়া কেহ কেহ উপহাস করেন। তিনি আবার উন্নতিশীলদলের অগ্রগ্রামী সভ্যগণের নেতা; ইহা হইতে মনে হয় সাধারণ লোকের নীতি মধ্যবিৎ লোকের নীতি হইতে ভিন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি রাজ্য বিস্তার না হয় ইংলণ্ডের বাড়তি লোকের স্থান কোথায় হইবে? কিন্তু তেমনি সাম্রাজ্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই জন্যে ইংরাজকে কত অগাধ মুদ্রা রণতরী প্রভৃতি নির্ম্মাণে ও সৈন্যরক্ষণে ব্যয় করিতে হয়। তদ্ব্যতীত আরও আপত্তি আছে। উপনিবেশ সকল অল্পদিন পরেই কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার উপর সাম্রাজ্য অতি বৃহৎ হইলে সকলকে সমবেত রাখা ক্রমশ দুষ্কর হইয়া পড়িবে। রোমক রাজ্যের ইতিহাস ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেমন অতি বৃহৎ, ব্রিটন-ক্ষমতা, ঐশ্বয্যও সেইরূপ বহুল। তাহা হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাতে সে বহুলতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতে পারে। এখনই ইয়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের ঐশ্বর্য্য প্রায় ইংলণ্ডের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটিশজাতি সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। উপনিবেশ সকল ব্রিটনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বর্দ্ধিত হয় তাহার জন্য প্রস্তাব চলিতেছে। তত্রাচ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে মনুষ্য সমাজের মনুষ্য-জাতির মত বার্দ্ধক্য স্বাভাবিক; সেই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তাহার অবনতির সম্ভাবনাও ক্রমশঃ বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। আশা করা যায় সে দিন এখনও সুদূরবর্ত্তী। ইহাই প্রত্যেক ব্রিটিশ রাজভক্তের আন্তরিক অভিলাষ।

আকবরসাহের হিন্দুপ্রীতি।

(৩)

রাজা জগন্নাথ। ইনি ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ বিহারী মল্লের পুত্র। প্রথম অবস্থায় ইনি আকবরের বন্দী ছিলেন, পরে সম্রাট ইঁহার বীরোচিত গুণে সন্তুষ্ট হইয়া, মুক্তিদান করিয়া ইঁহাকে নিজ সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথ সম্রাটের পক্ষে মানসিংহের অধীনে যে সমস্ত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই ইঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত-রবি মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধেও জগন্নাথ অসিচালনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মানসিংহ প্রভৃতি মহাবীর ও সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহারা রাজপুত-কুলকলঙ্ক। সেই সময়ে যদি তাঁহারা সম্রাট পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মিবারেশ্বরের সহিত মিলিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতে হিন্দুরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু আকবরের কৌশলময় রাজনীতির ছলনায় পড়িয়া ইঁহারা সামান্য ঐহিক সুখের জন্য স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়া জাতীয় গৌরবে মহাকলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে জগন্নাথ, মহারাণার অন্যতম প্রধান পৃষ্ট-পোষক জয়মল্লের পুত্র রামদাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করেন। রাজত্বের ত্রয়োবিংশতি বৎসরে আকবর তাঁহাকে পঞ্জাবে একটি জায়গীর দেন। ইহার পর কাশ্মীর, কাবুল মালওয়া প্রভৃতি স্থানের মহাযুদ্ধে জগন্নাথ সম্রাটের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পরও জগন্নাথ, কুমার পারভিজের সহিত উদয়পুরের মহারাণার বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে তিনি পাঁচহাজারী মন্সবদার ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সেনানায়ক পদে উন্নীত হন। ইঁহার পুত্র রামচাঁদ জাহাঙ্গীরের অধীনে দুই হাজারি মন্সবদার উপাধি লাভ করেন। রামচাঁদের পুত্র রাজা মনরূপ সাহাজাহানের বিদ্রোহের সময় তাঁহার একজন প্রধান সহচর ছিলেন। সাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার গোপাল সিংহ নামে একপুত্র ছিল।

রায় সর্জ্জন হর। ইনি বুন্দীর স্বনামখ্যাত অধিপতি রায় অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।* ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আকবর যখন চিতোর জয় করিয়া মহাগর্ব্বে স্ফীত হইতেছেন, বিজিগীষা প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া তাঁহার মনোবৃত্তিকে ক্রমাগত

---

* রায় অর্জ্জুন, চৌহানকুলের রত্নস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে গুজরাটের বাহাদুর সাঁ চিতোর অবরোধ করেন। চিতোরের সহিত বুন্দীর পূর্ব্ব বিবাদ থাকিলেও রায় অর্জ্জুন পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া রাণার সহায়তা করে সৈন্য লইয়া ধাবমান হন। চিতোরের একটি বুরুজ রক্ষার জন্য অসমসাহসে যবনের বাড়বাগ্নি

রাজ্যবিস্তারে পরিচালিত করিতেছে—সেই সময়ে বুন্দীরাজের অধিকৃত রণঅম্বর দুর্গ তাঁহার দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করে। বুন্দীর অধীশ্বর এতদ্দিন নির্ব্বিবাদে এই সুদৃঢ় দুর্গে বসিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আকবর লোভপরবশ হইয়া তাহা তাঁহাদের হস্ত-বিচ্যুত করিবার জন্য চিতোর জয়ের পর রণঅম্বরে উপনীত হন। রায় সর্জ্জন বীরপুরুষ, তিনি স্বদেশহিতৈষী ও জাত্যাভিমানে সম্পূর্ণ স্ফীত, যুদ্ধক্ষেত্র তাঁহার ক্রীড়াস্থল, এই দুঃসাহসী চৌহান, সম্রাট-সৈন্যকে রণঅম্বর বেষ্টন করিতে দেখিয়াও কোনক্রমে ভীত হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহার সৈন্যসংখ্যা সম্রাটের সহিত তুলনায় অল্পসংখ্যক হইলেও তিনি সেই সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যবর্ত্তী হইয়া অনায়াসে মোগলবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন।

সুচতুর আকবর কেবলমাত্র আগ্রহাতিশয্যে রণঅম্বর অধিকার করিতে গিয়াছিলেন। দুর্গাধিকার সহজ নহে দেখিয়া তিনি কৌশলের পথ অবলম্বন করিলেন। মহারাজ মানসিংহ তাঁহার সহায় হইলেন। যে শঠতাবশে মানসিংহ দুর্গাধিকার করেন তাহাতে তাঁহার রাজপুত নামে ঘোর কলঙ্ক পড়িল।

আতিথ্যপরায়ণতা রাজপুতের উচ্চধর্ম্ম। মহারাজ মানসিংহ এই সময়ে সর্জ্জন রায়ের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। মানসিংহ যদিও আকবরের অধীনস্থ ও শ্রেণীভুক্ত তথাপি উদার হৃদয় সর্জ্জন তাঁহার প্রতি কোন সন্দেহ করিলেন না। আকবরসাহ ছদ্মবেশে সামান্য আসাসোটা লইয়া মানসিংহের পরিবাররূপে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রায় সর্জ্জন কপটাচারী অম্বর রাজাকে আদরে গ্রহণ করিয়া নিজপার্শ্বে বসাইলেন। তাঁহারা নানাবিষয়ে কথোপকথনে নিবিষ্ট এমন সময়ে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি-পিতৃব্য ছদ্মবেশী আকবরকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে আসাসোটা কাড়িয়া লইয়া সম্রাটকে দুর্গমধ্যস্থ সিংহাসনে সমাসীন করিয়া দিলেন। আকবরকে এই প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করাতে সকলদিক রক্ষা হইল বটে কিন্তু বুন্দীশ্বর মনে মনে মানসিংহের কপট ব্যবহারে ও রাজপুত ধর্ম্মহীনতায় অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

মানসিংহ যে গর্হিত উপায়ে সম্রাটের দুর্গপ্রবেশ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কয়েকটি সন্ধির সর্ত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি সর্জ্জনকে

যুদ্ধে রায় অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মিবারের শ্রেষ্ঠ কবি চাঁদভট্ট এই চৌহান বীরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—

"সোর না কিয়া বহুৎ জোর
ধার পর্ব্বত অরি শিলা,
তাইস করি তরওয়ার
আদ্ পাড়িয়া [illegible]।"

[illegible] অর্থ [illegible] [illegible] মধ্যে এক [illegible] অর্জ্জুন [illegible]। [illegible]

সসম্ভ্রমে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মহারাজ! আপনি রাণার আনুগত্য ত্যাগ করিয়া রণঅম্বর দুর্গ সম্রাটকে অর্পণ করুন। সম্রাট আপনাকে বন্ধুরূপে গণ্য করিয়া ৫২টি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিবেন। এই প্রদেশগুলির উপস্বত্ব আপনি বংশানুক্রমে ভোগ করিবেন। ইহাতে দুর্গত্যাগের ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত হইবে। তবে নির্দ্ধারিত সংখ্যক সৈন্য লইয়া সম্রাটের সহায়তা করণ জন্য আপনাকে রাজধানীতে থাকিতে হইবে। এজন্য আর যাহা কিছু ক্ষতি পূরণ আবশ্যক সম্রাট তাহা করিতেও প্রস্তুত আছেন।"

দুর্গমধ্যে তৎক্ষণাৎ এক সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল। আকবরসাহ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। বুন্দীশ্বর এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও কি প্রকারে জাতীয় সম্মান ও নিজের প্রকৃতিগত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা নিম্নোদ্ধৃত কড়ার কয়েকটিতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

১। বুন্দীর রাজবংশ কখনও যবন সম্রাটের গৃহে কন্যা প্রদান করিবেন না।

২। জিজির কর হইতেও তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবেন।

৩। আটক প্রদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমা, তাহার বাহিরে গেলে জাতিপাতের সম্ভাবনা। সম্রাট কখনও বুন্দিপতিকে আটকের সীমার বাহিরে যুদ্ধে ব্রতী করিবেন না।

৪। নরোজার দিনে দিল্লির ও আগ্রার রাজ প্রসাদে যে—"মীনাবাজার"—অর্থাৎ খোস্‌রোজের বাজার হয় যাহাতে অন্যান্য রাজপুত নৃপতি ও সামন্তগণ স্ব স্ব কন্যা ও স্ত্রীদিগকে প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়েন, বুন্দী রাজসংসার এ প্রকার দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ পক্ষে মুক্ত।

৫। "দেওয়ানি আম" নামক সম্রাটের দরবারগৃহে সকল রাজপুত রাজারা সশস্ত্রে প্রবেশ করিতে পান না। বুন্দীর রাজবংশ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দরবারগৃহে প্রবেশ করিতে পাইবেন।

৬। বুন্দীর দেবালয় ও দেবমন্দির সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সম্রাট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

৭। মোগল সরকারের প্রথানুসারে, অনেক সময় রাজপুত নরপতিগণ, অন্য হিন্দু নরপতির অধীনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরিত হন। বুন্দী কখন এরূপ অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইবে না।

৮। রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে যাঁহারা সম্রাটের অধীনে সেনানায়কত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের অশ্বারোহী সেনাদিগের পরিচ্ছদে ও অশ্বগাত্রে, সম্রাটের অধীনতা-সূচক এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া থাকে। বুন্দীরাজসৈন্য সম্রাটের অধীনস্থ হইলেও এপ্রকার হীনতাজনক কোন চিহ্ন তাহাদের বহন করিতে হইবে না।

৯। বুন্দির অধীশ্বর যখন, সম্রাটের রাজধানীতে গমন করিবেন, তখন তিনি রাজপথে ও দিল্লির লালদরওয়াজা পর্য্যন্ত নাকারা বাদ্য করিয়া রাজোচিত সম্মানে যাইবেন।

১০। বুন্দীর অধীশ্বর যখন সম্রাটসদনে উপস্থিত হইবেন—তখন তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজগণের ন্যায় জানু পাতিয়া সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন না।

পাঠক! একবার এই ক্ষুদ্র রাজপুত সামন্তের তীব্র জাতীয় ভাব, ও উগ্র চৌহান শোণিতের কার্য্যকলাপ অবলোকন করুন। একবার ক্ষত্রিয়-কুলকলঙ্ক মানসিংহের সহিত এই চৌহান কুলগৌরব ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতির হৃদয়ের বলের তুলনা করুন।

আকবর সাহের সম্রাটোচিত গুণাবলীর মধ্যে "উদারতা" একটী সর্ব্বপ্রধান গুণ। এরূপ না হইলে তিনি এত বড় হইতে পারিতেন না। বুন্দীরাজার প্রস্তাবগুলি প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পক্ষে হানিজনক হইলেও, তিনি যেরূপ গর্হিত উপায়ে রণঅম্বরে চৌরের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া তাহাতে আহ্লাদের সহিত সম্মতি দান করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। আরো বুন্দীপতিকে বেনারসে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বুন্দীরাজ যদিও মোগলবাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা মুক্ত স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র।

আকবরসাহ সর্ব্ব প্রথমেই রায় সর্জ্জনকে গোণ্ডায়ানা প্রদেশাধিপতিকে দমনার্থে প্রেরণ করেন। সর্জ্জন সিংহ, প্রভূত বিক্রমে, গোণ্ডায়ানা বিজিত করিয়া তদধিপতিকে সম্রাট সদনে বন্দীরূপে আনয়ন করেন। কিন্তু পরিশেষে সেই বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন।

গোণ্ডায়ানা পতি সর্জ্জন সিংহের অনুগ্রহে স্বীয় রাজ্যের কিয়দংশ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন—এবং আকবরসাহ এই প্রবল শত্রুর পরাজয় পুরস্কার স্বরূপ রাজা সর্জ্জনকে, চুনার্ট প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

পবিত্রতীর্থ বারাণসী ধামে অবস্থান প্রার্থনা করায় রায় সর্জ্জনের কয়েকটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ে কাশীধামে, চোর ডাকাতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এতদভিন্ন, যবনাধিকার বলিয়া হিন্দু তীর্থগুলিতে যেরূপ অত্যাচার অবিচার হওয়া সম্ভব তাঁহার সকলই হইতেছিল। হিন্দুগণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিতচিত্তে কালাতিপাত করিত। রায় সর্জ্জন কাশীধামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া—সকল মহল্লাগুলিই সুশোভিত ও শান্তিশৃঙ্খলাময় করিয়া তুলিলেন। সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় এই ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুরাজ্যের সহায়তায় নিরাপদে তীর্থবাস করিয়া তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর এইরূপে তীর্থধামে কাটাইয়া, রায় সর্জ্জন এই পবিত্র ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা এই রায় সর্জ্জনকে বিকৃতরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এত বড় একটা মহাবীরের সম্বন্ধে তাঁহারা এত অল্প ও অসম্বদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। আমরা, বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই অসার অসম্বদ্ধ ঘটনাবলী হইতে সর্জ্জন সিংহের বিবরণ উদ্ধার করিয়াছি।

রাও ভোজ। মহাবীর সর্জ্জন রায়ের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার

রাও ভোজ ধরার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যবন লেখকেরা, দ্বিতীয় রাজকুমার দুধাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তৃতীয় রাজকুমার রায় মল্ল বলিয়া সাধারণে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ভোজই পিতার মৃত্যুর পর বুন্দীর সিংহাসন অধিকার করেন।

আকবর যে সময়ে গুজরাট জয়ের উদ্দেশ্যে মরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উষ্ট্রারোহী সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করেন, সেই সময়ে রাও ভোজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ যুবরাজ দুধা, সম্রাট কর্ত্তৃক এই যুদ্ধে ব্রতী হন। ভোজের দুঃসাহসিকতায় গুজরাটপতি যখন, ছিন্ন মস্তক হইয়া ভূপতিত হন তখন আকবর সন্তুষ্টচিত্তে ভোজরাজকে বলেন "আপনি কি কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করেন না"? বুন্দীরাজ তদুত্তরে বলেন "আমায় অনুমতি দিন, যেন সমস্ত বর্ষাকাল আমি নিজ রাজ্যে অতিবাহিত করিতে পারি।

রাও ভোজ পিতার ন্যায় মহাসাহসী, প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। আমেদনগর অবরোধকালে তিনি সম্রাট-সৈন্যের সঙ্গে যাত্রা করেন। চাঁদবিবির অসমসাহসিকতায় যখন সমস্ত মোগল-সৈন্য সন্ত্রস্ত ও বিস্ময়ীভূত, তখন রাও ভোজ অত্যল্পসংখ্যক রাজপুত সেনা লইয়া দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সম্রাটের সেনা প্রবেশের পথ করিয়া দেন। দুর্গ জয় হইলে আকবরসাহ রাও ভোজকে মহাসম্মানে সম্মানিত করেন। তাঁহার স্মরণার্থে আহম্মদ-নগরের দুর্গপ্রাচীরে "রাও ভোজের বুরুজ" নাম দিয়া একটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

রাও ভোজ পিতার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন কি না তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাটীতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে। বুন্দীরাজ তখন আগরার নিজ প্রাসাদে অবস্থান করিতে-ছিলেন। এই সময়ে আকবরের রাজপুত মহিষী যোধাবাইয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রিয়-তমা মহিষীর মৃত্যুতে আকবর অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া রাজ্য মধ্যে সাধারণকে শোক প্রকাশের চিহ্ন ধারণ করিতে অনুমতি প্রচার করেন। অশৌচ চিহ্নস্বরূপ সমস্ত মুসলমান ওমরাহগণও শ্মশ্রু ও মস্তক মণ্ডন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। হিন্দুরাজাদেরও উপর এই আদেশ প্রচারিত হয়। সম্রাটের ক্ষৌরকারগণ প্রত্যেক আমীর ওমরাহের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের শ্মশ্রু মণ্ডন করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তাহারা বুন্দীরাজের আবাসভবনে উপস্থিত হইল—তাঁহার আদেশে তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অপ-মানিত হইয়া দূরীভূত হইল।

অপমানিত ক্ষৌরকারগণ এই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বাদসাহের গোচর করিল। তাহারা বলিল—"ভোজরাজ যে কেবল আমাদের অপমান করিয়াছেন এরূপ নহে, স্বর্গীয়া মহিষীর বিরুদ্ধেও অনেক কটু কাটব্য করিয়াছেন। আকবর এই সংবাদে মহারুষ্ট হইয়া বুন্দীরাজের অতীত কার্য্যাবলী বিস্মৃত হইয়া আদেশ দিলেন—"তোমরা সকলে সেই দাম্ভিক রাজার শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দাও।"

একটা মহাহাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হইল। বুন্দীরাজের সৈন্যগণ সম্রাট-সৈন্যগণকে

পুনরাগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ মহাদম্ভে অসি নিকাসিত করিয়া সকলেই রণসজ্জায় সজ্জিত হইল।

সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা আকবরসাহ আদেশ প্রচারের অল্পক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রাও ভোজকে চিনিতেন। একটা মহা অনর্থ ঘটিবে এই ভয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষীয় সেনা সম্রাটকে দেখিয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইল। আকবরের হৃদয়ে কি জাগিতেছে তাহা বুন্দীরাজ বুঝিয়া লইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে অপ্রতিভ অনুতপ্ত বাদসাহের নিকট অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "সাহান সা! আমার স্বর্গীয় পিতার নামে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি নির্ব্বোধ—মৃত মহিষীর সম্মানার্থে, ক্ষৌর কর্ম্ম করিবার যোগ্য পাত্রও আমি নহি।" আকবর সাহ এই প্রকার সদাশয়তাপূর্ণ উক্তিতে, সেই তেজস্বী সামন্তের মনোভাব বুঝিয়া হইলেন। বীর না হইলে বীরত্বের গৌরব বুঝিতে পারে না। আকবর সাহ ভোজরাজকে সঙ্গে লইয়া সাদরে নিজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনার পর বুন্দীরাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎকাল বুন্দীতে বাস করিয়া রাজপুত গৌরব সম্যকরূপে উজ্জলিত করিয়া পরিশেষে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা, রায় ভোজের মৃত্যুর অন্যকারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রায় ভোজ মহারাজ মানসিংহের পুত্র, জগৎ সিংহের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। কেন যে তিনি এই যবন-সংস্পর্শিত রাজকুমারকে স্বীয় জামাতারূপে বরণ করেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ ব্যাপার। জগৎসিংহের এক কন্যা হয়। জাহাঙ্গীর সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ লোলুপতা প্রদর্শন করেন। তখন জাহাঙ্গীর নিজে সম্রাট। জগৎসিংহও ইহাতে সম্পূর্ণরূপে সম্মত। রাও ভোজ কিন্তু এই বিবাহের সম্যক প্রতিযোগিতা করেন।* ইহাতে জাহাঙ্গীর তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সম্মান রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া মনোদুঃখে আত্মহত্যা করেন। যবন ইতিহাস লেখকেরা একস্থানে বলিয়াছেন জগৎসিংহের কন্যা রাজ ভোজের দৌহিত্রীর সহিত অবশেষে জাহাঙ্গীরের পরিণয় হয়।

---

* আইন আকবর লেখক বলিয়াছেন—"It is said that Rathor and Kachwaha princess entered the Imperial Harem but no *Hara* princess (রাও ভোজ "হর" শ্রেণীভুক্ত চৌহান।) was ever married to a Timuride. (অনুবাদ—আকবর নামা). P. 459.

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

দুইটী বোন।

১

সকালে সাঁঝের বেলা বাগানে বেড়ায়,
ফুল তোলে মালা গাঁথে কত গান গায়।
এক বোন ডাল ধরে, আর বোন সাজি ভরে,
নাহি কোন ভ্রুক্ষেপ—ধারাল কাঁটায়।
পাইলে নূতন ফুল, সাধেতে সাজায় চুল,
দিদি দিদি বোন্ বোন্, মুখে বারোমাসি,
ভালবাসা বিনিময়ে ভালবাসাবাসি।

২

বালিকার "বাসীপাট" সকালেতে খাওয়া,
বিকেলের "মাথাবাঁধা" সাঁঝে ঘুম যাওয়া।
নিত্যকর্ম্ম আবদার, দিনে খাবে সাতবার,
তথাপি খাবার লাগি মার কাছে দাওয়া।
নাহি জানে লাজ লজ্জা, পুঁতুলের সাজসজ্জা,
মনোমত হলে পরে মুখভরা হাসি,—
দেখে পাড়াপ্রতিবেশী বলে "ভালবাসি"।

৩

হাতে বালা পায়ে মল গায়ে মাথা ধুলা,
এর বাড়ী তার বাড়ী রোদে জলে "বুলা"।
কারো না বারণ শোনে, ছুটে যায় দুই বোনে,
হাতটী ঠেকিলে গায় অভিমানে "ফুলা"।
দোষ গুণ নাহি বোঝে, কেবলি কলহ খোঁজে,
মা'র কাছে শেখা কথা মুখে রাশি রাশি,
বোনে বোনে এক কথা—শুধু ভালবাসি।

৪

পরবে পয়সা পেলে আর কেবা পায়!
কাপড়ের "খুঁটে বেঁধে সবাকে দেখায়।
কাঁচের পুঁতুল কেনে, বাবাকে দেখায় এনে,
কত কি জিজ্ঞাসে কথা সরল ভাষায়।
'ছোট তাস লাল ফিতে, বল ঝিকে কিনে দিতে,'
পরের পছন্দ নিতে নয় অভিলাষি,
ছোটর ভালয় বড় বলে ভালবাসি।

৫

শীতকালে উনুনের দুই পাশে বসা,
আগুনেতে হাত "তাপি" গালে মুখে ঘসা।
চ'খেতে আসিছে ঘুম, তবু হুঁ দেবার ধুম,
এতই বালিকা হিয়া গল্প-পরবশা।
শুইতে ডাকিছে যত, "যাবনা, যাবনা" তত,
উত্তরিতে দুজনাই সদা সমভাষি,
না হলে যে কমে যাবে ভালবাসাবাসি।

৬

করিতে গৃহিণীপনা কেঁদে করে কাদা,
চাই চাবিকাটী "খোলা" কাপড়েতে বাঁধা।
খেলা শালে "রাঁধা বাড়া" নিমন্ত্রণ নাই ছাড়া,
"গেনি' 'খাবে' 'মেনি" খাবে আর খাবে দাদা।
কাঠের পুঁতুল কোলে, সোহাগের তান তোলে,
নিতুই নূতন কাণ্ড—আনন্দ বিকাশি,
একদণ্ড নাহি ভোলে, ভাল বাসাবাসি।

৭

নাপ্‌তিনী ঘরে এলে পা কামান সাধ,
অলক্তক পরিবারে বিষম বিবাদ।
হাতে মাথে পায়ে মাথে, দিয়ে দেয় যাকে তাকে
কপালে সিঁদুর টিপ্—দ্বিতীয়ার চাঁদ।
প্রণামের তাড়াতাড়ি, আশীর্ব্বাদ কাড়াকাড়ি,
ঠান্‌দী, জ্যেঠাই, খুড়ি, বউ পিসি মাসি,
বলে "জন্মায়তী হও" কত ভালবাসি।

৮

ঘুমালে জগৎ ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা মা'র প্রাণ,
ক্ষণেকের তরে শুয়ে সুখে নিদ্রা যান।
গরমে সোয়াস্তি নাই, পাথা ধরে নাড়া চাই,
নতুবা দুয়েরি ঘুম জাগারি সমান।
সমাদরে গলা ধরে, কত মিষ্টালাপ করে,
ঘুমন্তে পড়িয়া থাকে শুধু পাশাপাশি,
স্বপনে স্বপনে সাধে ভালবাসাবাসি।

৯

কাপড়ের "বস্তা" কত একবার পরা,
আবার নূতন জন্য দাদাটিকে ধরা।
ধরিলে ছাড়ান্ কবে? তখনি আনিতে হবে,
না হলে দুইটী মুখ মলিনতা ভরা।
ধীরি ধীরি গুটি গুটি, হেমাঙ্গী হরিণী দুটি,
কাণে কাণে কয় চুপে দাদা কাছে আসি,
"নয় দাদা তোকে ভাই ভারী ভালবাসি"?

শ্রীশরৎচন্দ্র সরকার।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন।

তিনি পূর্ব্বে মৃত্যুকে ভয় করিতেন কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর হইতে তাঁহার সে ভয় দূর হয়।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এশঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করবো কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছা হয় পালাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে দুর্গা বলে, প্রাণত্যজি জাহ্নবীর তটে॥

দূর হয়ে যা যমের ভটা। (ভৃত্যটা)
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাব্‌লে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লে বলিস্ বেটা।
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখ্‌বে কেটা॥ ২

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
সে যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা সিকস্ত নদী, তাতে যে মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ওপদ পেয়েছো, জাননা সেই পদের মজা॥ ৩

এসংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥

নাইকো জরিপ জমা বন্দী, তালুকে হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনা সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেটা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমাআঁটা ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥ ৪

প্রসাদের গানের মর্ম্ম দ্বিজ রামপ্রসাদ কর্তৃক চতুর্থগানে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভালব্যাপার মন কত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ কেউ বা হারাল মূলে ॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুদ্‌ব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পাদে ডুবিয়া দিলে ॥
পাঁচ জিনিষ নে ব্যবসা করা পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত ॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি বইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি ॥
এনেছিলে বসে খেলে মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে, মন তখন তহবিল হবে খালি ॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে যায় রে চুরি ॥

প্রসাদের রচনায় কেমন সুসম্বদ্ধ ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে। এই প্রভেদ দ্বারা তাঁহার রচনা অন্যকবির রচনা হইতে সহজে পৃথক্ করা যাইতে পারে।

রাম প্রসাদী পদাবলীতে মধ্যে মধ্যে আইন বিষয়ক গানও আছে। সে সকল গুলিই যে তাঁহার রচনা তাহা বোধ হয় না। কোন কোনটিতে ইংরাজী কথা ডিক্রী ডিস্‌মিস কলেক্‌টরী আদি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় সে গানগুলি তাঁহার রচনা নয়। তাঁহার

আইন সম্বন্ধীয় গানে তিনি কাজীর বিচারে প্রযুক্ত পারসী কথাগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন।

হয়েছি ঘোর ফরিয়াদি।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন করিছে জানিবদারী নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার বেটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুরে হতে দূর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী ॥
হুজুরে তজবীজ* কর মা, হাজির ফরিয়াদি বাদী।
এ স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
এমা তোমার পুতে সতিন সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পাদি ॥ ১

তারা আমি নই আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করিনে তোর চোখ রাঙ্গালে ॥
* * * * *
* * * * *
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে ডিক্রীলব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরু দত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥ ২

যারে শমন যারে ফিরি!
ওতোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥
পাপ পুণ্যের বিচারকারী তোর যম হয় কলেক্টরী।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্ব শূন্য, পাপ দিয়ে বা নিলাম করি ॥
ইত্যাদি............ ॥

---

* তজবীজ বিচার, মীমাংসা। তজবীজ লিখনা—to write Judgment। জানিবদারী পক্ষপাত করা।

প্রথম গানে কেমন নম্রতা ও সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ রহিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় গানে ভক্ত তেজের সহিত ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রসাদের সময়ে কাজীর বিচারই প্রচলিত ছিল যেহেতু তাঁহার একটী গানে সে প্রকার আভাস পাওয়া যায়। সে সময় তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ৩০।৪০ হইয়াছিল—

ছিছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদ পদ্ম সুধা ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজীর তাজী।
তুমি ঠেক্‌বে যখন শিখ্‌বে তখন, কর্‌বে কালে পাপোষ বাজী॥
বাল্য জরা বৃদ্ধদশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজী।
পড়ে চোরের কোটায় মন টুটায়, যে ভজে সে মদ্দগাজী।
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি॥

এগানে প্রসাদ দুই একটী নূতন কথাও গড়িয়াছেন যেমন গতাজী ও হাজী। উভয়ের অর্থ মৃত্যু। পূর্ব্বের একটি গানে ভৃত্য স্থানে ভটা ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সকল কবিদেরই সম্ভবে। প্রসাদ দ্বেষাদ্বেষী করিতেন না—

মা আমার অন্তরে আছ।
কে বলে অন্তরে শ্যামা
মা আমার অন্তরে আছ॥
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে পাচেরে এক ক'রে ভাবে তার হাতে মা কোথায় বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যেজন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নিৰ্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ১

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দুআঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত আমায় পাগল বোল বলে সকলি।

আমার যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥
শ্রীরাম প্রসাদে বলে মা বিরাজে শত দলে।
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥ ২

নিতান্ত এদিন যাবে এদিন যাবে কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অশেষ কলঙ্ক হবে গো।
এসে ছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো ॥
দশের ভরা তরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়।
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথায় পাবে গো ॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দেমা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাষাণ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥ ১

সময় তো থাক্‌বে না গো মা কেবল কথা রবে।
কথা রবে কথা রবে মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কি বা মন্দ কালী অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নামে, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে ॥ ২

এই দুই গানের ভাব এক। প্রথমটী প্রসাদের মৃত্যুর প্রায় সমকালের রচনা। তাহাই আদর্শ করিয়া কোন কবি দ্বিতীয় গান রচনা করেন কিন্তু রচনার মাধুর্য্যে ও করুণরসের ভাবে প্রসাদের গানই ভাল।

আয় রে মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্প তরু তলায় গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
ইত্যাদি * * * * ॥

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জান না মান না শুন না কথা

অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয়, তবে শ্যামা মারে পাবা॥

ইত্যাদি

এই দুই গানেরও মর্ম্ম এক তবে রচনার প্রগাঢ়তায় প্রসাদ অদ্বিতীয়। যে প্রসাদের মন কালীময় ভাবে পরিপূর্ণ তাঁহার তদ্বিষয়ক রচনাও যে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্য কবি তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া রচনাটী নীরস করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃত ভক্তগণ কোন ধর্ম্ম বা দেব দেবীর প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন না।

মন কর না দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী॥

* * * * *

* * * * *

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাঁসি
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গয়াগঙ্গা কাশী॥

তাই কালো রূপ ভালবাসি

* * * *

যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালোরূপ তাঁর হৃদয় বাসী॥

* * * * * * * *

ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন কর না দ্বেষাদ্বেষী॥

ঈশ্বরের স্বরূপ নাই। তিনি ভাবের বস্তু। ভাবের অভাব হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তবে প্রতিমা গঠন কেবল মন একাগ্র করিবার উপায় মাত্র। প্রসাদ নিম্নরূপে ঈশ্বরের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন—

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর, তোমার শক্তি সারে।
আছে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়দর্শনে দর্শন পেলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক সদা নন্দপুরে বিরাজ করে॥

সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে অমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
শেষটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারেঠোরে॥১

কে জানে কালী কেমন।
ষড়্দর্শনে না পায় দর্শন॥
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদয় ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাঁসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন॥২

যোগতত্ত্বকে এইরূপ ভাবে গানে সাধারণের গোচর করা প্রথমে প্রসাদই করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

নূতন বিজ্ঞান।

(বক্তৃতা।)

২

টাপ।

টাপ একটী প্রকৃত কলির কাপ। সদাই সন্দিগ্ধ—ভীত—জড়সড়—বেয়াড়া মানসিক আতঙ্কপূর্ণ। সুতরাং নিয়ত প্রকাণ্ড কোণে বসিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিতে চায়। বস্তুতঃ নাম ও মার্কা অনুকরণের ভয়ও বিস্তর, তাই অনেকে অনেক সময় উহাদিগকে ফ্যাঁসকোঁসের জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে। অপিচ ফ্যাঁসকোঁসও অভ্যাসগুণে নাম এবং মার্কার কাব্যালঙ্কার হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, সেই হিজিবিজি আড়ম্বরে প্রকৃত পদার্থ কাহার সাধ্য নিরাকরণ করিতে পারে! যেমন অলঙ্কার প্রাচুর্য্যে কাব্যের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, অপর্য্যাপ্ত বেশভূষার দৌরাত্ম্যে যেমন চেনা লোকও আজগুবী হইয়া পড়ে, সেইরূপ ফ্যাঁসকোঁস বা হিজি

বিক্রির আতিশয্যে স্থায়ী নাম বা মার্কা নির্ব্বাচন করা দুর্ঘট হইয়া থাকে। একটি পূর্ণচন্দ্রে হৃদয় উছলিয়া উঠে, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ছড়াছড়ি করিলে ৺জগন্নাথজির মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়। তাই অনেক সময় নামের রচনাচাতুর্য্যে "প্রসাদ দাস ঘোষকে" পাহাড়পুরে ভঁইস পড়িলেও অসঙ্গত বলা যায় না। "মুর্চিরাম" যে "ঘটিরাম" হইয়াছিল, তাহার কারণই এই। যাহা হউক, অনুকরণের আতঙ্ক প্রযুক্ত অনেকে আবার অনেক সময় নিজ আবিষ্কারের নামও বিকটাকার ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন। কোথাও বা অজানিত ভাবে আপনিই হইয়া পড়ে। Habit is second nature. আর তাই বা কেন? শাস্ত্রে কথিত আছে আর্সুলা কাঁচ-পোকা ভাবিয়া নিজে কাঁচপোকা হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞানেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিণতিবাদ যাঁহাদের আলোচনার সামগ্রী তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে কীটপতঙ্গাদি শত্রুর হাত এড়াইবার জন্য বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতি আশ্রয়ভূমের বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনেরও নাম বা মার্কা সেইরূপ অনেক সময় অনুকরণ ভয়ে আপনিই অননুকরণীয় হইয়া পড়ে। এমন কি, অজানতও কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়ায়। যথা, চ্যাঙ ভ্যাঙ ননদীর হাঁপেলিক্সর, দৃষ্টাদৃষ্ট রোগারিষ্ট, বি. চি. ঘরের দাঁতুড়ী কৌটা, এমাম বক্সের এব্রমা হিঙোলিনা, ভাদুড়ীর ভিঙ্যালিকা ভার্গলিনা, ক্যাদড়াকাষ্ঠা কুড়ুম্বা, মিস ইলাজা কলসার মিশ্চুরিয়া দেশান্তকারিকা, ইত্যাদি। আপনারা অবশ্যই স্থির বুঝিয়াছেন যে এ সকল দিক্‌পাল নাম কতদূর অনুকরণীয়।

তবে কতকগুলি নাম সুমিষ্ট ও স্বতঃই অননুকরণীয় বটে। তাহাদের Genius এর কাছে কাহারই অগ্রসর হইবার শক্তি নাই। আমাদের Immortal ঘাসীরাম ও মুকুন্দ ইহার প্রধান প্রাচীন দৃষ্টান্তস্থল। হনীপ চাচার চা, কেদো বাগ্দির মলম, ক্যাবলার দই, বোকোর ট্যাপের খই, দেকোদীত্রের প্যাচন, প্রভৃতি নব্য আবির্ভাব। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে ইহাদের কখন অনুকরণ হয়ও নাই, হবেও না। ইহারা মিল্টনের মত সরল ও সুরেলা এবং বেকনের মত শুভ্র ও সারবান্। একটি অক্ষর এদিক ওদিক হইলেই সমস্ত পারিপাট্য এবং তাৎপর্য্য একদম নষ্ট হইয়া যাইবে। এত সারল্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য যে সাদা কথায়, বিনা চাতুর্য্যের ফ্যাঁসফোঁসে সংরক্ষিত হইয়াছে, ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে। রাজার নকল আছে, আদালতের রায়ের নকল আছে, দেশহিতৈষীতার নকল আছে; সাহেবের, টাকার, সোণার, রূপার, ধর্ম্মকর্ম্মের নকল আছে; কেবল মাত্র এইরূপ কয়েকটি নাম ও অভিজ্ঞানের নাই। চেষ্টা করিলেও হইবার যো নাই। ফরেস্‌ডাঙ্গা কলিকাতার পুরা নকল, শুদ্ধ ঠনঠনে গঙ্গার জলোবাতাসে চ্যাপটেপে হইয়া গিয়াছে। ইহাদের অনুকরণেও সেইরূপ দুর্দ্দশার ভয় আছে। তাই কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান না। নতুবা এতদিন অনুকরণের তেহাইয়ে সংসার তোলপাড় করিয়া ফেলিত।

"Beware" বা "সাবধান" টাপের আর একটি অঙ্গ। কারণ যেখানে বুড়কে সেই

খানেই গুনুকে, সুতরাং বিজ্ঞাপনে ওস্তাদী গাহনার বড়ই আবশ্যক। গান হইল, গায়কের মুখভঙ্গী ও স্বরে বীর, করুণ, বীভৎস প্রভৃতি রসের উদ্দীপনা হইল, কোথাও বা দীপক রাগে বেচারা জ্বলিয়া, পুড়িয়া, মরিয়া গেল; সুর, তাল, মান, লয় সকলি রহিল, গানের কথাগুলি কিন্তু শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াও কার্দানিবশতঃ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু মনের আতঙ্ক, কোন শ্রুতিধর যদি ঘুনাক্ষরেও কিছু পাইয়া থাকে। এস্থলে সাধারণকে সতর্ক না করিলে বিপত্তির সম্ভাবনা। কি জানি ভুলক্রমেও কেহ যদি সেই সঙ্গীত-অপহারক কথকের নিকট সেই ভুলগান আদায় করিয়া সঙ্গীত-নায়কদিগের অবমাননা করে।

পি. সি. মার দদ্রুদমনের প্রচার দেখিয়া কেবলরাম নিজ পুত্রের নাম পিতাম্বর রাখিলেন। ইচ্ছা মার ঔষধটির নামও মার্কা সমেৎ আত্মসাৎ করেন। নিষ্ঠুর পিনালকোড্ লগুড় হস্তে রাস্তায় রাস্তায় ফিরিতেছে; ভয়ে "পি. সি মার দদ্রুদমন মলম" ছাপাইয়া দিলেন এবং পি. সি. মাঁর দোকানের সন্নিকট দোকান খুলিয়া গদিয়ানী চালে বসিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে ক্রমে মা. সি. মা, "পি. সি. মার," "পি. চ. মার," "পি. এম. মার," "পি. এল. মার" ভৈরব আরবে ভারতভূমি কাঁপিয়া উঠিল৷ অবশেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী নাকি সেই রাস্তার নাম "দদ্রুদমন মলম রোড" দিতে ত্বরায় বাধিত হইবেন। "জগদ্বিখ্যাত কে. এম. দাসের চটীর" চোটে কালীশঙ্কর দুই হাত বাড়াইয়া "কে. এস. দাস" হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইলেন। শিবশম্ভু বামুনের ছেলে, নিরন্ন; জীবিকার লোভে "এস, এম, চট্টোর তালতলার চটির" চ্যাংড়া ফিরাইলেন। তাহা দেখিয়া শরচ্চন্দ্র "এস, চট্টোর তালতলার দোতলা চটি" মাথায় করিয়া ফিরি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পরিণতিবাদের যুক্তি অনুযায়ী "চট্টগ্রামের আসল চটি," "আসল চটি চট্টগ্রাম," "চটি আসল চট্টগ্রাম," "আসল চট্টগ্রাম চটি," প্রভৃতি পারমিউটেসন কম্বিনেসনের নক্সায় লোকের শ্রবণ বধির হইয়া গেল। আবার এই দেখুন চারপাই কোম্পানীর সবিশেষ উন্নতি দেখিয়া ছপাই, আটপাই, দশপাই, এক আনা কোম্পানীতে সহর ভরিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় "Beware of spurious imitation" প্রভৃতি তন্ত্রমন্ত্রের নিতান্ত আবশ্যক। কোথাও নকল হইবার ভয়ে আবশ্যক; কোথাও নকল হইবার ভয় নাই বলিয়া আবশ্যক। এটি একটি ভয়ঙ্কর লজিকেল ডিলেমা—যাহার প্রচার অধিক, তাহার নকলের ভয়ে আবশ্যক, যাহার প্রচার নাই, তাহার প্রচার করিবার জন্ত আবশ্যক; লোকে বুঝিবে বড় বিক্রি, সুতরাং কার্য্যপ্রদ। যেমন কবি, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতির ছড়াগত প্রাণ, বিজ্ঞাপনেরও সেইরূপ Beware-গত প্রাণ। মহাত্মা যাদীরাম, মুকুন্দ প্রভৃতি ব্যবসায়ে প্রথম ছড়া প্রবর্ত্তনা করেন। ক্রমে নানখাতাই, নকলদানা, অবাক চাক্তি, গোয়াদের চানা প্রভৃতি তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। অথচ ইহাদের কাহারই বোধ হয় নকলের ভয় নাই! তবে এসকল কাব্যদ্রব্যে ভণিতা অপরিহার্য্য। অধিকন্তু নকলদানা-প্রণেতা কাব্যশক্তি সত্ত্বেও চুলে চুলে বৈজ্ঞানিক। তাঁহার প্রণালী খাঁটি inductive;

যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং। তাঁহার রঙ, ঢঙ, সঙ নাই। লোকে নকলকে আসল বলে, ইনি নকলকে নকলই বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের পথই এইরূপ সরল ও মসৃণ। তবে খৃষ্টীয় নম্রতা যেমন "পচা খোলে" পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নাই। ইনি নতমুখে দীন হীন মলিন-ভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে গব্যরস বিলাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সে উচ্চ উদার ভাব সকলে বুঝিতে পারে না। এই রহস্যে একটু Initiated না হইলে বুঝিবার যোও নাই। বৈজ্ঞানিক ভাবুক নহে—প্রেমিক নহে—প্রতিভান্বিত—সত্যপ্রিয়। তিনি কোন বিষয়েই কখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন না। অতি অকিঞ্চিৎকরকেও মাথার মণি করিয়া রাখেন।

উপরে "টাপের" কেবল মাত্র কয়েকটী সামান্য নামজনিত চিত্র দর্শান হইল। এক্ষণে আপনাদিগকে, দুই একটী মার্কা রহস্য দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইব। এই যে কাল বোতল—, আকৃতি দেহ এবং কুম্ভকর্ণের ন্যায় পেট, ও মুখ, আকাশপাতাল-যোড়া হাঁ করিয়া কি গিলিতেছে; ইহার উপরে সাদা অক্ষরে যাহা লেখা আছে পাঠ করুন এবং ভাল করিয়া মার্কাটীর ফ্যাঁসফোঁস ছাড়িয়া দিয়া দেখুন, বিবাহের টোপর পাইবেন এ বিষয়ের সামান্য একটু ইতিহাস আছে। প্রথম কোন আর্য্যজীবন সুবুদ্ধি শুঁড়ীসন্তান বিলাতে একটী টোপর পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার বিয়ারের মার্কা করিতে অনুরোধ করেন এবং একচেটিয়া ব্যবসার প্রত্যাশায় সেই ট্রেডমার্কটী ত্বরায় রেজিষ্টারি করিয়া ফেলেন। নিরতিশয় বিক্রয় দেখিয়া birds of the same featherএরা সেই টোপরের নকল করিতে ভিন্ন ভিন্ন আরঙে আবেদন করেন। হোম ডিপার্টমেণ্টে ভিতরকার রহস্য কেহই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সুতরাং নকলে মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জিত, জিওমেট্রি ও কনিক সেক্সনের সকল diagram আসিল। নকল কিন্তু কিছুতেই অবিকল হইল না। সকলগুলিই অচলভাবে বাজারে পড়িয়া মাটি হইতে লাগিল। আসলের আরও তেজ হইল। পরে অনেক মাথা কুটিয়া Hoggs Brotherএরা Foolscap মার্কা বিয়র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে শুদ্ধ লোক হাসানই হইল—কাজ কিছুই হইল না। মার্কাটী বস্তুতঃ স্বতঃই অননুকরণীয়। এইরূপ সত্য-পীরের ঘোড়া মার্কা থানেরও নকল মাথা তুলিতে পারে নাই। বিলাতী conceptionএ সে Zoological curiosityর আদৌ নির্ণয়ই হয় নাই। হাতী, বরাহ, শশক, গাধা, হরিণ প্রভৃতি যাহা অনুমানে আসিল, তাহা চেষ্টা করিয়া নিতান্ত খারাপ করিলেও উহার অনুরূপ রস রক্ষা করিতে পারিল না। আর্দ্দলো মার্কা সসেজের নকলেরও নাকি সেইরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল। মার্কার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাই আজ অবধি একাই জগৎ আলো করিয়া বসিয়া আছে।

ঢপ।

পূর্ব্বেই বুঝা হইয়াছে যে ঢপ অর্থে কায়দা, কসরৎ, কেরামৎ, ধুয়া, ধরণ, ধারা, ঢেউ, তুফান, সাময়িক তরঙ্গ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। যখন যে দেশে যে ঢপ উঠে তখন সেই স্রোতে

গা ভাসান দেওয়াই সুবুদ্ধির খেলা; তবেই কাযকর্ম্ম ছপড় ফোড়কে চলিয়া থাকে, সর্ব্বত্র অগ্রণী হওয়া যায়। অপিচ যেমন কীর্ত্তনাঙ্গের মধ্যে ঢপ আছে, তেমন বিজ্ঞাপনের মধ্যেও ঢপ আছে। বিজ্ঞাপনও তো কীর্ত্তন বই ত নয়। তবে ইহাতে শুদ্ধ নিজ গুণকীর্ত্তনই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কায়দা বা ঢপ নিতান্ত আবশ্যক। সহজে কি আর লোকের মন গলিয়া পচিয়া মরিয়া যায়?

সুখের বিষয় আজকাল সভ্যজগতে বিজ্ঞানের আদর সমধিক। যখন বিজ্ঞাপন সেই সভ্যতার কেন্দ্র, তখন আদর না হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। তাই বিজ্ঞাপনে প্রায়ই সকল বিজ্ঞানের ধ্বজা উড্ডীন দেখা যায়। কোম্ত বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ও পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ দর্শাইয়াও বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞানের উল্লেখ করেন নাই। আর করেনই বা কিসে? বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞান তখন তো আর সমুদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং তিনি সমাজ-বিজ্ঞানকে সর্ব্বোচ্চে সংস্থাপন করিয়া সকলের সহযোগিতা দেখাইয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বৈজ্ঞাপনিক বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের শিরোমণি। ইহাতে সকল বিজ্ঞানেরই ছায়া আছে। সকল বিজ্ঞানই স্বীয় রত্নরাজি লইয়া ইহাকে সুসজ্জিত করিয়াছে। আগে কাব্যের আদর ছিল, তাই ঘাসীরাম, মুকুন্দ প্রভৃতি জগতে জয়ডঙ্কা মারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনে—ঘোরতর ভয়ঙ্কর দুর্ব্বিসহ এতদিনে শিক্ষিতের নিকট বিজ্ঞানের ধূলাগুঁড়ারও মহা খাতির হইয়াছে এবং হওয়াই উচিত। এখন বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, বৈজ্ঞানিক পরকাল, বৈজ্ঞানিক স্বর্গের জন্য লোক লালায়িত। বলিতে পারি না, হয়ত ত্বরায় টনেল নয় তো পিয়নো কোম্পানির ষ্টীমারে ভব নদীপারের অনুষ্ঠান হইবে। বিএ পাস করিয়া ছেলেরা ভাবে নিরক্ষর লোকে বিনা অপ্টিক্সে কিরূপে চক্ষে দেখিতে পায়। যখন তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোকেও শতকরা পঞ্চাশ জন বিনা চস্‌মায় দেখিতে পান না। ফিজিক্স বিনা সাধারণ লোকের উঠা বসা করা অনুচিত। জানি কি, গ্রাভিটেসনের ব্যত্যয়ে হাতপা ভাঙ্গিবারই সম্ভাবনা। ডাইনামিক্‌স না জানিয়া পথ চলা ভাল নয়—কেননা Laws of motion না জানায় গাড়ী—ট্রামগাড়ী চাপা পড়ার পদে পদে আশঙ্কা। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের সিলমোহর ভিন্ন কোথায় কে কল্‌কে পাইবে? তাই পথে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, প্রাচীরে, দ্বারে, জানালায়, ট্রামগাড়ীতে, ষ্টেসনে, খপরের কাগজে, পাঁজীতে, পুঁথীতে, হোটেলে, আস্তাবলে, গরুর গাড়ীতে; লোকের হাতে, ঘাড়ে, মাথায়, কপালে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপন সুশোভিত হইতে দেখা যায় যথা। বৈদ্যুতিক বালা, তাড়িৎজড়িৎ তাবিজ, ম্যাগ্নেটিক্ মল, টেলিফোনিক কর্ণফুল, মাইক্রস্কপিক মাকড়ী, অপ্টিকেল সুরমা, এক্রোব্যাটিক্ কোট, নন্‌কণ্ডাটিং কম্বল, ক্রমেটিক্ কণ্ঠমালা, ডিনামাইটিক্ পাদুকা, পেরিপ্যাটেটিক্ প্যান্ট, কোহিসিভ শার্ট, সাইকিক্ মাদুলী, এলো-ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথিক্ ফাঁকি, কবিরাজী ধোঁকা, কেমিকেল গহনা, ফিজিওলোজিকেল পেয়, ম্যাথামেটিকেল টেবিল, বটানিকেল চেয়ার, বুদ্ধাবতের বিচিত্র চিতার মুখ (anatomical) নাট্যবিকারের ন্যয়রাজি, ফুঁএটাইজড বা গ্যাসেটাইজড

ওয়াটার (Medical) প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা জগতের অনির্ব্বচনীয় হিতসাধন হইতেছে।

এখানে যে সকল বিজ্ঞাপনের বৈজ্ঞানিক অধিকার সুবিস্তারে দর্শান হইল, তন্মধ্যে কেবল পলিটিক্যাল একনমির কোনই নিদর্শন নাই। তাই অনেক পরিশ্রমে ও যত্নে এই মহা অপ্রতুলটী দূর করিবারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। "পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা," "বিনা ব্যয়ে চৌদ্দ খানা," "অতি সস্তা, ফুরালে আর পাবে না, নজগজে সিঁথী," "অর্দ্ধ মূল্যে, সিকি বাদে এবং সিকি কমিসনে বোম্বাই সাড়ী," "অর্থের অব্যর্থ সন্ধান," "গুপ্তধনের গোয়েন্দা," "একদম বড় লোকের রাস্তা, ইত্যাদিতে বিশেষ অভাব মোচন হইয়াছে। Old Charley going Home. Half price clearance sale. A rich stock of hobby horses. তিনটা পাশ করা ডাক্তার; চক্ষুরোগে অদ্বিতীয়; পীলাযকৃতের যম; দর্শনী নাই; শুদ্ধ সামান্য ঔষধের দাম। দীনদরিদ্রের একমাত্র বন্ধু।

বিজ্ঞানে সকল অসম্ভব ব্যাপারই সুসাধ্য হইয়াছে; কেবল প্রতিভার সৃষ্টির জন্য এতদিন বড়ই-লাগাপড়া ছিল। তাহাও নাকি আজকাল অনায়াস সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। "ব্রহ্মরন্ধ্র দীপক পঞ্চামৃত তৈল" মর্দ্দনে মাথা ভাল থাকে, চুল পাকে না, ময়লা হয় না, শত যোজন সুগন্ধ ছুটিয়া বেড়ায় এবং সপ্তাহকাল মাত্র ব্যবহারে বোকারও বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। অনেক বড় লোকের প্রশংসাপত্র আছে। বিলাতেও ইহার গুণ সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

29, Marcopolo Street,
Trickers Hospital, London, E.C.
April 1, 1888.

John Fox Doobut (ডুবুৎ), Esq.,
Pioneer Medical Novum Organum, Chittagong.

Dear Sir,

I have tried your world-known Oil in several cases of hereditary idiocy, and am happy to say it has had miraculous effect upon them all. I hope you will, by your godsend Philcomb, soon fill the world with geniuses.

Yours Faithfully,
J. NOWHERE, M.D.

মহাশয়, আপনি আমায় যে তৈল পাঠাইয়াছেন তাহা আমি ব্যবহার করিতে সাহস পাই নাই, এবং করিবার অভিলাষও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে মহাশয়ের তৈল পাইবার পরদিনেই আমি এই চিঠিখানি লিখিতে পারিয়াছি। ইতি পূর্ব্বে কালি কলমের সহিত আমার কখনও কোন সম্পর্ক ছিল না। আপনি দেখিয়া সুখী হইবেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রেরণ করিলাম। একদিনে সহসা পত্র লেখা সামান্য আশ্চর্য্যের কথা নহে।

আমার মত নিরক্ষর লোক আপনাকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে। আশা করি ত্বরায় গ্রন্থ লিখিয়া মহাশয়ের শ্রীকর কমলে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

একান্ত

মৃত মহাত্মা শ্রীহলধর রায় চতুর্ধুরীণ, জমীদার ভগলপুর।

ভবের ভেলায় "বড়" কর্ণধার। এ কথাটী কাব্য নয়—বিজ্ঞান। তাই লোক ধনী এবং উচ্চ পদের পদানত হইয়া থাকিতে চায়। "পুষ্প সঙ্গে বসে কীট দেবের মাথায়।" ইহার নিত্য শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জগতে নমিস্থালি জয়ের একাধিপত্য। মনুষ্য চরিত্র নামতায় মোড়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়র জয় জয় কার সাংসারিক জীবের চরম শিক্ষা। "সেবকশ্রী," "আজ্ঞাকারী," "মহামহিম" বিদ্যার শেষ পাঠ। সকল বিদ্যা যেন সেইখানে মিলিয়া প্রয়াগ তীর্থ উদ্ভাবন করিয়াছে। উনবিংশতি শতাব্দির উন্নত প্রান্তে, বিদ্যাবুদ্ধির জলন্ত ক্ষেত্রে যে বড় নামের বড় আদর হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? আজকাল শুদ্ধ বড় নামের দোহাই দিয়া বড় হওয়া যায়। বড়ত্বের এই সোজা পথ। "সেবকশ্রী" দিয়া "আজ্ঞাকারী" হইয়া "মহামহিমে" পৌছিতে হয়। শুনিয়াছি বড়গাছের ছায়ায় ছোট গাছের বৃদ্ধি নাই। ইহা Botany হইলে হইতে পারে, কিন্তু এ কথা Humanityতে খাটে না। মানুষ বড়র আশ্রয়ে বাড়িয়া থাকে। এমন কি, বড়র বাড়ীর কাছে থাকিলেও বাড়িতে পারে। বড় নামের বাতাস গায়ে লাগিলে মানুষ বা সামগ্রীর বড়ত্ব জন্মে। তাই ধর্ম্মশালা, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, বাগান, বাড়ী, পথ, ঘাট, মাঠ, নদী, নালা, গোলি, খুঁজি, ছাতা, জামা, লাঠি প্রভৃতিতে বড়র এত ধূয়া দেখা যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অপরিহার্য্য। কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে? আর কেনই বা কিসেই বা অন্যথা ঘটিবে? টমাস কার্লাইল বলেন, "For, as I take it, Universal History, the history of what man has accomplished in this world, is at bottom the History of the Great Men who have worked here. They were the leaders of men, these great ones; the modellers, patterns, and in a wide sense creatois, of whatsoever the general mass of men contrived to do or to attain; all things that we see standing accomplished in the world are properly the outer material result, the practical realisation and embodiment, of thought that dwelt in the Great Men sent into the world :.............."

তবে আর বিজ্ঞাপন "বড়র" দোহাই না দেয় কেন? বিজ্ঞাপন ত এক প্রকার সামাজিক নক্সা বটে। "মহারাজাধিরাজের বৈদ্যসঙ্কট হাসপাতাল," "রাণীমাতার আখড়া," "রায়-বাহাদুরের মোরোব্বা," "সাজেহান বোতাম," নূরজিহান গলাবন্ধ, লিটন অম্বল, ল্যান্সডাউন্ নস্য, এলিয়ট পাচনবাড়ি, ধর্ম্মাতর্কপঞ্চানন, খাঁ বাহাদুরের মিসেলিনিয়স জেলো, গবর্ণমেণ্ট

গঞ্জিকা, পাগুনিয়র কোল কোম্পানী, বিডন্ স্কোয়্যার, নেল্‌সন্ রিডর্, আরঙ্গজীব ফিতা, চাঁদপাল ঘাট, গুলুওস্তাগরের গলি, দবড়াগাজীর কুড়ল, মিউনিসিপাল স্লাটারহাউস্, প্রভৃতি আর কত বলিব। এ সকল বিজ্ঞাপনের বোধ করি আর আপনাদের চাক্ষুষ প্রমাণের আবশ্যক নাই—ইহাদের গুণাগুণ আপনাদের সকলের নিকটেই বিলক্ষণ বিদিত আছে।

নূতনত্ব চপের আর একটী উপাদান। যদি মনুষ্যচরিত্র কাটিয়া, ফাড়িয়া, ছিঁড়িয়া, খুঁড়িয়া দেখা যায় তাহা হইলে নূতনের পিপাসা প্রবৃত্তিমার্গে বড়ই প্রবল প্রতীয়মান হইবে। নূতনত্ব বোধ করি প্রকৃতির আদি কাব্যরস। নূতন নূতন সকলি লাগে ভাল। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় নূতনত্ব আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণ। ইহাই এ প্রকাণ্ড বিশ্বব্যাপারকে বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং বিষ্ণুই নূতন নূতন অবতার হইয়া বিশ্বসংসারকে মাতাইয়া থাকেন। বিজ্ঞাপন বিজ্ঞান বই ত নয়। ইহাতে যে নূতনের আদর হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আজ এ্যানি বেশান্তের গীতার ব্যাখ্যায় হিন্দুসন্তানগণ "কাঁদিয়া ভিজান মাটি," কিন্তু আজন্ম শতশত বড় বড় দিক্‌পাল ব্রাহ্মণপণ্ডিত গীতার সটীক ব্যাখ্যায় মাতামুড় খুঁড়িয়া গালে মুখে চড়াইয়া প্রাণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে কেহ কাঁদিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহা নূতনের আকর্ষণ বই আর কি? নূতন কশাঘাতে পুরাতন চক্ষে দরবিগলিত ধারা বাহির করিয়াছে। থিওসফী নামও ধর্ম্মসংসারে সেই নূতনের ছাপ মাত্র। এ্যানি বেশান্ত বলেন, ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম; অল্‌কট ঠাকুরের মতে ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম; বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সালজারের মতে এ্যাও নয়, অও নয়, দাদা যা বল্‌চেন ত্যাও নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক লোকে কখনই কোন বিষয়ে শীঘ্র কমিট্ করিতে চান না। ফলে ইহা হিন্দুধর্ম্ম হইলে আনন্দের বিষয় বটে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এমন বিজাতীয়, ব্র্যাণ্ডি-চুরটের গন্ধবিশিষ্ট এত ভজকট নাম কেন? বৈজ্ঞানিক নাম তো কতকটা বিজাতীয় কটভজ হওয়াই চাই। বিজ্ঞান তো আর আমাদের দেশীয় সামগ্রী নয় যে সুমিষ্ট চন্দনগন্ধবিশিষ্ট নাম পাইবে। কোন দিগ্‌গজ থিওসফিষ্ট বলেন যে নূতন নাম নহিলে লোকের আকর্ষণ হইবে কেন? তাই বলি, দাদা পথে এস। নূতন তো চপের একটা প্রধান অঙ্গই বটে। আমিও তো এতক্ষণ তাই বকে মরছিলাম। ফন্দিটা ঠিক বৈজ্ঞানিক বটে। এ কথায় অনেকের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। এতদ্বিষয়ে একটা ভয়ঙ্কর কুসংস্কার আছে। বিজ্ঞানবিবর্জ্জিত লোকের মাথায় একটা কথা বড়ই ভয়ানক বসিয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকল বিষয়েই নূতনের আদর স্বীকার করেন; কেবল ধর্ম্মে নহে। এখন বোধ করি তাঁহাদের চক্ষু দান হইল। এতদিনে বিজ্ঞানরাজ্য একছত্র হইয়া দাঁড়াইল। পরিচ্ছদে, আস্বাদনে, ইন্দ্রিয়প্রপঞ্চে নূতনত্বই রাজা। আজকাল জ্ঞানরাজ্যেও তাহার অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহকাল পরকাল সর্ব্বত্রই নূতনত্ব তাড়া মারিয়াছে। জানত অজানত আমরা নূতনের দাস। সে প্রবল প্রতাপ কাহার সাধ্য সম্বরণ করে? সংসারে Familiarity breeds contempt! সূক্ষ্মদর্শী [illegible]কায় ডাক্তার জনসনের কথা আজ বৈজ্ঞানিকেরও শিরোধার্য্য। "সীতার অগ্নিপরীক্ষার" পূর্ব্বে যে রস ছিল, আজ

তাহা আর পাওয়া যায় না। "অনলে বিজলী" না বলিলে আর [illegible] ও প্রেমের [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। "হনুমান" বলিয়া গালি দিলে আর কাহারও গায়ে লাগে না। "বগলে অংশুমালী" বলিলে অগ্নিকাণ্ড বা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। বোকার অপেক্ষা ইষ্টুপিড্, নাস্তিক অপেক্ষা খৃষ্টান, ইতর অপেক্ষা র‍্যাসকেল-এর দিকেই আমাদের ঝোঁক অধিক। সেইরূপ টিকি অপেক্ষা দাড়ি, জামা অপেক্ষা কোট, আহার অপেক্ষা ডিনার, বাবু অপেক্ষা সাহেব, তামাক অপেক্ষা চুরট, ডাব অপেক্ষা বিয়ার, নমস্কার অপেক্ষা গুড্ মর্ণিং, রাধামাধব অপেক্ষা বাই জোভ্, প্রভৃতি বড়ই উচ্চ রুচির ব্যাপার।

চপের নূতন অঙ্গের কয়েকটী মাথালো মাথালো উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বউ মাষ্টারের যাত্রা, মেম সাহেবের কনসার্ট, সুপ্রিম কাউন্সেলী পাঁচালী, পি. সি. মার ওরিএন্ট্যাল মিসেলেনী, মা, সি. মার মিউনিসিপাল বন্দবস্ত, পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার যে আমার মত হইবে, মেডিক্যাল কনগ্রেসী ধর্ম্মঘট, Don't bathe in this tank (বিডন্ স্কোয়ারে মিউনিসিপাল "সাধু সাবধান"), আমার মৃতদেহ—সকল যন্ত্র উল্টা—পাঁচ শত বৎসর জীবিত থাকিতাম—মূল্য একলক্ষ টাকা মাত্র ; জীবন্তে বিক্রয় নামা লিখিয়া দিব ; ম্যানচেষ্টার ম্যাজিক টেবল, এক্সচেঞ্জ ভোজবাজী। Wanted a sleeping partner for a lucrative judiciary ; none need apply who has not passed the conviction examination with honours ; কাল্‌নার মহাপ্রভু অল্‌না, Freemasonএর cremation, মুসবী মুষ্টিযোগ। Grand Highest Bidder Civilisation Sale at the Conviction Office, to be held on the 1st of April! A Drummer is badly wanted for the Government of Bengal ; Apply sharp to the Anglo-Indian Defence Society. Grand Picture Gallery, The Indian Civil Service, The greatest Service in the world, The Foundation of the Indian Empire. Open every morning at Sir James Westland's place. Entrance free. Soldiers in uniform are strictly forbidden.

এইরূপে নূতন বিজ্ঞাপনের নূতন অনুরাগ—নূতন মাতনি। বিশ্বসংসার সেই নূতন তরঙ্গে নিয়ত বসন্ত-পূর্ণিমা বুকে করিয়া সুখে ভাসিতেছে। প্রকৃতি চিরনবীন ভাবে জগজ্জনের মনোহরণ করিতেছেন। বিজ্ঞাপনের নূতনত্ব অমোঘ ঔষধের মত সংসারের দুঃখভার লাঘব করিতেছে। তবে ঔষধের ন্যায় বিজ্ঞাপনেরও অনুপান আছে। তাহা সর্ব্বতোভাবে রঙ চঙ সঙ সাপেক্ষ। তাই কত রকমের অনুপান সহকারে বিজ্ঞাপন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়া থাকে। কোথাও বা গরুর গাড়ীতে আটচালা ভাবে নানা কাব্য ছটায় বিভূষিত হইয়া মৃত পথিককে নাচাইয়া থাকে ; কোথাও বা গোপাল ভাঁড়ের মত মুটের মাথায় বসিয়া পুত্রশোকে বিহ্বলা জননীরও মুখে হাসি টানিয়া বাহির করে, কোথায় বা ভূতের মত বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবাল বৃদ্ধবনিতার মধ্যে বিভী-

খিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিয়া বেড়ায় কোথায় বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে জয়ঘণ্টা বাঁধিয়া দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়া যায় ; কোথাও বা তূরি ভেরি ধূধুরি বাজাইয়া ঘুমন্ত লোককে জাগাইয়া দেয় ; কোথাও বা মধুর কাস্মেরী খেম্‌টায় নৃত্যগীতবাদনে পথে ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোককে বিমোহিত করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় (মেস্‌মেরিক সাবজেক্টের মত) সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়।

এই সময় অভ্যন্তরের রঙ তামাসায় বঞ্চিত হইয়া বাহিরের কয়েকজন দুষ্ট বালক আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া বিপর্য্যয় ইষ্টক বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে শ্রোতৃবর্গ যে যেখানে পারিল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নশীল হইল। সভাপতি অনেক চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইয়া আপনার ধড়ধড়িত বক্ষস্থল ধরিয়া আরও বসিয়া পড়িলেন। বক্তা সহসা গোঁ-গোঁ করিয়া ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বক্তার বন্ধু কেবলরাম মাত্র তখনও স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তিনি জানিতেন বক্তা একজন প্রসিদ্ধ স্পিরিচুএলিষ্ট মিডিয়ম্। তিনি সানন্দে অগ্রসর হইয়া সকলকে উচ্চ চীৎকারে আহ্বান করিলেন। "ভয় নাই! ভয় নাই! ফের! ফের!" কিন্তু কেহই আর ফিরিল না। সকলেই নিরুদ্দেশ। পরে তিনি যে যে প্রশ্ন করিলেন তাহার উত্তর সমেৎ অবিকল নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্র। আপনি কে?

উ। ভূত।

প্র। আপনার এ অবস্থা কেন?

উ। অপঘাত মৃত্যুর ফল।

প্র। অপঘাত?—কি রূপ অপঘাত?

উ। খুন। (সভাপতি কম্পবান্)

প্র। কে খুন করিল?

উ। লর্ড ল্যান্সডাউন। (সভাপতি এবার একদম হাঁ। ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে অর্দ্ধ উঠিয়া বসার ভাব।)

প্র। আপনি কি মানুষের প্রেতাত্মা?

উ। না।

প্র। তবে কি ঘোড়ার, না গরুর, না অন্য কোন জীবের?

উ। আমি কোন জীবেরই নহি।

প্র। কোন জীবেরই নহেন? তবে আপনি আগে কি ছিলেন?

উ। Famine Fund।

প্র। এঁকে পাইলেন কেন?

উ। বক্তৃতার সময় আমায় কয়েকবার কটাক্ষ করিয়াছিল।

প্র। এখন আপনার উদ্দেশ্য কি?

উ। লর্ড এল্‌গিনকে বলিয়া গয়ায় আমায় একটা পিণ্ডি দেওয়াইয়া দাও। সভাপতির দ্বারায় বলে পাঠাও।

সভাপতি। আমায় ক্ষমা করুন, হিন্দুর পিণ্ডের ভার আমায় দিবেন না।

উ। তবে তোমায় ধরিব।

সভা। আমায় আর যা বলিবেন তাহাই করিব। এটি মাপ করুন। ইহাতে গবর্মেণ্ট আমাকে একজন কনগ্রেসওয়ালা ভাবিতে পারে। কনগ্রেসের মেম্বর ও রাজদ্রোহী প্রায় একই কথা।

সদারঙ্গের খেয়াল।

মনের মানুষ।

ছিলে হেথা এতদিন, ভাল নাহি লাগে আজ ?
মনের মানুষ চাই
খুঁজিতে যাইবে তাই !
মনের মানুষ নাই,
ইহাদের মাঝ ?

এরা শুধু প্রাণ দিয়ে, তোমার কুশল চাহে !
শুধু খোঁজে তব সুখ,
দেখিলে মলিন মুখ
বিদরিয়া যায় বুক,
কিবা হল তাহে ?

রোগেতে কাতর যবে, বসে থাকে তব পাশে ;
নাহি রাত্রি নাহি দিন
সমভাবে শ্রান্তি হীন
নিজ দেহ করে ক্ষীণ,
কিবা তাহে আসে !

হৃদয় বোঝে না এরা, হৃদি হীন বড় সবে !
ধরার শ্যামল সাজে,
উষার রাঙ্গিমা মাঝে
তোমার হৃদয়ে রাজে
মহাকাব্য যবে—

চাঁদের হাসিটি দেখি; সন্ধ্যার আকাশ পরে ;
ফুল দেখি তারা গুলি,
পাখীর সঙ্গীত শুনি,
কি যে ভাব রুণুরুণি
উথলে অন্তরে—

বুঝিতে পারে না তাহা ঘরের মানুষ যত !
ইহাদের লয়ে তবে
কেমনে হেথায় রবে ?
যাও যেথা আছে ভবে
লোক মনোমত।

খুঁজিতে খুঁজিতে যবে, জীবন মরুর মাঝে—
পিপাসায় যাবে দেহ,
জল দিতে নাহি কেহ
নাই স্নেহ নাই গেহ
পায়ে অগ্নি বাজে !

তখন বুঝিবে কোথা মনের মানুষ !
এখন উপেক্ষাভরে
যাইতেছ দূরে সরে ;
যাও তবে আন ধরে,
আকাশ কানুষ !

শ্রীহিরন্ময়ী দেবী।

বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্য-বংশাবলীতে বড় বেশী নাম নাই। যে কটী স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বোধ করি মুকুন্দরামের রাজত্বকালে বাঙ্গলা সাহিত্য প্রথম হাসির সহিত সম্পর্কে আসে। মুকুন্দরামের যথার্থ রাজ্য কারুণ্যক্ষেত্র, কিন্তু কখন কখন তাঁহার প্রতিভা রহস্যরাজত্ব ভেদ করিয়া ভাঁড়ুদত্তের চিত্রের ন্যায় দুই একটী অমূল্য বর্ণনা লুটিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সে রাজ্য তাঁহার করদ মাত্র, সম্পূর্ণ তদধীন নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের নবরসের অন্যতম যে হাস্যরস, ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম তাহাকে বাঙ্গালার অধীনে আনিলেন। গুপ্ত কবি রাজত্বস্থাপনা করিলেন, ভালয় মন্দয় হাস্যরস বাঙ্গলা সাহিত্যের অধিকারে আসিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে নূতন রাজ্য সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, তাহার পূর্ব্ব বর্ব্বরতা সংশোধিত হয় নাই, পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা শমিত হয় নাই। বঙ্কিমের হাতে যখন রাজদণ্ড পড়িল তখনই ইহার সংস্কার আরম্ভ হইল।

বঙ্কিমের প্রতিভা দেখিল এই নবলব্ধ, উর্ব্বর, স্বভাবসুন্দর রাজ্যকে যদি আদিরসের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে ইহা সাহিত্যের একটী প্রধান সহায় হইবে,—সৌন্দর্য্যে মনোজ্ঞতম বিহারক্ষেত্রের নিদান, এবং উর্ব্বরতায় বাঙ্গলার দীনভাণ্ডারকে রত্ন-ভাণ্ডারে পরিবর্ত্তনক্ষম। সেই পর্য্যন্ত, বঙ্কিমের রাজত্বকাল হইতে বাঙ্গলা হাস্যের স্নিগ্ধালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি অভাব পূর্ণ হয় নাই। এখনও এ সাহিত্য-প্রাসাদের সর্ব্বমহল আলোকিত হয় নাই, এখনও অনেক অন্ধকারাংশ রহিয়াছে যেখানে ইহার রশ্মি প্রবেশ করে নাই এবং করা আবশ্যক।

আমাদের সমাজের আজকালকার একটী প্রধান বিশেষত্ব সঙ্গীতপ্রিয়তা। কি পুরুষ-সমাজ, কি স্ত্রীসমাজ, কি স্ত্রী পুরুষসমাজ সর্ব্বত্রই সঙ্গীতের জন্য মহা আগ্রহ। যদি কোন সুগায়ক বা সুগায়িকা নিজেকে একবার ধরা দিয়া থাকেন, আর তাঁহার নিস্তার নাই প্রতি সম্মিলনীস্থলে তাঁহাকে তাঁহার বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে—সকলকে আনন্দদান করিতে হইবে। সাধারণতঃ কিরূপ গান এবং কার গান গাওয়া হইয়া থাকে? প্রেমের গান, জাতীয় গান ও ধর্ম্মের গান; এবং গিরীশ ঘোষের, অল্প স্বল্প সেকালের এবং অনেক-স্থলে রবীন্দ্রনাথের;—ওস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় লোপ পাইয়াছে।

গিরীশচন্দ্রের মুখপাত্র থিয়েটার। থিয়েটার সেকালের যাত্রার স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং গিরীশ ঘোষ ইদানীন্তনের সমস্ত থিয়েটারেরই সহিত কোন না কোন সময় সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় একপ্রকার দেশব্যাপী যাত্রার দলের অধিনায়ক, তাই তাঁর গানের প্রচার সর্ব্বাধিক। হাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র তাঁর গান শুনিতে পাইবে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার

অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজে। সে সমাজের যে অংশে একবার তাঁহার ভাব ও ভাষা ও সুরের বিচিত্র মিলন পঁহুছিয়াছে সেখানে প্রায় অন্ত কবির স্থান নাই। কিন্তু সে, সকল সময় অন্ত কবির কবিত্বের অভাববশতঃ নহে। গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে সুর রচনার ক্ষমতা দৈবাৎ দেখা যায় এবং নিজের গান নিজে গাহিবার ক্ষমতা আরও বিরল। এই তিনটী ক্ষমতাই রবীন্দ্রনাথের আছে। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে পরিবারভুক্ত সে পরিবারের অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ, শুধু নিজেরা সমাজে গান গাহেন তাহা নহে, অন্যরূপে গান প্রচারের কৌশলও তাঁহাদের করায়ত্ব। যতগুলি মাসিক পত্রিকাতে স্বরলিপি চলিতেছে সে তাঁহারা চালাইতেছেন, সুতরাং নানা প্রণালী দিয়া রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষিত সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুকবি অক্ষয় বড়ালের এ সৌভাগ্য নাই। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁর কতকগুলি গীত সাধারণের ভোগ্য। কোনদিন না কোনদিন কোন সঙ্গীতজ্ঞ স্বদেশবৎসল তাঁহার গানগুলিতে সুর বসাইয়া স্বরলিপি করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিবেন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ অক্ষয় বড়াল নহে, স্মরণ হইতেছে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ন্যায় আরও কয়েকটী সুন্দর গীতিকার কবি আমাদের মধ্যে আছেন যাহাদের গীত কখন গীত হয় না;—সে কবিরও দুর্ভাগ্য এবং গায়কেরও দুর্ভাগ্য।

কিন্তু আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের গানের প্রাচুর্য্যে অন্ত কবির অভাব অনুভব করিবার সময় নাই বোধ করি। তাঁর প্রেমের গানই কত শত। কত বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী কত বিভিন্ন গান। মনে হয় যেন ও বিষয়ে মানুষের যত কিছু বক্তব্য ছিল সব উনি একা নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন। তাঁহার জাতীয়সঙ্গীত তেজস্বিতা ও মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে অতুল্য। ব্রহ্মসঙ্গীতে তিনি অনন্তকবি না হইলেও তাঁহার গীতরাশি সংখ্যায় আর সকলকে অতিক্রম করিয়াছে, এবং কারুণ্যে ও গভীরতায় কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করে নাই। রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছু না লিখিতেন কেবল গীতি সাহিত্যই তাঁহাকে যশস্বী করিত।

কিন্তু—একটী অঙ্গে সে পরিহীন। তাঁহার গম্ভীরতম গদ্য রচনায় যে সূক্ষ্ম সরল কৌতুক-প্রবাহ অলক্ষিতে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত লেখাটিকে উজ্জ্বল সুস্পষ্ট সুখপাঠ্য করিয়া তোলে তাঁর গীতি-সাহিত্য সেই কৌতুকাংশহীন। তিনি অন্যত্র পরিহাসরসিক বটে, কিন্তু গানে তাহার সে প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু মনুষ্য সম্মিলনীতে কৌতুকপূর্ণ গানেরও demand আছে এবং বড় মজলিসে তাহা বিশেষ আবশ্যক। মজলিসী-গান সূক্ষ্মভাবের গান নয়। বড় সম্মিলনীতে শ্রোতাদের মন বিক্ষিপ্তভাবে থাকে, কোন একটী বিশেষ গম্ভীর বা করুণ সেণ্টিমেণ্ট মনোযোগ দিয়া শ্রবণপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিবার মত অবস্থা নহে। দুটী চারিটী বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া অপেক্ষাকৃত নিরালায় যে সব সেণ্টিমেণ্টের হাতে আমরা আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকি, বহুলোক মাঝে তাহাকে কাছে ঘেঁসিতে দিতে চাহি না, কেননা তাহার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগের [illegible] অতএব তাঁহার যোগ্য

অভ্যর্থনার স্থান এ নহে। সেই জন্যই বোধ করি আমোদের সম্মিলনীতে ব্রহ্ম সঙ্গীতের অবতারণাকে অনেকে আপত্তিজনক মনে করেন। শুধু যে কতকগুলি সেণ্টিমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহাদের ন্যূন শ্রদ্ধার স্থলে অবতারণা করিতে চাহি না তাহাও নহে, বাস্তবিকই সে সময় আমরা আর এক শ্রেণীর সেণ্টিমেণ্টের প্রতি পক্ষপাতী হই। কোন কোন সময় মনের এমন অবস্থা আসে যে সে সূক্ষ্ম রঙের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের চিত্র দেখিতে বিমুখ হয়, তাহার সম্মুখে তখন কতকগুলা ডবডবে রঙচঙে বড় বড় ছবি ধরা চাই। সে অবস্থার পক্ষে হাসির ন্যায় উপযোগী খাদ্য আর কিছু নহে। যখন বিশ পঞ্চাশজনে এক জায়গায় আমোদের জন্য মিলা গিয়াছে তখন যদি একজন কেহ খুব গোটাকত হাসির কথা বা হাসির গান বলে, ত সকলে একপেট হাসিয়া সন্তুষ্টমনে বাড়ী ফিরিয়া আসি। যেন একটা কিছু পাওয়া গেল, সময়টা নিতান্ত নষ্ট হইল না, যে যেমনই মনের ভার লইয়া গিয়া থাকি সকলেই অনেকটা হাল্‌কা হইয়া ফিরিলাম। এবং মাঝে মাঝে অতিভারগ্রস্ত হৃদয়াবেগকে মনুষ্য সমাজে গিয়া এইরূপে হাল্‌কা করিয়া আসিবার আবশ্যকও আছে ; কেবল সেণ্টিমেণ্টের উপর সেণ্টিমেণ্ট চাপাইলে জীবনযাত্রা চলে না। কিন্তু এই মনোভার লাঘবকারী স্বাস্থ্যের নিদান হাস্যরস সব সময় পাওয়া যায় কোথায় ? আমাদের দেশে হাসির গান কোথায় ? যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিতান্ত পক্ষপাতী তাঁহাদেরও মাঝে মাঝে ইহার অভাব অনুভব করিতে দেখিয়াছি—"একটা হাসির গান হোক্ হাসির গান হোক।" কিন্তু হায় ! তাঁহাদের প্রিয় কবির অগাধ সঙ্গীত-সমুদ্র মন্থন করিয়া মরিলেও হাসির গান মিলিবার নহে। তাই অভাবে, কবির দুর্ভাগ্যবশতঃ ভক্তগণের অতিভক্তিতে কোন পারিবারিক বিহাহোৎসবোপলক্ষে গ্রন্থিত গীতিনাটিকার দুটী একটী গান তাঁহার হাস্য রসের প্রকৃষ্ট নমুনা স্বরূপ আসরে নামান হয়।

তুমি আছ কোন্ পাড়া ?
তোমার পাইনে যে সাড়া,
পথের মধ্যে হাঁ করে যে রইলে হে খাড়া।
রোদে প্রাণ যায় দুপুর বেলা
ধরেছে উদরের জ্বালা
এর কাছে কি হৃদয় জ্বালা, (তোমার) সকল সৃষ্টিছাড়া।
রাঙা অধর, নয়ন কালো
ভরা পেটে লাগে ভাল
এখন, পেটের মধ্যে নাড়ী গুল দিয়েছে তাড়া।

সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো।
এই বেলা মানে মানে ফেরো ফেরো।
পলক যে নাই আঁখির পাতায়,
(তোমার) মনটা কি খরচের খাতায় ?
ও হাসি ফাঁসি দিয়ে প্রাণে বেঁধেছে গেরো !
সখা ফেরো ফেরো !

ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর, সেই সে কাঁদুনি—কি কব সখা,
কথায় কথায় অভিমান তাঁরি
সাধ্য কি যে সে মন রাখা।
গৃহে থেকে সাধ করে অরণ্যে হবে যে থাকা।

এ গানটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর, ভ্রমক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামেই চলিয়া আসিতেছে।

এই গানগুলি হাস্যরসবর্জ্জিত নহে, এবং নাটকখানিতে দেশ কালপাত্রের উপযোগী। কিন্তু ইহাদের যদি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের হাস্যরসরসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরা যায় তাঁহার প্রতি অবিচার হয়। বোধ করি কবি নিজে তাঁহার এ গানগুলির বিলোপ ইচ্ছা করেন। তাঁহার সঙ্কলিত "গানের বহি"তে ত এগুলি স্থান পায় নাই, এবং শুনা যায় সখি-সমিতির শিল্পমেলায় অভিনয়োদ্দেশ্যে যখন এই গীতিনাটিকাখানি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব হয় তখন কবি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, না ছাপাইলেই ভাল হয়। কিন্তু তিনি ছাড়িতে চাহিলেও ভক্তবৃন্দ ছাড়ে কৈ? হাসিটা যে কোন না কোন আকারে চাই ই! তাই এই কয়েকটি গানকে বারম্বার হাসির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়া ইহাদের সমস্ত রস নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াও পুনর্ব্বার একটা ভ্রান্ত সংস্কারে, ইহাদেরই শরণাপন্ন হওয়া যায়।

এই গানগুলির কতকগুলি ত্রুটী আছে। প্রথমতঃ ইহারা অতি উচ্চদরের হাস্যগীতি-সাহিত্য নহে; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং কায়িক ক্ষুদ্রতা বশতঃ অতি শীঘ্রই পুনরুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাদের আদিম রসবত্তা কমিয়া আসে, ক্রমশঃ হাসা উচিত মনে করিয়া হাসি ডাকিয়া আনিতে হয়; তৃতীয়তঃ নাটক বিশেষের অংশভূত হওয়ায় বিচ্ছিন্ন ভাবে গাহিলে নূতন শ্রোতার পক্ষে অবস্থাটি কল্পনা করিয়া লইয়া সব সময় হাসিতে প্রস্তুত থাকা সহজ হয় না।

রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত সাধারণের কবি গিরীশ ঘোষ বা সুবিখ্যাত পরিহাস-রসিক অমৃত বসুর নিকট যাইলে কি পাওয়া যায়? তাজ্জব-ব্যাপারের গোটাকতক গান।

ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে, দিয়েছ শিকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি, দখল কর জেনানা।
আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব,
টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা।
এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মীপূজোর আলপনা।
আমরা সব ছাড়্‌বো শাড়ি, রাখবো দাড়ি,
গাড়ী চড়ে আনাগোনা।
(গুণ-পুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা।
ছাড়্‌ব না আড়নয়ন, আর দোদুল বেণী—
এটি নারীর নিশানা।
(গুণ-পুরুষ) এটি নারীর নিশানা;
প্রেমের বন্ধন, রইলো অন্তর, শুছিয়ে কর গিন্নিপনা।

এই গানটির যথার্থ রস ও কবির ক্ষমতার পরিচয় দুইটি লাইনে—

"ছাড়্‌ব না আড়নয়ন আর মোহন বেণী
ঐটি নারীর নিশানা।"

বাকী রসিকতা সাধারণ ও পুরাতন। যেমন গদ্য রচনায় অসাধারণের প্রস্তাবনা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সাধারণ, কেন না সাধারণ অসাধারণের জাজ্বল্যমান পার্থক্য সকলের চোখেই পড়ে কিন্তু সাধারণের নিজের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ও সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অধিকাংশ লোকেরই চোখ এড়াইয়া যায়। তাই সংযত বিচক্ষণভাবে সাধারণ সত্যের অবতারণা সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ। রসিকতা সম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজের বিপ্লবাবস্থায় পুরুষ স্ত্রী বনিতেছেন এবং স্ত্রী পুরুষের অনুকরণ করিতেছেন এ রসিকতাটি খুব স্থূল, আবহমানকাল সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে, ইহার আবিষ্কারের জন্য নূতন প্রতিভার আবশ্যক হয় নাই। তাহা ছাড়া এ গানটি সব সময় সকল সম্মিলনীতে গাহিবার উপযুক্ত নহে, বিশেষতঃ যেখানে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত আছেন। মাঝে মাঝে নিতান্ত বাজারে ভাবের সংস্পর্শে ইহা তাঁহাদের সুকুমার কর্ণের অনুপযোগী হইয়াছে, এবং যে পুরুষহৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি যথার্থ ভদ্রতার ভাব আছে তিনি পুরুষ-সম্মিলনীতেও ইহা গাহিতে সঙ্কুচিত হইতে পারেন, কেন না তাঁহাদের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সম্ভ্রম ভঙ্গ হইয়াছে। অমৃতলাল বসুর অধিকাংশ হাসির গানের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে, প্রতিভার পরিচায়ক কিন্তু বিশুদ্ধ কৌতুকময় নহে, অনেক সময় ভাবে ও ভাষায় গ্রাম্যতাদোষস্পৃষ্ট। অবস্থাচক্রে তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভাকুমারীকে হাটের মাঝে খাড়া করিতে হইয়াছে, নানালোকের মনোরঞ্জন পেশায় তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তবে এখনও মাঝে মাঝে তাহার উচ্চকুলশীল ধরা পড়ে, দেখা যায় বাজারের মধ্যেই তাহার জন্ম নয়। মনে হয় এই পতিত প্রতিভাকে পতিতপাবনী পুণ্যতোয়া সুরুচি গঙ্গায় অভিষেক করাইয়া তাহার কলুষ ধৌত করিয়া যদি বাঙ্গলা-সাহিত্যের ঘরে তুলিয়া লইতে পারা যাইত, তবে গৃহের বড় শোভা ও আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু সে কল্পনা এখন বৃথা।

দুইটি যথার্থ হাস্যরসের গানের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই, প্রথমটি কোন কৃষ্ণ-নাগরিকের রচনা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি। এইটুকু সূত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া ভারতীর কোন পাঠক যদি লেখকের নাম অনুসন্ধান করিয়া ভারতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন তবে বর্ত্তমান লেখককে এবং বোধ করি ভারতীর অবশিষ্ট পাঠকবর্গকেও বিশেষ উপকৃত করা হয়। নিম্নে সে গানটি প্রদত্ত হইল।

কীর্ত্তণী সুর।

ও কে যাবি তোরা ব্রজে, বড় কলায় মেতেছেরে,—মণ্ডা!
খাজা খুর্ম্মা! গজা মণ্ডা!
ওই যে জীবেগজা আর গোল গজা আ আ আ আ
গরম গরম লুচী কচুরী আর পটলভাজা—মণ্ডা!
খাজা খুর্ম্মা! গজা মণ্ডা!

ও সারিতে বসেছিল কতকগুলি ফলারে,
তাদের পাতে দই দিতে হয়ে গেল দেরী,
আহা হয়ে গেল দেরী!
তখন দধি না পাইয়া বিপ্রদিগের ক্রোধ উপজিল ও ও ও ও
দে দই দে দই বলে ডাকিতে লাগিল
তারা ডাকিতে লাগিল!

ওরে দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ী হাতে
ওরে না পারিস্ ত এলি কেন!

ওরে ও সারি যে, ও যে দু-বার দিলি ই ই ই ই
ওরে এ সারি না ফিরে চেলি!
দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ী হাতে,—ইত্যাদি।

ওরে ও সারি যায়, ও যায় হাঁটু বুড়ে এ এ এ এ
ওরে এ সারি যায়, ও যায় ধূলো উড়ে!
দে দই দে দই পাতে,—ইত্যাদি।

ওরে ও সারি যাস্, ঘেঁসে ঘেঁসে এ এ এ এ
ওরা কি তোর মেশো পিশে!
দে দই দে দই পাতে,—ইত্যাদি।

ওরে উদিকে দিস্ মণ্ডার হুড়ো ও ও ও ও
ওরে ওরা কি তোর বাবা খুড়ো!
দে দই দে দই পাতে,—ইত্যাদি।

যখন দয়ের উপর, উপর, মণ্ডা ভাঙ্গি ই ই ই ই
যেন বানের আগে জেলে ডিঙ্গি!
দে দই দে দই পাতে, ইত্যাদি।

যদি বেরালের ভাগ্যে, ভাগ্যে শিকা ছিঁড়্‌ল ও ও ও ও
তবে কোথা হতে কুকুর এল!
দে দই দে দই পাতে, ইত্যাদি।

এ গানটি শুধু মজার গান নহে, উচ্চ সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত। যথার্থ রহস্য জিনিষটি কি? জর্জ ইলিয়টের একটি বাক্য এইখানে উদ্ধৃত করিলে আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর হইবে। Humour is the sympathetic presentation of incongruous elements in human nature and life. জর্জ ইলিয়ট বলিতেছেন মনুষ্য-প্রকৃতিতে এবং মনুষ্যের ব্যবহারে

অনেক সময় যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহারই সহৃদয় বর্ণনা রহস্য। আতিশয্যও একটা অসঙ্গতি। নিম্নলিখিত পদ্যটি তাহা বুঝাইয়া দিবে।

"Farewell! Farewell!" he cries in pain
His arms enfold her tight;
His kisses fall like autumn rain
Upon her forehead white;
He knows he'll see her not again
Until to-morrow night!

ভাবের এই আতিশয্য বশতঃ প্রেমিকেরা সর্ব্বত্র কৌতুকের পাত্র। এই অসঙ্গতি ও আতিশয্যের কষ্টিপাথর দিয়া আমরা প্রত্যেক জিনিষের হাস্যকরত্ব যাচাইয়া লইতে পারি। আমাদের দেশের অধিকাংশ গদ্য রচনা আতিশয্যে ভরপূর, তাই তাহারা যথার্থ সাহিত্যবোধজ্ঞের নিকট উপহাস ও অবহেলার পাত্র। পেটুকতার মধ্যে রহস্যের ভূমি আছে। পেটুকতা মানবপ্রকৃতির একটা আতিশয্য। অন্যান্য আর পাঁচটা বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অবস্থিত নহে, আর সকলকে ছাপাইয়া উঠে। তাই ইহা হাস্য সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে। রহস্য গীতিরচনায় যে প্রধান আবশ্যক বিষয়নির্ব্বাচনক্ষমতা—পূর্ব্বোল্লিখিত গানটীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় আবশ্যক চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা। এমন বর্ণনাকৌশলের সহিত জিনিষটিকে শ্রোতার কল্পনার সাম্‌নে খাড়া করিয়া দিতে হইবে, যেন সাক্ষাৎ চাক্ষুষ করিতেছি। প্রেমের গানে একটা ভাবের আভাস দিলেই চলে, কিন্তু হাসির গানে অনেকটা কঠিন ঘটনা চাই কতকটা গল্পের ছাঁচ চাই। যেটী বর্ণনীয় বিষয় তাহার আগাগোড়া এবং তাহার আশপাশের সংলগ্ন ছোট খাট ঘটনাবলীও খুব সুস্পষ্ট ছবির মতন চোখের সাম্‌নে বিরাজ করা চাই; তবেই যথার্থ হাস্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

গানের উপক্রমণিকায় ফলারলুব্ধ ব্রাহ্মণদের আহ্বানেই কত দক্ষতা—

ও কে যাবি তোরা ব্রজে, বড় ফলার মেতেছেরে—মণ্ডা।
খাজা খুর্ম্মা গজা মণ্ডা!

তাহার উপর আবার "ঐ যে জীবে গজা আর গোল গজা" সেইটেই কিছু অতিরিক্ত মারাত্মক! এত প্রলোভন জিতেন্দ্রিয়েরও সম্বরণ করা দুরূহ।

অবতারিকায় দুচার কথায় আহারের "ঠাই"য়ের এইরূপ একটী সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে আসা যায়:—

ও সারিতে বসেছিল কতকগুলি ফলারে,
তাদের পাতে দই দিতে হয়ে গেল দেরী
আহা হয়ে গেল দেরী!

যে গান না শুনিয়াছে সে এই 'আহা'র মর্ম্ম কি বুঝিবে? ঐ খানটীর সুরে ও ভাবে করুণরস আছড়াইয়া কাঁদিতেছে। শুধু যে একটা মূল আতিশয্যের বর্ণনাতেই বদ্ধ থাকিতে হইবে তাহা নয়, গানের মধ্যেই আবার নূতন নূতন অসঙ্গতির সৃষ্টি করিতে হইবে, যেমন সামান্যকে বৃহতের আসনে তুলিয়া বা বৃহৎকে সামান্য আসনে নামাইয়া পরস্পরের পরিমাণের বিপর্য্যয় ঘটান, যথাস্থানে অযথারসের সমাবেশ, ইত্যাদি।

মনে কর বিষয়টা খুব নিরস্কার,
"ও সারিতে বসেছিল কতকগুলি ফলারে, তাদের পাতে দই দিতে হয়ে গেল দেরী"

কেহ কখন ভ্রমক্রমেও ইহাকে কবিতার [illegible] মনে করিবেন না, ইহাকে গানের আসনে উন্নীত করাই যথেষ্ট হাস্যকর হইয়াছে, তাহার উপর যখন সেই হাস্যকর পদে সুরের দ্বারা করুণরসের যোজনা করা হয় তখন অতি বড় গম্ভীর লোকেরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহার পর দই দিতে দেরী হওয়ার মত গুরুতর ঘটনাটি যখন ঘটিল তখন, দধি না পাইয়া বিপ্রদিগের ক্রোধ উপজিল ট্র্যাজিক। কিবা কাণ্ড বাধে, কোপন বিপ্রেরা পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিতেই বা উদ্যত হয়! নাঃ তাহারা বীররসের আশ্রয় লইল, "দে দই দে দই বলে ডাকিতে লাগিল।"

ওরে দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ী হাতে,
ওরে না পারিস্ত এলি কেন!

শেষ চরণটীর যুক্তির অকাট্যতা সাক্ষাৎ গৌতম মুনিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না, সে অল্পবুদ্ধি পরিবেশক ত কোন ছার! হঠাৎ ব্রাহ্মণ হৃদয়ে করুণরসের আবির্ভাব হইল—

ওরে ও সারি যে, ও যে দুবার দিলি
ওরে এ সারি না ফিরে চেলি!

আহা কি মর্ম্মান্তিক অবহেলা। এমন হৃদয় বিদারক অভিমানছলছল ভৎসনাবাক্যও অল্প শুনা যায়।

ওরে ও সারি যায়, ও যায় হাঁটু বুড়ে
এ সারি যায়, ও যায় ধুলো উড়ে।

মনে প্রায় বৈরাগ্য উপস্থিত করে, বিবাগী হইয়া পাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতে ইচ্ছা যায়।

ওরে ও সারি যাস্, ও যাস্ ঘেঁসে ঘেঁসে
ওরা কি তোর মেশো পিশে?

ক্রমশ সহ্যের অতীত হইয়া আসিতেছে, মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছে। নাঃ এ মিষ্টি কথার কাজ নয়, কারুণ্য এখানে বৃথা অপব্যয়। অনেকক্ষণ ভালমানুষের মত কথা কহা গিয়াছে, এবার গালাগালি না দিলে চলে না, দেখনা—

উদিকে দেয়, দেয় মণ্ডার হুড়ো

রক্ত মাংসের শরীরে কত সহ্য হয়। "ওরা কি তোর বাবা খুড়ো!"

এতক্ষণে শরটী লক্ষ্যস্থানে পৌছিল, ব্রাহ্মণদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তাহাদের পাত হাঁটু বুড়িয়া উঠিল—তখন মহা খুসী।

যখন দয়ের উপর, উপর মণ্ডা ভাঙ্গি ই ই ই ই
যেন বানের আগে জেলে ডিঙ্গি।

এই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গানটীর পর দ্বিতীয় গানটী পাঠকের সম্মুখে আনিতে সঙ্কোচ হইতেছে। কিন্তু প্রথমটার সহিত তুলনায় খাট হইলেও তার নিজের ভিতরকার একটা মাপ দিয়া বিচার করিলে নিতান্ত হেয় হইবে না।

গানটীর আরম্ভ, "আইলাম প্রাণ আজি দেখিতে তোরে"

সোহিনী বাহারের খুব একটা গম্ভীর রকম খোঁচে চরণটী শেষ হইয়াছে। তাহাতে মনে মনে অনেক খানি আশা জাগিয়া উঠে দ্বিতীয় চরণে উঁচুদরের একটা কিছু তার আসিতেছে— কিন্তু ভাবিয়া দেখ কি বিস্ময় যখন শোনা যায়,—

[illegible]

এই হরের উপর সুরের কারদানির ঘটাটা খুব।

করেছে মাথা বেদনা, নেওনা আর ভাত খেওনা
(গায়কের এই খানটা অত্যন্ত করুণ ভাবাপন্ন হইতে হয়)
দুদিন চারদিন শুকিয়ে থেকো অম্নি অম্নি যাবে সেরে!!
সেন্টিমেন্টের চূড়ান্ত এবং গানের সমাপ্তি!!

এইরূপ দুটী চারটী গান লইয়া এতদিন আমাদের ঘরকন্না চলিতেছিল। এই দুর্ভিক্ষের রাজ্যে হঠাৎ যদি একটী হাসির ভাণ্ডার আবিষ্কার করা যায় তবে কি অত্যানন্দের কারণ হয়। সে ভাণ্ডারাধিকারী—কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

তাঁহার "আর্য্যগাথায়" তাঁহার মনোমুগ্ধকারী, কারুণ্য রসভূয়ান্ প্রেমের গীত রচনা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই কবির ভিতর যে এত হাস্য রসপ্রাচুর্য্য আছে তাহা বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ অগোচর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শুধু অসঙ্গতির বর্ণনাই যে হাস্যরস তাহা নহে, অসঙ্গতির সৃষ্টিও হাস্যরসের অধিকারের মধ্যে। নিম্ন লিখিত গানটী তাহার উদাহরণ।

বিক্রমাদিত্য ও তানসেনের মিলন।

হো, বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন নভাই,
আর, তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁহার সভায়।
অ, অর্থাৎ আস্তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মান নিক মোটে।

কোরাস্। তা ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ।

যাহোক, এলেন তানসান কলিকাতায় চড়ে রেলের গাড়ি,
আর, হুগলিব্রিজ্ পার হয়ে উঠ্লেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি।
অ, অর্থাৎ উঠ্তেন নিশ্চয় কিন্তু রেলপুল তখন হয়নি,
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী উজ্জয়িনী।

কোরাস্। তা ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ।

যাহোক, এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি,
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য পিয়ানো ইত্যাদি।
অ, অর্থাৎ আন্তেন নিশ্চয় কিন্তু হলো হটাৎ দৃষ্টি,
যে, হয়নি ক তানসানের সময় পিয়ানোর সৃষ্টি।

কোরাস্। তা ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ।

যাহোক, তানসান গাইলে এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে,
আর, গাইলেন এমন দীপক তানসান, জ্বলে উঠ্লেন নিজে।
অ, অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তানসান উঠ্তেন জ্বলে,
কিন্তু, রাজার ছিল 'ওয়াটার প্রুফ' আর তানসান এলেন চলে।

কোরাস্। তা ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ধিন্তাক্ ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ।

হলো, সেইদিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসেনের গীতিবাদ্য,
আর, আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।

অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ তাঁর ত হয়েছে কবে,
আর, তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ, কেমন করে হবে।

কোরাস্। তা ধিন্‌তাক্ ধিন্‌তাক্ ধিন্‌তাক্ ধিন্‌তাক্ ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ।

এই গানটীর হাস্যকরত্ব স্বতঃসিদ্ধ। সুধু কোরাসের সম্বন্ধে কিছু টীকার আবশ্যক। আরম্ভের "হো" টি হাসির গানের নোটিস্ তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত দুইটি খাঁটি দিশী হাসির গানের—"দে দই দে দই পাতে" এবং "আইলাম প্রাণ দেখিতে তোরে"র—দৃষ্টান্তে বিশ্বাস হয় না হাসির গান জিনিষটী আদত ইংরাজী। তাহারা যে ইংরাজী ধরণের সংস্পর্শমাত্র না রাখিয়া নিজের অস্তিত্ব সমর্থন করিতে পারে তাহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু দ্বিজবাবুর প্রতিভা ইংরাজী সলিলে সিঞ্চিত হইয়াছে, তিনি ইংরাজী 'কমিক্ গানের' আদর্শ হইতে তাঁহার উদ্বোধন প্রাপ্ত হইয়াছেন! সেটা ঘটনাচক্রবশতঃ তাঁহার বিলাতে অনেককাল অবস্থান হেতু, তাঁহার প্রতিভার ত্রুটীবশতঃ নহে, বরঞ্চ ইঁহাতে তাঁহার প্রতিভার কুশলতা প্রদর্শনের আরও অবসর ঘটিয়াছে। ইংরাজী প্রত্যেক কমিক্ গানের শেষেই একটা কোরাস্ থাকে, আদত গানটী একজন লোকে গাহেন, এবং কোরাসে অনেকে যোগ দিয়া আমোদ বৃদ্ধি করেন। কমিক্ গানের কোরাসের কথাগুলি প্রায়ই কোন বিশেষ অর্থরহিত, কতকগুলি শব্দ সমন্বয় মাত্র, পাঁচজনে মিলিয়া সেগুলি সুরে উৎপাদন করিলে একটা হট্টগোলের সুখ উৎপাদন করে। একটী উদাহরণ দেওয়া যাক্।

All you that are too fond of wine
Or any other stuff,
Take warning by the dismal fate
Of one Lieutenant Luff.
A sober man he might have been
Except in one regard,
He did not like soft water sir
So he took to drinking hard.
With his fol de rol d[illegible]ol de
Rol di fol de rol di de.

আর একটী :—

Come all young blades, both high and low,
And you shall hear of a dismal go,
It is all about one Billy Vite
Who was his Parent's sole delight
Ri toll tiddle. liddle, toll lol
Tol lol, tol lol, tiddle liddle de.

এই "রল্‌ডি, ফল্‌ডি, টিড্‌ল লিড্‌ল .ডি"র ঠিক অনুরূপ অথচ সম্পূর্ণ খাঁটি বাঙ্গলা ভাষান্তর "তা ধিন্‌তাক্ ধিন্‌তাক ধিন্‌তাক্ ধিন্‌তাক ম্যাঁউ ম্যাঁউ ম্যাঁউ (শেষটা তানপুরার সুরের অনুকৃতি তাহা বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিতেছেন) অতি কুশল হইয়াছে। কথা হইতেছে ইহার আবশ্যক ছিল কি না। যদি আমোদের গানে অনেকে যোগ দিবার

আবশ্যকতা থাকে, অর্থাৎ কেবল মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া যদি আমোদ সম্পূর্ণ না হয়, কণ্ঠচর্চ্চা করিয়া গানের অংশে যোগ দিবার যে অনিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে তাহার পরিতৃপ্তির যদি আবশ্যক থাকে তবে ইহার আবশ্যক আছে। এই শব্দগুলি গাহিবার জন্য খুব বেশী স্বরজ্ঞানের আবশ্যক করে না, তাই অল্পখরচেই গান গাওয়ার সখ মিটাইয়া লওয়া যায়। তাহাতে আসল গীতটিরও কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ একজায়গায় সুরাল এবং বেসুরা বহুকণ্ঠের সমন্বয়ের পর যখন নূতন পদে পুনরায় পূর্ব্বশ্রুত একটী গলামাত্র তাল মান ও সুরের সঙ্গতি ঠিক রাখিয়া গানটী ধরেন তখন কাণের আরও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। নিম্নলিখিত গানটীর কোরাস্ সৃষ্টিছাড়া, কিন্তু ওরিজিনাল্ এবং ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় সার্থ :—

আমি একটি শালিক পাখী
(আমার) কাজ কর্ম্ম সবই চালাকি
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।

আমি গান জানি খুব বড় বড়
কিন্তু কেউ শোনে না বড়
বরং দেখায় কিল, চড়
(কিন্তু) আমি কার কি তক্কা রাখি।

তারা বলে শূন্য তালমান এ
জানে না ক এ সব গানে
নাহি দরকার বেশী মানে,
(উদ্দেশ্য) শুধু দেওয়া সময় ফাঁকি।

গায় পাপিয়া স্রেফ্ 'পিউ' গানে
কোকিল শুধু 'কুহু' তানে
চাতক 'ফটিক জল' জানে
(আমি) কত রকমারি ডাকি।

একদিন, কৃষ্ণ গোষ্ঠে লয়ে ধেনু
বাজিয়েছিলেন মোহন বেণু,
কিন্তু যে গান আমি গেনু
এরি কাছে লাগে তা কি।

কে কবি আমার চেয়ে ?
ব্যাসদেব ত একঘেয়ে
কালিদাস ত 'ধেনো' খেয়ে
লিখেছিল শকুন্তলা,

ধ্রুপদ খেয়াল জানা আছে
ঢালা সবই এক ছাঁচে ;
লাগে কীর্ত্তন এর কাছে !
(বাবা) এ কাজ নয় নাড়া আর্কফলা।

হয়ে পাকে কৃতবিদ্য
কোয়েন একদিন ব্রহ্মা বৃদ্ধ
সেক্সপীয় সেলি প্যাটি সিদ্ধ
হোল শালিক দিয়ে ফাঁকি।

কোরাস্। ঘুনি কট্ কট্ চাটুর্য্যে, মুখুর্য্যে, লাহিড়ি, ভাদুড়ি,
ককো ককো ত্যাপ ত্যাপ প্রিং প্রিং (হুম্)

নিম্নলিখিত গানটীকে অন্তসঙ্গীতগুলির সহিত একাসনে স্থান দিতে না চাহিলেও একেবারে পরিত্যজ্য নহে, এবং ইহার সাপক্ষে সামান্য একটী বক্তব্য আছে। বুদ্ধিমান মানুষেরও জীবনের অংশ বিশেষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ছেলেমানুষী করিবার প্রবৃত্তি আসে, তাহাতে আসল বুদ্ধির কোন হানি হয় না, তাহার ন্যূনতাও প্রকাশ পায় না। নিম্নলিখিত গানটী প্রতিভার সেই স্বেচ্ছাকৃত ছেলেমানুষীর লক্ষণ :—

পুরবী—আড়া।

ছিল একটি শেয়াল,
তার বুড় বাপ দিচ্ছিল দেওয়াল ;
আর সে নিজে বোসে, বেড়ে
টাকা কড়ির চিন্তা ছেড়ে
গাচ্ছিল প্রেমিকার ডাকি (এই) পুরবীর খেয়াল।

কোরাস্। ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, আরে ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া ;
ক্যা ক্যা ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া ক্যা।

ইংরাজীতে একটী কমিক গান আছে

"Never be born on a Friday
help it if you can"

এই গানটীর দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া কবি কি সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে তদনুরূপ বাঙ্গালা গান রচনা করিয়াছেন দেখা যাক্।

পার ত, জন্মো না কেউ, 'বিস্যুৎ'বারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্লাতে পারবে না ক তার ঠেলা।
দেখ, বিস্যুৎবারের বারবেলায় যে আমার জন্ম হৈল,
তাই, দিল মোরে, কালো করে রোদে ধরে, আর মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।
দেখে মা, কালো ছেলে দিল ঠেলে, দিল না ক মায়ের দুধ,
কোরে দিল শরীর সরু বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গাইয়ের দুধ।
পরে, মিলে আমার আট টা মামার, বাবার সেই আট শালার,
হতে না হতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
দেখে গুরু মশায় (যেন কশাই) বিদ্যের থাট শর্ম্মারে,
করেছেন সেই ফাঁকে শরীরটাকে, পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচুদিকেই বাড়্ছি দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোর চাকরি করে, তারাও মোরে দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরি শূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে, ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কনের দরও চড়ে গেল।
হায়! গো বিধি তুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেলনু বোলে, জন্মে ভুলে বিস্যুৎবারের বারবেলা।

এই গানটী সুরে শুনায় বিশেষ আবশ্যক ছিল। "বাবার সেই আট শালায়," "যেন কশাই," "ক্ষুণ্ণ" প্রভৃতি কতকগুলি প্যারেণ্থেটিকাল উক্তির রসপ্রাচুর্য্য উপযুক্ত সুরকরনায় শত গুণিত হইয়াছে। ইহার দুটি গানটীকে এই সঙ্গে দেওয়া আবশ্যক।

তারি, দুই পোড়ে জন্মে রে ভাই দুর্দিনে বারবার যে,
এবার গুরুত ডেকে পাঁজি দেখে জন্ম নিলাম সোমবারে।

এ,	সুদিন দেখে জন্মানর ফল ক্রমশঃ প্রকাশ্যঃ,
প্রথমতঃ,	হলে জন্ম সবাই কাঁদে (আমি) করিলাম হাস্য।
দ্বিতীয়তঃ,	আমার বাপ হলো এক, টাকার জালা কাযেই অবিলম্ব, ভাই,
আমার,	বুদ্ধি হলো ক্ষুরের মত বিদ্যা ত অসম্ভবাই !
এবং,	করিলাম ঘর সহর গুণে রূপেতে আমার আলো,
সাহেবদেরে,	ডিনার দিয়ে বুদ্ধি বরং হলো আরো ধারালো।
পরে,	পাল্লে না যা কেশব সুরেন লিখে কিম্বা চেঁচিয়ে ছাই,
আমার,	বুদ্ধি দেখে গভর্মেণ্ট করে দিল K. C. S. I.
দিলাম,	শ্বেত পায়ে রত্ন ঢেলে রত্ন উপহার মহার্ঘ্য রে,
কাযেই,	সরস্বতী রৈলেন বাঁধা তাই আমার ঘরে।
স্বয়ং,	লক্ষ্মী এসে দিলেন আমার স্ত্রী ও রত্নে ঘর পুরি,
ও,	দিচ্ছেন খেতে বিনাপ্রশ্নে সরভাজা ও সরপুরি। (টপাটপ)
ক্রমে,	উঠ্‌লাম ফুলে দিবারাত্রি বসে খেয়ে খালি, আর
	মলাম যে তাও অত্যাধিক্যে পোলাও কোর্ম্মা কালিয়ার !

কিন্তু সব সময়েই কবির প্রতিভা যে ইংরাজীর নিকট ঋণী তাহা নহে। নিম্নলিখিত গানটী সম্পূর্ণ নূতন ও অতুল্য :—

নাঃ এ জীবনটা কিছু নাঃ !
(বাইরণ যা বলেন) শুধু একটা ঈঃ, আর এঃ, আর উঃ, ওঃ, আঃ !
এ ছাড়া জীবনটা কিছু নাঃ !
সব বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি,
এ সব করো না ক
খাসা বসে থাক
ভায়া ছড়িয়ে দিয়ে পাঃ,
আর বল জীবনটা কিছু নাঃ !
কেন চটাচটি আর রোষারোষী
আর গালাগালি আর দোষাদোষী
কর হাসাহাসি
ভাল বাসাবাসি
বসে পাশাপাশি খাও চাঃ !
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি
ছেড়ে রেষারেষী কর মেশামেশি
ছেড়ে ঢাকাঢাকি
কর মাখামাখি
আর সবাইকে বল বাঃ,
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ !
কেন দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি
আর চুলোচুলি আর লাথালাথি
আর গুতোগুতি
আর জুতোজুতি
কর চুমোচুমি সার, বাঃ !
হয়ে মুখোমুখী হয়ে বুকোবুকি
হয়ে খোলাখুলি কর কোলাকুলি

প্রেমে ঠেসাঠেসী
বস ঘেঁষাঘেষী
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ!
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ!
এত বকাবকি চোখ রাঙ্গারাঙ্গি
এত হুতোহুতি ঘাড় ভাঙ্গাভাঙ্গি
প্রাণ কাজে তাই
করে আই ঢাই
আর সদাই বাপরে মাঃ!
এ সব কিচিমিচি সব মিছিমিছি,
তাই মুহুমুহু কর উহু উহু,
প্রাণের সার যাহা
সেটা 'আহা' 'আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ!
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ!

শুধু নিরীহ কৌতুকের গান নয়, ব্যঙ্গরসেও কবি সুবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। আপাততঃ কবির সহিত পাঠকের সহিত পরিচয় কার্য্য আমার দ্বারা প্রায় সমাধা হইয়াছে, যেটুকু বাকী আছে তাহা কবি নিজেই সম্পন্ন করিবেন। এক্ষণে এ ভাট ব্রাহ্মণ অবসর গ্রহণ করুক্ কবি নিজে সভায় অবতীর্ণ হউন। বর্ত্তমান লোক কেবল একটী আপ্‌শোষ জানাইয়া পাঠকদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এতক্ষণ শুধু কবির কুলচীই পড়িলাম, চারণের কর্ত্তব্য করিতে পারিলাম না, গান গাহিয়া শোনাইতে পারিলাম না,—অথচ সুরেতেই হাসির গানের অর্দ্ধেক প্রাণ, সুর-সনাথ না হইলে ইহাদের সম্যক উপভোগ করা অসম্ভব। আশা করি এই গানগুলির স্বরলিপি অনতিবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া মৎকৃত সে ত্রুটি পূরণ করিবে।*

আমার কথা ফুরাইল। এবার কবি নিজের পরিচয় দিন।

---

* লেখক আর কিছু না করুন কবির গুণগান করিয়া তাঁহার গান গানের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। এবার কবির কর্ত্তব্য কবি যেন অসম্পূর্ণ না রাখেন। তাঁহার গানের স্বরলিপি অভাবে তাহাদের সম্যক্ রসাস্বাদনে যেন আমাদের বঞ্চিত না করেন। ভাঃ সং

ঈশ্বরী পাটনী।

কি আছে তোমার নায়ে দেখিহে নাবিক ?
নিত্য বেয়ে যাও তরী,
কভু না জিজ্ঞাসা করি—
তীরে বসে শুধু হেরি আঁখি অনিমিখ !
এমনি গোধূলী বেলা
নিত্য করি জল-খেলা,
মরালী বিহরে নীরে তীরে ডাকে পিক্ !
চলে যায় তরীখানি ধিকি ধিকি ধিক্ !
শূন্য তরী দ্রুত ধায়,
গেয়ে গীত ঘরে যায়,
সোণা হাসি মেঘে ভায় ঝুরে মরে দিক !
বহে যায় তরীখানি ধিকি ধিকি ধিক্ !
তীরে বসে শুধু হেরি আঁখি অনিমিখ।
আজি মাঝি কি পশরা
নায়ে দিয়াছিস্ ভরা ?
কেন, উতলা মরম হারা হৃদয়, পথিক !
কি আছে দেখিব শুধু দাঁড়াও ক্ষণিক।
মনে হয় যাহা চাই
ও তরীতে আছে তাই ?
হোথায় কি আছে ভাই, পরশ মাণিক ?
কি আছে তোমার নায়ে দেখিহে নাবিক।
কাষ্ঠতরী স্বর্ণময়
যাহার পরশে হয়,
কি তপে সে পদ পেলি বল্ দেখি ঠিক্ ?
কি জানি কি কর্ম্মদোষে,
রহিলাম তীরে বসে,
তুই বেয়ে গেলি হেসে, দিয়ে শত ধিক্ !
কি আছে তোমার নায়ে দেখিহে নাবিক ?

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মহানদী বক্ষে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩ই অগ্রহায়ণ। আমরা কন্দর্পপুর হইতে সুবর্ণপুর আসিলাম। সুবর্ণপুর আসিতেই সন্ধ্যা হইল। এই গ্রামে একটি সুন্দর মন্দির আছে, কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত ইহা দেখা হয় নাই। এই গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে নদীর উত্তর পার্শ্বে "চৈতমুণ্ডিয়া" নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। পাহাড়কে এদেশে চলিত ভাষায় মুণ্ডিয়া বলে। পাহারটি বাঁশ বনে আচ্ছন্ন। কণ্টকযুক্ত সরু সরু বাঁশ ঝাড়গুলির আনত অগ্রভাগ মৃদু সমীরণ হিল্লোলে অল্প অল্প দোলায়মান হইতেছিল, যেন হরিত বসনাবৃতা হইয়া সুন্দরীগণ পরস্পরকে মৃদু সম্ভাষণ করিতেছে। এই পাহাড়ের উপরও দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

১৪ই অগ্রহায়ণ প্রাতঃকাল হইতে রতাগড়ের মন্দির আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কিন্তু তাহার নিকটে আসিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। নদী হইতে তিন মাইল বালুকা অতিক্রম ভয়ে এ মন্দিরটিরও দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। মহানদী এ পাহাড়ের নিকট বক্রগতিতে গিয়াছে, সুতরাং বহুদূর হইতে এই মন্দির দৃষ্ট হয়।

কন্দরপুরের পরেই "ফুলবাড়ী"। "ফুলবাড়ী" অতিক্রম করিলেই "ওস্তিয়া" গ্রাম। এই ওস্তিয়া গ্রামে এক মাইল দূরে আঁচৈপা" নামক একটি হ্রদ আছে। আঁচৈপা কি কথার অপভ্রংশ তাহা ঠিক বলাযায় না। হ্রদের জল অতি পরিস্কার, কত দিন যে হ্রদের সৃষ্টি তাহা গ্রামস্থ বৃদ্ধ লোকেরা কেহই বলিতে পারেন না। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা কিছু শোচনীয় হইয়াছে। হ্রদের অধিকাংশ স্থান জলজ উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে জলের উপরিভাগ এখনও পরিস্কার আছে। এতদ্দেশীয় সর্ব্ব প্রকার জলজন্তু এই হ্রদে বাস করে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল, প্রস্থ গড়ে এক মাইলের চতুর্থাংশ। ইহার পশ্চিম পার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া একটি পাহাড় উত্থিত হইয়াছে। পাহাড়টি জঙ্গলে আবৃত এবং "সরেগুাগড়" নামে অভিহিত। কিম্বদন্তী আছে যে এখানে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান তাঁহারই রাজ্যভুক্ত ছিল। পূর্ব্বোক্ত রতাগড় নামক স্থানে ইঁহার সৈন্য নিবাস ছিল। প্রায় তিনশত বর্ষ গত হইল নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাহার পর দুই পার্শ্বস্থ বাঁকি এবং আটগড়ের রাজাদ্বয় ইঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং রাজ্য হইতে বিধবা রাজমহিষীকে বহিস্কৃত করিয়া দেন। কালের বিচিত্র গতি! যিনি রাজ-মহিষী ছিলেন, তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া কোথায় দুঃখের অবসান করিলেন, যিনি অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তিনিই জানেন। এই পাহাড়ের উপর

এখনও ইহার অস্ত্রাগার অভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। দেখিলে অল্পদিনের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা যে কত প্রাচীন তাহা নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীরা কেহই বলিতে পারিল না। গড়ের ভগ্নাংশ এখনও পাহাড়ের উপরিভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেখানে কয়েকটি কূপ আছে কূপ হইতে জল তুলিতে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অন্তর্নিহিত উৎস হইতে জল বাহির হইয়া এই কূপগুলিকে প্রায় পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছে। এই পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট বেলে পাথর পাওয়া যায়। এইস্থান হইতে প্রস্তর লইয়া অনেক মন্দির প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই দিন বাঁকির অনতিদূরে একটি স্থানে আমাদের রাত্রি যাপন হইল। ১৫ই অতি প্রত্যূষে বাঁকি আসা গেল। বাঁকি স্থানটি মন্দ নয়। এখান হইতে তিন মাইল দূরে বাঁকি গড়। এখানে পূর্ব্বে একজন রাজা ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে যতদূর শুনা গিয়াছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল। ইনিও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য করপ্রদ রাজার ন্যায় একজন করপ্রদ রাজা ছিলেন। সীতারামের চন্দ্রচূড় ঠাকুরের ন্যায় ইঁহারও একজন কুলগুরু ছিলেন। তিনি বলিতে গেলে রাজ্যের এক প্রকার সর্ব্বে সর্ব্বা এবং রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজা ইঁহার পরামর্শানুসারেই সকল কার্য্য করিতেন। অন্যান্য কুচক্রী বিদ্বেষী লোক সকল গুরুর এতটা আধিপত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কারণ তাঁহার প্রভুত্বকালে তাহাদের অন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইতেছিল। স্থূলবুদ্ধি রাজা ষড়-যন্ত্রকারীদের এই কুচক্র বুঝিতে পারিলেন না। তোষামোদকারীদের কপটতায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধিত করিলেন।

এইরূপ কথিত আছে, রাজার একটি প্রিয় হস্তী ছিল, সেই হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজগুরু একদিন আসিতেছিলেন। দুষ্ট কুচক্রীদের ইহা অসহ্য হওয়ায় রাজাকে দেখাইয়া বলিল "মহারাজ এই দেখুন, আপনি স্বয়ং যে হস্তীতে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেই হস্তীতে গুরু আসিতেছেন, দিন দিনই গুরুর আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। যে হস্তীতে স্বয়ং রাজা আরোহণ করিবেন সেই হস্তীতে অন্য কাহারও আরোহণ করা নিষিদ্ধ। ইহাতে মহারাজকে অবমাননা করা হয়। কিন্তু আপনার প্রিয় গুরু তাহা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্ব্যতীত গুরু এ রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টায় আছেন, যাহাতে আপনাকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য-লাভের পথ নিষ্কণ্টক হয় তদুপায় গুরু সতত চেষ্টা করিতেছেন। সক-লেই এই কথা বলিতেছে।" রাজা এই কথা শুনিয়া মৌখিক কোন অবিশ্বাস বা সন্দেহের ভাব প্রদর্শন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহপূর্ণ হইল। রাজা গুরুকে অত্যন্ত মান্য ভক্তি করিতেন তাই তিনি এই অমূলক বাক্য বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছিলেন না। প্রবঞ্চকেরা রাজার বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য রাজাকে ইহাও জানাইয়া রাখিল যে "মহারাজ, আপনি আমাদের কথা যখন বিশ্বাস করিতেছেন না তখন স্বয়ং তাহার একটি নিদর্শন চাক্ষুষ করুন। গুরু যে আপনাকে নির্জ্জনে পাইলে বধ

করিয়াছেন, তিনি যে গুপ্তভাবে সর্ব্বদা তরবারি রাখেন, তাহাই ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ।" রাজাকে এই কথা বলিয়া দুরভিসন্ধিকারীগণ গুরুকেও অন্তরালে জানাইল যে তাঁহার নিকট সর্ব্বদা অস্ত্র থাকে রাজা এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এত বড় রাজা, তাঁহার গুরু নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহার নিকট গেলে রাজা অসম্মান জ্ঞান করেন। ইত্যাদি নানা বাক্য প্রয়োগে তাঁহার সরলচিত্তে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইল। তৎপর একদিন রাজা গুরুর নিকট অস্ত্র দেখিতে চাহেন এবং তাঁহার নিকট অস্ত্র দেখিয়া তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল এবং গুরুর সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গুরুর প্রতি তাঁহার আজন্মের ভক্তি বিশ্বাস সকলই জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল। তিনি গুরু বধের আজ্ঞা দিলেন। এখানেই তাঁহার অধঃপতন। হত্যাকারীরা তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া হত্যা করিল, কেবল তাঁহাকে হত্যা করিয়াই তাহাদের জিঘাংসা-বৃত্তি নিবৃত্তি হইল না গুরুর আত্মীয় বন্ধু বান্ধাব এমন কি গর্ভবতী স্ত্রীকেও নিহত করিয়া হস্ত কলুষিত করিতে দ্বিধা করিল না। একটি মাত্র রমণী তৎকালে পিতৃভবনে অবস্থান নিবন্ধন এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা রাজার এই দুষ্কর্ম্মের কথা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাসে দণ্ডিত হইলেন। বিচার-কালে তিনি স্বীয় দোষ লাঘব অভিপ্রায়ে উন্মত্ততার ভাণ করিয়াছিলেন যে, "গুরু আমার প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, তাঁহাকে বধ করিবার আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।" কিন্তু রাজার দোষ সপ্রমাণিত হওয়ায় তাঁহার কোন কথা টিকিল না। এইরূপ শুনা যায় তিনি কারাবাস হইতে মুক্তি পাইয়া কটকে তুলসীপুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার চার রাণী এবং দুইটী দত্তক পুত্র ছিল। কেন যে তিনি উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বোধ হয় উন্মত্ততার ভাণ করিতে করিতে শেষে প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া বাঁকি রাজ্য মোগলবন্দীভুক্ত অর্থাৎ কটক জেলার অন্তর্গত করিলেন এবং খাস তহসীলের প্রথা প্রচলিত করিলেন। বাঁকি রাজ্য হইতে গবর্মেণ্টের বার্ষিক বর্ত্তমান আয় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। তাঁহার একটি দত্তক পুত্র বাঁকি গড়ে নিতান্ত দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনে সরবরাকারি কার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব আদায় করিতেছেন। বাঁকির অনেক প্রজার অবস্থা হইতেও রাজপুত্রের অবস্থা শোচনীয়। রাণীদিগের প্রত্যেকের মাসিক ভার্তার বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে একজন বর্ত্তমান আছেন; তিনি অতি বৃদ্ধা। রাজার রাজত্বকালে প্রজাদের সম্পত্তি ভালরূপ নিরাপদ ছিল না। এখন গবর্ণমেণ্টের অধীনে আরাম্য বেশ স্বচ্ছন্দতায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাঁকির অধিকাংশ স্থান

বেশ উর্ব্বরা, প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে। এই স্থানে "চর্ব্বিকা" নাম্নী এক দেবী আছেন, শুনিতে পাই তিনি জগন্নাথ দেবের অনেক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১৩ই। বাঁকি গড়ের অনতিদূরে মহাপর্ব্বত নামক একটি পাহাড় আছে, ইহার উচ্চতা প্রায় ১,০০০ ফুট। এই পাহাড়ে উঠিবার সুবিধা নাই, অনেক স্থল ঢালু। পদস্খলন হইলে মৃত্যু নিশ্চয়। পশ্চিম দিকে খানিকটা উচ্চে আরোহণ করিলে সেইদিকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা অতি মনোরম। একটি ঝিল একখানি বিচিত্র কঙ্কাকৃতি বৃহৎ দর্পণরূপে শোভা পাইতেছে। চতুষ্পার্শ্বে হরিত বর্ণের "ডালুয়া" নামক নূতন ধান্য এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে পীতবর্ণ পরিপক্ক হৈমন্তিক ধান্য। ঝিলের জল অতি পরিষ্কৃত, তাহাতে নানাজাতীয় বন্য হংসাদি আনন্দে সন্তরণ করিতেছে। আধুনিক কোন কোন দর্পণে যে প্রকার ফুল লতা ইত্যাদি দ্বারা দর্পনখানির শোভা বৃদ্ধি করা হয়, সেই প্রকার বিহঙ্গমকুল ঝিলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই ঝিলের দৈর্ঘ্য গড়ে দুই মাইল এবং প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল। ডালুয়া নামক ধান্যের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কার্ত্তিক মাসে বপন করা হয় এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে কাটা হয়। আর্দ্র নিম্ন ভূমিতে এই ধান্যের চাস হইয়া থাকে এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এই ঝিলটি আরও বিস্তৃত ছিল। মনুষ্যের অভাব বুঝিয়াই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী ইহার শরীরের অধিকাংশ শুষ্ক করিয়া দিয়াছেন এবং সেই স্থানে চাস আবাদ হইতেছে। এই ঝিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মপুর নামে একটি বৃহৎ পল্লী আছে। এখানেও একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখিলে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়।

১৭ই। বাঁকির কিয়দংশ মহানদীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। তিগিরিয়া নামক করপ্রদ ক্ষুদ্র রাজ্য অন্যাংশে সন্নিবিষ্ট। এই রাজ্যে তিনটি প্রধান পাহাড় আছে এজন্য ইহার নাম ত্রিগিরি। আধুনিক অপভ্রংশ তিগিরিয়া। তিগিরিয়ার অন্তর্গত শুক্টিপাল নামক গ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা "বুড়া" মহাদেব নামে অভিহিত। অতি প্রাচীন হইতে ইনি এখানে আছেন বলিয়া বোধ হয় ইহাকে বুড়া নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ সময় এই মন্দিরের কিয়দংশ জলমগ্ন থাকে সেই সময় মহাদেব বেচারীর বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়, সন্দেহ নাই।

১৮ই বাঁকি হইতে প্রত্যূষে রওনা হওয়া গেল। কয়েকটী গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা বড়ম্বা করপ্রদ রাজ্যের তেলোনিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে রাত্রিযাপন করিলাম। বড় অম্বা (মাতা) নাম্নী উৎকৃষ্ট দেবী এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে ইহা বড়ম্বা নামে খ্যাত হইয়াছে।

১৯শে প্রাতে তেলোনিয়া হইতে বৈদ্যেশ্বর উপনীত হইলাম। বৈদ্যেশ্বর একটি বৃহৎ পল্লী। এখানে অনেক মহাজনের বাস। সম্বলপুর এবং অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য মহানদী দিয়া আনীত হয় তাহার অধিকাংশ এখানকার মহাজনগণ ক্রয় করিয়া কটক চালান দিয়া থাকে। এখানে বৈদ্যনাথ এবং রামনাথ নামে মহাদেবের দুইটী মন্দির আছে।

কথিত আছে যে পঞ্চবটী গমনকালে রাম সীতা এবং লক্ষণ তিনটি মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ সীতার প্রতিষ্ঠিত। বৈদ্যনাথ নাম হইতে গ্রামের নাম বৈদ্যেশ্বর হইয়াছে। এই মহাদেবের মন্দির গ্রামের পশ্চিমাংশে "হাতিমুণ্ডিয়া" নামক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির প্রাচীর বেষ্টিত। তন্মধ্যে আরও ছুইটি মহাদেব আছেন, একটি "পশ্চিমেশ্বর" অপরটির নাম "খরাখিয়া"। পশ্চিমেশ্বরের মন্দির বৈদ্যনাথের মন্দিরের পরে প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিলে এইরূপ অনুমান হয়। "খরাখিয়ার" মন্দির ভিত্তি হইতে ছুই হস্ত পরিমাণ উর্দ্ধে মাত্র উঠিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে তদবস্থ হইলেই স্থপতির মৃত্যু হয় এবং আদেশ হয় যে তাঁহার মন্দিরের আবশ্যক নাই, তিনি "খরাখিয়া" অর্থাৎ রৌদ্রভোগী নামে অভিহিত হইবেন। ছুঃখের বিষয় যে আদিষ্ট ব্যক্তি "খরাখিয়ার" আর সাধুভাষা জুটাইতে পারে নাই। মন্দিরের গাত্রে কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। প্রাচীরের উত্তর পার্শ্বে একটি বৃহৎ কূপ আছে এবং কূপ হইতে জল আনিবার জন্য ২০।২৫টী সোপান রহিয়াছে। এই কূপোদকে মহাদেবের অভিষেকাদি কার্য্য সমাধা হয়। কূপের অর্দ্ধাংশ প্রাচীরের বহির্ভাগে। বর্ষাকালে নদীর জল চোঁয়াইয়া কূপটীকে প্রায় পরিপূর্ণ করে। মন্দিরের ব্যক্তিরা বলিল, একবার প্রবল বন্যা হওয়ায় মহাদেবের মন্দির মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছিল। সেরূপ বন্যা আর কখন দেখা যায় নাই।

এই গ্রামের দক্ষিণদিকে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরিভাগে রামনাথের মন্দির। ইনি রামের প্রতিষ্ঠিত এরূপ প্রবাদ। মন্দিরটির আকৃতি ক্ষুদ্র এবং অল্পদিন হইল ইহার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরে উঠিবার জন্য প্রস্তরের সোপানশ্রেণী রহিয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে একটি বিস্তৃত আম্রকানন। তীর্থ পর্য্যটকেরা এই স্থানে আহারাদি এবং রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। এই মন্দিরেই মালির দ্বারা মহাদেবের পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজা পদ্ধতির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

২০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে আমরা "হাতিমুণ্ডিয়া" নামক পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়টি ৭০০ ফুট উচ্চ অতিশয় জঙ্গলাকীর্ণ এবং মহানদী সংলগ্ন। মনুষ্য যাতায়াতের জন্য নদীর পার্শ্ব দিয়া পাহাড় কাটিয়া একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে এই রাস্তা দিয়া যাওয়া কিছু কষ্টকর। মনে হয় পদস্খলন হইলে নদী গর্ভে পড়িতে হইবে। গ্রামের একটী লোক সঙ্গে লইয়া আমরা অতি কষ্টে দেড় ঘণ্টায় পাহাড়ের শিরোদেশে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের কিঞ্চিদুপরে একটী বৈরাগী আশ্রম। আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে কর্ণিকার (কন্কে) ফুলের গাছ। উঠিবার পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং কণ্টকপূর্ণ যে আমাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত এবং বস্ত্র ছিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু শিরোদেশে পৌঁছিয়া যে সকল দৃশ্যাবলী আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল, তাহাতে আমাদের সকল ক্লান্তি দূরীভূত হইল। বৈদ্যেশ্বর বাঁকির এলাকা ভুক্ত, ইহার সংলগ্ন খণ্ডপাড়া করদরাজ্য দেশ। বাঁকি এবং খণ্ডপাড়ার সীমানায় কান্দিগিরি নামক একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটিকে পাহাড়ের উপর

হইতে একটী বক্রগতি সর্পাকৃতির ন্যায় বোধ হয়। নদীর উভয় পার্শ্ব-বিভক্ত শস্য ক্ষেত্রগুলিকে নানাবর্ণে চিত্রিত সতরঞ্চ ঘরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। গরু ও রাখালদিগকে দেখিয়া লিপিপুটের কথা স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল। নদীর শোভা নৌকায় থাকিয়া ভালরূপ উপলব্ধি করা যায় না। পাহাড়ের শিরোদেশে উঠিয়া তাহার যে শোভা নিরীক্ষণ করিলাম তাহা অনির্ব্বচনীয়। চতুস্পার্শে অসংখ্য ধূসরবর্ণ পর্ব্বতমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নদী-মধ্যে স্থানে স্থানে দ্বীপপুঞ্জ, দ্বীপের চতুস্পার্শ্বে নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিল রাশি রৌপ্যের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে—সে কি সুন্দর দৃশ্য! চতুর্দ্দিকে ভগবানের অসীম মহিমা দর্শন করিয়া মন আনন্দে পুলকিত হইল।

বৈদ্যেশ্বর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে মহানদী গর্ভে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপের পশ্চিমাংশে একটী প্রস্তরময় ক্ষুদ্র পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে সিংহনাথের মন্দির। কথিত আছে, লক্ষণ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট এবং চতুস্পার্শ্বে ১১টী ক্ষুদ্র মন্দির। এই সকল মন্দিরে অন্নপূর্ণা, স্বপ্নেশ্বর, যমেশ্বর, ঈশানেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরের গাত্রেও অগ্নি, কার্ত্তিক, গণেশ, সূর্য্য, নৃসিংহ ইত্যাদি কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। দক্ষিণা কালী নাম্নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সংস্থাপিত। মালীরা বলিল ইনি বড় প্রত্যক্ষ দেবী। সিংহনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে প্রাচীর এবং অন্য তিনদিকে মৃত্তিকা-বাঁধ। বর্ষার জল মন্দিরে প্রবেশ করিবার ভয়ে ইহাকে এইরূপে বেষ্টন করা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে যে পাহাড় আছে, তদুপরি একজন বৈরাগীর তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। বৈরাগী দশ বৎসর কাল এই কুটীরে বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বাতরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এখন মন্দিরের মণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন। পাহাড়টি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহাতে আরোহণ করা বড় দুষ্কর। উঠিবার রাস্তা মসৃণ প্রস্তরময়—একখণ্ড আয়তনে প্রায় ২০ ফুট হইবে। প্রস্তর নিতান্ত ঢালু হওয়ায় সশঙ্কিতচিত্তে উহাতে আরোহণ করিতে হয়।

মন্দিরের গাত্রে অতি সুন্দর শিল্পকার্য্য ছিল। কিন্তু জীর্ণ সংস্কারকালে অধিকাংশ স্থান চূর্ণাদি লেপন দ্বারা আবৃত হইয়াছে। দুই এক স্থানে কারুকার্য্যগুলি দৃষ্ট হইতেছে। শুনি-লাম একবার প্রবল বন্যার আক্রমণে মন্দিরের কিয়দংশ জলমগ্ন হইয়াছিল।

২১শে অগ্রহায়ণ সিংহনাথ দর্শন করিয়া কটকাভিমুখে নৌকা ছাড়া গেল। ২২শে কন্দরপুরে পৌছিলাম। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এখানে পশ্চিমেশ্বর নামে মহাদেব আছেন। সময়াভাব নিবন্ধন গতবারে ইহাকে দর্শন করিতে পারি নাই। এবার ফিরি-বার পথে মহাদেবকে দর্শন করিবার বাসনা মনে জাগ্রত হইল। মধ্যাহ্নে আমরা মহাদেব দর্শনে বাহির হইলাম। যে দ্বীপের উপরে এই মন্দিরটি সংস্থাপিত, তাহা একপ্রকার বৃহৎ কুশকাশাদি তৃণে এবং অন্যান্য গাছে পূর্ণ। মন্দিরের চতুস্পার্শ অতি জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে জনপ্রাণী দেখিতে পাইলাম না। ঘাসগুলি এত বৃহৎ যে আমরা কোন পথ অবলম্বন করিয়া

মন্দিরে যাইতে পারিব—তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। পরে একটী ছোট বালক আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ঘাসের অন্তরাল হইতে বাহির হইল। বালকটীকে পথ প্রদর্শক করিয়া সঙ্গে লওয়া গেল। ইত্যবসরে আর একটি বয়স্ক লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বীপে যাইয়া চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। সেগুলি সর্পের গর্ত্ত বলিয়া অনুমিত হইল। পরে লোকটীর নিকট শুনিলাম, সেগুলি প্রকৃতই সর্পের বাসস্থান এবং দ্বীপটী সর্পে পরিপূর্ণ। তাহাদের সহিত আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি অতি জীর্ণ। উপরি ভাগের তৃতীয়াংশ একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। শুনিলাম ইহাও কালা পাহাড়ের কীর্ত্তি। মন্দিরের কারুকার্য্য ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কারুকার্য্যের ন্যায় লক্ষিত হইল। ভুবনেশ্বরের মন্দির যত পুরাতন, এই মন্দিরও তদবৎ। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও ইহার সংস্কার করিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, সংস্কারও অল্পব্যয়সাধ্য। কিন্তু আটগড় রাজার সে দিকে দৃষ্টি নাই। শুনা যায়, এই মহাদেব তিনবর্ণে পরিবর্ত্তিত হন। প্রাতঃকালে কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিপ্রহরে ধূসর বর্ণ এবং সন্ধ্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করেন। আমরা মধ্যাহ্নে মহাদেব দর্শন করিয়াছিলাম তৎকালে ধূসরবর্ণ দেখা গেল। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে ইহাতেই মহাদেবের মাহাত্ম্য অতি প্রত্যক্ষ। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার কারণ স্পষ্টই অনুভূত হয়। মন্দিরের দ্বার পশ্চিমাভি-মুখে, সেই জন্যই বোধ হয় মহাদেবের নাম পশ্চিমেশ্বর। দ্বার হইতে মহাদেবের যে পার্শ্ব দৃষ্ট হয়, তাহা অতি মসৃণ। সেই মসৃণ পার্শ্বেই সূর্য্যের আভা প্রতিফলিত হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্তরূপ বিভিন্নবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটী দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অতি প্রত্যক্ষ দেবী ইত্যাদি বলিয়া পথ প্রদর্শকেরা তাঁহার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। দেবীর নাম "অমগেই" এইরূপ তাহারা বলিল। "অমগেই" সংস্কৃত কি কথার অপভ্রংশ আমরা প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। তৎপরে "অমগেই" "অমোঘার" অপভ্রংশ এইরূপ অনুমান করিয়া লইলাম। কিম্বদন্তী যে কালাপাহাড়ের আগমনে অমোঘা দেবী স্বয়ং জলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় কালাপাহাড়ই তাঁহাকে নদীতে বিসর্জ্জন দিয়া থাকিবে। ইহার কিছুকাল পরে জনৈক বণিক বানিজ্যার্থে ঐ পথ দিয়া দেশান্তরে যাইতেছিলেন। সেই সময় তিনি কি কারণে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্রকে নদীতে নিক্ষিপ্ত করেন। পরে পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অমোঘা দেবীর ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকট পুত্রের উদ্ধার কামনায় তাঁহাকে স্বর্ণ ঘণ্টা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অচিরাৎ তাঁহার কামনা সফল হইল। তিনি পুত্রকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া পাইলেন এবং প্রতিশ্রুতি মত অমোঘা দেবীকে স্বর্ণঘণ্টা এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়া পূজা করিলেন। যে স্থানে দেবী মগ্ন হইয়াছিলেন তাহার কিছু উপরে যে প্রস্তর আছে, তাহাতে স্বর্ণ ঘণ্টা সংলগ্ন করা হইল।

গ্রামস্থ লোক সকলেই উক্ত স্বর্ণঘণ্টার বিবরণ অবগত হইয়াছিল কিন্তু দুইজন লোকের উহার প্রতি লোভ জন্মিল। তাঁহারা প্রলুব্ধ হইয়া স্বর্ণ ঘণ্টা অপহরণ মানসে উপস্থিত হইল। দেবী ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণঘণ্টাকে প্রস্তরে পরিণত করিলেন এবং তস্করদ্বয় দেবীর কোপে কালকবলে পতিত হইল। সেই অবধি দেবীর মাহাত্ম্য অধিকতর রূপে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতারূপে সকলের মনে দৃঢ় ধারণা হইল। কিন্তু এই ঘটনা সকল যে কবে ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই বলিতে অক্ষম। পথ প্রদর্শক আরও বলিল যে এই স্থানটি অতিশয় ভয়াবহ। রাত্রিকালে কেহ এখানে বাস করিতে সাহসী হয় না। কয়েক জন সন্ন্যাসী এখানে আশ্রম করিয়া দিন কয়েক অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু রাত্রিকালে ভৈরবীর উৎপাতে এবং ভীষণাকৃতি এক পক্ষীর বিকট চীৎকারে তাঁহাদের এই স্থানে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সেই অবধি এইখানে বাস করিতে কেহই সাহসী হয় না। মন্দিরের গাত্রে যে ভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে তিনিই নাকি সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া আশ্রমবাসীদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। পক্ষীটিও নাকি ঐ প্রকার কোন দেবতার ছদ্মবেশ। সন্ন্যাসীদের যে আশ্রম এখানে ছিল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ গৃহের খুঁটিগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৩শে মধ্যাহ্নে আমরা কটক পৌঁছিলাম।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণদ্বারা আমরা যে বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্ত হই, তাহাতে লোহিতাদি বর্ণ অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে, কেবল ইহার মধ্যে সৌরবর্ণচ্ছত্রের প্রধান লক্ষণ কতকগুলি কৃষ্ণরেখা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু এই কৃষ্ণরেখাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, স্থূল দৃষ্টিতে সাধারণ বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এগুলি সহসা লক্ষিত হয় না, এজন্য সৌরবর্ণচ্ছত্র প্রায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এই ত গেল সূর্য্যালোকের কথা। অপর আলোকও বিশ্লিষ্ট হইলে, বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে রকম মৌলিক বর্ণরশ্মি সংযোগে সূর্য্যালোক উৎপন্ন হয়, তাহার সকলগুলি অপর আলোকে এককালীন উপস্থিত থাকে না, এজন্য বিবিধ বর্ণচ্ছত্রে বর্ণবিন্যাসের অনেক প্রভেদ দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে এই কারণে বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দেখা গিয়া থাকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিভেদে পদার্থ সকলের বর্ণচ্ছত্রগুলিকে, প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে সকল বর্ণচ্ছত্রে বর্ণসকল অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর সজ্জিত থাকে, তাহাদিগকে এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হয়। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে,

কঠিন ও তরল পদার্থ প্রজ্জলিত করিলে, তজ্জাত আলোকদ্বারা সাধারণতঃ এই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের বিকাশ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রে বিশ্লিষ্ট-বর্ণগুলির উজ্জলতা সমান থাকে না, এজন্য ইহাতে বর্ণসকল বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেখা যায়;—সৌরবর্ণচ্ছত্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত, ইহার সর্ব্বাংশ কৃষ্ণরেখা পরিব্যাপ্ত থাকে বলিয়া, পূর্ব্বাপর বর্ণগুলির মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যায়, কাজেই ইহা প্রথম শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—এই শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রোৎপাদক আলোক হইতে কোন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গযুক্ত মৌলিক বর্ণরশ্মি লয় প্রাপ্ত হইলে বর্ণচ্ছত্রে লুপ্তবর্ণ সকল প্রকাশিত হয় না, কাজেই ইহাদের স্থান শূন্য পড়িয়া থাকে, এই শূন্যস্থানই সৌরবর্ণচ্ছত্রে কৃষ্ণরেখাকারে প্রকাশিত থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্রেও অবিচ্ছিন্ন বর্ণের সমাবেশ দেখা যায় না, ইহাতে কেবল মধ্যে মধ্যে কয়েকটি স্থূল ও উজ্জল বর্ণরেখা দৃষ্ট হয় মাত্র; যে সকল রশ্মি কেবল দুই বা ততোধিক মৌলিকবর্ণ সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিশ্লেষণে, এই শেষোক্ত বর্ণচ্ছত্র রচিত হইয়া থাকে,—প্রজ্জলিত বাষ্পজাত আলোকের এই বর্ণচ্ছত্রই প্রধান লক্ষণ।

নিউটনের বর্ণবিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর বর্ণচ্ছত্র লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে কিছুদিন বেশ আন্দোলন চলিয়াছিল, কিন্তু ইহাদ্বারা কোন নূতন তথ্য প্রকাশ পায় নাই। নিউটনের আবিষ্কারের অনেক পরে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে, টমাস মেলভিল নামক জনৈক কৃতবিদ্য যুবক নিউটন প্রদর্শিত পথে বর্ণচ্ছত্রের নূতন গবেষণায় নিযুক্ত হন; সৌভাগ্যের বিষয় সমসাময়িক অপর বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় মেলভিলের অনুসন্ধান ও যত্ন বিফল হয় নাই,—দাহ্য পদার্থ ভেদে যে দীপালোকের নানা বর্ণচ্ছত্র হইতে পারে তাহা যুবক মেলভিলই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন এবং স্থূল কাগজস্থ ক্ষুদ্রছিদ্র দ্বারা ত্রিকোণ কাচ-মধ্যাগত আলোক পরীক্ষা করিয়া প্রজ্জলিত বাষ্পের স্থূলোজ্জল রেখাময় বর্ণচ্ছত্রের বিষয় ইনিই আবিষ্কার করেন। সামান্য যন্ত্রদ্বারা নানাজাতীয় বর্ণচ্ছত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কার করায়, তৎকালিক বৈজ্ঞানিক সমাজে মেলভিলের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল; এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া যুবক দ্বিগুণ উৎসাহে আলোকবিজ্ঞানের নানা গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত আবিক্রিয়ার দুই বৎসর পরেই মেলভিলের মৃত্যু হওয়ায় বিজ্ঞানজগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মেলভিলের পর, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওলাষ্টন্ বর্ণচ্ছত্রের গবেষণায় নিযুক্ত হন; ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ কয়েকটি নূতন কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদ্বারা আলোক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। আলোক বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাস ঠিক কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, অনেকে বলেন, জর্ম্মাণ প্রসিদ্ধ লোকের ফ্রানহোফারের সময় হইতেই আলোক বিজ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হয়। যাহা হউক ফ্রানহোফারের বিখ্যাত আবিষ্কার এবং তাঁহার নানা পরীক্ষা, আলোক বিজ্ঞান ও বর্ণচ্ছত্রের

ক্রমোন্নতির ইতিহাসে যে একটি মহৎ ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রানহোফার কর্তৃক সৌর বর্ণচ্ছত্রে পূর্ব্ববর্ণিত কৃষ্ণরেখার আবিষ্কার হওয়ায় অনেকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুইখানি ভিন্ন-প্রকৃতি কাচ লইয়া, বিবিধ রশ্মির আলোকপথ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ স্থির করিতে গিয়া এই জর্ম্মাণ পণ্ডিত, সৌর বর্ণচ্ছত্রে হঠাৎ কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করেন। অপর পণ্ডিতগণ ইহাঁর এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সন্দিহান হওয়ায়, থিওডোলাইট যন্ত্রের দূরবীক্ষণ দ্বারা, ঐ রেখা গুলির সংখ্যা ও স্থান প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে পর, সকল সন্দেহই অপনীত হইয়াছিল। ফ্রানহোফার এই ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা প্রায় ছয়শত কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় তিন বৎসর অবিরাম পরিশ্রম দ্বারা কৃষ্ণ রেখাগুলির পরস্পর ব্যবধান স্থির করিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রের কয়েকটি প্রতিকৃতিও অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে আরো অনেক নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরেখাগুলির সংখ্যা যে নির্দ্দিষ্ট, এবং সাধারণ সূর্য্যালোকে ও চন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহাগত প্রতিফলিত আলোকে, ঐ কৃষ্ণরেখাগুলির স্থান যে নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাও ফ্রানহোফার সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। এই প্রকারে নানা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেও, নানা পরীক্ষা ও চেষ্টাতেও, ফ্রানহোফার কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

ফ্রানহোফারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান শতাব্দির গবেষণাপরায়ণ পণ্ডিতদের কথা স্মরণ করিলে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সার্ জন হার্ষেল ও ফক্স ট্যালবটের কথা স্বতঃই মনে হয়। এই বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের মৌলিক গবেষণা দ্বারা, বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বর্ণচ্ছত্র দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা, এই পণ্ডিত যুগলই সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচার করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হার্ষেল সাহেব, বিবিধ জ্বলন্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের নির্দ্দিষ্টাংশে এক একটি স্থূল বর্ণরেখা দেখিয়া, এই নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখাগুলিকেই, দাহ্য পদার্থের প্রকৃতিজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করেন। হার্ষেলের পরীক্ষাকালীন, তৎকালিক অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানবিদ্ সার্ ডেভিড ব্রুষ্টার ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার উদ্ভিজ্জরসে বর্ণচ্ছত্র পাতিত করিলে ইহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া, বর্ণচ্ছত্র দ্বারা বিশ্লেষণ কার্য্য সম্ভবপর বলিয়া, এই বৈজ্ঞানিকদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বাষ্পের নির্দ্দিষ্ট রশ্মিহরণ-ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, সৌর বর্ণচ্ছত্রস্থ কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের প্রকৃত কারণের আভাষ, ইহাঁরাই সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রচারিত করেন।

হার্ষেল ও ব্রুষ্টারের পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ফক্স ট্যালবট উক্ত বৈজ্ঞানিক দ্বয়ের আবিষ্কারের সমালোচনা করিয়া এক খানি পুস্তিকা রচনা করেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, ট্যালবটের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, প্রাচীন বিজ্ঞান ভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন,—এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারাই আধুনিক বর্ণচ্ছত্রীয় বিশ্লেষণ প্রথার

মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। গ্রন্থকার একস্থানে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—অতীব রাসায়নিক পদার্থ প্রজ্জলিত করিয়া, কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষাদ্বারা ইহার গঠনোপাদান অতি সূক্ষ্ম ভাবে স্থির করিতে পারা যায়, এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কার্য্য অপর রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সকল বর্ণচ্ছত্রে সোডিয়ম জাত উজ্জল পীতরেখা দেখিয়া, পীতরেখা উৎপাদক পদার্থটির আবিষ্কারার্থে ট্যালবট নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। প্রায় সকল পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে জল আছে দেখিয়া জলই পীতবর্ণোৎপাদক পদার্থ বলিয়া স্থির করেন এবং অপর এক সময়ে লোহিতালোক-জাত বর্ণচ্ছত্রে অত্যুজ্জল পীতরেখা দেখিয়া, গন্ধকই ইহার কারণ বিবেচনা করেন।

এখন পূর্ব্ববর্ণিত প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিত গণের নানা পরীক্ষাদি দ্বারা দেখা যাইতেছে পদার্থ মাত্রই তাপসংযোগে বাষ্পীভূত ও প্রজ্জলিত হইলে, ইহাদের বর্ণচ্ছত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণের রেখা দৃষ্ট হয় এবং পদার্থটি সমান থাকিলে সকল সময়েই বর্ণচ্ছত্রের এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উক্তরেখা সকল প্রকাশিত দেখাযায়; কাযেই বর্ণচ্ছত্রস্থ এই স্থির বর্ণরেখাগুলি পরিদর্শন করিয়া, অনায়াসেই অতি জটিল পদার্থের গঠনোপাদানও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সোডিয়ম্ পোটাসিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু সাধারণ দীপশিখায় সহজেই বাষ্পীভূত ও প্রজ্জলিত হয়, এজন্য ইহাদের বর্ণচ্ছত্র অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু অপর পদার্থ অল্পতাপে বাষ্পীভূত ও প্রজ্জলিত করা অতি কষ্টসাধ্য এবং অনেক সময়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সাধারণ বিশ্লেষণ কার্য্যে বর্ণচ্ছত্র ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু আজ কাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও অক্সি-হাইড্রোজেন দীপশিখার সাহায্যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, এজন্য এই অভিনব বিশ্লেষণ প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া আদৃত হইতেছে। কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা, আজকাল সকল ধাতুই বাষ্পীভূত হইতেছে।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা কেবল যে পদার্থ বিশ্লেষণের সুযোগ হইয়াছে তাহা নয়, গত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে, ইহাদ্বারা কয়েকটি নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোটাসিয়ম ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর বর্ণচ্ছত্রে ইহাদের বর্ণরেখা নিরূপণকালীন জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মাণপণ্ডিত বুনসেন দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। পোটাসিয়মের বর্ণচ্ছত্রে ইহার সুপ্রশস্ত বর্ণরেখার পার্শ্বে অপর একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণরেখা দেখিয়া নিশ্চয়ই ইহা এক বিজাতীয় পদার্থ যোগে উৎপন্ন হইয়াছে স্থির করিয়া বুনসেন এই বর্ণোৎপাদক পদার্থটিকে পৃথক করিবার চেষ্টা করেন, এবং ইহার এই চেষ্টার ফলে রুবিডিয়ম ও সিজিয়ম নামক দুইটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ক্রুক্ নামীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক, কোন একটি যৌগিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষাকালীন পাতিত বর্ণচ্ছত্রে একটি অত্যুজ্জল নীলরেখা দেখিয়াছিলেন এবং ইহা পরিজ্ঞাত কোন মৌলিক পদার্থজাত হইতে পারে না দেখিয়া সম্ভবতঃ ইহা একটি নূতন পদার্থের অস্তিত্বজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করেন, এবং অল্পায়াসেই থ্যালিয়ম্ নামক একটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। বর্ণচ্ছত্রদ্বারা ধাতু আবিষ্কারে বুনসেন ও ক্রুক্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের

কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তৎকালিক অনেক পণ্ডিত সকল পদার্থেরই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহার ফলে অল্পকাল মধ্যে বয়স্‌বাদ্রোঁ ও ক্রেনবর্গ নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় অল্পকাল মধ্যেই ইণ্ডিয়ম্ ও গ্যালিয়ম্ নামে অপর দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন।

প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রস্থ নির্দ্দিষ্ট বর্ণের স্থিররেখা গুলিই, এই নূতন বিশ্লেষণ প্রথার প্রধান অবলম্বন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—পদার্থ পরিবর্ত্তন না করিলে, বর্ণচ্ছত্রে নির্দ্দিষ্ট বর্ণরেখাগুলির স্থান সকল সময়েই এক থাকে। এখন ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে,—কোন এক জটিল যৌগিকের উপাদান স্থির করিতে হইলে, বর্ণচ্ছত্র রচনা করিয়া ইহার কোন্ কোন্ বর্ণরেখা মৌলিক বর্ণচ্ছত্রস্থ রেখার অনুরূপ, সর্ব্ব প্রথমে তাহা নিরাকরণ করা আবশ্যক। কারণ তাহা স্থির করিতে পারিলে, তৎ তৎ বর্ণরেখা উৎপাদক মৌলিক পদার্থ যে, উক্ত যৌগিকে বর্ত্তমান আছে, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যায়। কোন্ মৌলিক পদার্থের কোন্ বর্ণরেখা প্রধান পরিচায়ক তাহাও নানা পদার্থের রঞ্জিত প্রতিকৃতি দেখিয়া অনায়াসে জানিতে পারা যায়। আজকাল সাধারণ বিশ্লেষণ কার্য্য এই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণরেখাগুলির স্থান যে সকল সময়েই নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোকজনক পদার্থের অবস্থাভেদে, অনেকসময় রেখাগুলি কখন ক্ষীণতর কখন বা প্রশস্ততর হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আলোকোৎপাদক পদার্থের চাপ ও তাপ বৃদ্ধি করিলে ইহার পরিচায়ক বর্ণরেখাগুলি ক্রমেই উজ্জ্বল ও প্রশস্ততর হইতে দেখা যায় এবং তাপ পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলে, বর্ণচ্ছত্রে কখন কখন একই বর্ণের অপর দুই একটি রেখা দৃষ্ট হয়। চাপ ও তাপ দ্বারা বর্ণচ্ছত্রের এই পরিবর্ত্তনে, পরীক্ষাকালীন নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ, যদিও অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বর্ণচ্ছত্র, জ্বলন্ত কঠিন পদার্থজাত বলিয়া সাধারণতঃ স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু বাষ্পজাত বিছিন্ন বর্ণচ্ছত্রস্থ বর্ণ-রেখাগুলিকেও প্রচুর উত্তাপ ও চাপ সাহায্যে বিস্তৃত করিয়া, কঠিন পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ অবিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। এজন্য বর্ণচ্ছত্রের বিশ্লেষণ কালে বর্ণরেখাগুলির পরস্পর ব্যবধান অতি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হয় এবং পরীক্ষাধীন পদার্থটিকে উপযুক্ত তাপ সংযোগে, অতি সাবধানে প্রজ্বলিত করিতে হয়।

এই ত গেল বিচ্ছিন্ন বাষ্পীয় বর্ণচ্ছত্রের কথা। কৃষ্ণরেখাময় সৌর বর্ণচ্ছত্র দ্বারাও, রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্মরূপে সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুভ্রালোকস্থ সমবেত বিবিধ বর্ণরশ্মি সকল, সূর্য্য মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে আগমন কালীন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং কতকগুলি রশ্মি কোন্ প্রকারে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হয়;—এই জন্যই সৌরবর্ণচ্ছত্রে লুপ্তবর্ণ স্থানে কৃষ্ণরেখা প্রকাশিত হয়। এই লুপ্তরশ্মি আলোকের বর্ণচ্ছত্রদ্বারা, অনেক সময়ে সহজে তরলপদার্থের নির্ম্মাণোপাদান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—আমরা সচরাচর যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তাহারা তাহাদের বর্ণ সূর্য্যালোক হইতেই পাইয়া থাকে। শুভ্রালোক

ঐ সকল পদার্থে পতিত হইলে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুসারে ইহারা আলোকস্থ কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ করে ও হৃতাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত করে,—এই প্রতিফলিত রশ্মিদ্বারাই আমরা পদার্থগণকে তত্তৎবর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পাই। এতই গেল সাধারণ পদার্থের বর্ণের কথা। স্বচ্ছ পদার্থসকলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে,—ইহাতে কেবল লুপ্তাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত না হইয়া, পদার্থের মধ্যদিয়া নির্বিঘ্নে বহির্গত হইয়া, ইহাদিগকে রঞ্জিত দেখায়। বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে কোন তরল পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, ইহার মধ্য দিয়া অবিশ্লিষ্ট রশ্মি গুচ্ছ আনয়ন করিয়া, পরে পূর্ব্ব বর্ণিত সাধারণ উপায়ে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিতে হয়, পরে এই বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা দ্বারা পদার্থটির উপাদান স্থির করিতে হয়। এই প্রকার বর্ণচ্ছত্রের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, তরল পদার্থের মধ্য দিয়া আগমন কালীন সাধারণ সৌর বর্ণরশ্মিগুচ্ছের কতকগুলি, পদার্থটির প্রকৃতি অনুসারে লোপ-প্রাপ্ত হয়; কাযেই এই লুপ্তরশ্মির আলোকদ্বারা যে বর্ণচ্ছত্র রচিত হয়, তাহাতে সৌর বর্ণচ্ছত্রস্থ স্থিররেখা গুলি ব্যতীত আরো কয়েকটি নূতন কৃষ্ণরেখা প্রকাশিত হয়। এই নূতন রেখা-গুলির স্থান বর্ণচ্ছত্রের কোন্ কোন্ অংশে অবস্থিত, এবং কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থদ্বারা, উক্ত বর্ণলুপ্ত রেখা সকল উৎপন্ন হয় তাহা স্থির করিলে, তরলপদার্থটির উপাদান অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়।

আজকাল পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে, সকল জৈবিক ও ধাতব পদার্থের বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যে সকল জৈবিক পদার্থ জটিলতার জন্য এপর্য্যন্ত অবিশ্লিষ্ট অবস্থায় ছিল, বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে এখন তাহার অতি ক্ষুদ্র উপাদানও, অতি সহজে আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সন্দেহজনক মৃত্যুতে, মৃতব্যক্তির পাকাশয়স্থ পদার্থের উপর বিশ্লেষণ অসম্ভব হইলে, কেবল বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষাদ্বারা অনেক সময়ে বিষাক্ত পদার্থের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে। অল্পদিন হইল, হপ্‌সেলার নামক জনৈক বিজ্ঞানবিদ্, নরশোণিতের বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করিয়াছেন এবং শোণিত বিষসংযুক্ত হইলে, বর্ণচ্ছত্রের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয় তাহাও দেখাইয়াছেন। হপ্‌সেলারের এই আবিষ্কার দ্বারা, বিকৃত-শোণিত ব্যক্তির কি বিষে রক্ত দূষিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই স্থিরীকৃত হইতেছে। আজকাল আবার অধ্যাপক সর্লি প্রমুখ কয়েকটি পণ্ডিত বর্ণচ্ছত্র সাহায্যে ব্যবসায়ীগণের দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; য়ুরোপীয় অনেক বণিক্-সভা, বিশুদ্ধতা নিরূপণের, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুলভতম উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শিখধর্ম্ম-গ্রন্থ ও ধর্ম্মনীতি।

শিখদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম আদি গ্রন্থ; এই গ্রন্থ গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেট সেক্রেটারী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ডাক্তার ট্রুম্প ইহার অনুবাদ ভার গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ শিখ পুরোহিত এবং গ্রন্থী (পাঠক ও ব্যাখ্যাকার) গণের দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা গুরুমুখী ভাষায় সুপণ্ডিত না হওয়াতে অনুবাদ লইয়া ডাক্তার ট্রুম্পকে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার যত্ন উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে এই কার্য্য অনেক বিলম্বেও সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাধারণে সহজে যাহাতে এই গ্রন্থ আয়ত্ব করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি গ্রন্থে ব্যবহৃত সমস্ত গুরুমুখী শব্দ ও তাহার বিশেষত্ব লইয়া একখানি ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন।

আদি গ্রন্থের প্রধান বৈচিত্র্য বৃথা পুনরুক্তি এবং অসংলগ্ন সামান্য সামান্য বিষয়ের বর্ণনা; কিন্তু গ্রন্থের শেষভাগে কবির ও কবিদের যে সকল শ্লোক বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর কবিত্ব এবং সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। একজন ইংরেজ সমালোচক বলেন যে সেই সকল রচনা প্রণালী অনেক পরিমাণে মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের রচনা কৌশলের অনুরূপ।

বাবা নানক আদি গ্রন্থের প্রধান লেখক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইহার অধিকাংশ ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন এই গ্রন্থের অভিনব আকার প্রদান এবং কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধন করেন; অনন্তর দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এই গ্রন্থে সামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া শিখ জাতির ধর্ম্মজীবনে নব প্রাণের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ সিংহের এই গ্রন্থ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়, গুরু গোবিন্দ কয়েক-জন হিন্দী কবির সহায়তায় এই দুরুহ কার্য্য সাধন করেন; ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোবিন্দ সিংহ নান-কের নির্দ্দিষ্ট মূল নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের হস্তে নানক-প্রবর্ত্তিত একেশ্বর বাদের প্রভা কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া গিয়াছে; কারণ গোবিন্দ সিংহ নিজে একেশ্বর বাদের পক্ষপাতী হইলেও শক্তিস্বরূপিনী হিন্দু দেবী দুর্গার উপাসক ছিলেন।

শিখ শব্দের ধাতুগত অর্থ শিষ্য, নানক তাঁহার শিষ্য দিগকে এই আখ্যা প্রদান করেন; খালসা ধর্ম্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নামে অভিহিত।

পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন শুদ্ধ নানকের ব্যবস্থাবলী সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় কবি এবং সাধুদিগের উপদেশপূর্ণ উক্তি সমূহও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে সেগুলি পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত। 'আদি গ্রন্থ' বিশুদ্ধ গুরুমুখীতে লিখিত নহে, প্রাচীন হিন্দীর সহিত ইহা প্রচুর পরিমাণে সংমিশ্রিত। গুরু গোবিন্দের রচনা বিশুদ্ধ হিন্দীতে, সুতরাং পাঞ্জাবী ভাষাবিৎ আধুনিক শিখ দিগের নিকট তাহা পরিস্ফুট নহে।

আদিগ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ। এই পরিচ্ছেদের নাম "যাপু" অথবা 'যাপ্‌জি'। ইহা নানকের স্বরচিত, কবির ও ফকিরের কোন কোন রচনা ভিন্ন সমস্ত গ্রন্থে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা আর নাই। কবিরের নাম ভারতবর্ষে সুবিখ্যাত, কাশীতে কবিরের প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায় আছে, তাহার নাম কবিরপন্থী। আদি গ্রন্থে দুইজন মারহাট্টী পণ্ডিতের রচনা আছে, এই রচনার ভাষা বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুরূপ, সুতরাং অনুমান হয় দাক্ষিণাত্যেই এই কবিদ্বয়ের বাসস্থান ছিল; ইহাদের একজনের নাম নাম দেব, অন্যের নাম ত্রিলোচন।

শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দ সিংহ আদিগ্রন্থের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন; এই সময় আদিগ্রন্থ কর্ত্তারপুর নামক স্থানে শিখধর্ম্মনায়ক (সোধী)গণের হস্তে সংরক্ষিত ছিল। এই সকল ধর্ম্মনায়ক বা সোধী গুরু রামদাসের বংশধর, তাহারা নবগুরু গোবিন্দ সিংহের হস্তে গ্রন্থ সমর্পণ করা দূরের কথা, তাঁহার প্রাধান্য পর্য্যন্ত অস্বীকার করিল। তৎকালে আনন্দপুর ও কর্ত্তারপুরে গুরু রামদাসের বংশধরগণের একাধিপত্য, শিখসমাজের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া তাহারা অতুল ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিল, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিল নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতকে অধিকতর উদার ভিত্তিতে সংস্থাপন এবং তাহার মধ্যে সাম্য নীতির প্রবর্ত্তনা করাই গোবিন্দ সিংহের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; গোবিন্দ সিংহের অনুগ্রহে অতি হীনজাতি যে সুপবিত্র খালসাগণের সমশ্রেণীতে বসিবে, ইহা তাহাদের নিতান্তই অসহ্য বোধ হইল। তাহারা গোবিন্দ সিংহকে প্রবঞ্চক, শঠ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে লাগিল, এবং উপহাস করিয়া বলিল যদি গোবিন্দ সিংহ নিজেকে গুরু বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি স্বয়ংই একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন।

সামান্য প্রতিবন্ধকতায় গোবিন্দ সিংহের উৎসাহ বিনষ্ট হইল না। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়নে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এই গুরুতর কার্য্য শেষ করিলেন। নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, এমনকি তিনি নানকের কোন বিধিরই নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন নাই, শিখজাতিকে যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতিতে পরিণত করা, তাহাদিগকে মুসলমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, পাঞ্জাবে শিখ ক্ষমতার সংস্থাপন এবং সম্প্রসারণ করাই এই নব বিধি প্রচলনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

খৃষ্টান ও মুসলমানের নিকট বাইবেল এবং কোরাণের ন্যায় শিখের নিকট আদি গ্রন্থ সম্মানিত, তাহারা ইহা ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু পাঞ্জাবী হিন্দুগণ ইহাকে মহাজনোক্ত মনে করিয়া থাকে; নানক এবং কবির এ উভয়ের উপদেশই তাঁহাদের নিকট সমান শ্রদ্ধার বিষয়। নানক নিজে কিয়ৎপরিমাণে সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং সংসার অনিত্য বলিয়া সংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। পক্ষান্তরে গোবিন্দ সিংহ একাধারে রাজনীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ছিলেন। রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ভাব, অন্ধসংস্কার, জড়োপাসনা প্রভৃতি বিদূরীত করিয়া উন্নত ধর্ম্মভাব এবং সদাচারের প্রতিষ্ঠায়

তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ধর্ম্ম সংস্কারকগণের মধ্যে তাঁহার নাম অতি উচ্চ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত।

কোন ইংরেজ সমালোচক বলেন নানকের চরিত্র এবং শিক্ষায় মহামতি শাক্যসিংহের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু একেশ্বরবাদের প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আদি গ্রন্থের একস্থানে নানক লিখিয়াছেন :—"আর কে দ্বিতীয় আছে?—কেহই নাই; সর্ব্বভূতেই সেই অপাপবিদ্ধ একেশ্বর বিদ্যমান হিন্দু মুসলমানদিগের ধর্ম্মমতের পার্থক্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "পথ দুইটি বটে, কিন্তু প্রভু একজন।" ঈশ্বর সম্বন্ধে নানকের কিরূপ বিশ্বাস তাহা গ্রন্থের নিম্নলিখিত অনুবাদ হইতে বোধগম্য হইতে পারিবে :—

১। "একই সমস্তেতে বিভক্ত এবং সকলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেখানেই তিনি অবস্থিত আছেন।"

"সুদৃশ্য মায়া-মরীচিকায় এই পৃথিবী মোহাচ্ছন্ন; সত্য নির্ণয়ক্ষম ব্যক্তি নিতান্ত বিরল।"

"সকলই গোবিন্দ, সকলই গোবিন্দ, গোবিন্দ ভিন্ন আর কেহই নাই; একগাছি সূত্রে সপ্ত সহস্র মাল্য গুটিকার ন্যায় পরমেশ্বর সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত।"

২। "জলতরঙ্গ, ফেণপুঞ্জ এবং জল-বুদ্‌বুদ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

"এই ব্রহ্মাণ্ড পরমব্রহ্মের ক্রীড়ণক মাত্র, তিনি অদ্বিতীয়।"

আদি গ্রন্থে বহু দেবতার উপাসনা নিষিদ্ধ, কিন্তু নানক অসংখ্য হিন্দু দেব দেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই; এমনকি তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তাহারা ঈশ্বর অপেক্ষা বহুপরিমাণে নিকৃষ্ট এবং অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত। আত্মার নিবৃত্তি নানকের মতে মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

আদি গ্রন্থে অদৃষ্টকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্যের অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষের কিছুমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা নাই, মনুষ্যমন যতই ধর্ম্ম প্রবল হউক ইহা সর্ব্বদাই মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, এই মায়া পরিত্যাগ করা অসম্ভব। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং অজ্ঞতা ইহাই মনুষ্যের প্রধান গুণ এবং ইহাদের কোন একটি মনুষ্যজীবনে আধিপত্য করে। তদনুসারে মনুষ্যচরিত্র ভাল মন্দ হইয়া থাকে।

পুনর্জন্ম হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের আশায় বহুসংখ্যক লোক শিখধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিল। ফিরোজপুরের মরুপ্রান্তরে মুসলমান সৈন্যবর্গের সহিত গুরু গোবিন্দ সিংহের যখন যুদ্ধ হয় তখন তিনি স্বসৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে তাঁহার যে সমস্ত অনুচর স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিবে তিনি তাহাদিগকে মুক্তির অধিকারী করিবেন। সেই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মুষ্টিমেয় শিখসৈন্য প্রকাণ্ড মোগলবাহিনীর সহিত অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সরোবর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গুরু গোবিন্দ তাহার নাম "মুক্তসর" রাখিয়াছিলেন। ইহা শিখজাতির একটি পবিত্র তীর্থ।

গুরুর প্রতি ভক্তি ও তাঁহার আজ্ঞা পালন, এবং সাধুদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শিখধর্ম্মের প্রধান সাধন। স্নান, ভিক্ষাদান, মাংসাহার বর্জ্জন এবং ধর্ম্ম শিক্ষা, মন্দ কথা ত্যাগ, ক্রোধ ও লোভহীনতা, নিস্বার্থপরতা, বিশ্বস্ততা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্যে রমণীর সতীত্ব এবং পুরুষের জিতেন্দ্রিয়তা অতি আদরণীয়। নানক স্বয়ং উদাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি গৃহস্থাশ্রমকেই মনুষ্যের প্রধান অবলম্বনীয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের কোনই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। নানকের মত বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং আড়ম্বরে ধর্ম্ম নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম হৃদয়ে, অরণ্যে বা নির্জ্জন মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া সংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াই ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। যাহা হউক নানকের এইরূপ উপদেশ সত্বেও ইহাদের মধ্যে উদাসী এবং অকালী নামক সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীর সংখ্যা অল্প নহে; ইহারা শিখধর্ম্মাবলম্বী হইলেও নানক ও গোবিন্দ সিংহের সমস্ত মত সমর্থন করিয়া চলে না।

আদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমর্থিত হয় নাই, কিন্তু নানক ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্যের বিরুদ্ধাচারী হইলেও তিনি প্রত্যক্ষতঃ জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই। তথাপি তিনি সাধারণের মধ্যে সমভাবেই শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন এবং উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান না করিয়া সকল জাতির মধ্য হইতেই তিনি শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। গুরু গোবিন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

আনন্দপুরের সোধীগণ যখন বিদ্রূপের সহিত গোবিন্দ সিংহকে প্রহলাদে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তখন তিনি নানকের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই; তৎপরিবর্ত্তে তিনি বিচ্ছিন্নপ্রায় শিখ সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করিতে ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের হইতে তাহাদিগকে অধিকতর স্বাতন্ত্র্য প্রদান পূর্ব্বক মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে চালিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলভিত্তি জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদসাধন তাঁহার প্রথম কার্য্য। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ করাতে গুরু গোবিন্দকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ নিম্নশ্রেণীকে তাহাদের দলে মিশিতে দেখিয়া গুরুর প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল; জাতিভেদের অধিকারে যাহারা বিশিষ সম্মানিত হইতেছিল, তাহাদের সেই গর্ব্ব চূর্ণ হওয়াতে সকলেই গোবিন্দ সিংহের প্রতি সন্দিগ্ধ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ শিখধর্ম্মে প্রবেশ করা আকাঙ্ক্ষনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; কিন্তু এজন্য গোবিন্দসিংহ ক্ষুণ্ণ কিম্বা চিন্তিত হন নাই,: স্থিরভাবে তিনি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-পথে অগ্রসর হইলেন।

হিন্দু সাধারণের সহিত শিখদিগের পার্থক্য নির্দ্ধারণের জন্য গোবিন্দ সিংহ অন্যান্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আহার, পরিচ্ছদ এবং পূজার্চ্চনার নিয়ম পালনের মধ্যেই সে সকল পার্থক্য পর্য্যবসিত হইয়াছিল। শিখধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে আত্মাদিগকে নীল

পরিচ্ছদ ধারণ করিত হইত, কালে সে প্রথা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল "অকালি" সম্প্রদায় তাহা পালন করিয়া আসিতেছিল। গুরুগোবিন্দ সর্ব্বসাধারণ শিখের মধ্যে তাহা পুনঃ প্রচলিত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিয়ম করিলেন যে তাহাদিগকে তরবারী ও পঞ্চবিধ দ্রব্য ধারণ করিতে হইবে যথাঃ কেশ, খাণ্ডা, কঙ্গ (অর্থাৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত চিরুণী) কড়া (লৌহ বলয়), কচ্ছ (জানুবিলম্বিত অনতিদীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড)। তাম্রকুট সেবন শিখদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত করেন। কাহারো কাহারো অনুমান এই জন্যই শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অহিফেন এবং গঞ্জিকা অপরিমিতরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে শিশুহত্যা প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যাহারা এই পাপে লিপ্ত হয় তাহারা অভিশপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি গোবিন্দ সিংহের সময় হইতে পাঞ্জাবে বৃটীশ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকাল পৰ্য্যন্ত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এই পাপ প্রথা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কন্যা কিম্বা ভগিনীর বিবাহে অর্থগ্রহণও ইহাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু এই নিষেধ বিধি প্রায়ই উপেক্ষিত হইত।

শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু আহারের জন্য আনীত পশুকে তরবারীর এক আঘাতে বিনষ্ট করিতে হইবে। গ্রন্থে গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে কোন নিষেধ-বিধির উল্লেখ নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় শিখসম্প্রদায়ের মধ্যেও গোজাতি পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শিখ সৈন্যগণ যখন সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য মুসলমান অধিবাসীগণের প্রতি অত্যাচার করিত, তখন ভীত ও বিপন্ন মুসলমানেরা শিখ সেনাগণের সম্মুখীন হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিত এবং বলিত "আমরা তোমাদের গরু" এই কথায় তাহারা অব্যাহতি লাভ করিত। গোজাতিকে ইহারা কিরূপ সম্মানের সহিত নিরীক্ষণ করে এই ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। মস্তকে কোন প্রকার টুপি ধারণ, শিখদিগের নিকট ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য; মুসলমানদিগের সহিত পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্যই বোধহয় এরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শত্রুর সহিত যুদ্ধকরা এবং তাহাদিগের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন না করাই ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য।

প্রত্যহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শিখদিগের অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য, কিন্তু শিখদিগের মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এই জন্য এই প্রথা সর্ব্বদা কার্য্যকারী হয় না। যাহা হউক পুরোহিতগণের গ্রন্থপাঠ শুনিয়া অনেকে পুণ্যার্জ্জন করে এবং অনেকে গ্রন্থী-দিগের মুখে পুনঃ পুনঃ পাঠ শুনিয়া তাহাতে এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে গ্রন্থের অংশ বিশেষ তাহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে।

গোবিন্দ সিংহের পরে অনেকদিন পৰ্য্যন্ত শিখদিগের মধ্যে কোন শাখা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় নাই, কিছুকাল পূর্ব্বে একজন উদাসী ফকির রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি শাখা-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই ফকিরের মৃত্যুর পর রাম সিংহ নামক একজন সূত্রধর তাহাদের অধিনায়ক হইয়া উঠে, এই সূত্রধর-পুত্রের অনেকগুলি উৎসাহী চেলা জুটিয়া যায়, তাহাদের সাধারণ নাম "কুকা"। ইহাদের পরিচ্ছদ শিখ সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদ হইতে কিঞ্চিৎ

বিভিন্ন, ইহাদিগকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অপেক্ষা রাজনৈতিক সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। একবার বহুসংখ্যক "কুকা" বিদ্রোহাপরাধে দণ্ডিত হয়; সেই হইতে ইহাদের উপর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তীব্র-কটাক্ষ আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা অনেক পরিমাণে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে ইহারা গোপনে এমন সকল পাপাচারের প্রশ্রয় দান করে, যে শিখ সম্প্রদায়ের উপর পর্য্যন্ত সেজন্য কলঙ্ক স্পর্শ করে।

সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে শিখগণ প্রায় হিন্দুপ্রথা পালন করিয়া থাকে। বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর ব্যাপারে, ইহাদের বিধিব্যবস্থা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। শিখদিগের মধ্যে পুরুষ অভিভাবকের অভাবে বিধবাগণ বিষয়ের অধিকারিণী হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর শিখরমণী-গণ রাজপুত ললনার ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যবতী এবং বুদ্ধিমতী, তাঁহাদের বৈষয়িক বুদ্ধিও পুরুষ অপেক্ষা অল্প নহে; পাতিয়ালার রাণী আউসকোর, আম্বালার রাণী দিয়াকোর এবং কানহিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী মাই খদাকোর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু বিধবাগণ সর্ব্বদা সম্পত্তি রক্ষায় সক্ষম না হওয়াতে ইহাঁদের মধ্যে মৃতস্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মৃতস্বামীর ভ্রাতৃসংখ্যা একাধিক হইলে তাহার পাণিগ্রহণে জ্যেষ্ঠেরই অধিক অধিকার। এই প্রকার বিবাহের নাম "চাদর দাল্না"। বিবাহের সময় দম্পতির উপর চাদর নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই এই বিবাহের এরূপ নাম। উক্তরূপ বিবাহে উৎপন্ন পুত্র কন্যা বৈধবিবাহবদ্ধ-দম্পতির সন্তান সন্ততির ন্যায় সমাজে গণনীয় হয়, এবং তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার অব্যাহত থাকে। "চাদর দল্না" বিবাহ অতি সংক্ষেপে এবং অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়, সুতরাং যুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের পূর্ব্বে এইরূপ বিবাহই আদৃত হইয়া থাকে। এই বিবাহের আর এক সুবিধা এই যে, ক্রীত দাসী কিম্বা কোন বন্দিনীকে বিবাহ করিতে হইলে এইরূপ বিবাহই প্রশস্ত। মহারাজ রঞ্জিত সিংহ দলীপ সিংহের মাতা মহারাণী ঝিন্দনকে এই প্রথায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিধবাগণ স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে এবং দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাদের তৃতীয় বার বিবাহ করিবার অধিকার আছে, এই বিবাহের নাম "ত্রিওয়া"।

পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে; প্রথম "চক্র বন্দ", দ্বিতীয় "ভাই বন্দ"। "চক্র বন্দ" প্রথা মাঞ্ঝ প্রদেশের শিখদিগের মধ্যে প্রচলিত এবং মালোয়ার শিখগণ দ্বিতীয় প্রকার প্রথারই পক্ষপাতী। প্রথম প্রথা অনুসারে মৃত স্বামীর সম্পত্তি বিধবা পত্নীগণের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়; দ্বিতীয় প্রথা অনুসারে পুত্রগণ সেই সম্পত্তি সম পরিমাণে লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে যদি কোন ব্যক্তি দুই স্ত্রী রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করে,—এবং তাহাদের একজনের এক পুত্র ও অন্যের তিন পুত্র থাকে তাহা হইলে ঐ এক পুত্র অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হইবে, অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ত্রয়ের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইবে, "চক্র বন্দ" প্রথা অনুসারে এরূপ হইলেও "ভাই বন্দ" প্রথা অনুসারে সমস্ত সম্পত্তিতে উক্ত চারি ভ্রাতার সমান অধিকার।

বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম হইলেও যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিখধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহাদের বিবাহ হিন্দুপ্রথা অনুসারেই সম্পন্ন হয়। সময়ে সময়ে বহু অর্থ উপহার দান করিয়া তাহারা স্বজাতির কন্যা বিবাহ করিতে পায়, কিন্তু সেরূপ স্থানে বিবাহিতা কন্যাগণ পিতৃগৃহ দর্শন সুখ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইয়া থাকে।

কন্যা কিম্বা তাহার সন্তান সন্ততিগণ কোন অবস্থাতেই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইতে সমর্থ নহে, পুত্রাদির অভাবে নিকট জ্ঞাতিই সম্পত্তির অধিকারী হয়।

সম্রান্ত শিখদিগের মধ্যে সতীদাহ প্রথা বহুপরিমাণে প্রচলিত ছিল। বিবাহিতা স্ত্রী দূরের কথা, দাসী এবং উপপত্নীগণও গৃহ স্বামীর মৃত দেহের সহিত অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিত। মহারাজ রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষী মাতাব দেবী ও অন্য তিন জন রাণী অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। রঞ্জিত সিংহের পুত্র মহারাজ খড়্গ সিংহের মৃত দেহের সহিত "চাদর দাল্‌না" প্রথায় বিবাহিতা স্ত্রী ঈশ্বরীকোয়ার দেহ ত্যাগ করেন; তিনি প্রাণ ত্যাগে অসম্মত ছিলেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী রাজা ধ্যান সিংহ তাঁহাকে "দেহত্যাগে বাধ্য করেন। রঞ্জিত সিংহের পৌত্র নাওনিহাল সিংহের দুই স্ত্রীও তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর রাণী ঝিন্দন কুমারীর ভ্রাতা যোয়াহির সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী চতুষ্টয়কে সহমরণে স্বামীর অনুগমন করিতে বাধ্য করা হয়; অভাগিনী রমণীগণ প্রাণনাশের আশঙ্কায় সকলের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না; এমনকি উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ বল প্রয়োগে তাঁহাদের নাসিকা ও কর্ণাভরণ ছিন্ন করিয়া লইল। যে সকল সতী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হয়, সাধারণের বিশ্বাস তাহাদের শেষ বাক্য দৈববাণীর ন্যায় অব্যর্থ; এই সতীদাহের সময় রাজা দীননাথ সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আগ্রহের সহিত সতীদিগকে পাঞ্জাবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিয়াছিলেন, পঞ্চনদ সেই বৎসরই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবে, খালসা সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহাদের স্ত্রী পুত্র অনাথ হইয়া পড়িবে। অনন্তর তাহাদের সুকোমল দেহ অগ্নি মুখে সমর্পিত হইল; বলা বাহুল্য তাহাদের প্রত্যেক কথা দৈববাণীর ন্যায় সফল হইয়াছে।

অবৈধ প্রণয়োৎপন্ন পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ নহে, কিন্তু পূর্ব্বে জারজ পুত্র অনেক সময়ই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। বিশেষতঃ "চাদর দাল্‌না" বিবাহে যে কোন রমণীর উপর একখানি চাদর মাত্র নিক্ষেপ করিলেই যখন সেই রমণীকে ন্যায় সঙ্গত বিবাহ করা যাইত, তখন বৈধ ও অবৈধ পুত্রে পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ কঠিন।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়

রাম ও রামায়ণ।

বিষ্ণুঅবতার রামচন্দ্র কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন ও আদি কাব্য রামায়ণ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল ইহা লইয়া অনেক পাশ্চাত্য ও দেশীয় বিদ্বান ভাস্করগণ স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিপ্রভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক একজন খদ্যোৎ মাত্র। তাহার মিট্‌মিটে আলো পাঠক বর্গের নিকট সাহস করিয়া প্রকাশ করিতেছে; ভরসা করি অনাদৃত হইবে না।

আদিকাণ্ড অষ্টাদশ সর্গে রামের জন্ম সময়ের এই প্রকার নির্দ্দেশ রহিয়াছে—

ততশ্চ দ্বাদশেমাসে চৈত্রেনাবমিকেতিথৌ।৬
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাকৃপতাবিন্দু না সহ॥৭

অর্থাৎ দ্বাদশমাসে চৈত্রের নবমী তিথি হইলে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ছিল এবং পঞ্চ প্রধান গ্রহ স্বীয় স্বীয় উচ্চস্থানে ছিলেন আর বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট লগ্নে উদয় হইয়াছিলেন। বরাহলিখিত বৃহজ্জাতক এবং অন্য জ্যোতিষীগণের মতে গ্রহগুলির উচ্চস্থান নিম্নরূপে নিরূপিত আছে—

অজবৃষভমৃগাঙ্গনা কুলীরা। ঝষবনিজৌ চ দিবাকরাদিতুঙ্গাঃ।
দশশিখিমনুযুক্ তিথীন্দ্রিয়াংশৈ ত্রিনবক বিংশতিভিশ্চ তেঽনীচাঃ॥

অর্থাৎ অজ বা মেষের ১০ অংশ, সূর্য্যের বৃষের তৃতীয় অংশ, চন্দ্রের মকরের ২৮ অংশ, মঙ্গলের কন্যার ১৫ অংশ, বুধের কর্কটের ৫ অংশ, বৃহস্পতির মীনের ২৭ অংশ, শুক্রের এবং তুলার ২০ অংশ শনির উচ্চস্থান বলিয়া কথিত এবং তাহাদের অন্তই অর্থাৎ ৭মরাশিই নীচস্থান। যাহা হউক এ গণনা দ্বারা তাঁহার সময় নিরূপণ কোন মতেই হইতে পারে না। তবে ইহা দ্বারা রামায়ণের রচনার সময়ের কতক আভাস পাওয়া যায় মাত্র। অতএব আমরা পূর্ব্বে তাহাই নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

বাল্মীকি দুই স্থানে ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম অরণ্যকাণ্ডে লক্ষণের মুখে প্রাতঃস্নান সময়ে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন দ্বিতীয় কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বিরহী রামচন্দ্রের বর্ষা-বর্ণন করিয়াছেন। এই দুইটাই সময় নিরূপণে প্রধান উপজীব্য। প্রকৃতির এপ্রকার সুন্দরছবি আঁকিতে ব্যাসদেব পারেন নাই। কাব্যের আদিম সময়ে কবিগণ প্রকৃতির ছবিতেই অধিক আকৃষ্ট হয়েন কিন্তু উত্তরোত্তর কালে প্রকৃতির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। তখন কবি অন্য প্রকারে স্বীয় প্রতিভা প্রকাশ করিতেই অধিক যত্নবান হয়েন। রামায়ণ ও মহাভারত স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ আমার কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে

পারেন। রামায়ণ যে মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা ইহাই তাহার একটি অন্যতম প্রমাণ। উভয় গ্রন্থের সময় নিরূপণ দ্বারাও তাহাই উপলব্ধি হয়। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত আমরা ক্রমিক তাহা প্রকাশ করিতেছি।

অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শ সর্গে লক্ষণ গোদাবরী স্নান কালে পথে হেমন্ত বর্ণনা করিতেছেন।

বসতস্তস্যতু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঃ ঋতুরিষ্টপ্রবর্ত্ততে॥ ১
অয়ংস কাল সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়োযস্তে প্রিয়মৃদ।
অলঙ্কতইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ॥ ৪
নীহার পরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যশালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগোহব্যবাহনঃ॥ ৫
নবাগ্রয়ণ পূজাভি রভ্যর্চ্চ পিতৃদেবতাং।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥ ৬
প্রাজ্যকামাজনপদাঃ সম্পন্নতর গোরসা।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ॥ ৭
সেব্যমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তক সেবিতাং।
বিহীনতিলকেবস্ত্রী নোত্তরাদিক্ প্রকাশতে॥ ৮
প্রকৃত্যাহিমকোষাঢ্যা দূর সূর্য্যশ্চ সাম্প্রতং।
যথার্থ নামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবানিতি॥ ৯
অত্যন্ত সুখ সঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসা সুভগাদিত্যাশ্ছায়া সলিল দুর্ভগাঃ॥ ১০
মৃদুসূর্য্যাঃ সুনীহারাঃ পটুশীতা সমাহিতাঃ।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতং॥ ১১
নিবৃত্তাকাশ শয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরা যামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতং॥১২
রবিসংক্রান্ত সৌভাগ্য স্তুষারারুণ মণ্ডলঃ।
নিশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ ১৩
জ্যোৎস্না তুষার মলিনা পৌর্ণমাস্যাংন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে নচ শোভতে॥ ১৪
প্রকৃত্যা শীতল স্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতং।
প্রবাতি পশ্চিমোবায়ুঃ কালে দ্বিগুণ শীতলঃ॥ ১৫
বাষ্পাচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব গোধূম বন্তিচ।
শোভন্তেহভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ
খর্জ্জুর পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বা শালয়ঃ কনকপ্রভাঃ॥
ময়ূখৈরূপসর্পদ্ভিঃ হিমনীহার সংবৃতৈঃ।
দূরমপ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্ক ইবলক্ষ্যতে॥ ১৮
তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্যচ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণরসবজ্জলং॥ ২৫
ত্যক্ত্বারাজ্যঞ্চ মানঞ্চভোগাংশ্চ বিবিধান্ বাহুন্।
তপস্বী নিয়তাহার শেতে শীতে মহীতলে॥২৮

ইহার অবিকল অনুবাদ দিবার কোন আবশ্যক নাই যে হেতু অল্প সংস্কৃত জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই এই স্বভাব বর্ণনার মাধুরী উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। অনুবাদে সে মাধুরীর বিশেষ হানি আছে। তবে ইহার ভাবার্থ সংক্ষেপে দিতেছি।

শরৎকালের পরে হেমন্ত ঋতু প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাই সম্বৎসরকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে নীহার পতনে সকল স্থান কর্কশ বলিয়া বোধ হয়; পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ থাকে; দেবতাকে নবশস্য দ্বারা পূজা করিয়া সকলে তৃপ্ত হয়; সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে শস্য ও দুগ্ধ পাওয়া যায়; জয়শীল রাজগণ যুদ্ধার্থে বহির্গত হইতেছেন, সূর্য্যদেব দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতে থাকেন; সূর্য্য দূরে গমন করায় হিমবানের নাম সার্থক

হইয়াছে ; দিবসের মধ্য ভাগ অত্যন্ত ভাল বোধ হয় এবং জল ও ছায়া ভাল লাগে না ; নীহার পতনের ভয়ে অনাবৃত স্থানে কেহ শয়ন করে না ; রাত্রিতে শীতের অনেক বৃদ্ধি হয় এবং পুষ্যানক্ষত্রের উদয় হয় ; তুষারে আবৃত হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডল অরুণবর্ণ বোধ হয় সেজন্য নিশ্বাসান্ধ দর্পণের ন্যায় মলিন হইয়াছে সুতরাং পূর্ণমাসী ও শোভা পাইতেছে না। একে বায়ু স্বভাবতই শীতল তাহাতে আবার পশ্চিমে বাতাসে দ্বিগুণতর শীতল হইতেছে। সূর্য্যোদয় সময়ে তুষারাবৃত অরণ্য ও শস্য শালিনী পৃথিবী প্রকাশ পাইতেছে। হিমে আবৃত থাকায় সূর্য্যদেব চন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতেছেন ; পর্ব্বতস্থ জল শীত প্রযুক্ত পারদের ন্যায় শীতল হইয়াছে ; এই সময়ে ভরত রাজ্যভোগাদি মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া তপস্বীর ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকেন।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বর্ণিত আছে যে বালী বধ হইবার পর সুগ্রীবের অভিষেক হয় এবং তারপর বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। সুগ্রীব রামকে বলিতেছেন—২৭ অধ্যায়

পূর্ব্বোঽয়ং বার্ষিকো মাস শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ
প্রবৃত্তা সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিক সঞ্জিতা॥ ১৩
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বংরাবণ বধে যতঃ।
এবঃ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশত্বং স্বমালয়ং॥ ১৬

বর্ষার পূর্ব্ব মাস শ্রাবণ আরম্ভ হইয়াছে ; এই সঙ্গে চাতুর্ম্মাস্যও প্রবৃত্ত হইয়াছে। কার্ত্তিকের আরম্ভে আপনি রাবণ বধে যত্নবান হইবেন ; ইহাই আমাদের প্রতিশ্রুতি এখন স্বীয় ভবনে প্রবেশ করুন।

রামকে লক্ষ্মণ বলিলেন—শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্‌কালো২য় মাগতঃ।
ততঃ সরাষ্ট্রং সগণং রাবণং ত্বং বধিষ্যসি॥ ৩৯-২৭ অধ্যায়

শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন সম্প্রতি বর্ষাকাল আগত তার পর সসৈন্য রাবণকে বধ করিবেন। ২৮ সর্গে বর্ষাবর্ণন দেওয়া আছে—

অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্ত সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সংপশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ॥২
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নং॥৩
এষা ধর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥৭
মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ॥১০
কচিদাপাতিসংকাশান্ বর্ষাসমসমুদ্বহকান্।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু॥১৪

রসাকুলং ষট্‌পদসন্নিকাশং।
প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামং।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং।
ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্বং॥১৯
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি।
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি।
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি॥২৫
ষট্‌পাদতন্ত্রী মধুরাভিধানং।
প্লবঙ্গমোদীরিত কণ্ঠতালং।

আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈঃ।
বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তং ॥৩৬
ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা।
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশঃ ॥৪৭
বিলীয়মানৈর্বিহগৈ র্নিমীলদ্ভিশ্চপঙ্কজৈঃ।
বিকসন্ত্যা চ মালত্যা গতোঽস্তংজ্ঞায়তেরবিঃ॥৫২

মাসিপ্রোষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাং।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥৫৪
নিবৃত্তকর্ম্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ।
আষাড়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥৫৫
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশ দুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতিমে ॥৫৮
শরৎকাল প্রতিক্ষিপ্যে স্থিতোঽস্মিবচনে তব।
সুগ্রীবস্ত নদীনাং চ প্রসাদমনুপালয়ন্ ॥৬৩

ইহার ভাবার্থ—এই বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে, দেখ পর্ব্বতাকার মেঘগুলি কেমন একত্রিত হইয়াছে। আকাশ সূর্য্যকিরণ দ্বারা নয় মাস সমুদ্রের বাষ্প পান করিয়া গর্ভ ধারণ করিয়াছে এখন অমৃতরূপে তাহাই প্রসব করিতেছে। নব জলে পরিপূর্ণা পৃথিবী শোকাকুলা ও ঘর্ম্মে ক্লান্তা সীতার ন্যায় বাষ্প পরিত্যাগ করিতেছে। মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়া ধারারূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া পর্ব্বতগুলি যেন গুহাপূর্ণবায়ুদ্বারা বেদ পাঠ করিতেছে। কোথাও গিরির নিকটে পুষ্পিত কুটজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভ্রমরের ন্যায় কাল জাম ও নানা বর্ণের পক্ক আম্র পতিত হইতেছে। নারায়ণ নিদ্রিত হইয়াছেন, নদী সাগর অভিমুখে, বালহাঁস মেঘের অভিমুখে গমন করিতেছে। কোথাও ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিতেছে মেঘগুলি মৃদঙ্গনাদ করিতেছে বোধ হইতেছে যেন বনময় সংগীতের ধুম লাগিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন প্রযুক্ত তারাগণ ও ভাস্কর অদৃশ্য রহিয়াছেন নূতন জলে পৃথিবী তৃপ্ত হইয়াছে কিন্তু সকল দিকেই অন্ধকার পরিব্যাপ্ত। পক্ষিগণ নীড়ে গিয়াছে, পদ্ম সকল নিমীলিত হইয়াছে, মালতীফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে অতএব বোধ করি সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। এই ভাদ্র মাসে সাম বেদপাঠী ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন সময় উপস্থিত হইয়াছে। আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া অযোধ্যাধিপতি ভরত নিশ্চয় আষাঢ় পৌর্ণমাসী ব্রতের আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। আমি শোকে অভিভূত, বর্ষাও বড় দুর্গম, এখন রাবণ যেন অপার পারাবারের ন্যায় বোধ হইতেছে।

এই মধুর স্বভাবোক্তি হইতে আমরা অয়নের দুই সীমা অবগত হইতেছি। প্রথম দক্ষিণায়ণ দ্বিতীয় উত্তরায়ণ—দুইটাই আরম্ভ হইতেছে। শীত বর্ণনের ৮ম ১২শ ও ১৪শ শ্লোকগুলি দেখিলে বেশ বোধ হইতেছে যে বাল্মীকি হেমন্তের অবসান সময়ের বর্ণন করিতেছেন। পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসীর নির্দ্দেশ বেশ প্রকাশ রহিয়াছে। সুতরাং রামায়ণ রচনা সময়ে উত্তরায়ণ পৌষীদিনে বা মাঘের কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ হইত। পুষ্যার ভোগাংশ ১০৩ অংশ ৪০ কলায় শেষ হয় সুতরাং সূর্য্যদেব তখন রাশিচক্রের ২৮৬ অংশ ৪০ কলায় ছিলেন অতএব নিরংশ স্থান হইতে অয়নচক্র ১৬ অংশ ৪০ কলা পশ্চিমে ছিল। সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা জানা যায় যে অয়নের উক্ত অংশ অগ্রসর হইতে ১১৯৭ বৎসর অতিবাহিত হয় অতএব জানা যাইতেছে যে রামায়ণ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে ৯১৩ বৎসরে রচিত হয়। বর্ষা বর্ণনের

২৫ ও ৫৫ শ্লোক দ্বারা জানা যায় যে দক্ষিনায়ণ আষাঢ়ের পুর্ণিমায় আরম্ভ হইত। ইহা দ্বারা আর একটী বিষয় অবগত হইলাম যে নারায়ণের শয়ন পুর্ণিমার দিন আরম্ভ হইত। বর্ত্তমান সময়ে শয়ন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী বলিয়া যে ব্রত প্রচলিত আছে তাহা মহাভারতের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতে আছে—

আষাঢ়ে তু সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ।
চতুর্মাস্যং ব্রতং কুর্য্যাৎ যৎকিঞ্চিৎ প্রযতোনরঃ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঋতু পরিবর্ত্তনে বা যে কোন কারণেই হউক রামায়ণের সময় হইতে মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত আসিতে এ ব্রতের চারদিনের অন্তর হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে মহাভারত পরবর্ত্তী রচনা।

আমরা মনুসংহিতা ১ম ৬৭—৭২ শ্লোকে অবগত হইতেছি যে চতুর্যুগের পরিমাণ ১২০০০ বৎসর। মহাভারত বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে প্রক্ষিপ্তাংশ মার্কণ্ডেয় সমস্যা দ্বারাও তাহাই অবগত হওয়া যায়। ভীষ্মপর্ব্ব ১০ম অধ্যায়ে সঞ্জয় কর্ত্তৃক যুগবর্ণনে জানা যায় যে চতুর্থ যুগের নাম তিষ্য ছিল। যুগত্রয়ের আয়ুর পরিমাণ ৯০০০ বৎসর দেওয়া আছে কিন্তু চতুর্থ তিষ্য বা কলি যুগে আয়ুর কোন পরিমাণ নাই, জাত অজাত সকলেই মৃত হয়। তাঁহার সময় দ্বাপর যুগই প্রবহমান ছিল। সে বর্ণন এই—

চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চকুরুবর্দ্ধন ॥৩
পুর্ব্বং কৃতযুগং নাম তত স্ত্রেতা যুগং প্রভো।
সংক্ষেপাদ্দ্বাপরস্যাথ ততস্তিষ্যং প্রবর্ত্ততে ॥৪
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃ সংখ্যা কৃতযুগেসংখ্যাতারাজসত্তম ॥৫
তথাত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বেসহস্রে দ্বাপরে চ ভুবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতং ॥৬
নপ্রমাণস্থিতির্হ্যস্তি তিষ্যেহস্মিন্ ভরতর্ষভ।
গর্ভস্থাশ্চম্রিয়ন্তেহত্র তথা জাতা ম্রিয়ন্তিচ ॥৭

পুরাণকার ও জ্যোতিষীগণ উক্ত যুগসংখ্যাকে দেব বৎসরে গণনা করিয়া যুগপরিমাণ অযথা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজগণের সময় নিরূপণ করিতে অনেক সময় অস্থিরপঙ্ককে পড়িতে হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ১২০০০ সহস্রে দেব বৎসর না বুঝাইয়া মনুষ্য বৎসরই বুঝাইতেছে। ইহার যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা অনেক চিন্তার পর আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ক্রান্তিপাতের রাশিচক্রের অর্দ্ধাংশ ভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে তাহাই যুগসমষ্টিরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ মেষের আদিস্থান হইতে তুলার আদি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে ক্রান্তিপাতের ১২০০০ বৎসর অতিবাহিত হয় এবং পুনর্ব্বার তুলার আদি হইতে মেষের আদিতে গমন করিতেও উক্ত সময় লাগে। সুতরাং ২৪০০০ বৎসরে ক্রান্তিপাত একবার রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া আইসে। এ গণনা মতে জানা যায় যে প্রতি বৎসরে ৫৪ বিকলা করিয়া ক্রান্তিপাত অগ্রসর হইতেছে। অতএব ৪২১ শকাব্দ বা ৩৬০০ কল্যব্দকে যদি ক্রান্তিপাত বা অয়নের বিরামস্থান কল্পিত করা যায় তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে কল্যব্দের আরম্ভই প্রকৃতপক্ষে

ত্রেতার শেষ হইতেছে। আবার সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ইহাও জানা যাইতেছে যে রামচন্দ্র ত্রেতার শেষে রাজ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং যাহাকে আমরা চিরকাল কল্যব্দ বলিয়া ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রামচন্দ্রেরই রাজ্যাব্দ হইতেছে। আমাদের মতে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১১৫০১ বৎসর হইতে যুগাব্দের কল্পনা করা হইয়াছে। এ সময়ের সহিত মিসর দেশীয় রাজবংশাবলীর বৎসরের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে মিসর দেশীয় ১৫৬ ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজগণ ১১৩৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সকলের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে রামচন্দ্র ১১০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু রামায়ণে যেমন ইহা লিখিত আছে সেই প্রকার ইহার প্রতিকূল মতটীও লিখিত আছে। ইহাতে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে রামচন্দ্র অনুমান ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। ক্রুদ্ধা কুব্জাকে কৈকেয়ী বলিতেছেন—

ধর্ম্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবান্ শুচিঃ
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যে মতোঽহইতি॥ ১৪
ভ্রাতৄন ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনং॥ ১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবংবর্ষশতং পরং।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ॥ ১৬ (অযোধ্যা—৮ অধ্যায়)

ধার্ম্মিক বিদ্বান কৃতজ্ঞ সত্যবাদী নির্ম্মল-চরিত্র জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রেরই যৌবরাজ্য পাওয়া কর্ত্তব্য। তিনি পিতৃবৎ দীর্ঘকাল ভ্রাতৃ ও ভৃত্যগণকে পালন করিবেন। হে কুব্জে, তুমি তাঁহার অভিষেক শুনিয়া কেন ক্রুদ্ধা হইলে। বেশ জানিও যে রামের ১০০ বৎসর পরে ভরত পিতৃ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

মেধাতিথি মনুর ভাষ্যে—"সহ ষোড়শং বর্ষশতমজীবদিতি পরমায়ুর্বেদেশ্রূয়তে" লিখিয়া বেদের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া ৪০০ আদি পরমায়ুর খণ্ডন করিয়াছেন আবার কল্লুকভট্ট রামায়ণলিখিত রামের আয়ুর বিষয় লিখিয়া মেধাতিথির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলতঃ কল্লুকভট্ট মেধাতিথির চাতুরীই বলুন আর যাই বলুন তাঁহার ভাষ্যে বহু অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে এমন কি, কোথাও কোথাও তিনি মেধাতিথি হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন অথচ পুস্তকের শেষে তাঁহারই নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন—এ জাতীয় কুলক রাখিবার স্থান নরকেও নাই! বরাহমিহিরের মতে মনুষ্যের পরমায়ু ১২০ বৎসর পাঁচ দিন। তিনি যে বিনা প্রমাণে এ প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি, না অতএব দীর্ঘজীবী সকল যুগেই আছে। মনুর মতে শুদ্ধাচারে নিষ্ঠাপূর্ব্বক থাকিলে মনুষ্যেরা ঋষিদিগের ন্যায় দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

শ্রীকানাই লাল ঘোষাল।

লাস্‌করানের উজীর।

চতুর্থ অঙ্ক।

[শোলিখানুমের গৃহে এই দৃশ্য সংঘটিত হয়। শোলিখানুম ও নিসাখানুম উদ্বিগ্নচিত্তে ও সপ্রতীক্ষ হৃদয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।]

নিসাখানুম। জান্‌তে পেলেম না কি হল, ব্যাপারটা কতদূর গড়াল, মস্‌দ এখনও এল না, খবর পাওয়া গেল না, মন ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

শোলিখানুম। তোর মন কেন ব্যস্ত হচ্ছে? তোর নিজেরই কথামত খাঁ ত তৈমুর আকার কোন হানি কর্‌তে পার্‌বেন না?

নিসা। তার কোন হানি কর্ত্তে পার্‌বেন না সত্যি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তৈমুর আকার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে—সে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

(এই সময় আগা মস্‌দের দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ)

শোলি। আগা মস্‌দ, বল, শুনি, কি রকম হল!

আগা মস্‌দ। কি রকম হতে চাও? উজীর খাঁর কাছে নালিশ কর্‌লেন, খাঁ লোক পাঠালেন,—তৈমুরকে নিয়ে এল,—তাকে ফাঁসি দিতে যান,—তৈমুর পিস্তল বের করে করাশদের সরিয়ে তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন। খাঁ পঞ্চাশজন গোলাম পাঠাতে হুকুম দিয়েছেন তৈমুর আকা যেখানেই থাকুন্‌ ধরে নিয়ে আস্‌বে,—খাঁর সাম্‌নে হাত বেঁধে নিয়ে আস্‌বে—তাঁকে মেরে ফেলা হবে। আর এখন সমস্ত সহর আর বাড়ীময় লোকে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

(নিসাখানুমের হৃদয়াবেগের আধিক্যে দীর্ঘনিশ্বাস পতন। সেই সময় দ্বার উন্মুক্ত হওন এবং তৈমুর আকার প্রবেশ)

শোলিখানুম। ও মা! ও মা! একি ব্যাপার! এখানে কেন এসেছ! এখানে কেমন করে এলে! তোমার কি সিংহের প্রাণ! কি তোমার প্রাণের ভয় মোটেই নেই!

তৈমুর আকা। (হাসিয়া) কি হয়েছে যে প্রাণের ভয় কর্‌ব?

শোলি। কি না হয়েছে! খাঁ লোক পাঠিয়েছেন তোমায় চারদিক থেকে খুঁজে বের কর্ত্তে, তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌তে! তুমি এমন খাতির জমা হয়ে এখানে এসেছ কি কর্ত্তে! আগা মস্‌দ, দোহাই আল্লার, বাইরে যাও; দেখো যেন এখানে কেউ না আসে!

---

* শ্রাবণ মাসের [illegible]

(আগা মসুদের নিষ্ক্রমণ)

তৈমুর আকা। তুমি কি মনে করেছ মসুবার ভয়ে আজ আমি নিসাখানুমকে দেখতে আসব না! আমার এ মাথা ত তার পায়ের তলায় রেখেই দিয়েছি। তবু আপাততঃ আমি বেমৎলবে আসিনি। আমি আজ রাত্তিরে নিসাখানুমকে আর কোথাও নিয়ে যেতে চাই, এখানে আর তাকে রেখে যেতে পারিনে। তোমার স্বামী যখন আমার প্রতি নিমকহারামি করেছেন আমি আমার ভাবী পত্নীকে তাঁর বাড়ী আর রাখতে পারিনে, কেন না ভবিষ্যতে আমি আর আগেকার মত এখানে যাওয়া আসা কর্ত্তে পারব না।

শোলি। বেশ আমিও এতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার এখানে এমন দিনে দুপুরে আসা ভাল হয়নি। তুমি কি জাননা জীবাখানুম আমাদের ধরবার জন্যে এরূপ জায়গায় গোয়েন্দা রেখে দিয়েছে—যে কোন ছুতোয় তোমায় মৃত্যুমুখে দেবে আর আমাদের বদনাম দেবে। এখন এখান থেকে কোন উপায়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই তোমার পক্ষে ভাল। আর্দ্ধেক রাত্তিরে ঘোড়া ও লোকজন নিয়ে দরজার সামনে এসো। আমি সেই সময় নিসাখানুমকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তোমার হাতে নিয়ে যেতে দেব।

তৈমুর আকা। নিসাখানুম তুমিও রাজী আছ?

নিসাখানুম। রাজী অবিশ্যি আছি। এ ছাড়া আর কি উপায় আছে!

(এই সময় দ্বারদেশের সম্মুখে আগা মসুদের উচ্চৈঃস্বরে কথন)

রক্ষা! উজীর আসছেন!

শোলিখানুম ও নিসাখানুম। (বিবর্ণ হইয়া) ওমা! ওমা! রক্ষে কর তৈমুর আকা, এই পরদার পিছনে লুকোও, দেখি এই জালিমকে বিদায় কর্ত্তে পারি কি না।

তৈমুর আকা। (স্বীয় মুখভাবের একতিল পরিবর্ত্তন না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে) আমি কখন আর ও পরদার আড়ালে লুকব না, সে আসুক, আমায় এখানে দেখুক।

শোলিখানুম ও নিসাখানুম। (পায়ে পড়িয়া, তাঁহার জানু ধরিয়া একান্ত উদ্বেগের সহিত) খোদার দোহাই, নিজেকে রক্তের স্রোতে ভাসিও না, তোমার বাপের কবরের দোহাই এই পরদার পিছনে লুকোও!

তৈমুর আকা। কক্ষনো না!

আগা মসুদ। (পুনর্ব্বার দ্বারদেশে মাথা ঢুকাইয়া) হায়! হায়! রক্ষে! উজীর এসেছেন।

শোলি ও নিসাখানুম। তোমার মাথা খবরদারি করি! আমাদের প্রতি দয়া কর। উজীর যদি এবার ফের তোমায় এখানে দেখেন তাহলে নিশ্চয় আমাদের মাথা কাটবেন।

তৈমুর। হা! আচ্ছা কেবল তোমাদের খাতিরে—

(পরদার অন্তরালে গমন, এক মুহূর্ত্ত পরে উজীরের গৃহ প্রবেশ)

উজীর। ভালই হয়েছে তোমরা দুজনেই এখানে রয়েছ তোমাদের সঙ্গে আমার কথা

কওয়ার দরকার আছে, আমার দিকে মন দাও। শোলি তুমি জান খাঁর সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে হলে আমার পদ আর তোমার মর্য্যাদা কত বাড়্‌বে, সেইজন্তে কি তোমার নিজের সুনামের দিকে নজর রাখা দরকার নয়! তাকে বাতাসে না বিলোন উচিত নয় কি? লোকে যেন না বলে খাঁর শ্যালী পরপুরুষকে বাড়ীতে যাতায়াত কর্ত্তে দেয়।

শোলিখাতুম। (ধীরে ধীরে ও নিঃসঙ্কোচে) অনুগ্রহ করে বলুন শোনা যাক্, কোন্ পরপুরুষ আমার বাড়ী যাতায়াত করে।

উজীর। এই যেমন তৈমুর আকা যাকে সেদিন তোমার ঘরে দেখেছিলুম।

শোলি। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী জীবাখাতুমের সঙ্গে, এই পরদার পিছনে।

উজীর। তা ঠিক। তোমার সম্বন্ধে আমার কোন মন্দ সন্দেহ নেই খুব সম্ভবতঃ জীবাখাতুমের ঘাড়েই এ দোষ চাপান উচিত। আমি তোমাকে এ কথা বল্‌ছি এই জন্তে যাতে করে এমন চালে চল যে খাঁর সাম্‌নে তোমার নামে কেউ কিছু মন্দ কথা বল্‌তে না পারে, আর তাতে করে নিসাখাতুমের উপর তাঁর মন বিগ্‌ড়ে না যায়। কেন না এখন তিনি নিসার জন্তে একেবারে অস্থির, আমায় তদ্বির কর্‌বার হুকুম দিয়েছেন যাতে আস্‌ছে সপ্তাতেই বিয়ে হতে পারে, এই আংটী উপহারও পাঠিয়েছেন। নিসাখাতুম এস! নাও! আঙ্গুলে পর! (নিসাখাতুমের হস্ততলে অঙ্গুষ্ঠি রক্ষণ)

নিসাখাতুম। যে মেয়ের বোনের নামে মন্দ সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে সে খাঁর যোগ্য নয়। এ আংটি নাও, খাঁর যোগ্য মেয়ে খুঁজে পেলে তার আঙ্গুলে দিও।

(উজীরের সম্মুখে ভূমিতে অঙ্গুষ্ঠি রক্ষণ এবং বহির্গমন)

উজীর। (তদুদ্দেশ্যে) আরে পাগ্‌লি মেয়ে। তোমার বোনের সম্বন্ধে কি সন্দেহ করছি? সে কথাগুল সুধু আমি ওকে উপদেশ দেবার জন্তে বলেছিলুম।

শোলি। আপনার স্ত্রী জীবাখাতুমকে এ উপদেশটা দিলে হত না!

উজীর। অবিশ্যি! কাল এর চেয়ে ঢের শক্ত করে তাকে বল্‌ব।

শোলি। তবে কাল কেন! কিন্তু, আজ যেতে পারেন না!

উজীর। এখন তত দরকার নেই কেন না যদি বা তৈমুর আকা ওর প্রণয়ী হয় ত সে সাজা পেয়েছে। যদি ধরা পড়ে ত মর্‌বে, আর যদি পালায় তাহলেও দেশ থেকে অনেক দূরে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হবে, ভবিষ্যতে তাই এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তার দরকার নেই। নিসাখাতুমের বিয়ের তদারকে এখন আমাদের নিযুক্ত হওয়া দরকার।

শোলি। তাহলে আমার মায়ের ঘরে যান, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কন গে, এ আমার কাজ নয়।

উজীর। তুমি যাও, তোমার মাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস, এই ঘরে বসেই কথাবার্ত্তা হবে।

(এই সময় দ্বার উন্মুক্ত হওন, এবং পরীখানুম ও নিসাখানুমের প্রবেশ)

ভালই হয়েছে, আপনি নিজেই এখানে অনুগ্রহ করে এসেছেন, বস্‌তে আজ্ঞা করুন।

পরীখানুম। তোমার বালাই নিয়ে মরি। বস্‌বার সময় নেই। যদি ফের চলে যাও আর তোমার দেখা পাব না। আমার দিকে একটু কাণ দিও, আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। আল্লা আকবর! এত তুমি ব্যস্ত থাক যে তোমায় দেখতেই পাইনে।

উজীর। হ্যাঁ, বিশেষতঃ এই কদিন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বার একটুও সময় ছিল না। বলুন দেখি আপনার কি কাজ।

পরীখানুম। তোমার বালাই নিয়ে মরি! তেমন কিছু কাজ নয়। আজ কুরবান্ গণৎকারের কাছে ওষুধ চাইতে গিয়েছিলুম যাতে খোদা আমার মেয়ের গর্ভে তোমায় একটী সন্তান দেন। গণৎকার ওষুধ দেবার সময় বল্লেন, উজীরের মাথার ঠিক তিন গুণ সুজীর পায়েস করে গরিব ভিখারীদের দিতে হবে। এখন তোমার মাথার তিন গুণের মাপ নিতে চাই, যাতে পায়েস কর্‌বার লগ্ন উৎরে না যায়।

উজীর। অদ্ভুত কার্য্য হাতে নিয়েছেন মা। কিন্তু যতক্ষণ আমার মাথা শরীরে আছে তার মাপ কি করে নেবেন?

পরী। তোমার বালাই নিয়ে মরি। সে আমি পার্‌ব। খুব সহজ। গণৎকার আমায় নিজে শিখিয়ে দিয়েছেন। তোমার মাথার উপর একটা খোঁদাল হাঁড়ী রাখতে হবে। যেমন হাঁড়ী তোমার মাথায় বসে তেমনি হাঁড়ীর মাপে তোমার মাথার মাপ। নিসাখানুম হাঁড়ী নিয়ে আয়!

(নিসাখানুমের বাহিরে গিয়া আগামসুদ কর্ত্তৃক রক্ষিত একটী ছোট হাঁড়ী আনয়ন। পরীখানুমের হাত বাড়াইয়া উজীরের মাথা হইতে তাড়াতাড়ি অথচ অরুক্ষভাবে টুপী উন্মোচন)

উজীর। যদিও ব্যাপারটা কিছু অসাধারণ, কিন্তু আমি আপত্তি কর্ত্তে পারি নে। কেননা যা বলা হয়েছে তা ঠিকঠাক করা দরকার। খোদা যেন শোলিখানুমের ইচ্ছে পূর্ণ করেন।

পরীখানুম। হ্যাঁ, তোমার কুরবানি হই। নিসাখানুম ওঁর মাথার উপর হাঁড়ী পরা।

(নিসাখানুমের উজীরের মাথার উপর হাঁড়ী রক্ষণ। হাঁড়ী উজীরের ভ্রূ পর্য্যন্ত পৌঁছে, তাহার নীচে নামে না, তাহাকে আরও নীচে নামাইবার জন্য নিসাখানুমের প্রবল বেগে হাঁড়ীর উপর আঘাত)

উজীর। (দুই হাত তুলিয়া) উঃ! ওঃ! রক্ষে কর! কি কর্‌ছ? আমার নাকে লাগ্‌ছে! আস্তে!

(মাথা হইতে হাঁড়ী উঠান)

পরী। (সক্রোধে) বাছা বড় হাঁড়ী নিয়ে আয়!

উজীর। নানাজান! খোদার দোহাই। আর এক সময় এটা করলে হয় না? এখন আপনার সঙ্গে আমার কথা কবার দরকার ছিল, একটা জরুরী কাজ আছে।

পরী। না না বাপ আমার! সে হতে পারেনা লগ্ন উৎরে যাবে। তোমার কুর্বানি হই, বিরক্ত হয়োনা বাপ, এ একমিনিটের কাজ তার পরে তোমার যা বলবার আছে সব শুনব। (অশ্রুপাত করিয়া) এই বুড় বয়সে শোলিখানুমের কোলে ছেলে না দেখে আমি মরব সেকি উচিত? (অশ্রুপূর্ণ চোখে নিসাখানুমের দিকে চাহিয়া) বাছা হাঁড়ী মাথায় পরা, এইটেই গোড়ায় আনা উচিত ছিল।

(নিসাখানুমের উজীরের মাথায় হাঁড়ী রক্ষণ। হাঁড়ী গলার নীচে আসায় পরীখানুমের খবর পরদার দিকে চাহিয়া শোলিখানুমের প্রতি ইসারা করন। শোলিখানুমের আস্তে আস্তে পরদা উঠাইয়া তৈমুর আকাকে বাহিরে আনিয়া তাহার সহিত দরজা পর্য্যন্ত আগমন, তৈমুর আকার দূরবর্ত্তী আর এক দরজা দিয়া নিষ্ক্রমণ; নিসাখানুমের হাঁড়ী উঠান।)

উজীর। যাহোক্ অবশেষে হোল। মা এখন বসুন, আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই।

পরী। চোখের মাথা খাই।

(বসিতে উপক্রম, এমন সময় প্রাঙ্গন হইতে কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হওন, এবং এক মিনিট অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তৈমুর আকার পিস্তলহস্তে গৃহে প্রবেশ। তৈমুর আকাকে দেখিয়া উজীরের কম্পন।)

তৈমুর আকা। আমার বাপের দয়ার দেন তোমার শাপ হয়। দেখে আমায় নাহক্ অন্যায় করে মেরে ফেলবার ফন্দি! কিন্তু তোমায় না মেরে আমি মরছিনে।

(উজীরের দিকে পিস্তল লক্ষ্য করণ)

শোলি। (পায়ে পড়িয়া সানুনয়ে) দয়া কর! তৈমুর আকা! হাত নামাও নিজেকে সম্বরণ কর।

(তৈমুর আকার হাত নামান। এই সময় কতিপয় গোলামের সহিত সমদবেগের প্রবেশ এবং দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওন)

তৈমুর আকা। সমদবেগ কি অভিপ্রায়? কি কর্ত্তে চাও?

সমদবেগ। আমরা আপনার ও আপনার পিতা মহাশয়ের চাকর। আমাদের কি সাধ্য আপনার প্রতি বেয়াদবী করি। কিন্তু আপনি নিজেই জানেন খাঁর হুকুম আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তৈমুর। আমাকে জীবন্তে তার কাছে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু আমার মাথা নিয়ে যেতে পার। তবু আমার মাথা তেমন সহজে কারো হাতে পড়বে না। আচ্ছা কিসমৎ! সে শক্তি তোমার থাকে ত এস সামনে এস।

সমদবেগ। আকা, হুজুর আপনি ঐ পিস্তল ছুঁড়তেন, এবং আমাদের একজনকে মারলেন। আমার সঙ্গে যে পঞ্চাশজন গোলাম রয়েছে তাদের সকলকেই কি মারতে পারেন

না। কিন্তু এ সবের কিছু দরকার নেই। খাঁ এখন ঠাণ্ডা হয়ে কথা দিয়েছেন আপনার কিছু করবেন না।

তৈমুর। তাঁর কথায় ও কাজে আমার কখন বিশ্বাস নেই। কবে তিনি তাঁর কথা রেখেছেন যে লোকে তাঁকে বিশ্বাস করবে। আমি যা বলছি তাই।

(এই সময় প্রাঙ্গনে পুনর্ব্বার কোলাহল শব্দ। সলিমবেগ নাজীর ও তৈমুর আকার ধাত্রীপুত্র রেজার গৃহে প্রবেশ)

সলিমবেগ। সমদবেগ পিছিয়ে দাঁড়াও। তৈমুর আকা আপনার মঙ্গল হোক্। আপনার পিতৃব্য খাঁ নৌকায় চড়ে সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন, হঠাৎ বিপরীত বাতাস উঠায় নৌক উল্টে সমুদ্রে ডুবে গেছে। এখন সব লোকে দেওয়ান খানায় জমা হয়েছে। আপনি মসনদে বসবেন, আপনার পিতার স্থান অধিকার করবেন বলে সবাই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছে।

তৈমুর। রেজা সত্যি কি ?

রেজা। হ্যাঁ! কুরবানি! সত্যি! আজ্ঞে করুন সবাই যাই।

(এই সময় উজীর ও সমদবেগের সম্মুখে আসিয়া ধূলায় পতন)

তৈমুর আকা। সমদবেগ ওঠ! একপাশে গিয়ে দাঁড়াও।

(সমদবেগের উঠিয়া একপার্শ্বে গমন)

তৈমুর। (উজীরের দিকে চাহিয়া) উজীর! তোমার বাড়ী আসবার কারণ আমার এই ছিল যে আমি তোমার শ্যালী নিসাখানুমকে ভালবাসতুম এবং এখনও বাসি। আল্লার ইচ্ছানুসারে, রসুলের আইনানুসারে এবং তার নিজের সম্মতিক্রমে আমি তাকে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম। কিন্তু তুমি খুব লম্বা চওড়া মৎলবে তাকে হতভাগ্য মৃত খাঁকে দেবার ইচ্ছে করেছিলে, সেইজন্যে আমার আসল অভিপ্রায় তোমায় খুলে বলতে পারি নি। তাই আমার প্রতি মন্দ সন্দেহ করে তুমি আমায় মারবার সংকল্প করেছিলে। কিন্তু মানুষের সংকল্প দৈবে উল্টে দেয়। যে ন্যায়ে ছোট বড় সকলের সামনেই তাদের কার্য্যের উচিত ফল ধরে দেয় সেই ন্যায়ের খাতিরে খোদাবন্দ ন্যায়কারীকে মুক্তি দিয়েছেন আর তোমার ইচ্ছে বাতিল করে দিয়েছেন। তোমার ক্ষমতাকালে রায়ত ও কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে তুমি প্রকাশ্যে যে সব মন্দ ব্যবহার করেছ তাই মনে রেখে তোমাকে এখন আর দ্বিতীয়বার উজীরের পদ দেওয়া উচিত নয়, কিম্বা তোমার সাবেক আমলে রাখা উচিত নয়। কেননা আমি জানি যে স্বাভাবিক মন্দ প্রকৃতি এই সব কাজের উৎপাদক, সে প্রকৃতিকে একবারে মন থেকে উৎপাটন করা কখন এমন সম্ভব নয় যে লোকের কাজে ন্যায়পথে চলতে পারবে। কিন্তু তুমি নাকি এই ঘরের নিমকে মানুষ হয়েছ তাই তোমার সাবেক দোষে আমি চোখ দিলুম না। এখন থেকে যাবজ্জীবন তুমি আমার বৃত্তিভোগী হয়ে তোমার ঘর ও পরিবারের কর্ত্তা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার মনে রাজ্য ও প্রজার উন্নতি কল্পনা থাকায়

আমার কাছে থেকে উজীরী পাবার আশা আর রেখো না। কেননা তোমার মত লোকের রাজকার্য্যে হাত দেওয়ায় দয়া ও ন্যায়ের ব্যত্যয় হয়। যে কেউ রাজ কার্য্যে সুবন্দোবস্ত আনতে চায় এবং প্রজাদের উন্নতি কর্ত্তে চায় তার স্বার্থপর, অজ্ঞ অসমর্থ লোকদের হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে নিয়ে যোগ্য সৎ ও বিজ্ঞলোকের হাতে সে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। যারা স্বভাবত লোভী ও ঘুসখোর এবং নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার করে তাদের হাতে ঈশ্বরের জীবের শাসন ভার দেওয়া উচিত নয়। রাজ্যকে উন্নতির দিকে নওয়ালে রায়ত কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য লোকেরা সবাই আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পারে। যাহোক এখন এ বিষয়ে আর বেশী কথা কবার সময় নেই। এখন বিয়ের ব্যাপারে হাত দিয়ে তাকে সাঙ্গ করা দরকার। তোমার আশীর্ব্বাদে এই কাজ হোক, নিসাখাতুমের যা যা দরকার তার তদারক কর। আল্লার ইচ্ছেয় আসছে হপ্তায় বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যে হুকুম দেওয়া যাবে, এবং চট্‌পট্ কাজ শেষ করা যাবে। পরিখাতুম মা, সোলিখাতুম বোন আমার, খোদা তোমাদের দেখুন, এখন আসি। নিজের নিজের কাজে নিযুক্ত হও।

পরীখাতুম ও শোলিখাতুম। খোদা তোমার আয়ু ও দৌলত বৃদ্ধি করুন আরও একশ বছর ধরে যেন খানায়ৎ ও রাজ্য ভোগ কর।

(প্রধান ব্যক্তিদের সহিত তৈমুর আকার নিক্রমণ, উজীরের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গৃহে অবস্থান)

গোলামগণ। (প্রাঙ্গন হইতে উচ্চৈঃস্বরে) তৈমুর খাঁর সলামত পৌছে।

(যবনিকা পতন)

কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন।

প্রকৃতভক্ত দুঃখে ম্রিয়মান ও সুখের সময় আনন্দে আপ্লুত হন না। তিনি সকল কার্য্যের কারণ তাঁহার ইষ্টদেবে আরোপিত করেন সুতরাং দুঃখে তাঁহার অনেক সান্ত্বনা হয়। প্রসাদ ও কমলাকান্ত এই প্রকার ভক্ত ছিলেন। ইহারা উভয়ে ইষ্ট দেবীর নিকট কেবল নিঃস্বার্থভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন—

আমি কি মা দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে মা দুঃখ দিয়ে বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥

মন কর না সুখের আশা। যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা॥
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতে শিবের দৈন্যদশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে মন সুখের আশে বড় কসা॥
হরিষে বিষাদ আছে মন করো না এ কথায় গোসা।

ওরে সুখেই দুঃখ দুঃখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মন ভেবেছো কপট ভক্তি করে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ায় কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতি মাসা॥
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্ম্মে কেন হও রে চাসা।
ওরে মনের মতন কর যতন রতন পাবে খাসা॥

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম কথা বোঝা গেছে।
তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।

তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্রে সে সুতার কাটনা কেটেছে।
ওমা মায়াসূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপাক্ষেপী খেল খেলিছে।

সুখের বাসনা কর না কদিন,
ত্যজি অন্য ফল কালী কালী বল মানব জনম যদিন॥

ইত্যাদি কমলাকান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "কালিসব ঘুচালি লেঠা" কতদুঃখের গান। কিন্তু ভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি আপনার মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন—

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন করবি কি করবি সেটা।
* * *
দুঃখে রাখ সুখে রাখ কি করবো মা দিয়ে খোঁটা
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুছতে পারি কি সাধের ফোঁটা।
জগতজুড়ে নাম দিয়াছো কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে যেমন ব্যাভার এ মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥

কিন্তু এই প্রকার দুর্ঘটনায় অভ্য রামপ্রসাদ মার প্রতি কত কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন—

মা মা বলে আর ডাক্‌বো না।
ওমা দিয়েছো দিতেছো কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে।

মা কি রয়েছো চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে
মা মলে কি ছেলে বাঁচে না॥
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র।
মা হয়ে হলি সন্তানেরি শত্রু।
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি।
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা॥

যিনি ভক্ত তিনি স্বীয় ইষ্টদেবকে মানস পূজা করিতেই অধিক ভাল বাসেন। আড়ম্বরযুক্ত পূজা তাঁহার ভাল লাগে না।

মন তোর এত ভাবনা কেনে। একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।

তুমি লুকায়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজকিরে তোর সে রোসনায়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দেওনা জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষছাগল মহিষাদি কাজকিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দাও ষড়্ রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

প্রসাদ "মন তোর ভ্রম গেল না" ইত্যাদি গানেও উপরি লিখিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কালী যে দুই চার হাত লম্বা প্রতিমা নহেন তিনি যে বিশ্ববাপী ঈশ্বর স্বরূপা তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে পৌত্তলিক বলিয়া আমাদের নিন্দা করা উচিত নহে। হিন্দুধর্ম্ম অগাধ সমুদ্র; ভক্ত ইহাতে ডুব দিলে নানাপ্রকার রত্ন লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই নানাপ্রকার শাখাধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত তাঁহাদের নিকট সকল উপধর্ম্মের একীকরণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরে দ্বিভাব থাকে না।

"মনরে তোরে এই মিনতি, তুমি পড়া পাখি হও করি স্তুতি" ইত্যাদি

প্রসাদের এই গানের সহিত দ্বিজ রামপ্রসাদের নিম্ন গানের কতকটা মিল আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা প্রসাদের গানে অধিক।

ডাকরে মন কালী বলে
আমি এই স্তুতি মিনতি ; করি ভুলনা মন সময় কালে॥ ইত্যাদি

প্রসাদের নিম্ন গানের ভাব এমন কি কথা গুলিও দ্বিজ রামপ্রসাদ স্বীয় গানে লিখিয়া গিয়াছেন।

দুটা দুঃখের কথা কই; কে বলে মা তোরে দীন দয়ামই!
কারে দিলি চিনি মোণ্ডা মা, খেতে খাসা দই
আমি অন্ন বিনে উপবাসী দিনেক দুদিন রই।
কারে দিলে হাতি ঘোড়া মা পাকি বাঁধা হই।
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেউ নই।
প্রসাদ বলে হৃদয় বুকে মা সকল দুঃখ সই।
ওমা আমি কি দিয়াছি মা তোর পাকা ধানে মই॥১

করুণাময়ী কে বলে তোরে দীন দয়াময়ী।
কারো দুধেতে বাতাসা ওগো তারা,
আমার এমি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো তারা কি বাপের ঠাকুর আমি কি তোর কেহ নই।
কেহ থাকে অট্টালিকায় মনে করি তেমি হই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে আমার কপাল বুঝি অমি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি তারা হলে পাষাণমই॥

রাম প্রসাদ যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং আমরা অনুমান করি তিনি যোগেই তনুত্যাগ করেন। যোগ বিষয়ের অনেকগুলি পদ দৃষ্ট হয়। তাঁহার "ষটচক্র ভেদে" যোগের বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; ইহা তাঁহার লুপ্ত কাব্যের বিক্রমাদিত্য পালার অংশ বলিয়া বোধ হয়। নিম্ন পদগুলি পাঠ করিলে তাঁহার যোগাভ্যাসের অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

বল ইহার ভাব কি নয়নে ঝরে জল

(গ্রহণে কালীর নাম) ইত্যাদি

'কালী কালী বল রসনারে।' 'ঐ ষটচক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥' ইত্যাদি

'রসনায় কালী কালী বলে আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে।'

* * *

দেখা দেখি সাধ্‌বে যোগ, সিজে কান্না বাড়ে রোগ।

ওরে মিছামিছি কর্ম্মভোগ গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥

মন ভুলনা কথার ছলে, লোকে বলে বলুক মাতাল বলে

* * *

যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া অন্ত ভাসে সেই জলে।

সে যে অকুলতারণ কুলের কারণ কুল ছেড়ো না পরের বোলে॥ ইত্যাদি

"কে জানে কালী কেমন"

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,

মা আছ গো অন্তরে।

একস্থান মূলাধার আর স্থান সহস্রার

আর স্থান চিন্তামণি পুরে॥

ইত্যাদি ষট্‌চক্র ভেদ

প্রসাদ মার নিকট যে আব্দার করিতেন তাহাতে কেমন নম্রতা ও ভক্তি আছে। কিন্তু অন্য রামপ্রসাদে তাহা নাই। প্রসাদের আব্দারে নিঃস্বার্থ ভাবই লক্ষিত হয়—

তারা আর কি ক্ষতি হবে। হেদে গো জননি শিবে।

তুমি লবে লবে বড়াই লবে প্রাণ কে আমার লবে॥

থাকে থাক যায় যায় এ প্রাণ যায় যাবে।

যদি অভয় পদে মন থাকেতো কাজ কি আমার ভবে॥

বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।

একি পেয়েছো আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥

আপনি যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে।

আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়পদে ডুবে

গিয়াছি না যেতে আছি আর কি পাব ভবে।

আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥

প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে।

তখন ভাব ভাল কি তুমি ভাল তুমি বিচারিবে॥"

যাঁহার কালীতে এত নিষ্ঠা এত আত্মোৎসর্গ তিনি যে তাঁহার কৃপায় সিদ্ধ হইবেন ইহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই। তাঁহার আত্মোৎসর্গের প্রমাণ তাঁহার দুই একটী পদে ব্যক্ত রহিয়াছে—

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালরূপ হল॥
কালরূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখলে পরে, হৃদয় পদ্ম করে আলো।
রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥

কালী নাম বড় মিঠা সদা পান কর পান কর এটা।
ওরে ধিক্‌রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পীঠা॥
নিরাকার সাকার বকার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষধাম নাম, ইহার পর আর আছে কিটা॥
কালী যার হৃদে জাগে হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালিটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল শ্রব কর যজ্ঞ যেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এতনু দক্ষিণাকালীর দেবোত্তরের দাগা চিটা॥

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নেমকহারাম নই মা শঙ্করী॥
* * *
* * *
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

অস্তু রামপ্রসাদ দুঃখে মার প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি করিয়াছেন যেন সুখই মানবের পৈতৃক সম্পত্তি কিন্তু দুঃখ না থাকিলে সুখের যে কে আদর করিত তাহা প্রসাদেরই হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল।

সমালোচকগণ প্রসাদের পরমায়ু লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কেহ বলেন তিনি ৫৪ বৎসর জীবিত ছিলেন কেহ বলেন তাঁহার ৮০ বৎসরের উপর পরমায়ু হইয়াছিল। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই ছত্রাংশের উল্লেখ করেন; অধিক পরমায়ু না হইলে অতগুলি পদ রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের মতে এ প্রমাণটী তাদৃশ বলবৎ নহে যেহেতু গানে যে প্রকার তাঁহার "মত্ততা" ছিল তাহাতে তিনি অনায়াসে পূজার সময় গান রচনা করিতে পারিতেন সুতরাং লক্ষ গান রচনা করিতে যে অধিক পরমায়ু আবশ্যক তাহার কোন অর্থ নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে প্রকার দুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন এবং যোগরূপ কষ্টদায়ক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাহাতে অনুমান করি তিনি দীর্ঘ জীবনলাভ করিতে পারেন নাই। অপিচ দীর্ঘ জীবনের তিনি প্রত্যাশী ছিলেন না—

ভূতের বেগার খাটিবো কত?
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চ ভূত।
ছয়া ষড়রিপু সাহায্য তার, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভব সংসারে দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা যার সুখেতে হব সুখী সে মন নয় মোর মনের মত॥
চিনি বলে নিম-খাওয়াকে ঘুচলো না সে মুখের তিত।
কেন তিক্ত প্রসাদ বলে বিদায় হয়ে কালীর শরণাগত॥

মাগো আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা করিলাম ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরের জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল।
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্তি কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল।

প্রসাদ ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদে দুর্গা নামের বর্ণনা আছে। এ পদগুলিরও রচনা ও ভাব বড় মধুর। এ রচনাগুলি যে তাঁহার লুপ্ত কাব্যের "ধুয়ার" ছিন্ন ভিন্ন অংশ তাহার কোন ভুল নাই। তাঁহার যে পদাবলী বাজারে দৃষ্ট হয় তাহার অনেকগুলি গানে "শিব বিবাহ" "শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ" "আগমনী" ইত্যাদির বর্ণনা আছে। বিদ্যাসুন্দরের অষ্টমঙ্গলায় এ বিষয়গুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয় সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে এগুলি তাঁহার লুপ্ত কাব্যের অংশ বিশেষ। তাঁহার উক্ত শিব বিবাহের রচনাই আদর্শ করিয়া রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের "ধুয়াটী" লিখিয়াছেন। উভয় রচনা তুলনা করিলে তাহা বেশ জানা যায়! কিন্তু প্রসাদের গভীর ভাব ও রচনা কৌশল ভারতের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

হর ফিরে মাতিয়া শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্।
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্, বব বম বব বম্ গান বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটডমরু লইয়া হাত।
কোটী কোটী কোটী দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া॥
কটী তটে কিবা বাঘের ছাল; গলায় দুলিছে হাড়ের মাল
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল; গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কপালে শোভে; নয়ন চকোর অমিয় লোভে;
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে; কেমনে পাইব ভাবিয়া॥
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি;
প্রজ্বলিত লয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ; তরুণ অরুণ অধর দেশ;
শব আভরণ গলায় শেষ; দেবের দেব যোগিয়া॥
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি;
ধরিছে তাল ত্রিমিকি ত্রিমিকি; হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল; শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর; শিয়রে শমন করিছে জোর;
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজ গুণে লহ তারিয়া॥

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।

কর বিলসিত নিশিত পরশু অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥

লক্ লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ

ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ বিমল কপাল গঞ্জিয়া

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল ; হলু হলু হলু যোগিনী বোল

কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥

ভভম্ ভভম্ ববম্ ভাল, ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল।

রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল, ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া ॥

সুরগণ কহে জয় মহেশ, পুলকে পুরিল সকল দেশ,

ভারত যাচত ভকতি লেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥

এই প্রকার জনশ্রুতি আছে যে প্রসাদ তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কাব্যের উপর কি মতামত প্রকাশ করেন তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার আজ্ঞার অব্যবহিত পরেই ভারত কর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল রচিত হয় সুতরাং প্রসাদের কাব্যখানি অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। অতএব জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে হইলে কৃষ্ণ-চন্দ্রকেই এই কাব্যের লোপরূপ পাপের দায়ী করিতে হয়। প্রসাদ তোষামোদ ভাল-বাসিতেন না—"মূঢ় সে জনম খোয়ায় তোষামোদে" এই কারণেই হউক বা তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা নাই বলিয়াই হউক কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাঁহার কাব্যের সম্যক্ আদর হইল না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎকালের রুচির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ও ভারতের বিদ্যাসুন্দরে অনেক প্রভেদ। ইহাতে সকলেই ধর্ম্মভীরু ও কালীভক্ত কিন্তু ভারতের বিদ্যাসুন্দরে কলিকাল অঙ্কিত—সকলেই সুচতুর, শীঘ্র যে কেহ ঠকাইয়া যাইবে-তাহার যোটী নাই। ফলতঃ প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভক্তের হৃদয়োচ্ছাস এবং ভারতের বিদ্যাসুন্দর ধূর্ত্তের বাক্যছটা বই আর কিছু নহে। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা ভারতের নিন্দা বা অনাদর করিতেছি। তাঁহার কাব্যে অন্যরূপ ভাল কবিত্ব যথেষ্ট আছে। যাহা হউক প্রসাদের কাব্যের লোপ হওয়ায় তাঁহার চিরস্মরণীয়তার লোপ হয় নাই। যাঁহার প্রতি কালী কৃপাময়ী তাঁহার চিরস্মরণীয়তা কে লুপ্ত করিতে পারে। প্রসাদ কালীভক্তির যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছিলেন তাহাই অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমসময়ে অনেক সাধক কালীসাধন করিয়া-ছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে কালীপূজা ও ভজনার প্রধান অনুশীলন ছিল।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর—ঐ।

মল্লার—কাওয়ালী।

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে।
পেখল সজনি, সতিমির রজনী
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে।
ঝিল্লীধ্বনি কৃত বন পরিপূরিত,
কুলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

পা১
[রা১ মা১ মা১ মা১ । পা২ পা১ ধপা১ । মা১ পা১ পা১ র্সা১ । র্সা২ র্সা২ । নো১ ধনো১ পা১
[নিঃ — ঝু ম নিঃ ঝু ম গ ম্ ভী র রা তে ক ম্ প

শেষ।

পা১ । মা২ গো১ গো১ মা১ । রা২ রা১ রা১ । সন্১ রা১ সা২ ।] [মা১ পা১ পা১ না১ । না১
ত প — ল্ল ব দ ক্ষি ণ বা — তে।] [পে — খ ল স

না১ না২ । না১ র্সা১ র্রা১ র্সা১ । না১ না১ র্সা২ । না১ র্সা১ র্রা১ র্রা১ । র্রা২ র্মা১ র্মা১ । র্রা২ র্সা১ র্সা১ ।
জ নি স তি মি র র জ নী অ ম্ ব রে চন্ দ্র ন তা র ক

নো১ ধা১ পা২ ।] রা২ মা১ পা১ । ধা১ নো১ ধা১ নো১ । ধা১ র্সা১ নো১ ধা১ । পা১ ধা১
ভা — তে] ঝি ল্লী — ধ্ব নি কৃ ত ব ন প রি পূ —

পা১ পা১ । না১ না১ না১ না১ । র্সা২ র্সা১ র্সা১ । না১ র্সা১ র্রা১ র্সা১ । নো১ ধা১ পা২ ॥
রি ত ক ল য় ত জা হ্ন বী মৃ দু ল প্র পা — তে॥

(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

হাসির গান।

সে আমি।

ভদ্রগণ এইটে আমি প্রস্তাব কর্ত্তে চাই—
এ জগতে একটিও ভাল লোক নাই ;
সকলেই মিথ্যাবাদী-ভীরু, ভণ্ড, চোর ;
সকলেই কুচরিত্র ব্যভিচারী ঘোর ;
আছে একটি ধার্ম্মিক সাধু, শুদ্ধপথগামী ;—
আর—এ হাঁ—সে আমি
সে আমি সে আমি সে আমি।
আরও দ্বিতীয় এক প্রস্তাব্য আমার—
বিশ্বের অসার মাঝে আছে এক সার ;
বিশ্বমূর্খ মাঝে আছে একটি বিদ্বান্ ;
নির্ব্বুদ্ধিক লোক মাঝে এক বুদ্ধিমান ;
যেই বিদ্যাবুদ্ধি রত্ন অতি উজ্জ্বল, ও দামী ;—
আর—এ হাঁ—সে আমি—
সে আমি, সে আমি, সে আমি।
শেষ প্রস্তাবনা এই করিছেন শর্ম্মা—
ইনি অতি বেঁটে আর উনি অতি লম্বা ;
এঁর চোক ছোট ওর নাক নহে ভাল ;
অমুক কি কটা ! আর অমুক কি কাল !
আছে এক সুশ্রী ব্যক্তি—যেন মূর্ত্তিমান কামই—
আর—এ হাঁ—সে আমি—
সে আমি, সে আমি, সে আমি।

চা।

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না ;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভাল এক প্যালা চা।
তার সঙ্গে যদি 'টোষ্ট' ডিম থাকে, আপত্তিকর নয় তা ;
কিন্তু কভু যেন নাহি যায় ফাঁক হে
প্রাতে এক প্যালা চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার ; দারা, সুত বাপ্ মা ;—
এ সংসারে দেখি যাহা কিছু সার প্রাতে এক প্যালা চা।
স্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট শেরি আর খাও যার খুসী—যা—
কেড়েকুড়ে শুধু নিওনা আমার
প্রাতে এক প্যালা চা।

কাফি।

খেয়োনা কফি এসে যেয়ে নওকর মোর।
জলদি করো দেখো রাতি ভৈলি ভোর।
খুব ভোরে খেলে কফি, হয় শ্রেষ্ঠ ফিলজফি
ত্বরা করে যেয়ে পাখা উল্লুক, শুয়োর।

আমরা তিনটি এয়ার।

আমরা তিনটি এয়ার
আমরা তিনটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু-খেয়ার ;
কিন্তু পার করি শুধু—গেলাস বোতল—
আমরা তিনটি এয়ার
মোদের দিওনা ক কেউ গালি
মোদের কোরো নাক কেউ মানা ;
আমরা খাবনা ক কারো চুরি করে দুধ ননী, ছানা ;
শুধু লুটিব একটু মজা শুধু করিব একটু পান.

শুধু হাসিব একটু, নাচিব একটু, গাইব একটু গান।
দেখ ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা আর হুইস্কি মোদের রাণী,
আমরা করিনে কাহারে ডর
আমরা করিনে কাহারো হানি।
আমরা রাখিনে কাহারো তক্কা
আমরা করিনে কাউরে কেয়ার
এ ভব মাঝে সবই ফক্কা জেনেছি আমরা তিনটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন?
শুধু পাছে মেলা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হলে নাক কবি হলো সেক্সপেয়র।
আর সে সব কথা কাজ কি বলে'—
আমরা তিনটি ইয়ার।

কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে, বল দেখি দাদা?
কারণ দেবতা খেত লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা।
এ স্বর্গে মর্ত্ত্যে সুরার মত সুন্দর কে আছে আর?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি আমরা তিনটি এয়ার।
এ জীবনটা ঘোর মেঘলা আর গৃহিণী ঘোর কালো;
এ ভব অন্ধকারে দাদা সুরাই একটু আলো।
এ ভব মরুভূমে দাদা এক সুরাই নির্ঝর,
এ ভবারণ্যে জীবন ঝঞ্ঝায় সুরাই পাকা ঘর।
খোল বোতল অমনি হৃদে বইবে প্রেমের ধারা,
উঠবে ভাবের ঢেউ আর খেল্‌বে বুদ্ধির ফোয়ারা।
শত্রুজনে কর্‌বে "হুট" আর মিত্রজনকে পেয়ার,
এ জীবনের মজা লুঠি আমরা তিনটি এয়ার।

এস এস বঁধু।

এস এস বঁধু এস আধ কয়াসে বস,
কিনিয়া রেখেছি কলসি দড়ি (তোমার তরে হে)
তুমি হাতি নও, ঘোঁড়া নও
যে সোয়ার করিয়ে পীঠে চড়ি;
তুমি চিড়ে নও বঁধু তুমি চিড়ে নও
যে খাই কলা দধি গুড় মেখে,

তোমায় যদি বঁধু না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়া খানায় দিতাম রেখে।
যবে তুঁয়া বঁধু পড়ে মনে তোমা সনে সঙ্গোপনে
খেয়েছি বিহঙ্গ রাশি রাশি,
এখন এক টিকি দেখি তাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
কাশির ছলন করি হাসি।

REFORMED HINDUS.

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে
আমরা Reformed Hindoos;
আমাদের নাম শুনেনি যে
Surely সে এক awful goose;
কেন আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heteredox আমাদের food;
কারণ চলে মাঝে মাঝে এটা, ওটা, সেটা
দুই একখান যখন we choose;
কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think
তাহলে you are an awful goose!
আমাদের dress হবে English কি Greek

তা এখনও কর্ত্তে পারিনি ঠিক,
কিন্তু ছেড়েছি মালা ও টিকী নয় বলে সব
'superstitions ও obtuse'
কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think
তা হলে you are an awful goose!
আমাদের language একটু quaint, as yon see
নয় এ English কি Bengali,
করি English ও Bengalির খিচুড়ি বানিয়ে
conversation এ use;
কিন্তু একটাও ঠিক কইতে পারি
if you think
তা হলে you are an awful goose.

আমরা at heart patriots warm
কিন্তু দিতে হ'লে বাপের নাম,
করি ইংরেজ বেটাদের aside তুমুল
shoesify ও abuse,
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think
তা হ'লে you are an awful goose
মোটা তাকিয়ায় দিয়ে ঠেস আমরা স্বাধীন করি দেশ;
লিখি furious articles patriotip coems
হা ভারত বলে shed tears profuse!
But when warrent is issued
টিকটী বলি if you think,
তা হ'লে you are an awful goose!
The Brahmos as a sect
আমরা করি খুব respect
আর It wouldn't be bad could
we step into some বিলেত দেবতাদের shoes!
But socially out-cast না করি if you think
তা হ'লে you are an awful goose!
About female education
আর female emancipation
আর infant marriage ও widow remarriage
আমাদের খুব enlightened views,
কিন্তু views মত act করি if you think
তা'হলে you are an awful goose!
আমরা পড়ি Mill, Hume Spencer
কোন ধর্মের ধারি না ধার?
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists
The Mohammedans, Christian and Jews;
কিন্তু ঠাকুরকে প্রণাম না করি if you think
তা'হলে you are an awful goose!
You aren't খুব wrong if you think
যে আমরা করি একটু বেশী drink
আর considering আমাদের evolutionএর state
আমাদের morals নয় খুব loose;
যদি না বোঝ slips of tight young men
তা'হলে you are an awful goose!
From the above দেখতে পাচ্ছ বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh,
আমরা curious commodities, human oddeties
denominated "Baboos"!
আমরা বক্তৃতায় ফুঁকি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের সময় সব ধুঁ ধুঁs
আমরা beautiful muddle and a queer amalgum
Of শশধর Huxley and goose!

বিলেত দেশটা মাটির।

এই বিলেত দেশটা মাটির সেটা সোণা রূপোর নয়;
আর আকাশেতে সূর্য্য ওঠে মেঘে বৃষ্টি হয়।
আর পাহাড়গুলো পাথরের আর নদীগুলো ছোটে;
তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কচ্ছ না'ক মোটে।
কিন্তু এ সত্যি, এ সত্যি, এ সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।
সেথা 'পুঁটি' মাছের হয় নারে ভাই 'টিয়া' পাখীর হয়;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটেই পা;
তাদের মাথাগুলো সমুখে লেজ'ত পিছনদিকে সুরু;
তোমরা বোধ হয় ভাবছ সেটা [illegible]

কিন্তু সত্যি এ সত্যি এ সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।
সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ আর মেয়েগুলো সব মেয়ে,
আর যোয়ান বুড়ো কচি কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে;
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে, পাগুলো সব নীচে,
তোমরা মুচ্‌কি হাস্‌চ বোধ হয় ভাব্‌ছ এ সব মিছে,
কিন্তু এ সব সত্য এ সব সত্য এ সব সত্য কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।
সেথা বসন ভূষণ কম্‌তি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে 'বাসি' হলেই টকে;
হয় জন্ম মৃত্যু চুরি খুন ও ডাকাতি—ইত্যাদি
তোমরা ভাবছ আমি একটা পাকা মিথ্যাবাদী;
কিন্তু এ সব সত্যি এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।
তবে কিনা দেশটা বিলেত, আর জাতটা বিলিতি,
কাজেই একটু সাহেবি রকম তাদের রীতি নীতি;
আর করে শুধু সাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে,
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিসে,
এই তফাৎ এই তফাৎ এই তফাৎ মাত্র ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ তফাৎ কিছু নাই।

সুর—শুক-সারী সংবাদ।

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও,"
আর রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জ্বালাও—মরি নিজের জ্বালায়।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
রাধা বলে "এখন তা'তে মোটেই রাজি নই—সর ধোঁয়ায় মরি।
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার 'মোহন বেণু'!"
রাধা বলে "ওঃ—শুনে আমি মরে' গে'নু।—আমায় ধর ধর"
কৃষ্ণ বলে "আমায় 'পীতাম্বর' বলে সবে"
রাধা বলে "বটে!—হোল মোক্ষলাভ তবে—থাক্ আর খাওয়া দাওয়া"
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবন আলো;"
রাধা বলে "তবু যদি না হ'তে মিস কালো—রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে—"
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
রাধা বলে "ঘুম হচ্ছে না।—এত ভারি জ্বালা—তা'তে আমারই কি"
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে মোরে কয়"
রাধা বলে "লোকের কথা কয়ো না প্রকাশ্যে—লোকে কি না বলে।"

কৃষ্ণ বলে, "রাধে তোমার কি রূপেরি ছটা"
রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ হাঁ হাঁ তা তা বটে—সেটা সবাই বলে।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবে চারু কেশ।"
আর, রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—সেটা বল্‌তেই হবে।"
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—যেন সুধা ঝরে।"
কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনিত কভু"
আর রাধা বলে "হাঁ আজ্ঞো সাবান মাখিনি ত তবু—নইলে আরও সাদা"
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"
রাধা বলে "এ সব কথা বল্লেই হ'ত আগে—গোল ত মিটেই যেত।"
কৃষ্ণ বলে "তুমি আমার বিধুমুখী রাই"
রাধা বলে "তুমি আমার প্রাণের কানাই—এস হৃদে ধরি"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কবি কৃত্তিবাস।*

তুলসীদাসের ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে উহা বিবিধ ছন্দোময়ী, অনুপ্রাস ও উপমাবাহুল্যে বিভূষিতা। তাঁহার "চাঁচা ছোলা" মসৃণ চিক্কণ ভাষা অনেকাংশে ভারতচন্দ্রের অনুরূপ। কৃত্তিবাসের কাব্যের তর্কালঙ্কারী পালিস্ ও বটতলার সরস্বতীর বরপুত্রগণের কৃতিত্ব সত্ত্বেও ভাষা মসৃণ নহে, ছন্দের পূর্ণতা ও অঙ্গসৌষ্ঠব নাই। উপমাগুলি প্রচুর নহে, দীর্ঘ, জটিলও নহে। ইহা হইলেও তুলসী দাস অপেক্ষা ইহার কাব্যে কল্পনা অধিক এবং ভাষা ভাবের সর্ব্বত্র অনুগামী। এজন্যই তাঁহার প্রতিভার একাংশ বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ পূর্ব্বে আমরা একথা বলিয়াছি। কাব্যে বর্ণিত নর নারীর সহিত তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতি আছে। তাহাদের সুখদুঃখবর্ণনা ভারতচন্দ্রের মত কেবল কবির কর্ত্তব্যপালন মাত্র নহে। তুলসীদাসের ভাষা রাশি রাশি দীর্ঘ সুন্দর উপমা ভারাক্রান্ত হইলেও সর্ব্বত্র শোভন বা সঙ্গত নহে। নিম্নে উভয় কবির কতকগুলি উপমা উদ্ধৃত হইল। কৃত্তিবাসের উপমা খুঁজিতে হইয়াছে কিন্তু তুলসীদাসের উপমা নির্ব্বাচন করিয়া উদ্ধৃত করি নাই। তবে নিম্নেধৃত উপমাগুলি অপেক্ষা উভয়ের অনেক সুন্দর উপমা থাকা অসম্ভব নহে:—

প্রথম তুলসীদাসের। অযোধ্যায় রঘুনাথের ধনুর্ভঙ্গ বর্ণিত হইতেছে।

---

* গত কার্ত্তিক সংখ্যা "ভারতীর" পর।

উদিত উদয়গিরিমঞ্চপর রঘুবর বাল পতঙ্গ।
বিকসে সন্ত সরোজ সব হর্ষে লোচন ভৃঙ্গ॥
নৃপন্ কেরি আশানিশি নাশী।
বচন নখত অবলীন প্রকাশি॥
মানী মহীপ কুমুদ সকুচানে।
কপটীভূপ উলূক লুকানে॥
ভয়ে বিশোক কোকমুনি দেবা।
বরষহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা॥

অর্থাৎ, যেন উদয়াচল মঞ্চোপরি রামচন্দ্ররূপী বালসূর্য্য উদিত হইলেন। (উহাতে) কমল রূপ সাধু মণ্ডলী বিকশিত ও তাঁহাদের ভৃঙ্গরূপ লোচন হর্ষিত হইল। (নিমন্ত্রিত) নৃপতি বৃন্দের আশানিশি বিনষ্ট, অস্তগামী নক্ষত্ররূপ তাঁহাদের বচনরাশি স্তব্ধ হইল। গর্ব্বিত (অভিমানী) নৃপরূপ কুমুদেরা নিমীলিত ও কপট পেচক সদৃশ মহীপালেরা লুকায়িত হইল। চক্রবাক তুল্য দেবতা ও মুনি বৃন্দেরা পুষ্প বৃষ্টিতে আপনাদের ভক্তি জ্ঞাপন করিলেন।

এরূপ দীর্ঘ উপমা একটির অধিক উদ্ধৃত করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবে না। ইহার সহিত কৃত্তিবাসের উপমা তুলনা করুন। এ উপমাগুলি এরূপ সহজ বোধ্য যে কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল সে কথা বলিবার কোন অপেক্ষা রাখে না।—

১। কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
২। পূর্ব্বাচল হইতে যেন আইল দিনপতি।
আকাশে দেউটী যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
মস্তক ঠেকেছে বীরের গগন মণ্ডলে॥
৩। চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী।
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হেম কলা॥
৪। সুমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে।
সেই মত উচ্চগিরি শোভা পায় আগে॥
৫। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে॥

৫ম দৃষ্টান্তে রামের রাজ্যাভিষেক পূর্ব্বে কৈকেয়ীর মান বর্ণিত হইয়াছে। তরুণা ভার্য্যারূপ বিষে জর্জ্জরীভূত বৃদ্ধ দশরথের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিবার ইহা অপেক্ষা আর কি সুন্দরতর উপমা হইতে পারে!

৬। দোলা ছাড়ি জানকী নামেন ভূমিতলে।
বিদ্যুতের ছটা যেন পড়িল ভূমিতলে।

বর্ণনায় কৃত্তিবাস অল্প ক্ষমতা দেখান নাই। তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব এই যে তাঁহার বর্ণনা সাধারণতঃ চিরন্তন প্রথার অনুকারী নহে। যেমন, স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা কালে, চন্দ্রের সহিত মুখের, তিল ফুলের সহিত নাসিকার, বিম্বের সহিত অধরোষ্ঠের, কুন্দের সহিত দন্তের, চক্ষুর সহিত ইন্দীবরের, হস্তের সহিত মৃণালের, ভুজঙ্গের সহিত বেণীর অঙ্গ বিশেষের সহিত কদম্ব, দাড়িম্বের তুলনায় পাঠককে বিরক্ত করিয়া তুলেন নাই। বিদ্যার রূপ বর্ণনা অনেক বৃদ্ধের কণ্ঠস্থ আছে। উক্ত বর্ণনা পাঠকালে অনেকে একেবারে ভাবে গদ্গদ হন। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে উহা "কেবল কতকগুলা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সমষ্টি মাত্র। উহাতে বিদ্যার রূপের কোনই ধারণা হয় না।"(১) কৃত্তিবাসের রূপবর্ণনার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা তদানীন্তন স্ত্রীলোকের

(১) Vide His "History of the Bengali Literature".

অলঙ্কারেরও কতক পরিচয় পাইবেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতার অন্বেষণার্থে পাতাল প্রবিষ্ট হনুমান প্রভৃতির সহিত এক কন্যার সাক্ষাৎ। তাহার রূপ এরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

কন্যার রূপেতে করে জগত প্রকাশ॥
সুন্দরী সে কন্যা বুঝি হরের গৃহিণী।
রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু।
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের ভানু॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের সিন্দু।
ভুরু যুগ উপরে উদয় অর্দ্ধইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা করে অতি।
অলকা তিলকা রেখা অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাঁতি॥
রতন রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলী সব।
রাজহংস জিনি শুনি নুপুরের রব॥
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর পায় রুনু রুনু বাজে॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গর্ব্ব করে গন্ধরাজ চাঁপা॥
ইত্যাদি।

তুলসী দাস বর্ষায় সীতাহারা রামের বিরহ বর্ণনা করিতেছেন—

ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা।
প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা॥
দামিনী দমকি রহী ঘন মাহী।
খলকী প্রীতি যথা থির নাহী॥
বরষ হিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে।
যথা নমহিঁ বুধ বিদ্যা পায়ে॥
বুন্দ আঘাত সহঁ্যায় গিরি কৈসে।
খলকে বচন সন্ত সহঁ্যায় জৈসে॥
ক্ষুদ্র নদী ভরি চলি উতরাই।
জস থোরে ধন খল বোরাই॥
ভূমি পরত ভা ভাবর পাণী।
জিমি জীব হিঁ মায়া লপটাণী॥
সিমিটি সিমিটি জল ভরে তলাবা।
জিমি সদ্‌গুণ সজ্জন পঁহ আবা॥
সরিতা জল জল নিধি মহ জাই।
হোই অচল জিমি জন হরি পাই॥
হরিত ভূমি তৃণ সঙ্কুল সমুঝি পরৈ নহিঁ পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বিবাদ তেলুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ॥
দাদুর ধনি চহুঁ ওর ওর সুহায়ে।
বিদ পড়্যায় জনু বটু সমুদায়ে॥

অর্থাৎ, "ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘন গর্জ্জন করিয়া প্রিয়াহীন আমার অন্তকরণকে ব্যাকুল করিতেছে। যেমন খলের সহিত প্রীতি চঞ্চল তদ্রূপ মেঘের কোণে চঞ্চলা চপলা ক্রীড়া করিতেছে। যেমন বুধ জন বিদ্যাভারে নম্র হন তদ্রূপ মেঘ ভূমির নিকটে আসিয়া (নমিয়া) বরিষণ করিতেছে। সাধুব্যক্তি যেরূপ দুষ্টের দুর্ব্বাক্য অক্লেশে সহ্য করেন সেইরূপ গিরিরাজি অজস্র বৃষ্টি পাত সহিতেছে। লঘুচেতা যেমন অল্প ধনেই উচ্ছৃত হয় তদ্রূপ ক্ষুদ্র নদীর জল দুইকূল প্লাবিত করিয়াছে। মায়া জড়িত জীবের ন্যায় ভূপতিত জল কর্দ্দমজড়িত হইয়াছে। সজ্জনের সদ্‌গুণ সংগ্রহের ন্যায় সরোবর সমূহ চারিদিক হইতে জল সঞ্চয় করিতেছে। লোকে ঈশ্বর পাইয়া যেমন অচল তুষ্ণীভাব ধারণ করে তদ্রূপ নদীর জল সমুদ্রে মিশিয়া অচল হইয়াছে। চারিদিকে ভেকধ্বনি আরও শোভা পাইয়াছে যেন ব্রাহ্মণ বটু বেদপাঠ করিতেছে।" ইহার সহিত রামের বিরহের কতটুকু সম্পর্ক।

কৃত্তিবাসের এ সকল ন্যায় বর্ণনা তুলনা করা যাক—

নীল অট্টালের বরিষাকাল শোভে।
মেঘ সঞ্চারিয়ে চারি সাগর [illegible]
[illegible]
[illegible]

আমার রজনে কর লক্ষণ আরতি।
দুরন্ত বরষাঋতু স্থির নহে মতি ॥
সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে।
আমি ত মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন।
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥
চতুর্দ্দিকে জল স্থল সব একাকার।
কেমনে হইবে কপি সৈন্য আগুসার ॥
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে।
জলমগ্না ধরণী ধরণীধর ভাসে ॥
ততদিন সীতা হবে অস্থি চর্ম্ম সার।
কি জানি ত্যজিবে প্রাণ বিরহে আমার ॥
একাকিনী অনাথিনী শত্রু মধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস ॥
আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে বধে তারে দশানন।
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত ॥
পক্ষী হইয়া উড়ে যাই সাগরের পার।
অভাগা সীতার দেখি শয়ন আহার ॥

* * * * *

প্রাকৃতিক বর্ণনা তুলসী দাসের সুন্দর বটে কিন্তু রামের অবস্থা বিবেচনা করিলে কৃত্তিবাসের বর্ণনা আরও সঙ্গত ও নৈসর্গিক বলিয়া বোধ হয়। ইহার পরবর্ত্তী বর্ণনাতেও রামের বিরহ-দুঃখের চিত্র আমাদের মনে তুলসীদাস উজ্জ্বল করিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁহার বর্ণনায় একটি সরল, অকৃত্রিম করুণ রস সিঞ্চিত করিয়া পাঠকের মনে সমবেদনা উদ্রিক্ত করিতেছেন। এই বিশেষত্বেই কৃত্তিবাস বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ। কবিকঙ্কণের এ নৈসর্গিকতা ছিল কিন্তু ভারতচন্দ্রের ছিল না। তাঁহার প্রধান দোষ কৃত্রিমতা, অত্যল্প স্থানেই তিনি সে দোষ ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তুলসীদাসেরও এই দোষ। তাহার উপর এ বর্ণনায় অনুকরণের ছায়াপাত হইয়াছে। এই বিরহ রচনাকালে তুলসীদাস আর এক শ্রেষ্ঠ কবির বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা স্মরণ করিতেছিলেন। আমাদের ঐ বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার স্থান অল্প সুতরাং পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। (শ্রীমদ্ভাগবত; ১০ম স্কন্ধ ২০শ অধ্যায়)। ইহা ব্যতীত তুলসীদাস অনেক স্থলে বাল্মীকির ভাষারও অনুকরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের এ দোষ নাই। পরস্পরের বর্ণনা তুলনা করুন। বাল্মীকির বর্ণনা এইরূপ :—

ইমানি শুভ গন্ধীনি পশ্যৎ লক্ষ্মণ সর্ব্বশঃ।
নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণ সূর্য্যবৎ ॥
এষা প্রসন্ন সলিলা পদ্মনীলোৎপলা যুতা।
হংস কারন্ডবাকীর্ণা পম্পা সৌগন্ধিকাযুতা ॥
জলে তরুণ সূর্য্যাভৈঃ ষট্‌পদাহত কেশরৈঃ।
পঙ্কজৈঃ শোভতে পম্পা সমন্তাভি সংবৃতা ॥
চক্র বাক যুতা নিত্যং চিত্রপ্রস্থ বনান্তরা।
মাতঙ্গ মৃগ যূথৈশ্চ শোভতে সলিলার্থিভিঃ ॥
পবনা হতঃ বেগাভিরূর্ম্মিভি র্বিমলে হম্ভসি।
পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাড্যমানানি লক্ষ্মণ ॥
পদ্ম পত্র বিশালাক্ষীং সততং প্রিয় পঙ্কজাং।
অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে ॥
রামায়ণ, কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, ১ম সর্গ।

তুলসীদাসের বর্ণনায় এ অংশ নিতান্ত সরল সুতরাং অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন :—

বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা।
মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গা ॥
বোলত জল কুক্কুট কলহংসা।
প্রভু বিলোকি জনু করত প্রশংসা ॥
চক্রবাক বক খগ সমুদাই।
দেখত বনৈ বরণি নহিঁ যাই ॥
সুন্দর খগগণ গিরা সুহাই।
জাত পথিক জনু লেত বুলাই ॥
তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছায়ে।
চহুঁ দিশি কানন বিটপ সুহায়ে ॥ ইত্যাদি।

ইহার সহিত কৃত্তিবাসের বর্ণনা তুলনা করুন। সে বর্ণনা সংক্ষেপ, স্বাভাবিক ও হৃদয় গ্রাহী :—

প্রভাত হইল নিশা উদিত মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পা নদী তীর॥
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত॥
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে॥
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী॥

কে না চোর রত্নাকরের কাহিনী শুনিয়াছেন? অথচ কৃত্তিবাসের ইহা মৌলিক কল্পনা এ কথা কয়জন জানেন? মনে পড়ে বাল্য কালে এ বর্ণনা পাঠকালে যখন দস্যুর পাপের ভাগ কেহ লইতে স্বীকৃত নহে রত্নাকরের সে অসহায় অবস্থায় মনে কিরূপ বেদনা হইত! এ বর্ণনা কিরূপ স্বাভাবিক! ভারতবাসীর অটল সংস্কার যে যদি কেহই আমার কর্ম্মের ভাগী নহে তবে কাহার জন্য এ পাপের বোঝা বহিয়া মরিতেছি? কেন বৃথা এ সংসাররূপ মায়াপাশে জড়িত হইতেছি! এই স্বাতন্ত্র্য; এই "বিরাট" নিশ্চেষ্ট মায়াবাদ প্রাচীন ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এজন্যই ভারত "চক্ষু কর্ণরুদ্ধ" করিয়া ক্রমশঃ এক অতল শান্তিগর্ভে (উৎসন্নে!) গিয়াছে ও ইহার অভাবেই আজ ইউরোপ আমেরিকা রাজনৈতিক চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমরা রত্নাকরকাহিনী হইতে অজ্ঞাতসারে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। অঙ্গদ রায়বারে অঙ্গদের বাক্‌পটুতা ও রাবণকে ভৎর্সনা আমাদের শৈশব কল্পনাকে কিরূপ পুলকিত করিত! এই মৌলিক বর্ণনায় কৃত্তিবাসের তদানীন্তন সমাজের এক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এখন যাহা সৎসাহিত্যে অশ্লীল বলিয়া ত্যক্ত হয় তখনকার লোকেরা সে রহস্য প্রশংসনীয় বাক্ চাতুরী মনে করিত। অঙ্গদের কথায় হাসিবার বিষয় অনেক আছে কিন্তু আজ কাল পাঠকের রুচি বিবেচনায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিব না। মহীরাবণের ছলনা-বৃত্তান্ত কিরূপ হৃদয়গ্রাহী! একে অমাবস্যার "ঘোর দ্বিপ্রহর নিশি" তাহাতে আবার সমুদ্রের উপকূল! পরপারে "সৌধ কিরীটিনী লঙ্কার" প্রাচীরতট ধৌত করিয়া সমুদ্র অনন্তোদ্দেশে ছুটিয়াছে। নূতন বৃক্ষপ্রস্তরের সেতু বাঁধা গিয়াছে; তাহাতেও বাত্যাতাড়িত সমুদ্র তরঙ্গপ্রহত হইতেছে। এই সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর করিবার উদ্দেশে সেতুর উপর স্থানে স্থানে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া অগ্নিস্তূপ করা হইয়াছে। সে আলোকে সমুদ্র ও ঐ স্তূপ-পার্শ্বস্থ বানরগণের মূর্ত্তি আরও বিকট দেখাইতেছে! মহীরাবণ অদ্ভুত মায়াবী সে ইন্দ্রের ক্রোড়স্থা গুপ্তা শচীকে দেবরাজের অজ্ঞাতসারে হরণ করিতে পারে বিভীষণ একথা রামকে বলিলেন। পাঠকের মনে বিপদের আশঙ্কা প্রবল হইল। রামের সেনা মধ্যে সতর্কতার ধুম পড়িয়া গেল। এই এক ইন্দ্রজালিকের হস্ত হইতে রক্ষার্থ অপরূপ গড় নির্ম্মিত হইল। সেগড়—হায়! লাঙ্গুল নির্ম্মিত গড়! সেগড়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ রক্ষিত হইয়াছেন; শূন্যমার্গে বিষ্ণুচক্র ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই পাঠকের মনে শঙ্কা হয় ইহাতেও কি মহীরাবণের দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন হইবে? শ্রীরাম লক্ষ্মণের হরণ ও পাতালপুরী হইতে হনুমানের

উদ্ধার কৌশল প্রভৃতি তৎপরবর্ত্তী বর্ণনা কিরূপ স্বাভাবিক! সীতান্বেষণার্থ সুগ্রীবের বানরদিগকে পৃথিবীর চতুঃসীমায় প্রেরণ বর্ণনায় কৃত্তিবাসের কল্পনার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। উদয় পর্ব্বতে সোনার তালবৃক্ষ, লোহিত পর্ব্বত বাহিনী নদীর জল রক্তবর্ণ ও তটে স্বর্ণ শিমুল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য, ক্রিমীজীবদেশে গভীর কেতকীকানন ও কালোদক পর্ব্বতে তিন কোটী সর্পের জৃম্ভণে মানুষের মৃত্যু সম্ভাবনার বৃত্তান্ত কোন আধুনিক ভূগোলে পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ। এই বৃত্তান্ত পাঠে অনেক পাঠক পিতামহীর উপকথা স্মরণ করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন। কিন্তু তাঁহার জানা কর্ত্তব্য যে কবির এই বর্ণনা উচ্চ বিজ্ঞানতত্ব সমন্বিত না হইলেও কাব্যাংশে খুব সুন্দর বটে। এ বর্ণনা পাঠে আমাদের মনশ্চক্ষে এ চিত্রগুলি স্বপ্নবৎ একে একে ভাসিয়া যায়। তুলসীদাসের ন্যায় আমাদের কবিও যদি প্রতিপদে কেবল দর্শন জ্ঞান ছড়াইতেন তাহাতে আমরা অধিক সুখী হইতাম না। কবি ক্যাম্বেল সত্যই বলিয়াছেন যে বিজ্ঞান নিষ্ঠুর হস্তে সৃষ্টির যবনিকা অপহৃত করিতে গিয়া আমাদের কল্পনার কি সুন্দর স্বর্গরাজ্যই না অন্তর্হিত করিয়াছে!

মানব চরিত্রাঙ্কনে ও মানবস্বভাব পরিজ্ঞানে কৃত্তিবাস কম ক্ষমতা দেখান নাই। ভারতচন্দ্র কালিদাসের অতুলনীয় শিবচরিত্রের মহান্ আদর্শ অনুকরণ সত্বেও উক্ত দেবচরিত্রের কঠোর সৌন্দর্য্য বর্ণনে সক্ষম হন নাই। তচ্চিত্রিত দেবচরিত্রে আমরা এক অক্ষম, ইন্দ্রিয়পর মানবিকতা দেখিতে পাই। যে শিবচরিত্রের অলৌকিক সৌন্দর্য্য কুমারসম্ভবে অক্ষুণ্ণ তাহার হাস্যকর প্রতিরূপ অন্নদা মঙ্গলে। কৃত্তিবাস এরূপ চরিত্র বিকৃত করেন নাই। তাঁহার কাব্যের প্রধান স্ত্রীপুরুষচরিত্র তুলনা করুন। রাবণের রসভাষে ভট্টিকার সীতাকে গদ্‌গদ চিত্ত বর্ণনা করিয়া আপনার শোচনীয় অক্ষমতা দেখাইয়াছেন! কৃত্তিবাসের সীতা অশোক বনে রাবণের কুৎসিত প্রস্তাবের এরূপ উত্তর দিতেছেন। পাঠকেরা উভয় কবির এ বর্ণনা তুলনা করিবেন :—

তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খাইয়া যদি হইস্ অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে কোথা কথা তার॥

*   *   *   *   *

আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী॥
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায়ে পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন॥
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস।
ক্রোধ শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিল্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবে রামের ঘরণী॥
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্যজন নাহি জানে সীতা॥

কি তেজস্বিনী উক্তি! সীতার উপযুক্ত কথাই বটে! কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান বাঙ্গালীর একটী স্মরণীয় শোকের দিন। রবীন্দ্র নাথ কোন স্থানে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "অপ্রাপ্ত-

বয়স্কা অনভিজ্ঞা মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙ্গালীকন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটী ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাঙ্গালার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। "এই শোকের, বাঙ্গালীর এই কাতর মর্ম্ম-ব্যথার চিত্র কৃত্তিবাস কিরূপ সরল স্বাভাবিক তুলিকায় উজ্জ্বল করিয়াছেনঃ—

ওথা রাজা বিদায় করেন কন্যাবর ॥

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে ॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমারে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিও স্মরণ ॥

কবির এ বর্ণনায় মানসচক্ষে আমরা একটা অশ্রুপ্লাবিত কপোল, লাল্ চেলীপরিহিতা বিবাহাভরণ ভূষিতা নবম বর্ষীয়া গৌরাঙ্গী কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে পিতার গলা জড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাই! তাহার পিতাকে এ দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ করিবার ভাবে এরূপ বোধ হইতেছে যেন এ আজন্মের স্নেহরাজ্য হইতে ছিনাইয়া কে যেন তাহাকে কোন্ অজ্ঞাত ক্রূর দৈত্যপুরীতে প্রেরণ করিতেছে, হেথায় সে যেন আর ফিরিতে পারিবে না। রাজর্ষি জনকের অটল বৈরাগ্য প্রবল হৃদয়, কালিদাসের কাশ্যপের ন্যায়, কোমল সুস্নিগ্ধ বাৎসল্যরসে দ্রবিত চিত্রিত হইয়াছে! কিন্তু শ্বশুরালয়ে কন্যা যদি সকলের মন যোগাইয়া চলিতে না পারে তবে তাহার অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে এ আশঙ্কায় কন্যাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দিতেছেন। ইহা ছাড়া, কন্যা চিরকাল নারীর অবশ্য পালনীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তজ্জন্য জনক কন্যাকে ধর্ম্মোপদেশও দিয়াছেন। আমাদের অনুরোধ যে জনকের এ উপদেশ প্রত্যেক বাঙ্গালী কন্যা যেন বিস্মৃতা না হন।

রামের বনযাত্রা কালীন রামলক্ষ্মণ ও কৌশল্যার কথোপকথন, ভরতের রামকে রাজ্য পুনর্গ্রহণানুরোধে রামের প্রত্যুত্তর, তরণীসেন বধে বিভীষণের বিলাপ, মারীচের ছলভ্রান্তা সীতার লক্ষ্মণের প্রতি ভর্ৎসনা ও লক্ষ্মণের প্রত্যুক্তিপাঠে, কবির মানবস্বভাব পরিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ভারতচন্দ্র বর্ণিত হরগৌরীর কোন্দলে প্রাচীন সম্প্রদায় মুগ্ধ হন। তাহার কারণ এই যে, কুমার সম্ভবের মহান্ দেবচরিত্রের আদর্শে কবি আধুনিক বাঙ্গালীর চরিত্র আঁকিয়াছেন। সে চিত্রাঙ্কনেও অনেকাংশে তিনি কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী।

বিবিধ রসের অবতারণায় কৃত্তিবাস সিদ্ধহস্ত। রামায়ণ করুণরসপ্রধান, এমন কি শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি ইহা অমর কবিগুরু বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় কৃত্তিবাসও সর্ব্বাপেক্ষা করুণরসবর্ণনায় পারদর্শী। সীতাহরণ ও রামের বিলাপ বর্ণনায়, অন্ধমুনির পুত্রশোক-কাহিনীতে কৃত্তিবাস সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই কাঁদাইয়াছেন। মারীচ বধান্তর রামচন্দ্র হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া আসিতেছেন। মনে কেবলই আশঙ্কা হইতেছে পাছে লক্ষ্মণের মায়া-আহ্বানে লক্ষ্মণ একাকী জানকীকে আশ্রমে ছাড়িয়া আসে। 'কোথায় রামের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' পথে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ। রামের বাক্যবাণ নিক্ষেপ শুনেও যখন

লক্ষ্মণ আসিলেন ও যখন বামে শব ও দক্ষিণে শৃগাল ইত্যাদি অমঙ্গলচিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল তখন রামের সহিত ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পাঠকের হৃদয়ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। পরে আশ্রমে আসিয়াঃ—

প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল। একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া আকুল॥ পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুটিবীর। এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥ তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন। কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥ রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশুপাখী॥

মনেপড়ে, বাল্যকালে যতবার পড়িতাম ততবারই এক অব্যক্ত যাতনায় চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত ও হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত। তাহার পর কত বর্ষ অতীত হইয়া আমাদের স্কন্ধে অভিজ্ঞতার বোঝা চাপাইয়াছে তথাপি ইহার করুণস্বর সমভাবেই চিত্তব্যথিত করে! রবীন্দ্র নাথ সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যে পুরাতন পয়ারছন্দে এক নূতন যতিস্থাপন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। উহা অমিত্রাক্ষরের ন্যায়ই চাঞ্চল্য ও আবেগ বর্ণনায় একান্ত উপযোগী। কৃত্তিবাস কিন্তু পুরাতন পয়ার ছন্দই চঞ্চলগতি ও গভীর আবেগপূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে অন্যের পালিস্ পড়িয়াছে বটে তবে একেবারে কৃত্তিবাসী সরল সৌন্দর্য্য দূর করিতে পারে নাই। রামচন্দ্রের আকুল বিলাপই তাহার এক প্রকৃষ্ঠ প্রমাণঃ—

কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। পদ্মমালা পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
কোথাগেলে সীতা পাব কর নিরূপণ। রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী, চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥ চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
বুঝি কোন মুনিপত্নি সহিত কোথায়। রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা॥
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥ হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালেম বনে।
তথা কি কমল মুখী করেন ভ্রমণ॥ কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥

ইহাতে মলয় জ্যোৎস্না, পিক পাপিয়া, দীর্ঘ হাহুতাশ বা বুকফাটা নৈরাশ্যের ঘটা নাই, তথাপি সহজেই এবর্ণনা পাঠশেষে পাঠকের নেত্রোপান্তে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হয়। ইহাই সার্থক কবিত্ব। কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে—ইত্যাদি ভারতচন্দ্রের বিদ্যার বিলাপ ইহার তুলনায় সৌখীন, বা পোষাকি দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। কেবল করুণরসেই নহে, অন্য রস বর্ণনেও কবি পারদর্শী। অঙ্গদ রায়বারে হাস্য বিদ্রূপের, নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের, ইন্দ্রজিত বধে রাবণের ক্রোধ বর্ণনা স্থানে রৌদ্ররস প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অবতারণায় কৃত্তিবাস বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথম, রামের বিবাহ বর্ণনায়। সীতার চিত্ত বিনোদনার্থ সুনিপুণ চিত্রকরে চিত্রাঙ্কিত করিয়াছে। সে চিত্রে রামলক্ষ্মণ সীতা প্রভৃতির

জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি আঁকা রহিয়াছে। সীতাও রামকে লক্ষ্মণ বিয়য় নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। জনকালয়ে রামের বিবাহসভা। চিত্রে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন :—"ইয়মার্য্যা, ইয়মার্য্যা মাণ্ডবী, ইয়ং বধূ শ্রুতকীর্ত্তি"। লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার নাম করিলেন না দেখিয়া জানকী পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বৎস, ইয়মন্যাপরা কা?' লক্ষ্মণ সলজ্জে অধোবদন হইয়া স্বগত বলিলেন "অয়ে! উর্ম্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা।" রস উথলিয়া পড়িল :— এ নির্ম্মল পরিহাস রসে ভবভূতি কিরূপ উদ্ভাবনা করিয়াছেন! কৃত্তিবাসও এরূপ একটী সুন্দর গার্হস্থ্য চিত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বিবাহোৎসবে সমাগতা নাগরীগণ রামকে পরিহাস করিতেছেন। সীতাকে হাতে ধরিয়া তুলিতে হইবে। সীতার ভয় পাছে রাম পায়ে হাত দেন। সখীরা এদিকে রামকে পরিহাস করিয়া কেহ হাতে ধরিয়া কেহ পায়ে ধরিয়া তুলিতে বলিতেছে। ইহার পর বাসর ঘরে সকলে সমাগতা। বিবাহের রাত্রে বাসর যাপন বাঙ্গালীর দুঃখময় জীবনে একটী স্মরণীয় সুখোৎসব। সেই বাসরে সমাগতা নারীগণ পরিহাস করিতেছে :—

পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকী পতি এ নহে উচিত॥
এই কথা রাম যে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি যে বড় কাল॥
হাসিয়া বলেন রাম সভার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥

যদি এমন কেহ দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী থাকেন যে কৃত্তিবাস এ পর্য্যন্ত আদৌ পাঠ করেন নাই তাঁহাকে আমরা এ অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা ভরসা করি যে ইংরাজী সাহিত্য পাঠে বিশুদ্ধ-রুচি তাঁহার শ্রম ব্যর্থ যাইবে না। ভারতচন্দ্র হইলে এরূপ রস অশ্লীলতায় কলঙ্কিত করিতেন। পাঠকেরা শিবের বিবাহ, বিদ্যার সখীদের উক্তি তুলনা করুন। কবিকঙ্কণ এরূপ রস বর্ণনে বড় একটা পারদর্শী নহেন—করুণ রস বর্ণনেই তিনি অদ্বিতীয়। ঘনরামের এরূপ স্থানের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী নহে। কেবল কাশীরাম এ বিষয়ে কৃত্তিবাসের সমকক্ষ কিন্তু বোধ হয় কৃত্তিবাসের রুচি বিশুদ্ধতর। পাঠকেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দুষ্মন্ত ও পাণ্ডুর বিবাহ তুলনা করিবেন। অদ্ভুত রসবর্ণনার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চন্দ্রকে জয় করিয়া রাবণ শ্বেত দ্বীপে গিয়াছে। সেখানে এক চতুর্ভুজ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ। তিনি স্বয়ং নারায়ণ। তাঁহার বর্ণনা কৃত্তিবাসের এইরূপ :—

অষ্ট বসু আছে সেই পুরুষ শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে॥
দশ দিক্‌পাল আছে পুরুষের পাশে।
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সব বায়ু বৈসে॥
হৃৎখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভি পদ্ম আসনে বৈসেন হৈমবতী॥
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের গাজন॥

* * * *

করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে রোমাবলীরূপে আছে অবতার॥
বাসুকীর বিষজাল বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকী পুরুষের মস্তক উপরে॥
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি।

এই বর্ণনায় আমরা গীতার মহিমাময় বিশ্বরূপ বর্ণনার ধৈবতধ্বনি শুনিতে পাই।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে সুতরাং এখানে উপসংহার করাই ভাল। আজ চারি শত বৎসর হইল এইরূপে কৃত্তিবাস আমাদের হাসাইয়া কাঁদাইয়া আসিতেছেন। কত লোক না তাঁহার অমর কাব্য হইতে প্রীতি উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু আমরা এরূপ আনন্দদাতার সম্মানার্থ কি করিয়াছি! তাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে এতদিনে তাঁহাকে আমাদের স্মরণ হইয়াছে; উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইলে বঙ্গের এ শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রথমে যিনি এ প্রস্তাব করেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র। বিধাতার অভিশপ্ত আমাদের দেশে জন্মিয়া কৃত্তিবাসের এ দশা! আমরা প্রতিভার সম্মান জানি না; নচেৎ ইউরোপে জন্মিলে তাঁহার কি বিভিন্ন ভাগ্যই অপেক্ষা করিত! তবে দেবদত্ত প্রতিভা নাকি ব্যর্থ হইবার নহে এ জন্যই প্রত্যেক সহৃদয় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কৃত্তিবাস অমর সিংহাসন স্থাপিত করিয়াছেন! আমাদের ইতিহাস নাই—বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক কবে ঘুচিবে? কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানিনা অথচ কত কথা জানিতে ইচ্ছা করে! কবি ধনী কি দরিদ্র, সুপুত্রে ভাগ্যবান্ বা অভাগা নিঃসন্তান ছিলেন—তাঁহার অমূল্য কাব্যই বা কোন বয়সে রচিত হইয়াছিল—তিনি যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এ সকল কথা জানিবার, হায়, কোন উপায় নাই! কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাই কবি এক খোড়ো আটচালার দাওয়ায় বসিয়া তুলট কাগজে রামায়ণ লিখিতেছেন—তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রতিভা দীপ্ত আয়ত চক্ষুঃ, প্রশস্ত দর্পণোপম ললাট দেখিয়া তাঁহাকে সাধারণ লোক হইতে সহজেই পৃথক করা যাইত। তাঁহার পরণে ধুসরবর্ণ গরদ, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা, কর্ণে ললাটে ও গ্রীবাদেশে পূজাবশেষ রক্ত ও শ্বেত চন্দন চিহ্ন। যখন তিনি সীতার শ্বশুরালয়ে গমনোদ্যোগে জনকের বেদনা কল্পনায় অনুভব করিতেছেন তখন হয়ত সীতারই ন্যায় সুকুমারী তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তখন তাহাকে সাদরে বুকে টানিয়া চুম্বন করিতে করিতে তাহার স্বামীগৃহে গমনের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কবিরই নেত্র হয়ত জলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত যৌবনেই তাহার প্রিয়তমার মৃত্যু হইয়াছিল! কে জানে কবির নিজের মর্ম্মোচ্ছাস রামের পূর্ব্বকৃত বিলাপে অমরতা লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণ তখন জীবিত; যদি "কমলে কামিনী" ও ফুল্লরার কবির সহিত রামায়ণের কবির সাক্ষাৎ হইয়া থাকে—তবে উভয়ের আলাপ কিরূপ সুখকর হইয়াছিল! তাঁহার কাব্য পাঠে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত সাংসারিক সচ্ছলতায়, গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গে পরিবেষ্টিত ও নিজের গ্রামের লোক কর্তৃক সম্মানিত হইয়া কবি সুখে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কিম্বা এরূপও হইতে পারে যে কবিকঙ্কণের ন্যায়ই কৃত্তিবাস দরিদ্র ছিলেন ও "দশ আড়া ধান" প্রাপ্তিতেই কবিকঙ্কণের ন্যায়ই সন্তুষ্ট হইতেন।

এ সব প্রলাপমাত্র। কিন্তু এ বৃত্তান্ত পাঠে যদি কোন পাঠকের মনে এরূপ ভাবের

উদ্রেক হয় তবে আমরা দুঃখিত হইব না। চারি শত বৎসর ধরিয়া যে কবিতাস্রোত বঙ্গদেশে পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর ন্যায় মুদি বকালি হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মবৃত্তিকে উর্ব্বর করিয়াছে—কথকের মুখে শুনিয়া যে কাব্যগ্রন্থ হইতে অনভিজ্ঞ নিরক্ষর কৃষকেরাও রামের সত্যনিষ্ঠা সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষণের ভ্রাতৃবৎসলতা, বিভীষণের সাধুতা, আমাদের শিশু হৃদয়কে ধর্ম্মামৃত পানে বলিষ্ঠ পুষ্ট করিয়াছে—যে কবি জাতীয় জীবন গঠনে এতদূর সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন না করিয়া আর কাহাকে করিব? কালভেদে রুচিভেদে কবিদের আদর অনাদর বোধ হয় সকল সাহিত্যেই ঘটিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ আদর ছিল এখন রুচি পরিবর্ত্তনে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত ও তাহাদের মাতৃভাষা একেবারে বিনষ্ট ও বিস্মৃত না হইবে সে পর্য্যন্ত "বঙ্গভূমির অলঙ্কার" কৃত্তিবাসের কবিত্বকীর্ত্তি সহৃদয় ঐতিহাসিকের লেখনী-ঘোষিত হইবে এবং কবি কৃত্তিবাস যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্যধারণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অমরগণের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকিবেন।"

শ্রী বীরেশ্বর গোস্বামী।

মানী।

কে তোরে দিয়াছে মানি, বল হেন মান!
পদে পদে বাজে যাহে শুধু অপমান!
আজ সিংহাসন পরে আছিস্ বসিয়া,
দুয়ার হইতে কাণে যেতেছে পশিয়া,
ভিখারীর সকরুণ প্রাণের ক্রন্দন;
নারিস উঠিতে তবু ছাড়ি সিংহাসন।
মানী সে যাইতে নারে ভিখারীর কাছে,
লোকে যদি হাসে, অপমান করে পাছে।
[illegible] তার [illegible] যত্নে-গড়া বেশ,
ভিখারীর ধূলি লেগে হয় জ্যোতিলেশ!
দুই জনে এসেছিস এক স্থান হতে,
এক স্থানে দুজনের ফের হবে যেতে।
কে জানে তখন সেথা কেবা ধনবান;
কেবা ভিখারীর বেশে চাবে কার দান।
এক ধাতু এক ধাতা গড়ে দুই দেহ,
দুই হবে পুড়ে ছাই সোনা নহে কেহ।
কোথা হতে পেলি তবে এত মান তুই,
অপমান বাজে তাই ভিখারীরে ছুঁই!

কলিকালে কালোরূপ।

সখি ওলো!
চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালো রূপে আলো-করা শ্যাম!
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশি গোপী-মনচোরা;
শিরে শুধু শোভে পাগ্, কটিতটে চেন।
মণি তাহে কি বাহার!
[illegible] কি দিল তার,
প্রকৃতির কোন দৃশ্যে যে আনন্দ নাই!
মূরতি দেখিলে দূরে
অমনি হৃদয় পুরে,
কি আবেগ উথলিত কেমনে বুঝাই?
অধীর তখন মন,
আসে [illegible]!
পিপাসিত উপকার পাব কতক্ষণে?
[illegible] বটে অনিমিষ,
দ্রুত পায় এই দিকে,
গজেন্দ্রগামিনী তব আমার নয়নে!

সজনি বল গো বল
[illegible] কেমন হোল!
একদিন না দেখিলে শান্তি নাহি মনে।
হৃদয় কেমন করে,
[illegible]
কি মোহ দিল [illegible] কেমনে!
[illegible] মাখা
নাম তার এক কথা,
[illegible];
[illegible],
[illegible],
[illegible]!
[illegible]?
[illegible] কি?
কিছু আর নাই [illegible]!
প্রেম-[illegible]
[illegible] শুধু [illegible]!
পেয়াদা সে, বই জানি, [illegible] পেয়াদা!

কয়লার গ্যাস।

কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে পাথুরিয়া কয়লার গ্যাস জ্বালিয়া আলোক কার্য্য হইয়া থাকে; ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং ইহার মধ্যে কি কি বস্তু আছে তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন হেল্‌স্ নামক এক ব্যক্তি ১২৮ গ্রেণ কয়লা হইতে ৫০ গ্রেণ গ্যাস প্রস্তুত করেন; এই গ্যাস ১৮০ ঘন ইঞ্চ স্থান ব্যাপিয়াছিল, আর ইহা জ্বালাইয়া আলোক উৎপন্ন করা হইয়াছিল। অতঃপর বিশপ ওয়াট্‌সন্ তাঁহার এক গ্রন্থে লেখেন যে কয়লা জাত গ্যাস জলের মধ্য দিয়া এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে লইয়া গেলে উহার আলোক উৎপাদন করিবার শক্তি বিনষ্ট হয় না। অবশেষে উইলিয়ম মরডক নামক স্কটজাতীয় একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া কয়লার গ্যাস ব্যবহার উপযোগী করেন; তিনি ওয়েল্‌স্ দেশে রেডরুথ্ নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং তথায় লৌহপাত্রে পাথুরিয়া কয়লা

উদ্রেক হয় তবে আমরা দুঃখিত হইব না। চারি শত বৎসর ধরিয়া যে কবিতাস্রোত বঙ্গদেশে পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর ন্যায় মুদি বকালি হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী পর্য্যন্ত প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মবৃত্তিকে উর্ব্বর করিয়াছে—কথকের মুখে শুনিয়া যে কাব্যগ্রন্থ হইতে অনভিজ্ঞ নিরক্ষর কৃষকেরাও রামের সত্যনিষ্ঠা, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষণের ভ্রাতৃবৎসলতা, বিভীষণের সাধুতা, আমাদের শিশু হৃদয়কে ধর্ম্মামৃত পানে বলিষ্ঠ পুষ্ট করিয়াছে—যে কবি জাতীয় জীবন গঠনে এতদূর সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন না করিয়া আর কাহাকে করিব? কালভেদে রুচিভেদে কবিদের আদর অনাদর বোধ হয় সকল সাহিত্যেই ঘটিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ আদর ছিল এখন রুচি পরিবর্ত্তনে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত ও তাহাদের মাতৃভাষা একেবারে বিনষ্ট ও বিস্মৃত না হইবে সে পর্য্যন্ত "বঙ্গভূমির অলঙ্কার" কৃত্তিবাসের কবিত্বকীর্ত্তি সহৃদয় ঐতিহাসিকের লেখনী-ঘোষিত হইবে এবং কবি কৃত্তিবাস যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্যধারণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের অমরগণের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকিবেন।"

শ্রীহীরেশ্বর গোস্বামী।

মানী।

কে তোরে দিয়াছে মানি, বল হেন মান!
পদে পদে বাজে যাহে শুধু অপমান!
রাজ সিংহাসন পরে আছিস্ বসিয়া,
দুয়ার হইতে কাণে যেতেছে পশিয়া,
ভিখারীর সকরুণ প্রাণের ক্রন্দন;
নারিস উঠিতে তবু ছাড়ি সিংহাসন।
মানী যে যাইতে নারে ভিখারীর কাছে,
লোকে যদি হাসে, অপমান করে পাছে।
যদি তার মলিন যত্ন-গড়া বেশ,
ভিখারীর ধূলি লেগে হয় জ্যোতিলেশ!
দুই জনে এসেছিস এক স্থান হতে,
এক স্থানে দুজনের ফের হবে যেতে।
কে জানে তখন সেথা কেবা ধনবান;
কেবা ভিখারীর বেশে চাবে কার দান।
এক ধাতু এক ধাতা গড়ে দুই দেহ,
দুই হবে পুড়ে ছাই সোনা নহে কেহ।
কোথা হতে পেলি তবে এত মান তুই,
অপমান বাজে তাই ভিখারীরে ছুঁই!

কলিকালে কালোরূপ।

সখি ওলো!
চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালো রূপে আলো-করা শ্যাম!
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশি গোপী-মনচোরা;
শিরে শুধু শোভে পাগ্, কটি বটে চাম!
মরি তাহে কি বাহার!
উপমা কি দিব তার,
প্রকৃতির কোন দৃশ্যে সে আনন্দ নাই!
মূরতি দেখিলে দূরে
অমনি হৃদয় পূরে,
কি আবেগ উথলিত কেমনে বুঝাই?
অধীর চঞ্চল মন,
আসে হেথা কতক্ষণ!
বিরচিত উপহার পাব কতক্ষণে?
হেলি বটে অনিবার,
দ্রুত ধায় এই দিকে,
গজেন্দ্রগামিনী তবু আমার নয়নে!

সজনি, বল গো বল
আমার এ কেমন হোল!
একদিন না হেরিলে শান্তি নাহি মনে।
হৃদয় কেমন করে,
নয়নে সলিল ঝরে,
কি মোহ নিয়া সে ফিরে—বলিব কেমনে!
সরমের খেয়ে মাথা
বলি আর এক কথা,
বলিসনে, মাথা খাস, যেন লো কাহারে;
একা আমি নই, বোন,
আরো হেন কত জন,
তার পথ পানে চেয়ে হা হা করে মরে!
কি শুধাস ওলো সখি?
নাম ধাম বলিব কি?
কিছু আর নাহি জানে অবোধ এ রাধা!
প্রিয়-হস্তাক্ষর দেখি
মজিয়াছে শুধু আঁখি!
পেয়াদা সে, এই জানি, ডাকের পেয়াদা!

কয়লার গ্যাস।

কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে পাথুরিয়া কয়লার গ্যাস জ্বালিয়া আলোক করা হইয়া থাকে; ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং ইহার মধ্যে কি কি বস্তু আছে তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন হেল্‌স্ নামক এক ব্যক্তি ১২৮ গ্রেণ কয়লা হইতে ৫১ গ্রেণ গ্যাস প্রস্তুত করেন; এই গ্যাস ১৮০ ঘন ইঞ্চ স্থান ব্যাপিয়া ছিল, আর ইহা জ্বালাইয়া আলোক উৎপন্ন করা হইয়াছিল। অতঃপর বিশপ ওয়াট্‌সন্ তাঁহার একগ্রন্থে লেখেন যে কয়লা জাত গ্যাস জলের মধ্য দিয়া এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে লইয়া যাইলে উহার আলোক উৎপাদন করিবার শক্তি বিনষ্ট হয় না। অবশেষে উইলিয়ম মরডক নামক স্কট্‌জাতীয় একব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া কয়লার গ্যাস ব্যবহার-উপযোগী করেন; তিনি ওয়েল্‌স্ দেশে রেড্‌রুথ্ নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং তথায় লৌহপাত্রে পাথুরিয়া কয়লা

উত্তপ্ত করিয়া গ্যাস প্রস্তুত করেন আর ঐ গ্যাস দ্বারা স্বকীয় ভবন আলোকিত করেন। ইহার পর তিনি বার্ম্মিংহাম নগরের নিকট সোহো নামক স্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন; তথায় তিনি উক্ত গ্যাস প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংশোধন করিয়া তুলেন, এবং ১৭৯৮ অব্দে সোহোর যে কুঠীতে তিনি কর্ম্ম করিতেন তাহা গ্যাসদ্বারা আলোকিত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রণালী এত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে ১৮০৫ অব্দে ম্যাঞ্চেষ্টর নগরের ফিলিপ্‌স্ ও লী নামক দুই ব্যক্তির কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার এক বৃহৎ কারখানায় গ্যাসের আলোক ব্যবহৃত হয়।

ক্রমে ক্রমে অনেক গুণবান্ লোক এই বিষয়ে মনোযোগ করেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ডাঃ উইলিয়ম হেন্‌রি উক্ত গ্যাসের রাসায়নিক প্রকৃতি অর্থাৎ উহাতে কি কি পদার্থ কত পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করেন। আর ক্লেগ নামক এক ব্যক্তি উহা প্রস্তুত ও সাফ করিবার অনেক গুলি কল ও কৌশল আবিষ্কার করেন, এই সকল অদ্যাবধিও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কিম্বা উহার কিঞ্চিৎ পরে প্যারিস সহরে গ্যাসের দ্বারা রাস্তাসমূহ আলোকিত করা হয়।

পাথুরিয়া কয়লা উত্তপ্ত করিলে কয়েক প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; উত্তাপ করিবার সময় যে পাত্রে কয়লা থাকে তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না (নচেৎ কয়লা জ্বলিয়া উঠিয়া ভস্মে পরিণত হয়।) উক্ত সকল পদার্থকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম, গ্যাসীয় বস্তু, ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র; দ্বিতীয়, তৈলবৎ বস্তু, ইহাকে আমরা আলকাতরা বলিয়া থাকি; তৃতীয়, জলীয় বস্তু, ইহা এমোনিয়া ও অন্যান্য কতক গুলি পদার্থ মিশ্রিত জল মাত্র।

কয়লার গ্যাস প্রস্তুত করিবার কলের এই কয়টি অংশ থাকে; প্রথম, রিটর্ট অর্থাৎ গ্যাস জন্মাইবার পাত্র; দ্বিতীয়, গ্যাস হইতে জলীয় বস্তু পৃথক করিবার অংশ; তৃতীয়, জ্বালাইবার গ্যাস হইতে অহিতকর গ্যাসসমূহ পৃথক করিবার অংশ; চতুর্থ, গ্যাস সংগ্রহ করিয়া রাখিবার পাত্র, ইহা হইতে নলদ্বারা গ্যাস ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইচ্ছামত চালিত ও প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে।

রিটর্ট বা গ্যাস প্রস্তুত করিবার পাত্র; ১৮১২ অব্দে উল্লিখিত ক্লেগ লৌহনির্ম্মিত পাত্র প্রচলিত করেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার পরিবর্ত্তে এক প্রকার মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহৃত হয়। এই মৃত্তিকাকে অগ্নিসহ মৃত্তিকা কহে, অর্থাৎ ইহা হইতে নির্ম্মিত পাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলেও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই রূপ পাত্র চারি পাঁচ হাত লম্বা, এক হাত প্রস্থ, এবং এক হাতের কিছু কম উচ্চ হইয়া থাকে; আর ইহাতে এক একবারে এক শত কিম্বা তাহার অধিক সের কয়লা পুরিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাত্রের এক প্রান্ত বন্ধ অপর প্রান্তে একটি লৌহ নির্ম্মিত মুখ সংলগ্ন, এই মুখ হইতে গ্যাস নির্গত হইয়া একটি ঊর্দ্ধ উন্নীত নলদ্বারা বহির্গত হইবার পথ আছে। এই প্রকার কতকগুলি পাত্র হইতে

গ্যাস জন্মিয়া নলদ্বারা বাহির হইয়া হাইড্রুলিক মেন্ নামক একটি বৃহৎ নলের মধ্যে প্রবেশ করে; এই বৃহৎ নল ধরাতলে সমান্তরালে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহার নিম্নভাগে জল থাকে। গ্যাস এই জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উহার আলকাতরা ও এমোনিয়া মিশ্রিত বাষ্প শীতল হয় এবং জলের মধ্যেই রহিয়া যায়, আর পরে তথা হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। হাইড্রুলিক মেন্ নামক নল হইতে বাহির হইয়া গ্যাস কতকগুলি উচ্চ লৌহ-নির্ম্মিত নলের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে; একটি নলের নিম্নে প্রবেশ করিয়া উহার উপরিভাগে উঠে এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী নলের উপরিভাগে প্রবেশ করিয়া তাহার নিম্নে যায় এবং তথা হইতে আবার একটি নলের নিম্নে প্রবেশ করে, ইত্যাদি। এইরূপে কতকগুলি নলের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গ্যাসের উত্তাপ যত কমিতে থাকে উহার আলকাতরা ও এমোনিয়া মিশ্রিত বাষ্পও তত জমিয়া জলীয় আকার ধারণ করে এবং নিম্নে পতিত হয়। কিন্তু এরূপ করিয়াও গ্যাসের সমুদয় আলকাতরা দূরীভূত হয় না; অতএব উহাকে [illegible] ফুট উচ্চ লৌহধাতু-নির্ম্মিত কতকগুলি স্তম্ভের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয় এবং তখন উহাদের উপর স্তম্ভগুলির উপরিভাগ হইতে জল বর্ষণ করা হয়। ইহাতে গ্যাস হইতে প্রায় সমস্ত আলকাতরা দূরীভূত হয়। অর্থাৎ আলকাতরা জলের সহিত মিশিয়া নিম্নে পড়ে আর গ্যাস চলিয়া যায়। আলকাতরা ব্যতীত আর দুইটী বস্তুও গ্যাস হইতে এই স্থলে পৃথক্ হইয়া যায়, ইহারা গন্ধক জাত দ্রব্য (কয়লার মধ্যে যে অল্প পরিমাণ গন্ধক থাকে তাহা হইতেই ইহাদিগের উৎপত্তি।) এই দুই দ্রব্যের মধ্যে একটীর নাম সল্‌ফরেটেড্-হাইড্রজেন আর অপরটীর নাম কার্ব্বনডাইসল্‌ফাইড্; ইহারা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ও বিষময়; গ্যাসের সহিত বাহির হইয়া আসিয়া এই দুই পদার্থ বায়ুতে জ্বলিলে সল্‌ফিউরিক্ এসিড উৎপন্ন হয় এবং এই এসিডের সংস্পর্শে ধাতু ও চর্ম্ম নির্ম্মিত সমুদয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে গ্যাস হইতে সল্‌ফরেটেড্ হাইড্রজেন ও কার্ব্বনডাইসল্‌ফাইড্ সহজে দূরীকৃত হইতে পারে এই নিমিত্ত উল্লিখিত স্তম্ভের মধ্যে শুদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে এমোনিয়া মিশ্রিত জল বর্ষণ করা হইয়া থাকে এমোনিয়া ঐ দুই বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় এবং তাহা হইতে যে যে বস্তু জন্মে তাহা সহজেই উক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয়। স্তম্ভের মধ্য দিয়া গ্যাস যখন বাহির হইয়া আইসে, তখনও উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে উল্লিখিত দুই পদার্থের বাষ্প থাকে এবং তাহা ব্যতীত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস থাকে; কার্ব্বনিক এসিড বর্ত্তমান থাকিলে গ্যাসের আলোক উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। এই সকল অনিষ্টকর বস্তু দূর করিবার নিমিত্ত গ্যাসকে অল্প জল মিশ্রিত চূণ কিম্বা চূণ, হীরাকষ, ও করাতের গুঁড়া এই তিনের মিশ্রণের সংস্পর্শে আনীত করা হইয়া থাকে।

এইরূপে সংশোধন করিলে পর যে গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে অনেকগুলি বাষ্পীয় ও বায়বীয় পদার্থ থাকে; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি জ্বলিলে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হয় আর কতকগুলি হইতে আলোক উৎপন্ন হয় না, কেবল উত্তাপ জন্মে; প্রথম শ্রেণীর

পদার্থগুলির নাম এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; তাহারা অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই দুই মূল পদার্থের যৌগিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থগুলির মধ্যে এই কয়টী প্রধান: হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্ব্বন মনক্সাইড্, ও মার্শ গ্যাস; ইহা ব্যতীত কিয়ৎ পরিমাণে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন (যবক্ষারজান ও অম্লজান) গ্যাস এবং উল্লিখিত কার্ব্বন ডাইসল্ফাইড্ ও সলফুরেটেড্ হাইড্রোজেন থাকে।

গ্যাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কয়লা (পাথুরিয়া) ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকৃতি ও প্রস্তুত করিবার সময় যে উত্তাপ প্রযুক্ত হয় তাহার উষ্ণতার মাত্রার উপর গ্যাসের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নির্ভর করে। ক্যানেল কোল নামক কয়লা হইতে যে গ্যাস জন্মে তাহাতে উৎকৃষ্ট আলোক পাওয়া যায় আর সাধারণ পাথুরিয়া কয়লা হইতে যে গ্যাস পাওয়া যায়, তাহার আলোক তত অধিক নহে। গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় যদি যথোচিত উত্তাপ প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে গ্যাসের অংশ অল্প আর অন্যান্য অংশ (আলকাতরা) অধিক হয়, আবার যদি উষ্ণতা অত্যন্ত অধিক হয় কিম্বা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গ্যাস প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে যে গ্যাস জন্মে তাহার আলোক প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রায় কিছুই থাকে না কারণ তাহাতে অধিক পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক গ্যাসের আলোক উৎপাদিকা শক্তি কি প্রকারে পরিমিত হইয়া থাকে। গ্যাসের আলোক এক প্রকার মোমবাতির আলোকের সহিত তুলনা করিয়া পরিমিত হইয়া থাকে; এই মোমবাতির মোম ঘণ্টায় ১২০ গ্রেণ পরিমাণে জ্বলে, আর গ্যাস বাতির গ্যাস ঘণ্টায় পাঁচ ঘনফুট জ্বালান হইয়া থাকে, আর গ্যাসবাতির আলোক ঐ মোমবাতির আলোক অপেক্ষা কতগুণ অধিক তাহা পরীক্ষিত হয়। একখণ্ড শ্বেত কাগজের মধ্যস্থলে একবিন্দু ঘৃত কিম্বা চর্ব্বি লাগাইয়া রাখ, পরে একটি অন্ধকার ঘরে একটি বাতির সম্মুখে কাগজখানি ধর, দেখিতে পাইবে যে কাগজখানির অন্যান্য অংশ সাদা আর উহার যেখানে চর্ব্বি লাগিয়াছে সেখানে প্রায় কাল, ইহার অর্থ এই যে এই স্থলে যে আলোক পড়িতেছে তাহা চর্ব্বির মধ্য দিয়া অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে, তোমার চক্ষুর দিকে প্রতিফলিত হইতেছে না; ইহার পর কাগজখানি আলোক ও তোমার চক্ষু এই দুয়ের মধ্যে ধর, দেখিতে পাইবে যে চর্ব্বিযুক্ত স্থল কাগজের অন্যান্য স্থল অপেক্ষা অধিক আলোকময়; ইহার অর্থ এই যে চর্ব্বির মধ্য দিয়া আলোক সহজেই আসিতেছে আর কাগজের অন্যান্য অংশ হইতে তত আসিতে পারিতেছে না। এইরূপ একখানি কাগজ উল্লিখিত গ্যাসের বাতি ও মোমবাতি এই দুয়ের মধ্যে এরূপ স্থলে ধর যে কাগজের চর্ব্বিযুক্ত স্থল উভয় পার্শ্ব হইতেই সমান উজ্জ্বল দেখায়। তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ স্থলে মোমবাতি হইতে যে আলোক পতিত হইতেছে তাহা গ্যাসবাতি হইতে পতিত আলোকের সহিত পরিমাণে সমান; গ্যাসবাতির আলোক চর্ব্বির মধ্য দিয়া মোমবাতির দিকে আর ইহার আলোক উহার দিকে চলিয়া যাইতেছে, উভয় আলোক পরিমাণে সমান

প্রতিপত্তি সমধিক হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের অন্তরে বিদেশীয় বা স্বদেশীয় কোন রূপ বিশ্বাসের স্থাপনা হইলেই আশার সঙ্গীত আমাদের অধিকতর সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হইত। কবির আশ্বাস বাণী হৃদয়ে ধারণার জন্য তাঁহার সহিত সমবিশ্বাসী হইবার প্রয়োজন করে না, হৃদয়ে কোনরূপ বিশ্বাসের স্থাপনা হইলেই সহানুভূতির বলে কবির আশাসঙ্গীত মানব হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাসের অভাব বলিয়াই সেলি প্রভৃতির উদ্দাম অসংযত বাঙ্ময় কাল্পনিক কথাও সুমিষ্ট সুরে সন্নিবেশন বশত আমাদের হৃদয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থাদির সরল কারুণ্য অপেক্ষা এতদূর অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয়।

আমাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত নৈরাশ্য অবিশ্বাস আপন সয়তানী রাজত্বের বিস্তার করিতে পারিলে আর আমাদের বড় রক্ষা ছিল না; কিন্তু সুখের বিষয় তাহা ঘটে নাই। সং, যে বিশ্বাসের অভাব মাত্র, জীবন্ত অবিশ্বাস নহে, তাহার প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন করিবে না, বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থেতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হইবে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি হইতে দেখা যায় যে ক্রন্দনরোলবহুল নৈরাশ্য অবিশ্বাস প্রসূত নহে, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের অভিমানাশ্রুর ন্যায় ক্রন্দন মাত্র। একজন গাহিতেছেন,—

ফোটেনা প্রাণের ভাষা অধরেতে আর,
সুখ-আশা ফোটেনাক আর কল্পনায়;
জীবন শ্মশানময় হয়েছে আমার,
কবিতার, কল্পনার দিন গেছে হায়!

সহসা এই খানেই এই দারুণ নৈরাশ্য সঙ্গীতের ছেদ মনে আকাঙ্ক্ষিত হয়, কিন্তু কবি এক নিশ্বাসেই গাহিয়া চলিতেছেন,—

নীরব নিরাশা-ভাষা বুঝিবারে চাই,
কে জানে কিনারা কোথা ভাবিয়া না পাই।

জীবন শ্মশানসম হইবার পরেও কবি যে নিরাশার ভাষা বুঝিবার জন্য অগ্রসর হন তাহাতেই বোঝা যাইতেছে প্রকৃত পক্ষে শ্মশানের সাদৃশ্য কতদূর সার্থক তাহার উপর আবার তার কিনারা পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাওয়া যায় নাই। তখন এরূপ অবস্থায় ইহাকে অভিমানের ক্রন্দন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

এই ভীষণ নৈরাশ্যের পরে কবি নববর্ষের আগমনে পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুরে গাহিতেছেন—

আন মুখে হাসি রাশি, পরাণে উঠুক ভাসি
জগতের সঙ্গীত মহান,
ডাকিছে আকুল ক'রে পরাণে পরাণ ভ'রে
ওই শোন মধুর বিষাণ!

"প্রতিধ্বনি"তে নৈরাশ্যের সহিত আশা এবং উৎসাহের রাগিণী আরও সুস্পষ্ট ধ্বনিত—

এস, অপ্রেমিকে প্রেম শিখাইয়ে,
ভাই ভগ্নী সব একত্র হইয়ে,
পরম দয়ালু করুণা নিদান,
সকলের পিতা সেই বিশ্ব প্রাণ,
করি হে তাঁহারি মহিমা গান !

অপর এক মহিলা-কবি বিলাপ করিতেছেন—

একা আমি জগতের পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুম ফুলে,
ঢালে না পাখী, কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;

পরে এই সুরই নিয়ে ঘনীভূত হইয়াছে—

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার দোসর কেন হবে ?
শ্মশান-সৈকত বাকে
একাকী পুড়িয়া সুখে,
জগত সংসার মোর শত দূরে রবে,
আমারে স্নেহ
দেয়নি—দিবেনা কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

কবিতার শেষ ভাগে কবির প্রার্থনা—

যে কদিন থাকে প্রাণ এই করো ভগবান !
গাই যেন তার গান বসি একা একা।

বিশ্বাসের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কুজ্ঝটিকার তিরোধান অবশ্যম্ভাবী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাহাকে philosophic mind বলিয়া গিয়াছেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে তাহার বিকাশের অভাব সুস্পষ্ট অনুভূত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ আশা-বিশ্বাসের কোমল মধুর রাগিণী বঙ্গ সাহিত্যে আদৌ শ্রুত হয় না—

...welcome fortitude, and patent cheer,
And frequent sights of what is to be borne !
Such sights, or worse, as are before me here :—
Not without hope we suffer and we mourn.